ভারতী

বোম্বাই রায়ৎ।

রায়ৎওয়ারী বন্দবস্তের বিশেষ গুণ এই যে ইহা ত্রিশ বৎসর কাল গবর্ণমেণ্টের উপর বন্ধনকারী—সেই কালের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট খাজানা বৃদ্ধি করিতেও পারেন না ও খাজানা দিতে ত্রুটি না করিলে রায়ৎকে স্থানান্তরিত করিতেও পারেন না অথচ তাহা রায়তের উপর বন্ধনকারী নহে। রায়ৎ ইচ্ছা করিলে ফসলী সালের প্রারম্ভে তাহার উপভোগ্য জমির সম্পূর্ণ অথবা এক ক্ষেত্রের অন্যূন কিয়দ্ভাগ পরিত্যাগ করিতে পারে এবং অন্যান্য অনধিকৃত ক্ষেত্র আবাদের জন্য গ্রহণ করিতে পারে। এ নিয়ম রায়তের পক্ষে সামান্য হিতকরী নহে। এই বন্দবস্তে ত্রিশ বৎসর ইজারার যে লাভ তাহা সম্পূর্ণ রায়তের অথচ তন্নিবন্ধন দায়িত্ব হইতে সে মুক্ত। তাহাতে তাহার কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই, কেননা ক্ষতির সম্ভাবনা দেখিলে নিজ স্বত্ব ছাড়িয়া দিবার তাহার কোন বাধা নাই। ছাড়িতে হইলে তাহার হস্তস্থিত সমস্ত ভূমি ছাড়িয়া দিতে হইবে তাহাও নহে—সে আপন ইচ্ছামত আপনার শক্তি-অনুসারে অল্প কিম্বা অধিক ভূমিখণ্ড রাখিয়া অবশিষ্ট ভাগে ইস্তফা দিয়া তাহার খাজানার দায় হইতে মুক্ত হইতে পারে। মনে কর, এক জন রায়তের দশটি ক্ষেত্র আছে, তাহার সমুদায়ে ১৫০ টাকা ও প্রত্যেকের জন্য ১৫ টাকা করিয়া খাজানা দিতে হয়। মনে কর, তাহার অবস্থা সচ্ছল—হাতে কিছু টাকা আসিয়াছে ও সেই টাকা দিয়া তাহার জমির স্থায়ী উন্নতি সাধনে সে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে—যথা, তাহার ভূমির এক ভাগে জলসেকের জন্য কুয়া খনন করা। এক্ষণে বিবেচনা কর, যদি তাহার সমগ্র ভূমির জন্য বৎসর বৎসর তাহাকে ১৫০ টাকা করিয়া খাজানা দিতে হয় তাহাতে তাহার সুবিধা অথবা যদি তাহার প্রত্যেক ক্ষেত্রের জন্য পৃথক্ খাজানা ১৫ টাকা নিরূপিত হয় ও সে তাহার যত গুলি ইচ্ছা রাখিতে ও ছাড়িয়া দিতে পারে তাহা হইলে তাহার সুবিধা হয়? পূর্ব্বোক্ত প্রকার নিয়ম হইলে হয়ত কোন আপদ বিপদে সে অত টাকা দিয়া উঠিতে অক্ষম হইতে পারে ও যে টাকা সে ভূমির উৎকর্ষ সাধনে ব্যয় করিয়াছে, ভূমির সঙ্গে সঙ্গে সে টাকাও তাহার নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। শেষোক্ত

প্রকার নিয়মে তাহার অবস্থা বুঝিয়া কতকগুলি ক্ষেত্র সে ইচ্ছামত ছাড়িয়া দিতে ও তন্নিবন্ধন খাজানার দায় হইতে অনায়াসে নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হয়। আর যে সকল ক্ষেত্র অধিক মূল্যবান্ ও যাহার উৎকর্ষ সাধনে তাহার অর্থব্যয় হইয়াছে তাহা রক্ষা করিতেও কৃতকার্য্য হইতে পারে। উল্লিখিত প্রকার দুই নিয়মের মধ্যে যে নিয়ম রায়তের পক্ষে অধিক সুবিধাজনক, যাহাতে জমির উন্নতি সাধনের জন্য অর্থব্যয়ে তাহার অধিক প্রবৃত্তি জন্মে—অধিক সাহসের সঞ্চার হয়, সেই নিয়মটিই এই রায়ৎওয়ারী বন্দবস্তের অন্তর্গত। এদিকে ত্রিশ বৎসর অন্তর বন্দবস্ত পরিবর্ত্ত করিবার নিয়ম থাকাতে সরকারী খাজানার কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। খাজানা দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তৎসমুদায়ই রায়তের ভোগ্য—জমির উপস্বত্বভাগী জমিদার কি পত্তনীদার আসিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিতে পারে না। রায়ৎ তাহার নিজ স্বত্বের উপর সম্পূর্ণ অধিকারী—গবর্ণমেণ্টের খাজানা দিবার ব্যতিক্রম না ঘটিলে কেহই তাহাকে সে স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ তাহার সত্বে হস্তক্ষেপ করিতে অসমর্থ। রায়তের দেয় খাজনা নিয়মিত সময়ে গ্রহণ করা ভিন্ন তাহারা আর কিছুই করিতে পারে না। এই সময়ে খাজানার টাকা লইয়া প্রস্তুত থাকিলে রায়ৎ নিজের জমি আবাদ করিয়াছে কি না—ফসল ভাল কি মন্দ হইয়াছে—এসকল বিষয়ের তদারক করিবার কোন আবশ্যক নাই। নূতন বন্দবস্ত করিবার নিয়ম এই যে, রায়ৎ নিজ যত্ন ও পরিশ্রমে যাহা কিছু উন্নতি সাধন করিয়াছে তাহা বিচারস্থলে আনীত না হইয়া অন্যান্য কারণে জমি ও ফসলের মূল্য বৃদ্ধি দেখিয়া খাজানার হার নিরূপিত হইবে। রায়তের লাভের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া খাজানা বৃদ্ধি করিলে সে ভূমি কর্ষণ হইতে বিরত হইবে সুতরাং তাহাতে গবর্ণমেণ্টকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। রায়ৎ অযথাবিধ খাজানা বৃদ্ধির আশঙ্কা না রাখিয়া ইচ্ছামত ভূমির উৎকর্ষ সাধনে তৎপর থাকিতে পারে। অতএব কে না স্বীকার করিবে যে রায়তওয়ারী বন্দবস্তে সরকারী খাজানা আদায়ের যেমন সুবিধা, তেমনি তাহা আবাদ কার্য্যের উন্নতি ও কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের নিদানভূত।

রায়ৎওয়ারী বন্দবস্তে নিম্নলিখিত চারিটি প্রধান নিয়ম দৃষ্ট হইবে।

(১) প্রত্যেক রায়তের সহিত গবর্ণমেণ্টের পৃথক্ বন্দবস্ত।

(২) ত্রিশ বৎসর, কি অন্য কোন নিয়মিত কালের জন্য ইজারা দান—সেই ইজারার অন্তর্গত সমুদয় অথবা কিয়দংশ ভূমি রায়ৎ ইচ্ছামত বৎসরের শেষে ছাড়িয়া দিতে পারে কিন্তু খাজানা দিবার ত্রুটি না হইলে গবর্ণমেণ্টের তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই।

(৩) রায়ৎ নিজস্ব ইজারা বিক্রয় কিম্বা বন্ধক দ্বারা হস্তান্তরিত করিবার সম্পূর্ণ অধিকারী।

(৪) নিয়মিত কাল অতীত হইলে রায়তের স্বকৃত উন্নতি সাধনের উপর লক্ষ্য করিয়া খাজানার হার বৃদ্ধি হইবার নহে।

যে সকল রায়তের নিকট হইতে নিয়মিত সরকারী খাজানা গৃহীত হয় তাহারা দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে—গতকুলী অথবা উপরী ও মিরাসদার। উপরী রায়তেরা রায়ৎওয়ারী বন্দবস্ত হইতে যাহা কিছু স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তদ্ভিন্ন ভূমির উপর তাহাদের কোন স্থায়ী স্বত্ব নাই। কিন্তু মিরাসদার পূর্ব্ব হইতেই জমীর প্রকৃত মালিক রূপে পরিগণিত। তাহাদের স্বত্ব বংশপরম্পরাগত ও বিক্রয়ের পাত্র ও নিয়মিত খাজানা দিতে পারিলে তাহারা তাহাদের ভূমি হইতে পরিচ্যুত হইতে পারে না। মিরাস-স্বত্ব এরূপ প্রবল যে মিরাসদার যদি তাহার ভূমি ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায় ত যখনি ফিরিয়া আসিয়া নিজ ভূমি প্রতিগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিবে তখনি তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে। এক্ষণে কেবল তামাদি বিষয়ক আইন প্রচলিত হইয়া তাহার সেই অধিকারের কিঞ্চিৎ খর্ব্বতা ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহা দৃষ্ট হইবে যে জরীপি বন্দবস্তে উপরী রায়ৎদের প্রতি যে সকল অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে ফলে তাহাদের ও মিরাসদারদের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই—এই মাত্র প্রভেদ যে উপরী রায়ৎ একবার তাহাদের জমি ছাড়িয়া দিলে তাহা প্রতিগ্রহণের দাওয়া করিতে পারে না। মহারাষ্ট্র দেশে মিরাস ভূমি বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

রায়ৎওয়ারী জমির উপর যে নির্দ্ধারিত জমা তাহার প্রত্যেক টাকায় এক আনার হিসাবে এক অতিরিক্ত কর রায়তের নিকট হইতে গৃহীত হয়।—তাহার নাম 'লোকল ফণ্ড সেস'। তাহা লোকল ফণ্ডে জমা হয় ও পল্লীসমূহে বিদ্যাপ্রচার ও পথ নির্ম্মাণ ও সংস্করণ প্রভৃতি স্থানিক কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিয়ম এই যে, এই টাকার দুই তৃতীয়াংশ শিক্ষা ফণ্ডে ও এক তৃতীয়াংশ রথ্যাফণ্ডে প্রযুক্ত হইবে। স্থানিক ফণ্ড নিম্নলিখিত ফণ্ডের সমষ্টি।—

রথ্যাফণ্ড।

শিক্ষাফণ্ড।

গোষ্ঠগৃহ ফণ্ড। (এই গৃহে অনিষ্টকারী গোমেষাদি ধৃত হইয়া রক্ষিত হয় ও তাহাদের ছাড়াইবার জন্য যে দণ্ড দিতে হয় তাহা হইতে এই ফণ্ড সংগৃহীত)

তরণ নৌকাফণ্ড।

টোল ফণ্ড।

পাইশাফণ্ড।

এই সকলের উৎপন্ন টাকা হইতে নিজ নিজ ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা সাধারণ লোকল ফণ্ডে জমা হয়।

এই সম্বন্ধে মুসলমান রাজাদের যে রীতি ছিল তদ্বিষয়ে Sir Henry Lawrence বলেনঃ—

"মুসলমান রাজাদের সমুদয় কার্য্যের প্রবর্ত্তন কেবলি স্বার্থপরতা। রাস্তা, সরাই, আবাদ—এ সকল কি প্রজাদের জন্য? না, তাহা নহে, সকলি রাজার চলাচলের

সুবিধার জন্য। একটী বাদসাহি সরাই নির্ম্মাণে যে ব্যয় তাহাতে প্রজাদের জন্য দশটা সরাই নির্ম্মিত হইতে পারিত। এ-দেশের সকল স্থানেই এই নিয়ম। যে স্থান দিয়া রাজার পরিভ্রমণ করিবার সম্ভাবনা সেখানে সুবিস্তীর্ণ পথ ও অন্যান্য অশেষ-বিধ সুবিধা। অন্যত্র পথ, পানীয়, আ-শ্রমের জন্য প্রজাদের বৃথা ক্রন্দন। অযো-ধ্যার নবাব—জোয়ানপুর ও মহারাষ্ট্রের মুসলমান রাজাদেরও ঐরূপ পদ্ধতি। তা-হাদের প্রিয় বাসগৃহের সন্নিহিত স্থান সকলকে সজ্জিত ও শোভিত করা—তাহা-দের ক্রীড়াকাননে যাইবার জন্য পথ মুক্ত করা—তাহাদের পথের বিঘ্নকারী নদীর উপর সেতু বন্ধন করা—সুন্দর কূপ খনন ও ছায়াবিশিষ্ট বৃক্ষাদি রোপণ, এ সকল কার্য্যে তাঁহারা তৎপর ছিলেন কিন্তু সক-লই স্বার্থসাধন উদ্দেশে," কিন্তু হিন্দু-রাজারা যে প্রজাদের কল্যাণ উদ্দেশে পথ ঘাট নির্ম্মাণ—পানুশালা স্থাপন—বাপী পুষ্করিণী খনন—ছায়া-বৃক্ষ-রোপণ প্রভৃতি কার্য্যে উৎসাহী ছিলেন তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পূর্ব্বে রায়ৎওয়ারী বন্দবস্তের বিষয় যাহা কিছু বলা গিয়াছে তাহাতে তাহার ভাল দিকটাই দেখান হইয়াছে কিন্তু তাহা শু-নিতে যেমন শ্রুতিমধুর, কার্য্যে তেমন ফলো-পধায়ী হইয়াছে কি না সন্দেহ।

রায়ৎওয়ারী বন্দবস্তের দোষ গুণ নিরূ-পণ করিবার পূর্ব্বে বিবেচনা করা উচিত যে গবর্ণমেণ্টের খাজানার প্রকৃত লক্ষণ কি? কি হিসাবে তাহা নির্দ্ধারিত হইলে রায়তের সুখ সমৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে। আমাদের বিবেচনায়—চাস ও আবাদের খরচ বাদ দিয়া যে মুনফা অবশিষ্ট থাকে গবর্ণমেণ্টের খাজানা তাহার অর্দ্ধাংশ কি আরো কিঞ্চিৎ অধিক হইলে ক্ষতি নাই। কৃষকের পরিশ্রমের বেতন ও হল বলদ প্রভৃতি কৃষিসাধন জিনিসের মূল্য অবশ্য আবাদের খরচের মধ্যে ধরিতে হইবে। তাহা বাদ দিয়া অবশিষ্ট মুনফার অংশ সরকারী খাজানাতে নির্দ্ধারিত হওয়া উ-চিত—একথা রায়ৎওয়ারী বন্দবস্তের প্রধান প্রতিপোষকগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। এইক্ষণে প্রশ্ন এই যে, ফলে সরকারী খা-জানা এই রূপ দাঁড়াইয়াছে কি না? তা-হার উত্তর 'না' বলিতে হইবে। ইহা নি-শ্চয় যে কৃষিকার্য্যের খরচ ও সরকারী দেনা বাদ দিয়া রায়তের অবশিষ্ট মুনফা কিছুই থাকে না। অনেক স্থলে সরকারী খাজানা দিবার জন্যও রায়ৎকে মহাজনের শরণাপন্ন হইতে হয়। সে তাহার নিজের ও পরিবারের সম্বৎসরের মত গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইবার জন্য যাহা কিছু কষ্টস্বষ্টে উপার্জ্জন করে তাহা 'মুনফা' বলা যাইতে পারে না—তাহা তাহার পরিশ্রমের বেতন। কোন এক শুভবর্ষে যদি তাহার অল্প মুনফা উদ্বৃত্ত হয় ত তাহা অন্য এক অনা-বৃষ্টি-জনিত অশুভ বৎসরে সকলি ব্যয় হইয়া যায়। কৃষক বৎসর বৎসর কায়ক্লেশে ভূমি কর্ষণ করিয়া প্রতি বৎসর আশা করিয়া থাকে—কবে সুদিন হইবে—মহা-

জনের দেনা পরিশোধ করিতে পারিবে—সে সুদিন আর দেখা দেয় না। স্বোপার্জ্জিত অর্থ সে যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া উঠে তাহা অনেক সময় তাহার সম্বৎসর উপ-জীবিকা চলিবার জন্য যথেষ্ট হয় না—অন্য স্থান হইতে ধার কর্জ্জ করিয়া তাহার সং-সার খরচ নির্ব্বাহ করিতে হয়। রায়ৎওয়ারী বন্দবস্তের পরিণাম যদি এই হইল ত কোন্ মুখে তাহার প্রশংসা করা যায়। জরীপ্-কর্ত্তারা মুখে যাহা বলুন, কার্য্যে তাহা প্র-কাশ পায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে এই দেখা যাইতেছে যে গবর্ণমেণ্টের খাজানা রায়তের মুনফার অংশ নহে—বেচারী রায়ৎ তাহার নিজ বেতন হইতে ও কখন কখন মহাজনের নিকট হইতে ধার করিয়া তাহা যোগাইতে বাধ্য হয়।

পূর্ব্বকালে এপ্রদেশে নিয়ম এই ছিল যে, যে পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হইবে রাজা তাহার ভাগগ্রাহী। রাজার ষষ্ঠাংশ বৃত্তি ইহা আমাদের শাস্ত্রসম্মত বাক্য। ভাল বৎসরে প্রজার মঙ্গল অবস্থা হইলে রাজ-ভা-ণ্ডার পূর্ণ হইত—মন্দ বৎসরে শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত জন্মিলে খাজানাও সেই পরিমাণে অল্প আদায় হইত। কোন বৎসর রায়ৎ তাহার জমি কারণবশত আবাদ করিতে না পারিলে তাহার জন্য খাজানা দিতে হইত না। কিন্তু এক্ষণে আর সে কাল নাই। ভাল বৎসরই হউক, মন্দ বৎসরই হউক—সুবৃষ্টিই হউক অনাবৃষ্টিই হউক,—ফসল হউক আর নাই হউক—জমি আবাদ হউক কি পতিত থাকুক—নিয়মিত খাজা-নাটি রাজভাণ্ডারে আনিয়া দিতেই হইবে। নতুবা জমি নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়। আগে কখন কখন কার্য্য-বিশেষের জন্য রায়ৎকে ধার দিবার প্রথা ছিল—কোন কারণে তাহার খাজানা হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া যাইত, কিন্তু এক্ষণে সে নিয়ম বন্ধ হইয়াছে।

খাজানা আদায়-নিয়মের কঠোরতা, এই দুর্ভিক্ষের বৎসরে বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট উল্লসিত হইয়াছেন, সেক্রেটরি অফ্ ষ্টেট্ মহা সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন যে, দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত রায়তের নিকট হইতে এবার প্রায় তাহার দেয় সমুদয় খাজানা আদায় করা যাইবে। করগ্রাহীর পক্ষে ইহা অতি-শয় সন্তোষজনক সন্দেহ নাই কিন্তু করদা-তার পক্ষে কতদূর তাহা সন্দেহ। সচরাচর সরকারী খাজানা দিতে যাহাদের গলদ্ঘর্ম্ম হয়, দুর্ভিক্ষের বৎসর অস্থি চর্ম্ম সার, সেই সকল রায়তের নিকট হইতে দুই বৎসরের খাজানা এক কালে আদায় করা সামান্য নিষ্ঠুরতার কার্য্য নহে। এই দ্বিগুণ কর দিবার সামর্থ্য-সাধনোপযোগী এবৎসর যে দ্বিগুণ ফসল হইয়াছে, কৈ তাহা ত শুনা যায় না। এই ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার কিরূপে সংসাধিত হইল বলা যায় না। এই প্রে-সিডেন্সিতে সমুদয় সরকারী খাজানার সমষ্টি ২৷৷০ কোটি টাকারও অধিক—তাহার মধ্যে ২ কোটি ৩৩ হাজারেরও অধিক আ-গষ্ট মাসের শেষে আদায় করা হইয়াছে। প্রায় ২ কোটি ১৫ হাজার টাকা মাত্র ছুট

দেওয়া গিয়াছে, তাহাও সম্পূর্ণ আদায় হইবার প্রত্যাশা। ১৮৭৭—৭৮ সালেরও সমুদয় খাজানা সমাহৃত হইবে এই রূপ শুনা যাইতেছে।

পুণা সার্ব্বজনিক সভা রায়ৎদের অবস্থা বিষয়ে বিস্তর অনুসন্ধানের পর এই রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রায়ৎওয়ারী বন্দবস্তের প্রথম সূত্রপাত হইবার সময় জমীর উপর যে গবর্ণমেণ্টের খাজানা নিরূপিত হয় তাহা অপেক্ষাকৃত লঘু, জমি ও কৃষিকার্য্যের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উদার ও পরিমিত ভাবে তাহার দর নির্ণীত হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম ত্রিশ বৎসর অতীত হইলে নূতন বন্দবস্ত জারী করিবার সময় এত অধিক পরিমাণে খাজানা বৃদ্ধি করা হইয়াছে যে তাহাতে মহারাষ্ট্র দেশের অধিকাংশ রায়তের ওষ্ঠাগত প্রাণ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, নূতন বন্দবস্তের নিয়ম এই যে, রায়তের বিনা যত্ন ও পরিশ্রমে জমী ও ফসলের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাজানা বৃদ্ধি করা বিধেয়। কিন্তু সুবিবেচনা ও দূরদর্শিতার সহিত সে নিয়ম রক্ষা না করিলে অনেক অনিষ্টের সম্ভাবনা। মনে কর ইংরাজি ১৮৩৫ শালের প্রারম্ভে প্রথম বন্দবস্তের সূত্রপাত হইল। ৩০ বৎসর অতীত হইলে ১৮৬৫ শালে দেখা গেল যে, সকল জিনিস আক্রা—জমির মূল্য চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে—রায়তের অবস্থা সচ্ছল হইয়াছে—তাহা দেখিয়া ঐ ত্রিশ বৎসরের শেষে পাঁচ বৎসরকার জিনিসের দরের সরাসরিতে যদি সরকারী খাজানা বর্দ্ধিত হয় তবে রায়ৎদের কি দুর্দ্দশা। ঐ বর্দ্ধিত মূল্য আগামী ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত অটল থাকিবে তাহার স্থিরতা কি? ১৮৬৪—৬৫ শালে রায়তের শ্রীবৃদ্ধি হইবার কারণ কি? না, আমেরিকার যুদ্ধ-জনিত এদেশে তুলার ব্যবসায়ের উত্তেজনা। ইহা বিবেচনা করা উচিত যে এ উত্তেজন ক্ষণস্থায়ী—যুদ্ধসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ইহা তিরোহিত হইবে। অতএব এই সম্ভবতঃ ক্ষণস্থায়ী মূল্য বৃদ্ধি অনুসারে আগামী ত্রিংশৎ বৎসরব্যাপী খাজানার দর নির্দ্ধারণ করা অন্যায়। এই রূপে অতীত ত্রিশ বৎসরের কোন এক ভাগের উপর লক্ষ্য করিয়া খাজানার দর বন্ধন করিলে তাহাতে যে ভ্রমোৎপত্তির সম্ভাবনা তাহা সহজে অনুধাবন করা যাইতে পারে। সেই কালের মধ্যে ৫ বিঘার ১০ বৎসরের সরাসরি দর যে আগামী ত্রিশ বৎসর কাল স্থায়ী থাকিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। বাস্তবিক পরীক্ষাতেও এই দেখা যাইতেছে যে, জিনিসের দরের কোন স্থিরতা নাই—নানা কারণে মধ্যে মধ্যে তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। যদি অতীত ত্রিশ বৎসরের সমুদায় কালের জিনিসের দরের সরাসরি লইয়া তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রিশ বৎসরের সরাসরি জিনিসের মূল্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখা যায় ও সেই অনুসারে খাজানার দর নিরূপিত হয় তাহা হইলেও কতকটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যে মহাত্মাদের হস্তে এই বন্দবস্তের ভার সমর্পিত তাঁহারা তত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিতে তৎপর নহেন। সুতরাং নূতন বন্দবস্তে মনঃকল্পিত নিয়ম অনুসারে খাজানা বৃদ্ধি করিয়া তাঁহারা যে প্রজাপীড়ন দোষে দোষী হইয়াছেন ইহা সহজে বিশ্বাস করা যায়। আর এক কথা এই যে, জিনিসের দর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের মূল্যও অধিক হয়, সুতরাং কৃষিকার্য্য চালাইবার খরচ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। এটিও মনে রাখা কর্ত্তব্য। নূতন বন্দবস্তের সময় জরীপ অধিকারীদিগের এই দুই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রথম—জমি ও ফসলের মূল্য বৃদ্ধি যাহা দৃষ্ট হইতেছে তাহা ভবিষ্যৎ ত্রিশ বৎসর কাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা কি না? দ্বিতীয়তঃ মূল্যবৃদ্ধির সমতুল্য খাজানার দরবৃদ্ধি বিধেয় নহে, কেননা জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি হইলে শ্রমের বেতন বৃদ্ধি, সুতরাং কৃষি কার্য্যের ব্যয় অধিক হইবে। এই সম্বন্ধে আর একটী বিষয় বক্তব্য এই যে, যে সকল তালুকে বর্দ্ধিত জমা স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে জমীর জরীপ প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য পুনর্ব্বার নবানুষ্ঠিত হইয়া সেই দর ধার্য্য হয়। এই রূপ করাতে জমীর মূল্যের বিস্তর তারতম্য ঘটিয়া অনেক ভূস্বামী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ৩০ বৎসরে বন্দবস্তের বচন পাইয়া রায়ৎ মনে করিতে পারে—আমি এই জমীর মালিক—নিয়মিত খাজানা দিতে পারিলে আর আমার কোন ভাবনা নাই। ত্রিশ বৎসর অন্তর, না হয় সেই দরের কিছু হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে। এই রূপ ত্রিশ বৎসর কাল নিজ সম্পত্তি ভোগ করিয়া পরে যখন সে দেখে আমার ২০ বিঘা ভূমি এক্ষণে ২৫ বিঘা হইয়া দাঁড়াইয়াছে ও পূর্ব্বাপর প্রচলিত খাজানা ত্রিগুণ কি চতুর্গুণ ধার্য্য হইয়াছে, তাহা না দিতে পারিলে আমার সমুদায় ভূমিসম্পত্তি ছাড়িয়া দিতে হইবে তখন তাহার কি যন্ত্রণা! রায়তের সর্ব্বনাশ ও গবর্ণমেণ্টের বচনের প্রতি তাহার হতশ্রদ্ধা—ইহা রাজা প্রজার উভয়েরই অনিষ্টকর সন্দেহ নাই।

যাহা বলা হইল তাহাতে পাঠকগণ রায়ৎওয়ারী বন্দবস্তের দোষ গুণ কতকটা বুঝিয়া লইতে পারিবেন। এইক্ষণে এই বন্দবস্তের অধীনস্থ রায়তের অবস্থা যৎকিঞ্চিৎ বর্ণন করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রী স—

পূর্ব্বতন গ্রীকদিগের সামাজিক অবস্থা।

প্রাচীন গ্রীকদিগের সহিত আমাদিগের অনেক বিষয়ে আশ্চর্য্যরূপ মিল দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগের দেবদেবীর সহিত আমাদিগের দেব দেবীর, তাহাদিগের জ্যোতির্ব্বিদ্যার সহিত আমাদিগের জ্যোতির্ব্বিদ্যার, তাহাদিগের গণিতের সহিত আমাদের গণিতের, তাহাদিগের দর্শনশাস্ত্রের সহিত আমাদের দর্শন শাস্ত্রের কি

আশ্চর্য্য সাদৃশ্য তাহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু তাহাদিগের আচার ব্যবহার পরিচ্ছদ, আহার বিহারেও যে ভারতবর্ষবাসীদিগের সহিত কোন কোন বিষয়ে মিল আছে তাহা বোধ হয় অনেকে অবগত নহেন।

গ্রীকদিগের মধ্যে দুইটি প্রধান জাতি—এথিনীয় ও স্পার্টান। তন্মধ্যে এথিনীয়েরা সমস্ত গ্রীকজাতির আদর্শ-স্বরূপ—এথিনীয়দিগের আচার ব্যবহার বিবৃত করিলেই প্রায় সমস্ত গ্রীকজাতির আচার ব্যবহার বর্ণনা করা হয়। স্পার্টানদিগের সহিত কাহারও মিল নাই। তাহাদিগকে একটি স্বতন্ত্র জাতি বলিলেও হয়। অতএব এই প্রস্তাবে স্পার্টানদিগের উল্লেখ করা যাইবে না। খৃস্ট জন্মিবার চার শতাব্দি পূর্ব্বে প্রাচীন এথিনীয়দিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতি আহার বিহার পরিচ্ছদ—এক কথায় তাহাদিগের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহাই এই প্রবন্ধে বিবৃত করা আমাদিগের উদ্দেশ্য।

আবাস।—নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ আবাসভূমির উপযোগিতানুসারে কেহবা প্রস্তর, কেহবা ইষ্টক কেহবা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বাটীতে বাস করিত। তাহাতে শয়ন ভোজনের ও অন্যান্য গার্হস্থ্য কার্য্য সম্পাদনের জন্য স্বতন্ত্র ঘর থাকিত। অনেক সময় একই ঘর নানা কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বড় মানুষদিগের বাটী দুই মহলে বিভক্ত হইত। পুরুষদিগের জন্য এক মহল—স্ত্রীলোকদিগের জন্য আর এক মহল। প্রত্যেক মহল চতুষ্কোণ-আকারে নির্ম্মিত। তাহার অভ্যন্তরে এক একটি—প্রস্তরে বাঁধানো প্রাঙ্গণ। ঐ প্রাঙ্গণের মধ্যদেশে এক একটি ফোয়ারা থাকিত। উঠানের চারি ধারে থাম-ওয়ালা বারাণ্ডা—এই বারাণ্ডার ভিতর দিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে হয়। পুরুষদিগের মহলে আমোদ প্রমোদের জন্য—বন্ধুবান্ধবকে বসাইবার ও খাওয়াইবার জন্য—বৈঠকখানা ও খাবার ঘর থাকিত। অন্দর মহলের ঘরে প্রায় পরিবারের লোকেরা বাস করিত। রান্না ঘর, ভাঁড়ার ঘর—শোবার ঘর অন্দর মহলেই নির্ম্মিত হইত।—এতদ্ভিন্ন সূতাকাটা—কাপড়-বুনা—এবং অন্যান্য গার্হস্থ্য ব্যাপার সম্পাদনের জন্য অন্যান্য ঘর উহাদের সহিত সংলগ্ন থাকিত। সকল ঘরই দ্বার-বিশিষ্ট—কেবল পুরুষদিগের বৈঠকখানা-ঘর পর্দ্দা দ্বারা রুদ্ধ থাকিত। ঘরের জানালা-সকল অংশতঃ ছাদের দিকে ও অংশতঃ প্রাঙ্গণের দিকে উন্মুক্ত।—অন্দর মহলের পশ্চাদ্‌ভাগে একটি উদ্যান থাকিত। রাজপথের সম্মুখস্থ দ্বারটীর পার্শ্বে ইষ্টদেবের বিগ্রহ ও বেদিকা স্থাপিত হইত। রাস্তাগুলি, না পাথর দিয়া বাঁধানো—না তাহাতে আলো দেওয়া হইত। সুতরাং বর্ষাকালে রাস্তা অত্যন্ত অপরিষ্কার ও রাত্রে অত্যন্ত অন্ধকার হইত। আবর্জ্জনারাশি বাহির করিয়া লইবার জন্য উত্তম পয়ঃপ্রণালীও ছিল না। গার্হস্থ্য ব্যবহারের জন্য নিকটস্থ সরকারি কূপ হইতে জল আনিতে হইত। গৃহসজ্জার মধ্যে টেবিল

—কৌচ—ভোজন-পাত্র প্রভৃতি ছিল। অবকাশ সময়ে ও আহার-কালে গ্রীকেরা চৌকির পরিবর্ত্তে কৌচ ব্যবহার করিত। কাচের জিনিস কিছুই ছিল না। ভোজন-পাত্র সকল মৃত্তিকা কাষ্ঠ কিম্বা ধাতুতে নির্ম্মিত হইত। দর্পণ পিত্তলের হইত। আমাদের দেশেও পূর্ব্বকালে এই পিত্তলের দর্পণই সাধারণে প্রচলিত ছিল।

বসন।—পরিধেয় বসন প্রধানতঃ দুই খণ্ড—একটি ভিতরের—আর একটি বাহিরের। ভিতরের পরিচ্ছদের নাম চিতোন—ইহা, সূতা কিম্বা পশমের কাপড়ে প্রস্তুত হইত—কাহারও কাহারও এই পরিচ্ছদ হাতা-বিশিষ্ট—কাহারও বা বাহু প্রবেশ করাইবার জন্য কেবল ছিদ্র থাকিত। এই পরিচ্ছদটি অতি শিথিলভাবে পরিহিত হইত। বাহিরের পরিচ্ছদের নাম হাইমেষন্—ইহা আমাদের চাদরের মত। এক্ষণকার ইংরাজি প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তিতে এই রূপ আচ্ছাদন সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ভাঁজ হাঁটু পর্য্যন্ত কিম্বা আরও নিম্নে ঝুলিয়া পড়ে এবং স্কন্ধে এই রূপ ভাবে জড়ান হয় যে বাম বাহু আচ্ছাদিত হইয়া দক্ষিণ বাহুটি মুক্ত থাকিতে পারে। এই চাদর লোকের রুচি, পদমর্য্যাদা বা ব্যবসায়-অনুসারে নানা প্রকারে পরিহিত হইত। মস্তকাবরণ দুই প্রকার ছিল। একটি মুসলমানদিগের অর্দ্ধ ডিম্বাকৃতি তাজ টুপির ন্যায়—আর একটি সচরাচর ইংরাজি টুপির ন্যায়!—কিন্তু এই মস্তকাবরণ সাধারণের মধ্যে ব্যবহার ছিল না। সাধারণ-আমোদালয়ে যাইবার সময় কিম্বা বেড়াইবার সময় লোকের মস্তক প্রায়ই অনাবৃত থাকিত। এই প্রথাটি অনেকটা অধুনাতন সাধারণ বাঙ্গালীদিগের ন্যায়। মাথার চুল খুব বড় করিয়া রাখা হইত এবং উচ্চশ্রেণীর লোকেরা অতীব যত্ন সহকারে কেশবিন্যাস করিতেন। কোন যুবক ১৮ বৎসরে পদার্পণ করিলেই তাহার দীর্ঘ কেশ ছাঁটিয়া দিয়া ধর্ম্মঘটিত অনুষ্ঠান সহকারে দেবতাদিগের নিকট উৎসর্গ করা হইত। এই ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম জীবনের একটি মহাকাল বলিয়া গণ্য হইত। ১৮ বৎসর হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত মাথার চুল ছোট রাখা হইত।

গ্রীকেরা বরাবর শ্মশ্রু ধারণ করিত—এবং ইহাকে পুরুষের একটি প্রধান অলঙ্কার বলিয়া মনে করিত। দাড়ি কামানো প্রথা যে একেবারেই ছিল না তাহা নহে কিন্তু সাধারণে তেমন প্রচলিত ছিল না। স্ত্রীলোকেরা এক্ষণকার ন্যায় নানা প্রকারে কেশবিন্যাস করিত।—তাহারা মস্তকে জাল থোলে, টুপি পাগড়ি প্রভৃতি নানা প্রকার মস্তকাবরণ ব্যবহার করিত। লোকে বাটীর বাহির হইলেই পাদুকা, খড়ম প্রভৃতি পরিধান করিত।

আহার।—সচরাচর গ্রীকেরা বড় সুখাহারী ছিল না। সর্ব্বসাধারণে যে সকল খাদ্য ব্যবহৃত হইত তাহা অতি সামান্য এবং সংখ্যাতেও অধিক নহে। দিনের মধ্যে দুই বার ভোজন করা সামান্যতঃ তাহাদের নিয়ম ছিল। এক বার মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে,

আর এক বার অপরাহ্ণে কিম্বা সন্ধ্যার সময়। এই অপরাহ্ণ কিম্বা সন্ধ্যার ভোজনটিই তাহাদিগের গুরুতর ভোজন। তাহাদের গ্রন্থে ইহাও উল্লেখ আছে যে প্রাতঃকালে তাহারা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া খাঁটি মদে রুটি ভিজাইয়া খাইত। প্রত্যুষে তাহারা আদালৎ প্রভৃতি সাধারণ সম্মিলন-স্থানে যাইত—এবং সেখান হইতে বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া আহারে বসিত। তাহার পর বিশ্রাম করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত—কাজ কর্ম্ম সাঙ্গ হইলে অপরাহ্ণে আর এক বার ভোজন করিত, তাহার পর সন্ধ্যার সময় বন্ধু বান্ধব লইয়া আমোদ প্রমোদ করিত। নিত্য খাদ্যের মধ্যে গম কিম্বা জবের রুটিই প্রধান ছিল। এই রুটি কখন কখন ঘরে প্রস্তুত হইত কিন্তু অ্যাথেন্স্ নগরে প্রায়ই লোকে দোকান হইতে কিনিয়া আনিত। জবের রুটিই সমস্ত গ্রীসের দরিদ্র-শ্রেণীর মধ্যে সচরাচর ব্যবহৃত হইত—উহার মধ্যে যাহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল তাহাদের মধ্যে গমের রুটি প্রচলিত ছিল। দর্শন শাস্ত্র ও উদ্দীপক বাগ্মিতার ন্যায় অ্যাথেন্সের রুটিও বিখ্যাত ছিল। রুটির সঙ্গে তাহারা পনির—শাক্‌সব্‌জি—প্যাঁজ রসোন কপি প্রভৃতি খাইত।—প্যাঁজ তাহাদের বড় প্রিয় খাদ্য ছিল। কিন্তু অ্যাথেন্‌সে এবং গ্রীসের অন্যান্য উপকূলস্থ প্রদেশে মৎস্য আহার আমাদের ন্যায় অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। যুদ্ধযাত্রী সৈন্য ও নাবিকগণের মৎস্য ও রুটিই প্রধান আহার ছিল। রুটি, পনির, পেঁয়াজ এবং শুষ্ক মৎস্য তাহারা সঙ্গে লইয়া যাইত। অন্য প্রকার খাদ্য যদি ক্রয় করিতে না পাইত, তাহা হইলে তাহারা উহাতেই সন্তুষ্ট থাকিত। মৎস্য অপেক্ষা মাংস কম পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। কোন বৃহৎ ভোজে, নানা প্রকার মৎস্যের সঙ্গে মাংসও থাকিত—মাচ মাংস খাওয়া হইলে পর, ফলমূল ও মিস্টান্ন আসিত। মদ্যপানও হইত কিন্তু ভোজের সময় নহে। ছুরি কাঁটার ব্যবহার ছিল না। কিন্তু চামচের ব্যবহার ছিল। কাঁটার পরিবর্ত্তে টুক্‌রা টুক্‌রা রুটির সাহায্যে গ্রাস সকল মুখে নীত হইত। মাংস পূর্ব্ব-হইতে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া আহার-স্থানে আনীত হইত।

আমোদ প্রমোদ।—জনসমাজপ্রিয় গ্রীকজাতির মধ্যে ভোজের নিমন্ত্রণ, জীবনের একটি প্রধান বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইত। আমাদের দেশের ন্যায় সকল অনুষ্ঠানেই ভোজ দিবার প্রথা ছিল। আমাদের দেশের ন্যায় তাহাদের বহুল দেবদেবী ছিল, সুতরাং পর্ব্বাহও অনেক ছিল। বর্দ্ধিষ্ণু লোকেরা প্রত্যেক পর্ব্বাহে—স্বকীয় অভীষ্ট দেবদেবীর নিকট ছাগাদি পশু বলিদান না দিয়া ক্ষান্ত থাকিত না—সুতরাং বৎসরের মধ্যে অনেক গুলি ভোজ হইত। শুদ্ধ পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের জন্ম-দিন উপলক্ষে নহে, অন্যান্য জীবিত কিম্বা মৃত মান্য ব্যক্তিগণের জন্ম-দিন উপলক্ষেও খাওয়ান হইত। এতদ্ভিন্ন যুবকদিগের মধ্যে পরস্পর চাঁদা করিয়া

খাওয়া চলিত। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ মস্তকে ফুলের মালা জড়াইয়া—দিব্য বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিত। ভোজনের সময় সকলে বালিস-যুক্ত কৌচের উপর হ্যালান্ দিয়া শুইত—ছোট ছোট টেবিল, কৌচের সম্মুখে স্থাপিত হইত। (পূর্ব্বকালে আমাদের দেশেও ছোট ছোট টেবিলে খাওয়া রীতি ছিল—এই টেবিল ত্রিপাদ-বিশিষ্ট। খৃষ্ট জন্মিবার চারি শতাব্দি পূর্ব্বে যখন মেগাস্থিনিস্ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তখন তিনি এই ত্রিপাদ টেবিলের ব্যবহার দেখিয়াছিলেন।) কোন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আসিবামাত্র ভৃত্যগণ তাহার পাদুকা খুলিয়া লইয়া, পা ধুয়াইয়া দিত। (এই প্রথাটিও আমাদের প্রথার ন্যায়—অতিথি আগন্তুক কাহারও বাটীতে আইলে তাহাকে পাদ্য দেওয়া হয়।) খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে পর কথাবার্ত্তা গান বাদ্য নৃত্য প্রভৃতি নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ হইত। অস্মদ্দেশের ন্যায় নিমন্ত্রিতব্যক্তিগণের সম্মুখে ব্যবসায়ী গায়ক দ্বারা গান বাদ্য নির্ব্বাহ হইত।—পারস্যদেশের প্রথানুরূপ মদ্যের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য ঐ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এক জন, পরিবেস্টা অথবা 'সাকীর' পদে নিযুক্ত হইতেন। তবে, পারস্য দেশের ন্যায় তিনি বোতল হইতে সকলকে মদ ঢালিয়া দিতেন না। তিনি প্রথমে একটি বৃহৎ পাত্রে মদ্য ঢালিয়া তাহাতে জল মিশ্রিত করিতেন মাত্র। তৎপরে ভৃত্যগণ একটা হাতার দ্বারা ঐ মদ্য প্রত্যেকের পান-পাত্রে পরিবেশন করিত। নিমন্ত্রিতগণ সকল সময় আপন ইচ্ছামত মদ্য পান করিতে পারিতেন না।—মদ্যপায়ীদিগের মধ্যে এই নিয়মটি অতি শুভকর সন্দেহ নাই। এই সকল ভোজের সময় স্ত্রীলোকেরা উপস্থিত থাকিতে পাইত না।

ক্রীড়াবিনোদ। বিনোদজনক ক্রীড়ার মধ্যে—সরকারি ব্যায়ামশালায় সাধারণের ব্যায়াম-চর্চ্চা, বালকদিগের সামান্য ক্রীড়া এবং ঘরে বসিয়া যে সকল খেলা হয় তাহাই ধরা যাইতেছে। "জিম্‌ন্যাষিয়ম্" অর্থাৎ ব্যায়াম-ভূমি সরকারি ব্যয়ে স্থাপিত হইত। একটি বিস্তৃত স্থান প্রাচীর দ্বারা ঘেরা হইত। ইহার মধ্যে কোথাও কোথাও তরু-পরিশোভিত ভূমি থাকিত—এবং চতুর্দ্দিক স্তম্ভশ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত হইত। আবার তন্মধ্যে একসারি চতুষ্কোণ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইত, তাহাতে স্নানাগার এবং বালকদিগের জন্য সরকারি পাঠশালা থাকিত। ইহাতে বোধ হয় ঐ স্থানে বালকগণ সাহিত্য ও ব্যায়াম উভয়ই একত্রে শিক্ষা করিতে পারিত। যদিও সম্ভবতঃ ভিন্ন বয়স্ক লোকের জন্য এবং ভিন্ন প্রকার ব্যায়াম-চর্চ্চার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভূমি নির্দ্দিষ্ট ছিল কিন্তু তথাপি বোধ হয় সে সকল এক স্থানেরই অন্তর্ভূত। বিদ্যালয়ে যুবকেরা, এক জন শিক্ষকের অধীনে শিক্ষা লাভ করিত।—অষ্টাদশ হইতে বিংশতি বর্ষ বয়স্ক বালকদিগের ব্যায়ামচর্চ্চা স্বতন্ত্র স্থানে হইত।—তদ্‌ভিন্ন সাধারণ লোকে, আমোদের জন্য কিম্বা ভবিষ্যতে আবশ্যক হইলে সৈন্যশ্রেণীর উপযুক্ত হইবার জন্য—নিজ নিজ বিবেচনা মত ব্যায়াম-চর্চ্চা করিত।

দৌড়ান—লাফান—ধনুর্ব্বাণ—বর্ষা ছোঁড়া—গোলা-খেলা—ঘুসা-ঘুসি—কুস্তি ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যায়াম ছিল—এবং উলঙ্গ হইয়া এই সকল ব্যায়াম-চর্চ্চা হইত বলিয়া—উহাদিগকে "জিমন্যাষ্টিক্" বলিত। এই সকল সরকারি ব্যায়াম-ভূমির সংলগ্ন স্তম্ভশ্রেণী-বিশিষ্ট বারাণ্ডায় প্রসিদ্ধ দার্শনিক, তার্কিক, আলঙ্কারিক ও বাগ্মী পণ্ডিতগণ আসিয়া একত্র হইতেন; এবং তাঁহাদের বাক্-বিতণ্ডা এবং কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য—অনেক লোক জমা হইত। অধিকাংশ লোক দুই এক ঘণ্টা কাল আমোদ উপভোগ করিবার জন্য এই সকল ব্যায়াম-ভূমিতে অপরাহ্ণে আসিত। অ্যাথেন্সের বিভিন্ন উপনগরে এই প্রকার তিনটি প্রসিদ্ধ আড্ডা ছিল—যথা—অ্যাকাডেমি—লিসিয়ম এবং সিনোসার্গিস্।

অন্তর্গৃহ-ক্রীড়ামোদও নানা প্রকার ছিল। সায়াহ্ণ-ভোজনের পর যে সকল আমোদ-প্রমোদ হইত তন্মধ্যে হেঁয়ালি ভাঙ্গাও তাহাদের একটি প্রিয় আমোদ ছিল। প্রত্যেককে পালা অনুসারে হেঁয়ালি ভাঙ্গিতে হইত। যে ঠিক্ অর্থ করিতে না পারিত—তাহাকে দণ্ডস্বরূপ—জল না মিশাইয়া খাঁটি মদ্য খাইতে হইত। যে ঠিক্ বলিতে পারিত তাহার ভাগ্যে পুষ্পমালা মিষ্টান্ন—কিম্বা চুম্বন লাভ হইত।—(আমাদের দেশের এক্ষণে যেরূপ দুরবস্থা হইয়াছে তাহাতে যদি এইরূপ দণ্ড পুরস্কারের বিধি প্রবর্ত্তিত হয়—হয়তো অনেকে ইচ্ছাপূর্ব্বক পুরস্কারের পরিবর্ত্তে দণ্ডকে আলিঙ্গন করিতে উৎসুক হইবেন!) কোটা-বস্ নামক এক প্রকার খেলা ছিল।—তাহা এই—একটা বৃহৎ পাত্র, হয় তৌলযন্ত্রের ন্যায় লম্বমান থাকে, নয় জলের উপর ভাসাইয়া রাখা হয়—আর একটা ছোট পাত্র হইতে মদ্য ছিট্‌কাইয়া এত পরিমাণ সেই বৃহৎ পাত্রটিতে ফেলিতে হইবে যাহাতে উহা হয় নিম্নে নাবিয়া পড়িবে নয় জলে মগ্ন হইবে। আবার এক রকম খেলা ছিল—তাহা কতকটা আমাদের শতরঞ্জের মত।—পাশা-খেলাও খুব প্রচলিত ছিল। ছেলেরা আমাদের দেশের মত ঘুঁটি খেলিত। মুরগি ও কোকিলের লড়াই সমস্ত গ্রীসে অত্যন্ত প্রচলিত ছিল।

ছুটির দিন।—এমনি তো গ্রীকদিগের দৈনন্দিন নানা প্রকার আমোদ ছিল, তাতে আবার ছুটির মোর্‌যোম্ পড়িলে তাহাদের আনন্দের আর ইয়ত্তা থাকিত না। ইংরাজদিগের ন্যায় সপ্তাহে সপ্তাহে তাহাদের কোন নিয়মিত ছুটি ছিল না। ছুটির এক একটা মোর্‌যোম্ আসিত, তাহাতে একেবারে দুই তিন দিন ধরিয়া ছুটি হইত। আমাদের দুর্গাপূজা প্রভৃতিতে লোকের যেরূপ মনের ভাব হয় অনেকটা সেই রূপ হইত। পরস্পরের মধ্যে রাজনৈতিক বিদ্বেষই থাকুক, জাতি-বৈরই থাকুক—ধর্ম্ম-ঘটিত বিবাদই থাকুক, এই সকল সাধারণ উৎসব-দিনে তাহারা সমস্তই বিস্মৃত হইত। গ্রীসের প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা গ্রোট্ সাহেব বলেন——"প্রত্যেক নগরের, প্রত্যেক গ্রামের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধর্ম্মোৎসব ছিল—ঐ সকল

উৎসবে দেবদেবীর নিকট বলিদান হইয়া গেলে—খাওয়া দাওয়া—নাচ গান বাজনা—কুস্তি ব্যায়াম প্রভৃতি নানা প্রকার আমোদ আহ্লাদ আরম্ভ হইত। যদিও উৎসবগুলি স্থানীয়—তথাপি ভিন্নপ্রদেশবাসী লোকদিগকে নিমন্ত্রিত করিয়া আনা হইত। কোন গ্রীক উপনিবেশ এবং উহার রাজধানী সম্বন্ধে এই রূপ প্রচলিত প্রথা ছিল যে, কোন উপনিবেশে উৎসব উপস্থিত হইলে রাজধানী-নিবাসী লোকদিগকে মর্য্যাদার স্থানে বসান হইত এবং তাহাদিগের মধ্যে এক জনকে বলি-মাংসের প্রথম আস্বাদ গ্রহণ করান হইত। অতএব যে সকল রাজ্য রাজনৈতিক সম্বন্ধে একত্র সম্মিলিত ছিল না—এই রূপ উৎসব উপলক্ষে যাতায়াত থাকায় তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যেও বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃভাবের নিদর্শন পাওয়া যায়"।

সমস্ত গ্রীসের মধ্যে যে সকল সাধারণ উৎসব ছিল—যে সকল উৎসব থাকাতে রাজনৈতিক মহা অনৈক্যের মধ্যেও সমস্ত গ্রীসে একটি ঐক্যস্থল ছিল—সেই সকল উৎসবের মধ্যে ওলিম্পিক নামক উৎসবটি সর্ব্ব-প্রধান। চারি বৎসর অন্তর পিলপনিসসে আল্‌ফ্যুস্ নদী-তীরে ওলিম্পিক জ্যুস্‌দেবের দৈববাণী-প্রকাশ-স্থান পুরাতন মন্দিরের সন্নিকট এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হইত। অল্প হইতে আরম্ভ করিয়া এই উৎসবটির কার্য্য-পরিসর ক্রমশ বর্দ্ধিত হয় এবং অবশেষে উহা একটি গুরুতর ব্যাপার হইয়া উঠে। প্রথমে সেখানে শুধু দৌড়াদৌড়ির প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইত—ক্রমে উহাতে কুস্তি, ঘুসাঘুসি, ঘোড়-দৌড়, রথ-চালন প্রভৃতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবর্ত্তিত হয়। ওলিম্পিকের ন্যায় আরও কতকগুলি সাধারণ উৎসব ছিল। যথা, ডেলফির সন্নিকটে পিথিয়ান নামক উৎসব—করিন্থের নিকটে ইস্থমিয়ান এবং নিমিয়ান নামক উৎসব। এই শেষোক্ত দুইটি উৎসব দ্বিবৎসরান্তর অনুষ্ঠিত হইত। পদমর্য্যাদা যার যতই হউক না কেন, অলিম্পিক মেলায় পুরস্কার লাভ সকলেরই পক্ষে ইহজীবনের একটি চূড়ান্ত লক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। এই জন্য ইহাই গ্রীকদিগের জীবনের একটি প্রধান আকাঙ্ক্ষা-স্থল হইয়া পড়িয়াছিল—এবং এই পুরস্কার লাভের উপযুক্ত হইবার জন্য কত লোকে নিজ নিজ ব্যায়াম ভূমিতে কত দিন ধরিয়া শ্রমসহকারে আপনাদিগকে শিক্ষিত করিত। এথেন্‌স এবং অন্যান্য নগরের সাধারণ ব্যায়াম-শালায় যে সকল ব্যক্তি ওলিম্পিকের পুরস্কার-প্রার্থী রূপে মনোনীত হইত—তাহাদিগকে স্বতন্ত্র ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হইত। এবং কত লোক আমোদ করিয়া অপরাহ্ণে তাহাদের শিক্ষা দর্শন করিতে আসিত। ওলিম্পিক মেলায় পুরস্কার লাভ করা এতদূর গৌরবের বিষয় ছিল, যে পুরস্কৃত ব্যক্তিগণ অল্পকাল মধ্যেই গ্রীক-জনসমাজে পদমর্য্যাদা ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিত—এমন কি কখন কখন রাজকীয় প্রধান প্রধান পদে আরূঢ় হইত। মল্ল-বিজয়ী যখন স্বগৃহে ফিরিয়া আসিতেন তখন মহা সমারোহ সহকারে তাঁহার

অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন হইত। প্রথমে তিনি বিজয়-রথে আরোহণ করিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিতেন—তৎপরে লোকজনে পরিবৃত হইয়া মহাসমারোহে নগরের প্রধান মন্দিরে যাত্রা করিতেন। সেখানে গিয়া দেবতার নিকট বলি উৎসর্গ হইত এবং সেই মল্ল-বীরের গুণ কীর্ত্তন হইত।

যাহারা নিতান্ত দরিদ্র তাহারাই কেবল ঐ সকল উৎসব-ক্ষেত্রে গমন করিতে পারিত না—কেন না গৃহ হইতে দূরপ্রদেশে যাত্রা ব্যয়-সাপেক্ষ। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সকল প্রদেশ হইতেই এক এক দল প্রতিনিধি মনোনীত হইয়া তথায় প্রেরিত হইত। প্রতিনিধিগণ আপন আপন প্রদেশের নামে তত্রস্থ দেবতার নিকট বলি উৎসর্গ করিত এবং উৎসবের উন্নতি সাধন কল্পে দান করিত। এই সকল প্রতিনিধি-দল তাঁহাদিগের সঙ্গে স্বর্ণ-রৌপ্যের বাসন লইয়া যাইতেন এবং আপনাদিগের তাম্বুতে অপর প্রদেশবাসী লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহা ভোজ দিতেন। এই সকল উৎসব উপলক্ষে গ্রীসের সর্ব্বাংশ হইতে অসংখ্য লোক আসিয়া জমিত এবং কোলাহল, মাতামাতি ও উৎসাহের আর সীমা থাকিত না। উৎসবের পূর্ব্বে ও পরে কত সপ্তাহ ধরিয়াই যে উৎসব প্রসঙ্গে কথা বার্ত্তা চলিত তাহা বলা যায় না। যদি নগরের অধিবাসী কোন ব্যক্তি ওলিম্পিকের পুরস্কারার্থী হইত—তাহা হইলে সেই নগরবাসীদিগের আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের আর ইয়ত্তা থাকিত না—কেন না, ঐ ব্যক্তি বিজয়ী হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় জন্মভূমিরও গৌরব বৃদ্ধি হইবে।

এথিনীয়দিগের আর একটি উৎসব আমোদের সময় ছিল—তাহা নাটকাভিনয়ের সময়। বৎসরের মধ্যে তিন চারি বার নাটকাভিনয় হইত। প্রত্যেক বারে দুই দিন ধরিয়া অভিনয় হইত এবং প্রত্যেক অভিনয়ে তিনটি করিয়া গম্ভীর ভাবের এবং একটি করিয়া স্যাটারিক নামক চপল ধরণের নাটক অভিনীত হইত। প্রথম প্রথম ঐ শেষোক্ত নাটকাভিনয় বাকস্ দেবের সম্মান উপলক্ষেই প্রবর্ত্তিত হয় এবং বাকস্ দেবের সঙ্গিগণের নাম স্যাটার হওয়ায় ঐ প্রকার নাটকের নাম স্যাটারিক হইয়াছিল। পূর্ব্বকালে—ঐ সকল নাট্যালয়ে সর্ব্বসাধারণের অবারিত-প্রবেশ ছিল কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন দর্শকমণ্ডলীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন টিকেট্ ক্রয় করিয়া প্রবেশের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল। যোত্রহীন নাগরিকগণ যাহাতে নিরাশ না হয় এই জন্য তাহাদের পক্ষে এই নিয়ম ছিল যে তাহারা টিকেটের জন্য আবেদন করিলেই সরকারি তহবিল হইতে মূল্য দিয়া তাহাদিগকে টিকেট্ ক্রয় করিয়া দেওয়া হইবে। এই প্রথাটির উল্লেখ করিয়া গ্রীক্-ইতিহাসবেত্তা গ্রোট্ বলেন "ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঐ সকল উৎসব পূর্ব্বতন ধর্ম্মেরই অঙ্গ স্বরূপ; এবং তৎকালীন সাধারণ-বিশ্বাস এই ছিল যে, কোন দেবতার উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠিত হইলে সেই উৎসব সময়ে যদি অসংখ্য লোক-সমাগম না হয় এবং সাধারণ-উপভোগ্য আমোদ-প্রমোদ না থাকে, তাহা হইলে সেই দেবতা প্রসন্ন হইবেন না। অতএব দরিদ্র পৌরজনদিগের জন্য যে এই রূপ ব্যয় হইত তাহা রাজকীয় ব্যাপারের অঙ্গ না বলিয়া বরং তাহাদের ধর্ম্মের অঙ্গ বলাই আরও যুক্তি-সঙ্গত।"

যাহাতে প্রতি বৎসর ভাল ভাল নাটক রচিত হয় এবং রচিত হইয়া সুচারুরূপে অভিনীত হয় তজ্জন্য গ্রীকেরা অত্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করিত। উৎকৃষ্ট নাটককারকে পুরস্কার দেওয়া হইত। এই পুরস্কার লাভের জন্য অনেক কবি প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। নগরের কোন ধনী ব্যক্তি অভিনেতা ও গায়কদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যয়-ভার বহন করিতেন। তখন গ্রীসে এই রূপ কোন সাধারণ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইলে আমাদের দেশের ন্যায় প্রায়ই তত্রস্থ ধনীদিগের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিই তাহার ব্যয়-ভার গ্রহণ করিতেন—সাধারণের সমবেত অর্থে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না। বাকস্ দেবের পূজা উপলক্ষে বসন্ত-উৎসবে যে সকল অগণ্য নাটক অভিনীত হইত তাহার সকল গুলি প্রায়ই নবপ্রসূত ও তৎকালোপযোগী। এবং এই সকল গ্রীক নাটকের নমুনা আমরা যাহা পাইয়াছি তাহাতে তাহাদের রচনা-নৈপুণ্য ও ভাবুকতা দেখিয়া কে না মোহিত হইবে? বিশেষতঃ যে সময় গ্রীসে কঠোর ব্যায়াম চর্চ্চার রুচি অত্যন্ত প্রবল ছিল, সেই একই সময়ে সুকুমার দৃশ্য-কাব্যের অনুরাগ যে সাধারণের মধ্যে এরূপ জাগরূক থাকিবে ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে!

সুঃ—

অভিমান।

"অভিমান রাখিবার স্থান, পাইনে কোন সন্ধান, বুঝিবা হারাই প্রাণ,"—এই মর্ম্মভেদী অক্ষরময় দীর্ঘশ্বাস যিনি ফেলিয়াছিলেন তাঁহার মনোভাব অনুভব করিতে হইলে বিজন প্রান্তরে বসিয়া ভাবিতে হয়। কোলাহলময় সংসার-ক্ষেত্রে এমন স্থান নাই, এমন অবসর নাই যেখানে এবং যে সময়ে হৃদয়ের এই সকল নিগূঢ় অথচ ভয়ানক যাতনার প্রতিমা অন্যের মনে প্রতিফলিত হইতে পারে। কোন বিকট হত্যাকাণ্ডে বা অবিচার-জনিত কোন পরিবারের সর্ব্বনাশে বা দুর্ভিক্ষ-জনিত নগরপল্লীর হাহাকারে, সংসারী ব্যক্তির মনে মমতার উদ্রেক হইতে পারে, কিন্তু যে সকল যাতনা হৃদয়ের নিভৃত প্রান্তে অবস্থিতি করিয়া তুষানলের মত হৃদয়ের প্রত্যেক শিরা উপশিরাকে ভস্মীভূত করিতে থাকে, যে সকল যাতনা ভূতকালকে হলাহলসিন্ধু ও

বর্ত্তমানকে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করিয়া ভবিষ্যৎকে প্রলয়-মেঘে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, যে সকল যাতনা মনের ও শরীরের গ্রন্থি সকলকে উচ্ছেদ করিয়া মানুষকে উদ্দেশ্য-বিহীন উন্মত্তের সমান করিয়া তুলে, যে সকল যাতনা যৌবনের উত্তপ্ত মানস-উচ্ছ্বাসকে উত্তর মহাসাগরের ন্যায় অনন্ত তুষারে জমাট্ করিয়া ফেলে, যে সকল যাতনার দীর্ঘশ্বাস কেবল গভীর নিশীথের বায়ুতরঙ্গে বিলীন হইয়া যায় এবং যাহার অদৃশ্য অশ্রুলহরী বিজন প্রদেশের ধরাতেই শুখাইয়া যায়, সে সকল যাতনার প্রতি মমতা অনুভব করিতে সংসারের অবকাশও নাই, প্রবৃত্তিও নাই। প্রত্যাখ্যাত শকুন্তলার দুঃখে অনেকেই অশ্রুবিসর্জ্জন করিবেন, কিন্তু অপরিচিতা রত্নাবলীর দুঃখ কেহই বুঝিবেন না, হত-প্রাণ ডেস্‌ডিমোনার দুঃখে অনেকেই কাতর হইবেন কিন্তু জীবন্মৃত অফিলীয়ার দুঃখ কেহই বুঝিবেন না, এমন কি, আত্মঘাতী কুন্দনন্দিনীর দুঃখে সকলেই হা হুতাশ করিবেন, কিন্তু নির্ব্বাসিত কুন্দনন্দিনীর দুঃখ কেহই বুঝিবেন না।

এই রূপ অনেক গুলি অলক্ষিত ও উপেক্ষিত যাতনার মধ্যে অভিমানের যাতনাও একটি ভয়ানক যাতনা। স্নেহ বা প্রণয়ের সম্পর্ক না থাকিলে কখনই অভিমানের উদয় হয় না, এবং স্নেহ বা প্রণয় থাকিলে শরৎকালীন মেঘের মতন মধ্যে মধ্যে অভিমানের উদয় হইবেই হইবে। যাহাকে যত পরিমাণে ভাল বাসা যায়, তাহার প্রকৃত বা কল্পিত অন্যায় ব্যবহারে তাহার প্রতি সেই পরিমাণে অভিমানও হইবে, এবং অভিমানের পরিমাণে ভালবাসাও পরিমিত হইবে। যে বায়রণ শত সহস্র লোকের তিরস্কার তৃণজ্ঞান করিয়া সদর্পে বিচরণ করিতেন, তিনিই আবার তাঁহার বাল্যপ্রণয়িনীর একটি কটু বাক্যে ভগ্নহৃদয় হইয়াছিলেন এবং যে নেপোলিয়ন শত্রুদিগের শত সহস্র কামানের অগ্নিকুণ্ড মধ্য দিয়া অক্ষত ভাবে আসিয়াছিলেন তিনিই আবার তাঁহার লুইসার একটি বিদ্রূপ-কটাক্ষে মরমের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে দগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। মানবহৃদয় কখনই এতদূর নীচাশয় হইতে পারে না যে, যার-তার উপরে অভিমান করিতে প্রবৃত্তি হইবে, এবং মানবহৃদয় কখনই এতদূর উদাসীনও হইতে পারে না যে, ভালবাসার পাত্রের অন্যায় আচরণে তাহার অভিমান-স্রোত অনিবার্য্য হইবে না। মহান-প্রকৃতি জুলিয়স্ সিজরকে বিনাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়া যখন তাঁহার কপট বন্ধুরা প্রতারণা করিয়া তাঁহাকে তাহাদের সন্নিবেশ-স্থলে লইয়া গেল, এবং সেই সন্নিবেশ-স্থানে যখন তাহারা লুক্কাইত ছুরিকা বাহির করিয়া তাঁহার প্রতি আঘাত করিতে লাগিল, তখন তিনি আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া আত্ম রক্ষণে যার পর নাই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে তাঁহার হৃদয়-সুহৃদ ব্রুটস্‌ও তাঁহাকে মারিবার জন্য খড়্গ উত্তোলন করিয়াছেন তখন তিনি কাতর স্বরে "ব্রুটস্! তুমিও এক জন, তবে আর সিজরের বাঁচিবার সাধ নাই" বলিয়া

শিশুর মত মুখাবৃত করিয়া আত্মরক্ষণে একেবারে বিমুখ হইলেন। ভুবন-বিজেতা জুলিয়স্ সিজর আজ আশৈশব ভালবাসার এই অস্বাভাবিক প্রতিদান দেখিয়া অভিমানে এতদূর অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে আত্মরক্ষণ সময়েও তিনি স্ত্রীলোকের মত অঞ্চলাবৃত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন!

অভিমান একটি অমিশ্র মনের ভাব নহে। তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে গেলে উপলব্ধি হইবে যে, দুঃখ ঔদাস্য এবং ঈষৎ রাগ—এই তিনটি স্বতন্ত্র ভাব একত্রিত হইয়া অভিমানে পরিণত হয়। যে রাগ অগ্নিময় এবং প্রতিবিধান করিতে তৎপর, আমরা সে রাগের কথা বলিতেছি না, কিন্তু মেঘদূতের "স্নিগ্ধ বিদ্যুতের"ন্যায় এক প্রকার কোমলতর রাগের কথা আমরা বলিতেছি। কিন্তু এই কোমলতর রাগ অবস্থা ও প্রকৃতি বিশেষে পরিশেষে প্রকৃত রাগে পরিণত হইতে পারে। অভিমানে দুঃখের ভাগটিই সমধিক—এবং তাহাই সম্ভাবিত। আমি যাঁহাকে আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব জ্ঞান করি, যাঁহার উপর আমার সকল সুখ, সকল শান্তির আশা নির্ভর করে এবং যিনিও আমার প্রেমে লীন হইয়া সেই সুখের আশাকে আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া তুলেন, তিনিই যদি সহসা আবার সেই বজ্রপ্রতিষ্ঠ আশাতরুকে একেবারে উন্মূলিত করেন, তাহা অপেক্ষা আর পৃথিবীতে কি অধিক যাতনা আছে? প্রত্যাখ্যাত শকুন্তলা, নির্ব্বাসিত সীতা ও অপমানিত ডেস্‌ডিমোনার দুঃখ ভাবিয়া দেখিলে কোন্ পাষাণ-হৃদয় না দ্রবীভূত হয়? কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সেই দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে একটি ঔদাস্যের ভাব আছে। ইহাও অভিমানের একটি বিশেষ লক্ষণ। ঈষৎ অভিমান-স্থলে ইহা প্রায়ই দেখা যায় যে, শতসহস্র অপর লোকের সঙ্গে আমি যতটুকু আত্মীয়তা করিতে সক্ষম, আমার স্নেহ বা প্রণয়ের পাত্রের উপর অভিমান হইলে তাহার শতাংশের একাংশও করিতে সক্ষম নহি। এমন কি, আমি হয় ত সেই শতসহস্র অপর লোকের সঙ্গে হাসিতে পারিব, গল্প করিতে পারিব, কিন্তু সেই স্থলে আমার অভিমানের পাত্রের আগমনে আমার হাসি শুখাইয়া যাইবে, গল্প ওষ্ঠেই বিলীন হইবে এবং আমোদ বিষাদে পরিণত হইবে। যিনি সকল অপেক্ষা আমার আপনার, অভিমানের সময় তাঁহাকেই সকল অপেক্ষা পর বলিয়া মনে হইবে। ইহা কেবল হৃদয়ের গভীর স্নেহ বা প্রণয়ের বিপরীত প্রতিক্রিয়া মাত্র। হৃদয় যাঁহাতে যত ঘোর ঘনিষ্ট ভাবে সংলগ্ন হয়, তাঁহার প্রকৃত বা কল্পিত বিরূপাচরণে তাঁহা হইতে হৃদয় তত সুদূরে প্রতিহত হইয়া আইসে। এই জন্যই প্রত্যাখ্যান-কালে শকুন্তলা দুষ্মন্তকে "আর্য্যপুত্র" বলিয়া সম্বোধন করিতে করিতে থমকিয়া "পোরব" বলিয়া সম্বোধন করিলেন, এই জন্যই নির্ব্বাসিতা জানকী রামকে লক্ষ্য করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন "এক্ষণে তোমাদের সেই রাজার নিকট এই প্রার্থনা করি, আমি এই রূপে পরিত্যক্ত হইলেও যেন তিনি তাপসনির্ব্বিশেষে আমার তত্ত্বাবধান ক-

রেন। এই জন্যই অপমানিত ডেস্‌ডিমোনাকে যখন তাঁহার পরিচারিকা এমিলিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ভর্ত্তৃদারিকে! প্রভুর আমার কি হইয়াছে?" তিনি প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কাহার কি হইয়াছে?" এমিলিয়া বলিলেন "আমার প্রভুর কি হইয়াছে?"

ডেস্‌ডিমোনা।—"কে তোমার প্রভু?"

এমিলিয়া।—"কেন, মধুরভাষিণি! যিনি তোমার প্রভু?"

ডেস্‌ডিমোনা কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিলেন "কই আমার ত কেহই নাই।"

আবার এই ঔদাস্যের সঙ্গে সঙ্গে আমরা উপরে বলিয়াছি একটি কেমলতর ঈষৎ রাগের আভাসও বিদ্যমান থাকে। এই জন্য উল্লিখিত অভিমান-স্থলে শকুন্তলা দুষ্মন্তকে বলিয়াছিলেন "তপোবনে তাদৃশ অমায়িকতা দেখাইয়া ও ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে এরূপ দুর্ব্বাক্য কহিয়া প্রত্যাখ্যান করা তোমার উচিত নহে।" এই জন্যই সীতা লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন "আমার হইয়া সেই রাজাকে বলিও, তিনি যে স্বসমক্ষে অগ্নিপরীক্ষা করিয়াও অকারণে আমাকে পরিত্যাগ করিলেন ইহা কি রঘুবংশের অনুরূপ কর্ম্ম করা হইল?" এবং এই জন্যই ডেস্‌ডিমোনা ওথেলো কর্ত্তৃক অন্যায় তিরস্কৃত হইয়া ইয়াগোকে বলিয়াছিলেন "যাহারা শিশু-সন্তানদিগকে শিক্ষা দেয়, তাহারা অতিভদ্র-ব্যবহারে ও সহজ উপায়েই তাহা করিয়া থাকে—ওথেলো ত আমার প্রতি তাহাই করিতে পারিতেন, কেন না তিরস্কার-বিষয়ে বাস্তবিকই ত আমি শিশু-সন্তানের ন্যায়।"

আমরা সীতা শকুন্তলা ও ডেস্‌ডিমোনার অভিমান পরীক্ষা করিয়া অভিমান যে কি কি উপাদানে গঠিত তাহা দেখিলাম। কিন্তু সাধারণত অনেকেই মান এবং অভিমানকে একই পদার্থ মনে করে। ঈষৎ অভিমানের ধরণ-ধারণ কতকটা মানের মত স্বীকার করি, কিন্তু এ উভয়েতে প্রকৃতিগত বিশেষ তারতম্য বিদ্যমান আছে। প্রণয় ও স্নেহ—এ উভয় স্থলে অভিমান সম্ভবে, কিন্তু মান—প্রণয়-স্থল ব্যতীত আর কোথাও সম্ভবে না; মান স্ত্রীস্বভাব-সুলভ কিন্তু অভিমান স্ত্রী কি পুরুষ উভয়েই করিয়া থাকে;—মানেতে প্রণয়ীর অনুরাগের উপর প্রণয়িনীর দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে মানের উদয় হয় না এবং অভিমানেতে অভিমানের পাত্রের অনুরাগের উপর অভিমানীর সংশয় না জন্মিলে কখন অভিমানের উদয় হয় না,—মানের উদ্দেশ্য আমাকে সাধুক্ এবং আমার প্রতি অনুরাগ দেখাইয়া আমার অনুরাগের সম্মান রাখুক্। অভিমানের উদ্দেশ্য—আমার সংশয় ভঞ্জন হোক্ এবং আমার সর্ব্বস্ব আবার আমার হইয়া আমার মর্ম্মযাতনার উপশম করুন। মানের প্রকৃতি—স্বত্ব বজায় রাখা, অভিমানের প্রকৃতি—ভিক্ষা প্রার্থনা; মান লীলাময়, অভিমান বিষাদময়; মানের অন্তরতম প্রদেশে হাস্য লুক্কায়িত ভাবে, না হয় প্রকাশ্য ভাবে থাকে; অভিমান অশ্রুতেই আপ্লুত। প্রকৃত অভিমানের উদয় হইলে মনে যেকি ভয়ানক

আঘাত লাগে তাহা বিজ্ঞতাভিমানী সাংসারিক ঋষিতপস্বিরা কিছুই অনুভব করিতে পারেন না। তাঁহারা জানেন যে রোগেই শরীর বিশুষ্ক হয়, ক্ষতিতেই মন ক্ষুণ্ণ হয় এবং শোকেই হৃদয় অভিভূত হয়। কিন্তু স্নেহ বা প্রণয়-পাত্রের একটি ঈষৎ কঠোর বচনে, একটি ঈষৎ নির্দ্দয় কটাক্ষে, একটি ঈষৎ নির্ম্মম ইঙ্গিতে হৃদয়ে যে কি ভীষণ ভূমিকম্প উপস্থিত হইতে পারে, তাহা তাঁহাদের মলিন কল্পনায় কিছুমাত্র প্রতিফলিত হইতে পারে না। কিন্তু এইরূপ একটী বচনে, বা একটি কটাক্ষে অভিমানীর যে কত আশা কত ভরসা, এমন কি তাহার হৃদয় পর্য্যন্ত স্তরে স্তরে যে কিরূপে ভস্মীভূত হইয়া যায়, তাহা সেই অভিমানী ব্যতীত আর কেহই অনুভব করিতে পারে না। দুর্গেশ-নন্দিনী তিলোত্তমা যখন রাজপুত্র জগৎসিংহের সহিত কারাগারে দেখা করিতে গেলেন তখন রাজপুত্র নিশ্চয়ই জানিতেন যে তিলোত্তমা পতিতা হইয়াছেন। এই ভাবিয়া তিনি নির্দ্দোষী তিলোত্তমাকে তাঁহার হৃদয়-বৃন্ত হইতে উৎপাটন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। এমন সময় এক দিন তিলোত্তমা রুগ্ন জগৎসিংহের সম্মুখে উপস্থিত। "রাজপুত্র কিঞ্চিৎ পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইলেন; অমনি তিলোত্তমার দেহ মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তম্ভিত হইয়া স্থির হইল। ক্ষণ-প্রস্ফুটিত হৃৎপদ্ম সঙ্গে সঙ্গে শুকাইয়া উঠিল। রাজপুত্র কথা কহিলেন,

"বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা?"

'তিলোত্তমার হৃদয়ে শেল বিঁধিল। * * * * রাজপুত্র পুনর্ব্বার কথা কহিলেন—'

"এখানে কি অভিপ্রায়ে?"

এখানে কি অভিপ্রায়ে?—কি প্রশ্ন! তিলোত্তমার মস্তক ঘুরিতে লাগিল; চারিদিকে কক্ষ শয্যা প্রদীপ প্রাচীর সকলই যেন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, অবলম্বনার্থে প্রাচীরে মস্তক দিয়া দাঁড়াইলেন।"

কিন্তু সেই যবন-কারাগারের এই মোহময় দৃশ্যের মাঝে যদি কোন সরল-হৃদয় সাংসারিক বিজ্ঞ পুরুষ থাকিতেন, তিনি সকলই আপনার অকাল্পনিক সরল ভাবে দেখিয়া তিলোত্তমাকে এই বলিয়া ঈষৎ বিদ্রূপ সহকারে বুঝাইতেন—"তোমার দুঃখের কারণ ত আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। রুগ্ন জগৎসিংহ হয় ত আপনার শরীরের কোন কষ্ট হেতু একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন, তাহাতে তোমার কষ্ট পাওয়া অন্যায়। আর বাস্তবিকই তুমি বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা, তোমাকে বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা বলিয়া সম্বোধন করাতে কেনই বা তোমার মনে যাতনা উপস্থিত হইবে? অবিবাহিত কুলকামিনীকে তিনি কখনই 'প্রিয়ে' বা 'প্রেয়সি' বলিয়া সম্বোধন করিতে পারেন না, তোমাকে তিলোত্তমা না বলিয়া বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা বলাতে বরং তাঁহার বুদ্ধির কার্য্য হইয়াছে, কারণ সেই শত্রুপুরী মধ্যে তোমার নাম প্রকাশ করিলে বিপদের সম্ভাবনা এবং এরূপ স্থলে অতদূর ঘোর ঘনিষ্টতা প্র-

কাশ করা মূর্খের কার্য্য। আর "এখানে কি অভিপ্রায়ে?" জিজ্ঞাসা করাতে যে তোমার মস্তক ঘুরিয়া গেল, ইহাতে বোধ হয় তোমার মস্তকের ঘূর্ণা-রোগ আছে, তাহা না হইলে তুমি সহসা সেই কারাগার মধ্যে কি অভিপ্রায়ে উপস্থিত হইলে?—এ কথা জিজ্ঞাসা করাতে তোমার মস্তক ঘুরিয়া যাইবে কেন? তুমি কি বল যে জগৎসিংহ যদি তোমার সঙ্গে কোন কথাই না কহিতেন তাহা হইলেই তাঁহার ভালবাসার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হইত? হা হতবুদ্ধি! তুমি আপনার কল্পনার দোষে আপনি কষ্ট পাইবে তা জগৎসিংহ কি করিবেন!" কিন্তু হে অন্তর্দেবতা! হে হৃদয়-সাক্ষী! ন্যায় শাস্ত্রের কূট তর্ক দ্বারা কি অভিমানের কারণ সিদ্ধ হইতে পারে? হৃদয়ের দ্বারা হৃদয় না বুঝিয়া কি বুদ্ধি বিবেচনা দ্বারা হৃদয় বুঝিতে পারা যায়? প্রণয়ীর হৃদয় আপনা আপনি যেরূপ দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরিণত হয়, তাহার তুলনায় কি ন্যায়শাস্ত্রের কুটিলতম যুক্তিও অকিঞ্চিৎকর মনে হয় না? কিন্তু আরও দুঃখের বিষয় এই যে, আমি যাঁহার উপর অভিমান করিলাম, তাঁহার যদি আমার প্রতি কিছুমাত্র ভালবাসা না থাকে অথচ সে ভাবটি স্পষ্ট অক্ষরে প্রকাশ করিতে নিতান্ত নির্ম্মমতার কাজ মনে করেন, তাহা হইলে তিনিও তিলোত্তমার মত অবস্থাতে আমাকে ঐ সাংসারিক ব্যক্তির মত কূট তর্কে পরাস্ত করিয়া এবং পরিশেষে আমাকে কাল্পনিক প্রমাণ করিয়া অপ্রস্তুত করিতে চেষ্টা পাইবেন।

স্বীকার করি যে অনেক সময়ে অভিমানী ব্যক্তি নিজ কল্পনার প্রভাবে যে সকল বিভীষিকা সৃষ্টি করেন, হয় ত তাহাদের কোন প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, কিন্তু চর্ম্ম-চক্ষেই দৃষ্ট হোক্ বা কল্পনার চক্ষেই দৃষ্ট হোক্—বিভীষিকা বিভীষিকাই, ভয়ের কষ্ট উভয়েতেই সমান। জাগ্রৎ অবস্থায় আমার উপর যদি কেহ শরাঘাত করে, আর স্বপ্নে যদি আমি অনুভব করি আমার উপর কেহ শরাঘাত করিতেছে, এই দ্বিবিধ আঘাত-জনিত কষ্টের কি কিছুমাত্র তারতম্য থাকে? জাগ্রৎ অবস্থার কোন বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া যে ভয় হয়, স্বপ্নাবস্থায় কি তাহার তিলমাত্র লঘুতর হয়?—তাহা হইলে অভিমানের কষ্ট, প্রকৃতই হোক্ আর কল্পিতই হোক্, তাহার কষ্ট বিদ্রূপের বিষয় কিরূপে হইতে পারে? দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক সময়ে অভিমানের পাত্রই আবার অভিমানীকে বিদ্রূপ করিতে ত্রুটী করেন না। কিন্তু তাহা অপেক্ষা পৃথিবীতে দারুণতর যাতনা আর অল্পই আছে! অভিমানের অশ্রুর উত্তরে অর্দ্ধস্ফুট হাস্যের প্রতিদান, অভিমানের দীন ভিক্ষার উত্তরে কঠোর বিদ্রূপ প্রয়োগ, অভিমানের সকরুণ চাহনীর উত্তরে তীব্র কটাক্ষ—পৃথিবি! তোমার হলাহল-সমুদ্রের তরঙ্গও ইহা অপেক্ষা দাহকারী নহে!

চ—

ভানুসিংহের কবিতা।

বার বার সখি বারণ করনু
ন আও মথুরা ধাম!
বিসরি প্রেম দুখ, রাজভোগ যথি (১)
করত হমারই শ্যাম।
কি কহিল রসনা? হমারই শ্যাম সো?
কি বুঝলি পাগল প্রাণ?
অবতক (২) ঘুচল ন ভাঁতি (৩) তুয়া মন!
সো কি হমারই শ্যাম?
শত শত দেশ পদানত যিনকো (৪)
শত শত মানুখ দাস,
শত শত রাজা রোষ-কটাখে
মনমে মানে তরাস,
দুখিনী গোপিনী, হম অবলা সখি,
সোকি হমারই শ্যাম?
বোল ত সজনি, মথুরা-অধিপতি
সোকি হমারই শ্যাম?
ধনকো শ্যাম সো, মথুরা পুরকো,
রাজ্য মানকো হোয়,
নহ পীরিত কো, ব্রজ কামিনীকো,
নিচয় কহনু ময় তোয়।
ন যাও সজনি, মথুরা নগরে
ভেটইতে সো শ্যাম,
সমরাইও না (৫) সখি, শ্যামক মনমে
দুখিনী হমার নাম।

(১) যেখানে (২) এখন পর্য্যন্ত (৩) ভ্রান্তি (৪) যাঁহার (৫) স্মরণ কয়াইও না

বাত রাখ মঝু (৬) অতান্ত সহিলো,
মথুরা পুর জনি (৭) যাহ,
দূর সঙেতু পেখিও শ্যামক (৮)
কৈছন আছয় নাহ। (৯)
জনি সখি দেখ সো, মনকো হরখে
করত সুখে পুর-বাস,
শপতি হমার লো, তব্ সখি ন আও
মথুরা পতিকো পাশ।
জনি দেখো তুঁহু সোবি সহত সখি!
দারুণ বিরহক জ্বালা
তব্ সখি সঁপিও, শ্যামক চরণে
ইহ বন-কুসুমক মালা!
কহিও, রাধা, দুখিনী রাধা—
মথুরা-অধিপতি কান!
দুখজ্বালা তব, বারইতে (১০) সব
সঁপবে দে মন প্রাণ।
উরস পাতবে, অবশ মাথ তব
রাখব তছু পরি মাধা,
তোষইতে মন সবকছু করবে
যত কছু জানয় রাধা!
ভানু কহত— অয়ি—বিরহ কাতরা
মনমে বাঁধহ থেহ। (১১)
মুগুধা বালা, বুঝহ বুঝলিনা,
হমার শ্যামক লেহ। (১২)

(৬) আমার (৭) যদি (৮) দূর হইতে তুমি শ্যামকে দেখিও (৯) নাথ কেমন আছেন। (১০) নিবারণ করিতে (১১) স্থৈর্য্য বাঁধো (১২) ভালবাসা।

তুকারাম।

তুকারাম মহারাষ্ট্র দেশের এক জন সাধু পুরুষ ও প্রখ্যাত কবি। তিনি ১৫১০ শকাব্দে (খৃষ্টাব্দ ১৫৮৮) পুণা নগরীর অনতিদূর দেহু নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তুকারাম সেই সময়কার লোক, যে সময়ে মহারাষ্ট্রের জনপদ অনেক কাল মুসলমানদের আধিপত্যে অবসন্ন থাকিয়া স্বাধীনতা প্রত্যাহরণের জন্য সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠে ও যবন-অধিকারের ভিতরে এরূপ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে যাহাতে শতাব্দীর মধ্যে মোগল সিংহাসন সমূলে কম্পমান হইয়া ভগ্ন দশা প্রাপ্ত হয়। তুকারাম মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবাজীর সমকালবর্ত্তী লোক—যে দুই শত বৎসর মহারাষ্ট্রীয়গণ স্বাধীন রাজ্য উপভোগ করিয়াছিল, তাহার প্রারম্ভ কালের ধর্ম্ম ও নীতির ভাব তুকারাম ও শিবাজীর গুরু রামদাস এই দুই কবির জীবনে প্রতিফলিত দেখা যায়।

তুকারাম জাতিতে শূদ্র ও ব্যবসায়ে বণিক ছিলেন। তাঁহার পিতা মাতা বংশানুক্রমে পণ্ডরপুরের দেব বিঠোবা বা বিঠ্ঠলের পরম ভক্ত ছিলেন ও তথায় তাঁহারা সর্ব্বদাই তীর্থ করিতে যাইতেন। এইরূপ জনশ্রুতি যে,বিশ্বম্ভর নামে তাঁহার কোন এক পূর্ব্বপুরুষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার মাতা তাঁহাকে চিরন্তন প্রথানুসারে পণ্ডরপুরে তীর্থযাত্রা করিবার উপদেশ দেন। সেই উপদেশ ক্রমে বিশ্বম্ভর মাসের মধ্যে দুই বার তথায় যাত্রা করিতে ব্রতী হইলেন। এইরূপে ১৬ বার তীর্থ দর্শন করিবার পর একদা রাত্রিতে তাঁহার স্বপ্ন হয়—যে বিঠোবা দেব ও রুক্মাই-দেবীর স্বয়ম্ভু মূর্ত্তি দেহু গ্রামের এক আম্র-বনে নিহিত আছে—তুমি গিয়া তাহা উদ্ধার কর—আর তোমার পণ্ডরপুরে তীর্থ পর্য্যটনে যাইতে হইবে না। পরে বিশ্বম্ভর তাহা উদ্ধার করিয়া দেহু গ্রামে ইন্দ্রায়নী নদী তীরে এক ক্ষুদ্র মন্দির প্রস্তুত করিয়া যথাবিধি সেই মূর্ত্তিদ্বয় প্রতিষ্ঠা করেন। সেই অবধি বিঠোবা-দেব বিশ্বম্ভরের কুল-দেবতা হইলেন।

তুকারাম, বহ্লোজীর তিন পুত্রের মধ্যে মধ্যম পুত্র। তাঁহার মাতার নাম কণকাই। বহ্লোজীর বৃদ্ধাবস্থায় তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সাওজীকে সংসারের ভার অর্পণ করিবার প্রস্তাব করেন কিন্তু সাওজী এক জন ভগবদ্ভক্ত পুরুষ, সংসারে বীতরাগ, কাজেই তুকারামের উপরেই কর্ম্মকাজের সমস্ত ভার ন্যস্ত হইল। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ১৩ বৎসর—কতক কাল পর্য্যন্ত তিনি সাংসারিক ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিয়া পিতা-মাতার সন্তোষ সাধন করিলেন। তাঁহার দুই পত্নী ছিল—রখুমাই ও জীজাই, কনিষ্ঠ পত্নীর স্বভাব কিছু কর্কশ ছিল ও তিনি তাঁহার স্বামীর বৈরাগ্য ভাবের উপর কিছু বিরক্ত ছিলেন। কথিত আছে যে এক দিন তুকারাম কতকগুলি ইক্ষুদণ্ড উপহার পাইয়াছিলেন। আখের গোছা ঘরে আনিতে আনিতে পথিমধ্যে কতকগুলি বালক তাহার প্রার্থী হইল। তিনি একে একে বিতরণ করিতে লাগিলেন, পরিশেষে তাঁহার হস্তে একটি দণ্ড মাত্র অবশিষ্ট রহিল। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে গৃহিণী কোথা হইতে সকল কথার সন্ধান পাইয়াছেন। স্বামীর এই রূপ আচরণে জীজাই রাগান্ধ হইয়া সেই ইক্ষু-গাছটি কাড়িয়া লইয়া পতির পৃষ্ঠোপরি এমন সজোরে প্রহার করিলেন যে তাহা দুই খণ্ড হইয়া গেল। তুকারাম ঐ দুই খণ্ড ইক্ষু হস্তে লইয়া শান্তভাবে কহিলেন—"প্রিয়ে, তুমি আমাকে এত ভাল বাস যে এই আখ-গাছটি একলা খাইতে ভাল লাগিবে না বলিয়া তাহা দুই খণ্ডে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে!"

তুকারামের বিংশতি বৎসর বয়সে তাঁহার জ্যেষ্ঠা পত্নী রখুমাইর মৃত্যু হয়। ঐ বৎসর সন্তু নামক তাঁহার একটি পুত্রও মরিয়া যায়। তৎপূর্ব্বে তাঁহার পিতা মাতা ও ভ্রাতৃজায়ার মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হন—তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও তাঁহাকে ছাড়িয়া তীর্থ যাত্রায় চলিয়া গিয়া তাঁহার শোককে দ্বিগুণিত করেন। ইহার উপর দুর্ভিক্ষ ও অন্ন-কষ্ট, এই সকল কারণে তিনি সংসারের উপর বিরক্ত ও সর্ব্বত্যাগী হইয়া ঈশ্বরারাধনায় জীবন উৎসর্গ করিলেন। এইরূপে তাঁহার জীবনের পূর্ব্বার্দ্ধ অতিবাহিত হইল।

তুকারামকৃত কবিতাবলী "তুকারামের অভঙ্গ" বলিয়া পরিচিত। তাহা মহারাষ্ট্রীয় প্রাচীন সাহিত্যের এক প্রধান অঙ্গ, ইহা হইতে কবির নিজ জীবন চরিত অনেকটা সংগৃহীত হইতে পারে। একজন সন্ন্যাসী তুকারামকে তাঁহার বৈরাগ্য অবলম্বনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি যে সকল অভঙ্গে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেলঃ—

১৩৩৩

শূদ্র জাতি, সংসার চালাই ব্যবসায়ে,
বিঠ্ঠল গৃহদেবতা, নমি তাঁর পায়ে।
এ সকল কথা কহা ভাল বড় নয়,
শুধাইছ, সেই হেতু কহিবারে হয়।
মা বাপের মৃত্যু হ'লে পড়িয়া সংসারে,
সহিনু কতই কষ্ট কহিব কাহারে?
ধন মান সঁপিলাম দুর্ভিক্ষের গ্রাসে,
অন্নাভাবে গৃহিণী মরিলা উপবাসে।
লজ্জায় শরমে শেষে হ'য়ে মর মর,
দুখে শোকে একেবারে হ'য়ে জর জর,
ব্যবসায়ে দেখিয়া দারুণ নোক্‌সান,
দেবতা মন্দিরে গিয়া কৈনু বাসস্থান,
এগারই দিনে আরম্ভিনু সঙ্কীর্ত্তণ,
কিন্তু অধ্যয়নে তত নাহি ছিল মন,
সাধুদের গুটিকত পবিত্র বচন,
মুখস্থ করিয়া নিনু করিয়ে যতন।
অন্য কেহ যদি কভু গাইতেন গান,
আমিও ভক্তির সাথে মিলাতেম তান।
লজ্জা দূর করি দিয়া, শুদ্ধ করি প্রাণ,
সাধুর চরণামৃত করিতাম পান।
পর-উপকার সদা করিবার তরে,
শরীরের প্রতি মায়া দিনু দূর ক'রে।
বন্ধুদের অনুরোধে দিলাম না কান,
সংসারের প্রতি আর রহিল না টান।

অপরের পরামর্শ না আনি শ্রবণে,
সত্য অসত্যের সাক্ষী করিলাম মনে,
স্বপ্নে মোর গুরু-মন্ত্র করিয়া শ্রবণ,
ঈশ্বরে অচলা ভক্তি করিনু স্থাপন।
কবিত্ব প্রতিভা শেষে স্ফূর্ত্তি পেল মনে,
অর্পণ করিনু হৃদি বিঠোবা চরণে—
নিষেধ* হইল শেষে কবিতা লিখায়,
বড়ই আঘাত তাহে পাইনু হিয়ায়।
গ্রন্থ মোর ফেলি জলে, গেলাম মন্দিরে,
দেবতা প্রসন্ন মোরে হইলা অচিরে।
সব কথা বিস্তারিয়া কহিবারে পাছে,
সময় বহিয়া যায়, এত কথা আছে।
এখন যে ভাব মোর দেখিছ সকল,
ভবিষ্যতে কি হইবে জানেন বিঠ্ঠল।
ভকতে না উপেক্ষা করেন নারায়ণ,
করুণা-সাগর তিনি জানিনু এখন।
পাণ্ডুরঙ্গে বলালেন যে কথা সকল,
তাই একমাত্র মোর রহিল সম্বল।

১৩৩৪

আমি অতি হীন পাপী শুন সাধু সবে,
এত ভাল বাস মোরে কেন বল তবে?
মনে জানিয়াছি গতি নাহিক আমার,
এক ভেবে কাজ করি, লোকে ভাবে আর।
কিছুতেই পূরিল না অভাব যখন,
বর্ত্তমান দশা তবে করিনু গ্রহণ।
অবশেষে ফুরাইয়া গেল মোর ধন,
অবশিষ্ট যাহা কিছু কৈনু বিতরণ।

* তুকারাম শূদ্র বলিয়া একজন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক তিনি কবিতা লিখনে নিষিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার বিশেষ বিবরণ আগামী বারে প্রকাশিত হইবে।

দারা সুত ভাইদের করিয়া বর্জ্জন,
হইলাম হতবুদ্ধি বিষাদে মগন।
লোক মাঝে মুখ আর দেখাব না মনে,
কাটাই জীবন মম বিজনে কাননে।
পেটের জ্বালায় মন হইল কঠিন,
পেটের জ্বালায় হৈনু দয়া-মায়া-হীন।
যে যা বলে ব'সে থাকি আপনার মনে,
না শুনে 'হাঁ' দিয়া যাই সবারি বচনে।
পূর্ব্ব পুরুষেরা মোর ছিলা ভক্ত অতি,
তাই আমি বিঠোবার করিগো আরতি।
তুকা বলে "কারো কথা নাহি শুনি আর,
ভক্তদের এই গতি জানিয়াছি সার।"

১৩৩৫

হে দেব যা কিছু মোর আছিল বিভব.
আমার ভালরি তরে নিয়াছ সে সব।
দুর্ভিক্ষের কালে যত পড়িয়াছি ক্লেশে,
আমার ভালরি তরে হইয়াছে শেষে।
শোক পেয়ে তব প্রতি ভক্তি গেল দড়,
সংসারের উপরে বিরাগ হল বড়।
ভালই যে পত্নী মম হইলা কর্কশা,
ভাগ্য মোর লোক মাঝে এত যে দুর্দ্দশা।
ভালই যে জগতে পাইনু উপহাস,
গোমেষাদি ধন ধান্য সব হল নাশ।
লোক-লাজ না রাখিনু হইল মঙ্গল,
তোমারে করিনু হরি জীবন-সম্বল।
তোমার মন্দিরে আজি সঁপিলাম কায়া,
তেয়াগিয়ে পুত্র জায়া সংসারের মায়া।
"ভাগ্য মোর" তুকাবলে "করিনু ধারণ,
একাদশী ব্রত উপবাস জাগরণ।"

উপরে তুকারাম তাঁহার স্ত্রীকে কর্কশা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—নিম্নোদ্ধৃত

কতিপয় শ্লোকে তাঁহার সেই স্ত্রীর প্রতি-মূর্ত্তি পাঠকেরা অবিকল চিত্রিত দেখিতে পাইবেন।

৫৬৬

আমারি বেলায় উনি সংসারে বিরাগী,
নিজের ত বাকী নাই সুখ,
সব সুখ ঘরে আসে,
শুধু মোর ঘুচিল না দুখ।
ঘরে অন্ন নেই বলে,
বল দেখি যাই কার দ্বার?
পোড়া সংসারের তরে,
কত জ্বালা সহি বল আর?
অন্ন অন্ন কোরে রাত দিন,
ছেলে-গুলো খেলে যে আমায়!
মরণ তাদের হয়,
সকল বালাই ঘুচে যায়।
সকলি ঝেঁটিয়ে নিয়ে যান,
তিল মাত্র ঘরে থাকা ভার।
ঘরে যে গোবর দেবো,
একটীও গরু নাই তার।
তুকা বলে, "দূর পোড়ামুখী,
আপনি মাথায় নিলি ভার।
এখন তাহার তরে,
কাঁদিলে কি হবে বল্ আর।"

৫৬৭

বোধ হয় এ পাষণ্ড,
পূর্ব্ব জন্মে ছিল মোর অরি।
এ জনমে স্বামী হোয়ে,
বৈর সাধিতেছে এত করি!
কত জ্বালা স'ব আর,
কত ভিক্ষা মাগি পর দ্বারে।
বিঠোবার মুখে ছাই—
কি ভাল কোল্লেন এ সংসারে?
তুকাবলে "স্ত্রী আমার,
রাগিয়া কতই কটু ভাষে।
কভু বা কাঁদিয়া মরে,
কভু বা আপন মনে হাসে।"

৫৬৮

ঘরে দুটা অন্ন এলে,
ছেলেদের দেব কোথা খেতে।
হত ভাগা তা দেবে না,
সকলি পরেরে যা'ন দিতে!
তুকা বলে "অতিথিরে,
যখনি গো দিতে যাই ভাত।
রাক্ষসীর মত এসে,
হতভাগী ধরে মোর হাত।"
"না জানি যে পূর্ব্ব জন্মে,
কতই করিয়া ছিলি পাপ।"
তুকা বলে "এ জনমে,
তাই এত পেতেছিস্ তাপ।

৫৬৯

খাবার কোথায় পাবি বাছা,
বাপ তোর থাকেন মন্দিরে—
মাথায় জড়ান্ তিনি মালা,
ঘরে আর আসেন না ফিরে।
নিজের হোলেই হল খাওয়া,
আমাদের দেখেন না চেয়ে।
খর্ত্তাল বাজিয়ে শুধু,
মন্দিরে বেড়ান্ গেয়ে গেয়ে।
কি করিব বল্ দেখি,
কিছুই ত ভেবে নাহি পাই।
ঘরে না বসেন এক রতি,
চলে যান অরণ্যে সদাই।

তুকা বলে "ধৈর্য্য ধর,
এখনো সকল ফুরায় নাই।"

৫৭০

গেছে সে আপদ গেছে,
ঘরেতে থাকিবে তবু রুটি।
যা হোক্ তা হোক্ কোরে,
পেট ভরে খেতে পাব দুটি।
বোকে বোকে দিনু এল্যে,
জ্বালাতন হনু হাড়ে মাসে,
তুকা বলে "যদিও সে,
দিবা নিশি কত কটু ভাষে।
তুকারে তুকার স্ত্রী,
মনে মনে তবু ভাল বাসে।"

৫৭১

ঘরে আর আসেনা সে,
কোন পরিশ্রম নাহি কোরে।
নিজে না কি খেতে পায়,
রোজ রোজ সুখে পেট ভোরে।
না উঠিতে শয্যা হতে,
মিলি দল-বল-গুলা সাথে।
করতাল বাজাইতে,
আরম্ভ করেন অতি প্রাতে।
খেয়েছে লজ্জার মাথা,
জ্যান্তে তারা মড়ার মতন।
ঘরে আছে ছেলে পিলে,
তাদের ত না করে যতন।
স্ত্রী তাদের পোড়ে আছে—
হতভাগী লাজ-দুঃখ-ভরে।
অভিশাপ দিতে দিতে—
মাথায় পাথর ভেঙ্গে মরে।
"ভাগ্যে যাহা আছে তাহা,"
তুকা বলে "থাক সহ্য কোরে।"

৫৭২

হেথা কেন আসে লোক-গুলা,
তাদের কি কাজ নাই হাতে?
তুকা কহে "ঈশ্বরের তরে,
পৃথিবী মিলেছে মোর সাথে।
"দু চারিটা ভাল বাক্যে,
তাতে কিবা ক্ষতি বৃদ্ধি আছে?
"কোথাও যায় না তারা,
ভালবেসে আসে মোর কাছে।
"এও সে বাসে না ভাল,
ভাগ্য কি বা আছে এর বাড়া,
"সকল লোকের পাছে,
কুকুরের মত করে তাড়া।"

তুকারাম সংসারাশ্রম হইতে অবসৃত হইয়া ভজন-পূজন-কীর্ত্তনে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। প্রত্যূষে স্নান করিয়া বিঠোবার মন্দিরে গমন ও দেবপূজাদি সমাপন করিয়া অরণ্যে প্রস্থান—এই তাঁর নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম। দেহূর তিন ক্রোশ পশ্চিমে "ভাণ্ডারী" নামক পাহাড় তাঁহার প্রিয় আবাসস্থান ছিল। তথায় সমস্ত দিবস ধ্যান ধারণায় মগ্ন থাকিয়া সন্ধ্যার সময় দেহূতে ফিরিয়া আসিয়া বিঠোবার মন্দিরে ভজনাদি করিতেন। কিন্তু তিনি যে একেবারে গৃহধর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। একবার তিনি ক্ষেত্র রক্ষণ কার্য্যের ভার লইয়া যে বিপদে পড়িয়াছিলেন তাহার বিবরণ এই—

এক দিন তিনি ইন্দ্রায়ণী-তীরে বসিয়া উপাসনা করিতেছেন এমন সময় তাঁহার নিকটে এক জন কৃষক আসিয়া উপস্থিত। সে তুকারামকে বলিল "তুকারাম শেট, মিছা মিছি নিষ্কর্ম্মার ন্যায় ঘরে বসিয়া আছ, যদি আমার ক্ষেত রক্ষণ কর ত তুমি আধ মন করিয়া দানা পাইবে, তাহাতে তোমার পরিবারের ভরণ পোষণে সাহায্য হইবে—আর যদি কোথাও হরিনাম করিতে ইচ্ছা হয় তাহাও করিতে পারিবে।" তুকারাম তাহাতে স্বীকৃত হইলে তাঁহাকে ক্ষেত্র রক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ক্ষেতকারী গ্রামান্তরে চলিয়া গেল। তুকারাম ক্ষেত্ররক্ষণ কালে দেখিলেন যে, দানার লোভে ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষীদল আসিয়া শস্যক্ষেত্রে উপদ্রব আরম্ভ করিল। কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত প্রাণীকে তাড়াইয়া দেওয়া দোষের কার্য্য জানিয়া তিনি তাহাদের তাড়াইয়া দিতে বিরত হইলেন। তিনি ক্ষেত্র মধ্যে কাষ্ঠমঞ্চের উপর বসিয়া ধ্যানে মগ্ন, এদিকে পক্ষীরা অকুতোভয়ে শস্য খাইয়া যায়। এইরূপে এক মাস চলিয়া গেলে ক্ষেতকারী প্রত্যাগত হইয়া দেখে যে তাহার ক্ষেত্র বিহঙ্গকুলের বাসস্থান হইয়াছে। ইহা দেখিয়া সে ক্রোধভরে তুকারামকে তাঁহার অনবধানতা জন্য বিস্তর তিরস্কার করিতে লাগিল, পরে গ্রামের পাঁচ জনকে একত্র করিয়া তাঁহাদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিল। তাঁহারা ক্ষেতকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার ক্ষেত্রে কত মন শস্য উৎপন্ন হয়? সে কহিল "দুই খণ্ডী"। তাঁহারা তদনুসারে দুই খণ্ডীর মূল্য ক্ষেতকারীকে দণ্ডস্বরূপ লিখিয়া দিতে তুকারামের প্রতি আদেশ করিলেন। তৎপরে পঞ্চায়তের মধ্যস্থগণ

নিজ চক্ষে ক্ষেত্র তদারক করিতে গিয়া যে দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে অবাক্। দেখেন যে ক্ষেত্রটি শস্যে শস্যে ছাইয়া গিয়াছে। সেই শস্য সংগৃহীত হইলে তাহা হইতে ১৭ খণ্ডী দানা উৎপন্ন হইল। গ্রামবাসীরা বিচারে ধার্য্য করিলেন যে দুই খণ্ডী মাত্র ক্ষেতকারীর কথা মত তাহার প্রাপ্য—অবশিষ্ট ভাগ তুকারামকে দিতে হইবে। কিন্তু তুকারাম তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। এক ব্রাহ্মণের নিকট উদ্বৃত্ত দানা গচ্ছিত রহিল। অবশেষে দেহূর মন্দির ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল তাহার সংস্করণ কার্য্যে তাহা ব্যয়িত হইল।

এই রূপে তাঁহার দিন যায়। এখনো পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের গতি নিরূপিত ও বিশ্বাসের স্থিরতা সম্পাদিত হয় নাই। মাঘ মাসের দশমী শুক্লপক্ষের রাত্রিতে তাঁহার এক স্বপ্ন হয় তাহাতেই তাঁহার জীবন-স্রোত নিয়মিত হইল। সেই স্বপ্নে বাবাজি নামক এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আবির্ভূত হন ও চৈতন্যের শিষ্য বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া তুকারামকে "রাম, কৃষ্ণ, হরি" এই মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। সেই সময় অবধি তুকারামের হৃদয়-গ্রন্থি খুলিয়া গেল—সকল সংশয় ভঞ্জন হইল। তিনি যে অগাধ শান্তি ও আনন্দ লাভ করিলেন তাহা নিজেই কতিপয় শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন।

৩৭১

শুনদেব, মনে যাহা করেছি নিশ্চয়,
জীবন সঁপিনু পদে হইয়ে নির্ভয়।

সকলি করেছি ত্যাগ, তোমারেই চাই,
সংশয় আশঙ্কা ভয় আর কিছু নাই।
হে অনন্ত দেব মোর, আছিল সম্বন্ধ তোর,
তব সাথে বহু পূর্ব্বে যাহা।
মিলি যত সাধুগণ, আমাদের সে বাঁধন,
দৃঢ়তর করিলেন আহা।
আর কিছু নাই, শুধু ভক্তি ও জীবন,
যা আছে তোমারি পদে করেছি অর্পণ।
সাধুগণ সঁপিয়াছে, আমারে তোমারি কাছে,
আমি কভু ছাড়িব না ওতব চরণ।
তুমিই কর গো মোর লজ্জা নিবারণ।

এই ক্ষণে তুকারামের জীবনের সেই ভাগে অবতীর্ণ হওয়া যাইতেছে যখন তিনি অভঙ্গ রচনা আরম্ভ করিলেন। যে ঘটনায় তিনি ভারতী-বন্দনে জীবন উৎসর্গ করিলেন তাহা ১৩২০—২১ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

নাম-দেব পাণ্ডুরঙ্গে লোয়ে সঙ্গে করে,
একদা দিলেন দেখা স্বপ্নে তিনি মোরে।
আদেশ করিলা মোরে কবিতা রচনে,
মিছা দিন না যাপিয়া প্রলাপ বচনে।
ছন্দ কহি দিলা মোরে—গম্ভীর সে বাণী,
বিঠ্ঠলজী নিজ হস্তে ধরেন লেখনী।
কহিলেন পিঠ মোর চাপড়িয়া হাতে,
এক শত কোটি শ্লোক হইবে পূরাতে।

১৩২১

যদি মোরে স্থান দেও তব পদছায়,
দিবা নিশি সাধু সঙ্গে রহিব সেথায়।
যাহা ভাল বাসিতাম ছেড়েছি সকল,
তুমি মোরে ছাড়িও না শুনগো বিঠ্ঠল।
চরণের এক পাশে দেহ যদি স্থান,
শান্তি-সুখে কাটাইব এ মম পরাণ।
নাম-দেবে মোর কাছে পাঠালে স্বপনে,
এই অনুগ্রহ তব গাঁথা র'ল মনে।

শ্রী স—

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, পৃথিবীতে মনুষ্যের অভিব্যক্তি আর মাতৃগর্ভে মনুষ্যের অভিব্যক্তি, উভয়ের প্রকরণ-পদ্ধতি সামান্যতঃ একই প্রকার। পৃথিবীতে ধাতু-প্রস্তর উদ্ভিদ্, অধম জীব-প্রবাহ এবং সর্ব্বশেষে মনুষ্য উত্তরোত্তর-ক্রমে অভিব্যক্ত হয়; মাতৃগর্ভে মনুষ্য উত্তরোত্তর জড়পিণ্ড উদ্ভিদ্ এবং নিকৃষ্ট জীবের পূর্ব্বাভাস-সূচক আকার ধারণ করিয়া সর্ব্বশেষে মনুষ্যের আকার ধারণ করে। পৃথিবীতে যুগযুগান্ত-কাল ব্যাপিয়া মনুষ্যের জন্ম-প্রকরণ চলিতে থাকে, মাতৃগর্ভে দশ মাসের মধ্যেই উহা নিষ্পন্ন হয়,তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। পৃথিবীতে মনুষ্যের জন্ম-প্রকরণ যে কয়টি বিশেষ বিশেষ সোপান-পংক্তিতে বিভক্ত, মাতৃগর্ভেও মনুষ্যের জন্ম-প্রকরণ সেই কয়টি সোপান-পংক্তিতে বিভক্ত। উভয়ের মধ্যে এই যে একটি মূল সৌসাদৃশ্য

হাই এক্ষণে বিবেচ্য; কালব্যাপ্তির ইতর বিশেষে তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না। বিজ্ঞান যেমন পৃথিবীতে এবং মাতৃগর্ভে মনুষ্যের আকার-অভিব্যক্তির প্রকরণ-সাদৃশ্য অন্বেষণ করিয়া পাইয়াছেন, তত্ত্বজ্ঞান সেইরূপ পৃথিবীতে এবং মনুষ্যেতে জ্ঞান-অভিব্যক্তির প্রকরণ-সাদৃশ্য অন্বেষণ করিয়া পাইতে পারেন। তবে, বিজ্ঞানের অন্বেষণ-প্রণালী এবং তত্ত্বজ্ঞানের অন্বেষণ-প্রণালী উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রথমটি আরোহ-প্রণালী, দ্বিতীয়টি অবরোহ-প্রণালী। তত্ত্বজ্ঞান বলেন "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" অসতের সত্তা হইতে পারে না, সতেরও অসত্তা হইতে পারে না। যে বস্তু পূর্ব্বে একেবারেই ছিল না তাহা চিরকালই না থাকিবার কথা—অতএব জ্ঞান-পদার্থকে যখন অভিব্যক্ত হইতে দেখা যাইতেছে তখন অভিব্যক্তির পূর্ব্বেও তাহা প্রচ্ছন্ন ভাবে বর্ত্তমান ছিল, ইহা অবশ্য মানিতে হইবে। পশুদিগের ক্রোধ লোভ ভয় এ সকল আছে কিন্তু জ্ঞান নাই। ক্রোধ লোভ ভয় ইহারা জ্ঞানের শত্রুপক্ষ, এজন্য রিপু শব্দে উক্ত হয়। ইহা সত্ত্বেও ক্রোধাদির মধ্যে জ্ঞানের পূর্ব্বাভাস লক্ষিত হইয়া থাকে। ক্রোধোদ্দীপনের সময় "কেন আমি ক্রোধ করিতেছি" এ জ্ঞান স্পষ্টরূপে আমাদের মনে স্থান পায় না ইহা সত্য, আমি মানিলাম; কিন্তু ইহাও ত সত্য যে ক্রোধের কারণ আমার জ্ঞানে প্রতিভাত হওয়াতেই আমার ক্রোধ হইয়াছে—এমন ক্রোধ হইয়াছে মনে কর যে, তাহার প্রভাবে আমার জ্ঞান লোপ পাইয়াছে। বলিতেছি বটে জ্ঞান লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তলে তলে ক্রোধের কারণ-জ্ঞান মনে জাগরূক না থাকিলে ক্রোধ কিসের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইবে? ক্রোধের কারণ-দৃষ্টি হইতেই যখন ক্রোধ উৎপন্ন হইয়াছে, তখন সেই কারণ-জ্ঞানের অভাবে তাহা কিরূপে বর্ত্তিয়া থাকিবে, কারণের অভাবে কার্য্য কিরূপে বর্ত্তিয়া থাকিবে? অতএব প্রচণ্ড ক্রোধের উদ্রেকে যখন জ্ঞান বিলুপ্ত-প্রায় হয় তখন বাস্তবিক তাহা বিলুপ্ত হয় না; হয় কেবল এই যে, পূর্ব্বে জ্ঞান পরিস্ফুট ভাবে বর্ত্তমান ছিল, এখন অপরিস্ফুট ভাবে কিম্বা প্রচ্ছন্ন ভাবে পরিণত হইয়াছে—এখন যে তাহা একেবারেই নাই এমন নহে। পশ্বাদি জন্তুরা ভয় ক্রোধ লোভ মোহ দ্বারা ক্রমাগতই চালিত হয়, এ জন্য তাহাদের জ্ঞান চিরকালই প্রচ্ছন্ন ভাবে বর্ত্তমান থাকে, কোন কালেই সমুচিত পরিস্ফুটতা লাভ করিতে পারে না। জ্ঞান সমুচিত পরিস্ফুট হইলে তাহা আপনি আপনাকে জ্ঞান পদার্থ বলিয়া জানে, এবং জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়া তাহারই নিয়মাধীন হইয়া চলে, জ্ঞান তখন জ্ঞানের নিয়মাধীন হইয়া চলে, আপনি আপনার নিয়মাধীন হইয়া চলে, স্বাধীন হইয়া চলে, ক্রোধাদির দ্বারা অভিভূত হয় না। বৃক্ষলতা ক্রোধ বা লোভ বা ভয় ইহার কোন কিছু দ্বারাই চালিত হয় না, অথচ তাহারা জীবদিগের ন্যায় অন্ন আহার দ্বারা পরিপুষ্ট এবং

বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। নিদ্রাবস্থায় আমাদের জ্ঞান যদি শরীরের সহিত সংযুক্ত না থাকিত তাহা হইলে শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য, শরীরের বর্দ্ধন এবং পোষণ-কার্য্য সকলই স্থগিত হইত। প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় আমাদের জ্ঞান যেমন প্রচ্ছন্ন-ভাবে শরীরাভ্যন্তরে বর্ত্তমান থাকিয়া শরীরের পুষ্টিসাধন-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, তরুলতাতে জ্ঞান সর্ব্বদাই সেই ভাবে অবস্থিতি করে। মনুষ্যের এমনও সমাধি অবস্থা দেখা গিয়াছে,যে অবস্থায় তাহার শরীরের পোষণ-ক্রিয়া শ্বাস-ক্রিয়া প্রভৃতি সকল ক্রিয়াই স্থগিত হইয়া যায় অথচ তাহার জ্ঞান শরীরাভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া শরীরকে জরার আক্রমণ হইতে অব্যাহত রাখে। মনুষ্য সর্ব্বতোভাবে তুষারাবৃত হইলেও কখন কখন ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই শেষোক্ত অবস্থায় মনুষ্যের জ্ঞান যেমন ঐকান্তিক প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করে, ধাতু প্রস্তরে জ্ঞান সর্ব্বদাই সেইভাবে অবস্থিতি করে। এই রূপ মত সর্ব্বাংশে সত্য হউক্ বা না হউক্, বিজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞান উভয়ে মিলিয়া ইহার স্থূল তাৎপর্য্যটির পোষকতা করিতেছে। উভয়ে মিলিয়া বলেন যে, ভৌতিক মনুষ্য (অর্থাৎ মনুষ্যের বাহ্য অবয়ব) হঠাৎ সৃষ্ট হয় নাই—যুগযুগান্তের কাল ব্যাপিয়া ভৌতিক-বস্তু আকার হইতে আকারান্তরে পদার্পণ করিয়া সর্ব্বশেষে মনুষ্যাকারে পরিণত হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞান বলেন যে, আধ্যাত্মিক মনুষ্য (অর্থাৎ জ্ঞান-ঘন আত্মা) হঠাৎ সৃষ্ট হয় নাই, প্রচ্ছন্ন ভাব হইতে উত্তরোত্তর অভিব্যক্তি লাভ করিয়া এই পরিশেষে সর্ব্বাঙ্গীনরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। বিজ্ঞান বলিতেছেন জগতের ক্রম পরিণাম-পদ্ধতি, এবং গর্ভস্থ মনুষ্যের ক্রম প্রজ্ঞা। আবার, প্রত্যেক বস্তুর এমনি পরিণাম-পদ্ধতি এপিট ওপিট বলিলে হয়। তত্ত্বজ্ঞান বলেন জগৎ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড মনুষ্য ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড; এমন কি মনুষ্য সমুদ জগতের নূতন সংস্করণ-স্বরূপ। মনুষ্যের জড়ভাব আছে, উদ্ভিদভাব আছে, পশু ভাব আছে, এবং তদ্ব্যতীত এমনি একটি বিশেষ ভাব আছে, যাহাতে সে আপনা সত্তাকে আপনি করতলে পাইয়া, সুনি শ্চিত প্রণালী অনুসারে আপনি আপনা উন্নতি সাধনকার্য্যে যত্নবান হয়। সে ভাবটি প্রজ্ঞার পরিস্ফুট ভাব। সৃষ্টির প্রথমা বস্থায় জগতে জড়-ভাবের প্রাদুর্ভাব-বশত প্রাণ মন অহঙ্কার প্রজ্ঞা, অভিভূত অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল। কাল-ক্রমে একটির পর আর একটি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে প্রজ্ঞা প্রাদুর্ভূত হইয়া নিম্নের সমস্ত ভাব গুলি সুচারুরূপে পরিচালনা করে। প্রজ্ঞার উন্মেষ হইলে আমাদের আপনার আপনার একটা চিরস্থায়ী স্বত্ব উপলব্ধি হয়, তাই আপনার উন্নতির প্রতি আমাদের যত্ন হয়। ভূমির উপর চিরস্থায়ী স্বত্ব জন্মিলে তবেই ভূমির উন্নতি সাধনে আমাদের মন যায়, তবে যায়—উহাও সেইরূপ। বিজ্ঞান সর্ব্ব জগতের মধ্যে বাহিরের মিল দেখিয়াই ক্ষান্ত থাকেন, তত্ত্বজ্ঞান ভিতরের মিল অন্বেষণ করেন। প্রত্যেক বস্তুই সমুদায় জগতের সর্ব্বসাধারণ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলে; প্রত্যেক বস্তুর

এই যে বিশেষ ভাব ইহাই অহংভাব। সন্নিধান-বর্ত্তী বস্তু সকলের প্রভাবে প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে ক্রিয়া জন্মে; এই যে আভ্যন্তরিক ক্রিয়াক্ষেত্র ইহাই মন। এবং প্রত্যেক বস্তুর যে বহিরাবরণ তাহা তাহার শরীর—কি না ইন্দ্রিয়-সমষ্টি। এইরূপ করিয়া দেখিলে সকল জগতের মধ্যে একটি নিগূঢ় ঐক্য উপলব্ধি হইতে পারে।

সামুদ্রিক জীব।

(প্রথম প্রস্তাব)

কীটাণু।

এই সমুদ্র, এই জলময় মহা মরুপ্রদেশ, যাহা মনুষ্যদিগের মৃত্যুর আবাস, যাহা শত শত জলমগ্ন অসহায় জলযাত্রীর সমাধি-স্থান, তাহাই আবার কত অসংখ্য জীবের জন্মভূমি, ক্রীড়াস্থল! স্থল-প্রদেশ এই জল-জন্তুদিগের তুলনায় কত সামান্য, কত ক্ষুদ্র। মিশ্লে (Michelet) কহেন, পৃথিবীতে জলই নিয়ম-স্বরূপ, শুষ্ক ভূমি তাহার ব্যতিক্রম মাত্র। পৃথিবীর এই চতুর্দ্দিক্-ব্যাপী, এই কুমেরু হইতে সুমেরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত মহাপরিখা যদি শুষ্ক হইয়া যায়, তবে কি মহান্, কি গম্ভীর দৃশ্য আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়, কত পর্ব্বত, কত উপত্যকা, সামুদ্রিক-উদ্ভিদ-শোভিত কত কানন কত ক্ষুদ্র ও প্রকাণ্ড জীব আমাদের দৃষ্টি-পথে পতিত হয়। এই সামুদ্রিক অরণ্যে কত প্রাণী ছুটিতেছে, সাঁতার দিতেছে, বালীর মধ্যে লুকাইতেছে, কেহবা বিশাল পর্ব্বতের গাত্রে লগ্ন হইয়া আছে, কেহবা গহ্বরে আবাস নির্ম্মাণ করিতেছে, কোথাও বা পরস্পরের মধ্যে মহা বিবাদ বাধিয়া গিয়াছে, কোথাও পরস্পর মিলিয়া স্নেহের খেলায় রত রহিয়াছে। আমাদের প্রসিদ্ধ কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় সমুদ্র বর্ণনা-স্থলে যে একটি লোম-হর্ষণ চিত্র দিয়াছেন তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

৪১

"যতই তোমার ভাব ভাবিহে অন্তরে,
ততই বিস্ময়-রসে হই নিমগন;
এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড যাহার উপরে,
না জানি কি কাণ্ড আছে ভিতরে গোপন!

৪২

আজি যদি আসি সেই মুনি মহাবল,
সহসা সকল জল শোষেন চুম্বুকে ;
কি এক অসীমতর গভীর অতল,
আচম্বিতে দেখা দেয় আমার সমুখে !

৪৩

কি ঘোর গর্জ্জিয়া উঠে প্রাণী লাখে লাখ,
কি বিষম ছট্ ফট্ ধড়ফড় করে ;
হঠাৎ পৃথিবী যেন ফাটিয়া দোফাক্,
সমুদয় জীবজন্তু পড়েছে ভিতরে।

৪৪

কোলাহলে পূরে গেছে অখিল সংসার,
জীবলোক দেবলোক চকিত স্থগিত ;
আর্ত্তনাদে হাহাকারে আকাশ বিদার
সমস্ত ব্রাহ্মাণ্ড যেন বেগে বিলোড়িত।

৪৫

আমি যেন কোন এক অপূর্ব্ব পর্ব্বতে
উঠিয়া দাঁড়ায়ে আছি সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় ;
বালুময় ঢালুভাগ পদমূল হ'তে
ক্রমাগত নেমে গিয়ে মিশেছে তলায়।

৪৬

ধুধু করে উপত্যকা, অতল অপার,
অসংখ্য দানব যেন তাহার ভিতরে,
করিতেছে হুড়াহুড়ি—তুমুল ব্যাপার,
মরীয়া হইয়া যেন মেতেছে সমরে।

৪৭

ফেরোগো ও পথ থেকে কল্পনা সুন্দরী
ওই দেখ যাদকুল নিতান্ত আকুল,
নিতান্তই মারা যায় মরুর উপরি,
হেরে কি অন্তর তব হয়নি ব্যাকুল ?

৪৮

সেই মহা জলরাশি আন ত্বরা ক'রে,
ঢেকে দাও এই মহা মরুর আকার,
অমৃত বর্ষিয়া যাক্ ওদের উপরে ;
শান্তিতে শীতল হোক্ সকল সংসার।"

ক্ষুদ্রতম অদৃশ্য কীটাণু হইতে বৃহৎ তিমি মৎস্য পর্য্যন্ত এবং আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ হইতে সহস্র হস্ত দীর্ঘ আল্‌জি (Algæ) নামক উদ্ভিদ পর্য্যন্ত এই সমুদ্রের গর্ব্ভে প্রতিপালিত হইতেছে। এই সমুদ্র-গর্ব্ভে যত প্রাণী আছে, স্থল-প্রদেশে তত প্রাণী নাই !

সমুদ্রে এক প্রকার অতি নিকৃষ্টতম শ্রেণীর প্রাণী দেখিতে পাইবে। তাহারা উদ্ভিজ্জ শ্রেণী হইতে এক সোপান মাত্র উন্নত। তাহাদের শারীর যন্ত্র এত সামান্য যে, সহসা তাহাদের প্রাণী বলিয়া বোধ হয় না। ইহাঁরাই পৃথিবীর প্রাণী সৃষ্টির মধ্যে আদিম সৃষ্টি বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। পৃথিবী যত প্রাচীন হইতে লাগিল, ততই জটিল শরীর-প্রকৃতি-বিশিষ্ট জীবের উৎপত্তি হইল। অবশেষে তাহার উৎকর্ষের সীমা মনুষ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ মনে করেন, এই খানেই আসিয়া শেষ হইল, আর অধিক অগ্রসর হইবে না, কিন্তু কে বলিতে পারে, এই মনুষ্যালয়ের উপর আর এক স্তর মৃত্তিকা পড়িয়া যাইবে না, ও এই মনুষ্য-সমাজের সমাধির উপর আর একটি উন্নততর জীবের উৎপত্তি হইবে না। পৃথিবীর প্রথম অবস্থায় উদ্ভিদ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, তাহার মধ্যে

প্রথমে আবার নিকৃষ্টতম উদ্ভিদের জন্ম হয়।

যদি কিয়ৎপরিমাণে জল খোলা জায়গায় কোন পাত্রে রাখিয়া দেওয়া হয়, তবে শীঘ্রই দেখা যায়, তাহার উপর পীত ও হরিৎবর্ণের অতি সূক্ষ্ম আবরণ পড়িয়াছে, অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যাইবে, সেগুলি আর কিছুই নহে, সহস্র সহস্র উদ্ভিদ্ পদার্থ ভাসিতেছে। তাহার পরেই সহস্র সহস্র কীটাণু দেখা যাইবে, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া সাঁতার দিতেছে ও সেই উদ্ভিজ্জ আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে। এই উদ্ভিদ পদার্থ যাহা আমরা অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত দেখিতে পাই না, তাহাই হয় ত তাহাদের নিকটে একটি বৃহৎ রাজ্য। পরে আর এক দল কীটাণু উত্থিত হইয়া প্রথমজাত কীটাণুদিগকে আক্রমণ করে, ও উদরসাৎ করিয়া ফেলে। প্রথমে উদ্ভিদ, পরে উদ্ভিদ-ভোজী জীব, তৎপরে মাংসাশী প্রাণী উৎপন্ন হয়।

কোন্ খানে উদ্ভিদ-শ্রেণী শেষ হইল ও জীব-শ্রেণীর আরম্ভ হইল, তাহা ঠিক নিরূপণ করা অতিশয় কঠিন। দেখা গিয়াছে যে, শৈবালের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে, অ্যাল্‌জি জাতীয় উদ্ভিদে, প্রাণি-জীবনের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান আছে; মনে হয় যেন তাহাদের চলনেন্দ্রিয় আছে। তাহাদের গাত্রে চলন-শীল যে সূক্ষ্ম সূত্র লম্বমান থাকে, তাহার দ্বারা তাহারা ইতস্ততঃ চলিয়া বেড়ায়, তাহা দেখিয়া সর্ব্বতোভাবে মনে হয় যেন তাহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক চলিয়া বেড়াইতেছে। কতকগুলি উদ্ভিদের অঙ্কুর এবং উদ্ভিদের উৎপাদনী আণবিক রেণুকণা (Fecundating corpuscles) জলে ভাসিবার সময় নিকৃষ্ট প্রাণীদিগের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে, আবার পুনরায় ফিরিয়া আসে ও পুনরায় সেদিকে ধাবমান হয়। এই রূপে আপাততঃ প্রতীয়মান হয়, যেন তাহাদের চেষ্টা করিবার ক্ষমতা আছে। ইহাদের সহিত যদি সামুদ্রিক কতকগুলি নিকৃষ্ট জাতীয় জীবের তুলনা করা হয়, তবে কাহারা উদ্ভিদ্ ও কাহারা প্রাণী তাহা স্থির করা দুষ্কর হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বোক্ত নিকৃষ্ট জাতীয় জীবদিগকে ইয়ুরোপীয় ভাষায় জুফাইট (Zoophyte) অর্থাৎ উদ্ভিদ্‌জীব বা উদ্ভিদ্-প্রাণী কহে। কারণ ইহাদের মধ্যে অনেকের বাহ্য আকৃতি উদ্ভিদের ন্যায়, তাহাদের শরীর হইতে উদ্ভিদের ন্যায় শাখা বহির্গত হয়, এবং তাহাদের কোন কোন অঙ্গ নানা বর্ণে চিত্রিত এবং দেখিতে পুষ্পের ন্যায়। প্রবালদিগকে দেখিতে অবিকল উদ্ভিদের ন্যায়, মৃত্তিকায় বা পর্ব্বতে তাহাদের মূল-দেশ নিহিত থাকে, এবং গাত্র হইতে শাখা প্রশাখা বহির্গত হয়, এবং তাহাদের রঙ্গিল অঙ্গগুলি কাল-বিশেষে অবিকল পুষ্পের ন্যায় আকার ধারণ করে। অষ্টাদশ শতাব্দী-পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা এই প্রবালকে নিঃসংশয়ে উদ্ভিদ্ বলিয়া গণ্য

করিয়া গিয়াছেন, সম্প্রতি ইহা প্রাণী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

এই নিকৃষ্টতম প্রাণীদিগের কি বুদ্ধি বা মনোবৃত্তি আছে? ইহা স্থির করা এক প্রকার অসম্ভব। প্রথমতঃ ইহারা প্রাণী কি উদ্ভিদ্, তাহাই কত কষ্টে স্থিরীকৃত হইয়াছে, এক্ষণে ইহাদের বুদ্ধি বা মনোবৃত্তি আছে কিনা তাহা স্থির করিতে বোধ হয় অনেক বিলম্ব লাগিবে। শুক্তিরা ত জন্মাবধি এক শৈলেই আবদ্ধ থাকে। কীটাণুরাও একটি মাত্র ক্ষুদ্রতম স্থান ব্যাপিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। (Amibæ) অ্যামিবি কীটগণ, মিনিটের মধ্যে যাহারা শত বার আকার পরিবর্ত্তন করে, তাহারা ত জীবন্ত পরমাণু মাত্র। ইহাদের বুদ্ধি ও মনোবৃত্তি আছে কিনা তাহা স্থির করা যে দুরূহ, তাহা বলা বাহুল্য।

উদ্ভিদ্‌জীবদিগের কঙ্কাল অতিশয় অপূর্ণ, স্নায়ুযন্ত্র অত্যন্ত অপরিস্ফুট। এই জাতীয় অধিকাংশ জীবের স্পর্শ ভিন্ন অন্য প্রকার অনুভূতি নাই, ইহারাই প্রাণি-জগতের শেষ শ্রেণীয় নিকৃষ্টতম জাতির অন্তর্ভূত। উদ্ভিদ্‌জীবেরা অনেক জাতিতে বিভক্ত।

লয়বেন হয়েক (Leuwenhoek) যখন অণুবীক্ষণ লইয়া সমুদ্রের এক বিন্দু জল পরীক্ষা করিতে গেলেন, তখন দেখিলেন, সেই এক বিন্দু জলের মধ্যে একটি নূতন জগৎ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সেই নূতন রাজ্যের অধিবাসীদিগের সংক্ষেপ বিবরণ পাঠ করা যাক্।

রিজোপডা (Rizopoda) বা শীকড়-পদ কীটগণের বিশেষ প্রকৃতির মধ্যে, উহাদের পাক যন্ত্র নাই,জলজ উদ্ভিদ্‌গণের ন্যায় উহাদের গাত্রে যে সূক্ষ্ম সূত্র থাকে তাহা দ্বারা চলা-ফিরা করে,নিজ শরীর ইচ্ছাক্রমে বর্দ্ধিত ও শাখা প্রশাখায় বিভক্ত করিতে পারে। সময়ে সময়ে দেখা যায়, শাখা প্রশাখায় বিভক্ত অঙ্গগুলি ক্রমে গুটাইয়া আসে,ও ক্রমে তাহাদের শরীরের মধ্যে মিলাইয়া যায়। মনে হয় যেন আপনার শরীর আপনিই ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। এই জাতীয় কীটেরা আবার অন্যান্য কীট এবং অন্যান্য জন্তুদিগের গাত্রে লগ্ন হইয়া প্রাণ ধারণ করে। অনেক জাতীয় রিজোপডা আছে, তন্মধ্যে দুই তিনটির বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে।

অ্যামিবি (Amibæ) নামক কীটাণুদিগের আঠাবৎ শরীর এমন স্বচ্ছ, এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রে রাখিয়া সময়ে সময়ে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহাদের শরীরের গঠন যে কি প্রকার তাহা কিছুই ভাবিয়া পাওয়া যায় না। অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে ইহারা এক বিন্দু জলের ন্যায়, কিন্তু মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ইহারা এত বিভিন্ন আকার ধারণ করে, যে ইহাদের আকৃতি কোন মতে নির্দ্ধারিত করা যায় না। ইহাদের শরীরে পাকযন্ত্র দেখা যায় না, তবে ইহারা কি করিয়া জীবন ধারণ করে? এই রূপ স্থির হইয়াছে, যে, খাদ্যদ্রব্য তাহারা শরীরের সহিত মিশাইয়া লয়। অণুবীক্ষণ দিয়া ইহাদের শরীরে মাঝে মাঝে উদ্ভিদের অংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহারা যেরূপ ইচ্ছামতে শরীর প্রসারিত ও কুঞ্চিত করিতে পারে, তাহাতে শরীরের সহিত খাদ্য মিশ্রিত করিবার ইহাদের অনেকটা সুবিধা আছে। কোন একটি উদ্ভিদাণুর উপরে নিজ শরীর প্রসারিত করিয়া পুনরায় কুঞ্চিত করিলে সহজেই তাহা তাহাদের শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়।

ফরামিনিফেরা (Foraminifera) নামক পূর্ব্বোক্ত জাতীয় আর এক প্রকার কীট আছে, তাহারা প্রায় চক্ষুর অদৃশ্য বলিলেও হয়. তাহাদের আয়তন এক ইঞ্চির ২ শতাংশ অপেক্ষা অধিক নহে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র কীটগণের দ্বারা কত বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছে, ভাবিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। পৃথিবীর অনেক স্থানের আবরণ কেবল মাত্র ইহাদেরি দেহে নির্ম্মিত হইয়াছে। আমাদের আবাস-গ্রহের তরুণাবস্থায় বোধ হয় এই কীটগণ অসংখ্য পরিমাণে সমুদ্রে বাস করিত। তাহাদের রাশীকৃত মৃত দেহে কত বৃহৎ পর্ব্বত সৃষ্টি হইয়া সমুদ্র-গর্ভ হইতে মাথা তুলিয়াছে। সমুদ্রের বালুকা অণুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, তাহাদের অর্দ্ধেক ইহাদের কঠিন গাত্রাবরণ। রুসিয়ার প্রকাণ্ড চূণের পর্ব্বতগুলি ইহাদেরি দেহে নির্ম্মিত। যে চা-খড়ির পর্ব্বত ফ্রান্স দেশস্থ শ্যাম্পেন হইতে ইংলণ্ডের মধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহা এই জীবদেহের স্তূপ মাত্র। যে চা-খড়ির দ্বারা প্রায় প্যারিসের সমগ্র ভূভাগ নির্ম্মিত, তাহা ইহাদেরি দেহ-সমষ্টি। এই কীট-সমষ্টির উপরে কত বিদ্রোহ, কত বিপ্লব, কত রক্তপাত হইয়া গেছে, ও হইবে। এই কীট-সমষ্টির উপর সভ্যতার উন্নততম প্রাসাদ নির্ম্মিত। প্রকৃত কথা এই যে, এই ক্ষুদ্র কীটগণের মৃতদেহ-রাশির উপরে জগতের আর এক জাতীয় উন্নততর কীটাণু ক্রীড়া করিতেছে!

ডর্ব্বিঞি (D'orbigny) তিন গ্র্যাম বালুকার মধ্যে চারি লক্ষ চল্লিশ সহস্র ফরামিনিফেরার গাত্রাবরণ পাইয়াছেন। ইহাদের কত দেহ যে পৃথিবীর ভূভাগের আয়তন বর্দ্ধিত করিতে নিযুক্ত হইয়াছে তাহা কল্পনারও অগম্য। ইহাদের স্তূপে অ্যালেক্‌জান্দ্রিয়ার বন্দর ক্রমশঃ পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, ইহাদের স্তূপে সমুদ্রের কত স্থানের তীরভাগ নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রবাল এবং অন্যান্য দুই একটি সামুদ্রিক পদার্থের ন্যায় ইহারাও সমুদ্রের মধ্যে অনেক দ্বীপ নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই চক্ষুর অদৃশ্য পদার্থ সমুদ্রের বিশাল উদর পূর্ণ করিয়া ক্রমে ক্রমে কিরূপে দ্বীপ ও পর্ব্বত সমূহ নির্ম্মাণ করে ভাবিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

ইহাদের দেহ আঠাবৎ পদার্থে নির্ম্মিত। স্বীয় গাত্রাবরণের মধ্য দিয়া ইহারা শাখা প্রশাখাবান্ অঙ্গ বহির্গত করে, এই অঙ্গ দ্বারা তাহারা চলা-ফিরা করিয়া থাকে। ইহাদের ঐ ক্ষুদ্রতম হস্তপদে আবার বিষাক্ত পদার্থ আছে। দেখা গিয়াছে, ইন্‌ফিউসোরিয়া (Infusoria) প্রভৃতি কীটের গাত্রে ইহাদের বিষাক্ত হস্ত লাগিলে তৎক্ষণাৎ তাহারা অচল হইয়া যায়। এই রূপে তাহারা শীকার করিয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র

কীটগণ নিষ্ঠুর মাংসাশী, ইহারা আবার কত কীটাণুর বিভীষিকা স্বরূপ। ইহারা আবার আপনাদিগের ক্ষুদ্র কীটাণু-রাজ্যে আক্রমণ করে, সংহার করে, কতই গোলযোগ করে। ডুজার্দ্যা (Dujardin) দেখিয়াছেন, ইহারা ইচ্ছা করিলে আপনার শরীর হইতে নূতন হস্তপদ নির্ম্মিত করিতে পারে, প্রয়োজন অতীত হইয়া গেলেই পুনরায় তাহা আপনার শরীরের সহিত মিশাইয়া ফেলে। ইহাদেরো শরীরে এপর্য্যন্ত পাকযন্ত্র দেখা যায় নাই। ইহাদের সুদৃশ্য গাত্রাবরণ নানা প্রকার। ইহাদের বিভিন্ন গাত্রাবরণ-অনুসারে ইহাদের জাতির ভিন্নতা নিরূপিত হয়।

সমুদ্রের নক্তালোকা (Noctiluca) নামক কীটের বিষয় দুই এক কথা বলা যাউক্। বাল্মীকি সমুদ্র বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে "স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শৈল। উহা অতল স্পর্শ। ভীম অজগরগণ গর্ভে লীন রহিয়াছে; উহাদের দেহ জ্যোতির্ম্ময়। সাগর-বক্ষে যেন অগ্নি-চূর্ণ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।" এখনকার নাবিকেরাও সমুদ্র ভ্রমণ করিবার সময়, সময়ে সময়ে দেখিতে পান, সাগর-বক্ষে যেন অগ্নিচূর্ণ প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে। দাঁড়ের আঘাতে এবং তরঙ্গের গতিতে তাহাদের উজ্জ্বলতা আরো বৃদ্ধি হইয়া উঠে। সমস্ত সমুদ্র যেন একটি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড বলিয়া বোধ হয়। কখন ভাঁটা পড়িয়া গেলে দেখা যায় পর্ব্বত-দেহে, সামুদ্রিক তৃণ-সমূহে ও তীর-ভূমিতে যেন আগুন লাগিয়াছে। বাল্মীকির সময়ে যাহা লোকে অজগরের দেহজ্যোতি বলিয়া মনে করিত, বৈজ্ঞানিকেরা অসংখ্য ক্ষুদ্র কীটের-দেহ নিঃসৃত ফস্‌ফরীয় আলোক বলিয়া জানিয়াছেন। সেই কীটদিগের নাম নক্তালোকা। ঝটিকা-মত্ত অন্ধকার রাত্রে রজত ফেনময় অধীর তরঙ্গের দ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া এই জ্বলন্ত কিরণ কি সুন্দর শোভাই ধারণ করে।

ইন্‌ফিউসোরিয়া (Infusoria) কীট অ্যামিবির ন্যায় পরিষ্কার বা লবণাক্ত, শীতল বা উষ্ণ সকল প্রকার জলেই বাস করে। সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ লয়্‌বেনহয়েক ইহাদের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা। এই চির-অস্থির কীটাণুগণ এত ক্ষুদ্র যে, একবিন্দু জলে ইহাদের কোটি কোটি বাস করিতে পারে। গঙ্গা প্রতিবৎসর এত ইন্‌ফিউসোরিয়া সমুদ্রকে উপহার দিতেছে যে তাহা একত্র করিলে ইজিপ্টের পিরামিড্ অপেক্ষা ছয় শত গুণ অধিক হয়। মরু প্রদেশে উৎকৃষ্ট জীবগণ বাস করিতে পারে না, কিন্তু সেখানেও ইহারা অসংখ্য পরিমাণে জীবন ধারণ করিয়া আছে। পৃথিবীর উচ্চতম পর্ব্বতের পরিমাণ অপেক্ষা গভীরতর সমুদ্র-তলদেশে এই অসংখ্য জীবিতকণা বাস করিতেছে। মনুষ্যের ন্যায় এই অদৃশ্য কীটাণুগণও এই মহান্ জগতের একটি অংশ। এই কীটাণুদিগকে জগৎ হইতে বাদ দাও, জগৎ এক বিষয়ে অসম্পূর্ণ হইল। এমন স্থান নাই, যেখানে ইহারা নাই। সমুদ্রে, নদীতে, পুষ্করিণীতে, এমন কি, আমাদের শরীরস্থ রসে ইহারা

সঞ্চরণ করে। অনেক স্থানে পৃথিবীর স্তর বহু দূর ব্যাপিয়া কেবল মাত্র ইহাদের দেহে নির্ম্মিত। ইহাদিগের দেহের নিমিত্তই গঙ্গা নীল প্রভৃতি নদীতীরস্থ কর্দ্দমে উর্ব্বরা শক্তি জন্মে। ইহাদের ক্ষুদ্রতম গাত্রাবরণ জমিয়া এক প্রকার প্রস্তর নির্ম্মিত হয়। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ কহেন—অনেক উচ্চ পর্ব্বত ইহাদেরি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র—বিন্দু জলে যাহারা কোটি কোটি বাস করিতে পারে—তাহাদের স্তূপে পর্ব্বত নির্ম্মিত হইয়াছে!

এই কীটাণুগণ, কেহ কেহ জলে, কেহ বা আর্দ্র শৈলে, কেহ কেহ বা অন্য জন্তুর শরীরে বাস করিয়া থাকে। এমন কি, স্ত্রীলোকের স্তন-দুগ্ধেও ইহাদিগকে পাওয়া গিয়াছে। পাঠকেরা যদি কেহ অণুবীক্ষণ দিয়া এই কীটাণুগণকে দেখিতে চান, তবে এক পাত্র জলে, ডিম্বের শ্বেতাংশ ফেলিয়া মুক্ত স্থানে রাখিয়া দিবেন, ইহাতে ফস্ফেট্ অফ্ সোডা বা কার্ব্বোনেট অফ্ সোডা অথবা নাইট্রেট কিম্বা অক্সালেট্স্ অফ অ্যামোনিয়া দিলে এই কীটাণুগণ অতি শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে।

এই কীটাণুদিগের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের প্রভেদ আছে। কিন্তু গর্ভ ভিন্ন অন্য কারণেও ইহারা জন্মলাভ করে। ইহাদের অসংখ্য সঙ্গিগণ হইতে একটি কীটাণুকে স্বতন্ত্র লইয়া যদি অনুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করা যায়, তবে দেখা যাইবে, ইহার দেহের মধ্যভাগ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, এবং ক্রমে নিম্ন প্রদেশে কতকগুলি চলনেন্দ্রিয়-সূত্র দেখা যাইতেছে। অবশেষে ক্রমশঃ ঐ কীট একেবারে দুই ভাগে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এবং এইরূপে দুইটি কীটের জন্ম হয়। বিচ্ছিন্ন অংশটিরও মুখ এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে যেমন "আত্মাবৈ জায়তে পুত্রঃ' এমন মনুষ্যের মধ্যে নহে। এইরূপে একটি ইন্‌ফিউসোরিয়া, যাহা কত যুগ পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, তাহারি খণ্ডাংশ হয়ত আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। দেখা গিয়াছে এক মাসের মধ্যে দুইটি কীটাণুর বিচ্ছিন্ন শরীরে ১০লক্ষ ৪৮সহস্র কীটাণু জন্ম লাভ করিয়াছে। ৪২ দিনে একটি কীটাণু-শরীর হইতে এককোটি ছত্রি শলক্ষ চল্লিশ সহস্র কীটাণু জন্মিয়াছে।

এই অতি ক্ষুদ্র কীটাণুর গাত্রেও আবার ক্ষুদ্রতর কীটাণু সঞ্চরণ করিতেছে, বৃহত্তর কীটাণুর গাত্র তাহার নিবাস ও আহার-স্থান। ঘণ্টাকতক মাত্র এই কীটাণুদিগের জীবন কাল। কিন্তু একটি আশ্চর্য্য দেখা গিয়াছে, যাহাতে বায়ু না পায় এমন করিয়া যত্নপূর্ব্বক ইন্‌ফিউসোরিয়াকে ঢাকিয়া রাখ, যতদিন পরেই হউক না কেন, গাত্রে এক বিন্দু জল লাগিলেই পুনরায় বাঁচিয়া উঠিবে। এইরূপে এই দুই ঘণ্টার জীব শতবৎসর মৃত থাকিয়া আবার মুহূর্ত্তে বাঁচিয়া উঠিতে পারে।

এই কীটাণুদিগের আর একটি আশ্চর্য্য প্রকৃতি আছে। ইহাদের শরীরের কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেও ইহারা মরিয়া যায় না। মৃত অর্দ্ধাংশ অদৃশ্য হইয়া যায়, আর জীবিত অংশটি যেন অতি নিশ্চিন্তভাবে

পুনরায় খেলা করিয়া বেড়ায়, যেন তাহার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই. অথচ সে হয়ত তাহার পূর্ব্ব শরীরের ষোড়শ অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে।

যে জলবিন্দুতে এই কীটাণুগণ সাঁতার দিয়া বেড়ায়, তাহাতে যদি অ্যামোনিয়া-সিক্ত একটি পালক ডুবান যায়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাদের গতি বন্ধ হইয়া যায়। চলিবার জন্য তাহারা হাত পা সঞ্চালন করিতে থাকে বটে কিন্তু চলিতে পারে না। ক্রমে তাহাদের শরীর গলিয়া যাইতে থাকে। আবার যদি তাহাতে ভাল জল দেওয়া যায়, তৎক্ষণাৎ, তাহাদের গলন বন্ধ হইয়া যায়, আবার অবশিষ্ট অংশ সুখে সাঁতার দিয়া বেড়ায়।

এক প্রকার ইনফিউসোরিয়া আছে, উদ্ভিদ অথবা প্রাণীগণের গলিত দেহে তাহাদিগকে পাওয়া যায়। কিন্তু যখনি অন্যান্য কীট তাহাদের স্থান অধিকার করে, তখনি তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়। অর্থাৎ অন্য জাতীয় কীটেরা তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। আবার যখন সেই সমস্ত দ্রব্য এমন পচিয়া যায় যে আর অন্য কোন কীট তাহাতে থাকিতে পারে না, তখন তাহারা পুনরায় আবির্ভূত হয়। দাঁতে যে শ্বেত পদার্থ আছে, তাহাতেও লয়বেনহয়েক্ এই কীটাণু দেখিতে পাইয়াছিলেন। অনেক রোগগ্রস্ত প্রাণীর শরীরস্থ রসেও ইহাদের বসতি। এক প্রকার ইন্‌ফিউসোরিয়া আছে, তাহার শরীর ক্ষুর ন্যায় পেঁচাল। ইহারা এমন আশ্চর্য্য বেগে ঘুরিতে থাকে যে, চোক দিয়া দেখা যায় না, এবং কেন যে অত বেগে ঘুরিতেছে তাহার কোন কারণ ভাবিয়া পাওয়া যায় না। আর এক প্রকার কীটাণু আছে, তাহাদের শরীর যেন তাহাদের নিজের নহে। ইহাদের অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কীটসমূহ ইহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়না করিয়া বেড়ায়, এবং ধরিতে পারিলেই তাহাদের গাত্রে চড়িয়া বসে, এবং বেচারীর সমস্ত রক্ত শোষণ করে, এবং রহিয়া বসিয়া তাহাকেও ভক্ষণ করিয়া ফেলে। উকুন বা ছারপোকার মত একটুতেই ইহাঁরা সন্তুষ্ট নহেন, যতক্ষণে সমস্ত আহার্য্য না ফুরাইয়া যায় ততক্ষণ ইহাঁরা ছাড়েন না। এ কীটাণুদের শুদ্ধ এই এক যন্ত্রণা নহে, আর এক প্রকারের কীটাণু ইহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছে, যেমন ইহারা কাছে আসে, অমনি তাহারা ইহার শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এবং অল্প সময়ের মধ্যে সে বেচারীর শরীরে ঘর-কন্না ফাঁদিয়া বসে, অবশেষে পুত্র পৌত্র লইয়া সুখে তাহার শরীর ভক্ষণ করিতে থাকে। একটি কীটাণুর শরীরের মধ্যে অমন পঞ্চাশটা ক্ষুদ্রতর ক্ষুদ্রতম কীটাণু পাওয়া গিয়াছে।

ভ—

করুণা।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আহা, বিষণ্ণ করুণাকে দেখিলে এমন কষ্ট হয় যে, ইচ্ছা করে প্রাণ দিয়াও তাহার মনের যন্ত্রণা দূর করি। কত দিন তাহাকে আর হাসিতে দেখি নাই। ভাল করিয়া আহার করে না, স্নান করে না, ঘুমায় না; মলিন, বিবর্ণ, ম্রিয়মান, শীর্ণ; জ্যোতিহীন চক্ষু বসিয়া গিয়াছে; মুখশ্রী এমন দীন, করুণ হইয়া গিয়াছে যে, দেখিলে মনে হয় না যে, এ বালিকা কখনো হাসিতে জানিত। ভবির হস্তে যাহা কিছু অর্থ ছিল সমস্ত প্রায় ফুরাইয়া গিয়াছে, কি করিয়া সংসার চলিবে, তাহার কিছুই ঠিক নাই। পণ্ডিত মহাশয়ের সাহায্যে কোন মতে দিন চলিতেছে।

নিধি স্বরূপের উল্লেখ করিয়া নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল "সে বাবুটি কি করে বলিতে পার?"

নরেন্দ্র—কেন, বল দেখি?

নিধি—ও লোকটিকে আমার ত বড় ভাল ঠেকে না।

নরেন্দ্র—কেন কি হইয়াছে?

নিধি—না কিছুই হয় নাই, তবে কি না—সে কথা থাক্,—বাবুটির বাড়ি কোথায়?

নরেন্দ্র—কলিকাতা।

নিধি—আমিও তাহাই ঠাওরাইয়াছিলাম, নহিলে এমন স্বভাব হইবে কেন?

নরেন্দ্র—কেন, কি হইয়াছে, বলই না।

নিধি—আমি সে কথা বলিতে চাহি না। কিন্তু উহাকে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দেও।

নরেন্দ্র অধীর হইয়া উঠিয়া কহিল—কি কথা. বলিতেই হইবে।

নিধি কহিল—যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার আর চারা নাই, কিন্তু সাবধান থাকিও, ও লোকটি আর যেন বাড়ির ভিতরের দিকে না যায়।

নরেন্দ্র।—সে কি কথা, স্বরূপ ত বাড়ির ভিতরে যায় নাই। নিধি—সেকি তোমাকে বলিয়া গিয়াছে? নরেন্দ্র অবাক্ হইয়া নিধির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিধি কহিল—আমিত ভাই আমার কাজ করিলাম, এখন তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর। নরেন্দ্র ভাবিল, এ সকল ত বড় ভাল লক্ষণ নয়। স্বরূপ কয়দিন ধরিয়া ভাবিয়াছে যে, করুণা তাহার জন্য একেবারে পাগল। একথা নিধি সহসা তাহাকে কেন কহিল? বুঝিল, নিশ্চয় করুণা তাহাকে দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছে। স্বরূপ ভাবিল, তবে আমিও তাহার প্রেমে পাগল, একথাওত তাহাকে জানানো উচিত। স্থির করিল, সুবিধা পাইলে নিজে গিয়া জানাইবে।

জ্যোৎস্না রাত্রি। ছেলেবেলা করুণা যেখানে দিনরাত্রি খেলা করিয়া বেড়াইত সেই বাগানের ঘাটের উপর সে শুইয়া

আছে, অতি ধীরে ধীরে বাতাসটি গায়ে লাগিতেছে। সেই জ্যোৎস্না রাত্রির সঙ্গে, সেই মৃদুবাতাসটির সঙ্গে, সেই নারিকেল বনটির সঙ্গে তাহার ছেলে বেলাকার কথা এমন জড়িত ছিল, যেন তাহারা তার ছেলে-বেলাকারই একটি অংশ। সেই দিনকার কথাগুলি, শ্মশানে বায়ু-উচ্ছ্বাসের ন্যায় করুণার প্রাণের ভিতর গিয়া হু হু করিতে লাগিল। যন্ত্রণায় করুণার বুক ফাটিয়া, বুকের বাঁধন যেন ছিঁড়িয়া অশ্রুর স্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

বাগানে আর দুই জন লোক লুকাইয়া আছে, নরেন্দ্র ও স্বরূপ। নরেন্দ্র চুপি চুপি স্বরূপের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছে, দেখিবে স্বরূপ কি করে। করুণা সহসা দেখিল একজন লোক আসিতেছে, চমকিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল "কেও?" স্বরূপ কহিল "আমি স্বরূপচন্দ্র। নিধিকে দিয়া যে কথা বলিয়া পাঠান হইয়াছিল তাহা কি স্মরণ নাই?" করুণা তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া চলিয়া যাইতেছে, এমন সময়ে নরেন্দ্র আর না থাকিতে পারিয়া বাহির হইয়া পড়িল। করুণা তাড়াতাড়ি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। নরেন্দ্র ভাবিল তাহাকে দেখিতে পাইয়াই করুণা ভয়ে পলাইয়া গেল বুঝি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

নরেন্দ্র কহিল "হতভাগিনি, বাহির হইয়া যা!" করুণা কিছুই কহিল না। "এখনি দূর হইয়া যা।" করুণা নরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নরেন্দ্র মহা রুষ্ট হইল, অগ্রসর হইয়া কঠোর ভাবে করুণার হস্ত ধরিল, করুণা কহিল 'কোথায় যাইব?' নরেন্দ্র করুণার কেশগুচ্ছ ধরিয়া নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করিতে লাগিল, কহিল "এখনি দূর হইয়া যা।" ভবি ছুটিয়া আসিয়া কহিল 'কোথায় দূর হইয়া যাইবে?' এবং স্মরণ করাইয়া দিল যে, ইহা তাহার পিতার বাটি নহে। নরেন্দ্র তাহাকে উচ্চতম স্বরে কহিল, 'তুই কি করিতে আইলি?' ভবি মাঝে পড়িয়া করুণাকে ছাড়াইয়া লইল, ও কহিল, "আমার প্রাণ থাকিতে কেমন তুমি করুণাকে অনূপের বাটি হইতে বাহির করিতে পার দেখি!" নরেন্দ্র ভবিকে যতদূর প্রহার করিবার করিল ও অবশেষে শাসাইয়া গেল যে 'পুলিষে খবর পাঠাইয়া দিইগে।' ভবি কহিল "ইহাতো আর মগের মুলুক নহে।"

নরেন্দ্র চলিয়া গেলে পর, করুণা ভবির গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "ভবি, আমাকে রাস্তা দেখাইয়া দে, আমি চলিয়া যাই।" ভবি করুণাকে বুকে টানিয়া লইয়া কহিল "সে কি মা, কোথায় যাইবে, আমি যত দিন বাঁচিয়া আছি, তত দিন আর তোমাকে কোন ভাবনা ভাবিতে হইবে না।" বলিতে বলিতে ভবি কাঁদিয়া ফেলিল। করুণা আর একটি কথা বলিতে পারিল না, তাহার বিছানার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, বাহুতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। সমস্ত দিন করুণা কিছু খাইল না, ভবি আসিয়া কত সাধ্য-সাধনা করিল, কিন্তু কোন মতে তাহাকে খাওয়াইতে পারিল না।

সমস্ত দিন ত কোন প্রকারে কাটিয়া গেল; সন্ধ্যা হইল, পল্লীর কুটীরে কুটীরে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালা হইয়াছে, পূজার বাড়িতে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতেছে। সমস্ত দিন করুণা তাহার সেই শয্যাতেই পড়িয়া আছে, রাত্রি হইলে পর সে ধীরে ধীরে উঠিয়া অন্তঃপুরের সেই বাগানটিতে চলিয়া গেল। সেখানে কতক্ষণ ধরিয়া বসিয়া রহিল, রাত্রি আরো গভীরতর হইয়া আসিয়াছে, পৃথিবীকে ঘুম পাড়াইয়া নিশীথের বায়ু অতি ধীর-পদক্ষেপে চলিয়া যাইতেছে, এমন শান্ত ঘুমন্ত গ্রাম যে, মনে হয় না, এ গ্রামে এমন কেহ আছে, যে এমন রাত্রে মর্ম্মভেদী যন্ত্রণায় অধীর হইয়া মরণকে আহ্বান করিতেছে!

করুণার বিজন ভাবনায় সহসা ব্যাঘাত পড়িল। করুণা সহসা দেখিল নরেন্দ্র আসিতেছে। বেচারী ভয়ে থতমত খাইয়া উঠিয়া বসিল। নরেন্দ্র আসিয়া অতি কর্কশ স্বরে কহিল, আমি উহাঁকে প্রতি ঘরে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, উনি কি না বাগানে আসিয়া বসিয়া আছেন! আজ রাত্রে যে ঘড়—বাগানে আসিয়া বসা হইয়াছে? স্বরূপ ত এখানে নাই?" করুণা মনে করিল, এইবার উত্তর দিবে, নিরপরাধিনীর উপর কেন নরেন্দ্রের এইরূপ সংশয় হইল, জিজ্ঞাসা করিবে, কিন্তু কি কথা বলিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না, নরেন্দ্রের ভাব দেখিয়া সে ভয়ে আকুল হইয়া একটি কথাও বলিতে পারিল না। নরেন্দ্র কহিল "আয়, বাড়িতে আর এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পাইবি না।" করুণা একটি কথাও কহিল না, কিসের অলক্ষিত আকর্ষণে যেন সে অগ্রসর হইতে লাগিল। একবার সে মনে করিল বলিবে, ভবির সহিত দেখা করিয়া যাই, কিন্তু একটি কথাও বলিতে পারিল না। গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিল, ব্যাকুল হৃদয়ে দেখিল, সম্মুখে দিগন্ত-প্রসারিত মাঠে জন প্রাণী নাই। মনে করিল, সে নরেন্দ্রের পায়ে ধরিয়া বলিবে, তাহার বড় ভয় করিতেছে, সে যাইতে পারিবে না, সে পথ ঘাট কিছুই চিনে না, কিন্তু মুখে কথা সরিল না; ধীরে ধীরে দ্বারের বাহিরে গেল; নরেন্দ্র কহিল, "কালি সকালে তোকে যদি গ্রামের মধ্যে দেখিতে পাই তবে পুলিষের লোক ডাকাইয়া বাহির করিয়া দিব।" দ্বার রুদ্ধ হইল, ভিতর হইতে নরেন্দ্র তালা বন্ধ করিল। করুণার মাথা ঘুরিতে লাগিল, করুণা আর দাঁড়াইতে পারিল না, অবসন্ন হইয়া প্রাচীরের উপর পড়িয়া গেল।

কতক্ষণের পর উঠিল, মনে করিল, ভবির সহিত একবার দেখা হইল না? কতক্ষণ পর্য্যন্ত শূন্য নয়নে বাড়ির দিকে চাহিয়া রহিল। প্রাচীরের বাহির হইয়া দেখিল, তাহার সেই বাগানের গাছ-পালা নীরবে দাঁড়াইয়া আছে, দেখিল, দ্বিতীয় তলের যে গৃহে তাহার পিতা থাকিতেন, যে গৃহে সে তাহার পিতার সহিত কত দিন খেলা করিয়াছে, সে গৃহের দ্বার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত; ভিতরে একটি ভগ্ন খাট পড়িয়া আছে, তাহার সম্মুখে নিস্তেজ একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। কত ক্ষণের পর নিশ্বাস ফেলিয়া

করুণা ফিরিয়া দাঁড়াইল। গ্রামের পথে চলিতে আরম্ভ করিল। কতক দূর গিয়া আর একবার ফিরিয়া চাহিল, দেখিল সেই বিজন কক্ষে একটি মাত্র মুমূর্ষু প্রদীপ জ্বলিতেছে। ছেলে-বেলা যাহারা করুণাকে সুখে খেলা করিতে দেখিয়াছে, তাহারা সকলেই আপন কুটীরে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। তাহাদের সেই কুটীরের সম্মুখ দিয়া ধীরে ধীরে করুণা চলিয়া গেল। আর একবার ফিরিয়া চাহিল, দেখিল তাহার পিতার কক্ষে এখনো সেই প্রদীপটি জ্বলিতেছে। সেই গভীর নীরব নিশীথে অসংখ্য তারকা নিমেষহীন স্থির নেত্রে নিম্নে চাহিয়া দেখিল—দিগন্ত প্রসারিত জনশূন্য অন্ধকার মাঠের মধ্য দিয়া একটি রমণী একাকিনী চলিয়া যাইতেছে।

বঙ্গসাহিত্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা এখন বঙ্গসাহিত্যের মহাকাব্যরূপ সমুচ্চ শিখরে আসিয়া পৌছিয়াছি। এখান হইতে নিম্নতর প্রদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস প্রভৃতির পদাবলীকে মৃদু-নিনাদিনী নির্ঝরিণী বলিয়া প্রতীতি হইতে থাকে এবং চৈতন্য দেবের ভক্ত কবিদিগের রচনাকে উপত্যকা-স্থিত অর্দ্ধস্ফুট বৃক্ষলতা-রাশি মনে হয়। এখানে সকলই মহান এবং বিস্তৃত; এখানে গাম্ভীর্য্য সৌন্দর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া এবং সৌন্দর্য্য বৈচিত্র্য দ্বারা রঞ্জিত হইয়া শিখরদেশের অতুল মহিমা বর্দ্ধিত করিতেছে। সকল দেশে এবং সকল ভাষাতে মহাকাব্যের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব। কারণ মহাকাব্য মাত্রেরই উদ্দেশ্য উচ্চ-ভাবের দৃষ্টান্ত দ্বারা মহৎ শিক্ষাপ্রদান, এবং বর্ণনা ও উদ্দীপনা দ্বারা হৃদয়কে গম্ভীর ও উচ্চতর ভাবে উত্তেজিত করা। এই দুইটি উদ্দেশ্য সাধন করিতে মহাকবিদিগকে দেশীয় পুরাণ হইতে সামাজিক রীতিনীতি পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া তন্মধ্য হইতে আদর্শ-প্রতিমা গঠন করিতে হয়, মনুষ্য-প্রকৃতির সবলতা ও দুর্ব্বলতা জ্বলৎ অক্ষরে বিবৃত করিতে হয় এবং স্বর্গমর্ত্ত্য পাতাল পরিভ্রমণ করিয়া সুখ দুঃখের শ্রেয়তা ও প্রেয়তা বিশদরূপে প্রকটিত করিতে হয়। ধর্ম্মের জয় এবং অধর্ম্মের পরাজয়—এই মহাসত্যটিই মহাকাব্যের পত্তন-ভূমিতে নিহিত থাকিতে চাই। এই সত্যের বিস্তৃত বর্ণনায় এক এক খানি মহাকাব্য—কবিতা ও কল্পনার অনন্ত ভাণ্ডার রূপে পরিণত হয়। কেবল রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিয়া দেখিলে এই সর্ব্ববাদী সত্যটি প্রতিপন্ন হইতে পারে।

কিন্তু এই দুই খানি গ্রন্থের একটি বিশেষত্ব আছে। ইহাদের তুলনায় অন্য সকল মহাকাব্য সঙ্কীর্ণতর বোধ হয়। এমন কি, জগদ্বিখ্যাত পাশ্চাত্য মহাকাব্যগুলিও ইহাদের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়। ব্যক্তিবিশেষের ক্রোধ বর্ণনা বা ব্যক্তিবিশেষের আংশিক দুর্দ্দশা বা বৃক্ষবিশেষের ফল ভক্ষণ লইয়া আমাদের রামায়ণের বা মহাভারতের আয়তন বর্দ্ধিত হয় নাই—দশ জন বা পঞ্চদশ জন লইয়া কাব্য-কার্য্য সম্পাদিত হয় নাই, দুএকটি মাত্র দেবতার সপক্ষতা বা বিপক্ষতার উপর মানুষিকী ঘটনার ফলাফল নির্ভর করে নাই, এবং পরিমিত স্থান ব্যাপিয়াও নায়ক নায়িকার ক্রিয়াকাণ্ড পরিসমাপ্ত হয় নাই। সুতরাং রামায়ণ এবং মহাভারতে কবির বর্ণনীয় প্রায় সকল সামগ্রীই আছে—বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগতের সমস্ত উপাদানই কল্পনার আলোকে আলোকিত হইয়া স্তরে স্তরে রাশীকৃত আছে, সাংখ্য-দর্শনের সূক্ষ্মতত্ত্ব হইতে একাদশীর মাহাত্ম্য পর্য্যন্ত কীর্ত্তিত আছে এবং গার্হস্থ্য সামান্য নিয়ম-প্রণালী হইতে রাজনীতির চূড়ান্ত রহস্য পর্য্যন্ত বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। হোমর বর্জিল বা মিল্‌টল গুটিকতক প্রধান প্রধান রসেরই অবতারণা করিয়াছেন,কিন্তু রামায়ণ বা মহাভারতের আদ্যোপান্তে স্থানে স্থানে সকল প্রকার রসেরই অবতারণা আছে। ইহা ব্যতীত, রামায়ণ ও মহাভারতের উচ্চ ধর্ম্মনীতি, সকল প্রকার মহাকাব্যের ধর্ম্মনীতি হইতে উৎকৃষ্ট। এই সকল কারণবশতই রামায়ণ ও মহাভারত ভারতের শ্মশান-ক্ষেত্রে আর্য্যদের চির-স্মরণীয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ-স্বরূপ আজও বিদ্যমান রহিয়াছে, এই সকল কারণবশতই বাঙ্গালা রামায়ণ ও মহাভারত বঙ্গজীবনের অপরিত্যজ্য প্রয়োজনের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে। কাশিদাসের মহাভারতের অগ্রে—কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রচারিত হয়, সুতরাং আমরাও অগ্রে রামায়ণের কথা কহিব।

মহাকবি কৃত্তিবাস যীশুখ্রীষ্ট জন্মিবার ১৬০০ বৎসর পরে বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু কোন্ সময়ে যে বাঙ্গালা রামায়ণ প্রচারিত হয় তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। যাহাই হউক, এই অবধি স্থির যে রামায়ণই বঙ্গসাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য। সুতরাং ইহার ভাষা কবিকঙ্কণের মত মধুর অথবা কাশিদাসের মত ওজস্বী নহে,ইহাতে বিদ্যাপতি বা চণ্ডিদাসের পদাবলীর ন্যায় হিন্দী বা ব্রজভাষার আধিক্য নাই এবং চৈতন্য-ভক্ত কবিদের কৃত কাব্যের ন্যায় ইহাতে প্রতি শ্লোকে গ্রাম্যতা দোষ বা যতিঃপতন বা নিরর্থক বাক্যাড়ম্বরও নাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণের উপন্যাসভাগ বিবৃত করিবার আবশ্যক নাই, কেন না, তাহা বঙ্গদেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতার জীবন-সূত্রে গ্রথিত আছে—কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এখনকার কৃতবিদ্য যুবকেরা পাশ্চাত্য সাহিত্য-মোহে মুগ্ধ হইয়া এবং অল্পশিক্ষিত কামিনী-কুল আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের বাগাড়ম্বরে প্রতারিত হইয়া রামায়ণ ও মহাভারতের প্রতি দারুণ ঔদাস্য প্রদর্শন করেন।

আমরা এই উভয় সম্প্রদায়ের মতামত সমালোচনা করিয়া কৃত্তিবাসের প্রকৃত গৌরব স্থাপনা করিতে চেষ্টা পাইব। মহাকাব্য মাত্রেরই প্রথম দ্রষ্টব্য সামগ্রীটি তাহার উপন্যাস ভাগ। এ স্থলে পাশ্চাত্য সাহিত্যের স্তুতিবাদকেরা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে রামায়ণের উপন্যাস-ভাগের ঘটনাবলীর তুলনায় ইলিয়াড্ বা ইনিড বা পারাডাইজ্ লষ্টের উপন্যাসের ঘটনাবলী স্বল্পতর এবং অকিঞ্চিৎকর। একিলিজের ক্রোধ হইতে হেক্টরের দাহ পর্য্যন্ত শুদ্ধ যে ঘটনাগুলি ইলিয়াডে আছে তাহা রামায়ণের এক লঙ্কাকাণ্ডের আয়তনও পূর্ণ করিতে পারে না। ইনিডে প্রকৃত প্রস্তাবে একটি রীতিমত উপন্যাসই নাই, কারণ ইনিডের অর্দ্ধেকই প্রায় গল্পারম্ভের পূর্ব্বে ইনিয়াস কি রূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন ও ভবিষ্যতে রোম-রাজ্য কিরূপ গরীয়ান্ হইবে সেই সব বর্ণনাতেই পরিপূর্ণ, আর অবশিষ্ট অর্দ্ধেক কেবল ডাইডোর উপাখ্যান ও টরনসের সহিত ইলিয়াসের যুদ্ধ ইত্যাদিতেই পর্য্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্যারাডাইজ্ লষ্টের গল্পটি ইনিড অপেক্ষা বিস্তীর্ণ ও মহত্তর, কিন্তু আড়ম্বর ও বর্ণনা পরিত্যাগ করিলে শুদ্ধ উপন্যাসটি রামায়ণের এক একটি কাণ্ডেতেই নিঃশেষিত হইয়া যায়।

কিন্তু দেশীয় সমগ্র মহাকাব্যের সহিত বিদেশীয় সমগ্র মহাকাব্যের তুলনা করা এখন অসাময়িক হইবে। রামায়ণ, কবিকঙ্কণ চণ্ডী ও মহাভারতের সমালোচনা না করিয়া শুদ্ধ রামায়ণ প্রসঙ্গে বিদেশীয় মহাকাব্যগুলির কথা উত্থাপন করা অথবা আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য অপেক্ষা পূর্ব্বতন সাহিত্য যে কি কি বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিল তাহা প্রদর্শন করা এখন যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে না। সুতরাং এ সকল মতামতের সমগ্র সমালোচনা এখন স্থগিত রাখিয়া কেবল রামায়ণের সহিত ইলিয়াডের তুলনা করিয়াই আপাততঃ নিরস্ত হইব। কেন না, ইলিয়াড্ যেমন গ্রীক্ ভাষায় প্রথম মহাকাব্য, বাল্মীকি রামায়ণও সেই রূপ সংস্কৃত ভাষায় প্রথম মহাকাব্য, এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণও তদ্রূপ বঙ্গসাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য। পূর্ব্বেই আমাদের বলিয়া রাখা উচিত যে, সংস্কৃত রামায়ণ ও গ্রীক্ ইলিয়াড আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে—আমরা কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও ইংরাজিতে অনুবাদিত ইলিয়াডের সমালোচনা করিব। তাহার কারণ এই যে প্রথমত আমরা বঙ্গসাহিত্যের বিষয় লিখিতেছি, দ্বিতীয়ত অনুবাদিত ইলিয়াড পড়িয়াই কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রতি কৃতবিদ্যদলের বিরাগ জন্মিয়াছে—তৃতীয়ত বাল্মীকি ও হোমরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিষয়ে কোন মীমাংসা করিতে আমাদের সামর্থ্য নাই। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এ কথা বলিতেও সঙ্কুচিত হইব না যে, কৃত্তিবাসের রামায়ণের সহিত ইংরাজিতে অনুবাদিত ইলিয়াডের তুলনা করিতে গেলে বাল্মীকির প্রতি অন্যায় ব্যতীত হোমরের প্রতি অন্যায় করা হইবে না, কেন না কৃত্তিবাসের রামায়ণ সংস্কৃত আদর্শের এক প্রকার অণুকরণ মাত্র, কিন্তু ইংরাজিতে

হোমরের অনেকটা অবিকল অনুবাদ আছে, সুতরাং ইংরাজি অনুবাদগুলিতে হোমরের প্রকৃত প্রতিমা যত দূর প্রতিবিম্বিত হইতেছে, কৃত্তিবাসের রামায়ণে বাল্মীকির প্রকৃত প্রতিমা তত দূর প্রতিবিম্বিত হয় নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইলিয়াডের উপন্যাসটি রামায়ণের উপন্যাস অপেক্ষা হ্রস্ব ও সংকীর্ণতর। সমস্ত গ্রীসদেশ যেরূপ আয়তনে ভারতবর্ষের একটি খণ্ডমাত্র, সমস্ত ইলিয়াড্ও সেইরূপ রামায়ণের একটি কাণ্ডমাত্র হইতে পারে। স্বীকার করি যে সংকীর্ণতা বা বিস্তীর্ণতার উপর লক্ষ্য করিয়া কবির কবিত্ব নিরূপিত হয় না, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, বহুল ঘটনাবলী কল্পনা-সূত্রে গ্রথিত করিয়া সমস্ত মহাকাব্যখানিকে একটি বিস্তৃত কল্পনা-রাজ্যে পরিণত করাও সামান্য কবিত্বের পরিচয় নহে। রামায়ণে ঘটনাবলী শুদ্ধ ঘটনাবলিরূপেই যদি বর্ণিত হইত তাহা হইলে আমরা এ কথা বলিতাম না, কিন্তু যখন দেখিতেছি যে প্রত্যেক ঘটনাবলী, প্রত্যেক ঘটনার ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত—অপূর্ব্ব কল্পনা-আলোকে আলোকিত, তখন ইলিয়াডের তুলনায় রামায়ণের বিস্তীর্ণতাই একটি বিশেষ সুখ্যাতির বিষয়। এই বিস্তীর্ণতা হেতুই আমরা রামায়ণে যত প্রকার ক্ষুদ্রতম হইতে মহত্তম প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং চণ্ডাল হইতে দেবতাসদৃশ মানব প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন চিত্র দেখিতে পাই, তাহার শতাংশের একাংশও ইলিয়াডে দেখিতে পাই না। এমন কি, উপন্যাসের সঙ্কীর্ণতা বশতই ইলিয়াডে মানব-প্রকৃতির অর্দ্ধাংশ যে নারী-প্রকৃতি—সেই নারী-প্রকৃতির সম্যক্ চিত্র আমরা দেখিতে পাই না। কৌশল্যার পুত্রবাৎসল্য বা কৈকেয়ীর স্বার্থপরতা, মন্থরার কুটিলতা বা সূর্পনখার নীচ লালসা, তারার তেজস্বিতা বা সরমার মমতা, মন্দোদরীর উদারতা বা সীতার সহিষ্ণুতা—এসকল চমৎকার চিত্র ইলিয়াডের আমরা কোথাও দেখিতে পাই না। সমস্ত ইলিয়াডে কোন নায়িকাই নাই। ইলিয়াডের চার পাঁচ স্থলে যেখানে স্ত্রীলোকের অবতারণা হইয়াছে, সেখানে রমণি-প্রকৃতির দুই তিনটি অঙ্গ মাত্র অতি সঙ্কীর্ণ ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে—কিন্তু তাহাতে কে সন্তুষ্ট হইতে পারে? উভয় মহাকাব্যের দেবদেবীর কথা আমরা এখানে কিছুমাত্র উল্লেখ না করিয়া কেবল মানব-প্রকৃতির চিত্র দেখিতেছি। এবং তাহা দেখিয়া কে না স্বীকার করিবে যে অশেষ প্রকার চিত্র প্রদর্শনে রামায়ণ অপেক্ষা ইলিয়াড নিকৃষ্টতর।

দ্বিতীয়তঃ—ইলিয়াডের উপন্যাসের অখণ্ডতা অপেক্ষা রামায়ণে উপন্যাসগত অখণ্ডতা বিশিষ্টরূপে রক্ষিত হইয়াছে। রামায়ণের উদ্দেশ্য রামের জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করা, সুতরাং রামের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনগত সকল ঘটনাই রামায়ণে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু ইলিয়াডের উদ্দেশ্য কি? কবি কাব্যের প্রারম্ভেই সরস্বতী-বন্দনা স্থলে বলিতেছেন—"হে দেবি! গ্রীকদিগের সকল বিপদের উৎসস্বরূপ

একিলিজের মহাক্রোধ বর্ণনা কর!" সুতরাং একিলিজের ক্রোধ বর্ণনা করাই ইলিয়াডের উদ্দেশ্য। কিন্তু সে ক্রোধের কারণ কি? একিলিজ-কর্ত্তৃক যুদ্ধে বন্দীকৃত সুরূপা ব্রাইসিসকে আগামেম্‌নন কাড়িয়া লইয়াছিলেন বলিয়াই আগামেম্‌ননের উপর একিলিজের মর্ম্মান্তিক ক্রোধ হয় এবং এই ক্রোধ ভরেই তিনি গ্রীকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে ট্রোজানেরা গ্রীকদিগকে ক্রমাগত যুদ্ধে পরাজিত করিতে লাগিল, শেষে গ্রীকেরা নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িলে তাহাদের প্রধান প্রধান রাজা ও মহৎ ব্যক্তিরা একিলিজকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অনুনয় করিতে গেল, কিন্তু তবুও একিলিজ ফিরিলেন না। তাহার পর তাহার প্রিয় সুহৃৎ প্যাট্রোকোলস ট্রোজান-যুদ্ধে নিহত হন। এই সংবাদে একিলিজ ক্রোধান্ধ হইয়া গ্রীকদলে ফিরিয়া গেলেন ও তাঁহার সুহৃৎ-হন্তা হেক্টরকে বধ করিলেন। একিলিজ যখন গ্রীকদলে ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার পূর্ব্ব-ক্রোধ-পাত্র আগামেম্‌নন্ তাঁহার নিকটে সকল দোষের মার্জ্জনা চাহিলেন ও ব্রাইসিস্‌কে প্রত্যর্পণ করিতে পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন। এই খানেই অর্থাৎ ঊনবিংশতি স্বর্গে উভয়ের আবার হৃদ্যতা সংস্থাপিত হইল। তবে আর বাকী পাঁচটি স্বর্গের আবশ্যকতা কই? যে ক্রোধ বর্ণনা করিতে কবি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সে ক্রোধের আরম্ভ হইতে উপশম পর্য্যন্ত সকল কথাইত বিবৃত করা হইল—তবে হেক্টরের মৃত্যু আমরা কোন্ প্রসঙ্গে ইলিয়াডে পাই? এইরূপ অপ্রাসঙ্গিক বলিয়াই হেক্টরের মৃত দেহ লইয়া একিলিজের জঘন্য ব্যবহার অধিকতর জঘন্য বোধ হয়। আগামেমননের উপর একিলিজের বিজাতীয় ক্রোধ লইয়া মহাকাব্য আরম্ভ হইল এবং নির্দোষী হেক্টরের দারুণ দুর্দ্দশা লইয়া মহাকাব্য সমাপ্ত হইল, এ কতদূর যুক্তি-সঙ্গত বলিতে পারি না।

তৃতীয়তঃ, উপন্যাসোক্ত ব্যক্তি বিশেষকে ধরিলেও ইলিয়াড্ অপেক্ষা রামায়ণের শ্রেষ্ঠতা প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এস্থলে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতি সমালোচনা করা আমাদের সাধ্যাতীত, আমরা কেবল ইলিয়াডের নায়ক একিলিজের সহিত রামের তুলনা করিয়া দেখিব। সকলে যদি এইটি স্বীকার করেন যে, মহাকাব্যের নায়ক কোন বিশেষ অথবা মহৎগুণের আদর্শস্থল হইবে, তাহা হইলে ইলিয়াডের নায়ক অপেক্ষা কোন মহাকাব্যের নায়ক আর নিকৃষ্টতর হইতে পারে না। সমরে দুর্দ্ধর্ষতা ব্যতীত একিলিজের আর কোন গুণই নাই। তিনি যেমন উদ্ধত তেমনি নৃশংস, যেমন নির্য্যাতন-প্রিয় তেমনি কোপন-স্বভাব। অনেকে বলিতে পারেন যে এ সকল গুণ বীরের গুণ, এ সকল গুণ একিলিজেই শোভা পায়। কিন্তু এ সকল গুণ বীরেতে শোভা পাইলেও হেক্টরের মৃতদেহ লইয়া একিলিজ যেরূপ চণ্ডালের ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা মনে করিতে গেলে তাঁহার প্রতি আর তিলমাত্র

ভক্তি হয় না। প্রকৃত বীর পুরুষ কখনই পরাজিত ও মৃত প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি সেরূপ ব্যবহার করিতে পারেন না। যে হেক্টরের অপ্রতিহত শৌর্য্যে গ্রীকেরা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল; গ্রীকদের ইন্দ্রাণী, বিশ্বকর্ম্মা এবং রণদেবী মিনর্‌বা সকলে মিলিয়া একিলিজকে সহায়তা না করিলে যে হেক্টর একিলিজের কাছে কখনই পরাভূত হইতেন না; একিলিজের নিকট যে হেক্টরের এইমাত্র অপরাধ হইয়াছিল যে তিনি স্বদেশ রক্ষার্থ স্বদেশ-বৈরি পেট্রকোলসকে ন্যায়-যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন, সেই হেক্টর আজ পরাভূত হইয়া একিলিজের হস্তে বন্দী হইয়াছেন এবং আসন্ন কালে বিজেতাকে কাতর স্বরে বলিতেছেন—"আপনার আত্মার দোহাই, আপনার জন্মদাতার দোহাই, আমার এই কাতর ভিক্ষার পবিত্রতার দোহাই, আপনি আমাকে আপনাদের গ্রীস্‌দেশীয় শৃগাল কুক্কুর দিয়া ভক্ষণ করাইবেন না, আমার পিতামাতার শোকশান্তি হেতু আমার অন্তিম সৎকার করাইবেন, তাঁহাদের বহুমূল্য উপহার সকলের বিনিময়ে আমার দেহের জন্য আমি যেন একটি ভস্মাধারও প্রাপ্ত হই এবং হেক্টরের দেহাবশেষ যেন হেক্টরের দেশেই নিহিত হয়।" এই কাতর উক্তির উত্তরে একিলিজ সদর্পে এবং সক্রোধে বলিলেন—"রে অভিশম্পাত-গ্রস্ত হতভাগ্য! তাহা কখনই হইবে না। আমার জন্মদাতার দোহাই, তোর কাতর ভিক্ষার পবিত্রতার দোহাই—আমি কোন দোহাই শুনিব না, এমন কি, আমার ইচ্ছা হয় আমার দেশীয় শৃগাল কুক্কুরের সঙ্গে আমিও তোর মৃত দেহ ছিন্ন-ভিন্ন করি। কিন্তু না, সেই শৃগাল কুক্কুরের হস্তেই তোর মৃতদেহ সমর্পণ করিব।" তাহার পর হেক্টরের মৃত্যু হইলে একিলিজ তাঁহার মৃতদেহ নিজ বিজয়-রথের চাকাতে বাঁধিয়া পেট্রকলসের সমাধিমন্দিরের চতুর্দ্দিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন। এই কি প্রকৃত বীরের উন্নত মন, এই কি প্রকৃত বীরের উদারতা! আমরা রামের প্রকৃতির সহিত একিলিজের প্রকৃতির তুলনা করিব না; কেন না, এমন দুই ভিন্ন প্রকৃতির মধ্যে কোনরূপ সৌসাদৃশ্য থাকিতেই পারে না। কিন্তু এস্থলে একটি বিখ্যাত লেখকের গুটিকতক কথা আমরা সমালোচনা না করিয়া থাকিতে পারি না। মনিয়র্ উইলিয়াম্‌স্ তাঁহার ভারতীয় মহাকাব্য প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "রামের চরিত্রে প্রায়ই কোন দোষ লক্ষিত হয় না, কিন্তু এই দোষ-শূন্যতাই আমাদের পক্ষে কণ্টকর। নানা দোষ-সম্বলিত হইলেও একিলিজের প্রকৃতি যে রামের প্রকৃতি অপেক্ষা কতদূর স্বাভাবিক তাহা বলা যায় না। হেক্টরের মৃতদেহ লইয়া একিলিজ যে কঠোর নৃশংস ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা সম্ভবপর, কিন্তু পরাজিত রাবণের প্রতি রাম যে উদার ব্যবহার করিয়া ছিলেন তাহা তত সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।"

পাশ্চাত্য সমালোচকের কথা আমরা শিরোধার্য্য করিতে পারিলাম না। স্বীকার করি যে হেক্টরের মৃত দেহের প্রতি একিলিজের আচরণ একিলিজের অনুরূপই হইয়া

ছিল, কিন্তু সমরশায়ী রাবণের প্রতি রামের ব্যবহার অস্বাভাবিক হইল কিসে?—একিলিজ যদি রামের মত কিম্বা রাম যদি একিলিজের মত পরাজিত শত্রুর সহিত ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে অস্বাভাবিকতার পরাকাষ্ঠা হইত সন্দেহ নাই; কিন্তু রাম যদি রামেরই মত ব্যবহার করেন তাহা হইলে অস্বাভাবিকতা কোথায়? এ কি কখন সম্ভবপর হইতে পারে যে, যে রামের সমস্ত হৃদয় ধর্ম্মভাব ও কোমলতায় গঠিত, তিনি দশাননকে পরাজিত করিয়া, আপনার কার্য্য সিদ্ধ করিয়া, সমস্ত লঙ্কা নিঃশত্রু করিয়া, সীতা উদ্ধারের পথ নিষ্কণ্টক করিয়াও আবার সেই দশাননের প্রতি কোনরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করিবেন? প্রকৃত ইতিহাসেই আমরা ত দেখিতে পাই যে, পরাজিত ক্যারাক্‌টেকসের প্রতি মহারাজ ক্লডিয়স কি উদারতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, পরাজিত পুরুরাজকে সেকন্দর শা কতদূর সম্মান করিয়াছিলেন, পরাজিত ফরাসীরাজ জন্‌কে বিজয়ী ব্লাক্ প্রিন্স কি রূপ বিনীত ভাবে সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন—সে দিনের পরাজিত লুই নেপোলিয়নকে প্রুসরাজা উইলিয়ম পর্য্যন্ত কিরূপে সমাদর করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়াও কি দশাননের প্রতি অমায়িক, প্রশান্ত, মমতাময় ও শাস্ত্রদীক্ষিত রামের ব্যবহার অস্বাভাবিক মনে হইতে পারে?—মনিয়র্ উইলিয়মস্ যাহাই বলুন না কেন, তাঁহার কথা আমরা অনুমোদন করিতে পারিলাম না।

রামায়ণের নায়ককে ছাড়িয়া দিয়া নায়িকা সীতা দেবীর প্রকৃতি আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যে শুদ্ধ ইলিয়াডে কেন, বোধ হয় কোন দেশের কোন কাব্যে সহিষ্ণুতা ও সতীত্বের এমন আর একটি মনোহারিণী প্রতিমা দেখিতে পাইব না। দুশ্চারিণী হেলেনের ত কথাই নাই—হেকুবা ও অ্যাণ্ড্রোম্যাকীর আভাস মাত্র আমরা ইলিয়াডে পাই, সুতরাং তাহাদের সমস্ত প্রকৃতি আমরা আলোচনা করিতেই অক্ষম—কিন্তু তাহা ব্যতীত অন্য স্থলে যে সকল নারী-প্রকৃতি আমরা দেখিতে পাই, তাহা সম্পূর্ণ সুন্দর হইলেও সীতা দেবীর সম্যক্ প্রতিরূপ হইতে পারে না। আত্মাভিমানিনী পেনিলাপি, পৌরুষিক আন্‌টিগণী বা ইলেক্‌ট্রা, পিতৃদ্রোহী ডেস্‌ডিমোনা বা লোভপরতন্ত্র ঈভের সহিত সীতা দেবীর তুলনা করিতে গেলে সীতা দেবীর উৎকৃষ্টতর প্রকৃতি আরও দেদীপ্যমান হয়! তিনি রূপে যেরূপ অসামান্যা, গুণেও তেমনি অদ্বিতীয়া।

চ—

তুকারাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তুকারাম তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ভারতী-প্রসাদ কিরূপে উপলব্ধি করিলেন তাহা পাঠকগণ তাঁহার নিজমুখ হইতেই শ্রবণ করিয়াছেন। লোকের বিশ্বাস এই যে, তুকারাম কবি-নামদেবের অবতার বিশেষ। মুকুন্দরাজ, জ্ঞানদেব, নামদেব, মহারাষ্ট্র দেশের আদি কবির মধ্যে পরিগণিত। নামদেবের মৃত্যুকাল শকাব্দ ১২৫৬ (খৃষ্টাব্দ ১৩২৮)। নামদেব ও তুকারামের সম্বন্ধে মহীপতি তাঁহার "ভক্তলীলামৃত" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে নামদেব শত কোটি অভঙ্গ রচনায় কৃতসঙ্কল্প হইয়া ৯৪ কোটি ৪৯ লক্ষ অভঙ্গ রচিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হয়েন; তিনিই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূরণ করিবার উদ্দেশে তুকারাম হইয়া পৃথিবীতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে তদনুসারে তুকারাম ৫ কোটি ১ লক্ষ ৩৪০০০ শ্লোক রচনা করেন কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তুকারাম-কৃত ৪,৬০০র অধিক সংখ্যক অভঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তুকারাম এই সকল অভঙ্গ অধিকাংশ বিঠোবা-মন্দিরে রচনা করিতেন। কবিতা রচনার উপযোগী আরও একটি বিজন স্থান তাঁহার মনোনীত ছিল—সে স্থানটি এখনো কোন ভ্রমণকারী দেহু দর্শনে গেলে তাঁহাকে "তুকার আশ্রম" বলিয়া দেখাইয়া দেওয়া হয়।

এই সময় "ভজন ও কথকতা" এই দুই দ্বার দিয়া তুকারামের কবিত্ব-শক্তি বিশেষ স্ফূর্ত্তি পায়। ছন্দোময় বাক্যে ঈশ্বরের ভজনার নাম "ভজন"। এই সকল স্থলে ভজন-কর্ত্তা স্বরচিত কবিতা অথবা সঙ্গীতাবলি গান করেন ও পরে শ্রোতৃবর্গ সমস্বরে সেই গানে যোগ দেন। এই সকল কবিতা ও গীতের অর্থ বুঝাইয়া ব্যাখ্যা করিবার রীতি নাই। এই রূপ ভজনের সময় তুকারাম হয়ত অগণ্য অগণ্য অভঙ্গ সদ্য সদ্য রচনা করিয়া গান করিতেন, তাহা কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়া থাকিবে। এই সকল অভঙ্গ লিপিবদ্ধ হইলে ইহাদের সংখ্যা প্রবাদ-অনুযায়ী কোটি না হউক, নিদান-পক্ষে লক্ষেও পৌঁছিতে পারিত। তুকারামের অভঙ্গ জনসমাজে সমাদৃত ও প্রখ্যাত হইবার অপর এক উপায় "কথকতা"। মহারাষ্ট্র দেশে ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা ও ব্যাখ্যানের এক প্রধান সাধন কথকতা। ইহাতে কথক দেববন্দনাদি পাঠ করিবার পরে কোন একটি কবিতা কিম্বা বচন অবলম্বন করিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করেন। নানা গ্রন্থ হইতে উপদেশ প্রদান ও মধ্যে মধ্যে গল্প ইতিহাস ও কথাচ্ছলে শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করত কবিতাটির মর্ম্ম তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া কথকতার উদ্দেশ্য। সঙ্গীত কথকতার এক প্রধান অঙ্গ। কথক

কাব্য অথবা পুরাণাদি গ্রন্থ হইতে যে সকল কবিতা ও বচন পাঠ করেন তাহা শ্রোতৃগণ তাঁহার পশ্চাতে আবৃত্তি করেন। মহারাষ্ট্রে কথকেরা বহুমানাস্পদ ও তাঁহাদের উপদেশ সাধারণ জনসমাজে ধর্ম্ম-প্রচারের বিশেষ উপযোগী। এই রূপ বক্তৃতা যতদূর ফলোপধায়ী হইতে পারে তুকারামের মুখে তাহার চতুর্গুণ ফল প্রসব করিত সন্দেহ নাই; কেননা তুকারামের বক্তৃতা কেবল মুখের নয়—তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে তাহা নিঃসৃত হইত। তাঁহার পবিত্র চরিত্র—অকৃত্রিম ঈশ্বর-ভক্তি ও বিনা মূল্যে উপদেশ প্রদান—এই সকল কারণে তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বিশেষ রূপে আকৃষ্ট হইত।

তুকারামের কীর্ত্তি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দুষ্ট লোকের বিষদৃষ্টিও তাঁহার উপর নিপতিত হইল। কিন্তু তিনি যে সমূহ কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি মুহ্যমান হইবার নহেন, প্রত্যুত অগ্নি-পরীক্ষিত কাঞ্চনের ন্যায় তাঁহার স্বাভাবিক সাধুতা, সরলতা, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, নিস্পৃহতা আরো অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। শূদ্র হইয়া তিনি বেদোদ্বোধন করেন—গুরুর ন্যায় ধর্ম্মোপদেশ দেন—লোকেরা ভক্তি-ভরে তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে—ইহা ব্রাহ্মণদের চক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। লোকের দোষ কি, তাহারা ব্রাহ্মণ শব্দের যথার্থ অর্থ অনুসারে শূদ্র তুকারামকেও ব্রাহ্মণের ন্যায় সেবা করিতে লাগিল; এমন কি, তুকারামের জীবনের শেষভাগে এক উচ্চকুলের ব্রাহ্মণ-পরিবার যাঁহারা গণেশের অবতার বিশেষ বলিয়া পরিচিত ছিলেন তাঁহারা তুকারামের সহিত একাসনে আহার করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। এই সকল কারণে ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে কাহারো কাহারো দ্বেষ ও ঈর্ষা জ্বলিয়া উঠিল ও তাঁহারা তুকারামের প্রতি বৈরসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। দেহু-গ্রামে মম্বাজী নামে এক জন গোঁসাই বাস করিতেন—তাঁহার হস্ত হইতে তুকারামের উপর অত্যাচারের প্রথম সূত্রপাত হয়। বিঠোবা-মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে মম্বাজীর একটী বাগান ছিল, তাহা তিনি কাঁটা-গাছের বেষ্টন দিয়া ঘিরিয়া লইলেন। একাদশীর দিন দেহুর এক উৎসবের দিন—সে দিন বিঠোবা-মন্দিরে লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। তুকারাম দেখেন যে এই সকল কাঁটাগাছে লোকদিগের প্রদক্ষিণ-স্থান পর্য্যন্ত অধিকৃত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া তিনি স্বহস্তে তাহা উৎপাটিত করিয়া স্থান পরিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ইহাতে মম্বাজী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই সকল কণ্টক-যষ্টি দিয়া তুকারামকে উত্তম মধ্যম বিলক্ষণ প্রহার করিলেন। তুকারাম ঐ প্রহারকের প্রতি বিন্দু মাত্র কোপ প্রকাশ না করিয়া তাঁহার নিত্য নিয়মিত কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিলেন, যেন কিছুই হয় নাই। অবশেষে তিনি তাঁহার শত্রুর উপর জয়ী হইলেন। "অসাধুং সাধুনা জয়েৎ" এই উপদেশ মত কার্য্য করিয়া সে জয় লাভ করিলেন। তুকারাম নিম্নলিখিত শ্লোকাবলীতে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

৩৫৫

ছাড়িব না ছাড়িব না, ছাড়িব না হে বিঠোবা তোমারি চরণ।
যতই যন্ত্রণা আসে, আসুক কি করিবে সে, না হয় হইবে মরণ।
শস্ত্রধারী আসি কেহ, খণ্ড করে যদি দেহ, তবু নাহি ডরি।
তুকা বলে "সাবধান, হোয়ে আছি আগুয়ান, চিতে মোর শমগুণ ধরি"।

৩৫৬

বেস বেস বড় ভাল, বিঠোবা হে কল্লে ভাল, শাপে বর দান।
ক্ষমাগুণ শেখাবারে, হানিলে এ দেহোপরে কণ্টকের বাণ।
কটু কাটব্য গালি, মোর পৃষ্ঠে দিলা ঢালি, তাহে পাই প্রাণ—
তুকাবলে "কৃপাকরি, সংহারিয়া ক্রোধ-অরি দিলে পরিত্রাণ"।

৩৫৭

তরিনু তরিনু দেব তরালে আমায়,
অদৃষ্টে যা ছিল ভাল, তাই মোর তাই হল, কি বলিব হায়!
যতনে সরল চিতে, কাঁটা তুলি নিজ হাতে, পথের আটক।
"কত সহি" তুকা বলে, "নাশি কিন্তু রিপুদলে, হৈনু নিষ্কণ্টক।

এরূপ সহিষ্ণুতার ফল অচিরেই ফলিল। মম্বাজীর ক্রোধানল আপনাপনি নিবিয়া গেল ও তিনি তুকারামের প্রতি বিরক্তি ভাব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুরক্ত ভক্তের মধ্যে গণ্য হইলেন।

পুণার নিকটবর্ত্তী বাঘোলী গ্রামস্থ রামেশ্বর ভট্ট নামক আর একজন ব্রাহ্মণ তুকারামের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। তিনি তুকারামের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অমূলক অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাঁহার প্রতি গ্রামাধিকারীদিগের বিদ্বেষ জন্মাইয়া দিলেন ও দেহুর পাটেলের নিকট হইতে তাঁহার গ্রামবহিষ্করণের এক অনুজ্ঞাপত্র বাহির করিলেন। তুকারাম মহা বিপদে পড়িয়া এই রূপে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

কি করিব কোথা যাব, গ্রামে লই কাহার শরণ?
গাঁয়ের মণ্ডল, করে গণ্ডগোল, কার কাছে জুটি ভিক্ষা মাগি গো এখন।
নিয়ম ভঙ্গ দোষে, দোষী করে রোষে, আদালতে নিয়ে চলি, বলিয়া শাসায়,
মিলে লোকগুল, বুঝাইল ভুল, লাভে হতে ভিখারীর অন্ন মারা যায়।
এহেন অসৎ সঙ্গে রহিব না আর—
তুকা বলে "চল যাই, পাণ্ডু রঙ্গ দ্বার।"

রামেশ্বর ভট্ট তুকারামকে তাঁহার হীন জাতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বহুবিধ তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া কবিতা রচনা করিতে একেবারে নিষেধ করিলেন। তুকারাম বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন—"আমি অল্প স্বল্প যাহা কিছু রচনা করিয়াছি সকলই পাণ্ডুরঙ্গের আদেশে, কিন্তু দেখিতেছি ব্রাহ্মণের আদেশও আমার শিরোধার্য্য, অতএব আপনার আজ্ঞানুসারে এখন হইতে আমি কবিতা রচনায় বিরত হইলাম—যে সকল

কবিতা আজ পর্য্যন্ত বিরচিত হইয়াছে তাহার কি করা যাইবে মহাশয় অনুমতি করুন।" রামেশ্বর ভট্ট তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী জলমগ্ন করিবার আদেশ করিলেন। তুকারাম অগত্যা তাহাতে সম্মত হইয়া দেহুতে গিয়া বিঠোবা দেবের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তৎপরে তাঁহার গ্রন্থ দুই প্রস্তর ফলকের মধ্যে রাখিয়া কাপড়ে যত্নে বাঁধিয়া নিজ হস্তে ইন্দ্রায়ণী নদীতে নিক্ষেপ করিলেন। পরে লোকেরা আসিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিল "সন্ন্যাসি জি—আগে একবার তুমি খাতাপত্র নদীতে ডুবাইয়া সংসার ডুবাইয়া দিলে—এখন আবার তোমার কবিতাগুলি নদীতে ডুবাইয়া পরমার্থও ডুবাইলে—তোমার একূল ওকূল দুকূলই গেল।" এই সকল কথা তুকারামের বক্ষে বজ্রপাত তুল্য আঘাত করিল। তিনি অন্নপান পরিত্যাগ করিয়া বিঠোবা মন্দিরের প্রাঙ্গণে পড়িয়া রহিলেন ও যে পর্য্যন্ত তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ না হয় সে পর্য্যন্ত উঠিবেন না নিশ্চয় করিলেন। এই রূপে ত্রয়োদশ দিবস অতিবাহিত হইল।

তাঁহার আসন্ন কাল উপস্থিত—শত্রুদের উল্লাসের আর সীমা রহিল না। তাহারা মনে মনে কত দর্প করিতে লাগিল—এবার আর এই শূদ্রটার মুখ হইতে বেদবাণী শুনিতে হইবে না। কিন্তু স্বয়ং বিঠোবা তুকারামের সহায়—তাঁহার অভঙ্গ সহজে বিলুপ্ত হইবার নয়। ত্রয়োদশ দিবসে তাঁহার গ্রন্থ নদীর উপর ভাসিয়া উঠিল ও লোকেরা তাহা তুকারামের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল। এই উপলক্ষে তিনি যে সকল শ্লোক রচনা করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

২২৪২

অন্যায় করিনু ঘোর—মরমে বিঁধিছে অনিবারে,
লোকের গঞ্জনা শুনে, কত কষ্ট দিলেম তোমারে।
মোর দুখ ভাগী তুমি, মূঢ়মতি দীন আমি,
অনাহারে অনিদ্রায় তের দিন রহি
মম দুখে দুঃখী ক'রি তোমারে,শরমে মরি—
তাই গো দ্বিগুণ জ্বালা সহি।
আমার মরণ দায় ফেলি তব শিরে,
কাজেই বাঁচাতে তাই হলো মুমূর্ষুরে।
জল মধ্যে গ্রন্থ খানি ক'রে সংরক্ষণ,
তুকা বলে নিজ ভক্তে করিলে রক্ষণ।

২২৪৩

কৃপাময়ী মা আমার অনাথ শরণ,
বালকের বেশে মোরে দিলে দরশন।
প্রকাশি সগুণ মূর্ত্তি শান্ত কর চিতে,
আলিঙ্গন দিয়ে পরে তারিলে ভকতে।
বন্ধুর সহায় দিয়ে, সাধু সঙ্গে মিলাইয়ে,
উদ্ধার করিলে মোরে সব দুঃখ হতে।
তুকা বলে "অশরণে, ক্ষমাকর গো জননী—
যাচি কর পুটে।
মরিলেও তোমারে মা, আর কভু ফেলিব
না এহেন সঙ্কটে।

২২৪৪

সহিব অবাধে আমি সহস্র পীড়ন,
ফেলুক বিপদে ঘোর যতই দুর্জ্জন।
তোমায় আমার লাগি ফেলিব না দায়ে,

আমায় রেখ গো মাতা তব পদচ্ছায়ে।
এবার করেছি দোষ আমি যে চণ্ডাল,
জলে আগুলিয়ে গ্রন্থে রাখিলে কৃপাল।
মন্দমতি সে সময়ে না কৈনু বিচার,
তোমারে ডাকিতে মোর কিবা অধিকার।
জানি না আমি হে দেব কেমনে মহতে
আমার এ ক্ষুদ্র ভার কহি গো বহিতে।
হবার যা হয়ে গেছে বৃথা এ শোচনা,
তুকা বলে "জানিলাম ভবিষ্য-যোজনা"।

২২৪৫

কি জানিবে পাণ্ডুরঙ্গ, তব অন্ত এপামর,
কি না তুমি কর দেব, যদি ধৈর্য্য ধরে নর।
আমি অতি মূঢ়মতি উতলা হইনু,
তবু কৃপানিধি তব আশ্রয় লভিনু।
দেবের তুমি হে দেব, জীবের জীবন,
কেন তবে করি মোরা বৃথায় ক্রন্দন!
তুকা কহে সকাতরে—"পতিত এ জন,
তব দ্বারে ধন্না দিনু—অন্যায় কেমন।"

২২৪৬

কেন এত ডাকিলাম হরি হরি করি,
আঘাত কি করেছিল, পিঠে তীব্র ছুরি।
রোয়ে তুমি দুই ঠাঁই জলে আর স্থলে,
রক্ষণ করিলে গ্রন্থে তুকারে বাঁচালে।
মা-বাপে তাড়ান্ হেরি একটু অন্যায়,
তুমি কিন্তু কত সও কি বলিব হায়।
তুকা কহে "কৃপাময় কেমনে বাখানি,
তোমা হেন হিতকারী—নাহি মোর বাণী।"

২২৪৭

মা হতে মায়ালু তুমি, চাঁদ হতে তুমিহে শীতল।
তোমাতেই, আহা মরি বাস করে প্রেম সুনির্ম্মল।
তুমিত পুরুষোত্তম, উপমা কোথায়।
তোমার নামের গুণে পাপী ত'রে যায়।
অমৃত সৃজিলে নিজে তা হতে মধুর,
তব সৃষ্টি পঞ্চভূত এই বিশ্বাঙ্কুর।
স্তব্ধ হয়ে নমে প্রভু তুকা তব পায়,
অপরাধ ক্ষমা কর এই ভিক্ষা চায়।

২২৪৮

দুর্গুণ অন্যায়ী আমি কত আর ক'ব,
বিঠ্ঠল আশ্রয় দেহ, আর কি চাহিব।
জানি গো যে এসংসার—দুস্তর ভয়াল,
থাকিতে না পারি ইথে তিষ্ঠে ক্ষণকাল।
বাসনার যে তরঙ্গ করে কত রঙ্গ,
সে কল্লোলে পড়ি যদি শান্তি হয় ভঙ্গ,
তুকা বলে "পাণ্ডুরঙ্গ, তুমিই ভরসা,
বিরাজি হৃদয়ে মোর ঘুচাও দুর্দ্দশা।"

দেহুতে এই সকল ঘটনা হইতেছে—এদিকে তুকা-বিদ্বেষী রামেশ্বর ভট্টের দুর্দ্দশার পরিসীমা নাই। প্রবাদ এই রূপ যে, পুণার অনঘড্ নামক ফকীরের একটা পাতকুয়া ছিল, রামেশ্বর ভট্ট এক দিন তাহার জলে স্নান করিয়া দেখেন যে তাঁহার শীতল হওয়া দূরে থাকুক—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছে; বোধ হইতে লাগিল যেন তাঁহার শরীর অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ হইতেছে—অনেক দিন এই রূপ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিবার পর তাঁহার স্বপ্ন হইল যে তুকারামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা এ রোগের এক মাত্র ঔষধ। তুকারামের গ্রন্থোদ্ধারের কথাও ঐ সময় তাঁহার শ্রবণ-গোচর হইল।

অবশেষে তাঁহার কৃতাপরাধের জন্য বিস্তর অনুতাপ করিয়া তুকারামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তুকারাম তাহার এই উত্তর দেন—

১৭৫১

চিত্তশুদ্ধি হলে পরে শত্রু হয় মিত্র,
বাঘে নাহি খায় সাপে না দংশায়, এমনি বিচিত্র।
বিষ সে অমৃত, বিপদ সম্পদ, অনীতি সেও হয় নীত।
দুঃখ অমঙ্গল, প্রসবে শুভফল, অগ্নি-জ্বালা হয় প্রশমিত।
প্রাণীতে প্রাণীর টান, ভাবে সবাই সমান,
এই ত গো স্বাভাবিক রীত।
তুকা বলে "তোমাপরে তুষ্ট নারায়ণ,
অনুভবে তাহা তুমি বুঝিলে এখন।"

এইক্ষণ অবধি রামেশ্বর ভট্ট তুকারামের এক জন পরম ভক্ত শিষ্য হইলেন—বিদ্বেষ অনুতাপে পরিণত হইল—যাঁহাকে শূদ্র বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন, তাঁহাকে দেবতা রূপে পূজা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে তাঁহার বোধগম্য হইল যে "ভগবন্ত জনের কোন জাতি নাই—যেমন শালগ্রাম প্রস্তর হইয়াও পূজার্হ, সেই রূপ ঈশ্বরানুরাগী পুণ্যাত্মার প্রতি নীচ জাতির দোষ অর্শে না। দশগ্রন্থী বৈদিক পণ্ডিতেরা শাস্ত্র পুরাণ ভগবদ্গীতা প্রত্যহ পাঠ করেন কিন্তু তাঁহারা সে সকলের সার অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই কলিযুগে ব্রাহ্মণেরা কর্ম্মকাণ্ডের কুচক্রে ও জাত্যভিমানে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। তুকা সামান্য ব্যবসায়ী বণিক নহেন—তিনি বিঠোবার চরণদাস—তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী ভক্ত ও ত্যাগী পুরুষ আমি পৃথিবীতে আর কোথাও দেখি নাই*।" এই রূপ তুকার প্রতি রামেশ্বর ভট্টের ভাব আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইল ও তিনি যে সকল কবিতা জলমগ্ন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন তাহা নিজ হস্তে লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

নদী হইতে তুকারামের গ্রন্থোদ্ধার ও রামেশ্বর ভট্টের বৈর-মোচনের পর তুকারাম এই সমস্ত অত্যাচার হইতে এক প্রকার অব্যাহতি পাইলেন। তাঁহার পবিত্র চরিত্র ও অকৃত্রিম দেবভক্তির জন্য তাঁহার নাম মহারাষ্ট্রময় প্রচারিত হইল। তাঁহার সুখ্যাতি মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবাজির শ্রুতিগোচর হওয়াতে তিনি তাঁহাকে স্বহস্তে এক পত্র লিখিয়া মহাসমারোহে রাজসভায় আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। এই স্থলে বলা উচিত যে শিবাজীর ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল ও তিনি রামদাসের শিষ্য বলিয়া প্রকাশ্যরূপে পরিচিত ছিলেন। কথিত আছে যে তিনি স্বকীয় রাজ্য রামদাসের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহা পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করত রামদাসের প্রতিনিধি রূপে শাসন কার্য্য আরম্ভ করেন—এই হেতু সন্ন্যাসীরা যে গেরুয়া বসন পরিধান করে মহারাষ্ট্রীয় জয়পতাকা সেই বর্ণের কাপড়ে প্রস্তুত হইত। তুকারামকে

*রামেশ্বর ভট্ট তুকারামের স্তুতি বিষয়ক যে কয়েকটি অভঙ্গ রচনা করিয়াছেন তাহাতে এই রূপ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

রাজভবনে আনাইবার জন্য তাঁহার নিকট লোক জন অশ্ব রথ রাজ-ছত্র প্রভৃতি অনেক সরঞ্জাম প্রেরিত হইয়াছিল কিন্তু তুকারাম মহারাজের আমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন না—তিনি সেই সকল সরঞ্জাম ফিরাইয়া দিয়া শিবাজী ও তাঁহার মন্ত্রীগণকে এক উপদেশ, পূর্ণ ছন্দোময় পত্র লেখেন তাহা নিম্নে অনুবাদিত হইল।

১৮৮৪

ভাল নাহি বাসি ছত্র ঘোটক মশাল,
ইথে কেন জড়াইছ আমারে ভূপাল!
ধন মান আড়ম্বর বড় ঘৃণা করি—
এ বিপদ হোতে মোরে রক্ষা কর হরি!

১৮৮৫

ভাল যা' না বাসি তাই চাও সঁপিবারে,
এ সঙ্কটে কেন সদা ফেলিছ আমারে?
সঙ্গী ও সংসার হতে অতি দূরে থাকি,
কথা নাহি ক'ব আর, রহিব একাকী।
মান দম্ভ লোকাচার ঘৃণা করি অতি,
এসব তোমারি থাক্ হে পাণ্ডরি-পতি।

১৮৮৬

ব্রহ্মা এ ব্রহ্মাণ্ড রাজ্য করিয়া প্রকাশ,
বিচিত্র শক্তির তাঁর করিলা আবাস।
পত্র প'ড়ে মনে হয় ভক্তি তব দড়,—
সুচতুর, বুদ্ধিমান গুরুভক্ত বড়।
লোকের ভাগ্যের সূত্র আছে তব হাতে,
"শিব" এই পুণ্য নাম সেজেছে তোমাতে।
করি ধ্যান আরাধনা যাগ যজ্ঞ আর,
স্ববশে এনেছ তুমি হৃদয় তোমার।
সাক্ষাৎ করিতে তুমি চেয়েছ রাজন,
উত্তরে মিনতি মম করহ শ্রবণ।
হীনশ্রী, অরণ্যবাসী, আসক্তি-বিহীন,
বস্ত্রাভাবে মলিন-কায়, অন্নাভাবে ক্ষীণ,
জীর্ণ হস্ত পদ অতি দেখিতে কুৎসিত,
আমারে দেখিয়া তুমি না হইবে প্রীত।
তুকা বলে "এই মম মনের কামনা,—
মোরে দেখিবার কথা বলোনা বলোনা।"

১৮৮৭

আমি যে তোমারে করি এতেক মিনতি,
জানিহ হরির কৃপা আছে তোমা প্রতি।
পাণ্ডুরঙ্গ পদে যার মন আছে লীন,
নহে সে কৃপার পাত্র নহে দীন হীন।
পাণ্ডুরঙ্গ রক্ষাকর্ত্তা সহায় আমার,
ছাড়ি তাঁরে অন্য কারে নাহি মানি আর।
তোমারে দেখিয়া মোর কি হইবে ফল,
সংসার-বাসনা যবে ছেড়েছি সকল।
বিসর্জ্জন করি দিয়া সব বাসনায়,
পেয়েছি নিবৃত্তি-গ্রাম অল্প খাজনায়।
পতিব্রতা যেই প্রেম রাখে পতি পরে,
মন মোর সেই মত বিঠোবার তরে।
বিঠ্ঠলি সমস্ত বিশ্ব আর কিছু নাই,
তোমার মধ্যেও তাঁরে দেখিবারে পাই।
তোমারে বিঠ্ঠল আমি করিতাম জ্ঞান,
অন্তরায় হল তায় তব পত্রখান।
রামদাস রয়েছেন সদ্‌গুরু অতি,
মন স্থির এক মাত্র কর তাঁর প্রতি।
মন যদি ধায় তব ভিন্ন ভিন্ন দিশে,
তাঁর পর ভক্তি তবে স্থির রবে কিসে।
তুকা কহে "শুন ওগো বুদ্ধির আগার!
ভক্তি এক মাত্র হয় ভক্তের উদ্ধার।"

১৮৮৮

যাইয়া তোমার কাছে কি হবে আমার,
মিছামিছি কষ্ট শুধু হইবেক সার।

খাবার অভাব হয় খাব ভিক্ষা কোরে,
বস্ত্র চাই ছিন্ন বস্ত্র আছে পথে পোড়ে।
শয্যা মোর পোড়ে আছে পথের পাষাণ,
আকাশেরে বস্ত্র করি, করি পরিধান।
বল তবে আর করি কিসের প্রত্যাশ,
বাসনা সে জীবনেরে করে শুধু হ্রাস।
রাজার প্রাসাদে যায় মানের আশায়,
কহ দেখি মোরে, সেথা শান্তি পাওয়া যায়?
মহতেরই তরে শুধু রাজার আলয়,
ক্ষুদ্র যে তাহার সেথা মান্য নাহি হয়।
বসন ভূষণ আদি আভরণ যত,
দেখা সে আমার পক্ষে মরণের মত।
এই কথা শুনি তব রোষ যদি হয়,
তবু হরি মোর পরে র'বেন সদয়।
হীনত্ব না ঘুচে করি যজ্ঞ উপবাস,
যত দিন মন রহে বাসনার দাস।
তুকা কহে লোক মাঝে তোমাদের মান,—
আমরা যে হরি-ভক্ত—দৈব-ভাগ্যবান।

১৮৮৯

এই এক মাত্র যোগ করিও সাধন,—
যাহা ভাল তাহা ঘৃণা কোরোনা কখন।
যে কাজ করিলে হয় দোষ সংঘটন,
এমন কাজেতে মন দিওনা কখন।
দুর্জ্জন নিন্দুকে যদি করে যুক্তি দান,
তাদের কথায় কভু দিয়ো নাক' কান।
রাজ্যের রক্ষক কেবা করিও নির্দ্ধার,
পরীক্ষা তাদের করি বিচার অবিচার।
কি জানাব রাজা তুমি জানিছ সকল,
শরণ লভয়ে যেন অনাথ দুর্ব্বল।
এই যে মিনতি মোর রাখ যদি মনে,
সন্তুষ্ট হইব তাহে কি ফল দর্শনে।
কি সন্তোষ হবে বল সাক্ষাৎ হইলে,
দিন দিন আয়ুক্ষীণ, কবে যাবে চ'লে।
দুই এক কাজ মাত্র সার বোলে জানি,
আপনার ভ্রমে আমি রহিব আপনি।
এই এক সার কথা জানহ কল্যাণ,
একই আত্মা সর্ব্ব ভূতে রহেন সমান।
আত্মারাম নিরঞ্জনে রাখ সদা মন,
পূজ্য গুরু রামদাসে দেখহ আপন।
তুকা কহে"ধন্য ধন্য তুমিহে ভূপতি—
ত্রিলোক ব্যাপিয়া রহে তব কীর্ত্তি ভাতি।"

১৮৯০

চতুর মান রক্ষক তুমি প্রতিনিধি,*
সত্ত্বগুণনিধি তোমা করেছেন বিধি।

*সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য শিবাজী আটজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

পেশোয়া অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী। মোরেশ্বর ত্রিম্বল পিংলে (ডাকনাম মোরোপন্থ) শিবাজীর পেশোয়া ছিলেন।

মজুমদার।—ইনি রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারী—ইহাঁকে সমস্ত হিসাব-পত্র তদারক করিতে হইত, সুতরাং ইহাঁর কার্য্যভার অতিশয় গুরুতর ছিল। কল্যাণী প্রদেশের সুবেদার আবাজী সোনদেও শিবাজীর মজুমদার ছিলেন।

সুর্ণীস।—ইনি দফ্তরদার ও পত্রব্যবহার (Correspondence)বিভাগের কর্ত্তা। ইহাকে সমস্ত চিটি পত্র দেখিতে শুনিতে হইত। সমস্ত দলিল দস্তাবেজ ইঁহার খাতায় লেখা থাকিত। ইনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া দিলে তবে সে সমস্ত মঞ্জুর হইত। আনাজি দত্তো শিবাজীর সুর্ণীস ছিলেন।

বাক্কানীস্—এই কর্ম্মচারীকে শিবাজীর নিজের দৈনিক বিবরণ ও চিটি পত্র রাখিতে হইত। শিবাজীর গৃহরক্ষক সৈন্যদল ও

শুন হে মজুমদার লেখনী-নিপুণ,
জানিবে পত্রের তুমি যত গুণাগুণ।

গার্হস্থ্য সমস্ত ব্যাপারের তত্ত্বাবধান-ভার ইঁহার উপর। এই কাজে দত্তোজি পন্থ নিযুক্ত ছিলেন।

সর্ণোবৎ অশ্বারোহী সৈন্যের অধ্যক্ষ ও ইয়েসজি কঙ্ক পদাতিক দলের অধ্যক্ষ ছিলেন।

ডবীর—বৈদেশিক রাজকর্ম্মচারী। বিদেশীয় দূতগণের অভ্যর্থনা ও বিদেশীয় অপরাপর রাজকার্য্যের ইনি তদারক করিতেন। সোমনাথ পন্থ শিবাজীর ডবীর ছিলেন।

ন্যায়াধীশ অর্থাৎ বিচারপতি। নীরাজি রাওজি এবং গোমাজি নায়ক ন্যায়াধীশ ছিলেন।

ন্যায়শাস্ত্রী—স্মৃতি ও অন্যান্য শাস্ত্রের ব্যাখ্যা-কর্ত্তা। ধর্ম্ম, দণ্ড, বিজ্ঞান ও রাজ্য সম্বন্ধীয় জ্যোতিষী গণনার ভার ইঁহার উপর ছিল। প্রথমে শম্ভু উপাধ্যায়—পরে রঘুনাথ পন্থ শিবাজীর ন্যায়শাস্ত্রী হন।

ন্যায়াধীশ এবং ন্যায়শাস্ত্রী ব্যতীত উক্ত প্রত্যেক কর্ম্মচারীকেই সেনা-নায়কতা করিতে হইত, এই জন্য সর্ব্বদা তাঁহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য কাজে মনোযোগ দিতে পারিতেন না। এই হেতু তাঁহাদের প্রত্যেকের এক এক জন কারবারী অর্থাৎ সহকারী ছিল। প্রত্যেক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর অধীনে আট জন কনিষ্ঠ কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিত। তাহাদের নাম—

১ দেওয়ান অথবা কারবারী।
২ মজুমদার—হিসাব পত্র পর্য্যবেক্ষক।
৩ ফর্ণবীস—ডেপুটি হিসাব-তদারককর্ত্তা।
৪ সবনিস্—দফ্তরদার।
৫ কর্কনিস (Commissary)
৬ চিটনিস—পত্র-ব্যবহার সম্পাদক।
৭ জামদার—নগদ টাকা ভিন্ন আর সকল মূল্যবান্ সামগ্রী ইহার হস্তে থাকিত।
৮ পোটনিস—খাদাঞ্চি।

পেশোয়া সুর্নিস আর চিট্ নিস্ ডবীর,
রাজাজ্ঞা সুমন্ত আর সেনাপতি বীর।
তুমি হে পণ্ডিত রায় ভূষণ সভার,
বৈদ্যরাজ আদি সবে জান নমস্কার।
তোমরা পত্রের অর্থ জানিয়ে অন্তরে,
বিচার করিয়া তাহা বল নৃপতিরে।
সাত্ত্বিক প্রণয় ভরা দৃষ্টান্তের কথা,
যা কহিনু যেন তার না হয় অন্যথা।
মহারাজে যথাস্থিত দিও এ সন্দেশ,
বাক্যের স্বরূপ অর্থ ক'য়ো সবিশেষ।
ভয়ে ভয়ে বুঝাও হে যদি বিপরীত,
তাহা হ'লে তোমাদেরি হইবে অহিত।
তুকা কহে "নমস্কার অধিকারিগণ—
জানাইবে মহারাজে, এই নিবেদন।

তুকারামের পত্র পাঠে শিবাজী কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া বরং সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন—এমন কি, তিনি নিজে সেই সাধুর আলয়ে গিয়া তাঁহার দর্শনেচ্ছু হইলেন। তখন তুকারাম দেহুর নিকটবর্ত্তী লোহ গ্রামে বাস করিতেছিলেন—মহারাজ স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া বহুমূল্য মণিমানিক রত্নাদি আনিয়া তাঁহাকে উপহার দেন কিন্তু তুকারাম সে সমুদয় তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দিলেন—বলিলেন "মহারাজ রজত কাঞ্চন আমার চক্ষে মৃত্তিকা-সমান—এ সকল বস্তুতে আমার লোভ হয় না। আমাদের মোহ ও আশার অন্ত হইয়াছে—আমি হরির দাস, হরিই আমার আশ। মহারাজ তুমি ভগবদ্ভক্ত হইয়া প্রজাপালনে নিযুক্ত থাক, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব।"

শিবাজী তুকারামের নিস্পৃহতা ও দেব-

ভক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। মহীপতি বলেন যে, মহারাজা তুকারামের সাধু দৃষ্টান্ত ও সৎসর্গগুণে সংসারের প্রতি এরূপ বীতরাগ হইয়াছিলেন যে তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। শিবাজীর মাতাঠাকুরাণী জিজাবাই এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র ব্যাকুল অন্তরে তুকারামের নিকট গমন করিয়া আপনার একটী মাত্র পুত্রকে সদুপদেশ দ্বারা সংসারে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিস্তর মিনতি করিলেন। তুকারাম কহিলেন "ভয় নাই, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।" রাত্রিকালে সংকীর্ত্তনের সময় শিবাজী রাজা সমাগত হইলে অবসর বুঝিয়া তুকারাম তাঁহাকে উপদেশ দিলেন যে, যাহার যে ধর্ম্ম তাহা পালন করা তাহার কর্ত্তব্য—তদ্ভিন্ন পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই। তিনি বলিলেন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মই প্রজাপালন, তাহা ছাড়িয়া মহারাজের সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করা কখনই উচিত নহে। এই উপদেশ পাইয়া শিবাজীর বিষয়-বৈরাগ্য দূর হইল এবং তিনি তাঁহার মাতার সঙ্গে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন।

অনন্তর শিবাজী তুকারামের সহিত একবার পুণায় গিয়া সাক্ষাৎ করেন। তথায় এক দিন তিনি তুকারামের কথকতা শ্রবণ করিতেছেন এমন সময় চাকন-দুর্গ রক্ষক এক জন মুসলমান সরদার তাহার সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য এক দল পাঠান সৈন্য প্রেরণ করেন। মুসলমান-ইতিহাসে এই রূপ কথিত আছে যে পাঠানেরা আসিয়া একত্রিত লোকের মধ্যে কে শিবাজী তাহা চিনিতে পারে নাই। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কোন এক জন লোককে পলায়নোদ্যত দেখিয়া শিবাজী-অনুমানে শত্রুদল তাহার পশ্চাতে ধাবমান হয়। এই অবসরে শিবাজী তথা হইতে অপসরণ পূর্ব্বক তাঁহার সিংহগড় দুর্গে গিয়া উপস্থিত হন। হিন্দুদিগের বিশ্বাস এই যে, তুকারামের পুণ্য ও প্রার্থনা-বলে শিবাজী শত্রুর চক্রান্ত হইতে রক্ষা পান।

শ্রীস—

ইংরাজদিগের আদব্-কায়দা।

ইংরাজদিগের এবং ইয়ুরোপীয় অন্যান্য দেশের আদব্-কায়দার কাছে আমাদের দেশের আদব্-কায়দা ঘেঁসিতেও পারে না। ইয়ুরোপে সকলি যেমন যন্ত্রে নির্ব্বাহিত হয়, তেমনি হৃদয়ের ভাবও ইয়ুরোপীয়েরা এমন যন্ত্রবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে, দুঃখ না হইলেও তাহারা দুঃখ প্রকাশ করিতে পারে, হাসি না পাইলেও হাসিতে পারে। ভদ্রতার ভাব হইতে যে সব নিয়ম প্রসূত তাহাকেই ত আদব্ কায়দা বলে? তোমার নিয়ম বাঁধা থাক্ বা না থাক্, যাহারা ভদ্র তাহারা কখনো অভদ্রতা করিতে পারে না। তাহারা স্বাভাবিক অবস্থায় পরের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে

তাহাই ভদ্রতা। আমাদের হিন্দুজাতির অত আইন কানুন নাই, অথচ স্বাভাবিক ভদ্রতার ভাব এমন আর কোথাও দেখিবে না। আমাদের দেশে ত এত নিয়মের বাঁধা-বাঁধি নাই, তবুও ত মনিয়র উলিয়াম্স্ কহিয়াছেন, ভারতবর্ষের ছোট লোকেরাও এমন ভদ্র, শান্ত, প্রভুভক্ত, যে ইয়ুরোপে তাহার তুলনা পাইবে না। ইংরাজদিগের আচার ব্যবহার আমাদের কাছে অনেক কারণে নূতন ও আমোদজনক লাগিবে।

ইংলণ্ডে প্রণামের স্থলে যেক্-হ্যাণ্ড করিবার সময় স্ত্রীলোকেরাই প্রথম হাত বাড়াইয়া দেন। তোমার অপেক্ষা মান মর্য্যাদায় যিনি বড় তাঁহার প্রতি তুমি প্রথমে হাত বাড়াইতে বা গ্রীবা নত করিতে পার না। যাহাদের সঙ্গে তুমি আলাপ পরিচয় রাখিতে ইচ্ছা কর না, তাহারা যদি তোমাকে প্রকাশ্যে অভিবাদন করে, তবে তুমি ফিরাইয়া না দিতেও পার। কিন্তু ইংরাজি আদব্-কায়দাজ্ঞ ব্যক্তি কহেন—তাহা অপেক্ষা অভ্যস্ত-উপেক্ষার সহিত তাহার প্রণাম ফিরাইয়া দেওয়াই ভাল। কিন্তু তাই বলিয়া কোন পুরুষ কোন অবস্থায় স্ত্রীলোকের অভিবাদন উপেক্ষা করিতে পারেন না। স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিলে কোন পুরুষকে ওরূপ উপেক্ষা করিতে পারেন কিন্তু কোন অবিবাহিতা স্ত্রী বিবাহিতা স্ত্রীর অভিবাদন ওরূপ অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। যদি কোন ব্যক্তি নিমন্ত্রণ-সভায় কোন মহিলাকে বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন, তাঁহার সহিত অধিক গল্প করিয়া থাকেন বা আহার-স্থানে হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া থাকেন, তবে তাহার পর দিন কোন প্রকাশ্য স্থানে দেখা হইলে সে মহিলা সে ভদ্র লোকটির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ গ্রীবা নত করিতে পারেন। অনেক সাহেব ভারতবর্ষীয়দের অভিবাদন, মাথা কাঁপাইয়া বা টুপি ছুঁইয়া মাত্র ফিরাইয়া দেন, কিন্তু ভাল আদব্ কায়দা অমন হোমিওপ্যাথিক-মাত্রায় প্রণাম করিতে পরামর্শ দেন না, সম্পূর্ণ রূপে টুপি না খুলিয়া যদি অভিবাদন করিতে চাও, তবে তাহার চেয়ে না করাই ভাল। যাহার সহিত যেক্-হ্যাণ্ড্ করিতে চাও, তাহার সহিত দেখা হইলে বাম হস্তে টুপি খুলিতে হইবে ও ডান হস্তে যেক্হ্যাণ্ড্ করিতে হইবে। পথে আসিতে আসিতে কোন পরিচিতা মহিলা যদি তোমার সম্মুখে আসিয়া পড়েন, তবে কথা কহিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার পথ বন্ধ করিও না, যেদিকে তিনি যাইতেছেন তাহা তোমার গম্য পথের বিপরীত দিক হইতে পারে, কিন্তু মহিলার পাশে পাশে সে দিকেই তোমার যাওয়া উচিত, পরে কথা শেষ করিয়া তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা করিও। যে মহিলার সহিত তুমি কথা কহিবে না, তাঁহার সহিত যদি দেখা হয়, তবে, তিনি যদি ডান দিকে থাকেন তবে বাম হস্তে বা যদি বাম দিকে থাকেন তবে ডান হস্তে টুপি খুলিতে হইবে অর্থাৎ যে হস্ত মহিলা হইতে অধিক দূর, সেই হস্তে টুপি খুলিতে হইবে। ঘোড়ায় চড়িয়া যাইবার সময় যদি কোন পদাতিক মহিলার

সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবে ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহার লাগাম ধরিয়া মহিলার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া কথা কহিবে, ঘাড় উঁচু করিয়া কথা কহিবার কষ্ট যেন মহিলাকে না দেওয়া হয়। কোন মহিলার সঙ্গে সঙ্গে চলিবার সময় তাঁহার হস্তে পুস্তক প্রভৃতি যাহা কিছু থাকিবে তাহা তুমি বহন করিবে। যদি চুরট খাইতে খাইতে পথে আইস, তবে কোন মহিলার সহিত কথা কহিতে হইলেই তাহা ফেলিয়া দিও। যেক্‌হ্যাণ্ড করিতে হইলে যাহাকে যেক্‌হ্যাণ্ড করিবে, তাহার খুব কাছে না আসিলে হাত বাড়াইও না, দূর হইতে হাত বাহির করিয়া আসিলে বড় ভাল দেখায় না। মহিলারা আসিলে ভদ্রলোকদিগকে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে, কিন্তু পুরুষেরা আসিলে মহিলাদিগকে উঠিতে হয় না। অগ্নিকুণ্ডের (Fire place) কাছাকাছি যাইবার জন্য তুমি এক চৌকি ছাড়িয়া আর এক চৌকিতে যাইতে পার না। গৃহের কর্ত্রী তোমাকে যদি কাহারো সহিত পরিচিত করিয়া দেন, তবে তুমি তাহার প্রতি গ্রীবা নত করিবে, তবে যদি সে ব্যক্তি কর্ত্রীর বিশেষ আত্মীয় বা পুরাতন বন্ধু হয়, ও কর্ত্রী যদি তাহার সহিত তোমার বিশেষ আলাপ করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে যেক্‌হ্যাণ্ড্ করিতে পার। মহিলারা পুরুষের প্রতি হাত বাড়াইয়া দেন বটে, কিন্তু হাত নাড়েন না, মহিলার হস্ত লইয়া নাড়িয়া দেওয়া পুরুষের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যুবতীরা অবিবাহিত পুরুষের প্রতি কেবল মাত্র গ্রীবা নত করিবেন। যখন কাহারো সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছ, যতক্ষণ থাকা প্রয়োজন ততক্ষণ থাকিয়াছ, এমন সময়ে যদি অন্য আগন্তুক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া পাঠায়, তাহা হইলে তখনি তুমি উঠিয়া যাইও না; যখন অভ্যাগতগণ চৌকিতে আসিয়া বসিল, তখন গৃহের কর্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া এবং নবাগতদিগকে অতি নম্র নমস্কার করিয়া চলিয়া যাইবে। হয় ত কর্ত্রী তোমাকে বসিবার জন্য অনুরোধ করিবেন, কিন্তু এক বার যখন উঠিয়াছ, তখন আবার বসিতে গেলে বড় ভাল দেখাইবে না। কাহারো সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় যদি ঘড়ি দেখিবার প্রয়োজন হয় তবে, "অন্য কাজ আছে এই জন্য ঘড়ি দেখিতেছি" এই বলিয়া কারণ দর্শাইয়া ও অনুমতি লইয়া তুমি ঘড়ি দেখিবে। কোন মহিলা বিদায় লইতে উঠিলে পুরুষেরও উঠিয়া দাঁড়াইতে হয়, এবং যদি তাঁহার নিজের বাড়ি হয় তবে গাড়িতে পৌঁছিয়া দিতে হয়। অভ্যাগত আইলে বিশেষ সম্ভ্রম দেখাইবার ইচ্ছা না থাকিলে মহিলারা অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবেন না, যদি তিনি এক পদ মাত্র অগ্রসর হইয়া তাহাকে যেক্‌হ্যাণ্ড করেন ও সে না বসিলে না বসেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। অভ্যাগতগণ বিদায় লইবার সময় উঠিলে মহিলাকেও উঠিতে হইবে, ও যতক্ষণ না তাঁহারা ঘর হইতে বাহির হইয়া যান, ততক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবেন, কিন্তু ঘরের সীমা পর্য্যন্ত

তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। নিজে যে চৌকিতে বসিয়া থাক, নিজে না বসিয়া সম্ভ্রম প্রদর্শনের জন্য সে চৌকি কাহাকেও বসিবার জন্য দিও না,তবে যদি অন্য চৌকি না থাকে সে এক আলাদা কথা। এইত গেল প্রণাম নমস্কার প্রভৃতি সম্ভ্রম প্রদর্শনের রীতি নীতি। এক্ষণে দেখা সাক্ষাৎ করিবার নিয়ম অনিয়মের বিষয় লিখি।

সকল সময়েই দর্শকদিগকে অভ্যর্থনা করাই ভদ্রতার নিয়ম। যদি তোমার হাতে সর্ব্বদা কাজ থাকে. তবে চাকরদিগকে বলিয়া রাখিও তাহারা আগন্তুকদিগকে বলিবে যে, প্রভু অমুক দিন বা অমুক সময় ব্যতীত কখনো ঘরে থাকেন না। যদি দৈবক্রমে ভৃত্য কাহাকেও ঘরের মধ্যে আনিয়া থাকে তবে যত অসুবিধাই হোক্ না কেন, তাহাকে অভ্যর্থনা করাই উচিত। কোন মহিলা আগন্তুকদিগকে অপেক্ষা করাইয়া রাখিবেন না। ছাতা এবং "ওভার-কোট্" "হলে" রাখিয়া দেখা করিতে যাইতে হইবে।

"মর্নিংকল্" অর্থাৎ দিনের বেলায় দেখা সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া বিকাল ৩টা হইতে ৫ টার মধ্যেই উচিত। কারণ আহারাদি ও সাজ-গোজ করিবার সময় দেখা করিতে গেলে বড় অসুবিধা হয়।

দেখা করিতে যাইবার সময় টুপি খুলিয়া টেবিল বা অন্য কোন দ্রব্যের উপর রাখা উচিত নহে, টুপি হাতে করিয়া রাখিতে হইবে, অথবা যদি রাখিতেই হয় তবে ভূমির উপর রাখা উচিত। "মর্নিং-কল্" করিতে যাইবার সময় সখের কুকুর সঙ্গে লইয়া ঘরে যাইও না, কারণ তাহারা চেঁচামেচি করিতে পারে, অথবা কোন লেডির গাউনের উপর বা মক্‌মলের কৌচের উপর শুইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ না করিতে পারে। অথবা গৃহের কর্ত্রীর সাধের বিড়ালটি হয়ত অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে ঘুমাইতেছে, তাহার সহিত অনর্থক একটা বিবাদ বাধাইতে পারে। যদি কোন মহিলা কাহারো সঙ্গে দেখা করিতে যান, তবে তিনি যেন তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছেলে-পিলে সঙ্গে লইয়া না যান। কারণ, যাহার সঙ্গে দেখা করিতে যান্ সে বেচারীর হয়ত বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে থাকে, পাছে তাঁহার "আল্‌বাম্" ছিঁড়িয়া ফেলে বা তাঁহার সাধের প্রস্তর-মূর্ত্তিটি অঙ্গহীন করিয়া ফেলে। তোমার যদি গাড়ি না থাকে তবে বাদলার দিনে কাহারো সঙ্গে দেখা করিতে যাইও না,কারণ তুমি যদি ভিজা কোটে ও কাদা মাখা জুতায় কাহারো ঘরের কার্পেটের উপর বিচরণ কর তবে গৃহের কর্ত্রীর বড়ই মন খারাপ হইয়া যাইবে। লোকাকীর্ণ ঘরে গেলে প্রথমে গিয়াই গৃহের কর্ত্রীকে সম্ভ্রম জানানো আবশ্যক, পরে অন্য কাজ। কোন মহিলা কাজ কর্ম্ম ছাড়া আর কোন কারণে ভদ্র লোকদের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতে পারেন না। বন্ধুত্বের সাক্ষাতে বড় অধিক কালব্যয় করিও না,বড় জোর আধ ঘণ্টা কথাবার্ত্তা কহিবে। আদব্-কায়দাজ্ঞ ব্যক্তিরা কহেন যে, তুমি এত টুকু থাকিবে যাহাতে বন্ধুগণ তুমি এত শীঘ্র চলিয়া গেলে বলিয়া কষ্ট পান, কিন্তু দেরি করিতেছ বলিয়া মনে মনে তো-

মার বিদায় প্রার্থনা না করেন। কাহারো সামাজিক সাক্ষাৎ (অর্থাৎ যে সাক্ষাৎ বিশেষ নিয়মানুসারে করিতেই হয়, বন্ধুত্ব অথবা অন্য প্রকারের সাক্ষাৎ নহে) ফিরিয়া দিবার সময় ঘরের মধ্যে না গিয়া একটা কার্ড্ রাখিয়া গেলেও হয়। কিন্তু অমনি বাড়ির লোকেরা কেমন আছেন, সে সংবাদটা লইও। আবার, যে মহিলার সঙ্গে তুমি দেখা করিতে গিয়াছ তাঁহার সঙ্গে যদি তাঁহার ভগিনী বা কন্যাগণ থাকেন, তবে প্রত্যেককে আলাদা আলাদা কার্ড্ দিতে হইবে। অথবা যদি বাড়িতে অন্য অভ্যাগত উপস্থিত থাকেন, তবে কাহাকে কার্ড্ পাঠাইতেছ, তাহা বিশেষ করিয়া জানাইবার জন্য তোমার নামের উপর তাঁহার নাম লিখিও। কাহারো শোকে শোক প্রকাশ করিবার জন্য যে সাক্ষাৎকারের নিয়ম আছে, তাহা শোকের ঘটনা ঘটিবার পরে সপ্তাহের মধ্যে পালন করা উচিত। তোমার যদি বিশেষ আত্মীয় বন্ধু না হন তবে কার্ড্ পাঠাইয়া দিও। কাহারো আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত সাক্ষাৎ করিতে হইলে কার্ড্ না পাঠাইয়া নিজে যাইও। যে বন্ধু বা আলাপীর বাড়িতে নিমন্ত্রণে গিয়াছ, বা যাহাদের নিমন্ত্রণের চিঠি পাইয়াছ, সপ্তাহের মধ্যে তাহাদের সহিত দেখা করিও! দেশে আগমন ও বিদায়-বার্ত্তা জানানো ভিন্ন অন্য কোন কারণে চাকরের হস্তে কার্ড্ পাঠানো বড়ই অসভ্রম প্রদর্শনের চিহ্ন।

কার্ডের উপর নাম ধাম সমস্ত লিখা থাকিবে। সাক্ষাৎ করিবার কার্ড্ খুব সাদাসিদা হওয়া উচিত, চক্‌চোকে কার্ডের "ফ্যাসান্" এখন আর নাই। নিজের নামের সহিত খেতাব প্রভৃতি যেন না থাকে, সাদাসিদা "ইট্যালিক্" অক্ষরে নাম লিখা থাকিবে, "রোমান" বা অন্য প্রকার ঘোর-ফের অক্ষরে যেন নাম লেখা না হয়। "কণ্টিনেণ্টে" অর্থাৎ ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে নামের পূর্ব্বে "মশিও" বা "মিষ্টর" বা "মিস্" প্রভৃতি লেখে না, ইংলণ্ডেও কেহ কেহ তাহার অনুকরণ করেন। নিজের হাতের লেখার অনুরূপ অক্ষরে নাম লিখিলে, হাস্যাস্পদ হইতে হয়। তবে বড় বড় প্রতিভা-সম্পন্ন লোক, যাঁহাদের হাতের অক্ষর দেখিতে লোকের কৌতূহল জন্মে, তাঁহারা এরূপ করিতে পারেন; জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল্ বা কার্লাইলের হাতের অক্ষরের কার্ড্ শোভা পায়, অন্য লোকের নহে। শোকগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের কার্ডের চারি দিকে কালো ঘের থাকিবে। অবিবাহিতা কুমারী যাঁহারা পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের আর স্বতন্ত্র কার্ডের প্রয়োজন নাই। কার্ডে তাঁহাদের মাতার নামের নিম্নে নিজের নাম লিখা থাকিবে। যেমন

Mrs Charles Gilbert.

Miss Charles Gilbert.

কোন কোন বিবাহিত ব্যক্তি সস্ত্রীক দেখা করিতে আইলে উভয় নামের একটি কার্ড্ ব্যবহার করেন; যেমন Mr. & Mrs Stewart Austin. । পরিবারের কাহারো মৃত্যু হইলে ইংরাজেরা অনেক সময়ে

কার্ড্ পাঠাইয়া সেই সংবাদ দেন; সেই কার্ডে মৃত ব্যক্তির নাম, বয়স, জন্মস্থান, বাসস্থান, ও কবর-স্থান লিখিত থাকে। বিদায় লইবার কার্ডের এক কোণে P. P. C. (pour prendre congé) অথবা P. D. A. (pour dire adieu) এই অক্ষর তিনটী খোদিত থাকে।

বিদেশ হইতে নবাগত ব্যক্তি যদি তোমার বন্ধুর পরিচয়-পত্র (Letter of introduction) তোমার কাছে পাঠাইয়া দেয়, তবে তাহার পরদিন গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিও! দেখা করিয়া তাহার পরেই তাঁহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিবে। যদি তেমন ক্ষমতা না থাকে, তবে তাঁহাকে লইয়া সঙ্গীতালয় পশুশালা প্রভৃতি দেশে যাহা কিছু দেখিবার স্থান আছে লইয়া যাইও। যাহাকে কাহারো নিকট পরিচিত করিবার নিমিত্ত পরিচয়-পত্র লিখিবে, তাহার চরিত্রের বিষয় কিছু লিখিবার আবশ্যক নাই। চরিত্রের বিষয় কিছু না বলিলেও বুঝায় যে, যাহাকে তুমি তোমার বন্ধুর সহিত পরিচিত করিতে চাও, তাহাকে অবশ্য তোমার বন্ধুর পরিচয়ের যোগ্য মনে করিতেছ। শুদ্ধ এই লিখিলেই যথেষ্ট যে—"অমুক ব্যক্তি তোমার বন্ধু হইলেন, ভরসা করি তোমার অন্যান্য বন্ধুরা তাঁহাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন।"

প্রাচীন সিংহলের বাণিজ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এক্ষণে প্লিনির বিবরণ পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। প্লিনি সিংহলের দুই বিভিন্ন প্রকার বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে একটী তাঁহার বা সিজরগণের সময় লইয়া, অপরটী প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের কথা লইয়া। সিজরগণ প্লিনির ঠিক্ পূর্ব্বসময়েই ছিলেন। আমরা প্লিনি ও ষ্ট্রাবোর মুখে শুনিতে পাই, যে প্লিনি ও সিজরদিগের সময়ে আরব-সাগর দিয়া ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য ব্যাপার প্রবলরূপে চলিত। উহাঁরা বলেন যে, যে সময় হইতে মিশর রোমকদিগের অধিকারভুক্ত হইল, সেই সময় হইতে বাণিজ্য-স্রোত এত প্রবল হইয়াছিল, যে দুই চারিখানি ক্ষুদ্র জাহাজের কথা দূরে থাকুক্, দলে দলে অসংখ্য জাহাজ প্রতিবৎসরে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইত এবং টাকার বিনিময়ে এতদ্দেশ-জাত দ্রব্যাদি লইয়া দেশে প্রতিগমন করিত। সম্রাট ক্লডিয়সের সময়ে সিংহল হইতে রোমে যে সকল দূত প্রেরিত হয়, তাহাদেরই কথা লইয়া প্লিনি সিংহলের বিষয় যাহা কিছু বলিয়াছেন। নিম্নলিখিত ঘটনার জন্য ঐ সকল দূত প্রেরিত হয়—এনিয়স্ প্লোক্যামস্ নামে জনৈক দাসত্ব-মুক্ত ব্যক্তি

লোহিত বা ভারত সাগরে শুল্ক আদায় করিত ; একদা যেমন তিনি আরব দেশের তীরাভিমুখে যাইতেছিলেন, অমনি ঘটনাক্রমে উত্তর বায়ু তাঁহাকে উড়াইয়া লইয়া সিংহলান্তর্গত হিপ্‌পুরী বন্দরে ফেলে, তথায় রাজা তাঁহাকে কৃপা দৃষ্টিতে গ্রহণ করিয়া ছয়মাস কাল যথোচিত আতিথ্য করেন। তাঁহারই প্রস্তাবে রাজা সিজরের নিকট চারি জন দূত প্রেরণ করেন। এই দূতেরাই গিয়া বলিয়াছিল, যে সিংহলে পাঁচশতেরও অধিক নগর আছে। পালিসিমন্দু Palæsimundu নিকটবর্ত্তী বন্দর লইয়া সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবশালী। এই খানেই রাজভবন ; এখানকার লোকসংখ্যা ২০০০০০ তন্নিকটেই মেনিস্‌বা হ্রদ, ইহার পরিধি ৩৭৫ মাইল, এবং ইহা হইতে দুইটী নদী বহির্গত হইয়াছে ; একটী উত্তর দিকে ; অপরটীর নাম পালিসিমন্দু, ইহা ত্রিমুখী হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয়, যে এনিয়স্ প্লোক্যামস্, নিশ্চয়ই উত্তর পূর্ব্ব বায়ু দ্বারা সিংহলের উত্তরভাগে হিপ্‌পুরী বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হন। হিপ্‌পুরী বন্দরটী কোন্ স্থানে ছিল, তাহা আমরা নির্ণয় করিতে পারি না। পাঁচ শতেরও অধিক নগর মধ্যে পালিসিমন্দু সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, ইহাতে এইরূপ নিশ্চয় হয়, যে তৎকালে সিংহল বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী ছিল। গঙ্গা, দ্বীপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী। এই দ্বীপের সকল বন্দরই বাণিজ্যোপযোগী ; তথায় প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ পর্য্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাই হউক এক সময়ে যে উহার বাণিজ্য বিলক্ষণ সুবিস্তৃত ছিল, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। প্লিনির অবশিষ্টাংশের বিষয় কিছুই না বলিয়া আমরা উহা ত্যাগ করিলাম, কেন না উহা কেবল নাবিকগণের কথার উপর নির্ভর করিয়া লিখিত। উহাতে মিথ্যা গপ্পের ভাগই অধিক থাকিবার সম্ভাবনা।

ক্লডিয়সের সময়ে, খ্রীষ্টীয় শকের প্রারম্ভে সিংহলের বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা দেখাইয়াছি, এক্ষণে ইহার পরবর্ত্তী সময়ের লেখক এরিয়ান কি বলেন, শুনা যাউক্। এই লেখক নিরো, কি আণ্টোনাইনিসের সময়ের লোক তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। যাহা হউক, তিনি কি বলেন, তাহা শুনা যাউক। এরিয়ান্ বণিক-বেশে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহার প্রণীত পেরিপ্লস্ গ্রন্থে মালাবার উপকূলের অবিকল বর্ণনা আছে। উহার ভিন্ন ভিন্ন বন্দরের বিশেষ বিবরণ, কি প্রকার বাণিজ্যে উহারা প্রসিদ্ধ, এ সকল স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে সিংহলের নিকটবর্ত্তী দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ ভাগস্থ কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরের সমৃদ্ধিসম্পন্ন অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, এরিয়ান্ সিংহলে যান নাই, তথাপি তিনি তাহার বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তদ্বিষয়ে সকলের মনোযোগ দেওয়া উচিত। তাঁহার সময়ে সিংহলের পূর্ব্বতন নাম তাপ্রোবেন, পালিসিমন্দম নামে পরিবর্ত্তিত হয়। তৎকালে উহার উত্তরাংশ কৃষির গৌরবভূমি ছিল ; বৃহৎ

বৃহৎ অর্ণবপোতে লোকে দূরদেশে বাণিজ্যযাত্রা করিত ; প্রবাল, বহুমূল্য প্রস্তর ও বস্ত্র এবং কচ্ছপ-পৃষ্ঠ ঐ দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। এই সংক্ষেপ বিবরণে প্রথমতঃ পালিসিমন্দম * নামের উৎপত্তি বিষয়ে বিতণ্ডা আবশ্যক করে। প্লিনি বলেন যে এই সুবৃহৎ নগরে দুই লক্ষেরও অধিক অধিবাসী ছিল। ইহাতে বোধ হয় যে, উহা ঐ দ্বীপের রাজধানী ছিল। এখানে বহুসংখ্যক বণিক ও নাবিক যাতায়াত করিত। তাহারা ঐ রাজধানীর নামানুসারে দ্বীপকেই পালিসিমন্দম্ কহিত। বর্ত্তমান সময়ে যেমন জাবাকে বটেভিয়া বলিয়া থাকে। টলেমি ঐ নামক কোন নগরের উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু এনারিস্‌মন্দম নামক একটী স্থানের কথা বলিয়াছেন। বহুদিন পূর্ব্বে সাল্‌মেসিয়স্ উভয়কে একই বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন। ঐ নগর দ্বীপের উত্তর ভাগে অবস্থিত ছিল; এক্ষণে অনেকে উহাকে আধুনিক জাফ্‌নাপত্তন (Jafnapatam) কহিয়া থাকেন। প্লিনির বিবরণ মতে উহা তৃণকমলী উপসাগরের তীরে হওয়াই অধিক সম্ভব, কেন না উহা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বন্দরস্থান। এরিয়ান দূর-বাণিজ্যার্থী বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবপোতের বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও এরিয়ান সিংহলের যথার্থ বিবরণ দিতে পারেম নাই, তথাপি এ দ্বীপের উত্তর ভাগ যে সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে কর্ষিত হইত, উহা যে বহুবিস্তৃত বাণিজ্যস্থান, ইউরোপ, আর্য্যাবর্ত্তের গাঙ্গেয় প্রদেশ, মলক্কা ও তন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপ সমূহ, এমন কি, চীন সাম্রাজ্যের সহিতও যে উহার বাণিজ্য চলিত, তাঁহার বিবরণ হইতে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

এক্ষণে টলেমির কথা। এই প্রসিদ্ধ ভূগোলবেত্তা খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক। ইঁহার ভূগোলের একটী পরিচ্ছেদ কেবলই সিংহলের কথা লইয়া। তিনি এত পরিষ্কাররূপে তাহার বিবরণ লিখিয়াছেন, যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি তাঁহার সমসাময়িক যে সকল নাবিক ও বণিকদিগের নিকট ভৌগোলিক বৃত্তান্ত পাইয়াছিলেন এস্থলে তাঁহাদের নাম করা অপ্রাসঙ্গিক বোধ করা গেল না। টলেমি যে কেবল উপকূল ও বন্দরের বিষয় জানিতেন এমন নহে, তিনি দ্বীপের অন্তঃপ্রদেশের বিষয়ও জ্ঞাত ছিলেন, তবে উপকূল বন্দরের বিষয় যত পরিস্ফুটরূপে জানিতেন, উহা তত জানিতেন না। তিনি বলেন যে পূর্ব্বে উহাকে পালিসিমন্দী কহিত, কিন্তু তাঁহার সময়ে তথাকার অধিবাসীরা Salæ এবং অপরে Salice কহিত। ঐ স্থান ধান্য, মধু, আদা, বহুমূল্য প্রস্তরখণ্ড, স্বর্ণ, রৌপ্য, হস্তী, ব্যাঘ্র প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। দ্বীপের উত্তর ভাগে যেখানে ক্ষেত্রে জল দিবার মানসে হ্রদ খনন করা হইত, সেই খানে ধান্য জন্মিত। বহুমূল্য প্রস্তর ও ধাতু

* উহার ব্যুৎপত্তি করিতে গিয়া হ্যামিল্টন বলেন পালি বা বালি সীমান্ত হইতে ঐ নামের উৎপত্তি, অর্থাৎ বালির অধিকারের ঐ পর্য্যন্ত সীমা।

সকল কেবল দ্বীপের অন্তঃপ্রদেশেই পাওয়া যাইত। দ্বীপের দক্ষিণ ভাগ, যে স্থানকে টলেমি হস্তি-চারণ-স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন সেখানে হস্তিদন্ত পাওয়া যাইত। উত্তর ভাগে দুইটী বাণিজ্য-প্রধান নগর মান্নতত্বী ও তলকড়ী (Talacri) এবং অন্তঃপ্রদেশে বিচারালয় স্থান অমরগ্রাম (Amurogrammum) এবং রাজধানী মহাগ্রাম (Maagrammum) লইয়া ছয়টী নগরের উল্লেখ আছে। টলেমির এই সকল বিবরণ আধুনিক পর্য্যটকগণের লিখিত বিবরণের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে উহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবেক। তাঁহাদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ নামা নক্সের কথা উল্লেখ করি। ইনি একজন স্কটলণ্ডের অধিবাসী। ১৬৫৭ খৃঃঅব্দে সিংহলের তীরে জাহাজ ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে, তথায় প্রায় বিংশতি বৎসর কাল রুদ্ধ থাকেন। তৎপরে অনেক কৌশলে ওলন্দাজদিগের অধিকারে পলায়ন করিয়া কিছু দিন পরে স্বদেশে প্রতিগমন করেন। ভ্রমণকারীর যে সকল গুণ থাকা উচিত এই অসাধারণ মনুষ্যের তৎ সমুদয়ই ছিল; যেরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে তিনি তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে সহস্র ধন্যবাদ দিতে হয়। তিনি তদ্দেশের ভাষা সম্যক রূপে শিখিয়াছিলেন। যে সকল প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভ আজিও দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে তৎসমুদায়ের প্রাচীন নাম অনুসন্ধান করিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেকগুলিই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণের সহিত টলেমির বিবরণ তুলনা করিলে দেখা যায় যে আজও তাহা সাধারণে জানে। ভূগোলবেত্তা টলেমি গঙ্গানামে দ্বীপের একটী প্রধান নদীর উল্লেখ করেন, তাহা যে নিশ্চয়ই মাবেলাগঙ্গা বা মহাবলিগঙ্গা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। টলেমি হস্তি-চারণ-স্থানের উপর হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে পর্ব্বতকে মালি (Malae) বলিয়াছেন, এক্ষণে তথাকার অধিবাসীরা তাহাকে মল্লেলেল (Malell) বলিয়া থাকে, কিন্তু ইউরোপীয়েরা তাহাকে Adam's Peak কহে। উহা দ্বীপের দক্ষিণ ভাগে। এখানে নানা স্থান হইতে তীর্থযাত্রী আসিয়া থাকে। টলেমির অমরগ্রাম ও নক্সের অমরবুর বা অমরপুর উভয়ই এক। নক্স বলেন, যে অত্রত্য অধিবাসিদিগের মধ্যে এই রূপ কিম্বদন্তী আছে, যে এখানে অনুক্রমে ৯০টী রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহারা বহুসংখ্যক দেবমন্দির স্থাপন করেন।

টলেমি সিংহলের পার্শ্ববর্ত্তী বহুসংখ্যক দ্বীপেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার ঐ সকল বৃত্তান্ত পাঠে বিলক্ষণ প্রতীতি হয়, যে তৎকালে ঐ সকল স্থানে নাবিকেরা সর্ব্বদাই যাতায়াত করিত; এবং সিংহল তাঁহাদের বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি ছিল।

এক্ষণে আমরা যষ্ঠ শতাব্দীর কথা বলিব। এই সময়ে সিংহল ভারতসাগরের প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল।* বাণিজ্য

* Macpherson, Annals of Commerce, Vol 1. page 225.

তরী সকল আসিয়ার নানা স্থান হইতে এখানে আগমন করিত। এখানকার বণিকগণও নানাস্থানে যাইয়া বাণিজ্য করিত। এই সকল বাণিজ্য-ব্যাপার কস্মাস্ দ্বারা সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। এই মৈশরীয় বণিক্ সম্রাট্ দ্বিতীয় জষ্টিনের সময়ে ৫৬০ খৃঃ অব্দে এক্সুম (Axume) রাজার অধিকারে বাস করিতেন। তিনি আরকীকোর নিকটস্থ এডুল (Adule) নামে ইথিয়োপিয়ার এক সুবিখ্যাত বন্দরে বাণিজ্যার্থে গমন করিয়াছিলেন। তথায় সোপেটার (Sopater) নামে এক সিংহলীয় বণিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহারই মুখে সিংহল এবং তাহার বাণিজ্যের বিষয় শুনিয়া যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন তাপ্রোবেন ভারতসাগরের একটী বৃহৎ দ্বীপ; হিন্দুরা উহাকে সিংহলদ্বীপ (তিনি Siledivá লিখিয়া গিয়াছেন, উহা যে "সিংহল দ্বীপের" অপভ্রংশ, তাহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে) বলিয়া থাকে। এখানে বহুমূল্য প্রস্তর (Hyacinth) পাওয়া যায়, ইহা পিপ্পলীর জন্মভূমি মেলের (মালাবার) অতি সন্নিহিত; ইহার চতুঃপার্শ্বে বহুসংখ্যক দ্বীপ দৃষ্ট হয়; তাহার সকল গুলিই নির্ঝরিণী-মালায় পরিশোভিত, সকল গুলিতেই নারিকেল বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দুইজন রাজা দ্বারা শাসিত, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের বিরোধী; তন্মধ্যে এক জন পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিকারী, সেখানে মূল্যবান প্রস্তর পাওয়া যায়। আর এক জন সিংহলের অবশিষ্ট ভাগের অধিকারী, সেই খানেই বাণিজ্যপ্রধান নগর ও বন্দর। এই কারণে তথায় তৎপার্শ্বস্থ স্থানের লোক সকল সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া থাকে। অধিবাসীরা আপন আপন রাজার ধর্ম্মাবলম্বী। এই দ্বীপে বহুসংখ্যক দেবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একটীতে এক অসাধারণ আকারের সমুজ্জ্বল প্রস্তর (Hyacinth) আছে। উহা ঐ পবিত্র মন্দিরের কোন এক চিহ্নিত সমুচ্চ স্থানে সংস্থাপিত থাকে। যখন উহা সূর্য্যকিরণে প্রভাসিত হয়, তখন উহার আলোক বহুদূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা এক বিস্ময়জনক অদ্ভূত ব্যাপার।

"ভারতবর্ষ, পারস্য, ইথিয়োপিয়া প্রভৃতি দেশসকলের সহিত উহার বাণিজ্যের সুগমতা আছে বলিয়া ঐ সকল দেশ হইতে সহস্র সহস্র অর্ণবপোত তথায় গমনাগমন করিয়া থাকে। ঐ দ্বীপবাসী বণিকদিগেরও অসংখ্য বাণিজ্য-তরী আছে। সিন (চীন) এবং অন্যান্য স্থান হইতে এখানে রেশম, মুসব্বর, লবঙ্গ, এবং দেশজাত অন্যান্য পণ্যদ্রব্য আমদানী হইয়া আবার মেল (মালাবার) ও কল্যাণ প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হইত। মেল হইতে পিপ্পলী, কল্যাণ হইতে পিত্তল, তিল, ও বস্ত্রবয়নোপযোগী দ্রব্য সকল আমদানী হইয়া সিন্ধু, পারস্য, হোমারাইট (Homerite) আদুল (Adule) প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হইত। তদ্বিনিময়ে সিংহল ঐ সকল দেশ হইতে যাহা পাইত, তাহা ও স্বদেশজাত দ্রব্যসকল, ভারতব-

র্ষের অভ্যন্তর প্রদেশে পাঠাইয়া দিত। সিন্ধুদেশ সিন্ধুনদী (Indus) দ্বারা পারস্য হইতে বিচ্ছিন্ন। সিন্ধু (Sindus) অড়োট (Orrhota,)কল্যাণ(Calliana,)সিবর(Sibor) প্রার্ত্তি (Prarti,)মঙ্গরথ (Mangarath,)সালপত্তন (Salopatana,) নলপত্তন (Nalopatana,) এবং পদ্মপত্তন (Pudopatana) এই কয়েকটীই তৎকালে ভারতবর্ষের বাণিজ্যপ্রধান নগর ছিল। শেষোক্ত কয়টী মেল প্রদেশের অন্তর্গত। অহোরাত্রি পাঁচ দিন পর্য্যটন করিলে মেল হইতে সিংহলদ্বীপ (Siledive) বা তাপ্রোবেনে উপস্থিত হওয়া যায়। আরো দূরে মহাদেশের উপর মাবেলো (Mavallo) নগর। এখানে শঙ্খ উৎপন্ন হয়; পূর্ব্বদিকে সিন্ই চীন-সমুদ্রের সীমা। কেবার (Caber) নগরে প্রচুর পরিমাণে Alabandanum† প্রস্তর পাওয়া যায়।

'সিংহলে এক প্রকার বহুমূল্য প্রস্তর (Hyacinth) জন্মে। এখানকার অধিবাসীরা অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য করিয়া থাকে; ইহা একটী বিখ্যাত বাণিজ্যপ্রধান স্থান, একথা আমি সোপেটার ও তাঁহার সহচরগণের মুখে শুনিয়াছি।'

কস্মাস্ সোপেটরের মুখে যাহা শুনিয়াছেন, আমরা তাহা বিবৃত করিলাম। এই বিবরণে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে সিংহল. আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূল হইতে চীন পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগের বাণিজ্যের সাধারণ কেন্দ্রভূমি ছিল; এখানে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বাণিজ্য দ্রব্য আসিয়া উপস্থিত হইত, এবং বণিকেরা স্ব স্ব দেশজাত দ্রব্যের বিনিময়ে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য লইয়া যাইত। শুদ্ধ যে এইরূপে ইহার বাণিজ্য চলিত তাহা নহে, এতৎস্থানবাসীরা স্বদেশোৎপন্ন দ্রব্যাদির আবার রপ্তানী করিত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই সময়ে সিংহল দুইটী বিভিন্ন জাতির বাসস্থান ছিল, এবং দুইটী বিভিন্ন রাজা দ্বারা শাসিত হইত। বহুমূল্য প্রস্তর ও দারুচিনির জন্মভূমি পার্ব্বত্যস্থান বা অন্তঃপ্রদেশ দেশীয় রাজার অধিকারে, আর, বন্দর ও বাণিজ্যপ্রধান নগরগুলি লইয়া সমগ্র উপকূলভাগ বিদেশীয় রাজার অধিকারে। এই বিদেশীয় রাজারা বাণিজ্যার্থ এখানে আসিয়া অধিবেশন করিয়াছিল, উহারা ভিন্ন জাতীয়। লেখকের কথানুসারে আমরা উহাদিগকে পারস্যবাসী বলিয়া বুঝিতে পারি।

যে সকল বিদেশীয় জাতির সহিত বিবিধ বাণিজ্য-ব্যাপার চলিত, তন্মধ্যে আডুল (Adule) বন্দরে ইথিয়োপীয়েরাই বিশেষ উল্লেখের যোগ্য। কারণ এই সময়ে আক্সুমিটি (Axumitæ) রাজ্যের সৌভাগ্যাবস্থা, ভারতবর্ষজাত দ্রব্য সকল উহার অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে, স্বর্ণের বিনিময়ে তদ্দেশবাসীরা ঐ সকল দ্রব্য লইয়া যাইত। তাহার পরে হোমিরিটি (Homeritæ) জাতি। ইহারা আরেবিয়া ফেলিক্স (Arabia Felix) তীরে বাস করিত,এই দেশেই এডেন বন্দর;

† Reported by Mons. Dulens to be something between an amethyst and a ruby.

ইহা ভারতবর্ষাগত অর্ণবপোত সকলের অতি সুবিধার স্থান। তৎপরে পারস্যের ভূমধ্যসাগরতীরস্থ প্রদেশাধিবাসী ও পারস্যোপসাগরবাসীদিগের নাম করা যাইতে পারে।

সিন্ধু নদের মুখ হইতে মালাবার পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যের সমগ্র উপকূল ভাগে সিংহলের বাণিজ্য বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। সিন্ধুদেশ হইতে সিংহলে মৃগনাভির আমদানী হইত। ভারতবর্ষের উপকূল ভাগের অনেকগুলি বন্দরের নামোল্লেখ করা হইয়াছে—যথা অড়োট, এক্ষণে উহাকে সুরাট কহে; কল্যাণ.—আজিও উহা বোম্বাইয়ের নিকট বর্ত্তমান আছে; সিবরের কথা বলা যায় না; মেল, এক্ষণে উহাকে মালাবার কহে। এই শেষোক্ত স্থান পিপ্পলীর জন্মভূমি। কস্মাসের সময়ে উহা সুবিস্তৃত বাণিজ্যের জন্য বিলক্ষণ বিখ্যাত ছিল। শঙ্খোৎপত্তিস্থান মাবেলোকে আমরা মান্নার বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। কস্মাস্ উহাকে মহাদেশের উপর বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এটী তাঁহার ভ্রম। উহাকে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ বলা যায়। কেবার বা কেবারো যে বর্ত্তমান ট্রাঙ্কুইবারের (Tranqueber) সন্নিকটবর্ত্তী ও কাবেরী নদীতীরস্থ স্থান, তদ্বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ নাই।

কেবল যে দাক্ষিণাত্য হইতে সিংহলে দ্রব্য সকল আমদানী হইত তাহা নহে, বহুদূরস্থ দেশ ও দ্বীপ সকল হইতেও নানা প্রকার পণ্য দ্রব্য এখানে আনীত হইত। জিনিট্জা (Tzinitza) বা চীন হইতে রেশম ও নানা প্রকার মশলার আমদানী হইত। তাহারা জন্ক (Junk) নামে যে জাহাজ ব্যবহার করিয়া থাকে, বোধ হয় তাহা লইয়াই সমুদ্রে যাতায়াত করিত। তৎকালে চীনের সহিত যে ইহার বাণিজ্য চলিত, তাহা আমরা কস্মাসের কথা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি।

যাহা লিখিত হইল, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ষষ্ঠ শতাব্দীতে সিংহল এক বহুবিস্তৃত বাণিজ্যস্থান বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

এক্ষণে আমরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর কথা বলিব। এই ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মার্কোপলো নামে জনৈক বিনিসীয় ইউরোপে ফিরিয়া যাইবার সময় সিংহল দেখিয়া যান। মার্কোপলোকে পূর্ব্বমহাদেশের কলম্বস বলা যাইতে পারে। চীনের ওদিকেও যে সমুদ্র আছে, ইউরোপীয়দিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে তাহা দেখিয়াছিলেন, দেখিয়া সকলকে জানাইয়াছিলেন। তিনি আসিয়া মহাদেশে আসিবার জন্য ১২৭১খৃঃ অব্দের শেষেই হউক বা ১২৭২ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভেই হউক বিনিস্ হইতে যাত্রা করেন। এবং ১২৯৫ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত এই মহাদেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি এই দীর্ঘ সময়ের অনেকাংশ তাতারের প্রসিদ্ধ কব্লে খাঁর সভায় অতিবাহিত করেন। তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য ইতিপূর্ব্বে বহুকাল ঐ রাজার রাজ্যে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারাই ঐ উনবিংশবর্ষবয়স্ক মার্কোকে লইয়া আসেন। মার্কো শীঘ্রই রাজার বিশ্বাসভাজন হইয়া

উঠিলেন। রাজা তাঁহার সাম্রাজ্যের দূরস্থ নানা প্রদেশের বহুবিধ গুরুতর কার্য্যের ভার তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। ঐ সুবিধা পাইয়া মার্কো নানাবিধ প্রদেশের আচার ব্যবহারে ও উৎপন্ন দ্রব্যে বিলক্ষণ রূপে অভিজ্ঞাত হইতে লাগিলেন। তিনি যাহা বর্ণনা করিয়াছিলেন, অনেকে তাহা অতিরঞ্জিত ও গল্প বলিয়া মনে করিতেন; কিন্তু তাঁহার পরগামী ভ্রমণকারিগণের কথায়, ও নানাবিধ গবেষণায় অবশেষে তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণীকৃত হইয়াছে। তিরাবোশী নামে জনৈক প্রসিদ্ধ ইতালীয় ইতিহাসবেত্তা তাঁহাকে সরলহৃদয়ে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন, এবং তাঁহার কথার সত্যতা বিষয়ে অনেক প্রমাণ দিয়াছেন। রবার্টসন মার্কোপলোর বিষয় বলিতে গিয়া নানা কথার পর বলেন, যে, তিনি স্বয়ং জাবা, সুমাত্রা তন্নিকটবর্ত্তী বহুসংখ্যক দ্বীপ, সিংহল ও কাম্বে উপসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র উপকূল ভাগ দেখিয়া যে যে নাম করিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

মার্কোপলো সিংহল সম্বন্ধে বলেন যে, ইহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্বীপ; লোকে রাজাকে সেন্দারনাজু (Sendernaz) কহে। নরনারী সকলেই পৌত্তলিক, সকলেই প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় থাকে। এখানে ধান্য, তিলতৈল, দুগ্ধ, মাংস, বৃক্ষসমুৎপন্ন মদ্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ্মরাগমণি, নীলকান্তমণি, প্রচুর পরিমাণে বকম কাষ্ঠ পাওয়া যায়। রাজার একপ্রকার অদৃষ্টপূর্ব্ব অতিবৃহৎ পদ্মরাগমণি আছে; তাহা নিষ্কলঙ্ক, জ্বলন্ত অগ্নিনির্ব্বিশেষ, এবং মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রীত হইবার নহে। কবলে খাঁ একটী নগরের মূল্য পাঠাইয়া উহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা তাহাতে উত্তর দিলেন, যে 'সমগ্র পৃথিবীর রত্নরাজি আনিয়া দিলেও আমি উহা দিব না, চিরজন্মে কখনও উহার সহিত বিচ্ছিন্ন হইব না, কেননা, উহা আমার পূর্ব্বপুরুষের।' এখানকার অধিবাসীরা সৈনিক কার্য্যে অনুপযুক্ত, আবশ্যক হইলে সৈন্য ভাড়া করিয়া আনে।

মার্কোপলোর প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে, সেণ্ট আলবানবাসী সার্ জন মণ্ডেভিল সিংহল দর্শন করেন। তিনি এমন বিশেষ কিছু বলেন নাই, অতএব আমরা তদ্বিবরণ লিখিতে ক্ষান্ত হইলাম।

প্রাচীন সিংহলের বাণিজ্য সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন লেখক কি বলিয়াছেন, আমরা তাহা দেখাইয়াছি; এক্ষণে দেখা যাউক বাণিজ্য প্রধানতঃ কোন্ জাতির হস্তে ছিল; কোন্ জাতি বাণিজ্যে বিশেষ আধিপত্য করিত। ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে যে হিন্দুদের হস্তেই বাণিজ্য ন্যস্ত ছিল, তাহা সার্ জন আলেকজণ্ডার জনষ্টনের * কথায় বুঝা যায়। তিনি বলেন, যে ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরবজাতীয় হেসেম পরিবারের কতক গুলি লোক, কালিফ আবদল মেলিকের (Caliph Abdolmelic)

* Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, vol 1. part III, p. 537—543.

অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া, মালাবার, কঙ্কাল, পরে সিংহলে উপনিবেশ সংস্থাপন করে। সিংহলে মুসলমানদিগের এই প্রথম উপনিবেশ। ইহার পূর্ব্বে যে দেশীয় বণিক্দিগের হস্তে বাণিজ্য ছিল, তাহা আমরা অবশ্যই বলিতে পারি। ঐ মুসলমানেরা সিংহলের ত্রিণকমলী, জাফনাপত্তন, মানতত্তী, মান্নাব, কেন্দ্রনালী, পট্লাম্, কলম্বো, বার্ব্বেরিন্, এবং পয়েণ্ট ডি গল, এই কয়েক স্থানে কয়েকটী উপনিবেশ স্থাপন করে। মানতত্তী ও মান্নার, এই দুইটীই তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহারা আরব, মিশর, পারস্য, হিন্দুস্থান, মলক্কা, ও তন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জ, ও চীনের সহিত বাণিজ্য করিত। চীনদেশীয় বণিকেরা সিংহলে আসিয়া রেশমের বিনিময়ে মুসব্বর, জায়ফল, ও নানাপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্য ক্রয় করিয়া, তাহা আবার আরব ও পারস্য হইতে আগত বণিকদিগকে বিক্রয় করিত; এই রূপে সিংহল সকল দেশের বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি ছিল। সিংহলের বণিকেরাও তৎকালে বিলক্ষণ ধনশালী ছিল। তৎকালে তাহাদের ভাণ্ডার মান্নার হইতে মানবত্তী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; এবং সিংহল ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেশজাত বহুমূল্য দ্রব্য সকলে পরিপূর্ণ ছিল।—যথা; ত্রিণকমলী হইতে ধান্য; জফনা হইতে বেগুনে রং; কেন্দমালী হইতে শঙ্খ ও প্রবাল; পট্লাম হইতে পান, সুপারি; কলম্বো হইতে দারুচিনি ও বহুমূল্য প্রস্তর; বার্ব্বেরিন হইতে নারিকেল তৈল, ও পায়েণ্ট ডি গল্ হইতে হস্তিদন্ত আসিত। উহারা প্রণালী ও তীরে আধিপত্য রাখিবার জন্য পথে অস্ত্রশস্ত্রসম্বলিত জাহাজ রাখিয়া দিত। পূর্ব্বে যে প্রাচীন বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ সকলের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহারা সে সকল বিশেষ যত্নে রক্ষা করিত। এই সময়ে কতকগুলি রেশম-তন্তুবায়, ভারতবর্ষ হইতে এখানে প্রথম আগমন করে; রাজা তাহাদিগকে কতকগুলি অসাধারণ অধিকার দিয়াছিলেন।

এই রূপ ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত সিংহলের বাণিজ্য মুসলমানদিগের হস্তে বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তাহার পর উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কৃত হওয়ায়, ক্রমে পর্টুগিজ ও ওলন্দাজদিগের হস্তে উহার বাণিজ্য আসিয়া পড়ে; এই সময় হইতে উহার বাণিজ্য দিন দিন হ্রাস পাইতে আরম্ভ হয়; সে সকল লিখিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা সংক্ষেপে প্রাচীন সিংহলের বাণিজ্যের অবস্থা দেখাইয়াছি; আবার ক্রমে প্রাচীন ভারতবর্ষের বাণিজ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইব।

প্রঃ—

রুসিয়া।

পৃথিবীর সমুদয় দেশ অপেক্ষা রুসিয়া এখন সকল লোকেরই মনের অধিক স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর মনুষ্যের বাসোপযোগী অংশের প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ রুসিয়া-সাম্রাজ্য, কিন্তু ইহার অধিবাসি-সমষ্টি বঙ্গদেশের অপেক্ষা অধিক নহে। পৃথিবীর অপর সকল সভ্যজাতি যৌবন অতিক্রম করিয়া বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিতেছে, কেবল এই দুই জাতীই উৎসাহও উদ্যমপূর্ণ নব যৌবনে উপস্থিত।—যদিও আমেরিকানিবাসী সভ্যজাতিমণ্ডলী ইউরোপীয় জাতি হইতে উৎপন্ন, কিন্তু এক্ষণে তাহাদের সম্পূর্ণরূপেই নব জীবন।—রুসিয়া-তুর্কির যুদ্ধ মনুষ্য জাতির ইতিহাসে একটি সুমহৎ ঘটনা। আমরা কেবল ইহার সূত্রপাত দেখিতেছি, কিন্তু ইহার সুনিবিড় ছায়া অতি দূর ভবিষ্যতে পড়িতেছে। ইহা ব্যতীত আর একটি কারণ বশত রুসিয়াসংক্রান্ত কোন বিষয়ই আমাদের নিকট ঔদাস্যভাজন নহে। রুসিয়ার সহিত আমাদের দেশের এত সৌসাদৃশ্য যে দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়; যে সকল আর্য্য রীতিনীতি বৈদেশিক প্রভাব বশত এদেশ হইতে অন্তর্হৃত হইয়াছে, কিম্বা মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত, সেই সকল রীতিনীতি অতি অল্পকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রুসিয়ায় পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত ছিল, এবং এক্ষণেও অতি অল্প মাত্রই বিলুপ্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মনুষ্যজাতির আদিম অবস্থার তত্ত্বানুসন্ধানে নিবিষ্ট লোকেরা রুসিয়ার ইতিবৃত্তে যথেষ্ট গুপ্ত রত্নেরখনি পাইবেন। বাস্তবিকই রুসিয়া-সাম্রাজ্য-গত অনেক ঘটনাই বিশেষ কৌতূহলজনক। এই সকল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করাই বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

১। যাতায়াতের বিধি।

কোন দেশের বিবরণ লিখিতে হইলে তথাকার রাস্তাঘাট ও যানাদি ভ্রমণকারীর চক্ষে প্রথমে পড়ে বলিয়া সর্ব্বাগ্রে উল্লিখিত হয়, এবং যানাদির মধ্যে ইউরোপীয় সভ্যদেশে লৌহপথকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। আমাদের এই প্রচলিত প্রথার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করিতে ইচ্ছা নাই। (Almanach de Gather) দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে ইয়ুরোপে রুসিয়ার ব্যাপ্তি ১,৫৫৫,৭৭ বর্গমাইল এতদ্ব্যতীত ৪,৩২৮,৬৪০ বর্গমাইল এবং সর্ব্ব শুদ্ধ ৫,৮৮৪,৪১৬ বর্গমাইল স্থান সেণ্টপিটার্স বর্গের সম্রাটের ক্ষমতার অধীন। ক্রাইমিচার যুদ্ধের সময় ইহার মধ্যে কেবল ৬০০ মাইলের উপর লৌহবর্ত্ম ছিল। সেই যুদ্ধের পর হইতে লৌহপথ ক্রমেই বাড়িতেছে এবং এক্ষণে দেড় লক্ষ মাইল স্থানের উপর বাষ্পীয় শকট গমনাগমন করে। লৌহবর্ত্মের সম্বন্ধে একটি অতি বিস্ময়কর কার্য্য বর্ণিত আছে। সেণ্টপিটর্স বর্গ হইতে মাস্কা পর্য্যন্ত লৌহ

পথ প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব হইলে ইঞ্জিনীয়ারেরা প্রস্তাবিত পথের নক্সা করিয়া সম্রাটকে প্রদর্শন করায়, সম্রাটের কোন কারণবশতঃ এই বিশ্বাস হইল যে ইঞ্জিনীয়ারেরা স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অকারণ পথ বাঁকাচোরা করিয়াছে। ইঞ্জিনীয়ারদিগকে অর্থলিপ্সার জন্য শাস্তিবিধান করিতে এবং ভবিষ্যতে এবিষয়ে আর কোন কথা না হয়, এই জন্য সম্রাট একটি রুল ও একটি পেনসিল লইয়া উক্ত নগরদ্বয় মধ্যে একটি সরলরেখা টানিয়া দিয়া বলিলেন যে "এই রেখা অনুসারে পথ প্রস্তুত করিতে হইবে।" তদনুরূপ লৌহপথ হওয়ায় ত্বার [Tver] ব্যতীত অন্য কোন নগরের কিছুমাত্র সুবিধা হয় নাই। রুসিয়ার সম্রাটের এই এক বিচক্ষণতার উদাহরণ। এই ঘটনা বর্ত্তমান সম্রাটের পিতা নিকলাসের সময় হইয়াছিল। ক্রাইমিয়ার যুদ্ধে রুসিয়ার পরাভবের এক প্রধান কারণ গতিবিধির অসুবিধা। উক্ত যুদ্ধের পর হইতে রুসিয়ানেরা যুদ্ধকৌশলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া সমুদয় কলের গাড়ীর পথ নির্ম্মাণ করিয়াছে। কোন একটা লৌহপথ প্রস্তুত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বিজ্ঞ সেনানায়কদিগের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। অন্যান্য দেশে কোন স্বাধীন ব্যবসায়িক সম্প্রদায় লৌহপথ-নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্য করিতে হইলে স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু রুসিয়ার সম্রাট যেরূপ অনুজ্ঞা দেন সেইরূপই করিতে হইবে, এবং সর্ব্বাগ্রে শাসন তন্ত্রের সহিত সেই কার্য্যের ফলের সম্পর্ক বিশেষ করিয়া রাজপুরুষদিগকে বুঝাইয়া দিতে হয়, সুতরাং রুসিয়ার স্বাধীন ব্যবসায়িক সম্প্রদায়েরাও যে কোন লৌহপথ করে তাহাতে সম্রাটেরই প্রত্যক্ষ পক্ষে লাভ হয়। যাহা হউক, রুসিয়ার লৌহপথ সকল এরূপ কৌশলে সংস্থাপিত যে এক্ষণে রুসিয়া কোন শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে অতি অল্পক্ষণমধ্যে আক্রান্ত স্থানে ইচ্ছানুরূপ সৈন্যসমবেত হইতে পারে, কিন্তু অন্যান্য দেশ অপেক্ষা রুসিয়ার বাষ্পীয় শকটের গতি মৃদু।

রুসিয়ার বাষ্পীয় জলযানের বন্দোবস্ত অন্যান্য দেশের মত নহে। তথাকার নদী সকল যদিও পৃথিবীর অপরাংশের নদী হইতে দৈর্ঘ্যপ্রস্থে বিশেষ নিকৃষ্ট নহে বটে, তবুও আমাদের দেশের নদীর ন্যায় তৎসমুদয় স্থানে স্থানে এত চড়া ও চোরাবালি পরিপূর্ণ যে তন্মধ্যে জাহাজাদির গতিবিধির বিশেষ সুবিধা নাই, কিন্তু ইহাতে রুসিয়ানেরা হতাশ্বাস হয় নাই। কাপ্তেনেরা নিজ নিজ বাষ্পীয় জলজানে বিনা ভাড়ায় ডননদীর উপকূল-নিবাসী কসাকদিগকে যাতায়াত করিতে দেয়। কোনস্থানে জলযান আটকাইয়া যাইলে এই কসাকেরা জলে নাবিয়া দড়ীদিয়া ষ্টীমার টানিয়া লইয়া যায়। এই সকল কসাকদিগের এক প্রস্ত কাপড়মাত্র আছে, সুতরাং তাহা জলে ভিজিয়া যাইলে কখন কাপড় পরিবর্ত্তণ করিতে পারে না; কিন্তু তাহাতে ইহাদের বিশেষ অসুবিধা নাই; বাত ও শর্দ্দির সহিত ইহারা কখন পরিচিত হয় না। কিন্তু এই সকল নদীতে বাষ্পীয় জলযানের যাতায়াতের পক্ষে যে

রূপ অসুবিধা আছে, সেইরূপ ইহাতে একটি সুবিধাও আছে। ভল্গা প্রভৃতি নদীতে স্রোতের গতি এত মন্দ যে ছোট ছোট টানিবার ষ্টীমার (Tug) দ্বারা বড় বড় শষ্যাদিপূর্ণ জাহাজ টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। ইহাতে শষ্যবাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা, কেন না বন্দরে লইয়া যাইবার অনেক ভাড়া বাঁচিয়া যায়। আমাদের দেশীয় নদীর তীরে যেরূপ অপর্য্যাপ্ত প্রকৃতির শোভা, রুসিয়ায় সেরূপ নহে ; সেখানে নদীর ধারে প্রায়ই সুন্দর দৃশ্য নাই,কেবল ভল্গার তীরে এক-স্থানে একশ্রেণী ক্ষুদ্র পর্ব্বত দ্বারা দৃশ্যটি অতিশয় মনোহর হইয়াছে। রুসিয়ায় ভাল চিত্রকরের দুর্ভিক্ষের এই বোধ হয় এক কারণ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে রুসিয়ার আয়তন এত বৃহৎ যে ইহার অনেক অংশেই ধূমকলের বংশীধ্বনী কখন শ্রুতিগোচর হয় নাই। এই সকল স্থানে গমনাগমন বিশেষ সহজ ব্যাপার নহে। রুসিয়ার রাস্তা ঘাট ও শকটাদি এইরূপ যে তাহাদের বিবরণ পাঠ করিলে মনে হয় যেন উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের কোন প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছি। রুসিয়ায় ভ্রমণের উপযোগী শকটের মধ্যে টারেণ্টাসই সর্ব্বাপেক্ষা চলিত। ইহা এক প্রকার স্প্রিংবিহীন গাড়ী ; ইহার ছাদ নাই, কারণ রুসিয়ার রাস্তা ঘাট এমনি উচ্চ-নীচু এবং সেই হেতু আরোহীগণ মধ্যে মধ্যে এরূপ সবলে উৎক্ষিপ্ত হয় যে মাথায় শক্ত আচ্ছাদন না থাকিলে গুরুতর আঘাত পাইবার সম্ভাবনা। বৃষ্টির সময় এই সকল গাড়ী কাপড়ের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হয়। সেই সময় টারেণ্টাসের সহিত পশ্চিমের রথ কিম্বা বহেলীর সহিত বিশেষ প্রভেদ থাকে না। বহেলী কিম্বা রথে সচরাচর দুই কিম্বা চারিটি গরু কিম্বা ঘোড়া জোড়া হয়, কিন্তু তিন ঘোড়ার কম টারেণ্টাস টানা হয় না। রুসিয়ার রাস্তায় গমনাগমন করা সকল সময়েই প্রায় কষ্টকর, কিন্তু শীতকালে এক স্তর বরফ জমিয়া যাইলে গাড়ী চলার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। কিন্তু পথিককে এক বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হয়। রুসিয়ার শীতকাল অতি ভয়ানক,এবং শরীরের নাসিকাদি অনাচ্ছাদিত অংশের উপর শীতের বিশেষ তীব্র আক্রোশ। এই রূপ শীতাক্রান্ত শরীরাংশের সময়ে প্রতিকার না করিলে উহা নিশ্চয়ই পচিয়া যায়। এই দুর্ঘটনার সম্ভাবনা যত অধিক, ইহার প্রতিকারের উপায়ও সেইরূপ সহজ। শীতক্লিষ্ট শরীরে বরফ ঘসিলে আর কোন ভয় থাকে না। যখন বরফ গলিতে আরম্ভ হয় তখন রাস্তাপথ এরূপ কদর্য্য হয় যে যাতায়াত এক প্রকার বন্ধ হইয়া যায়। বিশেষ কার্য্য না থাকিলে কেহ বাটীর বাহির হয় না।

আমাদের দেশে অধিক দূর ভ্রমণ করিতে হইলে পোষ্ট আফিস কিম্বা পুলিসের লোকের সাহায্যে ডাক বসাইতে হয়, রুসিয়াতেও সেইরূপ। কিন্তু এদেশে যেমন ডাক বসাইবার উপদেশও টাকা দিলেই নির্ভাবনা, রুসিয়ায় সেরূপ নহে। মিঃ ওয়ালেস্ কহেন যে এক দিবস তিনি ও তাঁহার এক জন

রুসিয়ানবন্ধু অপরাহ্নে একটি ডাকঘরে উপস্থিত হইলেন।—পূর্ব্বে সেই ডাকে উপযুক্ত সংবাদাদি পাঠান হইয়া ছিল।—উপস্থিত হইয়া নূতন ঘোড়া চাহোয়াতে সেই স্থানের কর্ম্মচারী বলিল যে পরদিন প্রাতঃকালে না হইলে নূতন ঘোড়া পাওয়া যাইবে না। তৎপরে মিঃ ওয়ালেস্ অন্যত্র হইতে ঘোড়া লইবার মানসে বাহির হইবেন এমন সময় সেই কর্ম্মচারী [এক জন বলিষ্ঠ ডনকসাক]—তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল যে"আপনারা পথিকদিগের মন্তব্য লিখিবার পুস্তকে আমার নামে দোষারোপ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা কাটিয়া না দিলে যাইতে পাইবেন না।" এই বলিয়া বলপ্রয়োগ করিবার উদ্যোগ করিল। পথিকদ্বয় এইরূপে বিপদ্‌গ্রস্থ হইয়া স্থির করিলেন যে রুসিয়ান বন্ধু উভয়ের তৈজসপত্র রক্ষার নিমিত্ত সেই স্থানে থাকিবেন, ও মিঃ ওয়ালেস শান্তিরক্ষকদিগের সাহায্য-অনুসন্ধানে বহির্গত হইবেন। সেইরূপ কার্য্য করা হইল; কতক্ষণ পরে মিঃ ওয়ালেস্ শান্তিরক্ষার প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত ফিরিয়া আসিলেন। প্রধান কর্ম্মচারী কোন কার্য্যবশতঃ সেই গ্রামে উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা আসিয়া দেখিলেন যে রুসিয়ান ভদ্রলোকটি ডাকঘরের কর্ম্মচারী ও অন্য দুই জন লোকে পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন, এবং উহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য রিভল্‌ভর আওয়াজ করিছেন, কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ কেহই আহত হয় নাই। প্রধান কর্ম্মচারীকে দেখিবামাত্র কসাক কর্ম্মচারী রুসিয়ান ভদ্রলোকের নামে হত্যা করিবার উদ্যোগ প্রভৃতি নানা অপরাধের জন্য অভিযোগ করিল। কর্ম্মচারী অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে সকল বিষয়ের নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন। এরূপ তৎপরতা বিস্ময়কর ও এদেশে বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

রুসিয়ার কোন কোন প্রদেশে এক প্রকার উষ্ট্রের গাড়ী প্রচলিত আছে, তাহার প্রতিরূপ পশ্চিমে পাওয়া যায়। উষ্ট্রের দ্বারা কৃষিকার্য্যও চলিয়া থাকে।

শুকতারা।

কে তুমি ত্রিদিববাসী, ওলো সুলোচনে !
একাকিনী উষাকালে দাও দরশন ?
মেলিয়া অলস আঁখি, বসিয়া বিজনে,
কার পথ চেয়ে আছ, রমণীরতন ?
কি দেখিছ গগনের হৈমদ্বার খুলি,
দেখিবার কিবা আছে আঁধার সংসারে ?
কার ধ্যান কর তুমি নিশা গেলে চলি ?
কৃপা করি, সুরনারি, কহনা আমারে ?
একভাবে একবেশে একই সময়,
হাসি মুখে দাও দেখা ভুবনমোহিনী ;
হেরিয়া তোমার রূপ জুড়ায় হৃদয়,
তাই নিত্য আসি হেথা পোহালে যামিনী।

অপরূপ রূপরাশি, হে সুরসুন্দরি,
দেখি তোমা পাখীগণ উঠে কূজনিয়া ;
সহসা জগৎ যেন জাগে হাস্য করি ;
উল্লাসে প্রভাত বায়ু বেড়ায় খেলিয়া।

দিনের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী, তুমি সো ললনে,
নিরখি তোমারে তাই ধরনী হাসিল,
হাসিল কুসুম-কলি বিকচ বদনে,
শাখীশাখা লতাপাতা নাচিতে লাগিল।

অথবা কল্পনা তুমি—কবিতার সার,
উষায় উদয়শোভা আস' দেখিবারে,
সুখে খুলি এসময় সুরপুর-দ্বার,
অনিমেষ নেত্রে হের শোভা চারিধারে।

তুমি কি, গো, আশাদেবী ? যার মায়াবলে,
জল্লাদ-কুঠারতলে লোকে হাস্যমুখ ;
শোকদুঃখ পাসরিয়ে নিবশে কুশলে,
প্রবাসী সহজে ভুঞ্জে স্বদেশের সুখ ?

তাই কি তোমারে হেরে ফুটিল কমল,
নাথ বিনা ছিল যেই লীন সরোবরে ;
আঁধার সংসার পুনঃ হইল উজল ;
উদিত কতই আশা জাগ্রত অন্তরে !

সুনিদ্রিত শিশু যথা স্বর্গীয় স্বপনে,
সহসা হাসিয়া উঠে শান্ত শয্যাতলে ;
সেরূপ সরল হাসি বিমল বদনে,
হেরি, তব, সুহাসিনি, পুলকে সকলে।

যত সুখ মম মনে তোমা দরশনে,
নিজ রূপে হয় কি, গো, সে সুখ তোমার ?
অথবা পরের সুখে সুখী তুমি মনে,
তাই দাঁড়াইয়া থাক খুলি স্বর্গদ্বার ?
নাহি জানি কেবা তুমি—কার প্রাণধন,
একাকিনী হেনকালে গগন প্রাঙ্গনে ?

এ বিরলে বল তব কিবা প্রয়োজন ?
অনন্ত আকাশে একা বসি কি কারণে !

প্রেমের ভিখারী তুমি হেন লয় মনে,
নবীনা যোগিনী সম রূপের আধার ;
অনায়াসে একাকিনী অনন্ত গগনে,
ভ্রমিছ প্রেমের আশে খুজি ত্রিসংসার ?

ভুঞ্জিয়া সমস্ত নিশা পতি সহবাসে,
আসি দাঁড়াইলে, দিয়া প্রাণেশে বিদায়,
সুরপুর মনোহর গবাক্ষের পাশে,
দেখিবারে নাথে, যত দূর দেখা যায়।

অথবা প্রাণেশ আশে যাপিয়া যামিনী,
আর গৃহে একাকিনী থাকিতে নারিলে ;
তাই কি রজনী শেষে, ওলো সিমন্তিনি,
বাহির হইয়া আসি পথে দাঁড়াইলে ?

হায় ! মূঢ়মতি আমি কি কহি তোমারে !
বিরহবেদনা, কি গো, আছে স্বর্গধামে ?
অমরে সে বিষে, কি গো, দহিবারে পারে,
মরলোক সবিষাদে কাঁদে যার নামে ?

বুঝেছি বুঝেছি আমি, ওলো, দয়াবতি !
নহে ও তোমার, হায় ! বিরহ অনল ;
মানবের দুঃখ দেখি কাঁদ তুমি, সতি !
প্রত্যহ প্রভাতে তব বহে চক্ষে জল।

ওই যে মুকুতারাশি শোভে দুর্ব্বাদল,
নিশির শিশিরবিন্দু কভু ওতো নয় ;
তোমার চক্ষের জল ঝরি অবিরল,
নিলীম প্রান্তর যেন সব মুক্তময়।
কল্পনা কহিছে কানে, "যখন ভুবন,
অনন্ত আঁধারময় ছিল নিরাকার,
রূপশূন্য রেখাশূন্য নিবিড় ভীষণ,
শূন্যময় ঘোরতর সব একাকার !

অনন্ত জগৎজ্যোতিঃ যিনি জ্যোতির্ম্ময়,
একটী স্ফুলিঙ্গ তাঁর প্রথম উঠিল ;
অনন্ত আকাশে সেই প্রথম সময়,
অনন্ত আঁধারে সেই প্রথম ভাতিল ?

সেই তো আদিম তারা, তুমি শুকতারা !
উদিল প্রথম দিন তোমা লয়ে ভালে ;
অসীম আকাশে দীপ তুমি তারাকারা,
প্রথম আঁধারে রেখা তুমি উষাকালে !

সূর্য্যচন্দ্র আদি যত গ্রহতারাগণ,
উঠিয়া তোমার আগে তোমায় নমিল,
নাচিল তোমায় সবে করিয়া বেষ্টন,
আঁধার সংসার যবে নিয়মে পশিল।

উদিল প্রথম তরু তোমার গোচর,
নদনদী মেরুমরু তব পদতলে,
ঢুলালে তোমায় বায়ু প্রথম চামর,
প্রথম প্রসূন তোমা পূজে কুতহলে।

প্রথম জীবের সৃষ্টি তোমার সদনে,
শিখিল প্রথম পাখী করিতে কূজন,
বন্দিল তোমায় নরে অস্ফুট বচনে,
সঞ্চরিল তব আগে জীবের জীবন।

প্রথম জীবের সুখে তুমিই হাসিলে,
যখন তোমার আগে হাসিল সকলে,
প্রথম জীবের দুঃখে তুমিই কাঁদিলে,
কাঁদিল কাতরে যবে তাহারা সকলে।

প্রথম প্রেমের গীত করেছ শ্রবণ,
প্রথম কেঁদেছ দেখি বিরহ-বেদনা;
প্রথম প্রেমের কলি করেছ দর্শন,
প্রথম দহেছ দেখি দারুণ ছলনা।
গোকুলের লীলা আদি নাহি অগোচর,
দেখেছ কালের স্রোত সত্যত্রেতাকলি,
ত্রিকাল তোমার কণ্ঠে—ঘটনা নিকর—
তোমার হৃদয়ে গাঁথা আছে সে সকলি।

কত হলো, কত গেল, সুরাসুর নর,
রাজ্যপাট গিরিনদী এ তিন ভুবনে,
ইন্দ্রপাত, চন্দ্রপাত—মরিল অমর,
তুমি কিন্তু একভাবে জাগিছ গগনে।

সময়প্রস্তরহৃদে লিখেছে সংহার,
তোমার কপালে কিন্তু নহি তার লেখা ;
অনন্ত যৌবন তব—চিরজ্যোতিঃ তার,
কভু তব স্বচ্ছ ভালে না পড়িবে রেখা।

অমরে মরিয়া যাবে, মরিবে পবন,
শুখাবে অসীম সিন্ধু, ডুবিবে ধরণী,
হিমাদ্রী হইবে চূর্ণ, টলিবে ভুবন,
তখন রহিবে জাগি তুমি বিনোদিনি !

দেখিয়া তোমার মুখ জাগে মম মনে,
আদি ভারতের সেই শান্তি নিকেতন ;
বৃক্ষমাঝে পর্ণগৃহ শোভিত-প্রাঙ্গণে,
সদা সুখে নিবসিত বিনম্র বদন !

অনন্ত আকাশে যথা তব শোভা পায়,
প্রান্তরে কুটীরগুলি দেখিতে তেমন,
উগ্রমূর্ত্তি, উচ্চ আশা, দম্ভস্ফীত কায়
কভু না জানিত, আহা ! সে সুখ ভবন।

সভ্যতাসূর্য্যের করে ঝলসে নয়ন,
অসহ্য হয়েছে সভ্যতার কোলাহল,
অসন্তোষ, দ্বেষ, হিংসা পূরিল ভুবন,
শিহরে পরাণ হেরে অন্তর-গরল।

নাহিক মধুর হাসি, খল হাসি হাসে,
অরুণলোচন এবে সভ্যতা প্রভায়,
ছলনা, চাতুরী, হায় ! সবে ভালবাসে,
অকপট সখ্যভাব নানি স্থান পায়।

হয়েছে বিস্তর বটে নানা মত কায,
তুঙ্গে তুঙ্গে অট্টালিকা উঠেছে গগনে,
ছুটেছে বাষ্পীয় রথ—বায়ু পায় লাজ,
বিদ্যুৎ পড়েছে ধরা দাসত্ব বন্ধনে!

বেঁধেছে জলধি-জল—ছেয়েছে গগন,
অসংখ্য পোতের ধ্বজে প্রকাশি বিভব,
বিহঙ্গ যাইতে যথা না পারে কখন,
মেঘমালা ভেদ করি উড়িছে মানব।

কিন্তু সে বিকটঠাঠ, দম্ভ-উচ্চ-মুখ,
ভাল মম নাহি লাগে জনতা ভীষণ,
নাহি চাই সভ্যতার আড়ম্বর সুখ,
কোমল মধুর মূর্ত্তি চাহে মম মন।

তাই দিবাকর ছাড়ি তোমা মম আশা,
তাই চাই জনশূন্য নিভৃত বিজনে,
তাই উষাকালে মম এত ভালবাসা,
শান্তিমূর্ত্তি আঁকা আছে যাহার বদনে।

সুখের কাল কি হায়! রহে বহুক্ষণ,
দেখিতে দেখিতে আহা! কি হলো তোমার,
তুমিও মনের দুঃখে মুদিছ নয়ন,
কোথায় চলিছ সতি! নিঃশব্দে আবার?

দেখিয়া তোমার ওই করুণ মূরতি,
ক্ষীণালোক দেহখানি—অস্ফুট দর্শন,
অশোক কাননে হায়! জানকী যেমতি,
মলিন বসনে বসি বিষণ্ণ বদন।

বিস্তারি অনন্ত জ্যোতিঃ জলন্ত তপন,
সুদূরে মেলিল আঁখি উদয়অচলে,
তুমিও উষার সখি, করিলে গমন,
ঢাকিয়ে বদনখানি মেঘের অঞ্চলে।

বিচিত্র বিধির বিধি এপাপ সংসারে,
বড়র দাপটে দেখ অস্থির ভুবন,
ধীর নম্র শান্ত সাধু তিষ্ঠিবারে নারে,
উগ্রমূর্ত্তি-রুদ্রবেশ সতের শমন।

রহ রহ! ক্ষণ দেখি পূরিয়া নয়ন,
মধুমাখা মুখখানি, গো সুরসুন্দরি,
প্রেমের প্রতিমা সম তোমার আনন,
স্বচ্ছদৃষ্টি-স্থিরজ্যোতিঃ লাবণ্য লহরী।

কি দিব উপমা আমি ওমুখের সনে,
কি আছে জগতে, বল, ওরূপের কাছে,
হেরেছে কি কভু কেহ ওরূপ নয়নে,
ধরার কি কব কথা! ত্রিদিবে কি আছে।

শ্রীপঃ

করুণা।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পণ্ডিত মহাশয় সকালে উঠিয়া দেখিলেন, কাত্যায়নী ঠাকুরাণী গৃহে নাই। ভাবিলেন, গৃহিনী বুঝি পাড়ার কোন মেয়ে মহলে গল্প ফাঁদিতে গিয়াছেন। অনেক বেলা হইল, তথাপি তাঁহার দেখা নাই; তা মাঝে মাঝে প্রায়ই তিনি এরূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় আর বেশীক্ষণ স্থির থাকিতে পারিলেন না, যেখানে যেখানে ঠাকুরাণীর যাইবার সম্ভাবনা ছিল, খোঁজ লইতে গেলেন। মেয়েরা চোক টে-

পাটিপি করিয়া হাসিতে লাগিল, কহিল, "মিন্সা এক দণ্ড আর কাত্যায়নীপিসিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, কোথায় গিয়াছে বুঝি, তাই খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন; কিন্তু পুরুষমানুষের অতটা ভাল দেখায় না।" তাহার মানে, তাঁহাদের স্বামীরা অতটা করেন না, কিন্তু যদি করিতেন, তবে বড় সুখের হইত। যেখানে কাত্যায়নীর যাইবার সম্ভাবনা ছিল, সেখানে ত পণ্ডিত মহাশয় খুঁজিয়া পাইলেন না, যেখানে সম্ভাবনা ছিলনা, সেখানেও খুঁজিতে গেলেন, সেখানেও পাইলেন না। এই ত পণ্ডিত মহাশয় ব্যাকুল হইয়া মুহুর্মুহু নস্য লইতে লাগিলেন। ঊর্দ্ধশ্বাসে নিধিদের বাড়ি গিয়া পড়িলেন। নিধি জিজ্ঞাসা করিল, ঘোষেদের বাড়ি দেখিয়াছেন, মিত্রদের বাড়ি দেখিয়াছেন, দত্তদের বাড়ি খোঁজ লইয়াছেন? এই রূপে মুখুয্যে চাটুয্যে, বাঁড়ুয্যে, ইত্যাদি যত বাড়ি জানিত, প্রায় সকল গুলিরই উল্লেখ করিল, কিন্তু সকল তাতেই অমঙ্গল উত্তর পাইয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য ভাবিতে লাগিল। অবশেষে নিধি নিজে নরেন্দ্রের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল। শূন্য গৃহ যেন হাঁ হাঁ করিতেছে। বিষণ্ণ বাড়ির চারি দিক যেন কেমন অন্ধকার হইয়া আছে, একটা কথা কহিলে দশটা প্রতিধ্বনি যেন ধমক দিয়া উঠিতেছে। একটা চাকর রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে সোপানের উপর পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছিল, নিধি তাহাকে জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গদাধর বাবু কোথায়?" সে কহিল "কাল রাত্রে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, আজো আসেন নাই, বোধ হয় কলিকাতায় গিয়া থাকিবেন।" নিধি ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে কহিল "যদি খুঁজিতে হয়, ত, কলিকাতায় গিয়া খোঁজগে।" পণ্ডিত মহাশয় ত একথার ভাবই বুঝিতে পারিলেন না। নিধি কহিল, "গদাধর নামে একটি বাবু আসিয়াছেন, দেখিয়াছ?" পণ্ডিত মহাশয় শূন্যগর্ভ একটি হাঁ দিয়া গেলেন। নিধি কহিল "সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে কাত্যায়নীপিসি কলিকাতা ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন।" পণ্ডিত মহাশয়ের মুখ শুকাইয়াগেল; কিন্তু তিনি একথা কোন ক্রমেই বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। তিনি কহিলেন, তিনি নন্দীদের বাড়ি ভাল করিয়া দেখেন নাই, সেখানেই নিশ্চয় আছেন। এই বলিয়া নন্দী আদি করিয়া আর একবার সমস্ত বাড়ি অন্বেষণ করিয়া আসিলেন, কোথাও সন্ধান পাইলেন না। ম্লান বদনে বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন। নিধি কহিল "আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে, এরূপ ঘটিবে।" কিন্তু তিনি পূর্ব্বে কোন দিন এ সম্বন্ধে কোন কথা বলে নাই। সিন্দুক খুলিতে গিয়া পণ্ডিত মহাশয় দেখিলেন, কাত্যায়নী ঠাকুরাণী শুদ্ধ যে নিজে গিয়াছেন, এমন নহে, যত কিছু গহনাপত্র, টাকাকড়ি ছিল, তাহার সমস্ত লইয়া গিয়াছেণ। দ্বার রুদ্ধ করিয়া পণ্ডিত মহাশয় সমস্ত দিন কাঁদিলেন। নিধি কহিল এসমস্তই নরেন্দ্রের ষড় যন্ত্রে ঘটিয়াছে, তাহার নামে নালিস করা হউক, আমি সাক্ষী তৈয়ার

করিয়া দিব।' নিধি এরূপ একটা কাজ হাতে পাইলেই বাঁচিয়া যায়। পণ্ডিত মাহাশয় কহিলেন, যাহা তাঁহার ভাগ্যে ছিল হইয়াছে, তাই বলিয়া তিনি নরেন্দ্রের নামে নালিস করিতে পারেন না।

নিধিকে লইয়া পণ্ডিত মহাশয় কলিকাতায় আসিলেন। একদিন দুই প্রহরের রৌদ্রে পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রান্ত স্থূল দেহ, কালীঘাটের ভিড়ের তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছে, এমন সময়ে সম্মুখে একটি সেকেণ্ড ক্লাসের গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। পণ্ডিত মহাশয়ের মন্দির দেখা হইয়াছে, কালীঘাট হইতে চলিয়া যাইবেন তাহার চেষ্টা করিতেছেন; গাড়ি দেখিয়া তাহা অধিকার করিবার আশয়ে কোন প্রকারে ভিড় ঠেলিয়া ঠুলিয়া, সেই দিকে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, গাড়ি হইতে প্রথমে একটি বাবু; ও তাঁহার পরে একটি রমনী হাসিতে হাসিতে,পান চিবাইতে চিবাইতে গাড়ি হইতে নামিলেন ও হেলিতে দুলিতে মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। পণ্ডিত মহাশয় সে রমণীকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন, সে রমনীটি তাঁহারি কত্যায়নী ঠাকুরাণী! তাড়াতাড়ি ছুটিয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কাত্যায়নী তাঁহার উচ্চতম স্বরে কহিলেন, 'কেরে মিন্সে? গায়ের উপর আসিয়া পড়িস্ যে? মরণ আর কি!' এই রূপ অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা গালাগালি বর্ষণ করিয়া অবশেষে পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার চোখের মাতা খাইয়াছেন কি না ও বুড়া বয়সে এরূপ অসদাচরণ করিতে লজ্জা করেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় দুইটি প্রশ্নের কোনটির উত্তর না দিয়া হাঁ করিয়া দাড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, মনে হইল যেন এখনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবেন। কাত্যায়নীর সঙ্গে যে বাবু ছিলেন, তিনি ছুটিয়া আসিয়া, তাঁহার ফিটিকের বাড়ি পণ্ডিত মহাশয়কে দুই একটা গোঁজা মারিয়া ও বিজাতীয় ভাসায় যথেষ্ট মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া, ইংরাজী অর্দ্ধস্ফুট স্বরে পাহারাওয়ালা পাহারাওয়ালা করিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। পাহারাওয়ালা আসিল, ও পণ্ডিত মহাশয়কে ঘিরিয়া দশসহস্র লোক জমা হইল। বাবু কহিলেন, এই লোকটি তাঁহার পকেট হইতে টাকা তুলিয়া লইয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় ভয়ে আকুল হইলেন, ও কাঁদো কাঁদো স্বরে কহিলেন "না বাবা আমি লই নাই,তবে তোমার ভ্রম হইয়া থাকিবে, আর কেহ লইয়া থাকিবে।" চোর, চোর, বলিয়া একটা ভারি কলরব উঠিল,চারিদিকে কতকগুলা ছোঁড়া জমিল, কেহ তাঁহার টিকি ধরিয়া টানিতে লাগিল,কেহ তাঁহাকে চিমটি কাটিতে লাগিল, পণ্ডিত মহাশয় থতমত খাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার ট্যাঁকে যত টাকা ছিল, সমস্ত লইয়া বাবুটিকে কহিলেন, "বাবা, তোমার টাকা হারাইয়া থাকে যদি, তবে এই লও, আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, তোমার পায়ে পড়িতেছি আমাকে রক্ষা কর।" ইহাতে তাঁহার দোষ অধিকতর সপ্রমাণ হইল, পাহারাওয়ালা তাঁহার হাত ধরিল। এমন সময়ে নিধি চোক্ মুখ রাঙা-

ইয়া ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। নিধির এক সুট চাপকান পেণ্টুলুন ছিল, কলিকাতায় সে চাপকান পেণ্টুলুন ব্যতীত ঘর হইতে বাহির হইত না। চাপকান পেণ্টুলুন পরা নিধি আসিয়া যখন গম্ভীর স্বরে কহিল, "কোন হ্যায় রে!" তখন অমনি চারিদিক স্তব্ধ হইয়া গেল। নিধি পকেট হইতে এক টুকুরা কাগজ ও পেন্সিল বাহির করিয়া পাহারাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার নম্বর কত, ও সে কোন থানায় থাকে, এবং উত্তর না পাইতে পাইতে সম্মুখস্থ ছেক্‌রা গাড়ির কোচম্যানকে জিজ্ঞাসা করিল, লালদিঘির এণ্ড্রুসাহেবের বাড়ি জান? পাহারায়ালা ভাবিল, না জানি এণ্ড্রুসাহেব কে হইবে? ও দাড়ি চুলকাইতে চুলকাইতে বাবু, বাবু করিতে লাগিল। নিধি তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সেই বাবুটিকে জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়, আপনার বাড়ি কোথয়? নাম কি?" বাবুটি গোলমালে সট্ করিয়া সরিয়া পড়িলেন, এবং সে পাহারায়ালাটিও অধিক উচ্চবাচ্য না করিয়া ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া পড়িল। ভিড় চুকিয়া গেল, নিধি ধরাধরি করিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে একটি গাড়িতে লইয়া গিয়া তুলিল, এবং সেই রাত্রেই দেশে যাত্রা করিল। বেচারী পণ্ডিতমহাশয়, লজ্জায় দুঃখে কষ্টে বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। নিধি কহিল, কত্যায়নীর নামে গহনা ও টাকা চুরির নালিশ করা যাক। পণ্ডিত মহাশয় কোন মতে সম্মত হইলেন না।

দেশে ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিত মহাশয় করুণার সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিলেন। তিনি কহিলেন, এগ্রামে থাকিয়া আর কি করিব। শূন্য গৃহ ত্যাগ করে কাশী চলিলাম। বিশ্বেশ্বরের চরণে এ প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।" এই বলিয়া পণ্ডিতমহাশয় ঘরদুয়ার সমস্ত বিক্রয় করিয়া কাশী চলিলেন। পাড়ার সমস্ত বালকেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, অশ্রুপূর্ণ নয়নে তিনি সকলকে আদর করিলেন। এমন একটি বালক ছিলনা,যে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলে নাই। এইরূপে কাঁদিতে কাঁদিতে পণ্ডিত মহাশয় গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অনেক লোক দেখিয়াছি কিন্তু তেমন ভাল মানুষ আর দেখিলাম না।

নরেন্দ্রের বাড়িঘরসমস্ত নিলামে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। নরেন্দ্র গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে। কোথায় আছে, কে জানে!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মহেন্দ্র চলিয়া গেলে রজনী মনে করিল, আমিই বুঝি মহেন্দ্রের চলিয়া যাইবার কারণ! মহেন্দ্রের মাতা মনে করিলেন যে, রজনী বুঝি মহেন্দ্রের উপর কোন কর্কশ ব্যবহার করিয়াছ, আসিয়া কহিলেন— "পোড়ারমুখী, ভাল এক ডাকিনীকে ঘরে আনিয়াছিলাম!" রজনীর শ্বশুর আসিয়া কহিলেন, "রাক্ষসী! তুই এ সংসার ছারখার করিয়া দিলি!" রজনীর ননদ আসিয়া কহিলেন—"হতভাগিনীর সহিত দাদার কি কুক্ষণেই বিবাহ হইয়াছিল!' রজনী একটি

কথাও বলিল না। রজনীর নিজেরই যে আপনার প্রতি দারুণ ঘৃণা জন্মিয়াছিল, সেই ঘৃণার যন্ত্রনায় সে মনে করিল, বুঝি ইহার একটি কথাও অন্যায় নহে, সে মনে করিল, যে তিরস্কার তাহাকে করা হইতেছে, সে তিরস্কার বুঝি তাহার যথার্থই পাওয়া উচিত। রজনী কাহাকেও কিছু বলিল না, একবার কাঁদিলওনা, এ কয়দিন তাহার মুখশ্রী অতিশয় গম্ভীর—অতিশয় শান্ত—যেন মনে মনে কি একটি সংকল্প করিয়াছে, মনে মনে কি একটি প্রতিজ্ঞা বাঁধিয়াছে। এই দুইমাস হইল মহেন্দ্র বিদেশে চলিয়া গিয়াছে, এই দুই মাস ধরিয়া রজনী যেন কি একটা ভাবিতেছিল, এত দিনে সে ভাবনা যেন শেষ হইল, তাই রজনীর মুখ অতি গম্ভীর, অতি শান্ত দেখাইতেছে।

সন্ধ্যা হইলে ধীরে ধীরে সে মোহিনীর বাড়িতে গেল। মোহিনীর সহিত দেখা হইল, থতমত খাইয়া দাঁড়াইল, যেন কি কথা বলিতে গিয়াছিল, বলিতে পারিল না, বলিতে সাহস করিল না। মোহিনী অতি স্নেহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, 'কি রজনি ? কি বলিতে আসিয়াছিস্ ?' রজনী ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে কহিল, 'দিদি আমার একটি কথা রাখতে হবে।' মোহিনী আগ্রহের সঙ্গে কহিল, 'কি কথা বল ?' রজনী কতবার না বলি না বলি করিয়া অনেক পীড়াপীড়ির পর আস্তে আস্তে কহিল, মোহিনীকে একটি চিঠি লিখিতে হইবে। কাহাকে লিখিতে হইবে ? মহেন্দ্রকে। কি লিখিতে হইবে ? না তিনি বাড়িতে ফিরিয়া আসুন; তাঁহাকে আর অধিক দিন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হবে না। রজনী তাহার দিদির বাড়িতে থাকিবে। বলিতে বলিতে রজনী কাঁদিয়া ফেলিল।

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

সকল জগতের মধ্যে মূল সাদৃশ্য যাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শন করিলাম, তাহা লইয়া অধুনাতন বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তর আন্দোলন চলিতেছে। সে আন্দোলনের ভাবগতি দেখিলে বোধ হয় যেন সাংখ্যের অভিব্যক্তি-বাদ নূতন বেশে দেখা দিবার উপক্রম করিতেছে। বৈজ্ঞানিক মত এই যে, পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তু নিয়তই আকার হইতে আকারান্তর পরিগ্রহ করিতেছে। সমজাতীয় বস্তু যে সমজাতীয় আকার ধারণ করে, তাহা তাহাদের স্বভাব-গুণ। কিন্তু সেই যে স্বভাব-গুণ তাহাও চিরকাল সমান ভাবে টেঁকিয়া থাকিতে পারে না। জগতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাহারও পরিবর্ত্তন অলঙ্ঘনীয় হইয়া উঠে। জগতের পরিবর্ত্তনের মধ্যে যে বস্তু আপনাকে অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হয়, সে বস্তু চারিদিকের সময়োচিত নূতন ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া নূতন আকার ধারণ করিতে বাধ্য হয়। প্রথম প্রথম তাহাদের মধ্যে যে আকার-ভেদ ঘটে তাহা স্বজাতীয় ভেদ, কালক্রমে সেই ভেদ ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া বিজাতীয় ভেদে পরিণত হয়। ইহার একটি উদাহরণ দিতেছি;—আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে একত্রে বাস করিতেন তখন তাঁহাদের আকার প্রকার একইরূপ ছিল। জগতের পরিবর্ত্তন, কাল-ক্রমে তাহাদের মধ্যে স্বজাতীয় ভেদ প্রবেশ করাইল; এখন সেই ভেদ এত বর্দ্ধিত হইয়াছে যে উক্ত জাতির দুই প্রান্ত ভাগ একই জাতির যে দুই বিভিন্ন শাখামাত্র তাহা বলিতে আমাদের মুখে বাধে ; জাতির সে শাখাদ্বয় এখন জাতিদ্বয় হইয়া উঠিয়াছে। সকল বস্তুই এইরূপ সমজাতীয় অভিব্যক্তি হইতে ভিন্ন জাতীয় অভিব্যক্তিতে পরিণত হইতেছে।

সকল বস্তুই এই যে আকার হইতে আকারান্তর পরিগ্রহ করিতেছে,—কাহার উত্তেজনায় এরূপ করিতেছে ? বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলেন বলের উত্তেজনায়। ইহাঁদের মতে তাপ জ্যোতি তড়িৎ চুম্বক ইত্যাদি যত কিছু চালক পদার্থ সমস্তই শুদ্ধ কেবল এক বলের বিশেষ বিশেষ পরিণাম মাত্র। এখানে এইটি বিশেষ করিয়া জানা উচিত যে, তাপ জ্যোতি ইহারা দুই বিভিন্ন অর্থে গৃহীত হইতে পারে। যে তাপ আমরা গাত্রে অনুভব করি, যে জ্যোতি আমরা চক্ষুতে প্রত্যক্ষ করি,সে তাপ সে জ্যোতি স্বতন্ত্র,এবং যে তাপ যে জ্যোতি পরমাণুগণের স্পন্দন-মাত্র তাহা স্বতন্ত্র। এই শেষোক্ত তাপ এবং জ্যোতি বলের পরিণাম বিশেষ, বিজ্ঞান ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু তাপ এবং জ্যোতিকে যদি মানসিক বোধ বলিয়া ধরা যায় তবে তাহারা যে শুদ্ধ কেবল বলের পরিণাম মাত্র একথায় বিজ্ঞান কখনই সায় দিবেন না। বিজ্ঞান এই কেবল জানেন যে, বলের যত কিছু পরিণাম সকলই জড়-রাজ্যের মধ্যেই বদ্ধ থাকে। বিজ্ঞান বলেন যে সমস্ত জড়-জগতের মধ্যে যে-পরিমাণ বল (কি না গতি-মাত্রা) বর্ত্তমান আছে তাহার সাকল্যে হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে না; জড়-জগতের একস্থানে যে পরিমাণে বলের হ্রাস হয়, অন্য কোন না কোন স্থানে সেই পরিমাণে তাহার বৃদ্ধি হইতেই হইবে; একস্থানে যদি বলের বিয়োগ হয়, তবে অপর কোন স্থানে তাহার সংযোগ হইতেই হইবে ; আর তাহার বিয়োগ হইলেও জড়বস্তু হইতে বিয়োগ, সংযোগ হইলেও জড়বস্তুতে সংযোগ ; জড়বস্তুকে ছাড়িয়া বলের কোথাও আর গত্যন্তর নাই।

তাপের যদি এইরূপ অর্থ কর যে, তাহা পরমাণুগণের পরস্পর বিচ্ছেদ-সাধক বিক্ষেপ শক্তি, তবে তাহাকেই বলের পরিণাম বিশেষ বলিতে পার, কিন্তু সেই শক্তি দ্বারা আমাদের মনে যে তাপ-বোধের উৎপত্তি হয় তাহা মনেরই পরিণাম-বিশেষ। বলরূপী তাপ শরীর পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে, শারীরিক গতি-বিশেষে পরি-

গত হইতে পারে, এক জড় বস্তু হইতে অন্য জড় বস্তুতে সংক্রমিত হইতে পারে, কিন্তু জড়বস্তু ছাড়া হইয়া যে ক্ষণকালও তিষ্ঠিয়া থাকে এ সামর্থ্য তাহার নাই। শরীরের তাপ তাপমান-যন্ত্রের পারদে সংক্রমিত হইয়া পারদকে যখন উর্দ্ধগামী করে তখন পারদে যে পরিমাণে তাপ বৃদ্ধি হয়, শরীরের স্পৃষ্ট অংশে সেই পরিমাণে তাপের হ্রাস হয়, ইহাই বিজ্ঞান-সঙ্গত। এইরূপ যদি মনেতে যে পরিমাণে তাপের বোধ হইত, শরীরে সেই পরিমাণে তাপের হ্রাস হইত, তাহা হইলেই বলা যাইতে পারিত যে, বোধরূপী মানসিক তাপ বলরূপী শারীরিক তাপের পরিণাম বিশেষ। কিন্তু যখন দেখা যায় যে শরীরের তাপাংশ শরীরকে ছাড়িয়া তাপমান যন্ত্রের পারদে প্রবেশ করিতে পারে, (কেননা উভয়ই জড় বস্তু) কিন্তু শরীরকে ছাড়িয়া বোধে প্রবেশ করিতে পারে না, তখন অবশ্যই মানিতে হইবে যে মনেতে যে তাপ বোধ হয় তাহা মনেরই পরিণাম। ইহার তাৎপর্য্য এই যে শরীরের মধ্যে এইরূপ গতি হইলে মনেতে এইরূপ বোধ হইবে, এমনি একটি নিয়ম আছে; কিন্তু তাহা বলিয়া জল যেমন এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে যায়, অথবা গতিবল যেমন এক জড়পিণ্ড ছাড়িয়া অন্য জড়পিণ্ডে যায়, সেইরূপ শরীরের গতিরূপী তাপ শরীরকে ছাড়িয়া বোধরূপে পরিণত হইবে, ইহা কোন শাস্ত্রেই লেখে না।

আকার হইতে আকারান্তরে পরিণাম যাহা ইতিপূর্ব্বে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, এবং বল হইতে বলান্তরে পরিণাম, যাহা এখনো বলিবার অপেক্ষা আছে, উভয়ই বৈজ্ঞানিক গণনার অধিকার-ভুক্ত। এক পক্ষে আয়, অপর পক্ষে ব্যয়; এক পক্ষে ভাঙন, অপর পক্ষে গঠন; এই নিয়মটি উভয়েতেই দেখিতে পাইবে। প্রথমতঃ আকার হইতে আকারান্তরে পরিণাম ঐ নিয়মেই হইয়া থাকে। একটা স্বর্ণখণ্ডকে যদি দীর্ঘে বাড়াইতে চাও, তবে তাহাকে প্রস্থ এবং বেধে কমাইতে হইবে। এইরূপ আকার হইতে আকারান্তর-পরিণাম করিতে হইলে একদিকে যে পরিমাণে আয় অপর দিকে সেই পরিমাণে ব্যয় আবশ্যক। বল হইতে বলান্তর-পরিণামও ঐরূপ আয় ব্যয়ের নিয়ম-সাপেক্ষ। হস্তের বল দ্বারা কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে সেই বল কাষ্ঠের পরমাণুগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাপরূপী পারমাণব বলে পরিণত হয়; এ স্থলে হস্তে যে বলের ব্যয় হইল, পরমাণু-সমষ্টিতে সেই বলের আয় হইল; এইরূপ বুঝিতে হইবে। উপরে হস্তবল যেমন পারমাণব-বলে পরিণত হইল, সেইরূপ আবার পারমাণব বল রাসায়নিক বলে পরিণত হইতে পারে, আয় ব্যয়ের নিয়মানুসারে বল বলান্তরে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু বল বোধে পরিণত হয় এ কথা বলিলে তাহা বৈজ্ঞানিক গণনার নিতান্ত বিপক্ষে দাঁড়ায়।

আধুনিক অভিব্যক্তি-বাদীগণের মধ্যে যাঁহারা মনে করেন যে জগৎ-সৃষ্টি শুদ্ধ কেবল বল এবং আকারের ক্রম-পরিণাম মাত্র তাঁহারা জগতের একটি প্রধান অভি-

ব্যক্তিকে গণনা হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন। জগতে শুদ্ধ কি কেবল আকারের এবং গতি-বলের অভিব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয়? বোধের অভিব্যক্তি কি তাহার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিগোচর হয় না। বোধের অভিব্যক্তি কি বলের পরিণাম-বিশেষ? বল কি? না গতির বেগ; গতির বেগ বৈজ্ঞানিক গণনার বিষয়; কোন একটি জড়বস্তুতে যদি গতিবেগের আয় হয়, তবে অপর কোন এক বা একাধিক জড় বস্তুতে সেই পরিমাণ গতিবেগের ব্যয় হইয়াছে ইহা নিশ্চিত। অতএব সমস্ত জড়-জগতে যে খানে যত বল আছে, সমুদায়ের সমষ্টি অপরিবর্ত্তনীয়। এক জড় বস্তুতে গতিবেগের ব্যয় হইলে, অপর জড়বস্তুতে তাহার আয় হয়, বিজ্ঞানের ইহাই যদি সিদ্ধান্ত হইল—এক জড়বস্তুর বল-ব্যয় হইয়া যদি অপর জড়বস্তুর বল বৃদ্ধি হইল, জড়বস্তুগত বল যদি জড়বস্তুতেই ক্ষপিত হইল, তবে তাহার উপর বোধের কিরূপে কোন স্বত্ব বর্ত্তিতে পারে। সমগ্র একই বস্তুর দুই স্বত্তাধিকারী হইতে পারে না। জড়বস্তু যদি বল-বিশেষের সম্যক্ স্বত্বাধিকারী হয়, মন তবে তাহা হইতে পারে না, মন যদি তাহার সম্যক্ স্বত্বাধিকারী হয়, তবে জড়বস্তু তাহা হইতে পারে না। বিজ্ঞানের এই যে সিদ্ধান্ত যে, বল জড়বস্তু হইতে জড়বস্তুতেই সংক্রমিত হয়, শুদ্ধ কেবল তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে জড়বস্তুকে ছাড়িয়া তাহা মনে সংক্রমিত হয় না, বোধে পরিণত হয় না। বলের পরিণাম-বিশেষ শরীরে সংক্রমিত হইলে মনেতে যে পরিণাম-বিশেষ উপস্থিত হয়, বায়ুস্পন্দন কর্ণে সংক্রমিত হইলে মনেতে যে শব্দ-বোধ উপস্থিত হয় তাহা মনেরই পরিণাম, বলের নহে; বায়ুস্পন্দন বা শ্রুতিপটহের স্পন্দন যাহা সেই শব্দবোধের পূর্ব্ব-সূচনা তাহাই বলের পরিণাম।

সাংখ্যের অভিব্যক্তি-বাদ (Theory of Evolution) কেবল বল এবং সাকার বস্তুকেই সর্ব্বস্ব মনে করেন নাই, সাংখ্য-দর্শন সৃষ্টির মূল উপাদান তিনটি ধরিয়াছেন—প্রকাশক চালক এবং বাধকধর্ম্মী সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণ। বল সাকার বস্তুর চালক, অতএব রজোগুণপ্রধান, সাকার বস্তু বলের বাধক অতএব তমোগুণ প্রধান, মন উভয়েরই প্রকাশক অতএব সত্ত্বগুণ প্রধান।

আধুনিক ইউরোপীয় অভিব্যক্তিবাদ এবং সাংখ্যের অভিব্যক্তিবাদ, পরস্পর তুলনা করিয়া দেখিলে উভয়ের মধ্যে প্রধান এই একটি প্রভেদ দৃষ্টিগোচর হয়,—

সাংখ্য-মতে

বাধক চালক এবং প্রকাশক, তিন বস্তুর সহকারিতা ব্যতিরেকে কোন অভিব্যক্তি সিদ্ধ হইতে পারে না।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে

শুদ্ধ কেবল বাধক এবং চালক বস্তু দ্বারা সকল অভিব্যক্তি সিদ্ধ হইতে পারে।

শেষোক্ত মত যে অসম্পূর্ণ তাহা ইতি পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। আকাশব্যাপী এক বস্তু হইতে ঐরূপ আর এক বস্তুতে

বল সঞ্চারিত হইতে পারে, কিন্তু আকাশাতীত যে বোধ তাহা বলের অগম্য প্রদেশ। আকার যেমন আকারান্তরেই পরিণত হইতে পারে, বল যেমন বলান্তরেই পরিণত হইতে পারে, তা ভিন্ন আকার বলে পরিণত হইতে পারে না, বলও আকারে পরিণত হইতে পারে না, সেইরূপ বোধই বোধান্তরে পরিণত হইতে পারে, আকার কিংবা বল কখনই বোধে পরিণত হইতে পারে না। একটা বড় গোলাকে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুলিতে পরিণত করিতে পারা যায়, তাহার আকারকে আকারান্তরে পরিণত করিতে পারা যায়; কিন্তু তাহার আকারকে কখনই বলেতে পরিণত করা যায় না। আকারের ব্যয় দ্বারা আকারান্তরের আয় বৃদ্ধি হইতে পারে, বৃহদাকার গোলার অংশ ব্যয় দ্বারা ক্ষুদ্রাকার গুলির পুষ্টিসাধন হইতে পারে; বল-ব্যয় দ্বারা বলান্তরের আয় বৃদ্ধি হইতে পারে,পিণ্ড-গত বলের ব্যয় দ্বারা পারমাণব বলের আয়-বৃদ্ধি হইতে পারে; ইহা বলিবামাত্রেই বুঝিতে পারা যায়।—কিন্তু তাহা বলিয়া আকারাংশের ব্যয় দ্বারা কি বলাংশের আয় সাধিত হইতে পারে, না বলাংশের ব্যয় দ্বারা আকারাংশের আয় সাধিত হইতে পারে? এরূপ প্রশ্ন প্রশ্নই নহে। এ যেমন,এমনি বোধই বোধান্তরে পরিণত হইতে পারে; ভূমির চতুর্দ্দিকে বেড়া দেওয়া যাইতে পারে এই বোধ যদি আমার থাকে, তবে ঠিক চক্রাকারে একটী বেড়া দেওয়া যাইতে পারে এই বোধান্তরে তাহা পরিণত হইতে পারে; পূর্ব্বোক্ত বোধের অভাবে শেষোক্ত বোধ কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। বোধই বোধান্তরে পরিণত হইতে পারে, বল কিংবা আকার কখনই বোধে পরিণত হইতে পারে না। জগতের বল এবং আকারের [আকাশ-পূরণের] যেমন সাকল্যে হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভবে না, বোধেরও সেইরূপ। এক বস্তু বা বস্তু-সমষ্টিতে যে পরিমাণে মনঃসমাধান করা হয়, অন্যান্য বস্তু হইতে সেই পরিমাণে মনকে প্রত্যাহরণ করা হয়; সুতরাং কোন এক বিষয়ে বোধের আধিক্য হইলে, অন্যান্য বিষয়ে বোধের অল্পতা হয়; দেখ—আয় ব্যয়ের নিয়ম এখানেও বলবৎ দেখা যাইতেছে। আরো এইরূপ দেখা যায় যে,অধিকায়ত জড় বস্তুকে স্বল্পায়ত করিলে তাহার প্রগাঢ়তা হয়, অল্পায়ত জড়-বস্তুকে অধিকায়ত করিলে তাহার ব্যাপ্তি হয়, কিন্তু তাহাতে তাহার মোট পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না; এইরূপ মনকে অনেক বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া যদি এক বিষয়ে সমাহিত করা যায় তাহা হইলে জ্ঞানের প্রগাঢ়তা হয়, এবং যদি এক বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া অনেক বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করা যায় তাহাহইলে জ্ঞানের ব্যাপ্তি সাধিত হয়। সুতরাং ব্যাপ্তি বিষয়ে যদি জ্ঞানের আয় বৃদ্ধি হয়, তবে প্রগাঢ়তা বিষয়ে তাহার ব্যয় বৃদ্ধি বুঝিতে হইবে, এবং তাহার বিপরীত হইলে বিপরীত বুঝিতে হইবে; কিন্তু সাকল্যে জ্ঞানের হ্রাস বা বৃদ্ধি সম্ভবে না। আলস্যের আক্রমণে আমাদের মন এরূপ বিক্ষিপ্তভাব ধারণ করে যে, সে সময় তাহাকে কোন

বিশেষ বিষয়েতে নিবিষ্ট করা অসাধ্য হইয়া উঠে; কিন্তু সে সময়ে স্বপ্নবৎ কত শত অপ্রাসঙ্গিক বিষয় মনোরাজ্যে যাতায়াত করিতে থাকে; তাহার উপরে মনের বিক্ষেপ যদি আর কতিপয় মাত্রা বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে বিশেষ কোন বিষয়েতে মন এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে না পারাতে কোন বিষয়ই তাহার ধারণা-সাধ্য হয় না, এই অবস্থায় আমাদের নিদ্রাকর্ষণ হয়, এবং বোধের প্রগাঢ়তা অতিমাত্র অল্প হইয়া যায়। এদিকে যেমন বোধের প্রগাঢ়তা কমিয়া যায়, ওদিকে তেমনি আবার তাহার ব্যাপ্তি বাড়িয়া উঠে। স্বপ্নকে এবিষয়ের সাক্ষী মানা যাইতে পারে। জাগ্রদবস্থায় যাহা কোন প্রকারেই মনে হইবার সম্ভাবনা নাই, এমনও সকল বিষয় স্বপ্নাবস্থাতে মনোনেত্রের গোচর হইয়া থাকে। বহুদিন হইল যাঁহারা মৃত হইয়াছেন স্বপ্নে তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি অবিকল যেমন তেমনি প্রতিভাত হয়। স্বপ্নেতে এইরূপ বোধের ব্যাপ্তি-বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রগাঢ় নিদ্রার সময় আমাদের মন যে একেবারেই বিষয়-শূন্য হয়, ব্যাপ্তির অত্যন্ত আধিক্যই তাহার কারণ। অতএব নিদ্রাবস্থাই হউক স্বপ্নাবস্থাই হউক আর জাগ্রদবস্থাই হউক, কোন অবস্থাতেই সাকল্যে জ্ঞানের হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভবে না। সাকার-বস্তু, বল এবং বোধ, এ তিনের কোনটিরই সাকল্যে হ্রাস বৃদ্ধি সম্ভবে না। ইহাদের মধ্যে এইরূপ দৃষ্ট হয় যে, আকারই আকারান্তরে, বলই বলান্তরে, বোধই বোধান্তরে পরিণত হয়, এ ভিন্ন আকার কখন বোধ কিংবা বলে পরিণত হইতে পারে না, বল আকার কিংবা বোধে পরিণত হইতে পারে না, বোধ আকার কিংবা বলে পরিণত হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়াভ্যন্তরে যখন বল এবং আকার বলান্তর এবং আকারান্তরে পরিণত হয়, মনেতে তখন বোধ বোধান্তরে পরিণত হয়—বিজ্ঞানানুসারে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায়, ইহাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া যদি বোধকে বল অথবা সাকার বস্তুর পরিণাম বলিতে সাহসী হও, তবে না বিজ্ঞান না তত্ত্বজ্ঞান কেহই তোমাকে সমাদর করিবেন না। বিজ্ঞান বলকে জড়-বস্তুগত ভিন্ন আর কোন প্রকার মনে করিতে পারেন না। বিজ্ঞান বল-বিষয়ে যাহা কিছু পরীক্ষা করেন, ভাবনা করেন, সিদ্ধান্ত করেন, সকলই জড় রাজ্যের ভিতর-প্রদেশে, তাহার বাহিরে যাইতে বিজ্ঞানের প্রয়োজনই হয় না। ভৌতিক বলকে যদি মানসিক বল, তবে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, মানসিক বোধকে যদি ভৌতিক বল, তবে তত্ত্বজ্ঞানের বিরুদ্ধাচরণ করিবে। অতএব অভিব্যক্তি-বাদ মানিতে হইলে শুদ্ধ কেবল বল এবং আকারের অভিব্যক্তি পর্য্যন্তই ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না; আকার হইতে আকারের অভিব্যক্তি কিরূপে হয়, বল হইতে বলের অভিব্যক্তি কিরূপে হয়, ইহার মীমাংসাকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিলে চলিবে না,বোধ হইতে বোধের অভিব্যক্তির প্রকরণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলে তবেই অভিব্যক্তি-বাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সম্ভবে।

গীত।।

রাগিণী ললিত বিভাস—তাল আড়াঠেকা।

সুর—"ভুলি ভুলি মনে করি,
ভোলে না যে পাপ মনো।"

বিরাজ সারদে কেন
এ ম্লান কমল বনে!
আজো কিরে অভাগিণী
ভাল বাস মনে মনে!
মলিন নলিন বেশ,
মলিন চিকণ কেশ,
মলিন মধুর মূর্ত্তি,
হাসি নাই চন্দ্রাননে।
মলিন কমল মালা,
মলিন মৃণাল বালা,
আর সে অমৃত জ্যোতি,
জ্বলেনাকো বিলোচনে।
কোলে যে করুণ স্বরে,
দুলে দুলে গান করে,
পদে সে পরিবাদিনী,
ঘুমাইছে অচেতনে।
জীবন-কিরণ রেখা,
অস্তাচলে দিল দেখা,
এ হৃদি কমল দেবী,
ফুটিবে না আর—
যাও বীণা ল'য়ে করে,
ব্রহ্মার মানস-সরে,
রাজহংস কেলি করে,
সুবর্ণ নলিনী সনে।

শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।

সম্পাদকের বৈঠক।

একটা বিবাদ।

প্রাণী এবং উদ্ভিদ্‌দিগের মধ্যে একটা ভারি বিবাদ বাধিয়াছে। উদ্ভিদ্ বলিতেছেন, যে পলা, জুফাইট্, স্পঞ্জ, ইহারা যদি প্রাণী হইল, তবে আমরা কেন হইব না? উভয় দলই নিজ নিজ প্রমাণ লইয়া আসিয়াছেন, বিজ্ঞান মহাফাঁপরে পড়িয়াছেন, তিনি তাহার মীমাংসা করিতে পারিতেছেন না। আমরা এই বিবাদের বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

বিজ্ঞান—তুমি বলিতেছ যে, "দেখ, আমাদের লজ্জাবতী লতার গায়ে হাত দাও, অমনি কুঁকড়িয়া যাইবে, কত উদ্ভিদ্ আছে যাহারা দিবসের রৌদ্রে উন্মুক্ত হয়, ও রাত্রের শীতল শিশিরের ভয়ে মুদ্রিত হইয়া যায়। যে দিকে রৌদ্র ভাল পায়, উদ্ভিদেরা আস্তে আস্তে মাথা সেই দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে; যে দিকে ভাল মৃত্তিকা আছে, সেই দিকে শিকড় বিস্তার করে, তবে যে

উদ্ভিদের চৈতন্য নাই, কিসে প্রমাণ পাইলে?" কিন্তু ইহা কোন কাজেরই কথা নহে। কি কারণে হয়, সে পরের কথা। কিন্তু উহা যে চৈতন্যের চিহ্ন নহে, তাহা এক কথায় প্রমাণ হইবে। প্রাণী-দেহে চৈতন্যের কারণ স্নায়ু। কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া তোমাদের শরীর তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলাম, তবুও স্নায়ু খুজিয়া পাইলাম না।

উদ্ভিদ—কিন্তু আপনিত অনেক সামদ্রিক প্রাণীর গাত্রে স্নায়ু দেখিতে পান নাই। কত কীটের গাত্রে কেবল যে স্নায়ু দেখিতে পান নাই তাহা নহে, তাহাদের অন্যান্য প্রাণীদের ন্যায় কোন অঙ্গই নাই। অথচ একটু নাড়া দিলেই তাহারা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, তাহারা আহার করে, এবং তাহাদের যে অনুভূতি নাই একথা আপনি বলিতে সাহস করেন নাই। কত জীবের উদ্ভিদের ন্যায় জন্ম হয়। তাহাদের শরীরে ফুল ফুটে, এবং তাহা হইতেই আর একটি নূতন প্রাণীর জন্ম হয়। অতএব দেখুন্ উদ্ভিদের সহিত প্রাণীদের কত ঐক্য।

প্রাণী—কই, তোমাদের ত আমাদের মত পাকযন্ত্র নাই!

উদ্ভিদ্—ও কথা কহিও না, অ্যামিবা কীটের পাকযন্ত্র আছে? রিজোপতা জাতীয় কোন্ কীটের পাকযন্ত্র আছে? এক প্রকার কীট আছে, তাহারা অন্য কীটের গাত্রে লগ্ন হইয়া থাকে। তাহাদের নিজের পাকযন্ত্র নাই, অন্য কীটের শরীরস্থ ভুক্ত দ্রব্য তাহাদের শরীরে সঞ্চারিত হয়।

প্রাণী—আমাদের শরীর যে প্রকারে গঠিত, তোমাদের শরীর বোধ হয় সেই একই প্রকারে গঠিত নহে।

উদ্ভিদ—হাঁ, আমাদের শরীরও সেই একই প্রকারে নির্ম্মিত। তোমাদের ন্যায় আমাদের শরীরও কোষ-সমষ্টি মাত্র। সেই প্রত্যেক কোষেরই জীবনী-শক্তি আছে।

প্রাণী—তোমাদের ত আমাদের মত চলৎশক্তি নাই।

উদ্ভিদ—অনেক প্রাণীরোত নাই। পলা, স্পঞ্জ প্রভৃতি অনেক প্রাণীরা এক স্থানেই থাকে। তাহা ছাড়া দুই একটি উদ্ভিদ দেখাইতেছি, যাহাদের কিয়ৎ পরিমাণে চলৎশক্তি আছে। কোন উদ্ভিদ্ পদার্থ পচিতে থাকিলে, তাহাদের গাত্রে ইথ্যালিয়ম নামক যে উদ্ভিদ্ পদার্থ জন্মে, যখন তাহারা ক্রমশ বর্দ্ধিত হইতে থাকে তখন তাহারা চলিতে থাকে। জলের মধ্যে এক প্রকার আণুবীক্ষণিক গোলাকার পদার্থ আছে তাহা ক্রমাগত ঘুরিতে থাকে! অনেক দিনের পরে বিজ্ঞান মহাশয় জানিতে পারিয়াছেন যে, তাহা প্রাণী নহে, তাহা এক প্রকার উদ্ভিদ্। আকৃতিতে তোমাদের অনেক প্রাণীর আমাদের সহিত যে কত সাদৃশ্য আছে তাহা বলা বাহুল্য।

প্রাণী—আমরা আহার করি, তোমরা বাষ্প ও রসাকর্ষণ কর।

উদ্ভিদ্—তাহা কেন, পূর্ব্বে যে ইথ্যালিয়ম নামা উদ্ভিদের কথা বলিলাম,তাহারা জন্তুদিগের ও তরুদিগের দেহাংশ আহার করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন, সম্প্রতি কতকগুলি মাংশাসী বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা কি জানা হইয়াছে?

প্রাণী—তোমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস আমাদের সহিত কত বিভিন্ন। তোমরা কার্ব্বনিক অ্যাসিড্ গ্যাস গ্রহণ ও অক্সিজন গ্যাস পরিত্যাগ কর, কিন্তু আমাদের ঠিক তাহারি উল্টা।

উদ্ভিদ্—কিন্তু রাত্রেরবেলা আমরা ঠিক তোমাদের সমান হই। রাত্রের বেলা ত আমরা কার্ব্বণিক গ্যাস পরিত্যাগ ও অক্সিজন গ্রহণ করি। তদ্ভিন্ন, দুই একটি উদ্ভিদ্ পদার্থ, যাহাদের মধ্যে পীত পদার্থ নাই, তাহারাত তোমাদের ন্যায়ই নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

বিজ্ঞান—তাইত, বড় গোলযোগ দেখিতেছি! কিন্তু তোমরা নিরস্ত হও, আমি ভাল করিয়া এবিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছি। কিছু দিনের মধ্য তোমাদের এ বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিব।

অসভ্য জাতির সভ্যতা—আধুনিক সভ্যতার ঠোঁটের জোর না থাকিলে তাহার এত গৌরব হইত না। তাহার ভিতরে যত কিছু গলদ আছে তাহা এখনকার সভ্যতাভিমানী লোকেদের লম্বা চৌড়া কথাতেই ঢাকিয়া যায়। তর্কে পরাজিত হইলে তাঁহারা প্রতিবাদীদিগকে "অসভ্য" "বর্ব্বর" ইত্যাদি মিষ্ট সম্ভাষণে নিরস্ত করেন। কিন্তু তাঁহাদের বিবেচনার জন্য আমরা দেশীয় অসভ্য সাঁওতালদের গুটিকতক ব্যাপার নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

সাঁওতালপ্রদেশে অনেকগুলি আদিম বাসীদের সম্প্রদায় আছে। তাহার মধ্যে পাহাড়ীয় নামে যাহারা প্রসিদ্ধ তাহারই এক প্রধান সম্প্রাদায়। কর্ণেল ড্যাল্টন বলেন যে লেফ্টনেণ্ট সর প্রবন্ধ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে পাহাড়ীয়রা পরজন্ম মানে। তাহারা বলে যে, যে কেহ ঈশ্বরের আজ্ঞাবর্ত্তী হইয়া চলে সে মৃত্যুর পর রাজা কিম্বা কোন প্রধান ব্যক্তি হইয়া পৃথিবীতে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করে।

তাহাদের বিবাহেতে ইংরাজদের মতন বিবাহসাধনা (কোর্টষিপ্) আছে। যতদিন পর্য্যন্ত বিবাহ সম্পন্ন না হইয়া যায় তত দিন পর্য্যন্ত বিবাহার্থীরা প্রকৃত প্রণয়ীর মত "প্রেমের আগুণে" জ্বলিতে জানে। বরকন্যা খুব স্বাধীন ভাবেই একত্রে থাকিতে পায়, কেননা গো মেষ চরান, খাওয়া দাওয়া এবং অন্য কাযকর্ম্ম সকল কার্য্যগতিকে এক সঙ্গেই হইয়া পড়ে। তাহাদের ভিতরে ন্যায়মত আদর আবদার পর্য্যন্ত মার্জ্জনার বিষয়,কিন্তু যদি কোনরূপ অন্যায় আচরণে তাহারা ধরা পড়ে, তাহা হইলে তাহাদের দলের গুরুব্যক্তিরা সেই

অপরাধীদিগকে জাতঃপাত করিয়া দেয়, এবং অনেক রকম প্রায়শ্চিত না করিলে তাহাদিগকে আর জাতে লওয়া হয় না। উক্ত ড্যাল্টন সাহেব আরও বলেন যে সাঁওতালদের মধ্যে বিবাহপ্রথা আদান-প্রদান নিয়মানুসারেই চলে। বিবাহের সময় এক জন বিজ্ঞব্যক্তি আসিয়া সমবেত বরকন্যাকে এই বলিয়া সম্বোধন করে "হে বালক, হে বালিকা, আজ পর্য্যন্ত তোমরা উভয়ে উভয়ের রোগশোকে সান্ত্বনা করিবে। এতদিন অবধি তোমরা কেবল এক সঙ্গে খেলিয়া বেড়িয়াছ ও অন্য অন্য নানা কায করিয়াছ, কিন্তু এখন গৃহকার্য্যের সমস্ত ভার তোমাদের স্কন্ধে পড়িল। অতীথি সেবা করিবে, আর যখন কোন আত্মীয়কুটুম্ব তোমাদের বাড়ি আসিবে তখন তাহার পা ধূয়াইয়া দিবে, এবং তাহাকে বিশেষ সম্মান করিবে।" সাঁওতালেরা প্রায়ই একের অধিক বিবাহ করে না, এবং স্ত্রীর প্রতি তাহারা "অনুকরণোপযোগী" স্নেহমমতা প্রদর্শন করে। যদি স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বহেতু কেহ দ্বিতীয়স্ত্রী গ্রহণ করে, তাহা হইলে প্রথম স্ত্রীর প্রভাবই গৃহে অক্ষুন্ন ভাবে থাকে, এবং দ্বিতীয় স্ত্রীকে তাহার অধীনে থাকিতে হয়।

এক জন বালককে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় যে "তাপ ও শৈত্যের গুণের বিভিন্নতা কি?" সে কহিল "তাপে দ্রব্য বর্দ্ধিত হয় ও শীতে কমিয়া যায়।" প্রশ্নকর্ত্তা কহিলেন "উদাহরণ দেখাও।" সে কহিল শীত কালে দিন ছোট ও গরমি কালে দিন বড় হয়।

ফরাসী ও ইংরাজে যুদ্ধের সময়ে এক জন বৃদ্ধা ইংরাজস্ত্রী আর এক জনকে কহিল "ব্রিটিশরা যে যুদ্ধে জয়ী হইল ইহা কি আশ্চর্য্য নহে?" সে কহিল "হইবে না কেন? ইংরাজেরা যুদ্ধের আগে যে প্রার্থনা করে।" প্রথমটি কহিল "ফরাসিরাও ত করে।" আরেক জন কহিল "হুট্, তাহাদের কথা বুঝিতে পারিবে কে?"

যখন আইরিষদিগের সহিত ইংরাজদিগের মিলন লইয়া তর্কবিতর্ক চলিতেছিল, তখন জুনিয়র ব্যারিষ্টরদিগের স্বভাব অনুসারে বেথেল নামক এক জন আইরিষ ব্যারিষ্টর সে বিষয়ে এক প্যাম্ফলেট লিখেন। পুস্তক প্রকাশের পর লাইসট্ এই ব্যারিষ্টরকে অতি বন্ধুভাবে বলিলেন "বেথেল, দেখ, মিলনের বিষয়ে যত প্যাম্ফলেট দেখিয়াছি, তোমার প্যাম্ফলেটে যেমন ভাল জিনিস দেখিয়াছি, এমন আর কিছুতে না।" সে আহ্লাদে হাত রগড়াইতে রগড়াইতে জিজ্ঞাসা করিল "কি ভাল জিনিস দেখিছেন?" তিনি কহিলেন "আজ সকালে দেখিতেছিলাম, তোমার বইয়ের কাগজে ভাল ভাল মিষ্টান্ন মুড়িয়া এক জন মুদীর দোকান হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল।"

এক জন প্রাচীন জ্ঞানী কহিয়াছেন স্বর্ণের ভালমন্দ অগ্নির দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়, স্ত্রীলোকের ভালমন্দ স্বর্ণের দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়, পুরুষের ভাল মন্দ স্ত্রীলোকের দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়।

বঙ্গসাহিত্য।

কি নাটক, কি মহাকাব্য, আমরা কোন কাব্যের নায়িকাকে সীতাদেবীর মত দারুণ পরীক্ষারূপ অগ্নিকুণ্ডে পতিত হইতে দেখি নাই, এবং এইরূপ দুরন্ত অগ্নিকুণ্ডে পতিত হইতে দেখিয়া কাহাকেও এরূপ অক্ষত ও অক্ষুন্ন ভাবে সে পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইতে দেখি নাই। পৃথিবীতে বা স্বর্গে যত প্রকার কোমল সামগ্রী আছে, বিধাতা যেন সেই সকল কোমল সামগ্রীর কোমলতম অংশটুকু লইয়াই রামময়জীবিতাকে নির্ম্মান করিয়া ছিলেন, এবং পৃথিবীর যত প্রকার মর্ম্মভেদী যন্ত্রনা আছে সেই সকল যন্ত্রণা দ্বারা সীতাদেবীকে পরীক্ষা করিবার জন্যই যেন তিনি কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই সীতাদেবী পৃথিবীর ন্যায় সহিষ্ণুতা-সহকারে এবং হিমাচলের ন্যায় অবিচলিত ভাবে সকল যন্ত্রণা সহ্য করিয়া রমণিহৃদয়ের প্রকৃত মহানতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, যতদিন মর্ত্তলোকে সতীত্বের সম্মান থাকিবে, যতদিন মর্ত্তলোকে সহিষ্ণুতার গরিমা থাকিবে, যতদিন মর্ত্তলোকে কোমলতার আদর থাকিবে, ততদিন বৈদেহীর মহিমাধ্বনি দেশবিদেশে কীর্ত্তিত হইবে!

চতুর্থতঃ। মনিয়র উইলমস্ এবং অন্য লোকেরা রামায়ণ এবং মহাভারত ইত্যাদি মহাকাব্যের বিরুদ্ধে আরও একটি বিশেষ নিন্দা ঘোষণা করেন। সেটি এই—তাঁহারা বলেন যে রাবণের দশমুণ্ড বা কুড়ি হস্ত বা কবন্ধ বা জটায়ু প্রভৃতির অস্বাভাবিক বর্ণনা দ্বারা রামায়ণের কবিত্ব নষ্ট হইয়াছে। এ সকল প্রলাপবাক্য আমাদের নিতান্ত অযৌক্তিক মনে হয়। সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে অজানিত বস্তু-বিশেষের বর্ণনা করিতে হইলে কল্পনাই আমাদের প্রধান নেতা হইয়া উঠে। এবং সেই একেই বস্তু যদি ভিন্ন ভিন্ন কবির দ্বারা বর্ণিত হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক কবির কল্পনাবিশেষে সে বস্তুও বিশেষ বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। সকলেরই মনে একটি দৃঢ় সংস্কার আছে সে স্বর্গ সুখের স্থান। সে সুখের বিশেষত্ব এই যে, তাহা পৃথিবীর সকল সুখ হইতে উচ্চতর এবং মহানতর। এই সহজ জ্ঞান হইতে পুরাণ, কোরাণ এবং বাইবেল-প্রণেতারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার স্বর্গের কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। সেই সকল প্রকার স্বর্গের ভিত্তিভূমি একই, কেবল কল্পনা বিশেষে

তাহাদের আকারপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে গঠিত ও ভিন্ন ভিন্ন রাগে রঞ্জিত হইয়াছে। আমরা সামান্য কথাতেও দেখাইতে পারি যে পূর্ব্বে আমরাও জানিতাম যে ইংলণ্ডভূমি চিরকালই তুষারে জমাট হইয়া থাকে, এবং পূর্ব্বে ইংরাজরাও জানিতেন যে ভারতবর্ষ আপাদমস্তক সুবর্ণে মণ্ডিত—নদীর উপকূলে স্বর্ণরেণু এবং পর্ব্বতের শিখরদেশে স্তূপাকৃত স্বর্ণ পাওয়া যায়। বাস্তবিক, যখন কোন বস্তুর আকারপ্রকার এবং প্রকৃতি আমরা ঠিক জানিনা, অথচ এইমাত্র জানি যে, সে বস্তু অন্য জানিত বস্তু হইতে ভিন্নতর, সেখানে কল্পনার দ্বারাই আমরা তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠন করিয়া তুলি। দেশেবিদেশে প্রেতযোনি সংক্রান্ত সংস্কার হইতে তাহা সপ্রমান হইতে পারে। সেইরূপ রামায়ণপ্রণেতা কখন রাক্ষসদিগকে দেখেন নাই, অথচ এই মাত্র জানিতেন যে তাহারা ভীষণতায় যাবতীয় পরিজ্ঞাত ভীষণ বস্তু হইতে বিশেষরূপ ভীষণতর, তখন তাঁহাকে কাযেই কল্পনা সহকারে এমন একটী বস্তু নির্ম্মান করিতে হইয়াছিল যে, যে কোন পাঠক সেই বর্ণনা পাঠ করিবে তাহারই মনে ভীষণ ভাবের উদ্রেক হইবে। আবার সেই রাক্ষসকুলের যিনি রাজা, তিনি অবশ্যই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতম হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? সকল দেশেরই আদিমহাকাব্যে এই বিশেষত্বটি আমরা দেখিতে পাই। ক্রমে যত জ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ হইতে থাকে ততই সেইরূপ নানা প্রকার উৎকট কল্পনার অবসান হইয়া আসে। রামায়ণে যেমন আমরা দশমুখ এবং কুড়ি হস্ত রাবণকে দেখিতে পাই, ইলিয়াডেও আমরা সেইরূপ শতহস্ত ব্রায়েরিয়স্ ও শতমুখ হাইড্রাকেও দেখিতে পাই। রামায়ণে যেরূপ বিকটমূর্ত্তি কবন্ধ শ্রীরামচন্দ্রের ভীতি সম্পাদন করিতেছে, অডিশীতেও সেইরূপ কপালচক্ষু-সাইক্লপদিগের পলিফিমস্ ইউলিসিসের ভীতি সম্পাদন করিতেছে—রামায়ণে পর্ব্বত-উৎপাটন যেমন অস্বাভাবিক, হিসীয়ডেও টাইটান কর্ত্তৃক পর্ব্বত উৎপাটন সেইরূপ অসম্ভব? দুর্য্যোধন যেরূপ মাতারদৃষ্টে প্রস্তরীভূত হইয়াছিলেন, একিলিজও সেইরূপ মাতাকর্ত্তৃক প্রস্তরিভূত হইয়াছিলেন,—অথচ কবির উদ্দেশ্য রক্ষার্থ উভয়েরই আবার শরীরের স্থানবিশেষে স্বাভাবিক কোমলতাও বিদ্যমান ছিল। রামায়ণে মারীচের রূপ পরিবর্ত্তন করা যেমন দুর্ব্বোধ, অডিসীর প্রোটিয়সের রূপ পরিবর্ত্তন করাও সেইরূপ দুর্ব্বোধ। মহাভারতে যেরূপ অর্জ্জুন বাণদ্বারা পৃথিবী ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ হিসয়ডে হরকুলিজ স্কন্ধদ্বারা সমস্ত পৃথিবী ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে পুরাকালের কাব্যসমূহে উৎকট কল্পনার বাহুল্য আছে। রামায়ণে জটায়ু পক্ষী কথা কহিতেছে শুনিয়া অনেকে হাসিতে পারেন বটে, কিন্তু ইলিয়ডে একিলিজের ঘোটক (জাণ্থস্) কেবল যে কথা কহিতেছে তাহা নয়, আবার একজন বিজ্ঞ দর্শনকারের মত ভবিতব্যের উপর বক্তৃতা পর্য্যন্ত দিতে ত্রুটি করে নাই। তবে একথা

অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ইলিয়ড অপেক্ষা রামায়নে ঐ সকল উৎকট কল্পনার আধিক্য আছে—তাহার প্রধান কারণ এই যে, ভারতবর্ষীয় বৃক্ষতরু, ভারতবর্ষীয় নদনদী, ভারতবর্ষীয় পাহাড়পর্ব্বতের মত ভারতবর্ষীয় কল্পনাও প্রভূত মহানতা ব্যতীত কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। গ্রীকদিগের ও আমাদিগের দেবদেবীর চরিত্র সমালোচনাস্থলে আমরা এ বিষয়ে আরও অনেক কথা বলিব, আপাততঃ এই খানেই ক্ষান্ত হইলাম। বোধ হয় একথা বলাই বাহুল্য যে কেবল দাক্ষিণাত্যের অসভ্য বর্ব্বর-জাতি সমূহকে লক্ষ্য করিয়াই রামায়ণ প্রণেতা রামচন্দ্রের বাণরসৈন্য কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এই কল্পনাতেই আমরা একটু দোষ ধরিতে পারি; কারণ বালী অঙ্গদ প্রভৃতি বাণরগণ এক এক বিষয়ে সভ্যজাতির উচ্চ আদর্শ।

আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে কৃত্তিবাসের লিপিপটুতা বা রচনাচাতুর্য্য সমধিক নহে, কিন্তু সেই হেতু আমরা একথা বলিতে প্রস্তুত নহি যে তাঁহার লিপিপটুতা বা রচনাচাতুর্য্যে ইংরাজি অনেক বিখ্যাতনামা কবি হইতে অথবা এখনকার অনেক "অদ্বিতীয়" বঙ্গ-কবি অপেক্ষা নিকৃষ্টতর।—পোপকৃত হোমরের অনুবাদ সঠিক না হইলেও, পোপের ইলিয়ডে পোপের ত অনেকটা রচনাচাতুর্য্য প্রকাশ হইতেছে—এখন সেই ইলিয়ডে বীরপুত্র হেক্‌টর সমরে নিহত হইলে বীরপ্রসবিনী হেকুবা এই এই বলিয়া কাঁদিতেছেন—

"Ah, why has heaven prolonged this hated breath,

Patient of horrors to behold thy death ?

O Hector ! late thy patrent's pride and joy,

The boast of nations, and the defence of Troy,

To whom her safety and her fame she owed ;

Her chief, her hero,and almost her God !

O fatal change ! become in one sad day

A senseless corse ! inanimated clay ! *

কিন্তু কৃত্তিবাস ইন্দ্রজিতের নিধনে

* হায়, কেনই বা ঈশ্বর এত দিনপর্য্যন্ত আমার এই ঘৃণিত এবং ভয়ানক যন্ত্রণাসহিষ্ণু জীবন হেক্‌টরের মৃত্যু দেখিবার জন্য প্রসারিত করিয়াছেন। হা হেক্‌টর! তুমিই তোমার পিতামাতার অহঙ্কারস্থল,ও আনন্দস্বরূপ ছিলে, তুমিই সকল জাতির গর্ব্বস্থল ও ট্রয়ের রক্ষা-স্বরূপ ছিলে,—তোমার নিকটেই ট্রয় তাহার রক্ষা ও গৌরবের জন্য ঋণী রহিয়াছে, তুমিই তাহার নেতাস্বরূপ, তুমিই তাহার বীরপুরুষ, তুমিই তাহার দেবতা! কিন্তু হায়—কি বিষম পরিবর্ত্তন! সেই হেক্‌টর, তুমি আজ এক দিনের মধ্যেই চেতনা-বিহীন মৃতদেহে—জীবন-বিহীন মৃতপিণ্ডে পরিণত হইয়া পড়িয়াছ।

মন্দোদরীর বিলাপ এইরূপে লিপিবদ্ধ করিতেছেন—

আমি নানা উপহারে, পূজিলাম মহেশ্বরে,
তোমা পুত্র পাইলাম কোলে।
কিছু দিন ছিল সুখ, এখন ঘটিল দুঃখ,
হেন পুত্র পড়ে রণস্থলে ॥
কি মোর বসতি বাস, জীবনে কি ছার আশ,
কি করিবে ছত্র নবদণ্ড।
কি আর পুষ্পক রথ, বীর ভাগ আছে যত,
তোমা বিনা সব লণ্ডভণ্ড ॥
ভূমিতলে লোটাইয়া, পুত্র শোকে বিনাইয়া
ক্রন্দন করিছে মন্দোদরী।
হায় পুত্র মেঘনাদ, কেন এত পরমাদ,
আজি যে মজিল লঙ্কাপুরী ॥
শচীসহ শচীপতি, সুখেতে করুণ স্থিতি,
সচ্ছন্দে ভুঞ্জুক দিনপতি।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, হরষিত সুরবর,
লঙ্কার দেখিয়া এ দুর্গতি ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণে, তুমি জিনিয়াছ রণে,
তবু ডরে কেহ নহে স্থির।
কি কহিব বিভীষণে, শত্রু আনে যজ্ঞস্থানে,
তেঁই সে বধিল রঘুবীর ॥ ইত্যাদি।

এই সমস্ত বিলাপটি অতিসুন্দর কবিত্বতে আপাদমস্তক আপ্লুত। শোক, অভিমান, অথচ বীরপুত্রের প্রতাপ স্মরিয়া বীরপ্রসবিনীর অহঙ্কার এমন সুন্দরভাবে এই বিলাপটিতে গ্রথিত আছে যে ইহার সুখ্যাতি করিয়া আমাদের পরিতৃপ্তি হয় না। আমরা পোপ হইতে আরও অনেক স্থান তুলিতে পারিতাম, কিন্তু এখনকার মত এই খানেই ক্ষান্ত হইলাম।

আমরা আধুনিক বঙ্গকবিদের সহিত কৃত্তিবাসের ও অন্যান্য পুরাতন কবিদের তুলনা, সকল মহাকাব্যগুলি সমালোচনার পর করিব? এক্ষণে কেবল এইমাত্র বলিলেই হইবে যে মেঘনাদ-বধকাব্যের লক্ষ্মণের সহিত কৃত্তিবাসের লক্ষ্মণের তুলনা করিলে কৃত্তিবাসের লক্ষ্মণে যেরূপ উচিতমত বীরত্ব ও মহানতা রক্ষিত হইয়াছে, মেঘনাদের লক্ষ্মণে সেইরূপ হীনতা ও কাপুরুষতা প্রদর্শিত হইয়াছে।—এক্ষণে আমরা কৃত্তিবাসের কবিত্ব দেখাইবার জন্য সীতাহরণে রামের বিলাপটি উদ্ধৃত করিয়া এবারের মত নিরস্ত হইলাম।

বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে,
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে।
কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ,
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ ॥
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী।
লুকাইয়া আছেন লক্ষ্মণ দেখ দেখি ॥
বুঝি কোন মুনিপত্নী সহিত কোথায়।
গেলেন জানকী না জানাইয়া আমায় ॥
গোদাবরীনীরে আছে কমলকানন,
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ ?
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া,
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া।
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস,
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস।
রাজ্যচ্যুত আমারে দেখিয়া চিন্তান্বিতা,
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা।
রাজ্যহীন আমি যদি হইয়াছি বটে,
রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে ॥

আমার সে রাজলক্ষ্মী হারাইল বনে,
কৈকেয়ীর মনোভিষ্ট সিদ্ধ এতদিনে।
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে,
লুকাইল তেমতি জানকী বনান্তরে।
কনকলতার প্রায় জানকদুহিতা,
বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা।
দিবাকর নিশাকর দীপ তারাগণ,
দিবানিশি করিতেছে তমোনিবারণ।
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার,
এক সীতা বিহনে সকলি অন্ধকার।
দশদিক শূন্য দেখি সীতার অভাবে,
সীতা বিনা অন্য কিছু হৃদয়ে না ভাবে।
দেখরে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ,
সীতারে আনিয়া দেহ, বাঁচাও জীবন।
আমি জানি পঞ্চবটী অতি পুণ্যস্থান,
তেঁই সে এখানে করিলাম অবস্থান।
তাহার উচিত ফল দিয়াছে আমারে,
শূন্য দেখি তপোবন সীতা নাই ঘরে।
শুন শুন মৃগ পক্ষী, শুন বৃক্ষ লতা,
কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা।
যাইতে দেখেন যাকে জিজ্ঞাসেন তাকে,
দেখিয়াছ তোমরা কি এপথে সীতাকে॥
ওহে গিরি, এসময়ে কর উপকার,
কহিয়া বাঁচাও জানকীর সমাচার।
হে অরন্য! তুমি ধন্য, বন্য বৃক্ষগণ,
কহিয়া সীতার কথা রাখহ জীবন।
শ্রীরাম বলেন শুন ভাইরে লক্ষ্মণ,
গোদাবরী জীবনেতে ছাড়িব জীবন।

অশ্রু-আবাহন।

গীত।

রাগিণী ললিত

পারিনে পারিনে আর, আয় ওরে অশ্রুজল,
দেখা দেরে অভাগারে, জুড়ায়ে মরমস্থল।
ছেলে বেলাকার, সখা যে আমার,
তুই সেই অশ্রুধার,
সাথের যে সাথী, ব্যথার যে ব্যথী
ছিলি যে সান্ত্বনা সার,
কতই যাতনা, মরম বেদনা,
পাইয়াছি বারবার,
তুই দেখাদিলে, সব গেছি ভুলে
ঘুচে গেছে শোকভার।
তবে বল হায়, পাসরি আমায়,
এখন লুকালি কোথা,
দুঃখের সময়, ছাড়িলি আমায়,
এ কেমন মমতা,
কত দিন ধরে, কত যে সাধিনু,
কত যে ডাকিনু তোরে,
এলিনে ত তুই, তবু একবার,
শুষ্ক নয়নপরে,
মৃত প্রায় তরু, পায় সে জীবন,
জলের পরশ পেয়ে,
ঝরি গেলে বারি, ফুটে শশী তারা,
সুনীল আকাশ ছেয়ে,
তুই অশ্রুজল, হ'লে নিরদয়,
এ আঁধার কে ঘোচাবে,
অভাগা দুর্ভাগা, কোথা যাবে আর,
কোথায় শান্তি পাবে।

শ্রী সঃ

পূর্ব্বতন গ্রীকদিগের সামাজিক অবস্থা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শিক্ষা।—গ্রীক-জনসমাজের নিয়মানুসারে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র তাহার পিতার সমক্ষে স্থাপিত হইত। সন্তানকে লালন পালন করিবেন কি না তদ্বিষয়ে পিতাকে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে হইত। কেন না, সন্তান লালন পালন করা পিতার স্বেচ্ছাধীন ছিল। তিনি যদি সদ্য-প্রসূত সন্তানটিকে ভূমি হইতে তুলিয়া লইতেন, তাহা হইলেই বুঝা যাইত যে তাঁহার সন্তান পালন করিবার ইচ্ছা আছে। আর যদি তিনি না তুলিতেন তাহা হইলেই প্রকাশ পাইত তাঁহার ইচ্ছা নাই; সুতরাং সেই শিশুকে হয় প্রকাশ্যরূপে ফেলিয়া দেওয়া হইত—নয় দত্তক পুত্রাভিলাষী কোন ব্যক্তিকে দান করা হইত। পরিবারের অতিরিক্ত সংখ্যাবৃদ্ধি নিবারণের জন্য গ্রীকদিগের এই রূপ পদ্ধতি ছিল। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার দশম দিবসে তাহার নাম-করণ হইত—সেই দিবস দেবতার নিকট বলি উৎসর্গ করা এবং বন্ধুবান্ধবকে ভোজ দেওয়া হইত। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে ধনী লোকের স্ত্রীরা যেমন সন্তানকে স্তনদান করেন না সেই রূপ তথায় ধনী লোকের স্ত্রীরা প্রায় সন্তানদিগকে স্বয়ং স্তন দিত না—দরিদ্র স্ত্রীলোকদিগকে ধাত্রীরূপে নিযুক্ত করিত। ছয় বৎসর পর্য্যন্ত বালক বালিকাদিগকে একত্র রাখিয়া লালন পালন করা হইত। তাহাদের নানা প্রকার খেল্না ছিল; আমাদের দেশের ন্যায় তাহাদের পুতুলগুলি রং করা মাটিতে নির্ম্মিত হইত। চাকা ও লাঠিম বয়স্ক শিশুদিগের খেলা ছিল। গুব্‌রে পোকার পায়ে দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া বেড়ানো তাহাদের একটি সাধের আমোদ ছিল। আমাদের ন্যায় তাহাদের মধ্যে লুকাচুরি খেলাও প্রচলিত ছিল। শিশুগণ দোষ করিলে তাহাদিগকে বেত্রাঘাত কিম্বা অন্য কোন প্রকার শাসন না করিয়া চটি জুতা কিম্বা খড়ম প্রহার করা হইত। সুকুমার শিশুর গাত্রে পাদুকাঘাত আমাদের চক্ষে অত্যন্ত জঘন্য রীতি বলিয়া বোধ হয়। কোন শিশু অবাধ্য হইলে আমাদের দেশের ন্যায়—তাহাকে কখন কখন ভূতের ভয়ও দেখানো হইত। ছেলে-ঘুম-পাড়ানি গান, গল্প, ছড়া কল্পনা-প্রবণ গ্রীকদিগের মধ্যে খুবই প্রচলিত ছিল। পৌরাণিক উপন্যাসের মধ্যে যাহা কিছু বিস্ময়কর ও মনোহর তাহাই গল্পচ্ছলে শিশুগণকে শুনানো হইত। এবং ইহাই শিশুগণের প্রথম শিক্ষা ছিল। প্রায় ষষ্ঠ কিম্বা সপ্তম বর্ষ হইতে বালিকাদিগকে পৃথক্ রাখিয়া বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। অর্থাৎ আমাদের দেশের সাধারণ প্রথানুরূপ বালকেরা প্রকাশ্য পাঠশালায় প্রেরিত হইত এবং বালিকাদিগকে গৃহে রাখিয়া গার্হস্থ্য কর্ম্মের

শিক্ষা দেওয়া হইত। বিদ্যালয়ে যাইবার পূর্ব্বে বালকেরা যদিও সম্ভবত মাতা কিম্বা ধাত্রীর নিকট হইতে কিছু কিছু বর্ণপরিচয় করিত কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে বিদ্যালয়েই তাহাদের শিক্ষা আরম্ভ হইত। কতকগুলি পাঠশালা যে ব্যায়াম-ভূমির অন্তর্ভুত ছিল তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে—কিন্তু ইহাও অনুমান হয়—সাহিত্যশিক্ষার জন্য কতকগুলি স্বতন্ত্র পাঠশালাও ছিল। বালকেরা সেখানে নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে পাঠ সাঙ্গ করিয়া ব্যায়াম-স্থানে গমন করিত।

অ্যাথেন্‌সে শিক্ষার দুইটি বিভাগ ছিল—একটি শরীরের জন্য ব্যায়াম-চর্চ্চা—আর একটি মনের জন্য বিদ্যানুশীলন।—ব্যায়াম চর্চ্চার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দিবসের মধ্যে কএক ঘণ্টা সরকারি শিক্ষকের অধীনে ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হইত।

ধনীদিগের সন্তানেরা এক জন দাসের সমভিব্যাহারে ঐ সকল পাঠশালা ও ব্যায়াম-শালায় গমন করিত। ঐ দাসদিগকে পেড্যাগগ্ বলিত। এই পেড্যাগগ্‌দিগের উপর বালকদিগের সাধারণ তত্ত্বাবধানের ভার ছিল এবং উহারাই এক প্রকার গৃহ-শিক্ষকের কাজ করিত। বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা ব্যায়াম-শিক্ষার প্রাধান্য ছিল। বালকেরা পাঠশালায় প্রবেশ করিবার প্রথম দিন হইতেই—ব্যায়াম শিক্ষা আরম্ভ করিত। এবং পাঠশালায় অধিকাংশ সময় উহাতেই অতিবাহিত করিত। গ্রীকদিগের মধ্যে বিদ্যার নয়টি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিল। এই নয়টি দেবতার অধীন সমগ্র বিদ্যাই গ্রীকদিগের শিক্ষনীয় ছিল। লিখন ও পাঠাভ্যাসের পরেই কবিদিগের বিশেষতঃ হোমরের পদাবলী বালকদিগকে কণ্ঠস্থ করিতে হইত এবং উহা বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে আবৃত্তি করিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গীতেরও বিলক্ষণ অনুশীলন হইত। ১৬ বৎসর বয়সে বালকেরা পাঠশালা ত্যাগ করিত। যুবকদিগের জন্য এক দল উচ্চশ্রেণীর শিক্ষক ছিল। তাঁহাদিগকে লোকে আলঙ্কারিক বা তার্কিক বলিত। তাঁহারা যুবকদিগকে প্রবন্ধ রচনা ও বক্তৃতা করিতে শিক্ষা দিতেন। এবং তদ্ব্যতীত তৎকালে যে সকল বিজ্ঞানশাস্ত্র প্রচলিত ছিল তাঁহারা তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতেন। ফলত, যে সকল কর্ম্ম প্রত্যেক পৌরজনের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল, ভবিষ্যতে তৎ সাধনে সম্যক্ উপযুক্ত করিবার জন্য তাঁহারা যুবকদিগকে শিক্ষা দিতেন। সকলকেই একবার না একবার বাদী বা প্রতিবাদী হইয়া আদালতে হাজির হইতে হইত। কাহাকেও বা আদালৎ-সংক্রান্ত কোন কার্য্য করিতে হইত। সুতরাং প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত বুদ্ধি ও বিধিমতে বক্তৃতা করিতে না পারিলে কিম্বা সামান্য মোকদ্দামা নিষ্পত্তি করিবার জন্য আইন জ্ঞান না থাকিলে নিতান্ত দোষের বলিয়া গণ্য হইত। রাজ্যে উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিবার জন্য যাঁহাদের আকিঞ্চন—কিম্বা যাঁহারা সরকারি ব্যাপারে কর্তৃত্ব করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে উল্লিখিত শিক্ষকগণের উপদেশ অত্যন্ত কাজে লাগিত।

প্লেটো, আইসোক্রেটিস্ অ্যারিস্টটলের মতে, শারীরিক বল ও তৎপরতা, বিদ্যানুশীলন এবং বাক্‌পটুতা এই কয়টি এক সঙ্গে শিক্ষা দেওয়াই গ্রিশীয় শিক্ষা-প্রণালীর উচ্চ আদর্শ। মল্ল—সৈনিক, বিদ্বান্ এবং বাগ্মীর পক্ষে ঐ এক একটি বিশেষ বিশেষ গুণ না থাকিলেই নয়—এবং এথিনীয়দের যেরূপ অভ্যাস ছিল ও তাহাদিগকে যে সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইত, তাহাতে ঐ সকল গুণেরই বিশিষ্টরূপ স্ফূর্ত্তি পাইবার কথা।*

এইরূপ নানাবিধ শিক্ষা-প্রকরণে এথিনীয়দিগের বুদ্ধিবৃত্তির শক্তি ও উদাম আশ্চর্য্যরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে সময় মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই—লিখন পঠনের তত সুবিধা ছিল না—সংবাদ পত্রও ছিল না—তথাপি আপনাদিগের মধ্যে পরস্পর কথোপকথন করিয়া, জ্ঞানীদিগের উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, উৎকৃষ্ট শিল্পের আদর্শ সকল আলোচনা করিয়া, নাট্যশালার অভিনয় দেখিয়া, প্রকাশ্য সাধারণ উৎসব-ক্রীড়ামোদে যোগ দিয়া এবং সকল অপেক্ষা অধিক—স্বাধীন পৌরজনের শ্রমসাধ্য কর্ত্তব্য ভার বহন করিয়া এথিনীয়দিগের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা লাভ হইত। মেকলে যথার্থই বলিয়াছেন যে †"এথিনীয়েরা প্রতি দিন প্রাতঃকালে ইচ্ছা করিলে সক্রেটিসের সহিত কথোপকথন করিতে পারিত, এবং প্রতিমাসে চার পাঁচবার পেরিক্লিসের কথা শুনিতে পাইত। ফিডিয়াসের গঠিত প্রতিমূর্ত্তি সকলের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিতে পাইত এবং জ্যুক্‌সিসের চিত্র সকল দেখিতে পাইত—ইস্‌কাইলসের Chorus তাহাদিগের কণ্ঠস্থ ছিল—Rhapsodist নামক উপস্থিতভাষী কবিগণ রাস্তার এক কোণে এখিলিসের ঢাল কিম্বা আর্গসের মৃত্যু সম্বন্ধে কোন গাথা আওড়াইতেছে তাহা তাহারা শুনিতে পাইত। এথেন্‌স্-নিবাসী প্রত্যেক লোকই—এক এক জন ব্যবস্থাপক, সন্ধি বিগ্রহ প্রভৃতি উচ্চ বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞ—প্রত্যেকই এক এক জন সৈনিক—যুদ্ধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত—প্রত্যেকই বিচারকর্ত্তা—বিরুদ্ধ দুই পক্ষের তর্কবিতর্ক প্রতিদিন বিচার করিতে হইত। ইহাই তো এক প্রকার শিক্ষা। এ যেরূপ শিক্ষা তাহাতে গভীর চিন্তাশীল সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত হওয়া যায় না বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা আমাদের মনের সংবেদনা-বৃত্তি (Perceptions) সমূহের শক্তি বৃদ্ধি হয়—রুচি সূক্ষ্ম ও মার্জ্জিত হয়—মনের ভাব সকল অনর্গল প্রকাশ করা যায়—এবং ভদ্র ব্যবহারের শিক্ষা হয়।"

মিল্ বলেন‡—"পূর্ব্বকালের সামাজিক প্রণালী ও ধর্ম্মনৈতিক ভাবে অনেক দোষ

* Grote Xi 371-374.

† Macaulay's Essays. P. 401 (Boswell's 'Life of Johnson.')

‡ Mill's Representative Government—67

ও ত্রুটি থাকিলেও ইহা বলিতে হয় যে ডিক্যাস্‌টরি ও এক্লিসিয়া প্রভৃতি আদালৎ ও সাধারণ সভার কার্য্যে প্রত্যেক এথিনীয়কে যতটুকু যোগ দিতে হইত তাহাতেই তাহার বুদ্ধিবৃত্তির এত চালনা ও উন্নতি হইত যে সেরূপ কি পূর্ব্বকালে কি ইদানীন্তন কালে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।" বস্তুতঃ এথেন্‌সে সাধারণতন্ত্রের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাগ্মিতা উপার্জ্জন সাধারণের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। তর্কবিতর্ক করা শিক্ষিত এবং উচ্চাভিলাষী পৌরজন মাত্রেরই কাজ ও আমোদ হইয়া পড়িয়াছিল। যে সকল যুবক তর্ক করিতে ও প্রতিবাদিগণকে পরাস্ত করিতে শিখিয়াছিল—আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যেরূপ কোন "ক্লবের" গন্ধ পাইলেই সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া উপস্থিত হয়—সেইরূপ তাহারা স্বীয় বিদ্যার আস্ফালন করিবার জন্য "ডিক্যাস্ত্রি" নামক আদালতে দলে দলে আসিত। প্রসিদ্ধ গ্রীক প্রহসন-লেখক অ্যারিস্‌টোফেনিস্‌ এই দলকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। যদিও যুক্তির গভীরতা অপেক্ষা তাহাদের বক্তৃতায় অলঙ্কারের অধিক প্রাচুর্য্য থাকিত তথাপি তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। যে হেতু, জন-সাধারণ ব্যাপারে আগ্রহের সহিত যোগ দেওয়া প্রত্যেক এথিনীয় যুবকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল।

১৬ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে ব্যায়াম চর্চ্চার বৃদ্ধি করা হইত। ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে যুবকদিগের কুল-মর্য্যাদা ও অস্ত্রধারণের উপযোগী শারীরিক যোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগের নাম পৌরজনের তালিকা মধ্যে সন্নিবেশিত হইত। তৎপরে তাহারা ইফিয়স্‌ এই নাম ধারণ পূর্ব্বক পৌরজনদিগের প্রকাশ্য সভায় একটী বর্ষা ও একখানা ঢাল উপহার প্রাপ্ত হইত। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি অনুষ্ঠান মহা গম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হইত, এবং পৌরজনের নির্দ্দিষ্ট প্রধান প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলির বিশেষরূপ উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে শপথ গ্রহণ করিতে হইত। এই ইফিয়স্‌গণ রাজ্য সম্বন্ধে অনেক পরিমাণে স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পাইত। কিন্তু দুই বৎসর ধরিয়া আটিকা প্রদেশ রক্ষণের জন্য তাহাদিগকে সৈনিক পদে থাকিতে হইত। সীমা প্রদেশ রক্ষণ ও আভ্যন্তরিক শান্তি রক্ষণ এই উভয় কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই এফিয়স্‌—শ্রেণী হইতে এক দল লোক নির্ব্বাচিত হইত। অতএব এই দুই বৎসর কাল ধরিয়া—যুবক মাত্রকেই সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত। ২০ বৎসরে পদার্পণ করিলেই—তাহারা একেবারে স্বাধীন হইত। তখন তাহারা সংসারে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় অভিরুচি অনুসারে কাজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত। যদি তাহাদিগের মধ্যে কাহারও পৈতৃক ধন থাকিত তাহা হইলে সে আমোদ প্রমোদ—বিদ্যানুশীলন—বা রাজকীয় পদের অনুসরণ যথা অভিরুচি করিতে পারিত। কারণ এথেন্সে সকল

বিষয়েরই যথেষ্ট সুবিধা ও সুযোগ ছিল। বিশেষতঃ যৌবন-সুলভ আমোদ প্রমোদ সম্ভোগ করিবার পক্ষে গ্রীকদিগের সামাজিক আচার ব্যবহার কিছুমাত্র প্রতিকূল ছিল না।

স্ত্রীলোক।—স্ত্রীলোকদিগের প্রতি গ্রীকদিগের ব্যবহার অনেকটা আমাদের দেশের ন্যায় ছিল। স্ত্রীলোকেরা গৃহেই যাহা কিছু শিক্ষা লাভ করিত—এবং পুরুষেরা তাহাদিগের নিকট এই মাত্র প্রত্যাশা করিত যে তাহারা সর্ব্বপ্রকার গৃহ-কার্য্যে দক্ষ হইবে এবং সূতাকাটা কাপড় বুনান প্রভৃতি গার্হস্থ্য শিল্প কার্য্যেই নিপুণতা লাভ করিবে। তাহারা গৃহের ভিন্ন বিভাগে বাস করিত এবং প্রায় কখনই গৃহের বাহিরে যাইতে পাইত না। তবে আমাদের দেশের ন্যায় পূজা-উৎসব উপলক্ষে কখন কখন বাহির হইতে পাইত। বিবাহ হইয়া গেলে তাহারা আর একটু স্বাধীনতা লাভ করিত। এক জন দাসী সঙ্গে করিয়া তাহারা বাজার হাট করিতে কিম্বা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে পারিত। বলা বাহুল্য যে দরিদ্র ঘরের স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষাকৃত অধিক স্বাধীনতা ছিল।

আমাদের দেশের ন্যায় গ্রীকেরাও বিবাহ-প্রথাকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গণ্য করিত। দেবতাদিগের পূজার্চ্চনার স্থায়িত্ব সম্পাদনই তাহাদের বিবাহ করিবার একটি প্রধান উদ্দেশ্য। রাজ্যের হিতজনক বলিয়াও সন্তান উৎপাদন একটি কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইত। আমাদের দেশে যেমন শ্রাদ্ধ তর্পণাদির আশায় লোকে পুত্র কামনা করে, গ্রীকেরাও তদ্রূপ মনে করিত যে বংশ লোপ হইলে মৃত পূর্ব্বপুরুষদিগের কবরের প্রতি আর সমাদর ও যত্ন থাকিবে না—এবং দেবতা ও পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের এই রূপ প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হইলে তাহারা মহা বিপদ বলিয়া মনে করিত। এইরূপ কতকটা সংসার চালাইবার জন্য এবং কতকটা ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে অধিকাংশ বিবাহ অনুষ্ঠিত হইত। যাহাকে প্রণয়-বিবাহ বলে অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষে প্রণয় হইয়া যে বিবাহ হয় তাহা প্রায় ঘটিত না। আমাদের দেশের ন্যায় প্রায় পিতাকর্ত্তৃক পুত্রের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইত। সাধারণতঃ বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিবার সময় কন্যার জাতি কুল এবং যৌতুকের পরিমাণ প্রভৃতির প্রতি যতটা দৃষ্টি রাখা হইত—তাহার রূপ গুণের প্রতি ততটা দৃষ্টি রাখা হইত না। রূপ গুণ জানিবার পক্ষে সেরূপ সুবিধাও ছিল না। স্ত্রীপুরুষের পদ-মর্য্যাদা ও অবস্থা সমান না হইলে প্রায় তাহাদের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইত না। নিকট জ্ঞাতির সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু এক পরিবারের মধ্যে পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। বর অপেক্ষা কন্যার বয়স অনেক কম না হইলে তাহাদের মধ্যে প্রায় সম্বন্ধ স্থির হইত না। যৌতুক-দান-প্রথা গ্রীসের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। এই যৌতুকের উৎপাতে গ্রীকেরা অনেক সময় কন্যা সন্তান পালনে সম্মত

হইত না—অনেকে কন্যা সন্তান হইলে অস্মদ্দেশের লোকের ন্যায় আপনাদিগকে ভারগ্রস্ত বলিয়া মনে করিত। বিবাহ-কালে নানা প্রকার ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান হইত। বিবাহের কিছুকাল পূর্ব্বে বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগকে বলি উৎসর্গ করা হইত। বিবাহের দিনে কোন একটি বিশেষ কূপ হইতে জল আনিয়া বর কন্যাকে অভিষেক করা হইত। সন্ধ্যার সময় বিবাহ যাত্রা আরম্ভ হইত। বর ও কন্যা বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী সকলে মিলিয়া কন্যার বাটী হইতে নির্গত হইয়া মশালের আলোকে ও বাদ্য সহকারে মহা সমারোহে বরের বাটীতে যাত্রা করিত। বরের নিজ বাটীতে কিম্বা তাহার পৈতৃক বাটীতে বিবাহ-ভোজ সম্পন্ন হইত। এই বিবাহ-ভোজের সময় গ্রীকেরা প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া স্ত্রীপুরুষ একত্র ভোজন করিত। তবে স্ত্রীলোকদিগের জন্য পৃথক ভোজন-পীঠ বা টেবিল থাকিত। আমাদের আনন্দ-লাড়ুর ন্যায় এক প্রকার বৈবাহিক মিঠাই সর্ব্বসাধারণকে বিতরণ করা বিবাহের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত ছিল। বিবাহকালে কন্যাকে অবগুণ্ঠিত করিয়া বিবাহ-স্থানে আনা হইত। এবং বিবাহ-শালার দ্বারে কতকগুলি বালিকা সমস্বরে মঙ্গল গীতি গান করিত। বিবাহের পর হইতে গার্হস্থ্য ব্যাপারের তত্ত্বাবধান ও সন্তানের প্রতিপালন-ভার সমস্তই বিবাহিতা স্ত্রীর উপর ন্যস্ত হইত। স্ত্রী স্বামীর সংসর্গে সকল সময় থাকিতে পাইত কিন্তু যখন বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া আমোদ আহ্লাদ হইত তখন স্ত্রী উপস্থিত থাকিতে পাইত না। কিম্বা স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন আগন্তুককে অভ্যর্থনা করিতে পারিত না। ভৃত্যগণ অর্থাৎ ক্রীত দাসেরা স্ত্রীরই কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিত এবং পরিবারের কাহারও কিম্বা দাস-দাসীর পীড়া হইলে তাহার শুশ্রূষা-ভার গৃহকর্ত্রীর উপর অর্পিত হইত।

ইংরাজিতে যাহাকে গ্যালেণ্ট্রি বলে সেরূপ ভাব যেমন আমাদের দেশে নাই, তেমনি গ্রীসেও ছিল না। বরং স্ত্রীলোকের সমক্ষে পুরুষেরা আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য একটু গম্ভীর ভাব ধারণ করিত। এবং মনে করিত পুরুষদিগকেই স্ত্রীলোকের সম্মান করা উচিত। স্ত্রীদিগকে সামান্য গার্হস্থ্য কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিতে হইত এবং লেখা-পড়া ভাল করিয়া তাহাদিগের শিক্ষা হইত না—সুতরাং * স্ত্রীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া স্বামী তেমন আমোদ পাইতেন না। এই অভাব নিবন্ধন গ্রীক-সমাজে হিটিরি

*"পূর্ব্বতন গ্রীকসমাজে অধিকাংশ পুরুষ বিবাহের পূর্ব্বে স্বীয় স্ত্রীর মুখ দেখিতে পাইত না। স্ত্রীরাও চিরকাল বাটীর প্রাচীরের মধ্যে রুদ্ধ থাকিত বলিয়া স্ত্রীসংসর্গে স্বামীরা তেমন আমোদ পাইত না। সুতরাং এই আমোদ-লালসা তৃপ্ত করিবার জন্য গ্রীক যুবকেরা এরূপ স্ত্রীলোকের সংসর্গ প্রার্থনা করিত যাহারা আত্মমর্য্যাদা হারাইয়াছে—যাহারা সম্পত্তিবিহীন বিদেশীয় কিম্বা যাহারা দাসত্ব হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে।" Schlegel's Dramatic Literature. Page 193.

নামক একদল অবিবাহিত স্ত্রী সম্প্রদায় সমুত্থিত হয়। তাহারা অত্যন্ত সুশিক্ষিত এবং বিবিধ গুণে বিভূষিত ছিল। তাহাদিগের গার্হস্থ্য কোন বন্ধন ছিল না—পুরুষদিগের সহিত তাহাদিগের অবারিত সংসর্গ। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তৎকালে এতদূর প্রখ্যাত হইয়াছিল যে তাহাদের নাম আবহমান কাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। তাহারা রূপে গুণে অসামান্য এবং তাহাদিগের এক প্রকার অসাধারণ মোহিনী শক্তি ছিল। আগন্তুক সাধারণের বদান্যতায় তাহাদিগের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। তাহাদের জ্ঞানগর্ভ ও আমোদ-জনক কথোপকথন শুনিবার জন্য দেশের যাবতীয় জ্ঞানী পণ্ডিতেরা তাহাদিগের বাটীতে যাতায়াত করিত। এই হিটিরিদিগের মধ্যে অধিকাংশ বিদেশ হইতে আসিয়া এথেন্‌সে বাস করিয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ হিটিরি-বৃত্তি অবলম্বন করিবে পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ সংকল্প করিয়া আসিত এবং কেহ কেহ বা ঘটনা-চক্রে পতিত হইয়া ঐ পথের পথিক হইত। ঐ সম্প্রদায়-ভুক্ত অ্যাস্‌পেসিয়া নামক সুপ্রসিদ্ধ স্ত্রীলোক প্রথমে বিদেশ হইতে আসিয়া এথেন্‌সে বাস করে—পরে এথেন্‌সের রাজা পেরিক্লিসের সহিত তাহার বিবাহ হয়। পূর্ব্বতন গ্রীকদিগের এই একটি বিশেষ ভাব ছিল যে তাহারা আমোদ আহ্লাদের একশেষ করিয়াও চরিত্রকে একেবারে ধ্বংশ হইতে দিত না। আমাদের দেশে আমোদপ্রিয় সম্প্রদায় যেরূপ একবারে অধঃপাতে যায় তাহারা সেরূপ যাইত না। ইন্দ্রিয়সুখ অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তি-ঘটিত উচ্চতর আমোদের প্রতি তাহাদিগের অধিক আস্থা ছিল। এথিনীয় যুবকেরা পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোক সম্প্রদায়ের সংসর্গে অধিকাংশ সময় এবং অর্থ ব্যয় করিত। হিটিরি সম্প্রদায় ব্যতীত আর একটী নীচ বেশ্যা দল ছিল তাহারা ক্রীত দাস শ্রেণীস্থ। সমস্ত গ্রীসের মধ্যে কোরিন্থ নগরেই উহাদের সংখ্যা অধিক ছিল। সুঃ—

দিক্-বালা।

'কোথা গেলে কল্পনা! আইস আইস দেবি!
সুখ-রাত যায় যে গো বহিয়া।
দিক্ বালাগণ যেথা ঘুমাইছে সেই খানে
মোরে দেবী চলনা গো লইয়া।'
* * * *

'সেথায় কি তুমি কবি করিবে গমন
যেথা দিক্ বালাগুলি মেঘময় পাখা তুলি
শূন্য-করিয়াছে আবরণ?
উঠ তবে মেঘ-রথে—চল গো আকাশ পথে,
সেথা হ'তে দিক্-রাজ্য করিবে দর্শন।'
* * * *

শ্যামল নীরদ যানে, চড়িলেন দুই জনে
মেঘ খণ্ড ধীরে ধীরে উঠিল আকাশে।
নিশির শিশিরময় বিমল বাতাসে।
শূন্যে বায়ু-স্তরে স্তরে, মৃদু মৃদু জ্যোতি ক্ষরে,
দ্বিতীয়ার অর্দ্ধস্ফুট জ্যোছনার প্রায়।
আঁধার জলদ খানি— স্নিগ্ধ জ্যোতি সুর-রাণী
নিকষে সুবর্ণ-রেখা যেন শোভা পায়।

* * * *

দূর আকাশের পথ, গিয়াছে জলদ রথ,
নিম্নে চাহি দেখে কবি ধরণী নিদ্রিত।
নদনদী পরবত, অস্ফুট চিত্রের মত
পৃথিবীর পটে-যেন রয়েছে চিত্রিত।
সমস্ত পৃথিবী ধরি একটি মুঠায়,
অনন্ত সুনীল সিন্ধু সুধীরে লুটায়।
হাত ধরা ধরি করি দিক্-বালা গণ
দাঁড়ায়ে সাগর-তীরে ছবির মতন।

কেহবা জলদময় মাথায়ে জ্যোছানা
নীল দিগন্তের কোলে পাতিছে বিছানা।
মেঘের শয্যায় কেহ ছড়ায়ে কুন্তল
নীরবে ঘুমাইতেছে নিদ্রায় বিহ্বল।

সাগর-তরঙ্গ তার চরণে মিলায়,
লইয়া শিথিল কেশ পবন খেলায়।
কোন কোন দিক্‌বালা বসি কুতূহলে
আকাশের চিত্র আঁকে সাগরের জলে।

আঁকিল জলদ-মালা চন্দ্রগ্রহ তারা,
রঞ্জিল সাগর, দিয়া জ্যোছনার ধারা।
পাপিয়ার ধ্বনি কেহ শুনি দূর বনে
প্রতিধ্বনি সুন্দরীরে জাগায় যতনে।

শুকতারা প্রভাতের ললাটে ফুটিল
পূরবের দিক্-দেবী জাগিয়া উঠিল।
লোহিতকমল করে পূরবের দ্বার
খুলিয়া—সিন্দূর দিল সীমন্তে উষার।
মাজি দিয়া উদয়ের কনক সোপান,
তপনের সারথীরে করিল আহ্বান।

সাগর-উর্ম্মির শিরে সোনার বরণ
মাথায়ে মাথায়ে দিল দিক্-বালাগণ।
পূরব দিগন্ত কোলে জলদ গুছায়ে
ধরণীর মুখ হ'তে আঁধার মুছায়ে

বিমল শিশির জলে ধুইয়া চরণ,
নিবিড় কুন্তলে মাখি কনক-কিরণ,
সোনার মেঘের মত আকাশের তলে,
কনক কমল সম মানসের জলে,

খেলিতে লাগিল সব দিক্‌বালাগণে
প্রফুল্লিত হয়ে নব প্রভাত পবনে।
ওই হিমগিরি পরে কোন দিক্ বালা
রঞ্জিছে কনক-করে নীহারিকা-মালা।

মুকুতা-মালিকা গাঁথি শিশিরের জলে
পরি দিক্ বালাগণ সুকুমার গলে,
কুন্তলে মেঘের চূর্ণ মাখিয়া প্রচুর,
সীমন্তে কনক-বর্ণ মাখিয়া সিন্দূর,

কেহবা সরসী-জলে করিতেছে স্নান,
কেহবা নীরব কুঞ্জে গাইতেছে গান।
ওদিকে দেখেছ ওই সাহারা ভিতরে
অধিষ্ঠিত দিক্-দেবী বালুকার পরে।
অঙ্গ হতে বাহিরায় জ্বলন্ত কিরণ,
চাহিতে মুখের পানে ঝলসে নয়ন।
আঁকিছে বালুকাপুঞ্জে শত শত রবি
আঁকিছে দিগন্ত-পটে মরীচিকা-ছবি।
অন্যদিকে কাশ্মীর উপত্যকা-তলে
পরি শত বরণের ফুল মালা গলে

শত বিহঙ্গের গান শুনিতে শুনিতে
সরসী লহরী মালা গুণিতে গুণিতে
বসি আছে দিক্-বালা হরিত বসনে
শিশির মুকুতাময় হরিত আসনে।
ওইরে তুষার-ক্ষেত্র বিস্তৃত উত্তরে
তীব্র-শীত সমীরণ স্বনিছে অম্বরে।
কুজ্ঝটি-বসনে ঢাকি সর্ব্ব কলেবর,
অনন্ত তুষার শুভ্র বিছানার পর,
এখনও দিক্-বালা ঘুমে অচেতন,
এখনো দিবস সেথা মেলেনি নয়ন!
ওই হোথা দিক্‌দেবী বসিয়া হরষে
ঘুরায় ঋতুর চক্র মৃদুল পরশে।
ফুরায়ে গিয়াছে এবে শীত-সমীরণ,
বসন্ত পৃথিবী-তলে অর্পিবে চরণ।
পাখীরে গাহিতে কহি অরণ্যের গান,
মলয়ের সমীরণে করিয়া আহ্বান।
বনদেবীদের কাছে কাননে কাননে
কহিল ফুটাতে ফুল দিক্-দেবীগণে।
বহিল মলয়-বায়ু কানন ঘিরিয়া,
পাখিরা গাহিল গান কানন ভরিয়া।
ফুল-বালা সাথে আসি বন-দেবীগণ,
কহে দিক্-দেবীদের বন্দিয়া চরণ।
"বসন্তের বিহঙ্গেরা খুলেছে মনের দ্বার,
ছুটিছে মলয়-বায়ু লুঠিতে সুবাস-ভার।
তবু মা আজিও আহা না পেয়ে বরষা জলে,
একটি কুসুম-কলি ফুটেনা কানন-তলে।

ম্রিয়মান গাছ গুলি প্রখর তপন-করে,
শুকায়ে পড়িছে পাতা, কুসুম ঝরিয়া পড়ে।
এক দিন মেঘ যদি বরিষে বরষা-জল,
বসন্তের ফুলভারে হাসিবে কানন তল।"

শুনি দিক্-বালাগণ কহিল "যাইতে হবে
সাগর-বালিকাদের পাশে,
চাহিব সলিল ধারা, সজল জলদ-রাশি
নিরমান করিবার আশে।

আয় তবে সজনিরা, সকলে মিলিয়া যাই,
অন্ধকার সাগরের তলে।
শুকালো কুসুমদের জীবন সঁপিতে হবে
ফোঁটা ফোঁটা বরিষার জলে।"—

"এস এস কবি আমরাও যাই
দেখিতে মুকুতা শালা।
দেখিবে কেমনে প্রবাস আলয়ে
রয়েছে সাগর-বালা।"

দেখিতে দেখিতে জলদের রথ
নামিয়া আসিল ধীরে।
দেখিতে দেখিতে উতরিনু আসি
সুনীল জলধি-তীরে।

ফের্ডিনাঁ ডে লেসেপ্ এবং সুয়েজের খাল।

সামান্য সামান্য ঘটনা হইতে কত অভাবনীয় মহৎ ব্যাপারের জন্ম হয়—সুয়েজের খাল তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল। এখন সকলের মুখেই তো সুয়েজ-খালের কথা শুনা যায়—এবং বাস্তবিকও ইহার নির্ম্মাণে যন্ত্রবিদ্ শিল্পীদিগের শিল্পনৈপুণ্যের যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে আর সংশয় নাই। কিন্তু কি রূপে এই মহৎ ব্যাপারের

প্রথম সূত্রপাৎ হইল এবং ফের্ডিনাঁ ডে লেসেপের মনে ইহার কল্পনা প্রথম উদয় হইল তাহা ঠিক্ জানিতে হইলে যে সময় ফরাশিস্‌রা মিসরদেশ জয় করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন বর্ত্তমান শতাব্দির সেই প্রাক্‌কালীন বর্ষগুলির প্রতি আমাদের মনশ্চক্ষুকে নিয়োগ করিতে হয়। যদিও নেপোলিয়ান বোনাপার্ট মিসরের জয়সাধনে কৃতকার্য্য হন নাই তথাপি বোধ হয় কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঐ দেশের ব্যাপারে তাঁহার বরাবর ঔৎসুক্য ছিল। তাঁহার পররাষ্ট্র-বিভাগের মন্ত্রী ট্যালেরাঁর পরামর্শ-অনুসারে নেপোলিয়ান্, ডেলেসেপ্ নামক এক ব্যক্তিকে তাঁহার প্রতিনিধি কার্য্যকারকরূপে "কায়রো" নগরে স্থাপন করেন। তাঁহার এই নিয়োগে পৃথিবীর একটি ভবিষ্য লভ্যের সূত্রপাত হইল। লেসেপ্ অতি কার্য্যদক্ষ বিচক্ষণ লোক ছিলেন। মহম্মদ আলিকে মিসরের শাসনকর্ত্তার পদে অধিরোহণ করিতে সহায়তা করায় তিনি ফ্রান্সের একটি মহৎ উপকার সাধন করিয়াছিলেন। সকলেই জানেন যে মহম্মদ আলি যখন প্রথম মিসরে আইসেন তখন অতি দরিদ্র ছিলেন। তিনি লেখাপড়া আদৌ জানিতেন না—কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল—এবং তাঁহার সৈনিক-সুলভ দৃঢ়তা ছিল। এই দুই গুণ থাকাতেই মাম্‌লুক্‌দিগের বিনাশের পর—তিনি ঐ উচ্চ পদে অধিরূঢ় হয়েন। ১লা মার্চ ১৪১১ খৃষ্টাব্দে ১৬০০ মামলুক "কায়রো" নগরে নিহত হয়—কেবল তাহাদের মধ্যে এক জন অশ্বারূঢ় হইয়া দুর্গ-প্রাকারের উপর দিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পলায়ন করে। লেসেপ্ কত কাল মিশরে থাকেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। ইহা নিশ্চয় যে তিনি ফ্রান্সের সহিত একেবারে সংশ্রব পরিত্যাগ করেন নাই। ভের্সাই নগরে ১৯ নবেম্বরে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। এই পুত্রের নাম ফের্ডিনাঁ ডে লেসেপ্। ইনিই সুয়েজ খালের অনুষ্ঠান করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে উৎকৃষ্ট শিক্ষা প্রদান করেন—এবং দৌত্য কার্য্যে এবং যন্ত্রবিদ্যায় তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। তাঁহার বুদ্ধির প্রথম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মিসরের বৃত্তান্ত শুনিতে লাগিলেন—এবং ঐ দেশের ব্যাপারে তাঁহার ঔৎসুক্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে তিনি ফরাসিস্ প্রতিনিধি-কার্য্যকারকের পদে তথায় নিযুক্ত হইলেন। ফের্ডিনাঁ ডে লেসেপ্ তাঁহার পিতার পরিচয়-সূত্রে মহম্মদ আলির নিকট যথোচিত সমাদর প্রাপ্ত হইলেন। মহম্মদ আলির অনেক ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁহাকে মিসরের নবজীবনদাতা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আলির মৃত্যুর পর ইব্রাহিম পাশা তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন। ইব্রাহিম পাশা যুদ্ধ ব্যাপারের জন্য প্রখ্যাত।—তাঁহার পর অ্যাবাস পাশা। তিনি অ্যালেকজাণ্ড্রিয়া হইতে কায়রো পর্য্যন্ত বাষ্পীয় শকটের লৌহপথ নির্ম্মাণ করেন। এই লৌহপথের নির্ম্মাণে মিসরের বাণিজ্য নব উদ্যম প্রাপ্ত হয়। তাহার পর

মহম্মদ আলির পুত্র সায়েদ পাশা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে মিসরের শাসনকর্ত্তার পদে অধিরূঢ় হয়েন। তিনিও মিসরের অনেক উন্নতি সাধন করেন।

সৌভাগ্যক্রমে মিসরের অনেক শাসনকর্ত্তার সহিত লেসেপের ক্রমান্বয়ে আলাপ পরিচয় হয় এবং তথাকার বাণিজ্য-ব্যবসায়ের সুবিধা সম্বন্ধে তিনি বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি যখন সে দেশে ছিলেন তখন ভূমধ্যসাগর ও লোহিত-সাগরের মধ্যে পরস্পর যোগ করিয়া জাহাজ চলিবার একটি খাল নির্ম্মাণের কোন সুবিধা হইতে পারে কি না তাহাই তিনি ক্রমাগত চিন্তা করিতেন। কিন্তু এই কল্পনাটি একেবারে নূতন নহে। পূর্ব্বকালে ফ্যারাওদিগের রাজত্ব সময়ে নীল নদী এবং লোহিত সাগর যোগ করিয়া একটি খাল ছিল। যদিও বালুকায় একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে তথাপি ইতস্ততঃ এখনও তাহার চিহ্ন দৃষ্ট হয়। কিন্তু লেসেপ্ যাহা কল্পনা করেন তাহা প্রকাণ্ড ব্যাপার। তিনি সমুদ্রে সমুদ্রে বরাবর যোগ করিয়া যাহাতে বড় বড় জাহাজ অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে এই সঙ্কল্পটি মনে মনে ধারণা করেন। নদীর কিম্বা হ্রদের সহিত যোগ করিয়া খাল প্রস্তুত করা তো সহজ কথা—কিন্তু দুইটি সমুদ্রের দুই মুখ খুলিয়া দিয়া জল আনয়ন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। লেসেপ্ দেখিলেন, যেখানে পাহাড় পর্ব্বত নাই—এমন স্থল ব্যতীত এই সঙ্কল্পটিকে কার্য্যে পরিণত করাই একেবারে অসাধ্য।

অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিলেন যে তত্রস্থ মরুভূমির কিয়দংশ এবং লোহিত সাগরের সংলগ্ন কিয়দংশ স্থানে সমুদ্রের লবণাক্ত জলরাশি পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল—তাহার চিহ্নস্বরূপ তিনি দেখিতে পাইলেন যে এখানে ওখানে কতকগুলি গর্ত্ত যাহা বালিতে বুজিয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে এখনও লবণের এক একটি সূক্ষ্ম আবরণ পড়িয়া আছে।

তবে এত দিন কেন সুয়েজ খাল নির্ম্মিত হয় নাই—তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—মিসর দেশের রাজনৈতিক অবস্থা তত অনুকূল ছিল না—ইউরোপের রাজাদিগের মধ্যে বেষারিষি প্রবল ছিল এবং সাধারণে এই একটি সংস্কার ছিল যে লোহিত সাগরের এবং ভূমধ্য সাগরের সমতল এক নহে। কিন্তু লেসেপ দেখিলেন উভয়েরই সমতল সমান—এবং তাঁহার বিলক্ষণ বিশ্বাস হইল যে বাষ্প ও তাড়িৎ বার্ত্তাবহের সাহায্যে একটি প্রশস্ত খালের মধ্য দিয়া বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিলক্ষণ সুগমতা হইবে।

ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্যের সুবিধা করাই—সুয়েজ খাল নির্ম্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য। কতিপয় শতাব্দি পর্য্যন্ত প্রাচ্য দেশের সহিত ইউরোপের বাণিজ্য অধিকাংশ এসিয়ার স্থলপথ দিয়া চলিত। বাণিজ্যদ্রব্য সকল প্রথমতঃ এসিয়ার স্থলপথ দিয়া আসিয়া পরে জাহাজে করিয়া বিনিস্ নগরে চালান হইত। পরে বিনিস্ হইতে ইউরোপের উত্তর

প্রদেশে নীত হইত। ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে উত্তমাশা অন্তরীপের আবিষ্কার হইলে পর—এই বিরক্তিজনক ও বহুব্যয়-সাপেক্ষ বাণিজ্যের পথটি বন্ধ হইয়া যায়। তখন জাহাজ সকল একেবারে ভারতবর্ষে সোজা যাতায়াত করিতে লাগিল এবং এই রূপে পৃথিবীর বাণিজ্যে মহা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। ক্রমে বিনিস্ নুরোম্বর্গ—ব্রুজ্ প্রভৃতি প্রাচ্য বাণিজ্যের অধিষ্ঠান-গুলির প্রাধান্য লোপ হইল। এই রূপ চলিতেছিল—এমন সময় আর একটি মহা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল।

এপর্য্যন্ত উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া বাণিজ্যের জাহাজগুলি যাতায়াত করিত—এবং ইদানীন্তন কালে অ্যালেক্স্যাণ্ড্রিয়া হইতে কায়রো পর্য্যন্ত লৌহপথ হওয়াতে পর্য্যটকদিগেরও অনেক পরিমাণে সুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু লেসেপের সঙ্কল্পিত প্রস্তাবে প্রাচ্য বাণিজ্যে আর একটি মহা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবার সূচনা হইল। উত্তমাশা অন্তরীপের পথটি একেবারে উঠাইয়া দিয়া, বাণিজ্য-জাহাজ চলাচলের উপযুক্ত খাল নির্ম্মাণ করিয়া, আফ্রিকা প্রদেশকে একটি মহাদ্বীপে পরিণত করা তাঁহার সঙ্কল্প হইল।

দৌত্যকার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইয়া লেসেপ্ ইউরোপে প্রত্যাগমন করিলেন এবং কিরূপে সুয়েজের যোজক-দেশ ভেদ করা যায় তাহারই চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তিনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে এই রূপ বলিয়াছিলেন, "১৮৪৯ হইতে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে বাণিজ্য ব্যবসায় সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার বিষয় আছে তত্তাবৎই আমি বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছিলাম। আমি দেখিলাম যে প্রতি দশবৎসরে বাণিজ্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইতেছে এবং ভাবিলাম যে এই সময় সুয়েজখাল নির্ম্মাণ করিলে ঐ বাণিজ্যের আরও শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে"। এই বিশ্বাসটি মনে বদ্ধমূল হইলে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ সাএদের শাসনকর্ত্তৃপদে অধিরোহণের সময় তিনি মিসর দেশে যাত্রা করিকরিলেন। নানা প্রকারে তিনি সায়েদের উপকার সাধন করায় সায়েদের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইল। এত দিনের পর তাঁহার আশা হইল যে তাঁহার সঙ্কল্পটি অনুষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য সায়েদের নিকট অনুমতি পাইলেও পাইতে পারেন। সায়েদ যখন একবার লিবিয়ান মরুভূমির উপর দিয়া যুদ্ধযাত্রায় নির্গত হইয়াছিলেন, তখন লেসেপ্ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই প্রস্তাবটী উত্থাপন করেন এবং বলিলেন সাধারণের যোগে এই বৃহৎ ব্যাপারটি সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু শাসনকর্ত্তার অনুমতি পাইবার পূর্ব্বে শাসনকর্ত্তার পারিষদবর্গকে অগ্রে সন্তুষ্ট করা আবশ্যক হইল। তাঁহার পারিষদ্গণ "মস্তিষ্কের চালনা অপেক্ষা অশ্বের চালনায় অধিক দক্ষ ছিলেন"। লেসেপ্ বলেন—"আমি কোন সুযোগ পাইয়া শাসনকর্ত্তার তাঁবুতে গিয়া উপনীত হইলাম।

আব্ড়ো-খাব্ড়ো শিলাখণ্ডের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত—কামান রাখিবার স্থান বিশিষ্ট দুর্গের ন্যায় একটি উচ্চ স্থানে ঐ শিবির সন্নিবেশিত ছিল। আমি কথায় কথায় বলিয়াছিলাম যে ঐ দুর্গের এমন একটি স্থান আছে যেখান হইতে অশ্বারূঢ় হইয়া লম্ফ প্রদান করিলে নীচে একটা বারাণ্ডায় গিয়া পড়া যায়। শাসনকর্ত্তামহাশয় এই কথায় সন্তুষ্ট হইয়া আমার প্রস্তাবটি আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন ঐরূপ ঘোড়ায় চড়িয়া তুমি এখনি তোমার তাঁবুতে গমন কর এবং প্রস্তাবিত খালের সমস্ত বিষয় লিখিয়া আমাকে দেখাও। মন্ত্রিগণ ও পারিষদ্গণ দ্বারা শাসনকর্ত্তা তখন পরিবেষ্টিত ছিলেন। আমি লম্ফ দিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম—এবং আমার অশ্ব এক লম্ফ দিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিল এবং ক্রম-নিম্ন-ভূমি দিয়া দ্রুতবেগে আমার তাঁবুতে গিয়া পৌঁছিল। আমার রিপোর্ট অনেক দিন হইতে প্রস্তুত ছিল আমি তাহা লইয়া শাসনকর্ত্তার তাঁবুতে পুনরায় উপস্থিত হইলাম। খালের সম্বন্ধে আমার মন্তব্য কথা দেড় পৃষ্ঠার মধ্যে সুস্পষ্ট রূপে আমি ব্যক্ত করিয়াছিলাম। তৎপরে যখন ঐ বিবরণ শাসনকর্ত্তা তাঁহার পারিষদগণকে পড়িয়া শুনাইলেন এবং তাঁহাদিগের পরামর্শ চাহিলেন তখন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিলেন যে, "মহম্মদ আলির বংশের সহিত যাঁহার চিরকালের বন্ধুত্ব তাঁহার প্রস্তাব কখনই অননুমোদনীয় হইতে পারে না এবং প্রস্তাবটি গ্রাহ্য করা প্রার্থনীয় বটে।" ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি খাল কাটিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। এক্ষণে বিধিমতে ডমরুমধ্য স্থানের (Isthmus) তত্ত্বানুসন্ধান এবং কোন্ স্থান দিয়া খাল কাটিতে হইবে তাহার পথ নিরূপণ করিবার সময় উপস্থিত হইল। লেসেপ্ এবং আর তিন জন ফরাসিস্ যন্ত্রবিৎ শিল্পী এই কার্য্যে ব্রতী হইলেন। এই চারি জনের পানীয় জল এবং অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য বহন করিবার জন্য ৬০টি উষ্ট্র এবং তদুপযুক্ত অনুচরগণের প্রয়োজন হইল। জীবন্ত ভেড়া ও মুর্গি অনেক সঙ্গে চলিল। তাঁহাদের পথের উল্লেখ করিয়া লেস্পে বলেন যে "তাঁহাদের সঙ্গে যেসব জন্তু গিয়াছিল তদ্ব্যতীত এই ভয়ানক মরুপ্রদেশে একটি মক্ষিকাও নাই"। তিনি বলেন যে "আমরা রাত্রিতে খাঁচা হইতে মুর্গিদিগকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া ছাড়িয়া দিতাম—কারণ,আমরা বেশ জানিতাম যে প্রাতঃকাল হইলেই আমাদের জীব জন্তুগুলি যেখানেই থাকুক আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবে। ঐ বিজন প্রদেশে কেহই পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে চাহিবেনা—ওখানে একলা থাকাও যা' মৃত্যু-মুখে পতিত হওয়াও তা'। আমরা যখন প্রাতঃকালে আমাদের তাঁবু উঠাইতাম—যদি কোন মুর্গি পিছনে পড়িয়া থাকিত—অমনি সে ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি তাহার খাঁচায় ঢুকিবার জন্য উষ্ট্র পৃষ্ঠে উড়িয়া আসিত।" —অনুসন্ধানের পর্য্যটন শেষ করিতে দুই মাস কাল লাগিয়াছিল। অবশেষে এই রূপ

স্থির হইল যে, খালের পথ নির্ণয় করিবার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন প্রদেশের সমবেত সুদক্ষ যন্ত্রবিৎ শিল্পীদিগের বিবেচনার উপর নির্ভর করা যাউক। তাঁহারাও রীতিমত অনুসন্ধান করিয়া লেসেপের সমভিব্যাহারে অ্যালেক্স্যাণ্ড্রিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিসরের শাসনকর্ত্তা পুরদ্বারে আসিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। এই সময় একটি চমৎকার দৃশ্য উপস্থিত হইল। লেসেপ্ বলেন, "যখন সায়েদ শুনিলেন যে দেশদেশান্তর হইতে সমবেত শিল্পিগণ নীল নদীর জলের সাহায্য ব্যতীত খাল হইতে পারে বলিয়া মত দিয়াছেন তখন তিনি দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে আগ্রহের সহিত আলিঙ্গন করিলেন এবং অত্যন্ত হর্ষ প্রকাশ করিলেন"

এই ফরাসিস্ বীর খাল কাটিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া ইউরোপে প্রত্যাগমন করিলেন এবং এতদুপলক্ষে একটি সন্তুয়-সমুত্থান স্থাপন করিবার জন্য সাধারণের মনকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

তিনি পদে পদে যেরূপ বাধাবিঘ্ন প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন তাহাতে আর কেহ হইলে তখনি ঐ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিত, কিন্তু তিনি কিছুতেই নিরাশ হইলেন না। কতকগুলি প্রতিপত্তিশালী ইংরাজ যন্ত্রশিল্পী এই রূপ মত প্রকাশ করিলেন যে, খালে এবং খালের মুখে আদপে কাদা আসিয়া না জমে তাহার উপায় করিতে ও মাটি কাটাইতে এত অধিক ব্যয় হইবার সম্ভাবনা যে উহাতে কিছুমাত্র খর্চ্চা পোষাইবে না। আরও এই আপত্তি ও সন্দেহ উপস্থিত হইল যে এই ব্যাপারে সাহায্য করিলে ফরাসিস্ গভর্ণমেণ্টের হাতে গিয়া পড়িতে হইবে। পার্ল্যামেণ্টে ঐ সম্বন্ধে যে সব বক্তৃতা হইয়াছিল তাহা পাঠ করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ৭ই জুলাই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড পামর্ষ্টন বলেন—"তুর্কির সহিত মিসরের বিচ্ছেদ আরও সহজে সাধন করা এই সঙ্কল্পিত ব্যাপারের রাজনৈতিক পরিণাম হইবে। আরও, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের আক্রমণ পক্ষে সুবিধা হইবে, এই দূর লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই ব্যাপারে ফরাসিরা হস্তক্ষেপ করিয়াছে। এবিষয় আমার বিশেষরূপে বলিবার আবশ্যক নাই, এই বিষয়ে যে কিছুমাত্র মনোযোগ দিয়াছে সেই স্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারিবে। আমার এই মাত্র বিস্ময় হইতেছে যে লেসেপ্ ইংরাজ মহাজনদিগের বিশ্বাস-প্রবণতার উপর এত দূর নির্ভর করিয়া আছেন যে তিনি মনে করিয়াছেন যে ইংলণ্ডের বাণিজ্য-প্রধান নগরগুলি পরিভ্রমণ করিবামাত্র ইংরাজদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সেই-সংগৃহীত অর্থে এমন একটি ব্যাপার সাধন করিবেন যাহা ইংরাজদিগের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী।" দশ দিন পরে লর্ড পামারষ্টন আরও এই রূপ বলেন "ইংরাজ ধনীদিগের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে যে সকল জল বুদ্‌বুদ্‌বৎ ব্যবসায়ের মৎলব্ বাহির হয়—আর যে সকল ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিলে আর যাহারই লাভ হউক ইংরাংজদিগকে নিশ্চয় ক্ষতি-

গ্রস্ত হইবার কথা—সেই সকল মৎলবের মধ্যে ইহাও একটি" এই অযোগ্য কঠোর উক্তিগুলি যদিও সর্ব্বসাধারণের হৃদয়-গ্রাহী হয় নাই তথাপি কতকটা নৈরাশ্যের কারণ হইয়াছিল। এবং উহা যে লেসেপের মর্ম্মস্পৃক্ হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই খাল কাটিতে ইংরাজদিগের যে কত সুবিধা হইবার কথা আশ্চর্য্য তাহা পামরষ্টন্ বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রতিবন্ধকাচরণে এই ব্যাপারের সমস্ত অনুষ্ঠানভার ফরাসিস্দিগের হাতে আসিয়া পড়িল এবং এই সুয়েজখাল—ফরাসিস্দিগের চিরন্তন কীর্ত্তি-প্রবাহ হইয়া রহিল!

লেসেপের প্রথম হইতেই ইচ্ছা ছিল যে পৃথিবীর সকল জাতিই সমানরূপে এই খালের ফল ভোগ করে। এই জন্য যে সন্তুয় সমুত্থান সম্প্রদায় স্থাপিত হইল তাহার তিনি "সুয়েজের বাণিজ্য-খালের বিশ্বজনীন কোম্পানি" এই নামটি প্রদান করেন। চুক্তি পত্রে এই রূপ সর্ত্ত ছিল যে—"কোন ব্যক্তি-বিশেষের কিম্বা জাতি-বিশেষের কোন রূপ প্রাধান্য না দিয়া বাণিজ্য জাহাজ মাত্রেই নির্ব্বিশেষে এই খালে যাতায়াত করিতে পারিবেক"—আরও "এই কোম্পানি কোন জাহাজকে—কোন সম্প্রদায়কে কিম্বা কোন ব্যক্তিকে এরূপ কোন সুবিধা কিম্বা ক্ষমতা দিবেন না যাহা অন্য জাহাজদিগকে প্রদত্ত হয় নাই"—মিসরের শাসনকর্ত্তার সহিত এই রূপ বন্দবস্ত হইয়াছিল যে খালের দুই ধারের কিয়ৎ পরিমাণ ভূমি ৯৯ বৎসরের জন্য—ঐ কোম্পানির অধিকারে থাকিবে। এই রূপে কোম্পানি স্থাপিত হইলে এবং ২৫ হাজার ফরাসিস্ স্বাক্ষরকারী এবং মিসরের গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক টাকা সংগ্রহ হইলে পর ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে খালের কার্য্য আরম্ভ হয়। এই খালের উদ্দেশে আবার নানা আনুসঙ্গিক কার্য্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। বন্দর, দীপ-মন্দির, সহস্র সহস্র শ্রমজীবীদিগের বাসস্থান—ইত্যাদি অধুনাতন সভ্যতার যাহা কিছু উপকরণ তাহার সমস্তই এই মরুভূমিতে আনীত হইল—এরূপ মরুভূমি যে খানে পূর্ব্বে একটি ঘাস কিম্বা এক বিন্দু জলও পাওয়া যাইত না। কিন্তু সায়েদ এবং তাহার উত্তরাধিকারী ইস্মাএল যদি এই বৃহৎ ব্যাপারে যথোচিত সাহায্য না করিতেন তাহা হইলে কিছুই হইয়া উঠিত না। যেখানে কোম্পানিরা ইসমেলিয়া নামক নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন সেই মধ্যবর্ত্তী স্থানে নীল নদী হইতে "মিঠে" জল আনিবার জন্য ২৫ ক্রোশ দীর্ঘ আবার একটি খাল কাটিতে হইয়াছিল। এই খালটি কাটিবার জন্য—পাশা ৮০ হাজার লোক সংগ্রহ করিয়া দেন। সামুদ্রিক খাল কাটিতে আরও বৃহৎ কাণ্ড উপস্থিত হইল। ২৮৫টা মৃত্তিকা কাটিবার যন্ত্র ১৮ হাজার অশ্ব-বল পরিমাণের বাষ্প-বলে চালিত হইয়া প্রতিমাসে ১২ হাজার টন কয়লা পুড়াইয়া কার্য্য করিতে লাগিল। এই বৃহৎ ব্যাপারটি সম্পন্ন করিবার জন্য যে কত শ্রম কত উদ্যম কত অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল তাহা ভাবিতে গেলে অশ্চার্য্য হইতে হয়। মনে করিয়া দেখ, সমুদ্র হইতে

সমুদ্র পর্য্যন্ত ৯৯ মাইল দীর্ঘ এবং বৃহৎ জাহাজ চলিতে পারে এরূপ প্রশস্ত এবং গভীর একটি খাল কঠোর বালুময় মরুভূমি হইতে কাটিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে—এই প্রকাণ্ড ব্যাপারটি ভাবিতে গেলে কি মন স্তম্ভিত হইয়া যায় না?—প্রতিমাসে ইহার যে মাটি কাটাই হইত তাহা পরিমাণে ২৭৬৩০০০ cubic yard হইবে—লেসেপ্ তাঁহার প্যারিসের শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট বলিয়াছিলেন—"যে মাটি কাটাই হইত তাহা পরিমাণে এত অধিক যে ম্যাড্‌লিন হইতে বাসটিই পর্য্যন্ত সমস্ত বুলবার (Boulevard) উচ্চে তত্রস্থ বাড়ির এক তালা পর্য্যন্ত একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতে পারে" তিনি আরও বলেন—"যে সকল সাহসী পুরুষ ও বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এই বৃহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিবার জন্য শ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাঁহাদিগের যাহা উচিত প্রাপ্য তাহা যেন আমরা তাঁহাদিগকে দিই।"

খাল কর্ত্তনে ও তাঁহার আনুসঙ্গিক কার্য্য সকল শেষ করিতে সার্দ্ধ দশ বৎসর লাগিয়াছিল। লেসেপ্ এই সমস্ত কাল সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া যখন যে বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে, কিরূপে তাহা অতিক্রম করিতে হইবে বরাবর তাহার পরামর্শ ও উপদেশ দিয়া আসিয়াছিলেন। অবশেষে খাল খুলিবার দিন উপস্থিত হইল। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে তৎকালীন ফ্রান্সের সাম্রাজ্ঞী য়ুজেনি এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সমক্ষে মহা সমারোহ সহকারে খাল খোলা হইল। এত দিনের পর লেসেপের মনস্কামনা পূর্ণ হইল—ও তাঁহার মহা-স্বপ্ন সফল হইল! যাহাতে জাহাজের অত্যন্ত ভীড় হইয়া গতিবিধি বন্ধ হইয়া না যায় এই আশঙ্কায় জাহাজের গতায়াত পক্ষে কতকগুলি কড়াকড় নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল। তাহার মধ্যে এই একটি নিয়ম হইল যে ১৬ ঘণ্টা ধরিয়া জাহাজের গতিবিধি হইবে, তাহার অধিক নহে। দুই সমুদ্রের সমতল সমান নহে বলিয়া পূর্ব্বে যে আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহা নিতান্ত অমূলক। দুই প্রান্তের স্রোত প্রায় সমানরূপে প্রবাহিত হয়। তবে লোহিত সমুদ্র হইতে যে জল আইসে তাহার একটু স্রোতোবেগ অধিক। কিন্তু উত্তর দিক হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহার বেগে এই স্রোতোবেগ মন্দীভূত হইয়া যায়। সুতরাং নৌচালনের কোন অসুবিধা হয় না। বালি ভাসিয়া আসিয়া খালকে বুজাইয়া ফেলিবে আর একটি এই যে ভয় ছিল তাহারও বিশেষ কারণ দেখা যায় না। "মিঠে'জলের যে খালটি কাটা হইয়াছে তাহার দুই ধারে বরাবর বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে। এই বৃক্ষগুলি বড় হইলে মেঘকে ঘনীভূত করিয়া বৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আনিবার পক্ষে পরে সহায়তা করিতে পারে। অতএব আমাদের বিলক্ষণ ভরসা হয় যে অনতিকাল মধ্যে এই যে বিস্তীর্ণ মরুভূমি তাহাও ফলবতী হইয়া ফলেফুলে সুশোভিত হইবে। এই খাল খোলা অবধি এমন একবারও হয় নাই যে জাহাজের গতায়াত একেবারে স্থগিদ হইয়া গিয়াছে। বাণিজ্যের সুগমতা পক্ষে পূর্ব্বে

যে সকল আশা করা হইয়াছিল তাহার অধিক ফল লাভ হইয়াছে। বণিকেরা এবং পোত-স্বামীরা এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের কত সুবিধা হইয়াছে। ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে যাতায়াত শীঘ্র হওয়ায় জিনিসের ভাংচুর ও ক্ষয় কমিয়াছে, সাধারণ ব্যয়ের লাঘব হইয়াছে এবং ইনস্যুর্যান্সের সাশ্রয় হইয়াছে। এই সকল সুবিধার বিনিময়ে কোম্পানিকে জাহাজের মাসুল এবং অন্যান্য খর্চ্চা দিতে হয়। দিন দিন এত জাহাজের গতিবিধি বৃদ্ধি হইতেছে যে আর এ খালে সংকুলান হয় কি না সন্দেহ।—হয় তো আর কিছু দিন পরে ইহার পরিসর বৃদ্ধি করিবার কথা উত্থাপিত হইবে? সমুদ্রদিয়া পোর্ট্‌সায়েদের নিকটবর্ত্তী হইলে দেখা যায় যে, সারি সারি জাহাজ দাঁড়াইয়া আছে এবং বন্দর ও খালের ভিতর প্রবেশ করিবার কখন্ তাহাদিগের পালা আইসে তাহারই জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। কোম্পানির নিয়মানুসারে সকল জাহাজ একত্র খুলিয়া যাইতে পারে না—একটি জাহাজের পর আর একটি পর্য্যায়ক্রমে খুলিয়া দিতে হয়। আবার বিপরীত দিক হইতে কোন জাহাজ আসিলে কোন কোন স্থানে অপর দিকের জাহাজকে কিছুকাল থামিতে হয়। সুয়েজ খালের বাণিজ্য-বিবরণে দেখা যায় যে ৩৩টা জাহাজ এক দিনের মধ্যে খালের মধ্য দিয়া গিয়াছে। ২৭ জুলাই ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ৪৩২টা জাহাজ খালের হয় এ দিক নয় ও দিক হইতে যাতায়াত করিতে দেখা গিয়াছে। যে সকল জাহাজ খাল দিয়া যাতায়াত করে তাহার অধিকংশই ইংরাজদিগের। যদি সর্ব্বশুদ্ধ ২৫টা জাহাজ হয় তবে তন্মধ্যে ১৮টা ইংরাজদিগের হইবে। ফলতঃ যে জাতির গবর্ণমেণ্ট খালের প্রস্তাবটিকে একেবার ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন সেই জাতিই এক্ষণে খালের অধিক ব্যবহার করিতেছেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে যে সকল জাহাজ খালের মধ্য দিয়া যাতায়াত করে তন্মধ্যে ইংরাজদিগের ৮১০—ফরাসিস্‌দিগের ৮৩ ও অষ্ট্রীয়দিগের ৭০। এবং অন্যান্য জাতীয়দিগের অপেক্ষাকৃত অনেককম। এই সুয়েজের খালে ইংরাজদিগের বাণিজ্যের কত সুবিধা হইয়াছে তাহা লেসেপ্ চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন 'মনে কর একটি জাহাজ বোম্বাই হইতে ছাড়িয়া সুয়েজখাল দিয়া লিবরপুলে আসিয়া উপনীত হইল এবং সেখানে তাহার তুলার বোঝাই নামাইয়া দিল। তখনই সেই তুলা মানচেস্টারে চালান হইয়া কাপড়ে পরিণত হইয়া আসিল। ৯ দিন পরে সেই একই জাহাজ ঐ কাপড়ের বোঝাই লইয়া সুয়েজ খালের পথ দিয়া আবার ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিল। এইরূপে দেখা গিয়াছে যে ৭০দিনের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে তুলা লইয়া তাহাকে কাপড়ের আকারে পরিণত করিয়া আবার ভারতবর্ষে ফিরিয়া পাঠান যায়।" এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ডের কোন বিপদ হইলে এখান হইতে সিপাহিসৈন্য শীঘ্র চালান করিবার পক্ষে খালের পথ কেমন উপকারী তাহা এইবার বেশ দেখা গিয়াছে।

প্রথমে যখন খালের প্রস্তাব হয় তখন ৪ কোটি টাকা ইহার আনুমানিক ব্যয় নির্দ্ধারিত হয়—কিন্তু এক্ষণে ইহার নিয়মিত খরচ দ্বিগুণ পড়িয়া গিয়াছে—এতদ্ব্যতীত স্লুয়েজ বন্দর প্রভৃতিতে ইজিপ্টের অনেক ব্যয় হইয়াগিয়াছে। অংশ (share) দ্বারা এবং কর্জ করিয়া যে মূলধন উঠান হয় তদ্ব্যতীত খাল পরিস্কার রাখিবার জন্য কর্দ্দম উঠাইতে ও খালের পাড় প্রস্তরাদির দ্বারা বাঁধাইতে বিপুল অর্থ অজস্র ব্যয় হইতেছে। বিশেষত পোর্ট সায়েদে খালের মুখ পরিস্কার করিয়া রাখিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় হয়। কারণ নীলনদ হইতে কর্দ্দমস্রোতে পরিচালিত হইয়া সমুদ্রের এই ভাগে আসিয়া সঞ্চিত হয়, এবং উত্তরের বাতাসে উহা তীরে নিক্ষিপ্ত হয়। এই সমস্ত কারণে নিজ খালের ব্যবসায়ে তেমন লাভ নাই—এই খালের পথটি উন্মুক্ত হওয়ায় অন্যান্য সাধারণ বাণিজ্যের যে প্রভূত উন্নতি হইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এবং এই মহৎ উপকারের জন্য পৃথিবীর তাবৎ জাতিকেই সেই ফরাসিস মহাপুরুষ লেসেপ্‌কে অগণ্য নমস্কার করা উচিত।

কেন ভালবাসি।

আজ যদি চন্দ্রলোক হইতে কোন বীর পুরুষ আসিয়া সমস্ত পৃথিবী অধিকার করেন, এবং সর্ব্বত্র এই কঠোর নিয়ম প্রচার করেন যে, সকল দেশের সকল প্রকার সাহিত্য হইতে প্রণয়ের কথা, প্রণয়ের কল্পনা, প্রণয়ের ব্যাপার মুহূর্ত্তমধ্যে অগ্নিসাৎ করিয়া ফেলিতে হইবে,—তাহা হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে এই সমস্ত ভূলোকের সাহিত্যের অবস্থা কি হয়? তাহা হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যেই কি এই বিশ্বব্যাপী সাহিত্যক্ষেত্র একেবারে উত্তপ্ত বালুকাময়ী মরুভূমিতে পরিণত হয় না? তাহা হইলে বাল্মীকি, হোমর, সেক্সপিয়ার, কালিদাস আর কি উপলক্ষও করিয়া অনন্ত জীবনের আশা করিতে পারেন? তাহা হইলে এই ভাবনাময়, এই যাতনাময় সংসারের মধ্যে মানবমণ্ডলী আর কোথায় গিয়া ক্ষণকালের জন্যও সন্তপ্ত হৃদয় সুশীতল করিবে? কিন্তু সেই বীরপুরুষ নিষ্ঠুরতায় এইরূপে অভ্যস্ত হইয়া যদি তাহার পর এই নিয়ম সর্ব্বত্র প্রচার করেন যে যদি কোন দেশে কোন স্ত্রীপুরুষ কোন সময়ে প্রণয়ের কথা কহে, বা প্রণয়ের চিন্তা মনে আনে, তাহাকে সেই দণ্ডেই ভস্মসাৎ করা হইবে—তাহা হইলে এই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অবস্থা কি হয়? তাহা হইলে অসভ্য হটেণ্টট্ জাতি হইতে সুসভ্য আর্য্যজাতি পর্য্যন্ত দাহ-ভয়ে কোথায় অজ্ঞাতবাসে কাল হরণ করে? স্বর্গের দেবতা হইতে পাতালের অপ্সরা পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্যাগী উদাসীন হইতে দারুণ সংসারী ব্যক্তি পর্য্যন্ত কত লোকের দেহাবশেষ ভস্ম যে কি ভয়ানক স্তূপাকৃত হয়

তাহা কল্পনাতেও ধারণা করা যায় না। যে প্লেটো তাঁহার কল্পিত সাধারণতন্ত্র হইতে কবিমাত্রকেই নির্ব্বাসিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তাঁহাকেই ত সর্ব্বাগ্রে দগ্ধ হইতে হয়। ক্রমে বিশ্ববিজয়ী সেকেন্দরসা, সিজার, নেপোলিয়ন, ক্রমে ধর্ম্মপ্রচারক মহম্মদ ও চৈতন্যদেব, ক্রমে মহাকবি সেক্সপিয়ার, দান্তে, টাসো, সকলকেই সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু যখন সেই চন্দ্রলোকের বীরপুরুষ দেখিবেন যে শত শত নরনারী আগ্রহের সহিত এবং উল্লাসের সহিত সেই প্রদীপ্ত অনলস্তম্ভকে আলিঙ্গন করিতে আসিতেছে, যখন তিনি দেখিবেন যে শত শত রমণীরত্ন সেই দারুণ অগ্নিশয্যাকে কুসুমশয্যা জ্ঞান করিয়া তাহাতে শয়ান হইয়া সহচরীবর্গকে উৎসবধ্বনিতে দিক-মণ্ডল বিদারিত করিতে বলিতেছে, এবং মন্দীভূত অগ্নিস্তম্ভে অমোঘ আহুতি প্রদানে উৎসাহ দিতেছে—তখন কি সেই বীরপুরুষ মুহূর্ত্তের জন্যও স্তম্ভিত হইয়া পড়িবেন না? কিন্তু যদি তিনি সেই উন্মত্ত নরনারীর মধ্যে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করেন যে কেন তুমি অন্যের জন্য এই রূপে অবলীলাক্রমে আত্মবিসর্জ্জন করিতেছ, সে ব্যক্তি এইমাত্র বলিতে পারিবে যে প্রেমের মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াই আমি আজ আত্মবিসর্জ্জন করিতেছি! কিন্তু যদি তিনি আবার জিজ্ঞাসা করেন কেন তুমি সে মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হইলে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিকে ক্ষণকালের জন্যও নিরুত্তর হইতে হইবে। মনে কর সেই চন্দ্রলোকবাসী পুরুষ এই উদ্দীপ্ত কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য সকল সময়ের প্রকৃত ও কল্পিত প্রণয়ী ও প্রণয়িনী একত্রিত করিলেন, এবং প্রেম-বিহ্বলা রত্নাবলীকে সকলের সমক্ষে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন তুমি রাজা উদয়নের জন্য আত্মঘাতিনী হইতে গিয়াছিলে?"

রত্নাবলী। আমি যে ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আত্মঘাতিনী হইতে গিয়াছিলাম তাহা মনে করিতে গেলে এখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমি অজ্ঞাত-কুলশীলা সামান্য নারী হইয়াও রাজা উদয়নের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেই ঘোর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে গিয়াছিলাম।

চন্দ্রলোকবাসী। কিসের জন্য তুমি রাজা উদয়নের প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিলে? তুমি কি তাঁহাকে রাজা বলিয়া, বা অনুরূপ রূপবান বলিয়া বা অদ্বিতীয় গুণবান বলিয়া মনে মনে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলে?

রত্নাবলী। আমি যখন তাঁহাকে প্রথমে সেই মধুমাসে মদনোৎসবের দিন লতামণ্ডপে দেখিতে পাইলাম, তখন আমি জানিতাম না যে তিনিই রাজা উদয়ন,—আমি তখন জানিতাম না যে তাঁহার কোন গুণ আছে অথবা কোন গুণই নাই। আমি তাঁহার অলৌকিক রূপরাশি দেখিয়াই তাঁহাকে সাক্ষাৎ অনঙ্গদেব মনে করিয়াছি-

লাম। কিন্তু সে দেবভক্তি ক্ষণস্থায়ী-মাত্র, কারণ তখনই তাহা মর্ম্মান্তিক অনুরাগে পরিণত হইল, এবং প্রথমে আমি যাঁহাকে দেবতাভাবে প্রণাম করিয়াছিলাম, পরক্ষণেই তাঁহাকে মনুষ্যভাবে হৃদয়মন উৎসর্গ করিলাম।

চন্দ্রলোকবাসী। তুমি কেমন করিয়া বুঝিতে পারিলে যে তাঁহাকে উদয়ন বলিয়া না জানিয়াও তোমার দেবভক্তি ক্ষণমধ্যেই মনুষ্যপ্রেমে পরিণত হইল ?

রত্নাবলী। তাঁহাকে প্রণাম করিয়াই আবার তাঁহাকে দেখিতে মন উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিল, যত দেখি কিছুতেই নয়নের তৃপ্তি হয় না, অথচ কেহ আমাকে পাছে সেই অবস্থায় দেখিতে পায়, পাছে কেহ আমার মনের ভাব বুঝিতে পারে, এই ভয়ে আমি আস্তে আস্তে সেস্থান হইবে প্রস্থান করিলাম। দেবভক্তিতে এত লজ্জা হইবে কেন ?

চন্দ্রলোকবাসী।—তবে তুমি কি কেবল রূপের মোহে মুগ্ধ হইয়া প্রেমের শিখায় হৃদয় দাহ করিয়াছিলে ?

রত্নাবলী। তা ব্যতীতই বা আর কি বলিব ? যখন রাজা বলিয়া জানি না, যখন তাঁর গুণ-গরিমার কথা কিছুই জানি না, তখন কেবল এক অলৌকিক রূপরাশি দেখিয়াইত আপনার চিতা আপনি সাজাইয়াছিলাম।

চন্দ্রলোকবাসী। কেবল রূপেই কি তবে প্রেমের উদ্দীপন হয় ?

রত্নাবলী। গুণ দেখিয়া শ্রদ্ধাভক্তি হইতে পারে, পদ বা পদবী দেখিয়া মনে সম্মান ভাবের উদয় হইতে পারে, কিন্তু রমণী-হৃদয় কেবল রূপেতেই বশীভূত হইয়া পড়ে। শুনিতে লজ্জাকর বটে, কিন্তু শকুন্তলা, মালতী প্রভৃতি অন্য অন্য সুপ্রতিষ্ঠ নারীকে জিজ্ঞাসা কর, আমার কথা সত্য কি না।

তখন ডেস্‌ডিমোনার সহচরী এমিলিয়া চন্দ্রলোকবাসী বীরপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—হে বীরশ্রেষ্ঠ! আমি সিংহলদুহিতা সাগরিকার কথা কখনই শিরোধার্য্য করিতে পারিব না। রূপরাশিতে যে প্রেম উদ্দীপিত হয় তাহা ত অস্থিচর্ম্মগত পার্থিব প্রেম। রূপদৃষ্টিতেই সে প্রেমের উদয় হয় এবং রূপের অবসানেই সে প্রেমের অবসান হয়। যদি কেবল রূপরাশিতেই প্রেম উদ্দীপন হইত তাহা হইলে দেবী বীনস্ পর্য্যন্ত কেন এডনিসের প্রেমে নিরাশ হইয়া আপনাকে নিতান্ত হতভাগিনী জ্ঞান করিয়াছিলেন ? তাহা হইলে উপদেশ ক্যোলিপ্সো কেন ঘোর প্রেম-বিহ্বলা হইয়াও ইউলিসিস্ বা টেলিমেকস্‌কে আপনার রমণীয় দ্বীপে রাখিতে পারিলেন না ? রূপরাশিতে নয়নের তৃপ্তি হইতে পারে, কিন্তু গুণ না দেখিলে মনের তৃপ্তি কিরূপে হইবে ? আমার প্রিয়সখী ডেস্‌ডিমোনাকে জিজ্ঞাসা কর যে তিনি ওথেলোর কি রূপরাশি দেখিয়া বিনিস্ নগরের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রাজপুত্রদিগকে অবলীলাক্রমে পরিহার পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গনে আলিঙ্গন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন ? কোথায় গোলাপ-কলিকা-সমষ্টি-

সম বিনিসের রাজপুত্রগণ, আর কোথায় ভীষণরূপ মিশরদেশীয় পিশাচ-মূর্ত্তি! কিন্তু কে আজ সাহস করিয়া বলিতে পারে যে রত্নাবলী বা শকুন্তলার অনুরাগের অপেক্ষা ডেস্‌ডিমোনার অনুরাগ নিষ্প্রভ বা হীনপদবীগত। আমার কথায় রত্নাবলী বা শকুন্তলা চমৎকৃত হইলেও হইতে পারেন, কেননা তাঁদের দেশের কোন কবিই আজও পর্য্যন্ত কুৎসিত ব্যক্তিকে মর্ম্মগত ভালবাসার পাত্র-রূপে প্রচার করিতে সাহস পান নাই। সংস্কারের বা অলঙ্কার শাস্ত্রের বশীভূত হইয়া তাঁহারা নায়কনায়িকা মাত্রকেই অলৌকিক রূপরাশি সম্পন্ন করিতেই বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। ইহা কি প্রকৃতির নিয়মের ব্যভিচার নহে ?

চন্দ্রলোকবাসী। আমার বোধ হইতেছে যে পাশ্চাত্য প্রেমের গৌরব রক্ষা হেতু পূর্ব্বদেশীয় প্রেমের উপর তোমার কটাক্ষপাৎ নিতান্ত অন্যায়। রূপজাত প্রেম অস্থিচর্ম্মগত হউক বা না হউক, পাশ্চাত্য প্রেমের ইতিবৃত্তে সে প্রকার প্রেমেরও ত ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়। রোমিও এবং জুলিয়েটে. ফরডিনাণ্ড এবং মিরাণ্ডাতে কি সূত্রে প্রণয় সংঘটন হইল ? প্যালামান্ এবং আরসাইটিতে বিবাদ হইবার কারণ কি ? আবার, গুণে মুগ্ধ হইবার দেদীপ্যমান উদাহরণও ত কুমারসম্ভবেই রহিয়াছে। পর্ব্বতরাজদুহিতা যে তরুণবয়সে মহাদেবের আশায় অতি কঠোর তপস্যায় দেহমন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা কি তিনি মহাদেবের রূপের পক্ষপাতিনী হইয়া করিয়াছিলেন ? বৃদ্ধ বিরূপাক্ষ পঞ্চাননের গুণেই কি তিনি মুগ্ধ হইয়া ঐ কঠোর ব্রতে ব্রতী হন নাই ? দময়ন্তী কি বিদর্ভপতি নলের গুণকীর্ত্তন শ্রবণেই বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে মাল্যদানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন নাই। তবে পূর্ব্বাঞ্চলে গুণজাত প্রেমেরই বা অল্পতা কোথায় ? আর গুণই যে প্রেমের নিয়ত ও অব্যবহিত কারণ তাহা নিশ্চয় কিরূপে বলিতে পারি ?

স্যাফো। সত্যই ওকথা কখন নিশ্চয় বলা যায় না, কেননা স্ত্রীলোকদের মধ্যে আমার মত অদ্বিতীয় কবি পৃথিবীতে আর কে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সেই আমিই আবার ফেয়নের প্রেমে নিরাশ হইয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া মৃত্যুকে ইচ্ছাপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়াছিলাম। যদি বল স্ত্রীলোক সহজেই হতভাগিনী, সুতরাং গুণের প্রকৃত আকর্ষণী শক্তি থাকিলেও পাত্রবিশেষে তাহার বিঘ্ন হয়—স্বীকার করিলাম ; কিন্তু তাহা হইলে ইটালির জগদ্বিখ্যাত কবি ট্যাসো ও পিট্রার্ক কেন চিরকাল এক জন লিয়নোরা ও অপরটি লরার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া দেহপাত করিয়া ছিল ?

চন্দ্রলোকবাসী। মনে কর যে কেবল রূপ বা কেবল গুণ প্রেমের নিত্য কারণ নহে। তবে একথার বোধ হয় অন্যথা নাই যে রূপ এবং গুণ উভয়ই একত্রিত হইলে প্রেম উদ্দীপন করিতে পারে।

টিটানীয়া। উহাও একটি ভুল সংস্কার।

রূপগুণের সমষ্টিও প্রেমের নিত্য কারণ নহে। বিখ্যাত মিলটনের জীবনী দেখিলে তাহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে কথাটি এই যে, কেবল রূপ বা কেবল গুণ বা রূপগুণের সমষ্টিরও সহিত প্রেমের নিত্য সম্বন্ধ কিছুই নাই। আমি আমার নিজের জীবনগত ঘটনা হইতে তাহা সপ্রমাণ করিতে পরি। আমি পরীদিগের মহিষী, আমার নাম টিটানীয়া। আজন্ম আমি কখন মেঘে চড়িয়া, কখন চন্দ্ররশ্মি অবলম্বন করিয়া, কখন পতনশীল নক্ষত্র ধরিয়া শূন্যে শূন্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াই। মর্ত্ত্যলোকের কুঞ্জে কুঞ্জে বিচরণ করি এবং নদীর তরঙ্গদোলায় দুলিতে দুলিতে চারিদিক প্রদক্ষিণ করি। অনেক দিন হইল আমি এথেন্স্ নগরের একটি নিভৃত কুঞ্জে নিদ্রিত আছি—জনপ্রাণী কেহই সেখানে নাই। এই অবস্থায় সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র আমি দেখিলাম আমার পার্শ্বে প্রকৃত গর্দ্দভের মুখসে আবৃতমুখ এক জন পথিক বসিয়া একটি গ্রাম্যগীত মহাকোলাহল করিয়া ভগ্নস্বরে গাহিতেছে। তাহার গানেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল।—জানি না মনের কি ভাববশতঃ, হৃদয়ের কি উচ্ছ্বাসরশতঃ, অনঙ্গের কি মোহমন্ত্রবশতঃ আমি সেই পথিককে দেখিয়াই তাহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। অবলাজাতির স্বাভাবিক লজ্জা ত্যাগ করিয়া আমি মুক্তকণ্ঠে তাহাকে বলিলাম "হে ধীর মর্ত্ত্যবাসি! পুনরায় তোমার ঐ গীতটি গাও, কারণ তোমার রূপে আমার নয়ন যে রূপ বিমোহিত হইয়াছে, তোমার স্বরে আমার কর্ণও সেই রূপ মুগ্ধ হইয়াছে। বাস্তবিকই তোমার রূপগুণে আমি এত দূর মুগ্ধ হইয়াছি যে এই প্রথম সাক্ষাতেই তোমাকে শপথ করিয়া না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না যে আমি তোমাকে ভালবাসি।" এই রূপে আমি তাঁহার রূপগুণের পক্ষপাতিনী হইয়া কত প্রকার বিভ্রম বিলাসে যে সময় অতিবাহন করিতে লাগিলাম, তাহার সেই সলোম গর্দ্দভমুখমণ্ডলে কতই যে চুম্বন-বৃষ্টি করিতে লাগিলাম, এবং তাহার সেই সুদীর্ঘ কর্ণদ্বয়ে কতই যে মালতী-মালা ঝুলাইতে লাগিলাম তাহা আর কি বলিব। পরে আর একবার নিদ্রার পর উঠিয়া দেখি যে আমার সে প্রেমের ভাব অবসান হইয়াছে। তখন গর্দ্দভমুখকে গর্দ্দভমুখ বলিয়া বোধ হইল, এবং লজ্জায় পরীসমাজে মুখ দেখাইতে সঙ্কুচিত হইতে লাগিলাম। আমার এ সকল গোপনীয় কথা জগতে কেহই কখন জানিতে পারিত না, কেবল কুটিলমতি অথচ সর্ব্বদর্শী সেক্সপিয়ারই আমাকে জগৎসমীপে অপ্রতিভ করিয়া ফেলিয়াছেন। সুরলোকে আমি তাঁহার সঙ্গে বিস্তর ঝগড়া করিয়া ছিলাম, কিন্তু তিনি বলিলেন "তোমার কথাতে মর্ত্ত্যলোকের অনেক নরনারীর কথাই প্রচার করা হইয়াছে, সুতরাং তোমার মত সকলেই যদি অপ্রতিভ হয় তাহা হইলে মর্ত্ত্যলোকও সুরলোক হইবে।" আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে মর্ত্ত্যলোকের অনেকে কেনই বা আমার মত অবস্থায় পড়িবে, কেননা নিদ্রাবস্থায় আমার চক্ষে

একটি দুষ্ট পরী একপ্রকার কুসুমরস লিঙ্গ্ড়াইয়া দিয়াছিল, তৎপ্রভাবেই নিদ্রাভঙ্গে আমি সেই বিকৃত পথিকের প্রেমে মুগ্ধা হইয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু মর্ত্ত্যলোকে কেহই হয়ত সে ফুলটির নাম বা গুণ কিছুই জানে না, সুতরাং আমার মত তাহাদের অবস্থা হইবার সম্ভাবনাই নাই। তাহাতে তিনি বলিলেন যে "সে ফুলের নাম সকলে জানুক বা নাই জানুক, কিন্তু তাহার রস প্রায় সকল মানব-হৃদয়েই রক্তের সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গিত হয়।" বাস্তবিক্ আমি সমস্ত ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম যে সেক্স্পিয়ার যাহা বলিয়াছেন তাহার উপর কেহ দ্বিরুক্তি করিতে পারে না। তিনি সমস্ত প্রকৃতির সূক্ষ্ম টীকাকার, তাঁহার অমোঘ বাক্যের অন্যথা নাই। আমি কত স্থানে যে অযথাস্থলে প্রণয় সংস্থাপন দেখিয়াছি তাহা বলিবার নহে। দেখিয়াছি কত শত লোক চারুচন্দ্রাননার মুখের পানে না চাহিয়াও বিকট-বদনার হস্তে এবং কত শত নারী অতুল-রূপগুণ-সম্পন্ন লোকের ভালবাসায় ভ্রুক্ষেপ না করিয়া অপেক্ষাকৃত বর্ব্বরের হস্তে হৃদয় প্রাণ সমর্পণ করিতেছে। বাস্তবিক, যাহারা কখন প্রকৃত প্রস্তাবে বিমল অপার্থিব প্রেমে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা আপনা আপনি অবশ্যই অনেকবার আপনাকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছে—"কেন ভাল বাসি?" কিন্তু কখনই বোধ হয় হৃদয় হইতে প্রকৃত উত্তর পায় নাই। হয় ত এই উত্তর পাইবে "অমন রূপলাবণ্যে কে না মুগ্ধ হয়"—কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি প্রেম-উদ্দীপনের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে তাহার প্রণয়পাত্র অপেক্ষা অন্য কাহারো শতসহস্রগুণ রূপলাবণ্য দেখিত, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি কি সরল হৃদয়ে বলিতে পারিত—"আহা, উহাকে আগে দেখিলে আর ইহাকে ভাল বাসিতাম না" কিম্বা "ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া উহারি শরণাপন্ন হই।" কখনই না। নীচপদবীগত লালসার স্থল ব্যতীত প্রকৃত প্রণয়স্থলে ওরূপ ভাব কাহারও মনে উদয় হইতে পারে না। তবে এটুকু অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সকল স্থলে রূপলাবণ্যে প্রেমের উদ্দীপন না হইলেও, প্রেমের উদ্দীপন হইলে সকল স্থলে রূপলাবণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভালবাসার অপেক্ষা কৌশলশীল চিত্রকর আর কোথাও নাই—সেক্সপিয়র বলেন যে প্রকৃত প্রণয়ী মিসরদেশীয় পিশাচী মূর্ত্তিতে হেলেনের সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়। যদি জগৎশুদ্ধ লোক সেই প্রণয়ীর রুচির নিন্দা ঘোষণা করে, যদিও সকলে প্রত্যক্ষ প্রমাণে তাহাকে দেখাইয়া দেয় যে নিবিড় জলদখণ্ড কখন শতদলসমষ্টি হইতে পারে না, এবং বিকট দশনশ্রেণী কখন মুক্তাপংক্তি হইতে পারে না, তখন সেই ব্যক্তি প্রত্যক্ষপ্রমাণে একান্ত পরাজিত হইয়া শেষে এই বলিবে যে "অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধরিয়া প্রকৃত সৌন্দর্য্য হয় না,—আমার প্রণয়িনীর শ্রী ও লাবণ্য লোকাতীত।"—একথার আর উত্তর নাই, কেন না তাহার কথায় অর্থান্তর এই যে আমি উহাকে ভালবাসি, এবং তোমরাও যদি আমার মত উহাকে ভালবাসিতে,

তাহা হইলে তোমরাও উহার শ্রী ও লাবণ্য দেখিতে পাইতে। এমন কি,—যদি কেহ বলে "তোমার প্রণয়িনীর মুখশ্রী সুন্দর বটে, কিন্তু যদি চক্ষুদুটি আরও একটু বিশাল হইত, তাহা হইলে অতি উত্তম হইত," প্রণয়ী অমনি আগ্রহের সহিত উত্তর করিবে "তোমার ঐটি ভুল, কেন না ঐ মুখে ঐ চক্ষুই অতিশয় মানানসই হইয়াছে—উহা আবার ঈষৎমাত্র দীর্ঘ হইলেই মুখশ্রীর একেবারে সর্ব্বনাশ হইত।" কিন্তু সেই ভালবাসা ক্রমে যখন অবসান হয়, প্রণয় যখন তাহার মোহময় দর্পণখানি সরাইয়া লয়, তখন সেই প্রণয়িনীর সেই মুখেই সুরুচি আসিয়া যে কত দোষ দেখাইয়া দেয় তাহা আর বলা যায় না। প্রকৃত কথা এই যে, সহস্র তন্ত্রসম্পন্ন হৃদয়বীণার কোন্ তারে কখন কি প্রকার আঘাত লাগিলে যে প্রণয়ের তার বাজিয়া উঠে তাহা বলা অতি সহজ নহে। উর্ব্বশীকে পুরূরবা দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা করিলেন। উর্ব্বশী অমনি তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কেন, পৃথিবীতে কেহ কি আর কাহারো উপকার করে না? উপকার করিলে কৃতজ্ঞতার উদয় হইবে, কিন্তু প্রেমের সঙ্গে কৃতজ্ঞতার নিত্য সম্পর্ক কোথায়? আহত আইভানহোর রোগশয্যায় রেবেকা তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে দয়া ও মমতায় আর্দ্র হইয়া উঠিলেন—এবং দু একদিন অতীত না হইতেই ঘোর প্রেমে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কেন, পৃথিবীতে কেহ কি কাহারও রোগশয্যায় সেবাশুশ্রূষা করে না? এই ত গুণবতী ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল্ ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের পর রুসিয়াতে রুগ্নালয় হইতে রুগ্নালয়ে আহত সৈনিকদের সেবা শুশ্রূষা করিয়া বেড়াইতেন, কিন্তু তিনি কয় জনের দুঃখে দুঃখী হইয়া শেষে প্রেমে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন? মহাশ্বেতা সরোবরে স্নান করিতে গিয়া মুনিকুমার পুণ্ডরীকের সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া প্রেমের প্রমাদে পতিত হইলেন। কিন্তু সৌম্য-ঋষিমূর্ত্তি আর কেহ কি কখন দেখে নাই,—মহাশ্বেতারই মনে প্রেমের উদ্দীপন হইল কেন? সেকথা মহাশ্বেতাও জানেন না, কেননা তিনি আপনিই বলিয়াছেন "কি মুনিকুমারের রূপসম্পত্তি, কি যৌবনকাল, কি বসন্তকাল, কি সেই সেই প্রদেশ, কি অনুরাগ, জানিনা কে আমাকে উন্মাদিনী করিল।" অনেকে আবার বলেন, যে প্রেমের এমন এক আকর্ষণী শক্তি আছে যে এক জন আর এক জনকে ভালবাসিলেই, সেও সেই ভালবাসাতে মুগ্ধ হইবে। কিন্তু এরূপ প্রলাপবাক্য প্রকৃত প্রণয়ের ইতিবৃত্ত দ্বারাই খণ্ডন হইয়া যায়। আমরা পূর্ব্বেই স্যাফো, ট্যাসো, পিট্রার্ক, ইত্যাদি অনেক হতাস প্রণয়িদের উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছি যে প্রেমের বিনিময়ে প্রেম যে পাইতেই হইবে প্রকৃতির এমন কোন নিয়ম নাই। যে নেপোলিয়ন প্রায় সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন তিনিই আবার লুইসার প্রেমের একটি কণামাত্রও অধিকার করিতে সক্ষম হন নাই।

তবে কেন ভালবাসি? হৃদয়ের সকল উচ্ছ্বাস অপেক্ষা যে উচ্ছ্বাস মহাসমুদ্র অপেক্ষাও বিশালতাময়, হিমালয় অপেক্ষাও মহৎভাবময়, এবং জ্যোৎস্না অপেক্ষাও কোমলতাময়, তাহার সহিত বহির্জগতের কোন পদার্থ বা কোন গুণেরই কি কোন প্রকার নিত্য সম্বন্ধ নাই? বাস্তবিকই, হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে কিসের প্রভাবে যে ভালবাসার তন্ত্র বাজিয়া উঠে তাহা সহজে বুঝা যায় না। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে রূপ-গুণ-বিশিষ্ট কত শতসহস্র লোক আছে, কিন্তু কেহই কি স্থির চিত্তে বলিতে পারে যে ঐ ব্যক্তিতেই আমার সমস্ত ভালবাসা অর্পিত হইবে, বা হইলেও হইতে পারে। কখনই নয়। তাহা হইলে ভালবাসার গরিমা থাকিত না। কখন্ কাহার সহিত কি রূপে প্রেমের মিলন হইবে তাহা কিছুই নির্দ্ধারিত নাই। সকলেই অনুভব করিয়া বুঝিতে পারেন যে সমস্ত দিন নানা বিষয়ক সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নানা ভাবে,নানা আনন্দে মন তরঙ্গিত হইতে হইতে, হয়ত একটি গানে, হয়ত একটি গানের একটি পদে, হয়ত একটি পদের একটি কথাতে হৃদয়ের বীণা এমনি বাজিয়া উঠে, যে পুনঃ পুনঃ সেই গানটি শুনিতে মন লালায়িত হয়,ক্রমাগত শুনিয়াও শরীর লোমাঞ্চিত হয়, এবং গায়ক নীরব হইলেও গভীর নিশীথে যেন দিগন্ত হইতে অপ্সরাদের বীণাঝঙ্কারের সহিত সে গানের সুর-লহরী "কানের ভিতর দিয়া,মরমে পশিয়ে গো, আকুল করিয়ে দেয় প্রাণ।" সকলেই বোধ হয় অনুভব করিতে পারেন যে নানা কবির নানা কাব্য পড়িতে পড়িতে মনের অবস্থাবিশেষে এক জন সামান্য কবির কথাতেও মন এমন চঞ্চল হইয়া পড়ে, মরমের প্রত্যেক শিরা পর্য্যন্ত এমন বিকম্পিত হইয়া উঠে, যে শয়নে স্বপ্নে সেই কথাই যেন কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, এবং শয়নে স্বপ্নে সেই কথা গুলিই যেন ক্রমাগত আপনাআপনি উচ্চারিত না হইতে হইতে সমস্ত হৃদয় কোমল রসে দ্রবীভূত হইয়া যায়। সকলেই বোধ হয় অনুভব করিতে পারেন যে ঘোর ঝড়বৃষ্টিময় গভীর অন্ধকার রাত্রিতে নির্জনে বসিয়া বিগত বাল্যকালের আমোদপ্রমোদের সহস্র সহস্র কথা ভাবিতে ভাবিতে, মনের অবস্থা বিশেষে বিশেষ একটি আমোদের কথা মনে পড়িয়া হৃদয় এমনি আকুল হইয়া উঠে, যে মনে হয় বর্ত্তমানের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া যদি সেই বাল্যকাল ফিরিয়া পাই, অন্তত বাল্যকালের আমোদের সেই দিনটি ফিরিয়া পাই—অন্তত যদি সেই আমোদটুক্ ফিরিয়া পাই, তাহা হইলে জন্মশোধ চরিতার্থ হই। ভালবাসার প্রকৃতিও সেইরূপ। স্থানবিশেষে, কালবিশেষে, এবং আপনার মনের অবস্থাবিশেষে কি সূত্রে যে কেমন করিয়া প্রেমের অগ্নি জ্বলিয়া উঠে তাহা নিরূপণ করিতে গিয়া বিহ্বল হইতে হয়। মহীসুর-পতি হাইদর আলি একটি দেশ অধিকার করিলে কোন কারণ বশতঃ তথাকার অধিবাসিদের উপর ক্রোধান্ধ হইয়া আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে হত্যা করিতে আজ্ঞা দেন। এই ভয়ঙ্কর আজ্ঞা

অর্দ্ধেক প্রতিপালিত হইতে না হইতেই তিনি সেই পুঞ্জীভূত নরমুণ্ডের মধ্যে একটী সুন্দর বালকের সদ্যচ্ছিন্ন মুণ্ড দেখিতে পান। তিনি তাহা অপেক্ষা শতগুণ সুন্দর মুখ দেখিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার তখনকার মনের অবস্থা বশতই হউক বা যে কারণেই হউক, সেই মুখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় এতদূর বিগলিত হইয়া গেল যে তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার কঠোর আজ্ঞা রোধ করিয়া দিলেন। সেইরূপ এক জন, শতসহস্র রোরুদ্যমানা রমণীর মধ্য দিয়া অক্ষুণ্ণ ভাবে বিচরণ করিয়াও সহসা হয়ত একটী দীনবেশা বিজনবাসিনীর অশ্রুলহরীতে তাহার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত প্রেম-প্রভাবে সিহরিয়া উঠিতে পারে। এক জনের সঙ্গে আজন্ম বাস করিয়াও, একত্রে ঘোর ঘনিষ্ঠ ভাবে বাস করিয়াও তাহার প্রতি সখ্যতা ব্যতীত আর কিছুই না হইয়া, এক জন নিতান্ত অপর ব্যক্তিতে হয় ত সহসা প্রেমের সমস্ত অনুরাগ অর্পিত হইতে পারে। আবার সেই চিরসহচর বা চিরসহচরীর সঙ্গে আজন্ম সখ্য ভাবে বাস করিয়া হয় ত কোন এক সময়ে, মনের কোন এক বিশেষ অবস্থাতে তাহার কোন কার্য্য, কোন ভাব, কোন কথা,—তাহার করুণ কটাক্ষ বা সরল হাস্য এমন অভাবনীয় রূপে হৃদয়াকাশে প্রেমের জ্যোৎস্না বিকাশ করিয়া দেয় যে, সে সময়ে বা সে স্থলে "কেন ভাল বাসি"—রূপ প্রশ্নটী নিতান্ত রহস্যময় প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হয়।

তুকারাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তুকারামের জীবন-বৃত্তান্ত লিখিবার এক সুবিধা এই যে, তাঁহার জীবনের অনেক গুলি ঘটনা তাঁহার স্বরচিত কবিতাবলীর মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি স্বকীয় জীবনচরিত নিজ হস্তেই এক প্রকার লিখিয়া রাখিয়াছেন, কেবল উপযুক্ত বিষয় সকল বাছিয়া লইলেই হইল। তুকারাম শত্রুর সহিত মিত্রবৎ আচরণ করিয়া কিরূপে ক্রোধ জয় করিয়াছিলেন তাহা আমরা দেখাইয়াছি—শিবাজীর নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি আপনাকে নির্লোভ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন,—সুদুর্জয় কামরিপুও তাঁহাকে আক্রমণ করিতে ত্রুটি করে নাই, কিন্তু সে সংগ্রামেও তিনি জয়ী হইয়াছিলেন, তাঁহার অভঙ্গেই তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। একটী তরুণবয়স্কা রূপবতী রমণী তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিল। এক দিন বিরলে সে আপনার মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে তুকারাম যে উত্তর দেন তাহা এই দুই অভঙ্গে দৃষ্ট হইবে—

৫২৩

স্ত্রীসঙ্গ চাহি না দেব শুষ্ক তরু এ যে—
এ পাষাণ দেহ,
বল তাহে স্ত্রীসঙ্গ কি সাজে?
তাহে আত্ম বিস্মরণ,
ভজন সাধন সব ঘুরে যায়।
ঘোর সে লালসা,
মজালে সহসা, রক্ষা পাওয়া দায়।
তাকানো সে মুখপানে মৃত্যুর সমান।
কামিনী-লাবণ্য যেন দুঃখের নিদান।
তুকা কহে "সাধু হয় যদিও আগুন—
কাছে গেলে দহিবে সে, এই তার গুণ।"

৫২৪

পরস্ত্রীকে দেবপত্নী রুক্মিণী সমান।
এ দড় বিশ্বাস মোর, ইথে নহে আন।
যাও মা কি দিব তোরে কিবা মোর আছে,
বিষ্ণুদাস আমরা গো কেন কষ্ট মিছে?
এ তব দুর্দ্দশা হেরি হৃদি দহে দুখে,
ছি ছি ছি ওকথা আর আনিও না মুখে।
তুকা কহে "হে সুন্দরি, পতি যদি চাও,
প্রণয়ী কতই পাবে, কেন তবে আমারে
মজাও।"

তুকারামের চৌদ্দ জন শিষ্য ছিল—তাহাদের মধ্যে অনেকেই রামেশ্বর ভট্টের ন্যায় প্রথমে তাঁহার বিদ্বেষী, অবশেষে তাঁহারে গুরুরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার পদানত হইয়াছিল। এই শিষ্যবর্গের মধ্যে শিবাজী নামে লোহগ্রামবাসী এক জন কাংস্যকার ছিল। এই রূপ কথিত আছে যে, সে অত্যন্ত কৃপণ ও তুকারামের এক জন দ্বেষ্টা ছিল, কিন্তু কালক্রমে সে এরূপ তুকাভক্ত হইল যে, সকল কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া সেই সাধুর সহবাসে দিনপাত করাই তাহার এক মাত্র ব্যবসায় হইল। কাংস্যকারের স্ত্রী স্বীয় পতির এই রূপ ভাব পরিবর্ত্তনে রুষ্ট হইয়া তুকারামকে এই অনিষ্টের প্রতিশোধ দিতে কৃতনিশ্চয় হইল। সে এক দিন তুকারামকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক আপনার গৃহে আনাইয়া স্নানের সময় এমন উষ্ণজল তাঁহার গাত্রে ঢালিয়া দিল যে তাহাতে তাঁহার সর্ব্বশরীর দগ্ধ হইয়া গেল, এবং তিনি জ্বালা নিবারণের জন্য কাতর স্বরে বিঠোবার স্তুতি আরম্ভ করিলেন। এই অগ্নিপরীক্ষাকালে তুকারামের অসামান্য ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া কাংস্যকারপত্নীর কঠিন হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল, এবং সেও তাহার পতির অনুবর্ত্তিনী হইয়া তুকারামের সেবায় নিযুক্ত হইল।

তুকারামের প্রতি সময়ে সময়ে যে এই রূপ কত অত্যাচার আচরিত হইত, তাহার অসংখ্য উদাহরণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু প্রায়ই অত্যাচারকারী দুষ্টদিগের অভীষ্ট সিদ্ধিতে কোন না কোন ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। এক দিন তুকারামের সঙ্কীর্ত্তন শুনিতে দুই জন পণ্ডিতাভিমানী সন্ন্যাসী উপস্থিত হইলেন। তুকারামের হরিনামকীর্ত্তন তাঁহাদের রুচিকর হয় নাই—তাঁহারা রোষপরবশ হইয়া মহারাজ শিবাজীর শিক্ষক* পূণার দাদোজী কোণ্ড-

* দাদোজী কোণ্ডদেব মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীর পিতা সাহাজীর একজন বিশ্বাসী ভৃত্য ও সুদক্ষ রেবেনিউ কর্ম্মচারী ছিলেন। শিবাজী লিখন পঠনে কখনই নিপুণতা লাভ করেন নাই, এমন কি, তিনি নাম স্বাক্ষর পর্য্যন্ত করিতেও অক্ষম ছিলেন। কিন্তু

দেবের নিকট তুকার বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করিলেন যে দেখুন তুকারাম শূদ্র হইয়া বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে—অজ্ঞ ভাবুক জনেরা তাহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতেছে, ব্রাহ্মণেরাও শূদ্রের পদে প্রণিপাত করিতে সঙ্কুচিত হইতেছে না, এ কি অন্যায় কথা—এখনি তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া ইহার সমুচিত দণ্ডবিধান করুন। দাদোজী বিজ্ঞ ও চতুর ছিলেন; তিনি ঐ দুই সন্ন্যাসীকে বলিলেন আপনারা তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ করিয়া যদি বাদানুবাদে তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারেন তাহা হইলেই তাঁহার উচিত শাস্তি হইবে। এই বলিয়া তুকারামকে পুণায় নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইলেন। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত একত্রিত হইলেন। সকলেই তাঁহাকে সমাদর সহকারে অভ্যর্থনা করিল। দাদোজী সন্ন্যাসীদের কথা না মানিয়া তুকারামের সহিত সাক্ষাৎ করত তাঁহাকে আদরের সহিত নগরে লইয়া আইলেন। তথায় সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সন্ন্যাসীরা কীর্ত্তনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা তুকার ভাব ও ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইলেন এবং দাদোজী তাহাদিগকে তীব্র তিরস্কাররূপ দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিয়াদিলেন।

ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের একটী রোগ এই যে প্রথম প্রথম তাঁহারা এক ভাবে ধর্ম্মোপদেশ আরম্ভ করেন। কালসহকারে তাঁহাদের স্বর্গীয় ভাবের সহিত পৃথিবীর ধূলি মিশ্রিত হইয়া তাঁহাদের ভাবপরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। পৃথিবীর নামাঙ্কিত ধর্ম্মনেতাদের জীবনবৃত্ত পাঠে যতদূর জানা যায় তাহাতে এই দৃষ্ট হয় যে, প্রথমে তাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হন, ক্রমে যেমন তাঁহাদের খ্যাতি প্রতিপত্তি বিস্তার হয় ও শিষ্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হয়, তেমনি তাঁহারা তাঁহাদের উচ্চ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া লোকদিগকেও বিপথগামী করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের দৃষ্টি আপনার প্রতি নিপতিত হয়—তাঁহাদের অনুরাগপূর্ণ সরল চিত্তে অল্পে অল্পে ধূর্ত্ততা ও ভণ্ডামি প্রবেশ করে—ঈশ্বরের সিংহাসন তাঁহারা নিজে অধিকার করিতে উদ্যত হন—ঈশ্বর হইতে লোকের হৃদয়-মন কাড়িয়া লইয়া আপনার দিকে তাহা আকৃষ্ট করিতে সচেষ্টিত হন। ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের নাম করিয়া আত্ম গৌরব বর্দ্ধন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইয়া উঠে! এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্তে নানা প্রকার প্রকৃতি-বহির্ভূত ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার প্রদর্শন দ্বারা লোক সকলকে চমকিত করা তাঁহাদের এক প্রধান কার্য্য হইয়া উঠে। মূককে বাচাল করা—অন্ধকে চক্ষুদান—ব্যাধিগ্রস্তকে আরোগ্য প্রদান—মৃত শরীরে প্রাণদান ইত্যাদি অদ্ভুত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান-চ্ছলে আপনাদিগকে ঈশ্বরের দূত অথবা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন। পরে ইহাঁদের দেহত্যাগানন্তর মৃত্যুর ছায়াতে ইহাঁদের জীবনের ক্ষুদ্র ভাব, ক্ষুদ্র লক্ষ্য, ক্ষুদ্র কার্য্যও এরূপ দীর্ঘাকার ধারণ করে যে, শিষ্যবর্গ মিলিয়া মোহাবেশে অনায়াসে ইহাঁদিগকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লন। এইরূপ পৃথিবীতে কত অবতারের সৃষ্টি হইয়াছে। যাঁহারা পবিত্র-চরিত্র প্রকৃত সাধুপুরুষ, তাঁহারা জানিয়া শুনিয়া এইরূপ ভণ্ডামি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন এমন সম্ভবে না, কিন্তু যিনি যাহা বলুন—মানুষ দুর্ব্বল-হৃদয় অপূর্ণ জীব, তিনি প্রকৃত সাধু হইলেও লোকের শ্রদ্ধা অনুরাগ ও পূজা পাইলে মোহবশতঃ তাঁহার মস্তকও অনেক সময় ঘূর্ণিত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, তুকারাম আপনাকে এইরূপ ঐশী শক্তি-সম্পন্ন জ্ঞান করিতেন কি না? তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন দেবতার অবতার বিশেষ জ্ঞান করিতেন, মহীপতি-রচিত তুকার জীবনবৃত্তে তাহার বহুতর নিদর্শন পাওয়া যায়। তুকারামের নিজের লেখায় তাঁহার দেবশক্তির কথার তাদৃশ উল্লেখ নাই—কিন্তু একেবারে নাই তাহা বলা যায় না। তুকারাম যে তাঁহার নিজের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করিতেন না তাহা বোধ হয় না—তৎকালে ওরূপ বিশ্বাস না হওয়াই আশ্চর্য্য। বিঠোবার উপর তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল ও তিনি তাঁহার জীবনের সামান্য ঘটনাতেও ঈশ্বরের আদেশ দেখিতে পাইতেন—ইহার দৃষ্টান্ত তাঁহার অভঙ্গে অনেক পাওয়া যায়। স্বপ্নে তাঁহার ধর্ম্মদীক্ষা ও স্বপ্ন হইতে তাঁহার সরস্বতীর প্রসাদ উপলব্ধি হয়। নদী হইতে তাঁহার গ্রন্থোদ্ধার প্রভৃতি কএকটা ঘটনা কতকটা অলৌকিক বলিলেও বলা যাইতে পারে। তুকারাম যে ঘটনা বিশেষে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব স্বীকার করিতেন তাহার স্পষ্টতর প্রমাণ তাঁহার অভঙ্গের আরো দুই এক স্থলে দৃষ্ট হয়। একটী অভঙ্গে একটী মৃত শিশুকে জীবন দানের কথা উল্লেখ আছে। মহীপতি এ ঘটনাটি এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন।—

লোহগ্রামে সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল, এমন সময়ে একটি স্ত্রীলোক আপনার শিশুর মৃতদেহ আনিয়া তুকারামের সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, তুমি যদি বাপু যথার্থই বিষ্ণু-ভক্ত হও তবে আমার এই ছেলেটিকে বাঁচাইতে পারিবে। তুকারাম তৎক্ষণাৎ একটি অভঙ্গ রচনা করিয়া নারায়ণের স্তব করিলেন, সকলে দেখিয়া অবাক্—শিশুটি সজীব হইয়া উঠিল।

ধনু-বিদ্যা, বল্লম চালনা, তলবার খেলা, অশ্বারোহণ প্রভৃতি ব্যায়াম কার্য্যে তিনি বিলক্ষণ কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তিনি রাজকার্য্য ও শাস্ত্রোক্ত আচার ব্যবহারে কুশলতা লাভ করিয়াছিলেন। রামায়ণ মহাভারত ও পৌরাণিক ইতিহাসে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দ জন্মিত, এবং তিনি কথকতার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন, এমনকি, তাঁহার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার অনেক পরে একবার তুকারামের কথা শুনিতে গিয়া তিনি যে সমূহ বিপদে পড়িয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বভাগে বর্ণিত হইয়াছে। দাদোজীর মৃত্যুর কএক দিন পূর্ব্বে তিনি শিবাজীকে ডাকাইয়া তাঁহার রাজ্যের স্বাধীনতা সংস্থাপন—গো ব্রাহ্মণাদি রক্ষণ, প্রজাপালন ইত্যাদি বিষয়ের উপদেশ দেন—শিবাজীর জীবন ও চরিত্রে যে সে উপদেশের ফল ফলিয়াছিল ইহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে।

সে অভঙ্গ এই—

২৩১৫

অচিন্ত্য তোমার শক্তি ওহে নারায়ণ,
নির্জ্জীবে করিতে পার তুমি সচেতন।
তোমার অদ্ভুত লীলা আগে শুনা গেছে,
প্রত্যক্ষ কেননা হবে আমাদের কাছে।
কি সৌভাগ্য আমাদের তুমি প্রভু যবে,
আমরা তোমার দাস কি অভাব তবে ?
কৃপাময় তুকার হে রাখ এ মিনতি
প্রকাশো এখনি তব অদ্ভুত শকতি।

আর একটী ঘটনা এই। চিন্তামণিদেব নামক এক পূজারী ব্রাহ্মণ দেহুর অনতিদূর চিঞ্চবাদ গ্রামে বাস করিতেন। তুকা তাঁহার নিমন্ত্রণ পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। চিন্তামণিদেব তাঁহাকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার সহিত ভোজন করিতে বসেন। ভোজনের সময় তুকার আসন এক স্বতন্ত্র পংক্তিতে স্থাপিত হয়। ইহাতে তুকারাম ক্ষুব্ধ না হইয়া প্রস্তাব করেন, এই ভোজে গণেশ ঠাকুরের জন্য এক আসন পাতিয়া তাঁহাকে আহ্বান কর। চিন্তামণি উত্তর করিলেন দেবতাকে কিরূপে এই ভোজে আনয়ন করিবেন, এত আমার সাধ্য নয়। তুকারাম দুইটি আসন ও দুই পাত্র রাখিতে বলিয়া গণেশ ও বিঠোবাকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার আহ্বানে দেবতারা আসিয়া তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। মহীপতি বলেন তুকা আর চিন্তামণি ভিন্ন অপর কেহ দেবতাদের দর্শন পায় নাই—তাঁহারা কেবল দেখিতে পাইলেন যে ভোজ্য-পূর্ণ পাত্র ক্রমে আপনাপনি শূন্য হইয়া আসিতেছে।

এই বিষয়ক অভঙ্গ—

২৮৮২

ওহে চিন্তামণিদেব করি নিবেদন,
গণেশ ঠাকুরে কর ভোজে নিমন্ত্রণ।
দেব কহে 'ওহে তুকা কি সাধ্য আমার,
'গ্রাসিয়াছে দেখ মোরে ঘোর অহঙ্কার।
প্রস্তুত হয়েছে অন্ন জুড়াইয়া যায়—
ব্রাহ্মণেরা সমাগত জ্বলিছে ক্ষুধায়।'
তুকা কহে 'তব পুণ্যে আনিব গণেশে,
'স্থির হও ধৈর্য্য ধর, দেখহ নিমেষে।"

১৫৭১ শকে তুকারামের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু-বিষয়ে প্রবাদ এই যে তিনি বিষ্ণুর পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া সশরীরে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। মহীপতি বলেন যে তুকারামের অন্তর্ধানের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে তিনি কথায় কথায় বৈকুণ্ঠ যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার শিষ্যদের প্রতি তাঁহার শেষ উপদেশ এই—

২৪৬০

শুন শুন যারা হরি ভকত,
রয়েছ এখানে ভাবুক যত,
তার্কিক সঙ্গ ছাড়িয়া দেও,
বিঠোবা চরণ ধরিয়া রও।
মতের চক্রে ভ্রমিও না আর,
ডুবিবে নরকে কহিনু সার।
কলির মাঝে তুকারাম দাস,
বিদায় লইয়ে যান নিজ বাস।

উপদেশ সমাপ্ত হইলে তাঁহার স্ত্রীকে বলিয়া পাঠাইলেন "আমি বৈকুণ্ঠে চলিলাম তুমি আমার সঙ্গে আসিতে চাও ত এস।" তাঁহার স্ত্রী ওকথায় বিশেষ মনোযোগ না দিয়া উত্তর করিলেন "আমার পাঁচ মাস গর্ভ, ছোট ছোট ছেলে, ঘরে গরু বাছুর, সংসারধর্ম্ম ছেড়ে এখন তোমার সঙ্গে কেমন করে যাই বল দেখি।" তুকারাম মন্দির হইতে বাহির হইয়া চতুর্দ্দশ শিষ্যের সহিত ইন্দ্রায়ণীর তীরে আসিয়া সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তন শেষ হইলে তুকার জন্য আকাশ হইতে পুষ্পক বিমান অবতীর্ণ হইল—তুকারাম দেবতাদের সঙ্গে রথারূঢ় হইয়া অদৃশ্য হইলেন। চতুর্দ্দিক হইতে জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। মহীপতির গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত আছে ও ইহার আভাস তুকারামের কয়েকটী অভঙ্গে লক্ষিত হয়। কিন্তু তুকারামের অভঙ্গ যে সকল পুস্তকরূপে সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে গদ্যে এইরূপ লিখিত আছে যে "১৫৭১শকে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া প্রাতঃকালে তুকারাম অদৃশ্য হন।' দেহুতে নদী হইতে উদ্ধৃত তুকার বংশজ মধ্যে যে গ্রন্থখানি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে তাহাতে তুকারামের মৃত্যু বিষয়ে এইমাত্র লিখিত আছে যে ১৫৭১ শকে বিরোধীনাম সংবৎসরে সীমগা (ফাল্গুন) বদ্য (কৃষ্ণপক্ষ) দ্বিতীয়া, বার সোমবার তে দিবসী প্রাতঃকালী তুকোবানী তীর্থাস প্রয়াণং কেলে—শুভং ভবতু মঙ্গলং"অর্থাৎ১৫৭১শকে বিরোধী নাম সম্বৎসরে ফাল্গুণ কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া সোমবার প্রাতঃকালে তুকারাম তীর্থ প্রয়াণ করিলেন—শুভমস্তু।"

তুকারামের এই রূপ সহসা অন্তর্ধান আর আমাদের কবি রামপ্রসাদ সেনের মৃত্যুর মধ্যে কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়।

তুকারামের আসন্ন কালে তাঁহাকে সর্ব্বদাই ধ্যানমগ্ন দেখা যাইত। এই কালের একটী প্রবাদ আছে যে তিনি আলন্দীর মন্দিরে গিয়া দেখিলেন যে মন্দিরের প্রাঙ্গণে এক বৃক্ষতলে এক পাল পক্ষী চরিতেছিল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাহারা উড়িয়া গেল। ইহা দেখিয়া তিনি বিষাদে মগ্ন হইলেন। তাঁহার মনে হইল যে এখনো আমার মনের মালিন্য অপনীত হয় নাই—এখনো জীবজন্তু আমাকে দেখিয়া শঙ্কিত হয়—যে অবস্থায় প্রাণী মাত্রে আমাকে দেখিয়া ভয় পাইবে না আমি এখনো সেই নিষ্কাম শান্তির অবস্থায় উপনীত হইতে পারি নাই। এই ভাবিয়া তিনি সেই বৃক্ষতলে শবের ন্যায় এরূপ নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন যে বিহঙ্গদল তাঁহাকে অচেতন পদার্থ জ্ঞানে তাঁহার গায়ে আসিয়া উড়িয়া বসিল। তুকারামের এই সময়কার রচনাতে—সংসার মায়াময়—জীবব্রহ্মে অভেদ—এই বৈদান্তিক ভাব প্রকটিত দেখা যায়, এবং তিনি ঈশ্বরে লীন হইয়া সংসার হইতে অপসৃত হইবার ভাব ব্যক্ত করেন।

১৫৯০

সংসারের গায়ে মাখা যতেক ব্যসন,
বিশুদ্ধ হয়েছি চিতে করিয়ে কীর্ত্তন।
নিষ্কলঙ্ক দেখি এবে এই ত্রিভুবন—
ভেদাভেদ জ্ঞান ধুয়ে পেয়েছি চেতন।
করিব অখণ্ড এবে ব্রহ্মপুরে বাস,
যেই স্থানে হয় সব পাপতাপ নাশ।

তুকা কহে "ভুলে সব একান্ত নিরত—
ব্রহ্মেতেই ব্রহ্মরস ভুঞ্জিব সতত"।

তুকারামের অন্তর্ধানের চতুর্থ দিবসে তাঁহার বিয়োগক্লিষ্ট শিষ্যগণের নিকট তিনি আপনার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এক জোড়া মন্দিরা যাহা সর্ব্বদাই তাঁহার হাতে থাকিত —এক খানি বস্ত্র ও কতকগুলি অভঙ্গ প্রেরণ করেন। সেই দিনে দেহুবাসিগণ হরি সঙ্কীর্ত্তন—ব্রাহ্মণ ভোজন প্রভৃতি উৎসবের কার্য্য মহা উল্লাসের সহিত অনুষ্ঠান করেন। দেহুতে এইরূপ প্রতিবর্ষে ফাল্গুণের পঞ্চমী ষষ্ঠীতে তুকারামের স্মরণার্থ উৎসবক্রিয়া মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

তুকারাম তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে যে সকল শ্লোকে আপনার অনুগত মণ্ডলী হইতে বিদায় লইয়া ছিলেন তাহার কতিপয় শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে—

১

দাও গোঁ বিদায় এবে যাই নিজ ধামে,
এতকাল আছিলাম তোমাদের গ্রামে।
আর কি কহিব বল মনে রেখো মোরে,
আর না ভ্রমিতে হবে সংসারের ঘোরে।
বল সবে রামকৃষ্ণ বিঠ্ঠলের নাম,
বৈকুণ্ঠে পৃথিবী ছাড়ি যায় তুকারাম।

২

নিজ গ্রামে নিজ ধামে চলিনু এখন,
বিদায় দিয়েছে মোরে মিলে সাধুগণ।
মোর সুখ-দুখ-মর্ম্ম করেছে গ্রহণ,
কৃপাদৃষ্টি আমাপরে আছে বিলক্ষণ।
সাজায়ে মিষ্টান্ন কত এসেছে লইতে,
বহুদিন পরে সুতে প্রবাস হইতে।
সেই পথে তাকাইয়ে আছি নিশিদিন,
সেই দিকে চিত্ত মোর শঙ্কা ভয়হীন।
তুকা কহে "আনিতে এসেছে লোক জন,
ডাকিছেন বাপ মায়ে দিতে আলিঙ্গন।
শিহরে অঙ্গ পুলক ভরে,
শুভ চিহ্ন সব আমার তরে।
স্মরেছেন মোরে মা বাপে আহা—
দেখা যাক্ ভাগ্যে আছে কি তাহা।
উৎকণ্ঠিত অতি হয়েছে হিয়া,
সুলক্ষণ তাহে দিতেছে কহিয়া।
তুকা কহে এবে কাজ হল শেষ,
আর কি থাকা যায় এখন বিদেশ।

৩

বাহিরে ও ঘরে মোর আছে যারা যারা—
এই আশীর্ব্বাদ—সুখে থাকগো তোমরা।
গুরু পূজ্য লোক মোর রয়েছেন যত,
প্রণতি তাঁদের মোর জানাইবে শত।
মধু-অন্বেষণ তরে অলি যায় উড়ে—
বস্ত্র ছিন্ন হলে পরে আর কি সে যুড়ে?
নদী যায় একবার সাগরেতে মিশে—
তার সেই স্রোত আর ফিরাইবে কিসে?
এই সব কথা গুলি মনে জেনো সার—
এই যে চলিল তুকা ফিরিবে না আর।

৪

শঙ্খচক্র ধরি করে আইলেন হরি,
কিবা শোভে কুণ্ডল মুকুটে আহা মরি।
মেঘশ্যামবর্ণ হরি পীতাম্বরধারী,
কহিছেন ভয় নাই; আর কিবা ডরি।
আমি গেলে সকলে কাঁদিবে উচ্চরবে—
কিন্তু আর ফিরিব না মনে জেনো সবে।
"যে ছিল গ্রামের রত্ন সে ছাড়িল দেহ,
মোদের সে বার্ত্তা তবু জানালে না কেহ"—

পাছে এই কথাবল ভয় করি ভাই,
পৃথ্বী ছাড়িবার আগে জানাইনু তাই।
লইয়া ধ্বজার বোঝা করি ভেরীরব—
পণ্ডরী পুরেতে যায় হরিভক্ত সব।

৫

তুকার পরীক্ষা হইল শেষ,
বিস্ময়ে পূরিল সকল দেশ।
প্রত্যহ দেবতা ভজন গান,
এই মাত্র তার অনুষ্ঠান।
বসিল তুকা বিমানে চড়ি,
সাধুগণ দেখে নয়ন ভরি।
ভক্তি তরে দেব ক্ষুধিত প্রাণ—
তুকারে বৈকুণ্ঠে লইয়া যান।

এই শেষ চরণের মূল অভঙ্গপাঠকদিগের কৌতুহল উদ্রেকের জন্য দেওয়া যাইতেছে—

তুকা উতরলা তুকী। নবল ঝালেঁ তিহীঁ লোকীঁ ॥ ১

নিত্য করিতো কীর্ত্তণ। হেঁচি ত্যাচেঁ অনুষ্ঠান ॥ ২

তুকা বৈসলা বিমানী। সন্ত পাহাতী লোচনীঁ ॥ ৩

দেব ভাবতো ভুকেলা। তুকা বৈকুণ্ঠাসী নেলা ॥ ৪

বোধ হয় এই শ্লোক হইতেই তুকারামের স্বর্গারোহণ কল্পিত হইয়াছে।

তুকারামের জীবনবৃত্তে যে সকল ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ—বিষয় ত্যাগ—ধৈর্য্য ক্ষমা শান্তি—তাঁহার অচলা দেবভক্তি প্রকাশ পাইতেছে। তুকারাম যে বাস্তবিক এক জন ভগবদ্ভক্ত সাধু ছিলেন তাহা তাঁহার জীবনপুস্তকে সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখিত আছে। তাঁহার বৈরাগ্য কেবল মুখের নয়—বৈরাগ্যের প্রকৃত অর্থ তাঁহার জীবনে ফলিত হইয়াছিল। তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সর্ব্বত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য কষ্টে প্রথমে তাঁহার সংসার ত্যাগে প্রবৃত্তি জন্মে, কিন্তু পরে যখন তাঁহার যশঃসৌরভ মহারাষ্ট্র মধ্যে বিস্তার পাইল—যখন লক্ষ্মী তাঁহার দ্বারে আসিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন, এবং সুদুর্লভ রাজপ্রসাদ তাঁহার হস্তগত হইল, তখন তিনি সমুদয় প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া কহিলেন—এ সকলে আমার কাজ নাই—আমি যে দুই একটী পদার্থ সার বলিয়া জানি তাহাতেই আমি অনুরক্ত থাকিব।—"আপনার ভ্রমে আমি রহিব আপনি" এই নিশ্চয় করিলেন। তিনি পার্থিব ধনমানের প্রার্থী ছিলেন না—রাজসম্মান তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর বোধ হইত—তিনি জানিতেন "আমরা হরিভক্ত দৈব-ভাগ্যবান্।"

তিনি বলিয়া গিয়াছেন—

১

নম্রতা প্রভুর অমূল্য দান,
হয় না সহিতে ঈর্ষার বাণ।
মহাপুরে ভাঙ্গে বৃক্ষের কায়,
কোমল লতিকা বাঁচিয়া যায়।
সাগর তরঙ্গ আইসে ধেয়ে,
প্রণত হইলে যায় বহিয়ে।
তুকা কহে দেখ বিনয়ের ফল,
পায়ে পড়িলে ত চলে না বল।

২

দীনতা নম্রতা দেহ গো হরি,
বড়ত্বের মোরা ধার না ধারি।
পিপীলিকা যেই ক্ষুদ্র প্রাণী,
সে পায় মিছরী টুকরা খানি।
মহারত্ন ঐরাবতে
জ্বলে অঙ্কুশ আঘাতে।
মহত যে জন হয়,
কঠিন যাতনা সয়,
তুকারাম কহে শুন হে সার,
মৃদু যে যত লঘু ভার তার।

তুকারামের শ্লোকাবলী মহারাষ্ট্রীয় বৈষ্ণবদিগের বেদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু শুধু বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কেন—মহারাষ্ট্র দেশের সাধারণ জনপদের মধ্যে তাঁহার অভঙ্গ প্রখ্যাত ও আদরণীয়। তুকারাম যেরূপ ধর্ম্মোপদেষ্টা, যাঁহার জীবনে জীবন্ত ধর্ম্ম প্রতিভাত ছিল—তিনি যেরূপ কবি, যাঁহার লেখায় নীতি ও ভক্তি-সুধাপূর্ণ জ্বলন্ত বাক্য সকল আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলেরই হৃদয়গ্রাহী, তাঁহার প্রতি অনুরাগ যে কোন সম্প্রদায়বিশেষে বদ্ধ তাহা নহে—তিনি মহারাষ্ট্র দেশের জাতীয় কবি। তাঁহার অভঙ্গ ব্রাহ্মণ শূদ্র কথক শ্রাবক সকলেরই মুখে। শিন্দে, হোলকর প্রভৃতি রাজপুরুষগণ তুকার অনুযাত্রী বলিয়া পরিচিত, ও মাসের মধ্যে নিয়মিত দিবসে সবান্ধবে তাঁহার শ্লোক কীর্ত্তন করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত। নিম্নতর শ্রেণীর মধ্যে তীর্থকরীগণ মহা উল্লাসের সহিত তুকার অভঙ্গ গান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সংখ্যা অল্প নয়—প্রতি বর্ষে আষাঢ় ও কার্ত্তিক মাসে প্রায় লক্ষ লোক বিঠোবা দর্শনে পণ্ডরীপুর যাত্রা করেন।

ঈশ্বরে ধ্রুব বিশ্বাস ও সেই বিশ্বাসানুযায়ী আচরণ, তুকার উপদেশের দুই প্রধান অঙ্গ। ভক্তিমার্গকেই তিনি মোক্ষলাভের প্রকৃত মার্গ জ্ঞান করিতেন। মুখে ধর্ম্ম ভানকারী অন্তরে ঘোর বিষয়ী যে সকল লোক কতকগুলি বাহ্যাড়ম্বরকেই ধর্ম্মসাধন মানিয়া চলেন, তাহাদিগকে তিনি দেখিতে পারিতেন না। তিনি বলিয়াছেন—

কথা অতি মিষ্ট আর মন ভাল যার,
নেই বা রহিল গলে ফুলমালা তার।
আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ কোরেছে যে জন,
নেই বা সে শিরে জটা করিল ধারণ।
আসক্তি নাহিক যার পরস্ত্রীর প্রতি,
ভস্ম যদি না মাখে সে কি তাহাতে ক্ষতি।
নিন্দায় যে মূক আর অন্ধ পরধনে,
তুকা কহে সন্ন্যাসী কহিও সেই জনে।

পুনশ্চ—

কি ফল পূজিয়ে বল পিত্তল পাষাণ,
ভাবহীন হয়ে যদি রহিলে অজ্ঞান।
ভক্তিই সুখকারণ ভক্তিই তারণ,
ভক্তিই শাস্ত্রেতে কহে মোক্ষের সাধন।
জপমালা কণ্ঠমালা কি করিবে বল—
বিষয়ের জপে যদি মগন কেবল।
অক্ষরের অভিমানী হইয়ে পণ্ডিত—
কি হবে যদি না তুমি সাধো জীবহিত।
খোল করতাল ধরি গাও নিশি দিন,
কি ফল তাহাতে যদি অন্তরে মলিন।

তুকা কহে "ভক্তি বিনা দেবসেবা করি,
বৃথা পণ্ডশ্রম খালি—পাইবে কি হরি?"

এই ক্ষণকার ধর্ম্মপ্রচারকেরা তুকারামকে তাঁহাদের জীবনের আদর্শ করিয়া চলিলে অনেক শুভ ফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। ত্যাগী শ্রদ্ধাবান্ শান্ত দান্ত ক্ষমাশীল—ঈশ্বর-ভক্তিই তুকারামের সর্ব্বস্ব ছিল—তাহাই তাঁহার জীবনের অন্ন পান—তাহাই তাঁহার উপদেশের সার—তাহারই গুণে মহারাষ্ট্রের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই নিকট তাঁহার অভঙ্গের এত আদর—এত গৌরব—তাহারই গুণে ঐ প্রদেশে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তুকারামের অভঙ্গ হইতে ঈশ্বরভক্তিসূচক কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

সন্তানে মায়ের হাতে কেবা দেয় আনি।
আপনি জননী তারে লন কোলে টানি—
কাজ যাঁর তিনিই তা করিবেন, তবে
আমি কেন মিছামিছি মরি ভেবে ভেবে।
সন্তান না যদি চায় তবুও জননী,
রাখেন তাহার তরে মিষ্টান্ন আপনি।
সন্তান যখন রহে খেলায় ভুলিয়া,
কাছে গিয়ে লন তারে বুকেতে তুলিয়া।
পীড়া তার হলে তিনি ব্যস্ত হন কত—
তুকা তাই কহে "শুন বন্ধুগণ যত—
"এত যত্ন কেন তবে শরীরের প্রতি,
মা থাকিতে আঘাত না পাবে এক রতি।"

এই শ্লোকটীতে ঈশ্বরের মাতৃভাব সুন্দর রূপে ব্যক্ত হইয়াছে।—নিম্নের কয়েকটী শ্লোকে কবির ঈশ্বরনিষ্ঠা প্রকাশ পাইতেছে।

নিজ হ'তে বাক্য কভু নাহি কহে নর,
প্রিয় ভগবন্ত যিনি তাঁরি সেই স্বর।
কোকিল যে করে সদা সুমধুর গান,
অন্য জন তারে সেই শিখাইল তান।
প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি যাহা আমি—
এ ক্ষমতা দিলা মোরে জগতের স্বামী।
তুকা কহে কে জানিবে তাঁহার শকতি,
পঙ্গু খঞ্জ জনেরেও দেন তিনি গতি।

লইনু সর্ব্বতোভাবে তোমার শরণ,
কায়মনোবাক্যে তব করিনু বন্দন।
হে দেব, অপর কিছু নাহি অভিলাষ,
তব পদে থাকে যেন বাঁধা তব দাস।
আমার হৃদয়পরে সেই গুরুভার—
তোমা বিনা ওহে নাথ কে করে উদ্ধার?
আমি হে তোমার দাস প্রভু তুমি আর—
বহুদূর হইতে এসেছি তব দ্বার।
তুকা কহে ধন্না দিয়ে বসিনু এখন,
হিসাব দেখিতে হবে দিয়ে দরশন।

ওহে পতিত-পাবন,
দীননাথ নারায়ণ,
তব রূপ হৃদি মাঝে
সদাই যেন বিরাজে,
ওহে ব্রহ্মাণ্ড নায়ক
ভক্ত-জন-প্রতিপালক।
জীবের জীবন তুমি প্রাণাধার,
দেব দেব তুমি তুকা কহে সার।

এই বর দান মাগি গো প্রভু,
যেন তোমা-হারা না হই কভু।

তব গুণ গানে সঁপিয়া প্রাণ—
ভবের বিভব চাহি না আন।
ধন মান যশ না চাহি কৃপাল,
সাধু সঙ্গে যেন কেটে যায় কাল।
ছাড়ি যায় যবে তুকা ভববাস—
হয় যেন সুখী এ তব দাস।

——

পতিত যে পাপী আমি লয়েছি শরণ,
পাণ্ডুরঙ্গ কর মোর লজ্জা নিবারণ।
ভকতবৎসল তব অন্ত কেবা জানে,
তোমা বিনা কেবা তারে অভাগা এজনে।
কত কষ্ট পায় আহা দ্রৌপদী ভগিনী,
আপনার মত তারে রাখিলে আপনি।
প্রহ্লাদে বাঁচালে স্তম্ভে হয়ে অবতার,
আমারে ভুলিলে তবে একি অবিচার।
দারিদ্র্যে ঘেরিল আসি সুদাম ব্রাহ্মণে,
তুমি তারে পাণ্ডুরঙ্গ উদ্ধারো যতনে।
তুকা কহে কায়মনে ধরিনু আধার,
পাপ নাশি তবদাসে দেওহে নিস্তার।

——

এই দেব তব পদে করি হে মিনতি,
কৃপাগুণে হোক্ মোর দেহের বিস্মৃতি।
তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবারে যাই,
জীবনের সুখ শান্তি নাহি অন্য ঠাঁই।
তোমার চরণ পানে বাঁধি নিজ ধাম,
সন্তোষ পাইব চিতে লভিব বিশ্রাম।
লজ্জা কিম্বা ভয় আর কাম ক্রোধ অরি—
বিনাশো জঞ্জাল সবে প্রভু কৃপা করি।
তব পদে প্রভু তুকা এই ভিক্ষা চায়—
সাধু সঙ্গে মিলাইয়ে তরাও তুকায়।

পৌত্তলিকতা বিষয়ে তুকারামের উক্তি—

স্থানেতে আবদ্ধ ক'রে পূজি গো তোমায়,
চৌদ্দ ভুবন কিন্তু অন্তরে লুকায়।
নাচায় ফিরায় তোমা লোকে দ্বার দ্বার,
রূপ রেখা হীন কিন্তু তুমি নিরাকার।
তোমা লাগি আমরা গো গাই কত গীত—
তুমি কিন্তু ওহে দেব শব্দের অতীত।
তোমা তরে আমরা গো পরি জপমালা—
তুমি কিন্তু সৃষ্টি হতে রয়েছ নিরালা।
তুকা কহে "এবে তুমি হয়ে পরিমিত—
প্রসন্ন হইয়ে মোর সাধ কিছু হিত।"

বৈদান্তিক মতের উপর তুকার উক্তি—

খণ্ডোবার ভিক্ষুক সে আছিল প্রথমে—
ভাগ্যগুণে সেনাপতি হল ক্রমে ক্রমে—
তবুও ভিক্ষার ঝুলি ঘুচিল না তার,
পুরাণো স্বভাব কভু নহে ঘুচিবার।
প্রথমে গণক ছিল, এমনি কপাল,
ক্রমে ক্রমে রাজ্যের সে হইল ভূপাল—
পাঁজি পড়া তবুও ত ঘুচিল না তার—
পুরাণো স্বভাব কভু নহে ঘুচিবার।
প্রথমে ছিল যে দাসী, কে জানিত কবে,
সেই দাসী ভাগ্যগুণে পাটরাণী হবে—
তবুও ত হীন কর্ম্ম ঘুচিল না তার—
পুরাণো স্বভাব কভু নহে ঘুচিবার।
প্রথমে পাইল তুকা সাধুদের সঙ্গ,
ক্রমে পাণ্ডুরঙ্গ সাথে হল এক অঙ্গ।
তবু তাঁর গুণ গান ঘুচিল না তার,
পুরাণো স্বভাব কভু নহে ঘুচিবার।

ভক্তের লক্ষণ—

সেই জন ভক্ত, যেই দেহেতে উদাস—
সংসারে বিরাগ যার ছিন্ন আশাপাশ।
বিষয় তাঁহার নাই বিনা নারায়ণ,
মাতা পিতা নাহি চান নাহি ধন জন।

গোবিন্দ সহায় তাঁর হন পদে পদে,
আগুলে রাখেন তাঁরে সম্পদ বিপদে।
তুকা কহে এই জেনো ভক্তের লক্ষণ,
সত্য কাজে সদা যিনি থাকেন মগন।

——

সংসারের অনিত্যতা—

কোন জন দেখ জল বোয়ে মরে,
সুখে শোয় কেহ খাটের উপরে।
কালের চক্র যেমন ঘুরে,
লোকের কপাল তেমনি ফিরে।
কভু শুষ্ক রুটি বহু কষ্টে মেলে,
কভু চর্ব্ব্য চোষ্য পাই অবহেলে।
কেহ পদব্রজে ঘুরিয়ে মরে,
কেহ রথে বসে সুখে বিহরে।
কেহ রাজবেশে ভূষিত শরীর,
কারো পুরাতন ধূলি মাখা চীর।
কভু বা দারিদ্র্য কভু ধনরাশ,
কভু হীন সঙ্গ কভু সাধু সহবাস।
তুকা এই কথা বলে মনে জেন ঠিক,
পৃথিবীর সুখ দুঃখ সকলি অলীক।

ধর্ম্মনীতি ও ঈশ্বর বিষয়ক আর কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করা যাক।

সেই পাপ মনে যদি রহিল সংশয়,
পাপ পুণ্য দুই সে মনের ধর্ম্ম হয়—
ভাল চিন্তা পুণ্য অতি জানিও গো সবে,
বীজ যদি ভাল হয় ফল ভাল হবে।
তুকা কহে "মনেরে রাখিও শুদ্ধ সত্ত্ব,
সেই অতি ভাল কাজ, সেই সার তত্ত্ব।
ধন্য ধন্য সেই প্রাণী ক্ষমা যার অঙ্গে,
ধৈর্য্যবল ধরে যেই সকল প্রসঙ্গে।
পর-গুণদোষ-চর্চ্চা নাহি যাঁর ঠাঁই—
অহঙ্কার গর্ব্ব শূন্য যে জন সদাই।
অন্তর বাহির যার সমান নির্ম্মল,
পূণ্যতোয়া গঙ্গাসম হৃদয় কোমল।
তুকা কহে হেন জন দোসর আমার—
প্রণমি তাহার পদে শত শত বার।

——

সন্তপ্ত পীড়িত জনে যে দেখে আপন,
দীন হীনে করে যেই হৃদয়ে ধারণ।
নিজ দাস দাসী পরে,
পুত্রের বাৎসল্য ধরে।
সেই সাধু, সেই তীর্থ দেবের বসতি,
তার গুণ বাখানিব হেন কি শকতি।
তুকা কহে "সাক্ষাৎ সে ভগবন্ত মূরতি।"

——

সদুপায়ে ধনরাশি করি উপার্জন,
ভাল কোরে বুঝে সুঝে কোরো বিতরণ।
কটু বাক্য না কহে যে পরহিতে রত,
পরস্ত্রীরে দেখে যেই জননীর মত—
জীবজন্তু সবাপরে অতি দয়াবান্,
মরুভূমে তৃষাতুরে করে জল দান।
সদা শান্ত, নাহি করে পর অপবাদ,
গুরু জন সাথে কভু না করে বিবাদ।
সে লভে উত্তম গতি নাহি পায় দুখ,
পরম সৌভাগ্য তার ভুঞ্জে সদা সুখ।
তুকা কহে আশ্রমের রত্ন তারে মানি,
এহতে তপস্যা আর কি আছে না জানি।
সংসারের ধারি না ধার,
হরির জন সে সখা আমার।
ব্রহ্মানন্দে কাল যায়
বিষয়ে কি মন তৃপ্তি পায়।

না আসে চিন্তা স্বপনেও কভু,
নিশি দিন যায় সুখেতে প্রভু।
তুকারাম কহে " এযে ব্রহ্মরস,
কি বলিব আহা কেমন সরস।"

কৃপাময় যিনি তাঁরে না কর স্মরণ?
একাকী জগত যিনি করেন পোষণ,
উত্তাপে শুকালে তরু, দিয়ে বারিধার;
কে করে তাহাতে বল জীবন সঞ্চার।
কে বল মায়ের স্তনে যতনে ঢালিয়া,
পান হেতু দুগ্ধ দেন আগেতে ভাবিয়া।
তুকা কহে জান তাঁর নাম বিশ্বম্ভর,
ভক্তি ভরে তাঁর ধ্যান কর নিরন্তর।

সবাই বলে গো দেব আমি তব দাস,
তুমিই রাখিবে মোরে এই মম আশ।
অনাথের নাথ তুমি পতিত পাবন,
এই নাম জপি আমি কাটাব জীবন।
ভজন পূজন মোর মুখেই কেবল,
অন্তরের কথা প্রভু জানিছ সকল।
তুকা কহে তুমি ওহে করুণার সিন্ধু,
ভবপাশ নাশো মোর ওহে দীনবন্ধু।

শ্রীস—

রুসিয়া।

২। পুরাবৃত্ত

রুসিয়ার অধিবাসিগণ অতি প্রাচীনকাল হইতেই অনেকগুলি গর্ভ-জাতিতে বিভক্ত; অপরাপর দেশের ন্যায় এদেশেও ঐ সকল গর্ভ-জাতি পরস্পর চির-বিরোধী-ভাবাপন্ন। এই চিরপ্রবাহী যুদ্ধে কখন বা একজাতি কখন বা অন্য জাতি প্রাধান্য লাভ করিত। এরূপ একটি কিম্বদন্তী আছে যে কোন এক সময় এই অভ্যন্তরীণ জাতীয় যুদ্ধ এত ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছিল যে অনেককাল পর্য্যন্ত কোন্ জাতিরই প্রাধান্য না হইয়া কেবল বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময়ে রুসিয়ার এক প্রকার ফিউদ্যালিস্‌ম (feudalism) প্রচলিত ছিল; রুসিয়ার বৈয়ারগণ* (Boyars) এই সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধ থামাইবার অন্য কোন উপায় না পাইয়া এক দল বিদেশীয় যোদ্ধাদিগকে আহ্বান করে। এই আমন্ত্রণানুসারে রুরিক স্বীয় দলবল সহিত রুসিয়ায় উপস্থিত হয়। এই সকল যোদ্ধা কোন্ জাত্যুদ্ভব এ বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। কেহ বলেন যে ইহারা স্কান্দেনেবীয় নর্ম্মান, এই মতানুসারে ইয়ুরোপের সকল মুকুটধারীই নর্ম্মান বংশোদ্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অপর মতটি এই যে রুরিক ফিন্‌লণ্ড উপসাগরের উপকূলস্থ শ্লেভ জাত্যুৎপন্ন; এই মতটি অনেকটা স্বদেশানুরাগ ও জাতীয় গর্ব্বপ্রসূত। এই উভয় মতের পোষকতা করিয়া রুসীয় ভাষায় অগণ্য পুস্তক লিখিত হইয়াছে। রুরিক আসিয়া অনেক কালের পর সমর-

* বৈয়ার পশ্চিম ইয়ুরোপের ব্যারনের (baron) প্রতিরূপ।

ক্লান্ত রুসিয়াকে শান্তি প্রদান করে। রুরিকের চারি পুত্র হয়; রুরিকের মৃত্যুর পর চারি ভ্রাতা বিজিত দেশকে চারি সমান ভাগে ভাগ করিয়া লয়। কালক্রমে ইহাদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ রুস অন্য তিন জনকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সমস্ত রাজ্যের অধীশ্বর হইল। ইহারই নাম হইতে রুসিয়া নামের উৎপত্তি। কিন্তু সমস্ত রুসিয়া কখন, রুসের অধীনে ছিল না, ইহার সময়েও অনেকগুলি গর্ভজাতি ছিল, এবং ইহার বংশ হইতেও দুই চারিটি গর্ভজাতির উৎপত্তি। এইরূপে ক্রমে ক্রমে রুসিয়ার অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্থান স্থাপিত হইল. ইহাদের প্রত্যেকের রাজা রুরিকের বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিতেন। অনেক রাজপুত রাজাও ঐরূপ রামলক্ষ্মণের বংশোৎপন্ন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ জঙ্গীশ খাঁ ভিন্ন ভিন্ন মোগল দলের একতা সম্পাদন করিয়া তাহাদিগকে নিয়মবদ্ধ করেন। এই বৌদ্ধমতাবলম্বী মোগলেরা এসিয়ার অধিকাংশ লুটপাট করিয়া ইয়ুরোপে পর্য্যন্ত প্রবেশ করে। জঙ্গীশ খাঁ চীনদেশের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া অর্দ্ধেক দেশ জয় করেন, তৎপরে সেনাপতিদিগের উপর অবশিষ্টাংশ জয় করিবার ভার অর্পণ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করেন। এরূপ অসভ্য জাতির যুদ্ধযাত্রা করিতে হইলে কোন রূপ কমিসরিয়ট বন্দোবস্ত করিতে হয় না, মেষের পালই তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব; সুতরাং পথে ইহাদের বিশেষ বাধা ঘটে না। অতি অল্পকাল মধ্যেই এই তাতার দল রুসিয়ায় আসিয়া হত্যা ও দাহনকাণ্ড আরম্ভ করিল, এবং অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে তাতার সাম্রাজ্য উত্তর মহাসাগর হইতে হিমালয়ের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত ও কার্পেথীয় পর্ব্বতশ্রেণী হইতে এসিয়ার সর্ব্বপশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। রুসিয়ার পনফট্‌সি নামক গর্ভজাতি ইহাদের দ্বারা সর্ব্বপ্রথমে আক্রান্ত হয়; ঐ জাতির রাজা আক্রমণকারীদিগকে দূর করিবার জন্য গ্যালিসিয়ার অধিপতি সাহসী মিষ্টিস্‌ল্যাকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করেন। মিষ্টিস্‌ল্যাক্ একজন বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, যে শত্রু আজ উহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে, কাল তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিবে। তদনুসারে বিবাদ অসত্ত্বে ও তিনি আক্রান্ত জাতিকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন, এবং অন্যান্য রাজার নিকট সহযোগিতার প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার মন্ত্রণায় অধিকাংশ রুসীয় জাতি এক-চিত্ত হইয়া বিদেশীয় শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু তাতারদিগের কর্ত্তৃক কাল্‌কা * নদীর উপকূলে সম্পূর্ণরূপ পরাভূত হইল। কিন্তু বিজেতৃবর্গ তাহাদের জয়ের সম্পূর্ণ ফল গ্রহণ না করিয়াই স্বদেশে ফিরিয়া গেল। ইহার তের বৎসর পর পর্য্যন্ত রুসিয়ায় ইহাদের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। এই সময়ের পর আবার রুসিয়ায় তাতার অভ্যুপাত হয়। রুসীয়গণ এই অকস্মাৎ উপস্থিত জাতির বিষয় কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নানারূপ

* এই নদীটি এজভ সাগরে পতিত হইতেছে।

অনুমান করিতে লাগিল। রুসিয়ার প্রাচীন সাধারণ কবিতা সমূহে বর্ণিত আছে যে হঠাৎ পূর্ব্বদিক হইতে বিকটাকার ভীষণ একজাতি আসিয়া উপস্থিত হয়; ইহারা শয়তানের পুত্র; হত্যা, দাহন ও দাসত্বে আনয়নই ইহাদের একমাত্র কার্য্য, রুসীয়দিগের কোন মহাগুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ইহরা শাস্তিরূপে বিহিত হইয়াছে।

এই সময়ে এবং ইহার বহুকাল পর পর্য্যন্ত রুসিয়া হইতে এত লোক দাসরূপে বিক্রীত হইবার জন্য দেশ দেশান্তরে প্রেরিত হইয়াছিল যে রুসীয় জাতিদিগের সাধারণ শ্লেভ (Slave) নাম হইতে ইংরাজি ও অন্যান্য ভাষায় ক্রীতদাসের একটি নাম শ্লেভ(Slave) হইয়া উঠিল*। কালক্রমে রুসিয়ার অধিকাংশ তাতারদিগর হস্তগত হয়। এই সময়ে ঐ জাতি মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করে। তাতারদিগের সুবর্ণ দল (Golden Horde) নামক দলের খাঁ রুসিয়া সম্রাট বলিয়া পরিগণিত হইল এবং রুসিয়ার সমুদয় ক্ষুদ্র রাজগণ করপ্রদ হইল। এই সময় হইতে মস্কোর রাজবংশের প্রাধান্যের সূত্রপাত; ইহাদের সহিত তাতার রাজাদিগের আদানপ্রদান চলিতে লাগিল এবং অন্যান্য রাজাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্য কর আদায় করিবার ভার খাঁ ইহাদের উপর অর্পণ করিলেন। এই ক্ষমতার অন্যায় ব্যবহার দ্বারা উক্ত রাজবংশ প্রভুত বলশালী হইল, পরে তাতার রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইলে ইহারা তাহাদিগকে দেশ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিল,এবং পরিশেষে দেশের অন্যান্য প্রতিদন্দ্বী রাজাদিগকে পরাভূত করিয়া রুসিয়ার Tsar হইয়া উঠিল। এই সময়ে মস্কোবীরদিগের একটি অতি লোমহর্ষণ নৃশংস ব্যবহার বর্ণিত আছে। নিঝনি নগর মস্কোবীরদিগের কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবার সময় স্বদেশস্বাধীনতা-রক্ষক তিনশত নাগরিক লোক নিকটস্থ নদীর সেতুর উপর হইতে নীচের জলে নিক্ষিপ্ত হয়। ইহাদের মধ্যে যাহারা সন্তরণ করিয়া কূলে উঠিবার চেষ্টা করে তাহারা কূলে ও নৌকায় অবস্থিত সৈনিকদিগের কর্ত্তৃক হত হয়। এখনও এই সেতুর নীচের জল অতি কঠোর শীতেও তরল থাকে। সাধারণ লোকেরা এই নৈসর্গিক ঘটনাটি সেই স্থানে মৃত লোকদিগের প্রেতাত্মার উপর আরোপ করে। এই ঘটনার স্মরণার্থ একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড অদ্যাপিও নিঝনিতে রক্ষিত আছে। অল্পকাল মধ্যে অপর সকল রাজা মস্কোর রাজপারিষদপদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। এই মস্কোবীর রাজবংশ এখনও রুসিয়ার সিংহাসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে। অনেক কাল পর্য্যন্ত

*It must not be thought that the word *slave*, as the name of a people comes from *slave* in its common sense of a *bondman*. It is just the other way, for this word *slave* got its sense of *bondman* because of the great number of bondmen of Slavonic birth who were at one time spread over all Europe.—Freeman's General Sketch of History, p. 15.

মস্কো রুসিয়ার রাজধানী ছিল। পরে প্রধান পীটর (Peter the Great) সেণ্ট পীটর্ষবর্গ নামক বর্ত্তমান রাজধানী স্থাপন করেন। কিন্তু পীটরের অনেক পরপর্য্যন্তও মস্কোতে রাজাদিগের অবস্থিতি হইত। নেপোলিয়নের অভ্যুৎপাতের সময় (১৮১২-১৩ খৃঃ অ।) বিপক্ষ পক্ষকে কষ্ট দিবার জন্য রুসীয়েরা মস্কো নগরে অগ্নি প্রদান করে, সেই অবধি সেণ্টপীটর্ষবর্গ সম্রাটদিগের আবাস-নগর হইয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে রুসিয়ার ধারা-প্রবাহী ইতিহাস অনুসরণ করা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে; যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা না জানিলে পশ্চাল্লিখিত বিষয় সকল স্পষ্টরূপে অবধারণা হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহাই উপরে সন্নিবেশিত হইল। রুসিয়ার ইতিহাস বিষয়ে ম্যাকমিল্যান কর্ত্তৃক প্রকাশিত এক খানি অতি সুন্দর পুস্তক আছে।

৩। শাসন-তন্ত্র।

শাসন-কার্য্যের সৌকার্য্যার্থে প্রকৃত রুসিয়া (অর্থাৎ সাইবেরিয়া সার্কেসিয়া প্রভৃতি অধিকৃত প্রদেশবহির্ভূত রুসিয়া) ৪৬টি গবর্ণমেণ্টে বিভক্ত। এই এক একটি গবর্ণমেণ্ট সাধারণতঃ বিস্তৃতিতে বঙ্গদেশীয় দুইটি জেলার সমান। গবর্ণমেণ্ট আবার জেলায় বিভক্ত। প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট একটি গবর্ণর, একটি বাইস-গবর্ণর ও একটি সাধারণ সভার দ্বারা শাসিত। এই সমস্ত গবর্ণর একটি প্রধান সভার অধীনস্থ। শাসনকার্য্য, ধর্ম্মরক্ষণ প্রভৃতি সকল বিষয়ের সর্ব্বময়কর্ত্তা, সম্রাট। তাঁহার ক্ষমতা বিভক্ত হইয়া তিনটি সভার উপর অর্পিত হইয়াছে। প্রথম সভার কার্য্য ব্যবস্থা সংস্থাপন করা—বস্তুতঃ ইহা অনেকটা আমাদের দেশের ব্যবস্থাপক সভার প্রতিরূপ; দ্বিতীয় মন্ত্রীর সভা, ইহার উপর সমস্ত শাসনকার্য্যের ভার অর্পিত হয়, তৃতীয়, বিচার সম্বন্ধীয় প্রধান সভা, পূর্ব্বে রাজার অনুপস্থিতি ও নাবালক অবস্থার সময় ইহার উপর সকল ক্ষমতা ন্যস্ত হইত। কিন্তু এক্ষণে ইহার কেবলমাত্র বিচারের ক্ষমতা আছে। অন্যান্য অনেক রাজ-তন্ত্র-শাসনপ্রণালী-বিশিষ্ট দেশেও অনেক লোকের উপর শাসনের ভার অর্পিত থাকে; সম্রাট কেবল সংশোধন ও তত্ত্বাবধারণ মাত্র করেন। রুসিয়ায় সেরূপ নহে; অতি ক্ষুদ্র হইতে অতি বৃহৎ পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ের এক মাত্র কর্ত্তা সম্রাট, ইহার অনুমতি ব্যতিরেকে অত্যন্ত সামান্য কার্য্যও হইতে পারে না। আইনমত রাজা ও প্রজার মধ্যে শাসনাদি বিষয়ে অন্য মধ্যবর্ত্তী কিছু নাই। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে রুসিয়ার শাসন-প্রণালী অত্যন্ত Centralized * অথবা কেন্দ্রীভূত। এই প্রকার শাসন-প্রণালীর দোষ বিশেষ করিয়া বর্ণনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। সকলেই বুঝিতে পারিবে যে শাসন-প্রণালী যত-

*সম্রাট, রাজা কিম্বা অন্য কোন প্রধান শাসনকর্ত্তা হইতে প্রত্যক্ষ-ভাবে বিক্ষিপ্ত ক্ষমতার দ্বারা চালিত শাসনতন্ত্রকে Centralized কহা যায়। অর্থাৎ centralized শাসনতন্ত্রে শুধু নামে নহে,কার্য্যেও এক ব্যক্তি সমস্ত শাসনকার্য্য চালাইবার চেষ্টা করে।

অধিক কেন্দ্রীভূত, দূর-প্রদেশে ততঅধিক অরাজক-ভাব; কারণ, স্বীয় আবাসনগরে যত প্রভুত ক্ষমতা হয়, দুরান্তরে কখনই তদ্রূপ হইতে পারে না। ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত-স্থল তুর্কী সুলতান ইস্তাম্বুলে প্রবল প্রতাপ; আর্মেনিয়াতে পাসাই সর্ব্বময়-কর্ত্তা—নিয়মিত রাজস্ব দিলেই নির্ভাবনা। রুসিয়ায় শাসনকার্য্যের এই রূপ বিভাগ সংস্থাপিত যে, দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, এদেশে Bureaucracyর বিশেষ প্রাদুর্ভাব। এই রূপ শাসনপ্রণালীর দোষ কিছু বলা উচিত; কারণ আমাদের দেশে যে Bureaucracyর নাম গন্ধ নাই এরূপ নহে। এই প্রণালীর প্রধান দোষ এই যে এক ব্যক্তি এক বিভাগের কর্ত্তা ও তাহার দোষ গুণের জন্য দায়ী হওয়ায় তাহার দ্বারা অধস্থ কর্ম্মচারীদিগের দোষ প্রকাশ পায় না। অন্য কোন সূত্রে কোন কর্ম্মচারীরও দোষ বাহির হইয়া পড়িলে ও তাহা সপ্রমাণ হওয়া দুঃসাধ্য। রুসিয়ার উচ্চ হইতে সামান্য পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্মচারীই ঘুষখোর, কিন্তু ইহা নিরাকরণের বিশেষ কোন উপায় নাই। কোন রকম দোষের বিষয় সম্রাটের কর্ণগোচর হইলেও তৎপ্রতিকারে তিনি এক প্রকার নিরুপায়, কারণ দোষ প্রমাণ হওয়া অসম্ভব। এই জন্যই মহারাণী ক্যাথেরাইন এক জন কর্ম্মচারী তাঁহার নিকট দরিদ্রতা জানাইলে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন "তুমি অপর সকলের ন্যায় কায কর না কেন?" কর্ম্মচারী অন্য সকলের ন্যায় কার্য্য করা কি জিজ্ঞাসা করায় মহারাণী উত্তর করিলেন "কেন, লুট।" এই উক্তির আর টীকার প্রয়োজন নাই। রুসিয়ার শাসন-প্রণালীর আর একটি দোষ এই স্থানে উল্লেখ করা উচিত। এখানে নিয়মের এতদূর প্রাদুর্ভাব যে একটা সামান্য কার্য্য করিতে হইলেও অন্ততঃ ত্রিশতক্তা ফুলিস্ক্যাপে লিখা চলে। মিঃ ওয়ালেস্ কহেন যে কোন এক গবর্ণরের গৃহের অগ্নিকুণ্ড ভাঙ্গিয়া যাওয়ার মেরামত করিবার প্রয়োজন হয়; ঐ মেরামত করিতে ঊর্দ্ধ সংখ্যায় পাঁচসিকা লাগিত। এক্ষণে সকলেই বোধ করিবেন যে এক জন গবর্ণরের পদাভিষিক্ত লোককে স্বেচ্ছানুসারে পাঁচ সিকা খরচ করিতে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু রুসিয়ার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ওরূপ বিবেচনা করেন না। এই মেরামতের জন্য প্রথমতঃ গবর্ণরের সেক্রেটরি প্রধান ইঞ্জিনীয়ারকে সম্ভবতঃ—ব্যয়স্থির করিবার জন্য লিখেন, প্রধান ইঞ্জিনীয়ার অধীনস্থ কর্ম্মচারীকে অগ্নিকুণ্ড দেখিয়া প্রয়োজনীয় সংবাদ দিবার আদেশ করেন, এবং অধীনস্থ ইঞ্জিনীয়ারের রিপোর্ট পাইয়া সেক্রেটরিকে সম্ভবতঃ-ব্যয়ের হিসাব পাঠান। সেক্রেটরি উপরিস্থ কর্ম্মচারীকে উক্ত হিসাবের সহিত পত্র লিখেন। এইরূপ সোপানানুসারে হিসাব সম্রাটের নিকট উপস্থিত হয়। সম্রাট বিবেচনা করিয়া গবর্ণরকে পাঁচসিকা ব্যয় করিবার অনুমতি দেন। এইরূপে দশ বারোবারে ৩০।৪০ তক্তা কাগজ লিখার পর পাঁচ সিকা ব্যয়ে একটা অগ্নিকুণ্ড মেরামত করিবার অনুমতি বাহির হয়!! অবশ্য এরূপ কেহ মনে করিবেন না যে সম্রাটের নিকট

হইতে অনুমতি পাওয়া পর্য্যন্ত মেরামতের কার্য্য স্থগিত রহিয়াছিল। একখানিও পত্র লিখিবার পূর্ব্বেই কার্য্য সমাধা হইয়াগিয়াছিল; সম্রাটের অনুজ্ঞার জন্য অপেক্ষা করিলে শীতকালের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড মেরামত হওয়া ভার হইত। যখন রুসীয় কর্ম্মচারী মাত্রেই চোর ও ঘুষখোর ছিল, তখন এরূপ করিলে সাজিত,কিন্তু যখন রুসীয়গণ তাঁহাদের দেশে ধর্ম্মনীতির বিশেষ প্রাদুর্ভাব বলিয়া অহঙ্কার করেন, তখন এইরূপ নিয়ম বিশেষরূপ দূষণীয় ও লজ্জাকর। রুসীয়শাসনপ্রণালী কেন, সকল বিষয়েরই একটি প্রধান দোষ এই যে দেশ কাল বিবেচনা না করিয়া ফরাশী,জার্ম্মণি ও ইংলণ্ড দেশ হইতে ব্যবস্থা,আচার ব্যবহার গণ্ডায় গণ্ডায় আনা হইয়াছে;—ইহা নানা প্রকার গোলযোগের নিদানভূত। রুসিয়ার কোন একটি কার্য্য করিবার পূর্ব্বে পণ্ডিতমণ্ডলীর পরামর্শ লওয়া হয়; এই সকল পরামর্শে তালমূদ ও কোরান হইতে আরম্ভ করিয়া মিল প্রভৃতির পর্য্যন্ত মত উদ্ধৃত ও সমালোচিত হয়। ইহাতে কার্য্যতঃ যে কি ফল ফলে সকলেই বুঝিতে পারিতেছে। আক্ষেপের বিষয় এই যে অনেকটা আমাদের দেশেও এইরূপ ভাব দেখা দিয়াছে। আমাদের উন্নতিশীল যুবকেরা দেশকালভেদ বিবেচনা না করিয়া বিলাতী লেখকদিগের মতানুসারে এদেশে কার্য্য চালাইতে চাহেন; এই বৃক্ষের ফল রুসিয়ায় ও এদেশে বোধ হয় একইরূপ হইবে। সামাজিক রীতিনীতি সমালোচনার সময় এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ অর্পিত হইবে, এস্থানে আর বাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

রুসিয়ার শাসন-প্রণালীর উন্নতির নিমিত্ত সম্রাট নিকলাস এক প্রকার স্বয়ংশাসন প্রণালী (Self-government) স্থাপিত করেন; ইহাতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই, কারণ রাজকীয় বল ইহার পক্ষ নহে। এই প্রণালীটি রুসীয়দিগের উপযোগী না হওয়ায় ইহার নিস্ফলতার আর একটি কারণ। সকল সময়ে উপযোগিতা বুঝিতে পারা বড় সাধারণ বিচক্ষণতার কার্য্য নহে। এই স্বয়ংশাসন প্রণালীযন্ত্রের নাম zemstvo। ইহা এক প্রকার সভা, ইহার বিশেষ দোষ এই যে ইহার সভ্যের মধ্যে একটিও কার্য্যের লোক নাই; ইহারা অনেকটা আমাদের ন্যায় নিষ্প্রয়োজনীয় তত্ত্বানুসন্ধায়ী; যথার্থ কার্য্যের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ নাই। সেই জন্য ইহার দ্বারা কোন উপকার না হইয়া কেবল কর বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু ইহার দ্বারা অন্য কোন ফল না হউক, কর্ম্মচারীদিগের দোষ আর পূর্ব্ববৎ নাই, অনেক কমিয়া আসিয়াছে। ইহা হইতে একটি বিশেষ উপদেশ লাভ করা যায় এই যে কর্ম্মচারীদিগকে সাধারণের শাসনাধীনে রাখিলে অনেকটা ভাল হয়; ফলতঃ কর্ম্মচারীদিগের দোষ নিবারণের এইটি কেবল এক মাত্র উপায়। সম্রাট নিকলাস স্বয়ং বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কর্ম্মচারীদিগের সাধুতার কিছুমাত্র উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের পর যখন তিনি ঐ কার্য্যের জন্য সাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করেন,

সেই অবধি কর্ম্মচারীদিগের দোষ হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের শাসন কর্ত্তাদিগের এইটি মনে রাখা উচিত; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ইহাঁরা এইটি উপেক্ষা করিয়া নূতন মুদ্রা-যন্ত্র সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা দ্বারা সাধারণের মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা হইতে কেহ মনে করিবেন না যে রুসিয়ার মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা আছে। এক্ষণে এখানে যে বিধি লইয়া আমাদের দেশে মহা আন্দোলন চলিতেছে, রুসিয়ার মুদ্রাযন্ত্রসম্বন্ধীয় নিয়ম তাহা অপেক্ষা অনেক কঠিনতর। সাধারণতঃ রুসিয়ার বিচারকার্য্য অন্যান্য সভ্যদেশের ন্যায়; কেবল রাজবিদ্রোহ সম্বন্ধীয় দোষের এক প্রকার স্বতন্ত্র বিচার হয়। অনেক সময় ঐ দোষে অপরাধী বলিয়া কাহাকেও সন্দেহ হইলে তাহাকে কোন বিচারালয়ে না আনিয়া একেবারে একটি দূরস্থিত দুর্গে সম্রাটের ইচ্ছানুরূপ সময় পর্য্যন্ত কারাবদ্ধ করে। অধিকাংশ সময় সম্বাদপত্রের সম্পাদকদিগের এই রূপ ঘটে। এক দিন কোন সম্বাদপত্রে গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্য কঠিন রূপে সমালোচিত হইল, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা মনে করিলেন বিদ্রোহের সূচনা হইতেছে, পরদিন সম্পাদক ও দুই এক জন প্রধান লেখককে আর কেহই দেখিতে পাইল না; তাহাদের বন্ধুবান্ধব তাহাদিগকে দুই এক দিন অনুসন্ধান করিয়া নিরস্ত হইল। তাহাদের আর কোন সম্বাদ পাওয়া গেল না। হয়ত তাহারা শ্বেত সাগরের উপকূলে কিম্বা দূর সাইবেরিয়াস্থ কোন দুর্গে পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; পত্রের দ্বারাও বন্ধুদের তত্ত্ব লওয়া অসম্ভব।

সম্পাদকের বৈঠক।

১

গভীর গভীরতম হৃদয় প্রদেশে,
নিভৃত নিরালা ঠাঁই, লেশ মাত্র আলো নাই,
লুকানো এ প্রেমসাধ গোপনে নিবসে,
শুদ্ধ যবে ভালবাসা নয়নে তোমার,
ঈষৎ প্রদীপ্ত হয়, উচ্ছ্বসিয়ে এ হৃদয়,
ভয়ে ভয়ে জড়সড় তখনি আবার।

২

শূন্য এই মরমের সমাধি-গহ্বরে,
জ্বলিছে এ প্রেমশিখা চিরকাল তরে,
কেহ না দেখিতে পায়, থেকেও না থাকাপ্রায়,
নিভিবারো নাম নাই নিরাশার ঘোরে।

৩

যা হবার হইয়াছে—কিন্তু প্রাণনাথ!
নিতান্ত হইবে যবে এ শরীরপাত,
আমার সমাধি স্থানে, কোর নাথ কোর মনে,
রয়েছে এ কে দুঃখিনী হয়ে ধরাসাৎ।

৪

যতই যাতনা আছে দলুক আমায়,
সহজে সহিতে নাথ সব পারা যায়,
কিন্তু হে তুমি যে মোরে, ভুলে যাবে একেবারে
সে কথা করিতে মনে হৃদি ফেটে যায়।

৫

রেখো তবে এই মাত্র কথাটী আমার,
এই কথা শেষ কথা, কথা নাহি আর,

(এ দেহ হইলে পাত, যদি তুমি প্রাণনাথ,
প্রকাশো আমার তরে তিলমাত্র শোক,
ধর্ম্মতঃ হবে না দোষী দোষিবে না লোক—
কাতরে বিনয়ে তাই, এই মাত্র ভিক্ষা চাই,
কখনো চাহিনে আরো কোন ভিক্ষা আর,)
যবে আমি যাব ম'রে, চির এ দুঃখিনী তরে,
বিন্দুমাত্র অশ্রুজল ফেল এক বার—
আজন্ম এত যে ভালবেসেছি তোমায়,
সে প্রেমের প্রতিদান, একমাত্র প্রতিদান,
তা বই কিছুই আর দিও না আমায়।

বায়রণ।

১

যাও তবে প্রিয়তম সুদূর সেথায়,
লভিবে সুযশ কীর্ত্তি গৌরব যেথায়,
কিন্তু গো একটী কথা, কহিতেও লাগে ব্যথা,
উঠিবে যশের যবে সমুচ্চ সীমায়,
তখন স্মরিও নাথ স্মরিও আমায়—
সুখ্যাতি অমৃত রবে, উৎফুল্ল হইবে যবে,
তখন স্মরিও নাথ স্মরিও আমায়।

২

কতযে মমতা মাখা, আলিঙ্গন পাবে সখা,
পাবে প্রিয় বান্ধবের প্রণয় যতন,
এহ'তে গভীরতর, কতই উল্লাসকর,
কতই আমোদে দিন করিবে যাপন,
কিন্তু গো অভাগী আজি এই ভিক্ষা চায়,
যখন বান্ধব সাথ, আমোদে মাতিবে নাথ,
তখন অভাগী বলে স্মরিও আমায়।

৩

সুচারু সায়াহ্নে যবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
তোমার সে মনোহরা, সুদীপ্ত সাঁজের তারা,
সেখানে সখা গো তুমি পাইবে দেখিতে—
মনে কি পড়িবে নাথ, এক দিন আমা সাথ,
বনভ্রমি ফিরে যবে আসিতে ভবনে—
ওই সেই সন্ধ্যাতারা, দুজনে দেখেছি মোরা,
আরো যেন জ্বল জ্বল জ্বলিত গগনে।

৪

নিদাঘের শেষা শেষি, মলিনা গোলাপ রাশি,
নিরখি বা কত সুখী হইতে অন্তরে,
দেখি কি স্মরিবে তায়, যেই অভাগিনী হায়
গাঁথিত যতনে তার মালা তোমা তরে।
যে হস্ত গ্রথিত ব'লে তোমার নয়নে
হত তা সৌন্দর্য্য মাখা, ক্রমেতে শিথিলে সখা
গোলাপে বাসিতে ভাল যাহারি কারণে—
তখন সে দুঃখিনীকে কোরো নাথ মনে।

৫

বিষণ্ণ হেমন্তে যবে, বৃক্ষের পল্লব সবে
শুকায়ে পড়িবে খ'সে খ'সে চারি ধারে,
তখন স্মরিও নাথ স্মরিও আমারে।
নিদারুণ শীত কালে, সুখদ আগুন জ্বেলে,
নিশীথে বসিবে যবে অনলের ধারে,
তখন স্মরিও নাথ স্মরিও আমারে।
সেই সে কল্পনাময়ী সুখের নিশায়,
বিমল সঙ্গীত তান, তোমার হৃদয় প্রাণ
নীরবে সুধীরে ধীরে যদি গো জাগায়—
আলোড়ি হৃদয়-তল, এক বিন্দু অশ্রুজল,
যদি আঁখি হ'তে পড়ে সে তান শুনিলে,
তখন করিও মনে, এক দিন তোমা সনে,
যে যে গান গাহিয়াছি হৃদি প্রাণ খুলে,
তখন স্মরিও হায় অভাগিনী ব'লে।

মূর।

আবার আবার কেন রে আমার,
সেই ছেলে বেলা আসে না ফিরে,

হরষে কেমন আবার তা হোলে,
সাঁতারিয়ে ভাসি সাগরের জলে,
খেলিয়ে বেড়াই শিখরী শিরে!
স্বাধীন হৃদয়ে ভাল নাহি লাগে,
ঘোরঘটাময় সমাজধারা,
না, না, আমি রে যাব' সেই স্থানে,
ভীষণ ভূধর বিরাজে যেখানে,
তরঙ্গ মাতিছে পাগল পারা!
অয়ি লক্ষ্মী, তুমি লহ লহ ফিরে,
ধন ধান্য তুমি যা দেছ মোরে,
জাঁকালো উপাধি নাহি আমি চাই,
ক্রীতদাসে মম কোন সুখ নাই,
সেবকের দল যাক্ না সোরে!
তুলে দাও মোরে সেই শৈল পরে,
গরজি ওঠে যা সাগর-নাদে,
অন্য সাধ নাই, এই মাত্র চাই,
ভ্রমিব সেথায় স্বাধীন হৃদে!
অধিক বয়স হয় নে ত মম,
এখনি বুঝিতে পেরেছি হায়,
এ ধরা নহে ত আমার কারণে,
আর মম সুখ নাহি এ জীবনে,
কবে রে এড়াব এ দেহ দায়!
একদা স্বপনে হেরেছিনু আমি,
সুবিমল এক সুখের স্থান,
কেন রে আমার সে ঘুম ভাঙ্গিল;
কেন রে আমার নয়ন মেলিল,
দেখিতে নীরস এ ধরা খান!
এক কালে আমি বেসে ছিনু ভাল,
ভালবাসাধন কোথায় এবে,
বাল্য সখা সব কোথায় এখন—
হায় কি বিষাদে ডুবেছে এ মন,
আশারো আলোক গিয়েছে নিবে!
আমোদ-আসরে আমোদ-সাথীরা,
মাতায় ক্ষণেক আমোদ রসে,
কিন্তু এ হৃদয়, আমোদের নয়,
বিরলে কাঁদি যে একেলা বোসে!
উঃ কি কঠোর, বিষম কঠোর,
সেই সকলের আমোদ রব,
শত্রু কিম্বা সখা নহে যারা মনে,
অথচ পদ্ বা বিভব কারণে,
আমোদ-আসরে মিশেছে সব!
দাও ফিরে মোরে সেই সখা গুলি,
বয়সে হৃদয়ে সমান যারা,
এখনি যে আমি ত্যেজিব তা হ'লে,
গভীর নিশীথ-আমোদীর দলে,
হৃদয়ের ধার কি ধারে তারা!
সর্ব্বস্ব রতন, প্রিয়তমা ওরে,
তোরে ও সুধাই একটি কথা,
বল দেখি কিসে আর মম সুখ,
হেরিয়েও যবে তোর হাসি মুখ,
কমে না হৃদয়ে একটি ব্যথা!
যাক্ তবে সব, দুখে নাহি তায়,
শোকের সমাজ নাহিক চাই,
গভীর বিজনে মনের বিরাগে,
স্বাধীন হৃদয়ে ভাল যাহা লাগে,
সুখে উপভোগ করিব তাই!
মানব-মণ্ডলী ছেড়ে যাবো যাবো,
বিরাগে কেবল, ঘৃণাতে নয়,
অন্ধকারময় নিবিড় কাননে,
থাকিব তবুও নিশ্চিন্ত মনে,
আমারো হৃদয় আঁধারময়!
কেন রে কেন রে হ'ল না আমার,

কপোতের মত বায়ুর পাখা,
তা হ'লে ত্যেজিয়ে মানব-সমাজ,
গগনের ছাদ ভেদ করি আজ,
থাকিতাম সুখে জলদে ঢাকা! বায়রণ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

বঙ্গ-বিজেতা।— শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১৷৹ মাত্র।

এই সুন্দর পুস্তক খানি যদিও আমরা অল্পদিন হইল পাইয়াছি তবুও ইহার সমালোচনা করা বাহুল্যমাত্র। কারণ, উপন্যাস-প্রিয় পাঠক মাত্রেই ইহার চমৎকারিতা ও পারিপট্যের সহিত বিশিষ্টরূপে পরিচিত আছেন।

মাধবীকঙ্কণ।—ঐ—ষ্ট্যানহোপযন্ত্রে মুদ্রিত।

এই পুস্তক খানিও বঙ্গবিজেতার ন্যায় এক খানি ঐতিহাসিক উপন্যাস। কিন্তু ইহাতে উপন্যাসের ভাগ অতি সঙ্কীর্ণ, এবং যতটুকু আছে তাহাও অতি অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু ইহার উপন্যাসের ভাগ সামান্য হওয়াতে কোন ক্ষতি হয় নাই, যেহেতু ইহার ঐতিহাসিক উপাদানটুকু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। অরঙ্গজীবের ভ্রাতৃবিরোধ, তৎসাময়িক রাজপুতদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, দিল্লীর সম্রাটদের আমোদ ও বিলাসপ্রিয়তা সকলই অতি মিষ্ট ও সরল ভাষায় পরিপাটীরূপে চিত্রিত হইয়াছে। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তি ল[illegible]রিয়াছি।

ভার্গব[illegible]কাব্য।—শ্রী গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। আল্‌বর্ট প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ১৷৷৹ মাত্র। এই পুস্তকখানির ছন্দে গ্রথিত শব্দতালিকা দেখিয়া ইহাকে বাঙ্গলায় অমরকোষ বলিয়া আমাদের প্রথমে ভ্রম হইয়াছিল। শেষে গ্রন্থকারের স্বকৃত টীকার সাহায্যে পুস্তকের ভিতর কতকটা প্রবেশ করিতে পারিয়া বুঝিতে পারিলাম যে গ্রন্থখানি একখানি মহাকাব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে গ্রন্থকার অনুগ্রহ করিয়া সকল স্থানের টীকা করেন নাই, সুতরাং আমরা সকল স্থানের অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। যেমন—

"হাসিছে দিগ্বধূবৃন্দ তমোহা মিহিরে
হেরি উদয়াদ্রি চূড়ে, ভূষি সুভূষণে
বাল-বিভাবসু-বসু-রাজী-সুসম্পৃক্ত—
নির্নীর-উদয়-নীরধর-খণ্ড-বাসা,
যথা স্বীয়া-সানুরতা-প্রিয়া, সমাগত
হেরি প্রাণ প্রিয়তম পতিরে (প্রবাসী)
সাগ্রহে সুপরিগ্রহি' মনোজ্ঞ বিগ্রহ
কৌসুম্ভ-রঞ্জিত তনু-অংশুক-সংপিহি
সিহরিয়া সান্দ্রানন্দ সন্দোহের সহ
সুহসিতাননে আসি সম্ভাষে, সুন্দরী।"

আমরা এই বিভীষিকাময় বীচিসঙ্কুল কাব্যাম্বুধি মন্থন করিতে অপারগতা স্বীকার করিলাম।

ডেবিড হেয়ারের জীবনচরিত।

শ্রী প্যারিচাঁদ মিত্র প্রণীত। নূতন আর্য্য যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৵০ আনা! এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানির জন্য আমরা সরল হৃদয়ে গ্রন্থকারকে কৃতজ্ঞতা উপহার দিতেছি। যদিও মহানপ্রকৃতি ডেবিড হেয়ারের নামে বঙ্গবাসী মাত্রেরই দেহ লোমাঞ্চিত হয়, তবুও তাঁহার উদারতা ও মমতার অনেকগুলি কার্য্য বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অনবগত ছিলাম। পুস্তক খানি পাঠ করিয়া হেয়ারসাহেবকে দেবাদিস্ট প্রকৃত বঙ্গমিত্র বলিয়া মনে হয়।

এই গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য অতি মহৎ, ভাষা অতি সরল, এবং মূল্যও অতি সামান্য। সুতরাং ভরসা করি ইহা বঙ্গবাসী মাত্রেই একবার পাঠ করিবেন।

কাশীমাহাত্ম্য।—শ্রী বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। সোমপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৷৷০ আনা। এই পুস্তকখানি খুলিয়া প্রথমেই দেখিলাম "হুগলী জেলার অন্তর্গত বলরামের গড় অর্থাৎ বলাগড় নিবাসী ৺ বলরাম ঠাকুরের কনিষ্ঠাত্মজ ৺ ভৃগুরাম মুখোপাধ্যায়, তস্য পুত্র ৺ কৃষ্ণরাম মুখোপাধ্যায়, তস্য পুত্র ৺ গৌরীচরণ মুখোপাধ্যায়, তস্য পুত্র ৺ দেবীচরণ মুখোপাধ্যায়, তস্য পুত্র ৺ রামধন মুখোপাধ্যায়, তস্য পুত্র শ্রী বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রণীত।" পুস্তকখানিকে মকদ্দামার আর্জি মনে করিয়া আর পড়িতে সাহস হইল না।

আর্য্যদর্পণ।—শ্রী বৈদ্যনাথ বরাট দ্বারা সপ্রমাণ শুদ্ধ যুক্তিমূলক প্রণীত ও প্রকাশিত। কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৷৷০ মাত্র। এই পুস্তকের টাইটেল পেজেই ত বরাটমহাশয় "দ্বারা সপ্রমাণ শুদ্ধ যুক্তিমুলক প্রণীত ও প্রকাশিত" পড়িয়া অর্থ নির্ণয়ে অপারগ হইলাম। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া গ্রন্থকারের চিন্তাশীলতা ও ভাবুকতা কতক সুখ্যাতির যোগ্য মনে হইল। তাঁহার পুস্তকের উদ্দেশ্য তিনি আপনি এইরূপে প্রকটিত করিয়াছেন—"এই সংক্ষিপ্ত আর্য্যদর্পণ একটি ক্ষুদ্রবৃক্ষ স্বরূপ, ব্রহ্মনির্ণয় ইহার মূল, আর্য্যধর্ম্ম সারযুক্ত স্কন্ধ, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শাখা প্রশাখা ও পত্র, রূপক বর্ণনায় ঈশ্বরের সাকার সাকারত্ব—পুষ্প, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা ও বস্ত্র হরণ—ফল, এবং আর্য্য ভাষায় নারায়ণের স্তব—মধুর রস। এই সামান্য বৃক্ষটি আমার ন্যায় অজ্ঞ মালীর দ্বারা রোপিত হওয়ায় ইহাতে পোকামাকড় প্রভৃতি নানাবিধ দোষ জন্মিয়াছে।" কিন্তু আমাদের বোধ হয় এত পোকা মাকড় না জন্মাইতে দিয়া বিনীতস্বভাব মালীমহাশয় যদি বৃক্ষটিকে আদৌ উপড়াইয়া ফেলিতেন তাহা হইলে সাহিত্যক্ষেত্রের বিশেষ কোন ক্ষতি হইত না।

পদ্য লতা।—প্রথম ভাগ। শ্রীপবন চন্দ্র মারিক প্রণীত। বীডন যন্ত্রে মুদ্রিত।

ইহা এক খানি 'সুকুমারমতি শিশুদের পাঠ্য পদ্য গ্রন্থ'। কিন্তু ইহার প্রথম প্রবন্ধ "ঈশ্বরের মহাত্মে" লিখিত আছে—

"চৈতন্য স্বরূপ তিনি, কিন্তু নিরাকার,
উপযুক্ত দিতেছেন সবার আহার।"

সুকুমারমতি শিশুরা ইহার ভাবার্থ কি বুঝিবে? আর যাহারা ভাবার্থ বুঝিতে পারিবে তাহারা সহজেই জিজ্ঞাসা করিবে যে প্রথম পংক্তিতে "কিন্তু" শব্দের সার্থকতা কোথায়?

আর এক স্থলে

"পরিশ্রম পরাঙ্মুখ যে জাতি হইয়া,
স্বভাবজ দ্রব্যে কিন্তু যথেচ্ছা খাইয়া,
উদর পূরণ করে পশুর মতন,
তাদের অসভ্য জাতি [illegible] সর্ব্বজন।"

শিশুদের জন্য ইহ[illegible]ক্ষা ভাষা সরল হওয়া উচিত।

বোম্বাই রায়ৎ।

দ্বিতীয় ভাগ।

রায়তওয়ারী বন্দবস্ত ও তাহার দোষগুণ ভারতীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় সংক্ষেপে এক প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে, এইক্ষণে এই বন্দবস্তের অধীনস্থ প্রজাদিগের অবস্থা আলোচনা করা যাউক। ইহা কাহারো অবিদিত নাই যে বোম্বাই রায়তের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। ফসলের মূল্যবৃদ্ধি—বিশেষতঃ তুলার ব্যবসার উন্নতি বশত ১৮৬০ শাল হইতে ১৮৭০ পর্য্যন্ত রায়তের যে শ্রীবৃদ্ধির চিহ্ন দেখা যাইতেছিল তাহা জিনিসের দরের (পুনঃ) পতন ও স্থানে স্থানে খাজনাবৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। মহারাষ্ট্রেই বল, গুজরাটেই বল, এদেশের কৃষিদল ঋণপাশে এরূপ জড়িত যে তাহা হইতে তাহাদের নিষ্কৃতি লাভের উপায় নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে। মহারাষ্ট্রের মহাজনেরা অধিকাংশ মারওয়াড়ী, গুজরাটে অধিকাংশ বণিক-জাতীয় লোক উত্তমর্ণ ব্যবসায়ী, কোন রায়তের হয়ত বলদ গিয়াছে—বণিক অমনি তাহাকে নূতন বলদ কিনিবার জন্য টাকা ধার দিতে প্রস্তুত, অথবা কোন কুণবীর পুত্রের বিবাহ কিম্বা পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য টাকার প্রয়োজন এই সকল উপলক্ষ্যে মহাজনের আশ্রয় ভিন্ন তাহার গত্যন্তর নাই। অনেক সময় রায়তের গবর্ণমেণ্টের খাজনা দিবার সঙ্গতি হয় না—তাহা না দিলেও তাহার স্বত্ব নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়—অগত্যা তাহাকে বণিকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে যে কোন কারণেই হউক, একবার সাহুকারের * ঋণজালে আবদ্ধ হইলে আর তাহার নিস্তার নাই। মহাজনের নিকট ধার করিতে হইলে মাসে শতকরা দুই টাকা সুদের—নিদান পক্ষে এক টাকার হিসাবে ধার করিতে হয়। ধার করিতে হইলে রায়ত খত লিখিয়া দিতে বাধ্য হয়। সে নিজে ত লেখা পড়ার ধার ধারে না—হিসাব করিয়া ঋণের টাকা নির্ণয় করা—সে সকলি মহাজন ও তাহার আশ্রিত জনের কথার উপর নির্ভর। কখন কখন যে সুদ ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবে তাহা আগে হইতেই আসল টাকার সঙ্গে মিলিত করিয়া ঋণের সংখ্যা নিরূপিত হয়, অর্থাৎ রায়ত হয়ত ৮০ টাকা ধার করিতেছে কিন্তু তাহার ভাবি সুদ কসিয়া হয়ত তাহাকে এক শত টাকার খত লিখিয়া দিতে হয়—তাহার উপর নিয়মিত কাল অতীত হইলে নিয়মিত দরের সুদ সঞ্চিত হইতে থাকে। খত প্রস্তুত হইলে রায়ত হয়ত তাহার নীচে হলাকৃতি চিহ্নে নিজের নাম স্বাক্ষর করে। সেই সময়ে মহাজনের দোকানে যদি কেহ উপস্থিত থাকে কিম্বা রাস্তা হইতে লোক ডাকিয়া তাহাদের নাম

* মহাজনকে এদেশে সাহুকার বলে।

খতের উপর সাক্ষীস্বরূপ স্বাক্ষরিত হয়। অনেকস্থলে লেখক ও সাক্ষীর ব্যবসাই খত লেখা, সাক্ষর করা ও কোর্টে উপস্থিত হইয়া স্বাক্ষ্য প্রদান করা—ইহাদের সাক্ষ্যের কত মূল্য তাহা অনায়াসেই অনুধাবন করা যাইতে পারে। খত লিখিবার সময় রায়তের সঙ্গে সঙ্গে তাহার একজন জামীন উপস্থিত থাকে, ও কখনো বা তাহার বৃদ্ধা মাতা কিম্বা স্ত্রীকে সাহুকার তাহার ঋণপাশে বদ্ধ না করিয়া ক্ষান্ত থাকে না। তাহার কারণ এই, টাকা আদায়ের সুবিধা। বৃদ্ধা মাতার কি গৃহিণীর কারাবাস-ভয়ে রায়ত যেমন করিয়াই হউক ঋণ শোধ করিতে তৎপর হয়। যখন আগামী বৎসরের ফসল প্রস্তুত হয়, আর গবর্ণমেণ্টের টাকা মুখী কিম্বা তলাটীর হস্তে গচ্ছিত হয়, তখন সাহুকার রায়তের দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়। অনেক কাকুতি মিনতির পর রায়ত আপনার সংসার খরচের জন্য যৎকিঞ্চিৎ হাতে রাখিয়া অবশিষ্ট সুদের টাকা বলিয়া হয়ত মহাজনের হস্তে অর্পণ করে। দেনা বৃদ্ধি হইলে মহাজন হয়ত সমস্ত ফসলই গৃহে লইয়া যায়, ও রায়ত যখন আপনার পরিবার পোষণের জন্য অল্প কিছু প্রার্থনা করে তখন সাহুকার তাহাকে বুঝাইয়া দেয়—তোর ভাবনা কি? তোর যখন যাহা প্রয়োজন হইবে আমার দোকান হইতে সকলি পাইবি। পর বৎসরে শস্য বপন করিবার বীজ চাই, রায়ত অমনি মহাজনের দ্বারে গিয়া উপস্থিত। মহাজন তাহাকে বীজ ধার দেয়; ধারের নিয়ম এই যে, শস্য পরিপক্ক হইলে ঋণের দ্বিগুণ ত্রিগুণ শস্য সুদ সমেত প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। এইরূপে বীজ বপনের জন্য—জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য প্রতিবৎসর তাহাদের বণিকের দোকানে ধার করিতে হয়। পর বৎসর ফসল কাটিবার সময় উপস্থিত, কিন্তু এইরূপে গবর্ণমেণ্টের খাজনা দিয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হয় তাহা গত বৎসরের দেনার সুদ পরিশোধ করিতে গিয়া সকলি নিঃশেষিত হইয়া যায়। এই সুদ ক্রমে মূল ধনের উপর সঞ্চিত হইয়া কর্জ্জ ক্রমিক বাড়িয়া যায়, ও যখন খত তামাদি হইবার উপক্রম হয় তখন মহাজন অবসর বুঝিয়া সুদের হিসাব করিয়া বর্দ্ধিত আকারে এক নূতন তমসুক প্রস্তুত করিয়া লয়। এবারকিন্তু সহজ তমসুকে সাহুকার সন্তুষ্ট নয়, তাহার সঙ্গে বন্ধক চাই—রায়তের ক্ষেত্র ও বসত বাটী বন্ধক লিখিয়া এক নূতন তমসুক লিখিত ও স্বাক্ষরিত হয়। এই প্রকারে গরীব বেচারী আটে ঘাটে এরূপ বদ্ধ হইয়া পড়ে যে তাহার পলাইবার পথ থাকে না। অবশেষে যখন দেনা পরিশোধ করিবার আর তাহার কিছুমাত্র সঙ্গতি থাকে না, তখন মহাজন তাহার তমসুক লইয়া রায়তের বিরুদ্ধে আদালতে মকদ্দামা উপস্থিত করে। এই সকল মকদ্দামার অধিকাংশ রায়তের অবর্ত্তমানেই নিষ্পত্তি হয়। খতের লেখক ও এক স্বাক্ষরকারীর সাক্ষ্য লইয়া জজ স্বকীয় কোর্ট হইতে ডিক্রী বাহির করেন। সেই ডিক্রী জারী হইয়া রায়তের ঘর জমি সকলি অল্প মূল্যে নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়। অনেকসময় মহাজন নিজেই হয়ত তাহার সমুদয় সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লন। মহাজন রায়তের জমী লইয়া কি করিবেন, তিনি কিছু নিজ হাতে চাস করিতে পারেন না, সুতরাং রায়তকেই হয়ত তাহা ইজারা দিয়া পাট্টা লিখিয়া লন। যে রায়ত এক কালে ভূস্বামী ছিল সে হয়ত মহাজনের কোরপা প্রজা হইয়া সেই জমি উগভোগ করে, ও কখনো বা তাহার দাসত্ব করিয়া যথাকথঞ্চিৎরূপে দিনপাত করিতে বাধ্য হয়।

রায়ত-মক্ষিকার উপর মহাজন-মাকড়সার জাল অল্পে অল্পে কিরূপে বিস্তৃত হয় তাহা বলা হইল। কিন্তু এই ত গেল সাধারণ নিয়ম। এতৎব্যতীত কত সময় কত জাল তমসুক—হিসাবে কত প্রতারণা—মিথ্যা মকদ্দমা প্রভৃতি সকল অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া মহাজন রায়তের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হয়; তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আদালতের দফতরে দেখিতে পাওয়া যায়।

রায়তেরা যে বিষম ঋণভার-প্রপীড়িত তাহার উদাহরণ দক্ষিণ রায়তদের উপর যে কমিসন বসিবার কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে তাহার রিপোর্টে অনেক সংগৃহীত দেখা যাইবে।

মহাজনদের খাতা হইতে কতকগুলি কৃষকের কর্জের হিসাব পর্য্যবেক্ষণে প্রকাশ পাইতেছে যে যে টাকা ধার দেওয়া গিয়াছে তাহার সমষ্টি ৪৯১৭ টাকা—যত টাকা শোধ হইয়াছে তাহার সমষ্টি ৫৯১৮ আর তাহা দিয়া এখনো ৫৯০৬ টাকা বাকি দেনা করিয়াছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত মনে রাখিতে হইবে যে প্রজারা এই বলিয়া অনেক সময় হাহাকার করে যে খতপত্রে যত টাকা দেনা বলিয়া লিখিত আছে তাহার সম্পূর্ণ তাহারা পায় নাই, কিম্বা ধার শুধিতে তাহারা যত টাকা মহাজনকে গণিয়া দিয়াছে তাহা তাহাদের হিসাবে জমা হয় নাই।

ঐ রিপোর্ট হইতে আরো কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেখাইলে রায়তদের দৈন্যাবস্থা পাঠকদিগের বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

কত্তিরে পরিবার, যাহারা পার্ণেজ গ্রামের পাটেলকী কর্ম্ম বংশপরম্পরা ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহারা দক্ষিণ দেশের নামাঙ্কিত পরিবার মধ্যে গণ্য ছিল। বার বৎসর হইল তাহাদের গৃহস্বামী ২০০ টাকা ধার করেন। তিনি ৩৩৫ টাকা প্রত্যর্পণ করেন, বাকি ৩৮৫ টাকার জন্য তাহার উপর মকদ্দামা আনা হয়, তাহাতে ভূমি সম্পত্তি—প্রায় ৪০ বিঘা জমি নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়, ও এক্ষণে তিনি দাসত্ব করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। বালাজী আট টাকা ধার করিয়া ১৫টাকা দেনা পরিশোধ করেন। মহাজন তাঁহার উপর ৩০ টাকা ডিক্রী পাইয়া সেই ডিক্রীজারী করিয়া তাহার ৪০বিঘা জমি ও ১২ টা বলদ বিক্রী করাইয়া স্বয়ং তাহা কিনিয়া লন। শ্রীপতি এক মন দানা (দাম তার বড় জোর ৪ টাকা) ধার করিয়া প্রত্যর্পণ করেন। সুদের জন্য তাঁহাকে ১৫ টাকার খত সুদ শুদ্ধ লিখিয়া দিতে হয়। আবার দেনা শুধিবার জন্য উত্তাক্ত হইলে সে দশ টাকা নগদ দিয়া ২৫ টাকার এক নূ-

তন খত লিখিয়া দিতে বাধ্য হয়। ২৫টাকা শুধিবার জন্য মহাজনের চাকরীতে নিযুক্ত হয়, ও অবশেষে মকদ্দমার হাঙ্গামে পড়িয়া তাহার বসতবাটী ও জমি ৬ টাকায় বিক্রয় হইয়া যায়। রাওজী ১৫ বৎসর পূর্ব্বে ৬০ টাকা ধার করে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সে মহাজনকে ১০০ টাকা নগদ ২২৫ টাকার শস্য ৪ টা বলদ ১ টা ঘোড়া ও তিনটা ক্ষেত্র বন্ধক দিয়াও এখনো সে দেনা হইতে নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হয় নাই। ১১ বৎসর পূর্ব্বে আনন্দজী দোকানের দেনার জন্য ২৫ টাকার একখত লিখিয়া দেয়, আর এক্ষণে তাহার আবশ্যক কতকগুলি জিনিস পত্র আছে কিন্তু হাতে নগদ টাকা নাই। সে তাহার মহাজনকে একটী ক্ষেত্র ৮ বলদ ও ৪ গো দান করিয়াছে। একে একে ৫০।১০০ ২০০।৩০০।৩৫০ টাকার খত লিখিয়া দিয়াছে ও এক্ষণে তাহার দেনা ৫০০ টাকায় বর্দ্ধিত হইয়াছে। লক্ষ্মণ ৮টাকার কাপড় কিনিয়া ঋণগ্রস্ত হয়—রামজী তাহার জামীন হয়। লক্ষ্মণ তিন টাকা শোধ দিয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যায়। সাহুকার রামজীকে পেড়াপীড়ি করাতে সে তিন বৎসর হইল ২২টাকার এক খত লিখিয়া দিতে বাধ্য হয়। গত বৎসরে সেই খতের সর্ত্তে তাহার উপর মকদ্দামা আনিয়া মহাজন খরচা সমেত এক ৫৬ টাকার ডিক্রী করিলেন। ডিক্রীজারী হইবার পরে সে ২২ টাকা নগদ দিয়া ৪৫ টাকার এক নূতন খত লিখিয়া দেয়। বিবি জান নামক একজন বৃদ্ধা বিধবা স্ত্রী তার পুত্রের বিবাহের জন্য অনেক বৎসর হইল ১৫০ টাকা কর্জ্জ করে। ১৩ বৎসর পূর্ব্বে এই দেনার জন্য সে ৩০০ টাকার এক বন্দক খত লিখিয়া পাতকুয়া শুদ্ধ ২০ বিঘা জমি তাহার হস্তে বন্দক রাখে। সেই অবধি মহাজন তার সমুদায় উপস্বত্ব ভোগ করিতেছে, সে হিসাবও দিবে না, জমি ফেরত দিতেও চায় না। বিশ বৎসর হইল আজু নামক এক ব্যক্তি ১৭ টাকা নগদ ও এক মন দানা ধার করিয়াছিল। সেই দেনা শোধ করিতে সে ভিন্ন ২ সময়ে ৫৬৭ টাকা দিয়াছে, অনেকগুলি খত লিখিয়া দিয়াছে তাহার দুইটির দরুণ ৮৭৫ টাকা এখনো পর্য্যন্ত অদেয় রহিয়াছে।

বোম্বাই রায়তের অবস্থা কতদূর শোচনীয় তাহা উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি হইতে সহজে প্রতীয়মান হইবে। এইরূপ ধার্য্য হইয়াছে * যে, কোন এক প্রদেশে ৬০০ জন রায়তের অবস্থা দেখিতে গেলে তাহাদের ঋণের পরিমাণ ৩ কোটি টাকারও অধিক দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ তাহাদের দেনা গবর্ণমেণ্টের সদর খাজনার ১৬ গুণ ও মোট বার্ষিক উপস্বত্বের প্রায় ১৷৷০ গুণ হইবে। ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে যে বিগত ১৫ বৎসরের মধ্যে যে কালের প্রারম্ভে মহারণী স্বয়ং রাজ-ভার গ্রহণ করাতে সকলেই রায়তের ভাবী মঙ্গলের প্রত্যাশা করিতেছেন, যে কালের অভ্যন্তরে বিশুদ্ধ আইন ও আদালত সকল প্রতিষ্ঠিত হইল কোথায় তাহাতে রায়তদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে-না তাহাদের ঋণভার শতগুণ

*Earmine and delt in India Nineteneth century september. 1977.

বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অনেক সময় মহাজনে ডিক্রীজারী করিয়া তাহার ঋণের ভূমি সম্পত্তি নিলামে বিক্রী করিয়া অল্প মূল্যে স্বয়ং কিনিয়া লয় তাহাতেও ডিক্রীর সমুদয় টাকা পরিশোধ হয় না। হতভাগ্য রায়তকে তাহার নিজের জমি অনেক খাজনা দিয়া মহাজনের নিকট হইতে পাট্টা লইয়া ভোগ করিতে হয়। না হয়ত জন্মভূমি ছাড়িয়া বিদেশে গিয়া তাহাকে নবজীবন আরম্ভ করিতে হয়। কখন কখন সে কতক বৎসরের জন্য হয়ত মহাজনের দাসত্ব স্বীকার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হয়। কমিসনরগণ একজন রায়তের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে একজন রায়তের সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গেলে সে নিজে ও তাহার স্ত্রী বার্ষিক খাওয়া, তামাক ও একখানা করিয়া কম্বলের বিনিময়ে ১৩ বৎসর পর্য্যন্ত তাহার দেশ বিদেশ দাসত্ব স্বীকার করিয়া খত লিখিয়া দেয়।

কমিসনরগণ রায়তদের এইরূপ দুর্দ্দশার অনেক গুলি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গৃহকার্য্য ও উৎসব ক্রিয়ার জন্য দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ধার কর্জ্জ করা—গবর্ণমেণ্টের খাজনা আদায়ের কড়াক্কর নিয়ম—শস্য বিক্রয়ের উপযুক্ত বাজারের অভাব, এই সকল তাহার মধ্যে অবশ্য ধর্ত্তব্য।

রায়তদের দুরবস্থার প্রধান কারণ রায়তের অজ্ঞান ও ভীরুতা আর মহাজনের অত্যাচার। আদালত সকল এই অত্যাচারের এক অব্যর্থ হাতিয়ার। দুঃখের বিষয় যে আদালতে ন্যায় বিতরণ করিয়া কোথায় এই অত্যাচার নিবারণ করিবে, না তাহা হইতেই অন্যায় অত্যাচার আরো প্রশ্রয় পায়। আদালতের যে আইন ও কার্য্যবিধি তাহাতে গরীবের উপর ধনীর জয়—নিরীহ অজ্ঞানের উপর স্বার্থপর প্রখর-বুদ্ধির জয় এত ধরা কথা। ন্যায়ান্যায়-বিচারহীন বাদী যখন এক জন অজ্ঞান দীন হীন রায়তের বিরুদ্ধে মকদ্দমা উপস্থিত করে তখন সেই রায়তের পরাজয়ই অবশ্যম্ভাবী বলা যাইতে পারে। আইন আবার রায়তের উপর এরূপ খড়্গহস্ত যে মহাজনে একবার তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী বাহির করিতে পারিলেই তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইতে পারে—তাহার ঘর দ্বার ভূমি সম্পত্তি সমুদয়ই বিক্রীত হইয়া যায় ও অবশেষে হয়ত দেনার জন্য তাহাদের কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। এদিকে আবার বিচারপতির হাতে যে অগাধ কর্ম্মভার, আদালতের যেরূপ কার্য্যপ্রণালী তাহাতে প্রত্যেক মকদ্দমার তন্ন তন্ন বিচার হইয়া উঠা এক প্রকার অসম্ভব—তাঁহারা ন্যায় অন্যায় না দেখিয়া আইনের প্রতিই দৃষ্টি করেন—তাঁহারা আইন মতে কার্য্য করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট, সত্য-নির্ণয়ের জন্য সময় ব্যয় সময়ের অপব্যয়ই বিবেচনা করেন।

আদালতে যে অর্থী প্রত্যর্থী উপস্থিত হয়েন তাঁহারা আইনের চক্ষে উভয়েই সমান। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রায়ত ও মহাজনের মধ্যে যে বিবাদ তাহা দুগ্ধপোষ্য শিশু ও বলিষ্ঠ পাহালওয়ানের মল্ল যুদ্ধের ন্যায়।

মকদ্দমার কার্য্য-প্রণালী যতই সহজ হউক না কেন, সামান্য রায়তের পক্ষে তাহাই নিতান্ত দুরূহ, তাহাতেই সে থত মত খাইয়া যায়। যদি কোন রায়ত মহাজনের বিরুদ্ধে দ্বন্দ-যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হয়—প্রথমতঃ তাহাকে গ্রাম ছাড়িয়া, কাজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কত দূরে আসিয়া সংগ্রাম করিতে হইবে—তার পর স্ট্যাম্পের ব্যয় ও উকীল খরচা, কত কারণে মকদ্দমা স্থগিত হইতেছে ও তাহার পুনঃপুনঃ আদালতে আসিয়া কষ্ট ভোগ—তার পর নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করা সেও তাহার পক্ষে সহজ নহে। এই সকল কারণে বুঝিতে পারা যায় মকদ্দমার সময় কেন প্রতিবাদিগণ প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে। নথি অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে শত করা ৯০ মকদ্দমা রায়তের অবর্ত্তমানেই নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। আর এই সকল ধার কর্জ্জের মামলায় শতের একটাতে যদি রায়তে জয়লাভ করিতে পারে তাহাই ঢের অর্থাৎ একশতের মধ্যে এক জন রায়ত যদি মহাজনের ষড়চক্রের বিরুদ্ধে জয়লাভে সমর্থ হয় তবে তার ভাগ্য বলিতে হইবে। এ অতি ভয়ানক কথা। ফৌজদারী মকদ্দমায় এ অপেক্ষা সুবিচারের সম্ভাবনা। যদি চুরির অভিযোগ আনিয়া কাহারো বিরুদ্ধে নালিশ করা যায় সে হয়ত দুই এক মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে, কিন্তু সে বিচারের সময় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সাক্ষীদের জেরা করিতে পারে; শত্রুর অভিযোগ খণ্ডন করিতে পারে—আপনার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হয়।

মকদ্দমার ব্যয়বাহুল্য হেতু যে রায়তেরা অনেক সময় মকদ্দমা চালাইতে অক্ষম হইয়া মিথ্যাবাদী বাদীর নিকটেও পরাভূত হয় তাহা রায়ত কমিসনরগণ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে মকদ্দমার ব্যয়াধিক্য গরীব রায়তদের পক্ষে গুরু-ভার-জনক। এই ব্যয় যদি মকদ্দমার ন্যায্য খরচার অধিক না হইত তবে কিছু বলিবার থাকিত না। কিন্তু দেখিতে গেলে স্ট্যাম্প ও কোর্ট ফী হইতে যে রাজস্ব উৎপন্ন হয় তাহা হইতে মূল ও আপীল কোর্টের সমুদয় খরচা বাদেও এই বোম্বাই প্রেসিডেন্সির জন্যই প্রায় ৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হয়।

মকদ্দমার ব্যয় বাহুল্য প্রতিপাদন করিবার জন্য এক্ষণকার আইন অনুসারে প্রতিবাদীর উপর কি কি খরচা পড়ে তাহা দেখাইলেই যথেষ্ট হইবে। মনে কর এক খতের টাকা আদায়ের দাওয়া। প্রতিবাদীর বক্তব্য এই যে খতের টাকা সে পায় নাই। এই কথা সমর্থন করিবার জন্য তার চারি সাক্ষীর প্রয়োজন। সমন জারী হইয়াও তাহাদের মধ্যে এক জন সাক্ষী উপস্থিত হয় নাই। ইহাও অনুমান করা যাউক যে সেই মকদ্দমায় প্রতিবাদীর পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য এক জন উকীল নিযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ হইলে প্রতিবাদীর যে খরচ পড়িবে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।—

	২৫ টাকার মকদ্দমায়	৫০ টাকার মকদ্দমায়
আরজীর উত্তর	,, ১	,, ৮
উকীল পত্রের উপর কোর্ট ফী	,, ৮	,, ৮
২ আনার হিসাবে ৪ সাক্ষীর সমন খরচ	,, ৮	,, ১
৩ আনার হিসাবে সাক্ষীর ভাতা খরচ	,, ১২	,, ১২
এক জন সাক্ষীর ওয়ারেণ্ট খরচ	,, ৪	,, ৮
নকলের জন্য কোর্ট ফী ইত্যাদি	,, ১২	,, ১২
উকীলের ফী	১ ,, ৪	২
সমষ্টি	৪ ,, ১	৬ ৩

উল্লিখিত তালিকা দৃষ্টে প্রমাণ হইবে যে ২৫ টাকার মকদ্দমায় প্রায় দাওয়ার ষষ্ঠাংশ খরচ—৫০ টাকার মকদ্দমায় প্রায় অষ্টমাংশ। এক্ষণে যে স্ট্যাম্প সংক্রান্ত আইন প্রবর্ত্তিত হইবার কথা হইতেছে তাহার বিধানানুসারে মকদ্দমার খরচ আরো বর্দ্ধিত হইবে। এই ব্যয়ভার লইয়া গরীব রায়তেরা চলৎশক্তি হীন। যাহাতে তাহারা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিচারালয়ে সহজে উপস্থিত হইতে পারে তাহার জন্য মকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যয়ের হ্রাস করা নিতান্ত আবশ্যক। নতুবা তাহাদের নিকট হইতে ন্যায়ের দ্বার এক প্রকার রুদ্ধ করা হয়। এইক্ষণকার আইন অনুসারে যে সকল খরচা বাদী প্রতিবাদী উভয়কেই বহন করিতে হয় তাহা এইঃ—

১। কোর্টফী আইন অনুসারে আরজী দরখাস্ত-নকল প্রভৃতির উপর কোর্টফী।

২। শমন প্রভৃতির জন্য নির্দ্ধারিত কোর্ট ফী।

৩। সাক্ষীর ভাতা খরচ।

৪। ডাকের খরচ।

৫। উকীলের ফী।

৬। নকল লইবার খরচ।

ইহার প্রত্যেক বিষয়ে খরচ কমাইবার দিকে আইনকর্ত্তাদিগের লক্ষ্য থাকা উচিত। বিশেষতঃ অল্প টাকার মকদ্দমা সংক্রান্ত ফীর স্বল্পীকরণ অবশ্য কর্ত্তব্য। দুই জন ধনীর মধ্যে মকদ্দমা উপস্থিত হইলে উকীল মোক্তার আটর্ণীগণ ভূরি ভোজন করিয়া-লন তাহাতে তত ক্ষতি নাই কিন্তু ন্যায়-প্রার্থী গরীবের পথের কণ্টক তুলিয়া না দিলে তাহার আর কোন রূপে নিস্তার নাই। বরং গবর্ণমেণ্টের উচিত যে এই সকল লোকদের বিনা বেতনে উকীল পাইবার সুবিধা করিয়া দেন—তাহা হইলে বাস্তবিকই তাঁহাদের রাজোচিত কার্য্য হয় ও তাঁহারা সহস্র সহস্র প্রজার আশীর্ব্বাদের পাত্র হয়েন। বিচারালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহই ষ্টাম্প ও কোর্টফী গ্রহণের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অর্থী প্রত্যর্থীর নিকট হইতে টাকা লইয়া সাধারণ রাজস্ব বর্দ্ধিত করা কখন ন্যায়-পরায়ণ সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নহে।

আদালতে মকদ্দমা আনিবার দরুণ যে অর্থনাশ ও মনস্তাপ তাহা হইতে মুক্ত করিবার এক সহজ উপায়, সালিসী বিচারের উত্তেজনা। গ্রামের পাঁচজনে মিলিয়া বিবাদ-ভঞ্জন-প্রথা এদেশের চিরন্তন প্রথা।

জাতি-সংক্রান্ত ও অন্যান্য বিবাদে এখনো পর্য্যন্ত ইহা প্রচলিত দেখা যায়। মহারাষ্ট্রীয় রাজত্ব কালে পঞ্চায়তের বিচারের উপর লোকেরদের বিশেষ আস্থা ছিল। এদেশে কথায় বলে "পঞ্চ পরমেশ্বর" অর্থাৎ পঞ্চের বিচার ঈশ্বরের বিচার সমান। Vox populi vox dei. মহারাষ্ট্রীয়দের আমলে সামান্যতঃ গ্রামের পঞ্চায়ত কর্ত্তৃক সকল দেওয়ানী মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইত—হয় বাদী প্রতিবাদী স্বয়ং নয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষগণ সেই সকলের মীমাংসা পঞ্চায়তের হস্তেই সমর্পণ করিতেন। বেতনভুক্ কর্ম্মচারিগণ প্রায়ই সে সকল কাজে হস্তক্ষেপ করিতেন না। এপ্রদেশে ইংরাজ রাজ্যের প্রারম্ভে কর্ত্তৃপক্ষগণ এই রীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন। খৃষ্টাব্দ ১৮২৭ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ পঞ্চায়তের উপরেই দেওয়ানী মকদ্দমার ভার নিক্ষেপ করিতেন,পঞ্চায়তের হুকুম অনুমোদন ও জারী করাই তাঁহাদের কার্য্য ছিল। ১৮২৭ এর দেওয়ানী আইন বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে প্রচলিত হইলে পঞ্চায়ত সংক্রান্ত নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হইয়া এক স্বতন্ত্র আইন (১৮২৭ এর ৭) সংসৃষ্ট হয়। লোকের মধ্যে পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ যাহাতে আপসে মিটিয়া যায় তাহার উত্তেজনা দেওয়াই ঐ আইনের প্রধান উদ্দেশ্য। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ পঞ্চায়তের কার্য্যভার গ্রহণে আদিষ্ট। সত্য নিরূপণের জন্য যেরূপ প্রমাণ ও বিচারের আবশ্যক সেই সকল প্রমাণ সংগ্রহ করা ও সেইরূপ বিচার অবলম্বন করা পঞ্চায়তের ক্ষমতাধীন ছিল ও তাহাদের নিকট সাক্ষী হাজির করিবার ভার আদালতের উপর। তাহাদের ব্যবস্থার উপর ষ্ট্যাম্প ছিল না ও তাহা আদালতে দাখিল হইলে ডিক্রীর সমান ফলোপধায়ী। তাহার উপর আপীল ছিল না। ১৮৫৯ এর ৮ আইন প্রচলিত হওয়া পর্য্যন্ত ঐ আইন জারী ছিল, ক্রমে তাহার নিয়ম সকল শিথিল হইয়া এই পঞ্চায়ত-প্রথা বিলুপ্তপ্রায় হইয়া অসিয়াছে।

সৌভাগ্য ক্রমে মহারাষ্ট্রীয় কতকগুলি দেশানুরাগী ব্যক্তি এই পুরাতন প্রথা পুনরুদ্দীপ্ত করিতে তৎপর হইয়াছেন ও তাঁহাদের যত্নে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের স্থানে স্থানে সালিসী কোর্ট সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল কোর্ট স্থাপন করিবার প্রযত্ন কয়েক বৎসর হইল পুণা জিলায় ইদাপুর নগরে প্রথম আরম্ভ হয়। এই সকল কোর্ট জন সাধারণের এত প্রার্থনীয় ও তখনকার আইন তৎস্থাপন পক্ষে এরূপ অনুকূল ছিল যে দুই বৎসরের মধ্যে পুণা, সাতারা, সোলাপুর, অহমদ নগর, যানা, রত্নাটগারী নামক, আহমদাবাদ প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে সালিসী কোর্ট সকল স্থাপিত হয় ও তাহাদের শাখা আরো অন্যান্য স্থানে বিস্তারিত হয়। জানুয়ারি ১৮৭৬ শালে পুণার 'লওয়াদ' কোর্টের কার্য্যারম্ভ হয়। পুণানগরবাসীদের এক সাধারণ সভাতে বিরেশী জন নানা শ্রেণীস্থ ভদ্রলোক কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েন। ইহাদের মধ্যে এক কিম্বা একাধিক জনকে বাদী প্রতিবাদিগণ ইচ্ছামত বাছিয়া লইয়া আপনার বিবাদ নিষ্পত্তির ভার অর্পণ করিতে পারেন। বিচারকগণের পালায় পালায় অধিবেশন হয় ও তাঁহারা বিনা অর্থে কার্য্য করেন। এই পুণা কোর্টে দুই বৎসর মধ্যে প্রায় ৩সহস্র মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে। এই ৩০০০ মকদ্দমা স্বল্প ব্যয়ে আপসে মিটিয়া গেল, আদালতে যাইতে হইলে কত অর্থ ও সময় ব্যয়—কত মিথ্যাসাক্ষী, কিরূপ মনঃপীড়া, এই সকল নিবারিত হইল—একি সামান্য লাভ!—এবিষয়ে পুণানিবাসী গণেশ বাসুদেব জোশী একজন প্রধান উদ্যোগী। এই দেশহিতৈষী ব্যক্তি ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া এই শুভ কার্য্যে দেশীয়দের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবার জন্য যত্ন ও পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করেন নাই।

শ্রীস—

করুণা।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্ন। রৌদ্র ঝাঁঝাঁ করিতেছে। রাশি রাশি ধূলি উড়াইয়া গ্রামের পথ দিয়া মাঝে মাঝে দুই একটা গরুর গাড়ি মন্থর গমনে যাইতেছে। দুই এক জন মাত্র পথিক নিভৃত পথে হন্ হন্ করিয়া চলিয়াছে। স্তব্ধ মধ্যাহ্নে কেবল একটি গ্রাম্য বাঁশীর স্বর শুনা যাইতেছে, বোধ হয় কোন রাখাল মাঠে গরু ছাড়িয়া দিয়া গাছের ছায়ায় বসিয়া বাজাইতেছে।

করুণা সমস্ত রাত চলিয়া চলিয়া শ্রান্ত হইয়া গাছের তলায় পড়িয়া আছে। করুণা যে কোন কুটীরে আতিথ্য লইবে, কাহারো কাছে কোন প্রার্থনা করিবে সে স্বভাবেরই নয়। কি করিলে কি হইবে, কি বলিতে হয়, কি কহিতে হয়, তাহার কিছু যদি ভাবিয়া পায়। লোক দেখিলে সে ভয়ে আকুল হইয়া পড়ে—এক এক জন করিয়া পথিক চলিয়া যাইতেছে, করুণার ভয় হইতেছে, এইবার এই বুঝি আমার কাছে আসিবে, ইহার বুঝি কোন দুরভিসন্ধি আছে। বেলা প্রায় তিন প্রহর হইবে, এখনো পর্য্যন্ত করুণা কিছু আহার করে নাই। পথশ্রমে, ধূলায়, অনিদ্রায়, অনাহারে, ভাবনায় করুণা এক দিনের মধ্যে এমন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, এমন বিষণ্ণ বিবর্ণ মলিন শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, যে দেখিলে সহসা চিনা যায় না।

ওই এক জন পথিক আসিতেছে,দেখিয়া ভাল মনে হইল না, করুণার দিকে তার ভারি নজর, বিদ্যাসুন্দরের মালিনী মাসীর সম্পর্কের একটা গান ধরিল, কিন্তু এই জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিপ্রহর রসিকতা করিবার ভাল অবসর নয় বুঝিয়া সেত গান গাইতে গাইতে পিছন ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল। আর এক জন আর এক জন

আর এক জন এইরূপ একে একে করিয়া কত পথিক চলিয়া গেল। এপর্য্যন্ত করুণা ভদ্র পথিক এক জনো দেখিতে পায় নাই—কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! ওই একজন প্যাণ্টলুন চাপ্‌কানধারী আসিতেছে, অনেক সময়ে ভদ্রলোকদের (ভদ্র কথা সাধারণ অর্থে যেরূপে ব্যবহৃত হয়) যত ভয় হয় এত আর কাহাদেরো নয়। ওই দেখ করুণা যে গাছের তলায় বসিয়াছিল সেই দিকেই আসিতেছে, করুণাত ভয়ে আকুল, মাটির দিকে চাহিয়া থর থর কাঁপিতে লাগিল। পথিকটিত বলা নয় কহা নয়, অতি শান্ত ভাবে আসিয়া সেই গাছের তলাটিতে আসিয়া বসিল কেন? বসিতে কি আর জায়গা ছিল না, পথের ধারে কি আর গাছ ছিল না? পথিকটি স্বরূপ বাবু। স্বরূপ বাবুর স্ত্রীলোকদিগের প্রতি যে একটা স্বাভাবিক টান ছিল তাহারই আকর্ষণ এড়াইতে না পারিয়া গাছের তলায় আসিয়া বসিয়া ছিলেন। তিনি জানিতেন না যে করুণাকে সেখানে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু যখন করুণাকে দেখিলেন, চিনিলেন। তখন তাঁহার বিস্ময়ের ও আনন্দের অবধি রহিল না। করুণা দেখে নাই,পথিকটি কে। সে ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে, সেখান হইতে উঠিয়া যাইবে যাইবে মনে করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। কিছুক্ষণত বিস্ময় ও আনন্দের তোড় সামলাইতে গেল, তার পর স্বরূপ অতি মধুর গদ গদ স্বরে কহিলেন "করুণা"। করুণা এই সম্বোধন শুনিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিল, পথিকের দিকে চাহিল—দেখিল স্বরূপ বাবু! তাহার চেয়ে একটা সাপ যদি দেখিত করুণা কম ভয় পাইত। করুণা কিছুই উত্তর দিল না। স্বরূপ অনেক কথা বলিতে লাগিল, এ কয় রাত্রি সে করুণার জন্যে কত কষ্ট পাইয়াছিল তাহার সমস্ত বর্ণনা করিল। সেই সুখ-রাত্রে তাহাদের প্রেমালাপের যখন সবে সূত্রপাত হইয়াছিল, এমন সময়ে ভঙ্গ হওয়াতে অনেক দুঃখ করিল, সে অতি হতভাগ্য, বিধাতা তাহাকে চির জীবন দুঃখী করিবার জন্যই বুঝি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার কোন আশাই সফল হয় না। অবশেষে, করুণা নরেন্দ্রের বাড়ি হইতে যে বাহির হইয়া আসিয়াছে, ইহা লইয়া অনেক আনন্দ প্রকাশ করিল—কহিল, আরো ভালই হইয়াছে, তাহাদের দুই জনের যে প্রেম যে স্বর্গীয় প্রেম, তাহা নিষ্কণ্টকে ভোগ করিতে পারিবে আরো এমন অনেক কথা বলিল, তাহা যদি লিখিয়া লওয়া যাইত, তাহা হইলে অনেক বড় বড় নভেলের রাজপুত, ক্ষত্রিয়, বা অন্যান্য মহা মহা নায়কের মুখে স্বচ্ছন্দে বসানো যাইত, কিন্তু করুণা তাহার রসাস্বাদন করিতে পারে নাই।

স্বরূপ এলাহাবাদে যাইবে, তাই ষ্টেষণে যাইতেছিল পথের মধ্যে এই সকল ঘটনা। স্বরূপ প্রস্তাব করিল, করুণা তাহার সঙ্গে পশ্চিমে চলুক্ তাহা হইলে আর কোন ভাবনা ভাবিতে হবে না। করুণা কাল রাত্রি হইতে ভাবিতে ছিল, কোথায় যাইবে—কি করিবে কিছুই ভাবিয়া

পায় নাই—আজিকার দিনত প্রায় যায় যায়, রাত্রি আসিবে তখন কি করিবে, কত প্রকার লোক পথ দিয়া যাওয়া আসা করিতেছে, এই সকল নানান্ ভাবনার সময় এ প্রস্তাবটা করুণার মন্দ লাগিল না। ছেলে বেলা হইতে যে চিরকাল গৃহের বাহিরে কখনো যায় নাই সে এই অনাবৃত পৃথিবীর দৃষ্টি কি করিয়া সহিবে বল? সে একটা আশ্রয় পাইলে, লোকের চোখের আড়াল হইতে পারিলে বাঁচে। তার মনে হইতেছে যেন সকলেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। তাহা ছাড়া করুণা এমন শ্রান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে, যে আর সে সহিতে পারে না। একবার মনে করিল স্বরূপের প্রস্তাবে সায় দিয়া যাইবে। কিন্তু স্বরূপের উপর তাহার এমন একটা ভয় আছে, যে পা আর উঠিতে চায় না। করুণা ভাবিল এই গাছের তলায় নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকি, না খাইয়া না দাইয়া মরিয়া যাইব। কিন্তু রক্ত মাংসের শরীরে কত সহিবে বল—এ ভাবনা আর বেশীক্ষণ স্থান পাইল না। স্বরূপের প্রস্তাবে সম্মত হইল। সন্ধ্যা হইল। করুণা ও স্বরূপ এখন ট্রেণের মধ্যে।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বরূপ ও করুণা কাশীতে আছে। করুণার দুরবস্থা বলিবার নহে। সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকিয়া সে যে কি অবস্থায় দিন যাপন করিতেছে; তাহা সেই জানে। স্বরূপের ভ্রম অনেক দিন হইল ভাঙ্গিয়াছে; এখন বুঝিয়াছে করুণা তাহাকে ভাল বাসে না। সে ভাবিতেছে—একি উৎপাত—এত করিয়া আনিলাম,গাড়িভাড়া দিলাম—সকলি ব্যর্থ হইল? সে যে বিরক্ত হইয়াছে তাহা আর বলিবার নহে। সে মনে করিয়াছিল, এত দিন কবিতায় যাহা লিখিয়া আসিয়াছে, কল্পনায় চিত্র করিয়াছে, আজ সেই প্রেমের সুখ উপভোগ করিবে, কিন্তু সে কাছে আসিলে করুণা ভয়ে জড় সড় আড়ষ্ট হইয়া মরিয়া যায়, তাহার সঙ্গে কথাই কহে না। স্বরূপ ভাবিল "একি উৎপাত এ গলগ্রহ বিদায় করিতে পারিলে যে বাঁচি!" ভাবিল, দিন কতক কাছে থাকিতে থাকিতেই ভাল বাসা হইবে। স্বরূপ ত তাহার যথাসাধ্য করিল, কিন্তু করুণার ভালবাসার কোন চিহ্ন দেখিল না। করুণা বেচারীর ত আরাম বিশ্রাম নাই। একত সর্ব্বক্ষণ পরের বাড়ীতে, অচেনা পুরুষের সঙ্গে আছি বলিয়া সর্ব্বদাই আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইতেছে। তা ছাড়া স্বরূপের ভাব গতিক দেখিয়া সেত ভয়ে আকুল—সে কাছে বসিয়া গান গায়, কবিতা শুনাইতে থাকে, মনের দুঃখ নিবেদন করে—অবশেষে মহারুক্ষ ভাবে গাড়িভাড়ার টাকার জন্য নালিশ করিবে বলিয়া শাষাইতে আরম্ভ করিয়াছে। করুণা যে কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পায় না—ভয়ে বেচারী সারা হইতেছে। স্বরূপ রাত দিন খিট্ খিট্ করে, এমন কি করুণাকে মাঝে মাঝে ধম্‌কাইতে আরম্ভ করিয়াছে। করুণার কিছু বলিবার মুখ

নাই, সে শুধু কাঁদিতে থাকে। এইরূপে কত দিন যায়—স্বরূপের এলাহাবাদে যাইবার সময় হইয়াছে। সে ভাবিতেছে "এখন করুণাকে লইয়া কি করি। এইখানে কি ফেলিয়া যাইব? না এত করিয়া আনিলাম, গাড়িভাড়া দিলাম, এত দিন রাখিলাম, অবশেষে কি ফেলিয়া যাইব? আরো দিন কতক দেখা যাক্।" অনেক ভাবিয়া সাবিয়া করুণাকেত ডাকিল। করুণা ভাবিল, "যাইব কি না? কিন্তু না যাইয়াই বা কি করি? এখানে কোথায় থাকিব? এত দূর দেশে অচেনা জায়গায় কার কাছে যাইব? দেশে থাকিতাম তবু কথা থাকিত।" করুণা চলিল। উভয়ে ষ্টেসনে গিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ি ছাড়িতে এখনো দেরী আছে। জিনিষ পত্র পুঁটুলি বোঁচকা লইয়া যাত্রীগণ মহা কোলাহল করিতেছে। কানে কলম গোঁজা রেলোয়ে ক্লার্কগণ ভারি উঁচু চালে ব্যস্তভাবে ইতস্ততঃ ফর্ ফর্ করিয়া বেড়াইতেছেন। পান সোডাওয়াটার নানা প্রকার মিষ্টান্নের বোঝা লইয়া ফেরিওয়ালারা আগামী গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এইরূপত অবস্থা। এমন সময়ে এক জন পুরুষ করুণার পাশে সেই বেঞ্চে আসিয়া বসিল। করুণা উঠিয়া যাইবে যাইবে করিতেছে। এমন সময়ে তাহার পার্শ্বস্থ পুরুষ বিস্ময়ের স্বরে কহিয়া উঠিল—"মা তুমি যে এখানে?" করুণা পণ্ডিত মহাশয়ের স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। অনেক ক্ষণ কিছু বলিতে পারিল না, অনেক ক্ষণ নির্জ্জল নয়নে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—"সার্ব্বভৌম মহাশয়, আমার ভাগ্যে কি ছিল?" পণ্ডিত মহাশয়ত আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না। গদ্গদ স্বরে কহিলেন—"মা যাহা হইবার তাহা হইয়াছে তাহার জন্য আর ভাবিও না—আমি প্রয়াগে যাইতেছি আমার সঙ্গে আইস—পৃথিবীতে আর আমার কেহই নাই, যে কয়টা দিন বাঁচিয়া আছি, তত দিন আমার কাছে থাক, তত দিন আর তোমার কোন ভাবনা নাই।" করুণা অধীর উচ্ছ্বাসে কাঁদিতে লাগিল। এমন সময়ে নিধি আসিয়া উপস্থিত হইল। নিধি পণ্ডিত মহাশয়ের খরচে কাশী দর্শন করিতে আসিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয় তজ্জন্য নিধির কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আছেন তিনি বলেন, নিধির ঋণ তিনি এজন্মে শোধ করিতে পারিবেন না। করুণাকে দেখিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিল। কহিল—"ভট্টাচার্য্য মশায় একটা কথা আছে।" পণ্ডিত মহাশয় শশব্যস্তে উঠিয়া গেলেন। নিধি কহিল—"ঐ বাবুটিকে দেখিতেছেন?" পণ্ডিত মহাশয় চাহিয়া দেখিলেন—দেখিলেন স্বরূপ। নিধি কহিল "দেখিলেন—করুণার ব্যবহারটা একবার দেখিলেন—ছি-ছি স্বর্গীয় কর্ত্তার নামটা একেবারে ডুবাইল?" পণ্ডিত মহাশয় অনেকক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—অবশেষে হাত উল্টাইয়া আস্তে আস্তে কহিলেন,

"স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ"

নিধি কহিল "আহা নরেন্দ্র এমন ভাল লোক ছিল। ওই রাক্ষসীই ত তাহাকে নষ্ট করিয়াছে।" নরেন্দ্র যে ভাললোক ছিল, সে বিষয়ে পণ্ডিত মহাশয়ের সংশয় ছিল না, এখন যে খারাপ হইয়া গিয়াছে তাহারো প্রমাণ পাইয়াছেন, কিন্তু এতক্ষণে কেন যে খারাপ হইয়া গিয়াছে তাহার কারণ টা জানিতে পারিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের স্ত্রীজাতির উপর দারুণ ঘৃণা জন্মাইল। পণ্ডিত মহাশয় ভাবিলেন—"আর না—স্ত্রীলোকেই তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে—স্ত্রীজাতিকে আর বিশ্বাস করিবেন না।" নিধি লাল হইয়া কহিল—"দেখুন দেখি মহাশয়—পাপাচরণ করিবার আর কি স্থান নাই?—এই কাশীতে?" একথা পণ্ডিত মহাশয় এতক্ষণ ভাবেন নাই—শুনিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে অবাক্ হইয়া নিধির মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন—ভাবিলেন—"সত্যইত!" একটা ঘণ্টা বাজিল মহা ছুটাছুটি চেঁচামেচি পড়িয়া গেল। পণ্ডিত মহাশয় বেঞ্চের কাছে বোঁচ্কা ফেলিয়া আসিয়াছিলেন তাড়াতাড়ি লইতে গেলেন—এমন সময় স্বরূপ তাড়াতাড়ি করুণাকে ডাকিতে আসিল—পণ্ডিত মহাশয়কে দেখিয়া সট করিয়া সরিয়া পড়িল। করুণা কাতর স্বরে পণ্ডিত মহাশয়কে কহিল "সর্ব্বেভৌম মহাশয়, আমাকে ফেলিয়া যাইবেন না।" পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন—"মা—অনেক প্রতারণা সহিয়াছি—মনে করিয়াছি, বৃদ্ধবয়সে আর কোন দিকে মন দিব না—দেবসেবায় কএকটি দিন কাটাইয়া দিব।" করুণা কাঁদিতে কাঁদিতে পণ্ডিত মহাশয়ের পা জড়াইয়া ধরিল—কহিল—"আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন না—আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন না!" পণ্ডিত মহাশয়ের নেত্রে অশ্রু পূরিয়া আসিল—ভাবিলেন—"যাহা অদৃষ্টে আছে হইবে—ইহাকে ত ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।" নিধি ছুটিয়া আসিয়া মহা একটা ধমক দিয়া কহিল—"এখানে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে কি হইবে? গাড়ি যে চলিয়া যায়।" এই বলিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের হাত ধরিয়া হড় হড় করিয়া টানিয়া একটা গাড়ির মধ্যে পূরিয়া দিল। করুণা অন্ধকার দেখিতে লাগিল—মাথা ঘুরিয়া মুখ চক্ষু বিবর্ণ হইয়া সেই খানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। স্বরূপের দেখা সাক্ষাৎ নাই, সে গোলেমালে অনেকক্ষণ হইল গাড়িতে উঠিয়া পড়িয়াছে। অগ্নিময় অঙ্কুশের তাপে আর্ত্তনাদ করিয়া লৌহময় গজ হন হন করিয়া অগ্রসর হইল। ষ্টেসনে আর বড় লোক নাই।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে মহেন্দ্রের নিকট হইতে যে সকল পত্র পাইয়াছিলাম,—তাহার এক খানি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

ভাই!—যে কষ্টে, যে লজ্জায়, যে আত্মগ্লানির যন্ত্রণায় পাগল হইয়া দেশ পরিত্যাগ করিলাম, তাহা তোমার কাছে গোপন করি নাই, সেই আঁধার রাত্রে বিজন পথ দিয়া যখন যাইতে ছিলাম—কোন কা-

রণ নাই—কোন উদ্দেশ্য নাই—কোন গম্য স্থান নাই—তখন কেন যাইতেছি, কোথায় যাইতেছি কিছুই ভাবি নাই—মনে করিয়াছিলাম এ পথের যেন অন্ত নাই, এমনি করিয়াই যেন আমাকে চির-জীবন চলিতে হইবে—চলিয়া—চলিয়া চলিয়া তবু পথ ফুরাইবে না—রাত্রি পোহাইবে না। মনের ভিতর কেমন এক প্রকার ঔদাস্যের অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল তাহা বলিবার নহে। কিন্তু রাত্রের অন্ধকার যত হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল, দিনের কোলাহল যতই জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল ততই আমার মনের আবেগ কমিয়া আসিল। তখন ভাল করিয়া সমস্ত ভাবিবার সময় আসিল। কিন্তু তখনো দেশে ফিরিবার জন্য এক তিলও ইচ্ছা হয় নি। কত দেশ দেখিলাম—কত স্থানে ভ্রমণ করিলাম—কত দিন কত মাস চলিয়া গেল, কিন্তু কি দেখিলাম কি করিলাম, কিছু যদি মনে আছে! চোকের উপর কত পর্ব্বত, নদী, অরণ্য, মন্দির, অট্টালিকা, গ্রাম উঠিত কিন্তু সে সকল যেন কি; কিছুই নয়। যেন স্বপ্নের মত যেন মায়ার মত যেন মেঘের পর্ব্বত অরণ্যের মত। চোখের উপর পড়িত তাই দেখিতাম, আর কিছুই নহে। এই রূপ করিয়া যে কত দিন গেল তাহা বলিতে পারি না—আমার মনে হইয়াছিল এক বৎসর হইবে—কিন্তু পরে গণনা করিয়া দেখিলাম চার মাস। ক্রমে ক্রমে আমার মন শান্ত হইয়া আসিয়াছে। এখন ভবিষ্যত ও অতীত ভাবিবার অবসর পাইলাম। আমি এখন লাহোরে আসিয়াছি। এখানকার এক জন বাঙ্গালী বাবুর বাড়িতে আশ্রয় লইলাম, ও অল্প অল্প করিয়া ডাক্তারি করিতে আরম্ভ করিলাম। এখন আমার মন্দ আয় হইতেছে না, কিন্তু আয়ের জন্য ভাবি না ভাই, আমার হৃদয়ে যে নূতন মনস্তাপ উত্থিত হইয়াছে তাহাতে যে আমাকে কি অস্থির করিয়া তুলিয়াছে বলিতে পারি না। আমার নিজের উপর যে কি ঘৃণা হইয়াছে তাহা কি করিয়া প্রকাশ করিব? যখন দেশে ছিলাম তখন রজনীর জন্যে একদিনো ভাবি নাই—যখন দেশ ছাড়িয়া আসিলাম তখনো এক মুহূর্ত্তের জন্য রজনীর ভাবনা মনে উদিত হয় নাই—কিন্তু দেশ হইতে যত দূরে গিয়াছি, যত দিন চলিয়া গিয়াছে, হতভাগিনী রজনীর কথা ততই মনে পড়িয়াছে, আপনাকে ততই মনে পড়িয়াছে—আপনাকে ততই নিষ্ঠুর পিশাচ বলিয়া মনে হইয়াছে। আমার ইচ্ছা করে এখনি দেশে ফিরিয়া যাই তাহাকে যত্ন করি—তাহাকে ভাল বাসি—তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। সে হয়ত এত দিনে আমার কলঙ্কের কথা শুনিয়াছে। আমি তাহার কাছে কি বলিয়া দাঁড়াইব? না ভাই আমি তাহা পারিব না! * * *

মহেন্দ্র ”

আমি দেখিতেছি, যে সকল বাহ্য কারণে মহেন্দ্রের রজনীর উপর বিরাগ ছিল, সে সকল কারণ হইতে দূরে থাকিয়া মহেন্দ্র একটু ভাবিবার অবসর পাইয়াছে। যতই তাহার আপনার নিষ্ঠুরাচরণ মনে উদিত

হইয়াছে—ততই রজনীর উপর মমতা তাহার দৃঢ়মূল হইয়াছে। মহেন্দ্র এখন ভাবিয়াই পাইতেছে না তাহাকে কেন ভাল বাসে নাই—এমন মৃদু, কোমল, স্নিগ্ধস্বভাব, তাহাকে ভাল বাসে না এমন পিশাচ আছে? কেন, তাহাকে দেখিতেইবা কি মন্দ? মন্দ? কেন অমন সুন্দর স্নেহপূর্ণ চক্ষু! অমন কোমল ভাব-ব্যঞ্জক মুখশ্রী! ভাব লইয়া রূপ, না বর্ণ লইয়া? রজনীর যাহা কিছু ভাল তাহাই মহেন্দ্রের মনে পড়িতে লাগিল, আর তাহার যাহা কিছু মন্দ তাহাও মহেন্দ্র ভাল বলিয়া দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্রমে রজনীকে যতই ভাল বলিয়া বুঝিল—আপনাকে ততই পিশাচ বলিয়া মনে হইল।

মহেন্দ্রের সেখানে বিলক্ষণ পশার হইয়াছে। মাসে প্রায় দুই শত টাকা উপার্জ্জন করিত। কিন্তু প্রায় সমস্তই রজনীর কাছে পাঠাইয়া দিত, নিজের জন্য এত অল্প টাকা রাখিয়া দিত যে আমি ভাবিয়া পাই না, কি করিয়া তাহার খরচ চলিত।

অনেক দিন হইয়া গেছে মহেন্দ্রের বাড়ি আসিতে বড়ই ইচ্ছা হয়, কিন্তু সকল কথা মনে উঠিলে আর ফিরিয়া আসিতে পা সরে না। মহেন্দ্র একটা চিটি পাইয়াছে, পাইয়া অবধি বড়ই অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। ইহা সেই মোহিনীর চিঠি। চিঠির শেষ ভাগে লিখা আছে—“আপনি যদি রজনীকে নিতান্তই দেখিতে না পারেন—যদি রজনী এখানে আছে বলিয়া আপনি নিতান্তই আসিতে না চান্—তবে আপনার আশঙ্কা করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই, সে তাহার দিদির বাড়ি চলিয়া যাইবে। রজনী লিখিতে জানে না বলিয়া আমি তাহার হইয়া লিখিয়া দিলাম। সে লিখিতে জানিলেও হয়ত আপনাকে লিখিতে সাহস করিত না।”

ইহার মৃদু তিরস্কার মহেন্দ্রের মর্ম্মের মধ্যে বিদ্ধ হইয়াছে, সে স্থির করিয়াছে, দেশে ফিরিয়া যাইবে।

রজনীর শরীর দিনে দিনে ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে—মুখ বিবর্ণ ও বিষণ্ণতর হইতেছে। এক দিন সন্ধ্যাবেলা সে মোহিনীর গলা ধরিয়া বলিল, “দিদি—আর আমি বেশীদিন বাঁচিব না।” মোহিনী কহিল “সেকি রজনি, ওকথা বলিতে নাই।” রজনী বলিল “হাঁ দিদি আমি জানি, আর আমি বেশী দিন বাঁচিব না; যদি এর মধ্যে তিনি না আসেন তবে তাঁকে এই টাকা গুলি দিও। তিনি আমাকে মাসে মাসে টাকা পাঠাইয়া দিতেন কিন্তু আমার খরচ করিবার দরকার হয় নাই, সমস্ত জমাইয়া রাখিয়াছি।” মোহিনী অতিশয় স্নেহের সহিত রজনীর মুখ তাহার বুকে টানিয়া লইয়া বলিল “চুপ কর্, ওসব কথা বলিস্‌নে। মোহিনী অনেক কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া মনে মনে কহিল “মা ভগবতি, আমি যদি এর দুঃখের কারণ হোয়ে থাকি তবে আমার তাতে কোন দোষ নাই।”

হাত অবসর পাইলেই রজনীর শাশুড়ি রজনীকে লইয়া পড়িতেন—নানা জন্তুর সহিত তাহার রূপের তুলনা করিতেন, আর

বলিতেন যে বিবাহের সম্বন্ধ হওয়া অবধিই তিনি জানিতেন যে এই রূপ একটা দুর্ঘটনা হইবে, তবে জানিয়া শুনিয়া কেন যে বিবাহ দিলেন সে কথা উত্থাপন করিতেন না। রজনী না থাকিলে মহেন্দ্র-বিয়োগে তাঁহার মাতার অধিকতর কষ্ট হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই, এই যে মাঝে মাঝে মন খুলিয়া তিরস্কার করিতে পান, ইহাতে তাঁহার মন অনেকটা ভাল আছে। মহেন্দ্রের মাতার স্বভাব যতদূর জানি তাহাতে ত এক এক বার আমার মনে হয়—এই যে তিরস্কার করিবার তিনি সুযোগ পাইয়াছেন, ইহাতে বোধ হয় মহেন্দ্রের বিয়োগও তিনি ভাগ্য বলিয়া মানেন। মহেন্দ্রের অবস্থান-কালে, রজনী যে দিন কোন দোষ না করিত, সে দিন মহেন্দ্রের মাতা মহা মুস্কিলে পড়িয়া যাইতেন। অবশেষে ভাবিয়া ভাবিয়া দুই বৎসরের পুরাণো কথা লইয়া তাহার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া আসিতেন। কিন্তু এই ঘটনার পর তাঁহার তিরস্কারের ভাণ্ডার সর্ব্বদাই মজুত রহিয়াছে, অবসর পাইলেই হয়। ইতিমধ্যে মহেন্দ্রের মা মহেন্দ্রকে এক লোভনীয় পত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার "বাবাকে" তিনি নিশ্চিন্ত হইতে কহিয়াছেন, ও সংবাদ দিয়াছেন যে, তাঁহার জন্যে একটি সুন্দরী কন্যা অনুসন্ধান করা যাইতেছে। এই চিঠি পাইয়া মহেন্দ্রের আপনার উপর দ্বিগুণ লজ্জা উপস্থিত হইয়াছে। "তবে সকলেই মনে করিয়াছে আমি রূপের কাঙ্গাল? রজনী দেখিতে ভাল নয় বলিয়াই আমি তাহার উপর নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছি? লোকের কাছে মুখ দেখাইব কোন্ লজ্জায়?" কিন্তু রজনীর আজ কাল অল্প তিরস্কারই অত্যন্ত মনে লাগে, আগেকার অপেক্ষাও সে কেমন ভীত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার শরীর যতই খারাপ হইতেছে ততই সে ভয়ে ত্রস্ত ও তিরস্কারে অধিকতর ব্যথিত হইয়া পড়িতেছে। ক্রমাগত তিরস্কার শুনিয়া শুনিয়া আপনাকে সত্য সত্যই দোষী বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। মোহিনী প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা তাহার কাছে আসিত—প্রত্যহ তাহাকে যথাসাধ্য যত্ন করিত ও প্রত্যহ দেখিত সে দিনে দিনে অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। এক দিন রজনী সংবাদ পাইল, মহেন্দ্র বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছে। আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার কিসের আহ্লাদ? মহেন্দ্র ত তাহাকে সেই ঘৃণা-চক্ষে দেখিবে। তাহা হউক্—কিন্তু তাহার জন্য মহেন্দ্র যে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে কষ্ট পাইতেছে, এ আত্মগ্লানির যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইল—যে কারণেই হউক মহেন্দ্র যে বিদেশে গিয়া কষ্ট পাইতেছে ইহা রজনীর অতিশয় কষ্টকর হইয়াছিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

কাশীর ষ্টেষণে করুণা-সংক্রান্ত যে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছিল, এক জন ভদ্রলোক তাহা সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। স্বরূপকে দেখিয়া তিনি কেমন লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া গিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন

সকলে চলিয়া গেল এবং করুণা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল তখন তিনি তাহাকে একটা গাড়িতে তুলিয়া তাঁহার বাসাবাড়িতে লইয়া যান—তাঁহার কোথায় যাইবার প্রয়োজন ছিল কিন্তু যাওয়া হইল না। করুণার মুখ দেখিয়া, এমন কে আছে যে তাহাকে দোষী বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে? মহেন্দ্রও তাহাকে সন্দেহ করে নাই—বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম সেই ভদ্র লোকটি মহেন্দ্র। লাহোর হইতে আসিবার সময় একবার কাশীতে আসিয়াছিলেন; কলিকাতার ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে এই সমস্ত ঘটনা ঘটে। করুণা চেতনা পাইলে মহেন্দ্র তাহাকে তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। মহেন্দ্রের মুখে এমন দয়ার ভাব প্রকাশ পাইতেছিল যে করুণা শীঘ্রই সাহস পাইল। কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাকে কহিল এবং ঠিক সে যেমন করিয়া ভবিকে জিজ্ঞাসা করিত তেমন করিয়া মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, কেন নরেন্দ্র তাহার উপর অমন রাগ করিল? মহেন্দ্র বালিকার সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না—কিন্তু এই প্রশ্ন শুনিয়া তাহার চক্ষে জল আসিয়াছিল। নরেন্দ্রকে মহেন্দ্র বেশ চেনে, সে সমস্ত ঘটনা বেশ বুঝিতে পারিল। পণ্ডিতমহাশয় যে কেন তাহাকে অমন করিয়া ফেলিয়া গেলেন তাহাও করুণা ভাবিয়া পাইতেছিল না, অনেক ক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া তাহাও মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল। মহেন্দ্র তাহার যথার্থ কারণ যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহা গোপন করিয়া নানারূপে বুঝাইয়া দিলেন। এখন করুণাকে লইয়া যে কি করিবে মহেন্দ্র তাহাই ভাবিতে লাগিল। অবশেষে স্থির হইল তাহাদের বাড়িতেই লইয়া যাইবে। মহেন্দ্র করুণার নিকট তাহার বাড়ির বর্ণনা করিল—কহিল তাহাদের বাড়ীর সামনেই একটি প্রাচীর দেওয়া বাগান আছে, বাগানের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে, পুষ্করিণীর উপরে একটি বাঁধানো সানের ঘাট, কহিল তাহাদের বাড়িতে গেলে করুণা তাহার একটি দিদি পাইবে, তেমন স্নেহশালিনী—তেমন কোমল-হৃদয়া—তেমন ক্ষমাশীলা (আরো অসংখ্য বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছিল) দিদি কেহই কখনো পায় নাই। করুণা অমনি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল সেখানে কি ভবীর দেখা পাইবে। মহেন্দ্র ভবীর সন্ধান করিবে বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন করুণা তাহাকে ভ্রাতার মত দেখিবে কি না, করুণার তাহাতে কোন আপত্তি ছিল না। যাহা হউক, এত দিন পরে করুণার মুখ প্রফুল্ল দেখিলাম, এতদিন পরে সে তবু আশ্রয় পাইল। কিন্তু বারবার করুণা মহেন্দ্রকে পণ্ডিত মহাশয়ের তাহার উপরে রাগ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছে।

অবশেষে তাহারা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল, কাশী পরিত্যাগ করিয়া চলিল, কে কি বলিবে, কে কি করিবে, কখন কি হইবে এই সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে ও যদি কেহ কিছু বলে তবে তাহার কি উত্তর দিবে, যদি কেহ কিছু করে তবে তাহার কি প্রতি-

বিধান করিবে, যদি কখনো কিছু হয় তবে সে অবস্থায় কিরূপ ব্যবহার করিবে, এই সমস্ত ঠিক করিতে করিতে মহেন্দ্র গ্রামের রাস্তায় গিয়া পৌঁছিল। লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া,সঙ্কোচে অভিভূত হইয়া পথিকদিগের চক্ষু এড়াইয়া ও কোন মতে পথ পার হইয়া গৃহের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল। কতবার সাত পাঁচ করিয়া পরে প্রবেশ করিল। দাদাবাবুকে দেখিয়াই ঝি ঝাঁটা রাখিয়া ছুটিয়া বড় মাকে খবর দিতে গেল। বড়মা তখন রজনীর সুমুখে বসিয়া রজনীর রূপের ব্যাখ্যান করিতেছিলেন, এমন সময়ে খবর পাইলেন যে আর একটি নূতন বধূ লইয়া তাঁহার 'বাবা' ঘরে আসিয়াছেন। মহেন্দ্রের ও করুণার সহিত সকলের সাক্ষাৎ হইল, যখন সকলে মিলিয়া হুলু দিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন এমন সময়ে মহেন্দ্র তাঁহাদিগকে করুণা-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিল। সে সমস্ত বৃত্তান্ত মহেন্দ্রের মাতার বড় ভাল লাগে নাই ; মহেন্দ্রের সমুখে কিছু বলিলেন না, কিন্তু সেই রাত্রে মহেন্দ্রের পিতার সহিত তাঁহার ভারি একটা পরামর্শ হইয়া গিয়াছিল ও অবশেষে রজনী পোড়ারমুখীই যে এই সমস্ত বিপত্তির কারণ তাহা অবধারিত হইয়া গিয়াছিল। এই কথাটা লইয়া মহেন্দ্রের পিতার অতিরিক্ত আনাতুয়েকের তামাকু ব্যয় হইয়াছিল ও দুই চারিজন বৃদ্ধ বিজ্ঞ প্রতিবাসিদিগের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আর অধিক কিছু দুর্ঘটনা হয় নাই। রজনী তাহার দিদির বাড়ি যাইবার সমস্তই বন্দোবস্ত করিয়াছিল, তাহার শ্বশুর শাশুড়িরা এই বন্দোবস্তে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু রজনী বড় দুর্ব্বল বলিয়া এখনো সমাধা হইয়া উঠে নাই। এই খবরটি আসিয়াই মহেন্দ্র তাঁহার মাতার নিকট হইতে শুনিতে পাইলেন, আশ্চর্য্যের স্বরে কহিলেন, "দিদির বাড়ি যাইবে, তার অর্থ কি? আমি আসিলাম আর অমনি দিদির বাড়ি যাইবে?" মহেন্দ্রের মাও অবাক,মহেন্দ্রের পিতা কিছুক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন, পরে ঠুঙ্গি হইতে চসমা বাহির করিয়া পরিলেন এবং মহেন্দ্রকে দেখিতে লাগিলেন, যেন তিনি মিলাইয়া দেখিতে চান যে এ মহেন্দ্রের সহিত পূর্ব্বকার মহেন্দ্রের কোন আদল আছে কি না, এ মহেন্দ্র ঝুঁটা মহেন্দ্র কি না। মহেন্দ্র অধিক বাক্য ব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ রজনীর ঘরে চলিয়া গেলেন ও কর্ত্তা গৃহিণীতে মিলিয়া ফুস্‌ফুস্ করিয়া মহাপরামর্শ করিতে লাগিলেন। রজনী মহেন্দ্রকে দেখিয়া মহা শশব্যস্ত হইয়া পড়িল, কেমন অপ্রস্তুত হইয়া গেল। সে মনে করিতে লাগিল, মহেন্দ্র তাহাকে দেখিয়া কি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে —তাহার তাড়াতাড়ি বলিবার ইচ্ছা হইল, যে, "আমি এখনি যাইতেছি, আমার সমস্তই প্রস্তুত হইয়াছে!" যখন সে এই গোলমালে পড়িয়া কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না, তখন মহেন্দ্র ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে গিয়া বসিল। কি ভাগ্য! বিষণ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি নাকি আজই দিদির বাড়ি যাবে? কেন রজনি?" আর কি উত্তর দিবার যো আছে? "আমি তোমার কাছে

অনেক অপরাধ করিয়াছি, আমি তোমাকে কষ্ট দিয়াছি, কিন্তু তাহা কি ক্ষমা করিবে না?" ওকি মহেন্দ্র, অমন করিয়া বলিও না, রজনীর বুক ফাটিয়া যাইতেছে। "বল— তাহা কি ক্ষমা করিবে না?" রজনীর উত্তর দিবার কি ক্ষমতা আছে? সে পূর্ণ উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া উঠিল। মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া বলিল "একবার বল ক্ষমা করিলে?" রজনী ভাবিল—সে কি কথা! মহেন্দ্র কেন ক্ষমা চাহিতেছেন? সে জানিত তাহারই সমস্ত দোষ, সেই মহেন্দ্রের নিকট অপরাধী, কেন না তাহার জন্যই মহেন্দ্র এত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, গৃহ ত্যাগ করিয়া কত বৎসর বিদেশে কাল যাপন করিয়াছেন, সে কোথায় মহেন্দ্রের নিকট ক্ষমা চাহিবে, তাহা না হইয়া একি বিপরীত! ক্ষমা চাহিবে কি? সে নিজেই ক্ষমা চাহিতে সাহস করে নাই, সে কি ক্ষমার যোগ্য? মহেন্দ্র রজনীর দুর্ব্বল মস্তক কোলে তুলিয়া লইল, রজনী ভাবিল এই সময়ে যদি মরি তবে কি সুখে মরি। তাহার কেমন সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল, মহেন্দ্রের ক্রোড় তাহার নিকট যেন ভিখারীর নিকট সিংহাসন।

মহেন্দ্র তাহাকে কতকি কথা বলিল, সে সকল কথার উত্তর দিতে পারিল না ; সে ভাবিল এ মধুর স্বপ্ন চিরস্থায়ী নহে—এই মুহূর্ত্তে মরিতে পাইলে কি সুখী হই। কিন্তু এ অবস্থা কতক্ষণ রহিবে? রজনীর এ সঙ্কোচ শীঘ্র দূর হইল। রজনী তাহার কোলে মাথা রাখিয়া কতক্ষণ কতকি কথা কহিল—কত অশ্রুজল কত কথা কত হাসি —সে বলিবার নহে। মহেন্দ্র যখন উঠিয়া যাইতে চাহিল তখন রজনী তাহাকে আর একটু বসিয়া থাকিতে অনুরোধ করিল, যাহা আর কখনো করিতে সাহস করে নাই। রজনীর একি পরিবর্ত্তন? যে সুখ সে কখন আশা করে নাই, আপনাকে যে সুখ পাইবার যোগ্য বলিয়া মনে করে নাই, সেই সুখ সহসা পাইয়াছে, আহ্লাদে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল— সে কি করিবে ভাবিয়া পাইতে ছিল না। সেই সন্ধ্যাবেলাই সে মোহিনীর বাড়িতে গেল, তাড়াতাড়ি তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে বসিল, মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল "কেন রজনি, কি হোয়েছে?" সে মনে করিল মহেন্দ্র না জানি আবার কি অন্যায়াচরণ করিয়াছে। রজনী তাহাকে সকল কথা বলিতে লাগিল—শুনিয়া মোহিনীও আহ্লাদে কাঁদিতে লাগিল। রজনীর দুই এক মাসের মধ্যে যে কোন ব্যাধি বা দুর্ব্বলতা হইয়াছিল তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। আর কখনো রজনীর ঘরকন্নার কাজে এত উৎসাহ কেহ দেখে নাই—শাশুড়ি মহা উগ্রভাবে কহিলেন "হোয়েছে, হোয়েছে ঢের হোয়েছে, আর গিন্নিপনা কোরে কাজ নেই, দুদিন উপোস করে আছেন, সবে আজ ভাত খেয়েছেন, ওঁর গিন্নিপনা দেখে আর বাঁচিনে।" এই খানে একটা কথা বলা আবশ্যক—রজনী যে দুদিন উপোস করিয়াছিল সে দুদিন কাজ করিতে পারেনি বলিয়া তাঁহার শাশুড়ি মহা বক্তৃতা দিয়াছিলেন ও ভবিষ্যতে যখনি

রজনীর দোষের অভাব পড়িবে সেই দুই দিনের কথা লইয়া আবার বক্তৃতা যে দিবেন ইহাও নিশ্চিত—এবিষয়ে কোন পাঠকের সন্দেহ উপস্থিত না হয়।

দেখিতে দেখিতে করুণার সহিত রজনীর মহা ভাব হইয়া গেল। দুই জনের ফুস্‌-ফুস্‌ করিয়া মহা মনের কথা পড়িয়া গেল—তাহাদের কথা আর ফুরায় না। তাহাদের স্বামীদের কত দিনকার সামান্য যত্ন, সামান্য আদর টুকু তাহারা মনের মধ্যে গাঁথিয়া রাখিয়াছে, তাহাই কত মহান্‌ ঘটনার মত বলাবলি করিত, কিন্তু এবিষয়ে ত দুই জনেরি ভাণ্ডার অতি সামান্য, তবে কিযে কথা হইত তাহারাই জানে। হয়ত সে সব কথা লিখিলে পাঠকেরা তাহার গাম্ভীর্য্য বুঝিতে পারিবেন না, হয়ত হাসিবেন হয়ত মনে করিবেন এসব কোন কাজেরি কথা নয়—কিন্তু সে বালিকারা যে সকল কথা লইয়া অতি গুপ্ত ভাবে, অতি সাবধানে আন্দোলন করিয়াছে, তাহাই লইয়া যে সকলে হাসিবে—সকল কথা তুচ্ছভাবে উড়াইয়া দিবে তাহা মনে করিলে কষ্ট হয়। কিন্তু করুণার সঙ্গে রজনী পারিয়া উঠে না, সে এক কথা সাতবার করিয়া বলিয়া, সব কথা একেবারে বলিতে চেষ্টা করিয়া, কোন কথাই ভাল করিয়া বুঝাইতে না পারিয়া রজনীর এক প্রকার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারই কথা ফুরায় নাই,ত কেমন ক'রে সে রজনীর কথা শুনিবে! তাহার কি একটা আধটা কথা? তাহার পাখীর কথা, তাহার ভবির কথা, তাহার কাঠবিড়ালীর গল্প—সে কবে কি স্বপ্ন দেখিয়াছিল—তাহার পিতার নিকট দুই রাজার কি গল্প শুনিয়াছিল, এসমস্ত কথা তাহার বলা আবশ্যক। আবার বলিতে বলিতে যখন হাসি পাইত, তখন তাহাই বা থামায় কে? আর, কেন যে হাসি পাইল তাহাই বা বুঝে কাহার সাধ্য? রজনীবেচারীর বড় বেশী কথা বলিবার ছিল না, কিন্তু বেশী কথা নীরবে শুনিবার এমন আর উপযুক্ত পাত্র নাই। রজনী কিছুতেই বিরক্ত হইত না, তবে এক এক সময়ে অন্যমনস্ক হইত বটে, তা, তাহাতে করুণার কি ক্ষতি? করুণার বলা লইয়া বিষয়। করুণাকে লইয়া মহেন্দ্রের মাতা-বড় ভাবিত আছেন। তাঁহার বয়স বড় কম নহে, পঞ্চান্ন বৎসর, এই পঞ্চান্ন বৎসরের অভিজ্ঞতায় তিনি ভদ্রলোকের ঘরে এমন বেহায়া মেয়ে কখনো দেখেন নাই, আবার তাঁহার প্রতিবেশিনীরা তাহাদের বাপের বয়সেও এমন মেয়ে কখনো দেখে নাই বলিয়া স্পষ্ট স্বীকার করিয়া গেল। মহেন্দ্রের পিতা তামাকু খাইতে খাইতে কহিতেন যে, ছেলে মেয়েরা সবাই খৃস্টান হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রের মাতা কহিতেন "সে কথা মিছা নয়।' মহেন্দ্রের মাতা মাঝে মাঝে রজনীকে সম্বোধন করিয়া করুণার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া কহিতেন "আজ বাগানে বড় গলা বাহির করা হইতেছিল! লজ্জা করে না!" কিন্তু তাহাতে করুণা কিছুই সাবধান হয় নাই। কিন্তু এ ত করুণার শান্ত অবস্থা, করুণা যখন

মনের সুখে তাহার পিতৃভবনে থাকিত,তখন যদি এই পঞ্চান্ন বৎসরের অভিজ্ঞ গৃহিণী তাহাকে দেখিতেন তবে কি করিতেন বলিতে পারি না। আবার এক একবার যখন বিষণ্ণ ভাব করুণার মনে আসিত, তখন তাহার মূর্ত্তি সম্পূর্ণ বিপরীত। আর তাহার কথা নাই, হাসি নাই, গল্প নাই, সে এক জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে—রজনী পাশে বসিয়া "লক্ষ্মী দিদি আমার" বলিয়া কত সাধাসাধি করিলে উত্তর নাই। করুণা প্রায় মাঝে মাঝে এমনি বিষণ্ণ হইত, কতক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তবে সে শান্ত হইত। একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "নরেন্দ্র কোথায়?" মহেন্দ্র কহিল "আমিত জানি না।" করুণা কহিল, "কেন জান না?" কেন জানে না সে কথা মহেন্দ্র ঠিক করিয়া বলিতে পারিল না, তবে নরেন্দ্রের সন্ধান করিতে স্বীকার করিল। কিন্তু নরেন্দ্রের অধিক সন্ধান করিতে হইল না। নরেন্দ্র কেমন করিয়া তাহার সন্ধান পাইয়াছে। এক দিন করুণা যখন রজনীর নিকট দুই রাজার গল্প করিতে ভারি ব্যস্ত ছিল, এমন সময়ে ডাকে তাহার নামে একখানি চিঠি আসিল। এপর্য্যন্তও তাহার বয়সে সে কখনো নিজের নামের চিঠি দেখে নাই। এ চিঠি পাইয়া করুণার মহা আহ্লাদ হইল, সে জানিত চিঠি পাওয়া এক মহা কাণ্ড, রাজা রাজড়াদেরই অধিকার। আস্ত চিঠি ছিঁড়িয়া খুলিতে তাহার কেমন মায়া হইতে লাগিল, আগে সকলকে দেখাইয়া অনেক অনিচ্ছার সহিত লেফাফা খুলিল, চিঠি পড়িল, চিঠি পড়িয়া তাহার মুখ শুখাইয়া গেল, থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চিঠি মহেন্দ্রকে দিল। নরেন্দ্র লিখিতেছেন—"তিন শত টাকা আমার প্রয়োজন, না পাইলে আমার সর্ব্বনাশ; না পাইলে আমি আত্মহত্যা করিয়া মরিব। ইতি।" করুণা কাঁদিয়া উঠিল। করুণা মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল "কি হবে?" মহেন্দ্র কহিল কোন ভাবনা নাই, এখনি টাকা লইয়া সে যাইতেছে। নরেন্দ্রের ঠিকানা চিঠিতে লিখা ছিল, সেই ঠিকানা উদ্দেশ্যে মহেন্দ্র চলিল।

প্রতিশোধ।

(গাথা)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গভীর রজনী, নীরব ধরণী,
মুমূর্ষু পিতার কাছে,
বিজন আলয়ে, আঁধার হৃদয়ে,
বালক দাঁড়ায়ে আছে।

বীরের হৃদয়, ছুরিকা বিধানো,
শোণিত বহিয়ে যায়,
বীরের বিবর্ণ মুখের মাঝারে,
রোষের অনল ভায়!

পোড়েছে দীপের অস্ফুট আলোক,
আঁধার মুখের পরে,
সে মুখের পানে, চাহিয়া বালক,
দাঁড়ায়ে ভাবনা ভরে,

দেখিছে পিতার, অসাড় অধরে,
যেন অভিশাপ লিখা,
স্ফুরিছে আঁধার নয়ন হইতে,
রাগের অনল শিখা—

ঘুম হ'তে যেন চমকি উঠিল
সহসা নীরব ঘর,
মুমূর্ষু কহিলা, বালকে চাহিয়া,
সুধীর গভীর স্বর—

"শোনো বৎস শোনো, অধিক কি কব,
আসিছে মরণ বেলা,
এই শোণিতের প্রতিশোধ নিতে,
না করিবে অবহেলা।"

এতেক বলিয়া, টানি উপাড়িলা,
ছুরিকা হৃদয় হোতে,
ঝলকে ঝলকে, উছসি অমনি,
শোণিত বহিল স্রোতে,

কহিল—'এই নে, এই নে ছুরিকা ;—
তাহার উরস পরে,
যতদিন ইহা, ঠাঁই নাহি পায়,
থাকে যেন তোর করে !

হা হা ক্ষত্র দেব, কি পাপ করেছি—
এ তাপ সহিতে হ'ল,
ঘুমাতে ঘুমাতে, বিছানায় পড়ি,
জীবন ফুরায়ে এল।'

নয়নে জ্বলিল দ্বিগুণ আগুন,
কথা হোয়ে গেল রোধ,
শোণিতে লিখিলা ভূমির উপরে—
"প্রতিশোধ প্রতিশোধ !"

পিতার চরণ, পরশ করিয়া,
ছুইয়া কৃপাণ খানি,
আকাশের পানে, চাহিয়া কুমার,
কহিল শপথ বাণি !—

"ছুঁইনু কৃপাণ, শপথ করিনু;
শুন ক্ষত্র-কুল-প্রভু,
এর প্রতিশোধ, তুলিব তুলিব,
অন্যথা নহিবে কভু !

সেই বুক ছাড়া, এ ছুরিকা আর,
কোথানা বিরাম পাবে,
তার রক্ত ছাড়া, এই ছুরিকার,
তৃষা কভু নাহি যাবে।"

রাখিলা শোণিত-মাখা সে ছুরিকা,
বুকের বসনে ঢাকি।
ক্রমে মুমূর্ষুর ফুরাইল প্রাণ.
মুদিয়া পড়িল আঁখি॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভ্রমিছে কুমার, প্রতি দেশে দেশে,
ঘুচাতে শপথ ভার।

দেশে দেশে ভ্রমি, তবুওত আজি,
পেলে না সন্ধান তার।

এখনো সে বুকে ছুরিকা লুকানো,
প্রতিজ্ঞা জ্বলিছে প্রাণে,
এখনো পিতার শেষ কথা গুলি,
বাজিছে যেন সে কানে।

"কোথা যাও যুবা ? যেওনা যেওনা,
গহন কানন ঘোর,
সাঁজের আঁধার, ঢাকিছে ধরণী,
এস গো কুটিরে মোর !"

"ক্ষম গো আমায়, কুটীর স্বামী !
বিরাম আলয় চাইনা আমি,
যে কাজের তরে, ছেড়েছি আলয়,
সে কাজ পালিব আগে"—

"শুন গো পথিক, যেওনাকো আর,
অতিথির তরে মুক্ত এদুয়ার।
দেখেছ চাহিয়া, ছেয়েছে জলদ,
পশ্চিম গগন ভাগে।"

কতনা ঝটিকা, বহিয়া গিয়াছে,
মাথার উপর দিয়া,
প্রতিজ্ঞা পালিতে চলেছে তবুও,
যুবক নির্ভীক হিয়া।

চলেছে—গহন গিরিনদী মরু
কোন বাধা নাহি মানি।
বুকেতে রয়েছে ছুরিকা লুকানো
হৃদয়ে শপথ-বাণী !

"গভীর আঁধারে নাহি পাই পথ,
শুনগো কুটীর স্বামী—
খুলে দাও দ্বার আজিকার মত
এসেছি অতিথি আমি।"

ধীরে ধীরে ধীরে খুলিল দুয়ার,
পথিক দেখিল চেয়ে—
করুণার যেন প্রতিমার মত
একটি রূপসী মেয়ে।

এলো থেলো চুলে, বনফুল মালা
দেহে এলোথেলো বাস—
নয়নে মমতা, অধরে মাখানো
কেমন সরল হাস।

বালিকার পিতা রয়েছে বসিয়া
কুশের আসন পরি—
সম্ভ্রমে আসন দিলেন পাতিয়া
পথিকে যতন করি।

দিবসের পর যেতেছে দিবস,
যেতেছে বরষ মাস—
আজিও কেন সে কানন-কুটীরে
পথিক করিছে বাস ?

কিকর যুবক, ছাড় একুটীর—
সময় যেতেছে চলি,
যেকাজের তরে ছেড়েছ আলয়
সেকাজ যেওনা ভুলি !

দিবসের পর যেতেছে দিবস,
যেতেছে বরষ মাস,

যুবার হৃদয়ে পড়িছে জড়ায়ে
ক্রমেই প্রণয়-পাশ।

শোণিতে লিখিত শপথ আখর,
মন হোতে গেল মুছি।
ছুরিকা হইতে রকতের দাগ
কেনরে গেলনা ঘুচি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মালতী বালার সাথে কুমারের
আজি বিবাহ হবে—
কানন আজিকে হতেছে ধ্বনিত
সুখের হরষ রবে।

মালতীর পিতা প্রতাপের দ্বারে
কাননবাসীরা যত,
গাইছে নাচিছে হরষে সকলে,
যুবক রমণী শত।

কেহবা গাঁথিছে ফুলের মালিকা,
গাহিছে বনের গান,
মালতীরে কেহ ফুলের ভূষণ
হরষে করিছে দান।

ফুলে ফুলে কিবা সেজেছে মালতী
এলায়ে চিকুর পাশ—
সুখের আভায় উজলে নয়ন
অধরে সুখের হাস।

আইল কুমার বিবাহ সভায়
মালতীরে লয়ে সাথে,
মালতীর হাত লইয়া প্রতাপ
সঁপিল যুবার হাতে।

ওকিও—ওকিও—সহসা প্রতাপ
বসনে নয়ন চাপি,
মূরছি পড়িল ভূমির উপরে
থর থর থর কাঁপি।

মালতী বালিকা পড়িল সহসা
মূরছি কাতর রবে!
বিবাহ-সভায় ছিল যারা যারা
ভয়ে পলাইল সবে।

সভয়ে কুমার চাহিয়া দেখিল
জনকের উপছায়া—
আগুনের মত দুনয়ন জ্বলে
শোণিতে মাখানো কায়া—

কিকথা বলিতে চাহিল কুমার,
ভয়ে হ'ল কথা রোধ,
জলদ-গভীর-স্বরে কে কহিল
"প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—

হা রে কুলাঙ্গার! অক্ষত্র সন্তান,
এই কিরে তোর কায?
শপথ ভুলিয়া কাহার মেয়েরে,
বিবাহ করিলি আজ!

ক্ষত্রধর্ম্ম যদি প্রতিজ্ঞা পালন
হয়, কুলাঙ্গার, তবে
এচরণ ছুঁয়ে যে আজ্ঞা লইলি
সে আজ্ঞা পালিবি কবে!

নহিলে যদিন রহিবি বাঁচিয়া
দহিবে এমোর ক্রোধ।"
নীরব সে গৃহে ধ্বনিল আবার
"প্রতিশোধ-প্রতিশোধ"—

বুকের বসন হইতে কুমার
ছুরিকা লইল খুলি
ধীরে প্রতাপের বুকের উপরে
সে ছুরি ধরিল তুলি।

অধীর হৃদয় পাগলের মত,
থর থর কাঁপে পাণি—
কতবার ছুরি ধরিল সে বুকে
কতবার নিল টানি।

মাথার ভিতরে ঘুরিতে লাগিল
আঁধার হইল বোধ—
নীরব সে গৃহে ধ্বনিল আবার
"প্রতিশোধ প্রতিশোধ।"

ক্রমশঃ চেতন পাইল প্রতাপ
মালতী উঠিল জাগি
চারিদিক চেয়ে বুঝিতে নারিল
এসব কিসের লাগি।

কুমার তখন কহিলা সুধীরে
চাহি প্রতাপের মুখে
প্রতি কথা তার অনলের মত
লাগিল তাহার বুকে।

"একদা গভীর বরষা নিশীথে
নাই জাগি জন প্রাণী
সহসা সভয়ে জাগিয়া উঠিনু
শুনিয়া কাতর বাণী।

চাহি চারিদিকে—দেখিনু বিস্ময়ে
পিতার হৃদয় হোতে—
শোণিত বহিছে, শয়ন তাঁহার
ভাসিল শোণিত-স্রোতে।

কহিলেন পিতা অধিক কি কব
আসিছে মরণ বেলা—
এই শোণিতের প্রতিশোধ নিতে
না করিবে অবহেলা।

হৃদয় হইতে টানিয়া ছুরিকা
দিলেন আমার হাতে
সে অবধি সেই বিষম ছুরিকা
রাখিয়াছি সাথে সাথে।

করিনু শপথ ছুঁইয়া কৃপাণ
শুন ক্ষত্র-কুল-প্রভু—
এর প্রতিশোধ তুলিব—তুলিব
না হবে অন্যথা কভু।

কি তাহার নাম জানিতাম নাকো
ভ্রমিনু সকল গ্রাম——
অধীরে প্রতাপ উঠিল কহিয়া
"প্রতাপ তাহার নাম!

এখনি-এখনি ওই ছুরি তব
বসাইয়া দেও বুকে
যে জ্বালা হেথায় জ্বলিছে—কেমনে
কব তাহা এক মুখে?

নিভাও সে জ্বালা—নিভাও সে জ্বালা
দাও তার প্রতিফল—
মৃত্যু ছাড়া এই হৃদি-অনলের
নাই আর কোন জল।

কাঁদিয়া উঠিল মালতী কহিল
পিতার চরণ ধ'রে,
"ও কথা বলোনা—বোলোনা গো পিতা,
যেওনা ছাড়িয়ে মোরে!—

কুমার—কুমার—শুন মোর কথা,
এক ভিক্ষা শুধু মাগি,—
রাখ মোর কথা, ক্ষম গো পিতারে,
দুখিনী আমার লাগি!—

শোণিত নহিলে, ও ছুরির তব,
পিপাসা না মিটে যদি,
তবে এই বুকে, দেহ গো বিঁধিয়া,
এই পেতে দিনু হৃদি!"

আকাশের পানে, চাহিয়া কুমার,
কহিল কাতর স্বরে,
ক্ষমা কর পিতা, পারিব না আমি,
কহিতেছি সকাতরে!

অতি নিদারুণ, অনুতাপ শিখা,
দহিছে যে হৃদি তল,
সে হৃদয় মাঝে, ছুরিকা বসায়ে,
বল গো কি হবে ফল?

অনুতাপী জনে, ক্ষমা কর পিতা!
রাখ এই অনুরোধ!"
নীরব সে গৃহে, ধ্বনিল আবার,
প্রতিশোধ!—প্রতিশোধ!—

হৃদয়ের প্রতি শিরা উপশিরা
কাঁপিয়া উঠিল হেন—
সবলে ছুরিকা, ধরিল কুমার,
পাগলের মত যেন।

প্রতাপের সেই, অবারিত বুকে,
ছুরি বিধাইল বলে।
মালতী বালিকা, মূর্চ্ছিয়া পড়িল,
কুমারের পদ তলে।

উন্মত্ত হৃদয়ে, জ্বলন্ত নয়নে,
বদ্ধ করি হস্ত মুঠি—
কুটীর হইতে, পাগল—কুমার,
বাহিরেতে গেল ছুটি,

এখনো কুমার, সেই বন মাঝে,
পাগল হইয়া ভ্রমে।
মালতী বালার, চির মূর্চ্ছা আর,
ঘুচিল না এ জনমে!

স্যাক্‌সন জাতি ও অ্যাঙ্গ্লো স্যাক্‌সন সাহিত্য।

এই প্রবন্ধে স্যাক্‌সন জাতির আচার ও ব্যবহার, ভাষা ও সাহিত্য বিস্তৃত-রূপে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যে ভিত্তির উপর আধুনিক ইংরাজি মহা-সাহিত্য স্থাপিত আছে সেই আঙ্গ্লো স্যাক্‌সন ভাষা ও সাহিত্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে এবং যে ভিত্তির উপর সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর স্বরূপ ইংরাজ জাতি আদৌ স্থাপিত, সেই স্যাক্‌সনদের রীতি নীতি সমালোচনা করিয়া দেখিতে আজ আমরা প্রবৃত্ত হইলাম। কিড্‌মন, বিউল্ফ্‌, মাস, টেন প্রভৃতির সার সংগ্রহ করিয়া আজ আমরা পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি।

রোমানেরা ব্রিটনে রাজ্য স্থাপন করিলে পর এক দল শেলট (celt) তাহাদের বশ্যতা স্বীকার না করিয়া ওয়েল্‌স ও হাইল্যাণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইল। যাহারা রোমকদের অধীন হইল তাহাদের মধ্যে রোমক সভ্যতা ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইতে লাগিল। রোমকদের অধিকৃত দেশে প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মিত হইল, দৃঢ় প্রাচীরে নগর সমূহ বেষ্টিত হইল—বাণিজ্য ও কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হইল—নর্দাম্বর্লণ্ডের লৌহ, সমার্সেটের শীষক, কর্ণওয়ালের টিনখনি আবিষ্কৃত হইল। কিন্তু বাহিরে সভ্যতার চাকচিক্য যেমন বাড়িতে লাগিল, ভিতরে ভিতরে ব্রিটনের শোণিত ক্ষয় হইয়া আসিতে লাগিল। রোমকেরা তাহাদের সকল বিষয়ের স্বাধীনতা অপহরণ করিল—তাহাদিগকে বিদ্যা শিখাইল—উন্নততর ধর্ম্মে দীক্ষিত করিল—সভ্যতা ও অসভ্যতার প্রভেদ দেখাইয়া দিল—কিন্তু কি করিয়া স্বদেশ শাসন করিতে হয় তাহা শিখাইল না। সুশাসনে থাকাতে জেতৃজাতির উপর তাহারা সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিল—কখনো যে বিপদে পড়িতে হইবে সে কথা ভুলিয়া গেল, সুতরাং আত্মরক্ষণের ভাব অন্তর্হিত ও পরপ্রত্যাশার ভাব তাহাদের চরিত্রে বদ্ধমূল হইল। এইরূপ অস্বাস্থ্যকর সভ্যতা সে জাতির সর্ব্বনাশ করিল। রোমকদের কর-ভারে নিপীড়িত হইয়াও তাহাদের একটি কথা বলিবার যো ছিল না। এক দল জমীদারের দল উত্থিত হইল—ও সেই সঙ্গে কৃষক দলের অধঃপতন হইল—কৃষকেরা জমীদারদের দাস হইয়া কাল যাপন করিতে বিধান পাইল। এইরূপে রোমকদিগের অধিকৃত ব্রিটনেরা ভিতরে ভিতরে দুর্ব্বল হইয়া আসিল। রোমক পুঁথি পড়িতে ও রোমক ভাষায় কথা কহিতে শিখিয়াই তাহারা মনে করিল ভারি সভ্য হইয়া উঠিয়াছি ও স্বাধীন শেলট ও পিক্টদিগকে অসভ্য বলিয়া মনে মনে মহা ঘৃণা করিতে লাগিল। প্রায় চারি শতাব্দী ইহাদের এইরূপ মোহময় সুখ-নিদ্রায় নিদ্রিত রাখিয়া সহসা

এক দিন রোমকেরা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল। গথেরা ইটালি আক্রমণ করিয়াছে, সুতরাং রোমকেরা নিজদেশ রক্ষা করিতে ব্রিটন ছাড়িয়া স্বদেশে চলিয়া গেল, আর ফিরিল না। অসভ্যতর শেল্‌ট পিক্ট, স্কট প্রভৃতি সামুদ্রিক দস্যুগণ চারিদিক হইতে ঝাঁকিয়া পড়িল—তখন সেই অসহায় সভ্য জাতিগণ কাঁপিতে কাঁপিতে জর্ম্মণী হইতে অর্থ দিয়া সৈন্য ভাড়া করিয়া আনিল। হেঙ্গেষ্ট ও হর্ষা তাহাদের সাহায্য করিতে সৈন্য লইয়া এবস্‌ফ্লিটে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইল।

ইহারাই (Angles) আঙ্গল্‌স্। ব্রিটনেরা এবং রোমকেরা ইহাদিগকে স্যাক্‌সন বলিত। ইহাদের ভাষার নাম Seo Englisce Spræc অর্থাৎ English Speech. হলাণ্ড হইতে ডেন্মার্ক পর্য্যন্ত ঐযে সমুদ্র-সীমা দেখিতেছ, মেঘময়, কুজ্‌ঝটিকাচ্ছন্ন আর্দ্র ভূমি বিস্তৃত রহিয়াছে—বহু শতাব্দী পূর্ব্বে উহা নিবিড় অরণ্যে আবৃত ছিল, সেই আরণ্য ভূভাগ অ্যাঙ্গল্‌স্‌দের বাসস্থান ছিল। এমন কদর্য্য স্থান আর নাই। বৃষ্টি ঝটি গ মেঘে সেই দেশের মস্তকের উপ রব না অ অভিশাপের অন্ধকার বিস্তার রে রাখিয়াছে রাত্রি উন্মত্ত জলধি তীর-ভূমি করিতেছে—এই ক্ষুভিত সমুদ্রের মুখে কোন জাহাজের সহজে নিস্তার নাই। এই সমুদ্রতীরে, তুষার কুজ্‌ঝটিকাচ্ছন্ন-ঝঞ্ঝা-ঝটিকা-ক্ষুব্ধ অন্ধকার অরণ্যে ও জলায় শোণিত-পিপাসু সমুদ্রিক দস্যুদল বাস করিত। এই মনুষ্যশিকারীরা জীবনকে তৃণ জ্ঞান করিত। সেই সময়কার রোমক কবি কহিয়াছেন "তাহারা আমাদের শত্রু; সমুদয় শত্রু অপেক্ষা হিংস্র, এবং যেমন হিংস্র তেমনি ধূর্ত্ত। সমুদ্র তাঁহাদের যুদ্ধ-শিক্ষালয়, ঝটিকা তাহাদের বন্ধু; এই সমুদ্র-ব্যাঘ্রেরা পৃথিবী লুণ্ঠন করিবার জন্যই আছে।" তাহারা আপনারাই গাহিত "ঝটিকা-বেগ আমাদের দাঁড়ের সহায়তা করে—আকাশের নিশ্বাস স্বরূপ বজ্রের গর্জ্জন আমাদের হানি করিতে পারে না—ঝঞ্ঝা আমাদের ভৃত্য—আমরা যেখানে যাইতে ইচ্ছা করি সে আমাদের সেই খানেই বহন করিয়া লইয়া যায়।" স্ত্রীলোক এবং দাসদের উপর ভূমি কর্ষণ ও পশুপালনের ভার দিয়া ইহারা সমুদ্র ভ্রমণ, যুদ্ধ ও দেশলুণ্ঠন করিতে যাইত। রক্তপাত করাই তাহারা মুক্ত স্বাধীন জাতির কার্য্য বলিয়া জানিত—স্বাধীনতা ও মুক্ত ভাবের ইহাই তাহাদের আদর্শ ছিল। নরহত্যা ও রক্তপাত তাহাদের ব্যবসায়, ব্যবসায় কেন, তাহাই তাহাদের আমোদ ছিল। Ragnar Lodbrog নামক গাথক গাহিতেছে—"অসি দিয়া আমরা তাহাদিগকে কাটিয়া ফেলিলাম;—আমার সুন্দরী পত্নীকে যখন প্রথম আমার পার্শ্বে শয্যায় বসাইলাম তখন আমার যেরূপ আমোদ হইয়াছিল, সেই সময়েও কি আমার তেমনি আমোদ হয় নাই?" যখন (Egil) এজিল ডেন্মার্কবাসী জার্লের কন্যার পার্শ্বে উপবেশন করিল, তখন সেই কন্যা তাঁহাকে "তিনি কখনো নেকড়িয়া বাঘদিগকে গরম গরম মনুষ্য মাংস খাইতে

দেন নাই ও সমস্ত শরৎকালের মধ্যে মৃতদেহের উপর কাক উড়িতে দেখেন নাই" বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়া দূরে ঠেলিয়া দিল। তখন এজিল এই বলিয়া তাহাকে শান্ত করে "আমি রক্তাক্ত অসি হস্তে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছি, নর-দেহ-লোলুপ কাকেরা আমার অনুসরণ করিয়াছে। দারুণ যুদ্ধ করিয়াছি এবং মনুষ্য আলয়ের উপর দিয়া অগ্নি চলিয়া গিয়াছে। যাহারা দ্বার রক্ষা করিতে নিযুক্ত ছিল, তাহাদিগকে রক্তের উপর ঘুম পাড়াইয়াছি।" তখনকার কুমারীদের সহিত এই রূপ কথোপকথন চলিত। ইহাদের গ্রামবাসীদের সম্বন্ধে ট্যাসিটস্ বলেন যে তাঁহারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ আপনার আপনার লইয়াই থাকে। এমন বিজন নৈমাত্রতন্ত্র্যপ্রিয় জাতি আর নাই। প্রত্যেক রাজ্যবাসী যেমন আপনার ভূমিটুকু লইয়া স্বতন্ত্র থাকে তেমনি আবার প্রত্যেক গ্রাম অন্য গ্রামের সহিত স্বতন্ত্র থাকিতে চায়। প্রত্যেক গ্রাম চারি ধারে অরণ্য। পোড়ো-ভূমির দ্বারা ঘেরা থাকে—সে ভূমি কোন বিশেষ ব্যক্তির অধিকারভুক্ত নহে—সেই খানে দোষী ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড হইত—এবং সেই খানে সকল প্রকার উপদেবতার আবাস বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল। যখন কোন নূতন ব্যক্তি সেই অরণ্য বা পোড়োভূমির মধ্যে আসিত তখন তাহাকে শৃঙ্গা বাজাইয়া আসিতে হইত। নিঃশব্দে আসিলে শত্রু জ্ঞান করিয়া যাহার ইচ্ছা সেই তাহাকে বধ করিতে উত্থিত হইত। ইহাদের সকলেরই প্রায় একটু একটু ভূমি থাকিত, এবং যাহাদের এইরূপ ভূমি থাকিত তাহাদের নাম (churl) কার্ল্ (মনুষ্য) ছিল। তাহাদিগকে Freenacked man (মুক্তস্কন্ধ) কহিত—অর্থাৎ তাহাদের কোন প্রভুর নিকট স্কন্ধ নত করিতে হইত না। তাহাদের আর এক নাম ছিল "শস্ত্রধারী" অর্থাৎ তাহাদেরই অস্ত্রবহন করিবার অধিকার ছিল। প্রথমে ইহাদের মধ্যে বিচার-প্রণালী ছিল না—প্রত্যেক মনুষ্য আপনার আপনার প্রতিহিংসা সাধন করিত। ক্রমে ন্যায় ও বিচার প্রচলিত হইল। তখনকার অপরিস্ফুট দণ্ডনীতি বলেন—চোখের বদলে চোখ, প্রাণের বদলে প্রাণ দাও, কিম্বা তার উপযুক্ত মূল্য দাও। যাহার যে অঙ্গ তুমি নষ্ট করিবে, তোমার নিজের সেই অঙ্গ দান করিতে হইবে, কিম্বা তাহার উপযুক্ত মূল্য দিতে হইবে। এ মূল্য যে দোষী ব্যক্তিই দিবে তাহা নহে, দোষী ব্যক্তির পরিবার আহত ব্যক্তির পরিবারকে দিবে। প্রত্যেক কুটুম্ব তাঁহার অন্য কুটুম্বের রক্ষক, এক জনের জন্য সকলে দায়ী, ও এক জনের উপর আর কেহ অন্যায়াচরণ করিলে সকলে তাহার প্রতিবিধান করিবেন। ইহাদের মধ্যে বিশেষ পুরোহিত কেহ ছিল না—প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার আপনার পুরোহিত।

নিপীড়িত ব্রিটিষ জাতীয়েরা এই অ্যাঙ্গল্‌স্ সৈন্যদিগকে অর্থ দিয়া ভাড়া করিয়া আনিল। কিন্তু দেখিতে দেখিতে ঝাঁকে ঝাঁকে অ্যাঙ্গল্‌স্‌রা ব্রিটনে আসিয়া পড়িল। ব্রিটিষদিগের এত টাকা ও খাদ্য দিবার সামর্থ্য ছিল না, সুতরাং অবশেষে তাহাদেরই স-

হিত যুদ্ধ বাধিয়া গেল। দারুণ হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল—ধনিগণ সমুদ্রপারে পলায়ন করিল। দরিদ্র অধিবাসীরা পার্ব্বত্য প্রদেশে লুকাইয়া রহিল, কিন্তু আহারাভাবে সেখানে অধিক দিন থাকিতে না পারিয়া বাহির হইয়া পড়িত, অমনি নিষ্ঠুর স্যাক্‌সনদের তরবারি-ধারে নিপতিত হইত। দরিদ্র কৃষকেরা গির্জ্জায় গিয়া আশ্রয় লইত—কিন্তু গির্জ্জার উপরেই স্যাক্‌সনদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্রোধ ছিল। গির্জ্জায় আগুন ধরাইয়া দিয়া আচার্য্যদিগকে বধ করিয়া একাকার করিত, কৃষক বেচারীরা আগুন হইতে পলাইয়া আসিয়া স্যাক্‌সনদের তরবারিতে নিহত হইত। ফ্র্যাঙ্ক জাতিরা গল্ অধিকার করিলে ও লম্বর্ডিগণ ইটালি অধিকার করিলে জেতারাই সভ্যতর জিত জাতিদের মধ্যে লোপ পাইয়া যায়, কিন্তু ইংলণ্ডে ঠিক তাহার বিপরীত হয়—স্যাক্‌সনেরা একেবারে ব্রিটন জাতিকে ধ্বংশ করিয়া ফেলে। দুই শতাব্দী ক্রমাগত যুদ্ধ ও ক্রমাগত হত্যা করিয়া স্যাক্‌সনেরা ব্রিটনের আদিম অধিবাসীদের বিলোপ করিয়া দেয়। তখন ইংলণ্ড তাহাদেরই দেশ হইল। অল্প স্বল্প দুই একটি ব্রিটন যাহারা অবশিষ্ট ছিল তাহারা কেহ কেহ স্যাক্‌সন প্রভুর দাস হইয়া রহিল, কেহ কেহ বা ওয়েল্‌স্ ও হাইলণ্ডের দুর্গম প্রদেশে পলাইয়া গেল। এখনো শেল্‌টিক ভাষা-প্রসূত এক প্রকার ভাষা ওয়েল্‌সে চলিত আছে।* ইংরাজি ভাষায় শেল্‌টিক উপাদান খুব অল্পই পাইবে। নবম হইতে দ্বাদশ শতব্দী পর্য্যন্ত কেবল কেল্‌টিক বা শেণ্টিক কথা ইংরাজি ভাষায় প্রচলিত ছিল।

রোমকেরা যখন ইংলণ্ড বিজয় করিয়া ছিলেন তখন অধিকৃত জাতিদিগের রাজভাষা লাটিন ছিল। কিন্তু অ্যাঙ্গ্লো স্যাক্‌সন ভাষায় তখনো লাটিনের কোন চিহ্ন পড়ে নাই। ইংলণ্ডের কতকগুলি দেশের নাম কেবল রোমীয় ধাতু হইতে উৎপন্ন হয়। তাহা ব্যতীত দুএকটি অন্য কথাও রোমীয় ধাতু হইতে প্রস্তুত হইয়াছিল, যেমন Cheese পনির কথা লাটিন Casens হইতে উৎপন্ন। স্যাক্‌সন munt পর্ব্বত কথা বোধ হয় লাটিন mons হইতে গৃহীত হইয়াছে। পর্ব্বত প্রভৃতিরা মুক্ত পদার্থের নামও যে অন্য ভাষানিত—গৃহীত হইবে, ইহা কতকটা তাহা- বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু ক্রপাত সমুদ্রের তীরে বা তাহার নিকটে যাহাই ও পর্ব্বত নাই, সুতরাং সে দেশীbrogরা যে পর্ব্বতের নাম না জানিবে [illegible]তে আশ্চর্য্য নাই।

জর্ম্মাণ জাতিরা যখন স্পেন গল ও ইতালি জয় করিয়াছিল, তখনো সে দেশের

* যে জাতিরা অ্যাঙ্গ্লোস্যাক্‌সন দলভুক্ত নয়, অথচ অ্যাঙ্গ্লোস্যাক্‌সনদের দেশের সীমায় বাস করিত, তাহাদিগকে স্যাক্‌সনেরা Wealhas বলিত, ইহা হইতেই Wales নামের উৎপত্তি। এই কারণ বশতই ইটালির জর্ম্মাণ নাম Welsch land. ঐ কারণেই আরো অনেক দেশকে জর্ম্মণেরা Welsh walloon, wallachia [illegible]মে অহিত করিয়া থাকে।

ধর্ম্ম, সামাজিক আচার ব্যবহার, ও শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু জর্ম্মাণ জাতিরা ব্রিটন দ্বীপ যেরূপ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিল এমন আর কোন দেশ পারে নাই। রোমীয় সভ্যতার ধ্বংশাবশেষের উপর সম্পূর্ণরূপে জর্ম্মাণ সমাজ নির্ম্মিত হইল। ব্রিটিষ আচার ব্যবহার, ইতালীর সভ্যতা, সমস্ত ধ্বংশ হইয়া গেল, এবং এই সমতলীকৃত ভূমির উপর আর এক প্রকার নূতনতর ও উন্নততর সভ্যতার বীজ রোপিত হইল।

যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে স্যাক্‌সনদের রাজার প্রয়োজন হইল। পূর্ব্বে তাহাদের রাজা ছিল না। যখন কোথাও যুদ্ধ করিতে যাইত তখন একজনকে প্রধান বলিয়া লইয়া যাইত মাত্র। কিন্তু একটা দেশ অধিকার করিয়া রাখিতে হইলে ও ক্রমাগত তদ্দেশবাসীদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ বাধিলে রাজা নহিলে চলে না। হেঙ্গেষ্টের উত্তরাধিকারীরা কেল্‌টের রাজা হইল। এই সকল যুদ্ধে স্যাক্‌সন জাতিদের মধ্যে দাস-সংখ্যা বাড়িয়া উঠিল। যুদ্ধে বন্দী হইলে উচ্চ শ্রেণীস্থদিগকেও দাস হইতে হইত, এবং মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যও দাসত্ব অনেকে আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিত। ঋণ শুধিতে না পারিয়া অনেককে উত্তমর্ণের দাস হইতে বাধ্য হইতে হইত। বিচারে অপরাধী ব্যক্তির পরিবারেরা জরিমানা দিতে না পরিলে সে দোষী ব্যক্তিকে দাসত্ব ভোগ করিতে হইত। এইরূপে স্যাক্‌সনদের মধ্যে একটা দাসজাতি উত্থিত হইল। দাসের পুত্রও দাস হইত। ইহা হইতেই এই ইংরাজি প্রবাদ উৎপন্ন হয় যে, আমার গরুর বাছুর আমারি সম্পত্তি। দাস পলাইয়া গেলে পর ধরিতে পারিলে তাহাকে চাবুক মারিয়া মারিয়া খুন করিত বা স্ত্রীলোক হইলে তাহাকে দগ্ধ করিয়া মারিত। যখন ব্রিটনদের সহিত যুদ্ধ কতকটা ক্ষান্ত হইল, তখন তাহাদের আপনাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। নর্দাম্বরলণ্ডের রাজা ইয়ল্‌ফ্রিথ্ অন্যান্য অনেক ইংলিস রাজ্য জয় করিলেন। কেবল কেণ্টের রাজা ইথ্‌ল্‌বার্ট তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ইয়ল্‌ফ্রিথের অকস্মাৎ মৃত্যুতে এই দুই রাজ্যের মধ্যে তেমন বিবাদ বাধিতে পারে নাই। এই সময়ে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ধীরে ধীরে ইংলণ্ডে প্রবেশ করিল। প্যারিসের খ্রীষ্টান রাজকন্যা বাক্‌টার সহিত ইথ্‌ল্‌বার্টের বিবাহ হইল। রাজ্ঞীর সহিত একজন খ্রীষ্টান পুরোহিত কেণ্টের রাজধানীতে আসিল। এই বিবাহ-বার্ত্তা শ্রবণে সাহস পাইয়া পোপ গ্রেগরি সেণ্ট অগষ্টিনকে ইংলণ্ডে ক্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিতে পাঠাইয়া দিলেন। কেণ্টের অধিপতি তাহাদের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিলেন ও কহিলেন "তোমাদের কথাগুলি বেশ, কিন্তু নূতন ও সন্দেহজনক। তিনি নিজে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন না, কিন্তু খ্রীষ্টানদিগকে আশ্রয় দিতে স্বীকার করিলেন। প্রচলিত ধর্ম্মের সহিত অনেক যুঝাযুঝির পর খৃষ্টান ধর্ম্ম ইংলণ্ডে স্থান পাইল।

ইংলণ্ড-বিজেতাদের যে সকলেরই এক

ভাষা ও এক জাতি ছিল তাহা নহে। এই খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রবেশ করিয়া তাহাদের ভাষা ও জাতি অনেকটা এক করিয়া দিল। এই ভাষার ঐক্য সাহিত্যের অল্প উন্নতির কারণ নহে। খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অক্ষরে লিখা প্রচলিত ছিল না। খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রবেশ করিলে পর স্যাক্‌সনেরা নব উদ্যমে উদ্দীপ্ত হইল ও তাহাদের হৃদয়ের উৎস উন্মুক্ত হইয়া সঙ্গীত-স্রোতে অ্যাঙ্গ্লো-স্যাক্‌সন সাহিত্য পূর্ণ করিল। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার হওয়াতে স্যাক্‌সনদের মধ্যে রোমীয় সাহিত্য চর্চ্চার আরম্ভ হইল ও বাইবেলের কবিতার উচ্চ আদর্শ স্যাক্‌সনেরা প্রাপ্ত হইল। যুদ্ধোন্মাদে মত্ত থাকিয়া যে জাতি বিদ্যার দিকে মনোযোগ করিতে পারে নাই, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সহিত শান্তি ও ঐক্যে অভিষিক্ত হইয়া সম্মুখে যে ইতালীয় বিদ্যার খনি পাইল তাহাতেই তাহারা মনের সমুদয় উদ্যম নিয়োগ করিল। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করিবার জন্য তাহারা অ্যাঙ্গ্লো স্যাক্‌সন ভাষায় বাইবেল ও অন্যান্য লাটিন ধর্ম্মপুস্তক অনুবাদ করিতে লাগিল। ইহাতে যে ভাষার ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আঙ্গ্লো স্যাক্‌সন ভাষায় লিখিত অধিক প্রাচীন পুস্তক পাওয়া যায় না। অ্যাল্‌ফ্রেডের সময়েই প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত ভাষা Bec ledene (Book language) অর্থাৎ লিখিত ভাষা হইল। প্রাচীনতর পুস্তক যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারের পরে অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। প্রাচীনতম আঙ্গ্লোসাক্‌সন কাব্যের মধ্যে Lay of Beowulf প্রধান। ইহা কোন্ সময়ে যে রচিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। অনেকে অনুমান করেন খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে ইহা রচিত হইয়া থাকিবে। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবিতা অ্যাঙ্গ্লো স্যাক্‌সন ভাষায় পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু ইহার ধরণ, ভাব অন্যান্য অ্যাঙ্গ্লো স্যাক্‌সন কবিতার সহিত এত বিভিন্ন যে এই গীতি সাধারণ স্যাক্‌সন প্রতিভা হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে হয় না। স্কান্দিনেবীয় পৌরাণিক কবিতার সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। গল্পটির সার মর্ম্ম এই, ডহাম গ্রেণ্ডেল বলিয়া এক রাক্ষস ছিল, সে নিকটস্থ জলার মধ্য হইতে বাহির হইয়া রাত্রে গুপ্ত ভাবে তথাকার রাজবাটির মধ্যে প্রবেশ করিত ও গৃহস্থিত ঘুমন্ত যোদ্ধাদিগকে বিনষ্ট করিত; কেহ কেহ বলেন এই রাক্ষস জলার অস্বাস্থ্যজনক বাষ্পের রূপক মাত্র। বোউল্‌ফ নৃপতি তথায় গিয়া সেই রাক্ষসকে আহত ও নিহত করেন। তিনি ফেনগ্রীব (Foamy necked) জাহাজে চড়িয়া কিরূপে বিদেশীয় রাজ সভায় আইলেন এবং তাঁহার অন্যান্য কীর্ত্তি ইহাতে স্কান্দিনেবীয় সাগার ধরণে লিখিত। বোউল্‌ফ এক মহাবীর পুরুষ। "তিনি উন্মুক্ত অসি দৃঢ় হস্তে ধরিয়া ঘোরতর তরঙ্গে ও শীতলতম ঝঞ্ঝায় সমুদ্র পর্য্যটন করিয়াছেন, ও তাঁহার চারিদিকে শীতের তীব্রতা সমুদ্রের ঊর্ম্মির সহিত যুদ্ধ করিয়াছে।" কিন্তু তিনি তাহাদিগের কুঠার দিয়া বিদ্ধ করিলেন। নয় জন সিন্ধুদৈত্য

(NICOR) বিনাশ করিলেন। বৃদ্ধ রাজা হ্রথগার Hrothgar কে গ্রেণ্ডেল (Grendel) দৈত্যহস্ত হইতে নিস্তার করিবার জন্য অস্ত্রাদি কিছু না লইয়াই আসিলেন। আপনার শক্তির উপর নির্ভর করিয়া তিনি প্রাসাদে শুইয়া আছেন—"নিশীথের অন্ধকার উত্থিত হইল, ওই গ্রেণ্ডেল আসিতেছে, সকলে দ্বার খুলিয়া ফেলিল"—এক জন ঘুমন্ত যোদ্ধাকে ধরিল, "তাহার অজ্ঞাতসারে তাহাকে ছিঁড়িয়া ফেলিল, তাহাকে দংশন করিল, তাহার শিরা হইতে রক্তপান করিল, ও তাহাকে ক্রমাগত ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলিল।" এমন সময়ে বোউলফ্ উঠিলেন, দৈত্যকে আক্রমণ করিলেন। "প্রাসাদ কম্পিত হইল * * উভয়েই উন্মত্ত। গৃহ ধ্বনিত হইল, আশ্চর্য্য এই যে যে মদ্যশালা এই সংগ্রাম-শ্বাপদদিগকে বহন করিয়া ছিল, সে সুন্দর প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। শব্দ উত্থিত হইল, তাহা নূতন প্রকারের। যখন নর্থ ডেন্মার্কবাসীরা আপনাদের গৃহভিত্তির মধ্যে থাকিয়া শুনিল যে সেই ঈশ্বর-দ্বেষী আপন ভীষণ পরাজয়-সঙ্গীত গাহিতেছে, আঘাত-যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছে, তখন এক প্রকার ভয়ে তাহারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। * * সেই ঘৃণ্য হতভাগ্যের মৃত্যু-আঘাত পাইতে এখনো বাকি আছে—অবশেষে সে স্কন্ধে ভীষণ আঘাত পাইল—তাহার মাংসপেশী সমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল—অস্থির সন্ধিমূল বিভিন্ন হইল। সমরে বোউল্‌ফেরই জয় হইল।" বিচ্ছিন্ন হস্ত-পদ গ্রেণ্ডেল হ্রদে গিয়া লুকাইল। "সেই হ্রদের তরঙ্গ তাহার রক্তে ফুটিতে লাগিল। হ্রদের জল তাহার শোণিতের সহিত মিশিয়া উষ্ণ হইয়া উঠিল। রক্ত-বিবর্ণ জলে শোণিতের বুদ্বুদ উঠিতে লাগিল।" সেই খানেই তাহার মৃত্যু হইল। কিন্তু গ্রেণ্ডেলের মাতা, তাহার পুত্রের মত যাহার "অতি শীতল সলিলের ভীষণ স্থানে বাস নির্দ্দিষ্ট ছিল" সে এক দিন রাত্রে আসিয়া আর এক জন যোদ্ধাকে বিনাশ করিল। বোউল্‌ফ্ পুনরায় তাহাকে বধ করিতে চলিলেন। একটি পর্ব্বতের নিকট এক ভীষণ গহ্বর ছিল—সে গহ্বর নেকড়িয়া বাঘদের আবাস স্থান। পর্ব্বতের অন্ধকারে ভূমির নিম্ন দিয়া এক নদী বহিয়া যাইতেছে। বৃক্ষ সমূহ শিকড় দিয়া সেই নদী আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। রাত্রে সেখানে গেলে দেখা যায় সে স্রোতের উপর আগুন জ্বলিতেছে। সে অরণ্যে কেহ নেকড়িয়া বাঘ দ্বারা আক্রান্ত হইলে বরং তীরে দাঁড়াইয়া মরিয়া যাইবে তবুও সে স্রোতে লুকাইতে সাহস পাইবে না। অদ্ভুতাকৃতি পিশাচ (Dragon) ও সর্প সমূহ সেই স্রোতে ভাসিতেছে। বোউল্‌ফ্ সেই তরঙ্গে ডুব দিলেন; বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সেই রাক্ষসীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে তাঁহাকে মুষ্টিতে বদ্ধ করিয়া তাহার আবাস স্থানে লইয়া গেল। সেখানে এক বিবর্ণ আলোক জ্বলিতেছিল। সেই আলোকে সম্মুখাসম্মুখি দাঁড়াইয়া বীর সেই পাতালের বাঘিনী মহাশক্তি নাগিণীকে দেখিলেন।

অবশেষে তাহাকে বধ করিলেন। তাঁহার মৃত্যু-ঘটনা নিম্ন লিখিত রূপে কথিত আছে। পঞ্চাশ বৎসর তিনি রাজত্ব করিলে পর এক ড্র্যাগণ (Dragon) আসিয়া "অগ্নি-তরঙ্গে" মনুষ্য ও গৃহ নষ্ট করিতে লাগিল। বোউলফ্ এক লৌহ-চর্ম্ম নির্ম্মাণ করিলেন। এবং তাহাই পরিধান করিয়া একাকী যুদ্ধ করিতে গেলেন। "নৃপতির এমন উদ্ধত গর্ব্ব ছিল যে সেই পক্ষবান রাক্ষসের সহিত যুদ্ধে অধিক সঙ্গী ও সৈন্য লইয়া যাইতে চাহিলেন না।" কিন্তু তথাপি কেমন বিষণ্ণ হইয়া অনিচ্ছার সহিত গেলেন, কেন না এই বার তাঁহার অদৃষ্টে মৃত্যু আছে। সেই রাক্ষস অগ্নি উদ্গার করিতে লাগিল। তাহার শরীরে অস্ত্র বিদ্ধ হইল না। রাজা সেই অগ্নির মধ্যে পতিত হইয়া অতিশয় যন্ত্রণা পাইতে লাগিলেন। উইগ্লাফ্ ব্যতীত তাঁহার অন্য সমস্ত সহচর বনে পলায়ন করিল। উইগ্লাফ অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিল, এবং তাহাদের উভয়ের খড়্গাঘাতে সেই ড্রাগন বিচ্ছিন্ন-শরীর ও বিনষ্ট হইল। কিন্তু রাজার ক্ষতস্থান ফুলিয়া উঠিল ও জ্বলিতে লাগিল, "তিনি দেখিলেন তাঁহার বক্ষের মধ্যে বিষ ফুটিতেছে।" তিনি মৃত্যুকালে বলিলেন, "পঞ্চাশ বৎসর আমি এই সকল প্রজাদিগকে পালন করিয়াছি। এমন কোন রাজা ছিল না যে আমাকে ভয় দেখাইতে বা আমার নিকট সৈন্য পাঠাইতে সাহস করিত। আমার যাহা কিছু ছিল তাহা ভালরূপ রক্ষা করিয়াছি, কোন বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই, অন্যায় শপথ করি নাই। যদিও আমি মৃত্যু-আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি, এই সকল কারণে তথাপি আমার আনন্দ হইতেছে। প্রিয় উইগ্‌লফ! এখনি যাও, ঐ শ্বেত-প্রস্তর-শালা (দৈত্যের আবাস) অনুসন্ধান করিয়া দেখ, গুপ্ত ধন পাইবে। আমার জীবন দিয়া ধনরাশি ক্রয় করিয়াছি, উহা আমার প্রজাদের অভাবের সময় কাজে লাগিবে। আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার প্রজাদের জন্য এই যে ধন পাইয়াছি ইহার নিমিত্ত দেবতার নিকট ঋণী রহিলাম।' এই কাব্যের কবিতা যতই অসম্পূর্ণ হউক, ইহার নায়ক যে অতি মহান তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহাঁর চরিত্রে প্রতিপদে পৌরুষ প্রকাশ পাইতেছে। পরের উপকারের জন্য নিজের প্রাণ দিতে ইনি কখনো সঙ্কুচিত হন নাই। সেই সময়কার সমাজের অসভ্য অবস্থায় এরূপ চরিত্র যে চিত্রিত হইতে পারিবে ইহা একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

অ্যাঙ্গ্লো স্যাক্‌সন কবিতা হৃদয়ের কথা মাত্র, আর কিছুই নহে। ইহাতে চিন্তার কোন সংশ্রব নাই। ইহার কবিতা কতকগুলি ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথার সমষ্টিমাত্র—ছন্দও তেমনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা, ঠিক যেন হৃদয়ের পূর্ণ উচ্ছ্বাসের সময় সকল কথা ভাল করিয়া বাহির হইতেছে না। "সৈন্যদল যাইতেছে, পাখিরা গাইতেছে, ঝিল্লীরব হইতেছে, যুদ্ধাস্ত্রের শব্দ উঠিতেছে—বর্ম্মের উপর] বর্ষাঘাতের ধ্বনি হইতেছে। ওই উজ্জ্বল চন্দ্র আকাশের তলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ভয়ানক দৃশ্য সকল দৃষ্টিগোচর হইল। * * প্রাঙ্গণে যুদ্ধ-কোলাহল উত্থিত হইল। তাহারা কাষ্ঠের ঢাল হস্তে ধারণ করিল। তাহারা মস্তকের অস্থিভেদ করিয়া অস্ত্র বিদ্ধ করিল। দুর্গের ছাদ প্রতিধ্বনিত হইল। * * অন্ধকার-বর্ণ অশুভদর্শন কাকেরা চারিদিকে উইলো-পত্রের ন্যায় উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।"

অ্যাঙ্গ্লো স্যাক্‌সন কবিতায় প্রেমের কথা নাই বলিলেও হয়;—কিন্তু বন্ধুত্ব ও প্রভুপ্রীতির সুন্দর বর্ণনা আছে। "বৃদ্ধ রাজা তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুচরকে আলিঙ্গন করিলেন—দুই হস্তে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন, বৃদ্ধ অধিপতির কপোল বাহিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইল, সে বীর তাঁহার এত প্রিয় ছিল। তাঁহার হৃদয় হইতে যে অশ্রুধারা উত্থিত হইল তাহা নিবারণ করিলেন না! হৃদয়ে মর্ম্মের গভীর তন্ত্রীতে তাঁহার প্রিয় বীরের জন্য গোপনে নিশ্বাস ফেলিলেন।"

কোন দেশান্তরিত ব্যক্তি তাহার প্রভুকে স্বপ্নে দেখিতেছে—যেন তাঁহাকে আলিঙ্গন, চুম্বন করিতেছে, যেন তাঁহার ক্রোড়ে মাথা রাখিতেছে। অবশেষে যখন জাগিয়া উঠিল যখন দেখিল সে একাকী, যখন দেখিল সম্মুখে জনশূন্য প্রদেশ বিস্তীর্ণ, সামুদ্রিক পক্ষীরা পক্ষবিস্তার করিয়া তরঙ্গে ডুব দিতেছে, বরফ পড়িতেছে, তুষার জমিতেছে, শিলাবৃষ্টি হইতেছে, তখন সে কহিয়া উঠিল—

"কতদিন আনন্দের সহিত আমরা মনে করিয়াছিলাম, [মৃত্যু ভিন্ন আর কিছুতেই আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না, অবশেষে তাহা মিথ্যা হইল, যেন আমাদের মধ্যে কখনো বন্ধুত্ব ছিল না। কষ্ট দিবার জন্য মানুষেরা আমাকে এই অরণ্যে এক ওক্ বৃক্ষের তলে এই গহ্বরে বাস করিতে দিয়াছে। এই মৃত্তিকার নিবাস অতি শীতল, আমি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। গহ্বর সকল অন্ধকার, পর্ব্বত সকল উচ্চ, কণ্টকময় শাখা প্রশাখার নগর, একি নিরানন্দ আলয়! * * * আমার বন্ধুরা এখন ভূগর্ভে—যাহাদের ভাল বাসিতাম, এখন কবর তাহাদিগকে ধারণ করিতেছে। কবর তাহাদের রক্ষা করিতেছে,—আর আমি একাকী ভ্রমিয়া বেড়াইতেছি। এই ওক্ বৃক্ষতলে এই গহ্বরে এই দীর্ঘ গ্রীষ্মকালে আমাকে বসিয়া থাকিতে হইবে।"

অ্যাঙ্গ্লো স্যাক্‌সন কবিতার ছন্দ বড় অদ্ভুত। ইহার মিল নাই বা অন্য কোন নিয়ম নাই, কেবল প্রত্যেক দ্বিতীয় ছত্রে দুই তিনটি এমন কথা থাকিবে যাহার প্রথম অক্ষর এক, যেমন—

Ne wæs her tha giet, nym the heol-
stersceado
Wiht geworden; ac thes wida grund
Stood deop and dim, drihtne fremde,
Idel and unnyt.

অ্যাঙ্গ্লো স্যাক্‌সন খ্রীষ্টান কবিদিগের মধ্যে প্রধান ও প্রথম, কিড্‌মন (Cædmon)। অনেক বয়স পর্য্যন্ত কিডমন কবিতা রচনা করিতে পারিতেন না। এক দিন এক

নিমন্ত্রণ সভায় সকলে বীণা লইয়া পর্য্যায়ক্রমে গান গাইতে ছিল; কিড্‌মন্ যেই দেখিলেন, তাঁহার কাছে বীণা আসিতেছে, অমনি আস্তে আস্তে সভা হইতে উঠিলেন এবং বাড়ি প্রস্থান করিলেন। এক দিন রাত্রে এক অশ্বশালায় চৌকি দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, স্বপ্ন দেখিলেন একজন কে যেন আসিয়া তাঁহাকে কহিতেছে, "কিড্‌মন্, আমাকে একটা গান শুনাও! কিড্‌মন্ কহিলেন "আমি যে গাইতে পারি না।' সে কহিল "তাহা হউক, তুমি গাহিতে পারিবে।' কিড্‌মন্ কহিলেন "কি গান গাইব।" সে কহিল "সৃষ্টির আরম্ভ বিষয়ে।" ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে কিড্‌মন্ আবেস্ হিল্‌ডার নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন; আবেস্ মনে করিলেন কিড্‌মন্ দেবপ্রসাদ পাইয়াছেন, তিনি কিড্‌মনকে তাঁহার দেবালয়ের সন্যাসী-দলভুক্ত করিয়া লইলেন। কৃত্তিবাস যেমন কথকতা শুনিয়া রামায়ণ লিখিতেন, তেমনি একজন কিড্‌মনকে বাইবল অনুবাদ করিয়া শুনাইত আর তিনি তাহা ছন্দে পরিণত করিতেন। আমাদের দেশের কবিদের সহিত, কিড্‌মনের স্বপ্ন আদেশের বিষয় কেমন মিলিয়া গিয়াছে।

সৃষ্টির বিষয়ে কিড্‌মন এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

গুহা-অন্ধকার ছাড়া ছিল না কিছুই!
এমহা অতলস্পর্শ আঁধার গভীর—
আছিল দাঁড়ায়ে শুধু শূন্য নিষ্ফল।
উন্নত ঈশ্বর তবে দেখিলা চাহিয়া
এই নিরানন্দস্থান! দেখিলা হেথায়
অন্ধকার, বিষণ্ণ ও শূন্য মেঘরাশি
রহিয়াছে চিরস্থির-নিশীথিনী ল'য়ে।
উত্থিত হইল সৃষ্টি ঈশ্বর আজ্ঞায়।
মহান্ ক্ষমতা বলে অনন্ত ঈশ্বর
প্রথমে স্বর্গ ও পৃথ্বী করিলা সৃজন।
নির্ম্মিলা আকাশ; আর এ বিস্তৃত ভূমি
সর্ব্বশক্তিমান প্রভু করিলা স্থাপন।
পৃথিবী তরুণ তৃণে ছিলনা হরিত,
সমুদ্র চিরান্ধকারে আছিল আবৃত,
পথ ছিল সুদূর-বিস্তৃত, অন্ধকার!
আদেশিলা মহাদেব জ্যোতিরে আসিতে
এমহা আঁধার স্থানে। মুহূর্ত্তে অমনি
ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল তাঁর। পবিত্র আলোক
এই মরুময় স্থানে পাইল প্রকাশ।

কিড্‌মন ইজিপ্টের ফ্যারাওর (Pharaoh) যুদ্ধে মৃত্যুবর্ণনা করিতেছেন—

ভয়ে তাহাদের হৃদি হইল আকুল!
মৃত্যু হেরি সমুদ্র করিল আর্ত্তনাদ,
পর্ব্বত-শিখর রক্তে হইল রঞ্জিত;
সিন্ধু রক্তময় ফেন করিল উদ্গার,
উঠিল মৃত্যু-আঁধার, গর্জ্জিল তরঙ্গ,
পলা'ল ইজিপ্ট-বাসী ভয়ে কম্পান্বিত!

* * *

সমুদ্র তরঙ্গ রাশি মেঘের মতন
ধাইয়া তাদের পানে, পড়িল ঝাঁপিয়া;
গৃহে আর কাহারেও হ'ল না ফিরিতে।
যেথা যায় সেখানেই উন্মত্ত জলধি—
বিনষ্ট হইয়া গেল তাহাদের বল,
উঠিল ঝটিকা ঘোর আকাশ ব্যাপিয়া,
করিল সে শত্রুদল দারুণ চীৎকার!

মৃত্যুর নিদানে বায়ু হল ঘনীভূত!

পাঠকেরা যদি মিল্‌টনের সয়তানের সহিত কিড্‌মনের সয়তানের তুলনা করিয়া দেখেন তবে অনেক সাদৃশ্য পাইবেন।

কেনবা সেবিব তাঁরে প্রসাদের তরে?
কেন তাঁর কাছে হব দাসত্বে বিনত?
তাঁর মত আমিও বিধাতা হ'তে পারি।
তবে শুন—শুন সবে বীর-সঙ্গিগণ
তোমরা সকলে মোর কর সহায়তা,
তাহ'লে এযুদ্ধে মোরা লভিব বিজয়!
সুবিখ্যাত, সুদৃঢ়-প্রকৃতি বীরগণ
আমারেই রাজা বোলে করেছে গ্রহণ।
সুযুক্তি দিবার যোগ্য ইহারাই সবে,
যুঝিব ঈশ্বর সাথে ইহাদের ল'য়ে!

* * *

ইহাদেরি রাজা হ'য়ে শাসিব এদেশ,
তবে কি কারণে হব তাঁহারি অধীন?
কখনো—কখনো তাঁর হইব না দাস।

আর এক স্থলে—

উচ্চ স্বর্গধামে মোরে করিলেন দান—
ঈশ্বর যে সুখ-ভূমি, সে স্থানের সাথে
এ সঙ্কীর্ণ আবাসের কি ঘোর প্রভেদ।
যদি কিছুক্ষণ তরে পাইগো ক্ষমতা—
এক শীত-ঋতু তরে হই মুক্ত যদি
তাহা হ'লে সঙ্গিগণ লোয়ে—কিন্তু হায়—
চারিদিকে রহিয়াছে লৌহের বাঁধন!
এই ঘোর নরকের দৃঢ়মুষ্টি মাঝে
কি দারুণ রূপে আমি হয়েছি আবদ্ধ!
ঊর্দ্ধে, নিম্নে জ্বলিতেছে বিশাল অনল—
এমন জঘন্য দৃশ্য দেখিনি কখনো!

বীরের নৈরাশ্য সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। অবশেষে সয়তান স্থির করিলেন যদি ঈশ্বর-সৃষ্ট মনুষ্যের কোন অপকার করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি "এই শৃঙ্খলের মধ্যে থাকিয়াও সুখে ঘুমাইবেন।"

ইতিমধ্যে ডেনিষরা একবার ইংলণ্ড আক্রমণ করিয়াছিল; কিন্তু অ্যালফ্রেড্ তাহাদিগকে দমন করেন। নবম শতাব্দীতে অ্যালফ্রেডের রাজত্ব কালে অ্যাঙ্গ্লোস্যাক্‌সন ভাষা ও সাহিত্য চরম উন্নত সীমায় পৌঁছিয়াছিল। অ্যালফ্রেডের এই একমাত্র বাসনা ছিল, যে যাহাতে "মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার সৎকার্য্যের স্মরণচিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারেন।" সে বিষয়ে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি একজন বলবান যোদ্ধা ছিলেন, ও তখনকার ইংলণ্ডের অন্যান্য রাজ্য অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়াছিল, ইচ্ছা করিলে হয়ত তিনি সমস্ত ইংলণ্ড বশে আনিতে পারিতেন। কিন্তু সে দিকে তাঁহার অভিলাষ ধাবিত হয় নাই, শান্তিস্থাপনা, সুশাসন, ও নিজ প্রজাদের মধ্যে সুশিক্ষা প্রচার করাই তাঁহার এক মাত্র ব্রত ছিল। অ্যালফ্রেডের যে অসাধারণ প্রতিভা বা উদ্ভাবনী শক্তি ছিল তাহা নহে, তাঁহার সৎ ইচ্ছা ও মহান্ অধ্যবসায় ছিল। তিনি তাঁহার উচ্চ আশা ও স্বার্থ পরিতৃপ্ত করিতে কিছু মাত্র মন দেন নাই, প্রজাদের মঙ্গলই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি দুঃখ করিয়া বলেন, যে এমন এক দিন ছিল যখন বিদেশ হইতে লোকে ইংলণ্ডে বিদ্যা শিখিতে আসিত, কিন্তু এখন বিদ্যা শিখিতে গেলে বিদেশীদের নিকট

শিখিতে হয়। এই অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য তিনি দেশীয় ভাষায় নানা পুস্তক অনুবাদ করিতে লাগিলেন। অ্যালফ্রেড যদিও অনেক লাটিন পুস্তক অনুবাদ করিয়াছিলেন তথাপি তাঁর লাটিন অতি অল্পই জানা ছিল; অতি প্রশংসনীয় সরলতার সহিত ইহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন; "যদি আমার চেয়ে কেহ অধিক লাটিন জান, তবে আমায় কেহ দোষ দিও না, কারণ প্রত্যেক মনুষ্য তাহার যে পর্য্যন্ত ক্ষমতা আছে, সেই অনুসারেই কথা কহিবে ও কাজ করিবে।" তাঁহার অনুবাদের মধ্যে স্থানে স্থানে লাটিনের অজ্ঞতা স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। অ্যালফ্রেডই অ্যাঙ্গ্লোস্যাক্‌সন ভাষায় গদ্যের প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা। তখনকার অজ্ঞলোকদের বুঝাইবার জন্য তাঁহার অনুবাদ যথাসাধ্য সহজ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এক ছত্র ভাঙ্গিতে গিয়া তাঁহাকে দশ ছত্র লিখিতে হইয়াছিল। ইহাঁর সময় হইতেই ইংলণ্ডের Chronicle অর্থাৎ ঐতিহাসিক বিবরণ লিখিত হয়। কিন্তু সে অতি শুষ্ক ও নীরস। তাহা ইতিহাসের কোন উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে নাই। তাহাতে তখনকার ব্যক্তিদিগের অবস্থার বিষয় কিছুই বর্ণিত হয় নাই, কেবল অমুক বৎসরে দুর্ভিক্ষ হইল, অমুক বৎসরে অমুক নগরে আগুন লাগিল, অমুক বৎসরে একটা ধূমকেতু উঠিল, ইত্যাদি কতকগুলি ঘটনার বিবরণ মাত্র লিখিত আছে।

আবার ডেনিষরা ইংলণ্ড আক্রমণ করে; এবার ইংলণ্ড তাহাদের হস্তগত হইল। ডেনিষদের সহিত স্যাক্‌সনদের ভাষা ও আচার ব্যবহারের বিশেষ কিছুই প্রভেদ ছিল না। কানুট প্রজাদের কিরূপ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। যাহা হউক, অ্যাঙ্গ্লো স্যাক্‌সন রাজত্বের শেষভাগে অ্যাঙ্গ্লো স্যাক্‌সন সাহিত্যের যথেষ্ট অবনতি হইয়া আসিয়াছিল। ধর্ম্মাচার্য্যগণ অলস বিলাসী অজ্ঞ, সাধারণ লোকেরা নীতি-ভ্রষ্ট ও ধূর্ত্ত হইয়া আসিতেছিল। এই সময় ইংলণ্ডে নর্ম্মান সভ্যতা-স্রোত প্রবেশ করিয়া দেশের ও ভাষার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিল। যাহা হউক, ডেনিষরাজ্য শীঘ্রই বিলুপ্ত হইল।

খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রবেশ করিলে পর ইংরাজি ভাষায় অনেক রোমীয় কথা প্রবেশ করে। কিন্তু নর্ম্মান অধিকারের সময়েই অধিকাংশ লাটিন ধাতুজাত কথা ইংরাজি ভাষায় প্রচলিত হয়। অনেক ডেনিষ কথা ইংরাজিতে পাওয়া যায়।

যখন স্যাক্‌সনেরা তাহাদের আদিম দেশে ছিল তখন তাহাদের স্বভাব কিরূপ ছিল তাহা বর্ণনা করিয়াছি। যখন ইংলণ্ডে আসিয়া তাহারা একটা স্থায়ী বাসস্থান পাইল, তখন তাহাদের বিলাসের দিকে দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু সে কিরূপ বিলাস? মুসলমানেরা ভারতবর্ষে আসিয়া যেরূপ বিলাসে মগ্ন হইয়াছিল, ইহা সে বিলাস নহে। যে বিলাসের সহিত সুকুমার বিদ্যার সংশ্রব আছে, ইহা সে বিলাস নহে। অ্যাঙ্গ্লোস্যাক্‌সনদের শিল্প দেখ, নাই বলিলেও হয়; তাহাদের কবিতা দেখ, কেবল

রক্তময়। কবিতার যে অংশের সহিত শিল্পের যোগ আছে—ছন্দ, তাহা স্যাক্‌সন ভাষায় অতি বিশৃঙ্খল। লাটিন সাহিত্যের আদর্শ পাইয়াও তাহাদের কবিতার ও ছন্দের বিশেষ কিছুই উন্নতি হয় নাই। স্যাক্‌সনদের হৃদয়ে সুন্দর-ভাবের আদর্শ ছিল না বলিয়াই মনে হয়—তাহাদের বিলাস আর কি হইতে পারে? আহার ও পান। সমস্ত দিন রাত্রি পানভোজনেই মত্ত থাকিত। এড্‌গারের সময় ধর্ম্মমন্দিরে অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত নাচ গান পান ভোজন চলিত। পৃথিবীর প্রথম যুগের অসহায় অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিয়া একটু অবসর পাইলেই, আর্য্যেরা, (আর্য্যেরা বলিলে যদি অতি বিস্তৃত অর্থ বুঝায় তবে হিন্দুরা) স্বভাবতই জ্ঞান উপার্জ্জনের দিকে মনোযোগ দিতেন, কিন্তু স্যাক্‌সনেরা তাহাদের অবসরকাল অতিবাহিত করিবার জন্য অদ্ভুত উপায় বাহির করিয়াছিল; সে উপায়টি—দিন রাত্রি অজ্ঞান হইয়া থাকা। তাহারা উত্তেজনা চায়, তাহারা ঋষিদের মত অমন বিজনে বসিয়া ভাবিতে পারে না—অসভ্য সঙ্গীত উচ্চৈঃস্বরে গাইয়া, যুদ্ধের নৃশংস আমোদে উন্মত্ত থাকিয়া তাহারা দিন যাপন করিতে চায়। রক্তপাত ও লুটপাট ছাড়া আর কথা ছিল না। দাস ব্যবসায় যদিও আইনে বারণ ছিল, কিন্তু সে বারণে কোন কাজ হয় নাই—নর্ম্মান রাজত্ব সময়ে দাস ব্যবসায় উঠিয়া যায়। গর্ভবতী দাসীদিগের মূল্য অনেক বলিয়া তাহারা স্ত্রী দাসী দিগের প্রতি জঘন্য আচরণ করিত। তবুও খ্রীষ্টধর্ম্ম ইহাদের অনেকটা নরম করিয়া আনিয়াছিল। স্যাক্‌সনদের বুদ্ধি তখন তীব্র নহে। তাহাদের মধ্যে প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি অতি অল্পই জন্মিয়াছে। তাহাদের কবিতার উপাখ্যান সমূহের ভালরূপ ধারাবাহিক যোগ নাই, তাহাদের কবিদের ঔপন্যাসিক ক্ষমতা তেমন ছিল না। স্যাক্‌সনদের মধ্যে বিদ্যা-প্রচার করিবার জন্য অনেক বার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু সে বিষয়ে কেহই কৃতকার্য্য হয় নাই। স্যাক্‌সন ধর্ম্মাচার্য্যদের মধ্যে যে বিদ্যা চর্চ্চার আরম্ভ হয় তাহা কয়েক শতাব্দী মাত্র থাকে, তাহার পরেই আবার সমস্ত অন্তর্হিত হইয়া যায়। নর্ম্মানরা আসিয়া স্যাক্‌সন খৃষ্ট-পুরোহিতদিগের অজ্ঞতা দেখিয়া অতিশয় বিরক্ত হয়। অ্যাঙ্গ্লোস্যাক্‌সন সাহিত্য অতি সামান্য। অ্যালফ্রেডের গদ্যগ্রন্থ ও বোউলফ্‌ এবং অন্যান্য দুই একটি কবিতা লইয়াই তাহাদের সাহিত্যের যথা-সর্ব্বস্ব।

স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও বীরত্ব স্যাক্‌সন জাতীয়দিগের প্রধান গুণ। তাহাদের সমস্ত স্বভাব পৌরুষেই গঠিত। সকলেই আপনার আপনার প্রভু। রাজার সহিত প্রজার তেমন প্রভেদ ছিল না—স্যাক্‌সন রাজ্যের শেষাশেষি সেই প্রভেদ জন্মে। জর্ম্মণীতে ভীরুদিগকে পঙ্কে পুঁতিয়া বিনষ্ট করিত। স্যাক্‌সনেরা যাহাকে প্রধান বলিয়া মানে তাহার জন্য সকলি করিতে পারে। যে তাহার প্রধানকে না লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে,

তাহার বড় অখ্যাতি। যে প্রধানের গৃহে তাহারা মদ্যপান করিয়াছে, যাহার নিকট হইতে বিশ্বাসের চিহ্ন তরবারি ও বর্ম্ম পাইয়াছে তাহার জন্য প্রাণদান করিতে তাহারা কাতর নহে—এভাব তাহাদের কবিতার যেখানে সেখানে প্রকাশ পাইয়াছে। স্যাক্সন জাতিদের কল্পনা ও সৌন্দর্য্য-প্রীতি ছিল না, তাহাদের চরিত্রে কার্য্যকরী বুদ্ধি ও পৌরুষ অতিমাত্র ছিল।

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

অবরোহ-প্রণালীতে সৃষ্টি-তত্ত্ব আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পথি-মধ্যে সাংখ্যের এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের অভিব্যক্তিবাদ লইয়া যে কিঞ্চিৎ কাল ক্ষেপণ করিলাম তাহা না করিয়া গম্যপথে অগ্রসর হইলে ভাল হইত, ইহা বলিতে পারি না। পথে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে পাথেয় সঙ্গ্রহ করা আবশ্যক,আমরা তাহাই করিলাম। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে এই একটি অমূলক মত ক্রমশ প্রশ্রয় পাইতেছে যে, জড় হইতে জ্ঞানের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। আমরা বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন করিয়া দেখাইয়াছি যে জড় হইতে জ্ঞানের অভিব্যক্তি বিজ্ঞান-শাস্ত্র মাত্রেরই অনভিমত। বিজ্ঞান-শাস্ত্র কেবল জড় বস্তুর গতি অথবা গতি-চেষ্টা, আয়তন এবং বাধা বিষয়ক নিয়ম যত কিছু তাহাই নির্ণয় করিয়া থাকেন। এক প্রকার গতি অন্য প্রকার গতির উপর কার্য্য করিয়া কিরূপ গত্যন্তর উৎপাদন করে, এবং কেন করে, ইহা বিজ্ঞান সুনিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন; কিন্তু গতি হইতে বোধ গঠিত হয় ইহা কোন বিজ্ঞান বলেনও না বলিতে পারেনও না। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, গতি জড়-পদার্থের স্থান পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই নহে; ও তাহা বহির্বস্তু হইতে বাধা প্রাপ্ত হইলে গত্যন্তরে পরিণত হয়, গতি গতিতেই পরিণত হয় তদ্ভিন্ন আর কিছুতেই পরিণত হইতে পারে না—সুতরাং বোধে পরিণত হইতে পারে না। কাজেই মানিতে হয় যে, বোধ জড়-পদার্থের গতি-পরিণাম নহে, তাহা অন্য কোন পদার্থের পরিণাম,—শেষোক্ত এই যে পদার্থ ইহাকে জ্ঞান-পদার্থ কহা যায়। এবিষয়ে সাংখ্যের মর্ম্ম এই যে, জ্ঞান, (সত্ত্বগুণ) গতি (রজোগুণ) এবং জড় বাধা (তমোগুণ) তিনটিই কোনটি বা অভিভূত কোনটি বা প্রাদুর্ভূত এইরূপ-ভাবে সৃষ্টির সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে, তাহার মধ্যে প্রথমটির (সত্ত্বগুণের) প্রাদুর্ভাবই সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য। আলোক পদার্থে গতির প্রাদুর্ভাব, এবং জড়ত্বের অভিভব এত অধিক যে আলোক এক মুহূর্ত্তে শতসহস্র যোজন-গামী হইলেও বাধা-প্রদ শক্তির অভাবে

অমন-যে তাহার প্রভূত বেগ তাহাতেও কাহারো গাত্রে একবিন্দু আঘাত লাগে না। গুরু-ভার জড়-বস্তুতে গতির অভিভব এবং বাধার প্রাদুর্ভাব দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ধাতু-প্রস্তরাদিতে জ্ঞানের অভিভব এবং জীবজন্তুতে (বিশেষত মনুষ্যতে) জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। গম্য পথের পাথেয় উল্লেখে যাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে ইঙ্গিত করিয়াছি তাহা এই যে,—পৃথিবীতে জ্ঞান উত্তরোত্তর-ক্রমে অভিব্যক্ত হয় ইহা সত্য কিন্তু তাহা বলিয়া জড় হইতে যে জ্ঞান অভিব্যক্ত হইবে ইহা কোন মতেই হইতে পারে না। সৃষ্টির মধ্যে যত জ্ঞান আছে সকলই জড় পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন, সেই পরিচ্ছদের বাধা অতিক্রম করিয়া জ্ঞান ক্রমশ উচ্চ হইতে উচ্চতর অভিব্যক্তি লাভ করিবে ইহাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। জ্ঞানের অভিব্যক্তিই যদি সৃষ্টির উদ্দেশ্য তবে জড়-বাধার প্রয়োজন কি? এ বিষয়ের মীমাংসা আমরা পূর্ব্বে করিয়া চুকিয়াছি, আমরা বলিয়াছি যে,—"যে বিষয় যত গভীর যত উৎকৃষ্ট তাহার আবির্ভাব ততই কাল-সাপেক্ষ। জগৎ যেরূপ অতলস্পর্শ 'গভীর রচনা,' তাহার প্রকাশও সেইরূপ অনন্ত-কাল-ব্যাপী। কবি যদি আপন অন্তঃকরণের সকল ভাব এক কালেই প্রকাশ করিতে যা'ন তাহা হইলে তাঁহার সে ভাব ভাব-মাত্রই থাকিয়া যায়, আবির্ভাবে পৌঁছিতে পারে না। কবি আপনার মনের নিগূঢ় কথা আপাততঃ অপ্রকাশ রাখিয়া ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিলে তবেই তাহা কাব্যরূপে আবির্ভূত হয়। কবির কাব্য এইরূপ যে ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুটতার দিকে অগ্রসর হয় তাহার মূল আদর্শ জানিবে ঈশ্বরের সৃষ্টি-প্রণালী। প্রকাশ হইয়াছে, অপ্রকাশ রহিয়াছে এবং অপ্রকাশের মধ্য হইতে প্রকাশের উপক্রম হইতেছে এই তিন অবস্থার উপর ভর করিয়া সমুদায় সৃষ্টি গম্য-পথে অগ্রসর হইতেছে। ইহা দেখিয়াই বোধ হয় সাংখ্য-দর্শন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে জগতের মূল উপাদান তিনটি—একটি প্রকাশক, আর একটি প্রকাশের বাধা-জনক, আর একটি বাধার প্রতিপক্ষ—প্রচালক।" জ্ঞানের অভিব্যক্তি যদিও সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য, তথাপি তাহা এমন লঘু বিষয় নহে যে তাহা এক মুহূর্ত্তেই শেষ হইয়া যাইবে। জ্ঞান ক্রমে ক্রমে জড়-বাধা অতিক্রম করিয়া করিয়া অভিব্যক্তি হইতে অভিব্যক্তি লাভ করিবে, এ ভিন্ন অভিব্যক্তি-লাভের অন্য কোন উপায় নাই। জ্ঞানের অনন্ত অভিব্যক্তি সৃষ্টির মুখ্য এবং চরম উদ্দেশ্য তাহার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু জড়-বাধা অতিক্রমণ ব্যতিরেকে সে অভিব্যক্তি সম্ভব না হওয়াতে জড়-বাধার নিতান্তই প্রয়োজন। এক কথায় এই যে সৃষ্টির মুখ্য প্রয়োজন যেমন জ্ঞানের অভিব্যক্তি, তাহার আনুষঙ্গিক প্রয়োজন সেইরূপ জড়ের বাধা এবং সেই বাধার প্রতিবিধান। গতি-ক্রিয়াকে জ্ঞান এবং জড় দুয়ের মধ্যবর্ত্তী সোপান বলিয়া ধরা যাইতে পারে। জড়-বাধা অতিক্রমণের জন্য জ্ঞান কর্ত্তৃক গতি

নিয়োজিত হয় এবং সেই গতি জড়-বাধা কর্ত্তৃক প্রতিহত হয়; পরিশেষে জ্ঞানেরই জয় হয়। এইরূপ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া,—জাগরণ সুপ্তি, উদ্যম অবসাদ, জীবন মৃত্যু, এইরূপ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া—জ্ঞান এক পা এক পা করিয়া উন্নতি-শিখরে অগ্রসর হইয়া থাকে।

জ্ঞানের অভিব্যক্তি-সাধনের প্রণালী এবং ক্রম-পদ্ধতি এক্ষণে বোধ গম্য হইবে; —মূলে এক অদ্বিতীয় নিরালম্ব অসীম জ্ঞান অসীম সত্য বর্ত্তমান; তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া জগতের বাধাক্রান্ত পরিমিত জ্ঞান ক্রমশই বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতেছে, অভিব্যক্তি লাভ করিতেছে। অত্যন্ত অস্ফুট, প্রসুপ্ত, মোহাচ্ছন্ন যে জ্ঞান, সেও চুপ করিয়া নাই; সে-ও কোন না কোন গতি প্রয়োগ করিতেছে, কোন না কোন বাধা অতিক্রমণ করিতেছে;—এ-যে করিতেছে এ কেবল পরমাত্মার আশ্রয়-গুণে—নিজ-গুণে নহে। আমরা যখন নিদ্রায় অভিভূত থাকি, তখন আমরা চেষ্টা করিয়া জাগিতে পারি না; তবুও যে আমরা যথাসময়ে জাগ্রত হইয়া আপনাকে পুনঃপ্রাপ্ত হই সে কেবল পরমাত্মার আশ্রয়-গুণে। পরমাত্মার অধ্যক্ষতা এবং আশ্রয়ের গুণে, সৃষ্ট-জ্ঞান, গতি-প্রয়োগ দ্বারা জড় বাধা অতিক্রম করিয়া উত্তরোত্তর আপনার অভিব্যক্তি সাধন করিতেছে—ইহাতেই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতেছে। জ্ঞানের অভিব্যক্তি-সাধনের ক্রম-পদ্ধতি এই রূপ;—পৃথিবী স্বীয় গতি-প্রভাবে সূর্য্যের আকর্ষণ-বাধা অতিক্রম করিয়া স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল—এটি কি? না পরিণামে যে জ্ঞানের অভিব্যক্তি হইবে তাহার প্রথম সোপান। পৃথিবীর আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া উদ্ভিদ্‌গণ আকাশাভিমুখে উত্থিত হইল—এইটি দ্বিতীয় সোপান। সচেতন জীব পৃথিবীর শৃঙ্খল ছেদন করিয়া স্বস্ব প্রবৃত্তি অনুসারে চলা বলা করিতে লাগিল—এইটি তৃতীয় সোপান। মনুষ্য প্রবৃত্তির আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া জ্ঞান-ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল এইটি চতুর্থ সোপান।

এই চতুর্থ সোপানেই জ্ঞান আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব উপলব্ধি করে, এবং তাহার সেই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব-বোধ সমুচিত পরিস্ফুট হইলে আপনার অবিনাশিত্ব বিষয়ে নিঃশঙ্ক হয়। পশ্বাদির জ্ঞান আপনার স্বতন্ত্র-অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহে; কিন্তু তাহা বলিয়া তাহা যে কিছুই নহে তাহা বলিতে পারি না। প্রকৃতির সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই যখন উন্নতি-পথে পদ-নিক্ষেপ করিতেছে তখন পশ্বাদির জ্ঞান যে সে-পথে একেবারেই বিমুখ হইবে ইহা সম্ভবে না। কোন জাতীয় বন্য পশু অপেক্ষা সেই জাতীয়গ্রাম্য পশুকে অনেক বিষয়ে উন্নত দেখা গিয়া থাকে। তবুও মনুষ্যের এবং পশ্বাদির জ্ঞানোন্নতি উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, মনুষ্য জানিয়া শুনিয়া উন্নতি-পথে চলে, পশ্বাদি জন্তুরা অজ্ঞাত-সারে উন্নতিপথে নীত হয়। ইহার কারণ এই যে, মনুষ্যের জ্ঞান আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকে. পশ্বাদির জ্ঞান তাহাতে অসমর্থ। পৃথিবীতে প্রথমে নিকৃষ্ট জন্তু এবং উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর জন্তু সৃষ্ট হইয়াছে, ইহাতে ত আর সংশয় নাই; এবং সৃষ্টির পূর্ব্বাপর যোগ আছে ইহাও ত সেই রূপ অকাট্য; অতএব পশু-বিশেষের জ্ঞান যে শরীর-চ্যুত হইলেই বিনষ্ট হয় ইহার প্রমাণাভাবে এই সিদ্ধান্তই যুক্তি সিদ্ধ হইতেছে যে, নিকৃষ্ট পশুর জ্ঞান মৃত্যুর পরে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট পশু-দেহ পরিগ্রহ করে; ক্রমে যখন প্রাকৃতিক জ্ঞান (অর্থাৎ ঐশ্বরিক জ্ঞান নহে—সৃষ্ট-জ্ঞান) আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বোধে অধিকারী হয়, তখন তাহা মনুষ্য-দেহ পরিগ্রহ করে। এস্থলে পশু-জ্ঞান এবং মনুষ্য-জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ এই যে, পশু-জ্ঞান মৃত্যুর পূর্ব্বেও যেমন মৃত্যুর পরেও তেমনি অজ্ঞাত-সারে উন্নতি-পথে নীত হয়—মনুষ্য-জ্ঞান মৃত্যুর পূর্ব্বেও যেমন মৃত্যুর পরেও তেমনি জানিয়া শুনিয়া উন্নতিপথে চলিতে থাকে।

জগতের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উন্নতি-পথে চলিতেছে, এবং সেই পথের অনুসরণেই সৃষ্ট-জ্ঞান মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হইয়া আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব-বোধ প্রাপ্ত হইয়াছে,—আর কি এখন সে-জ্ঞান সর্ব্ব-সেব্য উন্নতি-পথ পরিত্যাগ করিতে পারে? যখন জ্ঞান পরিস্ফুট হয় নাই তখন তাহার ক্রমশই উন্নতি হইয়াছে, আর যেই তাহা পরিস্ফুট হইল অমনি তাহার উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে ইহাও কি কখন হইতে পারে? সৃষ্ট-জ্ঞান উন্নতির উচ্চ সোপানে উত্তীর্ণ হইলে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব-বোধে সমুজ্জ্বল হয়; এবং যতই উচ্চতর সোপানে পদ-নিক্ষেপ করিবে তাহার সে ঔজ্জ্বল্য ততই বৃদ্ধি হইবে—ইহাই যুক্তি-সঙ্গত। তবে যদি এরূপ বল যে, বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হইলে জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য ক্রমশ হ্রাসই হয় বৃদ্ধি ত কই হয় না; তাহার উত্তর এই যে, ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টির একটি মূল-নিয়ম সুতরাং অনতিক্রমণীয়; রাত্রিকালেও যেমন, বার্দ্ধক্য দশাতেও তেমনি, জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পাইবেই, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার মূল যে উন্নতি তাহা বন্ধ হইতে পারে না। ভূমি-সম্পত্তির উপস্বত্বের সাময়িক হ্রাস বৃদ্ধিতে কিছুই আইসে যায় না, নিয়মিত রূপে স্থিত বৃদ্ধি হইতে থাকিলেই বলিতে পারা যায় যে, তাহার ক্রমশই উন্নতি হইতেছে। রাত্রি-অবসানে পর-দিবসে জ্ঞান উন্নতি লাভ করিবে, বার্দ্ধক্য-অবসানে পর-জীবনে জ্ঞান উন্নতি লাভ করিবে এটি বন্ধ হইতে পারে না। কথা এই ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া জগতের প্রকৃত উন্নতি অপ্রতিহত-ভাবে চলিতেছে,—তা' নহিলে জগৎ এত দিনে কোন্-কালে বিনাশ পাইত। মনুষ্য-জ্ঞানের অভিব্যক্তি এবং অনন্ত উন্নতি বিষয়ে আমাদের এই যে স্থির-সিদ্ধান্ত ইহা আমরা অবরোহ প্রণালী অনুসারে প্রাপ্ত হইয়াছি—এটি যেন মনে থাকে। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি "প্রত্যক্ষ হইতে অনুমানে আরোহণ—ইহাই আরোহ প্রণালী; প্রজ্ঞা হইতে যুক্তিতে অবরোহণ—ইহাই অবরোহ প্রণালী।" প্রজ্ঞার গোড়ার কথা এই যে জগতের যত কিছু

সত্য আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হয় সকলই আপেক্ষিক; জগতের ভিতর এমন কোন সত্য নাই যাহা সম্পূর্ণ রূপে আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত—জগতের কোন বস্তুই পূর্ণ সত্য নহে। জগতের ভিতরকার আপেক্ষিক সত্যের মূলে জগতের উপরকার নিরালম্ব সত্য—অপূর্ণ সত্যের মূলে পূর্ণ সত্য—অবশ্যই আছে। অজ্ঞান হইতে জ্ঞানের দিক্ পূর্ণতার দিক—এজন্য পূর্ণ সত্য জ্ঞান-স্বরূপ; প্রজ্ঞা তাই বলেন—পূর্ণ সত্য কেবল এক পরমাত্মা। প্রজ্ঞার এই মূল পত্তন হইতে প্রথম যুক্তি-সোপান যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা এই;—যিনি জ্ঞানেতে শক্তিতে সকল বিষয়েই পরিপূর্ণ তিনি যাহা করেন তাহার উদ্দেশ্য কখন কু হইতে পারে না—যিনি যত উৎকৃষ্ট তাঁহার উদ্দেশ্যও সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট; পরিপূর্ণ-স্বরূপের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ মঙ্গল। প্রজ্ঞা মূলক যুক্তির দ্বিতীয় সোপান এই,—পরমাত্মা আপনি পরিপূর্ণ মঙ্গল, তা'-ভিন্ন আর কোন মঙ্গল আছে কি না? আর কোন মঙ্গল যদি না থাকিত তবে জগৎ সৃষ্ট হইত না;—সে মঙ্গল অপূর্ণ মঙ্গল—অপূর্ণ বটে কিন্তু অনন্তকাল পূর্ণতার দিকে তাহার গতি হইতে থাকিবে এই নিয়মের প্রভাবে অপূর্ণতার দোষাংশটি শোধিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি "পরমাত্মা যদি জীবাত্মার সকল অভাব এককালে পূরণ করেন, তিনি যদি তাহাকে এক কালেই পূর্ণতা প্রদান করেন, তবে তাঁহাতে আর জীবাত্মাতে কিছুই আর প্রভেদ থাকে না; তাহা হইলে এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা ভিন্ন আর কেহই অবশিষ্ট থাকে না। * * * * এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, জীবাত্মাকে পরিমিত করিয়া সৃষ্টি না করিলে তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোন মতেই রক্ষা পাইতে পারে না। সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মা জীবাত্মাকে পরিমিত করিবার জন্যই যে পরিমিত করিয়াছেন তাহা নহে, তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সমর্থন করিবার জন্যই তাহাকে পরিমিত করিয়াছেন। পরমাত্মা একদিকে জীবাত্মাকে পরিমিত করিয়া স্বতন্ত্র অস্তিত্বের যে একটি অভাব তাহার ছিল তাহা পূরণ করিয়াছেন; আর এক দিকে তাহাকে অনন্ত উন্নতির যোগ্যতা প্রদান করিয়া অপূর্ণতা-নিবন্ধন তাহার যে একটি অভাব আছে তাহাও পূরণ করিয়াছেন,—জীবাত্মার অভাব পূরণ যতদূর করিতে হয় তাহা করিয়াছেন।" দেখ সৃষ্টির উদ্দেশ্য অবরোহ-প্রণালী অনুসারে কেমন সুন্দর-রূপে সপ্রমাণ হইতেছে। অতএব তত্ত্বজ্ঞান যে প্রামাণিক নহে ইহা আর বলিবার উপায় নাই। বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ এবং অনুমানকে সহায় করিয়া যে সিদ্ধান্তে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তত্ত্বজ্ঞান প্রজ্ঞা এবং যুক্তিকে সহায় করিয়া সেই সিদ্ধান্ত একেবারে অকাট্য করিয়া দাঁড় করাইতেছেন;—সে সিদ্ধান্ত এই যে জগতের এবং তাহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের (মনুষ্যের ত কথাই নাই) ক্রমাগতই উন্নতি—ক্রমাগতই উন্নতি! জগতের এই চরম উদ্দেশ্যটির প্রতি দৃষ্টি

রাখিয়া আরোহ প্রণালীতে সৃষ্টি আলোচনা করিলে উভয় প্রণালীরই মান রক্ষা করা হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞান কেবল শুষ্ক বিজ্ঞান না হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের সোপানতা প্রাপ্ত হয়।

সংক্ষেপে এক্ষণে আমাদের শেষ বক্তব্য বলিয়া প্রস্তাব সাঙ্গ করি;——দলাদলির ভাব যেমন কার্য্যনাশক এমন আর কিছুই নহে; ভাল সামগ্রী পাইলেই তাহাকে দুই পায়ে দলাদলি করিয়া নষ্ট করে, এই জন্যইবা তাহার দলাদলি নাম হইয়াছে। এক দল আছেন যাঁহারা বিজ্ঞানকে খাট করিয়া তত্ত্বজ্ঞানকে বড় করিতে চা'ন, এক দল আছেন যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানকে খাট করিয়া বিজ্ঞানকে বড় করিতে চা'ন; যেখানে এইরূপ কোন না কোন দলীয় ভাবের আধিপত্য দেখা যায় সেই খানেই সত্য ভয়ে ভয়ে মানে মানে অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে কথঞ্চিৎ প্রকারে প্রাণ-ধারণ করে। বলিতে কি আমরা' দলীয় ভাবকে বড় ডরাই। আমরা বলি—তত্ত্বজ্ঞান এবং বিজ্ঞান দুয়েরই যথোচিত সম্মান করিয়া সৃষ্টি-তত্ত্বের আলোচনা কর; কিন্তু দলাদলি নামে যে একটি ভয়ানক জন্তু আছেন তিনি অমনি বলেন "তাও কি কখন হয়?" আমরা দলাদলির কথা অগ্রাহ্য করিয়া প্রণালী-পূর্ব্বক দেখাইলাম যে, বিজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান কাহারো সহিত বিবাদ না করিয়া, সখ্য ভাবে সত্য অন্বেষণ করিলে আমরা ইষ্ট লাভে কখনই বঞ্চিত হই না।

"সৃষ্টি" এই গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু বেদ পুরাণ তন্ত্র দর্শন প্রভৃতি অনেক শাস্ত্র ঘাঁটিয়া সে সমুদায়ের প্রকৃত অভিপ্রায় এবং মর্ম্ম বিবৃত করিয়াছেন—এজন্য তিনি আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন। শাস্ত্রের অর্থ আবিষ্কারে তিনি অশেষ বিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন, এবিষয়ে কাহারো দ্বিরুক্তি হইতে পারে না; দোষের মধ্যে তাঁহার গ্রন্থে সেকালের ঘটা কিছু অতিরিক্ত পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়; গ্রন্থকারের অভিপ্রায় কিছু এরূপ নয় যে, শাস্ত্রের নাম শুনিলেই সকল কথা অবিচারে শিরোধার্য্য করিতে হইবে, আর শাস্ত্রোক্ত মত হইলেই তাহা যেন তেন প্রকারেণ সমর্থন করিতে হইবে; কিন্তু তাঁহার লেখা দেখিলে অনভিজ্ঞ লোকের হঠাৎ সেইরূপ ভ্রম জন্মিতে পারে। শাস্ত্রোক্তি সমর্থন করা অগ্রে সত্যান্বেষণ তাহার পরে, এরূপ ভ্রমেতেও অনিষ্ট আছে। শাস্ত্রের মধ্যে অনেক সত্য আছে কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার মধ্যে অসত্য যে নাই তাহা নহে; শাস্ত্রোক্ত বচন, সত্য হইলেও তাহা যে শাস্ত্রোক্ত বলিয়াই সত্য এমন নহে, যৌক্তিক বলিয়াই তাহা সত্য। সৃষ্টির গ্রন্থকার শাস্ত্রের বচন মাত্রকেই প্রমাণের যথা-সর্ব্বস্ব গণ্য করিয়াছেন, তাহার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিতে কিছুমাত্র আয়াস পা'ন নাই, এ প্রণালীতে চলিলে শাস্ত্রের মতই নির্ণীত হইতে পারে, সত্য নির্ণীত হওয়া দুষ্কর। যদি শাস্ত্রের মত নির্ণয় করা গ্রন্থকারের কেবল মাত্র উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে

পারি। শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ যিনি সাংখ্যের গ্রন্থকার তিনি তাঁহার গ্রন্থটি অতি সুপ্রণালী অনুসারে রচনা করিয়াছেন। নামে এবং কার্য্যে (বয়সে কেবল নয়) তিনি প্রাচীন কালের ব্যক্তি, কিন্তু তাঁহার লেখার ধরণ দিব্য এ-কালোচিত—তাহাতে সত্যান্বেষণেরই প্রাধান্য। ইহাঁর ন্যায় অপক্ষপাতী শ্রমশীল সদ্‌বুদ্ধি এবং যথাবৎ অধীত-শাস্ত্র ব্যক্তিগণ যদি সংস্কৃত দর্শন-শাস্ত্র-সকল বঙ্গ ভাষায় রীতিমত বিবৃত করিয়া প্রকাশ করেন তাহা হইলে বঙ্গ-ভাষা অচিরাৎ নূতন-বিধ এক অমূল্য রত্নের আকর হইয়া উঠে। কিন্তু কৈ! ভাল বস্তুকে ভাল করিয়া দেখাইবার রীতি আমাদের দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও হয়;—এখনকার রীতি আর এক রূপ,—গোড়ায় যাহা বাস্তবিক ভাল তাহাকে অতি-ভাল করিবার জন্য কত যে বিচিত্র পরিচ্ছদ পরানো হয়—দেখিলে হাসিও পায় দুঃখও হয়। নিরপেক্ষ ভাবে, যথার্থ সত্য জিজ্ঞাসুভাবে, শাস্ত্রালোচনা করা কাহাকে বলে যাঁহারা জানিতে চান, তাঁহারা একবার বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সাংখ্যদর্শন পাঠ করুন তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে; আর আমাদের ন্যায় যাঁহারা অধুনাতন বঙ্গ সাহিত্যের অসারতা এবং বৃথা আড়ম্বর দেখিয়া তীব্র মনোবেদনা অনুভব করেন তাঁহারা ঐগ্রন্থ খানি পাঠ করুন তাঁহাদের হৃদয় জুড়াইবে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

বঙ্গাঙ্গনা কাব্য। প্রথম খণ্ড, শ্রী রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য এক টাকা।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আমাদের পক্ষে একটি কঠোর কর্ত্তব্য বিশেষ। প্রাপ্ত গ্রন্থ সমূহের শুদ্ধমাত্র, প্রাপ্তি স্বীকার করিলে গ্রন্থকার মহাশয়েরা কখনই তৃপ্ত হইবেন না, আবার তাহাদের বিস্তৃত সমালোচনা করিতে গেলে ভারতীতে স্থান কুলাইবে না। সুতরাং সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। কিন্তু সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় আমরা প্রাপ্ত গ্রন্থের মোট দোষ গুণ ব্যক্ত করা ব্যতীত বিস্তৃতরূপে দোষ গুণ প্রদর্শন করিতে পারি না! মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে এরূপ প্রণালী অনুসারে অনেক সময়ে আমরা অনেক গ্রন্থকারের প্রতি অনিচ্ছা ক্রমেও অন্যায় করিয়া ফেলি। একখানি পুস্তক সমস্তটা পড়িয়া হয়ত আমরা মোটের উপর প্রীতি লাভ করি, আর একখানি পুস্তকের সমস্তটা পড়িয়া হয়ত মোটের উপর আমরা বিরক্ত হই, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর অনেক পুস্তকের অনেক স্থল হয়ত খুব কদর্য্য হইতে পারে আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর অনেক পুস্তকের অনেক স্থানে হয়ত সুন্দর হইতে পারে। আমরা সংক্ষিপ্ত সমালোচনস্থলে

এই দোষ গুণের সমন্বয় করিতে যতদূর সাধ্য চেষ্টা করি—কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ইদানিন্তন গ্রন্থ-সমূহে দোষের ভাগ এত অধিক যে সরল ভাবে সমালোচনা করিতে গেলে ইচ্ছা না থাকিলেও কতকটা কঠোর হইয়া পড়িতে হয়। যদিও আমরা জানি যে ক্ষেত্র মাত্রই নব উর্ব্বরতা লাভ করিলে তাহাতে ভাল দ্রব্যের সহিত আগাছাও উৎপন্ন হয়—ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত নব স্বাধীনতার সময় অনেক ভাল কার্য্যের সহিত অনেক জঘন্য কার্য্যও সম্পাদিত হইয়াছিল—ইংরাজি সাহিত্যে ড্রাইডেন্ ও পোপ কর্ত্তৃক নব প্রণালী উদ্ঘাটিত হইলে থিওবোল্‌ড্ ও সিবর প্রভৃতিও কবিতা রচনা করিয়া সকলকে জ্বালাতন করিয়াছিল, তবুও ঐ-সকল অশুভ অপরিত্যাজ্য ও অবশ্যম্ভাবী বলিয়া যে দমনীয় নহে তাহা আমরা স্বীকার করি না। সুতরাং বাঙ্গলা সাহিত্য নবজীবন পাইয়া যে সকল অসার প্রলাপে দিক্‌বিদিক্ ধ্বনিত করিতেছে তাহা নিবারণ করিতে চেষ্টা পাওয়া নিতান্ত অন্যায় নহে।

এই যে "বঙ্গাঙ্গনা' নামক গ্রন্থখানি সমালোচনা করিতে বসিয়াছি, ইহার নিন্দা না করিয়া যদি নিরপেক্ষ ভাবে মৌন হইয়া থাকি তাহা হইলে আমরা ভারতী দেবীর কাছে ঘোর অপরাধী হইব। আমি এই পুস্তকের সমস্তটুকু পড়িতে অক্ষম হইলাম, কিন্তু ইহার একটি প্রসঙ্গ আদ্যোপান্ত পড়িতে পারিয়াছি—সে প্রসঙ্গটি এই—"জনৈক বঙ্গবিধবা শ্রীল শ্রীযুক্ত পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট নিম্ন লিখিত পত্রিকা খানি লিখিয়াছিলেন—— বুঝিতে হইবে যে এই পত্র খানি কবির কপোল-প্রসূত মাত্র—তিনি এই পত্রের আকারে বঙ্গীয় বিধবাদিগের অবস্থা ও মনের ভাব বর্ণনা করিতেছেন।—পত্রের আরম্ভ টুকু এই—

নবীনা যোগিনী আমি হ'য়েছি সংসারে,
এনবীন সুবয়সে ফেলিয়াছি দূরে
কঙ্কণ বলয়, কাঞ্চি অলঙ্কার যত!
মুছি সিন্দুরের বিন্দু। শঙ্খের বলয়া
ভাঙ্গি—আহা প্রাণেশ সমাধি স্থলোপরে।
পরিছি ধবল বস্ত্র, লোহিত ত্যজিয়া।
একাহার নিরামিষ! কৃতাঞ্জলি পুটে
এক মনে জপিতেছি মুদ্রিত নয়নে—
মহামন্ত্র—"রক্ষা কর হে বিদ্যাসাগর!"

আমরা সহৃদয় পাঠকমাত্রকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে ইহা অপেক্ষা সত্যের অবমাননা ও কল্পনার ব্যভিচার আর কি হইতে পারে? দেশবিদেশ সকলেই স্বীকার করে যে বঙ্গীয় বিধবারা ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা ও পবিত্রতার আদর্শ স্থল। কিন্তু আদর্শস্থল না হইলেও "রক্ষা কর হে বিদ্যাসাগর'—রূপ মহামন্ত্রে দীক্ষিত বিধবা নারীই কি বঙ্গীয় বিধবাকুলের মুখপাত? একথা কেহই বোধ হয় স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। এই ত গ্রন্থকারের সত্যপ্রিয়তা,—কিন্তু তাঁহার কবিত্বের একটি দেদীপ্যমান উদাহরণ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না—সেই বিধবা রমণীই আবার লিখিতেছেন—

স্পনা করিতে করিতে—সর্ব্বাঙ্গে কাদামাখা দুই চারিটা কুকুরের নিকট হইতে অশ্রান্ত তিরস্কার শুনিতে শুনিতে মহেন্দ্র গোবর আচ্ছাদিত একটি অতি মুমূর্ষু বাটিতে গিয়া পৌঁছিলেন। দ্বারে আঘাত করিলেন, জীর্ণ শীর্ণ দ্বার বিরক্ত রোগীর মত মৃদু আর্ত্তনাদ করিতে করিতে খুলিয়া গেল। নরেন্দ্র গৃহে ছিলেন, কিন্তু বৎসর কয়েকের মধ্যে পুলিষের কনষ্টেবল ছাড়া নরেন্দ্রের গৃহে আর কোন অতিথি আসে নাই—এই জন্য দ্বার খুলিবার শব্দ শুনিয়াই নরেন্দ্র অন্তর্ধান করিয়াছেন। দ্বার খুলিয়াই মহেন্দ্র আবর্জ্জনা ও দুর্গন্ধময় এক প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিলেন। সে প্রাঙ্গণের এক পাশে একটা কূপ আছে, সে কূপের কাছে কতকগুলা আমের আঁটি হইতে ছোট ছোট চারা উঠিয়াছে। সে কূপের উপরে একটা পেয়ারা গাছ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। প্রাঙ্গণ পার হইয়া সঙ্কুচিত মহেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন। এমন নিয় ও এমন সেঁৎসেঁতে ঘর বুঝি মহেন্দ্র আর কখন দেখে নাই, ঘর হইতে এক প্রকার ভিজা ভাপ্স গন্ধ বাহির হইতেছে। বৃষ্টির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভগ্ন জানালায় একটা ছিন্ন দরমার আচ্ছাদন রহিয়াছে। সে গৃহের দেয়ালে যে এককালে বালি ছিল, সে পাড়ায় এইরূপ একটা প্রবাদ আছে মাত্র। এক জায়গায় ইঁটের মধ্যে একটি গর্ত্তে খানিকটা তামাক গোঁজা আছে। গৃহসজ্জার মধ্যে একখানি অবিশ্বাস-জনক তক্তা (যদি তাহার প্রাণ থাকিত তবে তাহা ব্যবহার করিলে পশু নৃশংসনিবারিণী সভায় অনেক টাকা জরিমানা দিতে হইত) তাহার উপরে মললিপ্ত মসীবর্ণ একখানি মাদুর ও তদুপযুক্ত বালিশ ও সর্ব্বোপরি স্বকার্য্যে অক্ষম দীনহীন একটি মশারি। গৃহে প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র একটি দাসীকে দেখিতে পাইলেন। সে দাসীটি তাঁহাকে দেখিয়াই ঈষৎ হাসিতে হাসিতে মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে কহিল, "কেন গো বাবু, মানুষের গায়ের উপর না পড়িলেই কি নয়?" মহেন্দ্র তাহার নিকট হইতে অন্তত দুই হস্ত ব্যবধানে ছিলেন ও তাহার দুর্গন্ধ বস্ত্র ও ভয়জনক মুখশ্রী দেখিয়া আরো দুই হস্ত ব্যবধানে যাইবার সংকল্প করিতেছিলেন—কিন্তু মহেন্দ্রের যে তাহার কাছে যাওয়াই লক্ষ্য ছিল, ইহা কল্পনা করিয়া সে দাসীটি মনে মনে মহা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। যাহা হউক এই দাসী গিয়া ভীত নরেন্দ্রকে অনেক আশ্বাস দিয়া ডাকিয়া আনিল। নরেন্দ্র মহেন্দ্রকে দেখিয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হইল না, সে যেন তাঁহারি প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু মহেন্দ্র নরেন্দ্রকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল—এমন পরিবর্ত্তন সে আর কাহারো দেখে নাই। অনাবৃত দেহ, অল্পপরিসর জীর্ণ মলিন বস্ত্রে হাঁটু পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত। মুখশ্রী অত্যন্ত বিকৃত হইয়া গিয়াছে, চক্ষু জ্যোতিহীন, কেশপাশ অপরিচ্ছন্ন ও বিশৃঙ্খল, সর্ব্বদাই হাত থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, বর্ণ এমন মলিন হইয়া গিয়াছে যে আশ্চর্য্য হইতে হয়—তাহাকে দেখিলেই কেমন এক প্রকার ঘৃণা ও সঙ্কোচ উপস্থিত হয়। নরেন্দ্র

অতি শান্তভাবে মহেন্দ্রকে তাঁহার নিজের ও তাঁহার সংক্রান্ত সমস্ত লোকের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন—কাজ কর্ম্ম কিরূপ চলিতেছে তাহাও খোঁজ লইলেন। মহেন্দ্র নরেন্দ্রের এই অতি শান্ত ভাব দেখিয়া অত্যন্ত অবাক্ হইয়া গিয়াছেন—মহেন্দ্রকে দেখিয়া নরেন্দ্র কিছুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। মহেন্দ্র আর কিছু না বলিয়া নরেন্দ্রের চিঠিটি তাহার হস্তে দিল, সে অবিচলিত ভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল "হাঁ মশায়—সম্প্রতি অবস্থা মন্দ হওয়াতে কিছু দেনা হইয়াছে, তাই বড় জড়াইয়া পড়িয়াছি।" মহেন্দ্র কহিলেন—'তা আপনার স্ত্রীর নিকট সাহায্য চাহিবার অর্থ কি? উপার্জ্জনের ভার ত আপনার হাতে। আর তিনি অর্থ পাইবেন কোথা?' নির্লজ্জ নরেন্দ্র কহিল—"সে কি কথা? আমি সন্ধান লইয়াছি, আজ কাল সে খুব উপার্জ্জন করিতেছে! দিন কতক স্বরূপ বাবু তাহাকে পালন করিয়া ছিলেন, শুনিলাম আজ কাল আর কোন বাবুর আশ্রয়ে আছে।" মহেন্দ্র ইচ্ছা পূর্ব্বক কথাটার মন্দ অর্থ না লইয়া কিঞ্চিৎ দৃঢ় স্বরে কহিলেন, "আপনি জানেন তিনি আমার বাটিতেই আছেন। নরেন্দ্র কহিলেন, "আপনারই বাটিতে? সেত ভালই।" মহেন্দ্র কহিলেন—"কিন্তু তাঁহার কাছে অর্থ থাকিবার ত কোন সম্ভাবনা নাই।" নরেন্দ্র কহিলেন "তা যদি হয় তবে আমার চিঠির উত্তরে সে কথা লিখিয়া দিলেই হইত।" মহেন্দ্র যেরূপ ভাল মানুষ, অধিক গোলযোগ করা তাহার কর্ম্ম নয়—বকাবকি করিতে আরম্ভ করিলে তাহার আর অন্ত হইবে না জানিয়া মহেন্দ্র প্রস্তাব করিলেন, নরেন্দ্র যদি তাঁহার কুঅভ্যাস গুলি পরিত্যাগ করেন তবে তিনি তাঁহার সাহায্য করিবেন। নরেন্দ্র আকাশ হইতে পড়িল, কহিল, 'কুঅভ্যাস কি মশায়? নূতন কুঅভ্যাস ত আমার কিছুই হয় নাই, আমার যা' অভ্যাস আছে সেত আপনি সমস্ত জানেন।" এই কথায় ভালমানুষ মহেন্দ্র কিছু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, সে তেমন ভাল উত্তর দিতে পারিল না। নরেন্দ্র পূর্ব্বে এত কথা কহিতে জানিত না, বিশেষ মহেন্দ্রের কাছে কেমন একটু সঙ্কোচ অনুভব করিত, সম্প্রতি দেখিতেছি সে ভারি কথা কাটাকাটি করিতে শিখিয়াছে। তাহার স্বভাব আশ্চর্য্য বদল হইয়া গিয়াছে! মহেন্দ্র শীঘ্র শীঘ্র তাহার সহিত মীমাংসা করিয়া লইয়া তাহাকে টাকা দিলেন; ও কহিলেন, ভবিষ্যতে নরেন্দ্র যেন তাঁহার স্ত্রীকে অন্যায় ভয় দেখাইয়া চিঠি না লেখেন। মহেন্দ্র সেই আর্দ্র বাষ্পময় ঘর হইতে বাহির হইয়া বাঁচিলেন, ও পথের মধ্যে একটা ডাক্তারখানা হইতে এক শিশি কুইনাইন কিনিয়া লইয়া যাইবেন বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। দ্বারের নিকট দাসীটি বসিয়া ছিল, সে মহেন্দ্রকে দেখিয়া অতি মধুর দুই তিনটি হাস্য ও কটাক্ষ বর্ষণ করিল, ও মনে মনে ঠিক দিয়া রাখিল, সেই কটাক্ষের প্রভাবে মলয়-সমীরণে, চন্দ্র-কিরণে মহেন্দ্র বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে।

Page - 192 to 227
Damaged

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ কাল রজনী ভারি গিন্নি হইয়াছে। এখন তাহার হাতে টাকা কড়ি আসে। পাড়ার অধিকাংশ বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়া গৃহিণীরা রজনীর শ্বাশুড়ির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া শিং ভাঙ্গিয়া রজনীর দলে মিশিয়াছেন। তাঁহারা ঘণ্টাখানেক ধরিয়া রজনীর কাছে দেশের লোকের নিন্দা করিয়া,উঠিয়া যাইবার সময় হাই তুলিতে তুলিতে পুনশ্চ নিবেদনের মধ্যে আবশ্যক মত টাকাটা সিকিটা ধার করিয়া লইতেন এবং রজনীর স্বামীর, রজনীর উচ্চবংশের, ও চোখের জলমুছিতে মুছিতে রজনীর মৃত লক্ষ্মীস্বভাবা মাতার প্রশংসা করিয়া শীঘ্র সে ধার গুলি শুধিতে না হয়—এমন বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেন। কিন্তু এই পিসি-মাসী-শ্রেণীর মধ্যে করুণার দুর্ণাম আর ঘুচিল না, ঘুচিবে কিরূপে বল? মাসী যখন সন্তোষজনক রূপে ভূমিকাটি শেষ করিয়া রজনীর কাছে কাজের কথা পাড়িবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে হয়ত করুণা কোথা হইতে তাড়া তাড়ি আসিয়া রজনীকে টানিয়া লইয়া বাগানে চলিল। মাঝে মাঝে তাঁহারা করুণার ব্যবহার দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন "তুমি কেমন ধারা গা?" সে যে কেমন ধারা, করুণা তাহার কোন হিসাব দিতে চেষ্টা করিত না। কোন পিসির বিশেষ কথা, বিশেষ অঙ্গভঙ্গী বা বিশেষ মুখশ্রী দেখিলে এক এক সময় তাহার এমন হাসি পাইত যে সে, সামলাইয়া উঠা দায় হইত, সে রজনীর গলা ধরিয়া মহা হাসির কল্লোল তুলিত, রজনী শুদ্ধ বিব্রত হইয়া উঠিত। তাহা ছাড়া রজনীর গিন্নিপনা দেখিয়া সে এক এক সময়ে হাসিয়া আর বাঁচিত না!

কিছু দিন হইতে মহেন্দ্র দেখিতেছেন, বাড়িটা যেন শান্ত হইয়াছে-করুণার আমোদ আহ্লাদ থামিয়াছে। কিন্তু সে শান্তি প্রার্থনীয় নহে—হাস্যময়ী বালিকা হাসিয়া খেলিয়া বাড়ির সর্ব্বত্র যেন উৎসবময় করিয়া রাখিত, সে এক দিনের জন্য নীরব হইলে বাড়িটা যেন শূন্য শূন্য ঠেকিত, কি যেন অভাব বোধ হইত। কয় দিন হইতে করুণা এমন বিষণ্ণ হইয়া গিয়াছিল, সে এক জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, কাঁদিত. কিছুতেই প্রবোধ মানিত না। করুণা যখন এই রূপ বিষণ্ণ হইয়া থাকে, তখন রজনীর বড় কষ্ট হয়—সে বালিকার হাসি আহ্লাদ না দেখিতে পাইলে সমস্ত দিন তাহার কেমন কোন কাজই হয় না। নরেন্দ্রের বাড়ি যাইবে বলিয়া করুণা মহেন্দ্রকে ভারি ধরিয়া পড়িয়াছে। মহেন্দ্র বলিল—সে বাড়ি অনেক দূরে; করুণা বলিল, তাহোক্! মহেন্দ্র কহিল, সে বাড়ি বড় খারাপ; করুণা কহিল, তা হোক্! মহেন্দ্র কহিল, সে বাড়িতে থাকিবার জায়গা নাই; করুণা উত্তর দিল তাহোক্! সকল আপত্তির বিরুদ্ধে এই "তাহোক্" শুনিয়া মহেন্দ্র ভাবিলেন, নরেন্দ্রকে একটি ভাল বাড়িতে আনাইবেন ও সেই খানে করুণাকে লইয়া যাইবেন। নরেন্দ্রের সন্ধানে চলিলেন। বাড়ি ভাড়া দিবার সময় হইয়াছে বলিয়াই হউক্

বা মহেন্দ্র তাঁহার বাড়ির ঠিকানা জানিতে পারিয়াছে বলিয়াই হউক্—নরেন্দ্র সে বাড়ি হইতে উঠিয়া গিয়াছেন। মহেন্দ্র তাঁহার বৃথা অন্বেষণ করিলেন, পাইলেন না। এই বার্ত্তা শুনিয়া অবধি করুণার আর হাসি নাই, বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ সময়ে সহসা এক একটা কথা শুনিলে যেমন বুকে আঘাত লাগে, করুণার তেমনি আঘাত লাগিয়াছে! কেন, এত দিনেও কি করুণার সহিয়া যায় নাই? নরেন্দ্র করুণার উপর কত শত দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে, আর আজ তাহার এক স্থানান্তর সংবাদ পাইয়াই কি তাহার এত লাগিল? কে জানে, করুণার বড় লাগিয়াছে। বোধ হয় ক্রমাগত জ্বালাতন হইয়া হইয়া তাহার হৃদয় কেমন জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, আজ এই একটি সামান্য আঘাতেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। বোধ হয় এবার বেচারী করুণা বড়ই আশা করিয়াছিল, যে, বুঝি নরেন্দ্রের সহিত আবার দেখা সাক্ষাৎ হইবে, তাহাতে নিরাশ হইয়া সে পৃথিবীর সমুদয় বিষয়ে নিরাশ হইয়াছে, হয়ত এই এক নিরাশা হইতেই তাহার বিশ্বাস হইয়াছে, তাহার আর কিছুতেই সুখ হইবে না! করুণার মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল—যে ভাবনা করুণার মত বালিকার মনে আসা প্রায় অসম্ভব, সেই মরণের ভাবনা তাহার মনে হইল। তাহার মনে হইল এসংসারে সে কেমন শ্রান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সে আর পারিয়া উঠে না, এখন তাহার মরণ হইলে বাঁচে। এখন আর অধিক লোক জন তাহার কাছে আসিলে তাহার কেমন কষ্ট হয়—সে মনে করে আমাকে এই খানে একলা রাখিয়া দিক, আপনার মনে একলা পড়িয়া থাকিয়া মরি—সে, সকল লোকের নানা জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়া উঠিতে আর পারে না, সে সকল বিষয়েই কেমন বিরক্ত, উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। রজনী বেচারী কত কাঁদিয়া তাহাকে কত সাধ্য সাধনা করিয়াছে; কিন্তু এই আহত লতাটি জন্মের মত ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছে, বর্ষার সলিল-সেকে, বসন্তের বায়ুবীজনে আর সে মাথা তুলিতে পারিবে না!

কিন্তু একি সংবাদ? মহেন্দ্র নরেন্দ্রর সন্ধান আবার পাইয়াছে শুনিতেছি! মহেন্দ্র করুণা ও নরেন্দ্রের জন্য একটি ভাল বাড়ি ভাড়া করিয়াছে। নরেন্দ্র মহেন্দ্রের ব্যয়ে সে বাড়িতে বাস করিতে সহজেই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এক বার মন ভাঙ্গিয়া গেলে তাহাতে আর স্ফূর্ত্তি হওয়া সহজ নহে—করুণা এই সংবাদ শুনিল, কিন্তু তাহার অবসন্ন মন আর তেমন জাগিয়া উঠিল না। করুণা মহেন্দ্রদের বাড়ি হইতে বিদায় হইল—যাইবার দিন রজনী করুণার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কতই কাঁদিতে লাগিল, করুণা চলিয়া গেলে সে বাড়ি যেমন কেমন শূন্য শূন্য হইয়া গেল। সেই যে করুণা গেল, আর সে ফিরিল না, সে বাড়িতে সেই অবধি করুণার সেই সুমধুর হাসির ধ্বনি এক দিনের জন্যও আর শুনা গেল না!

Page - 192 to 227
Damaged

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

পীড়িত অবস্থায় করুণা নরেন্দ্রের নিকট আসিল। মহেন্দ্র প্রায় মাঝে মাঝে করুণাকে দেখিতে আসিতেন; করুণা কখনো খারাপ থাকিত, কখনো ভাল থাকিত, এমনি করিয়া দিন চলিয়া যাইতেছে। নরেন্দ্র করুণাকে মনে মনে ঘৃণা করিত, কেবল মহেন্দ্রের ভয়ে এখনো তাহার উপর কোন অসদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে নাই। কিন্তু নরেন্দ্র প্রায় বাড়িতে থাকিত না—দুই এক দিন বাদে যে অবস্থায় বাড়িতে আসিত, তখন করুণার কাছে না আসিলেই ভাল হইত। তাহার অবর্ত্তমানে পীড়িতা করুণাকে দেখিবার কেহ লোক নাই! কেবল সেই দাসীটি মাঝে মাঝে আসিয়া বিরক্তির স্বরে কহিত, "তোমার কি ব্যামো কিছুতেই সার্‌বে না? কি যন্ত্রণা!"

নরেন্দ্রের উপর এই দাসীটির মহা আধিপত্য ছিল; নরেন্দ্র যখন মাঝে মাঝে বাড়ি হইতে চলিয়া যাইত, তখন ইহার যত ঈর্ষা হইত, এত আর কাহারো নয়। এমন কি নরেন্দ্র বাড়ি ফিরিয়া আসিলে তাহাকে মাঝে মাঝে ঝাঁটাইতে ত্রুটি করিত না, মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের উপর ইহার অভিমানই বা দেখে কে? করুণার উপরেও ইহার ভারি আক্রোশ ছিল, করুণাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া জ্বালাতন করিয়া মারিত। মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের সহিত ইহার মহা মারামারি বাধিয়া যাইত—দুজনেই দুজনের উপর গালাগালি ও কিল চাপড় বর্ষণ করিয়া কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া দিত। কিন্তু এই রূপ জনশ্রুতি আছে, নরেন্দ্র তাঁহার বিপদের দিনে ইহার সাহায্যে দিন যাপন করিতেন।

নরেন্দ্রের ব্যবহার ক্রমেই স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। যখন তখন আসিয়া মাতলামী করিত, সেই দাসীটার সহিত ভারি ঝগড়া বাধাইয়া দিত। করুণা এই সমস্তই দেখিতে পাইত, কিন্তু তাহার কেমন এক প্রকারের ভাব হইয়াছে, সে মনে করে, যাহা হইতেছে, হউক, যাহা যাইতেছে চলিয়া যাক! দাসীটা মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের উপর রাগিয়া করুণার নিকট গর্‌গর্‌ করিয়া মুখ নাড়িয়া যাইত, করুণা চুপ করিয়া থাকিত, কিছুই উত্তর দিত না! নরেন্দ্র আবশ্যক মত গৃহ-সজ্জা বিক্রয় করিতে লাগিল। অবশেষে তাহাতেও কিছু হইল না—অর্থ সাহায্য চাহিয়া মহেন্দ্রকে একখানা চিঠি লিখিবার জন্য করুণাকে পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিল। করুণা বেচারী কোথায় একটু নিশ্চিন্ত হইতে চায়, কোথায় সে মনে করিতেছে, যে যে যাহা করে করুক্‌ আমাকে একটু একেলা থাকিতে দিক্‌; না; তাহাকে লইয়াই এই সমস্ত হাঙ্গাম! সে কি করে, মাঝে মাঝে লিখিয়া দিত। কিন্তু বারবার এমন কি করিয়া লিখিবে? মহেন্দ্রের নিকট হইতে বারবার অর্থ চাহিতে তাহার কেমন কষ্ট হইত, তদ্ভিন্ন সে জানিত অর্থ পাইলেই নরেন্দ্র তাহা দুষ্কর্ম্মে ব্যয় করিবে মাত্র।

একদিন সন্ধ্যার সময় নরেন্দ্র আসিয়া মহেন্দ্রকে চিঠি লিখিবার জন্য করুণাকে

পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। করুণা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "পায়ে পড়ি, আমাকে আর চিঠি লিখিতে বলিও না।" সেই সময় সেই দাসীটি আসিয়া পড়িল—সেও নরেন্দ্রের সঙ্গে যোগ দিল—কহিল "তুমি অমন একগুঁয়ে মেয়ে কেন গা! টাকা না থাক্‌লে গিলবে কি?" নরেন্দ্র ক্রুদ্ধ ভাবে কহিল "লিখিতেই হইবে! করুণা নরেন্দ্রের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল 'ক্ষমা কর, আমি লিখিতে পারিব না!' 'লিখিবি না? হতভাগিনী, লিখিবি না?' ক্রোধে রক্ত বর্ণ হইয়া নরেন্দ্র করুণাকে প্রহার করিতে লাগিল। এমন সময় সহসা দ্বার খুলিয়া পণ্ডিত মহাশয় প্রবেশ করিলেন; তিনি তাড়াতাড়ি গিয়া নরেন্দ্রকে ছাড়াইয়া দিলেন, দেখিলেন দুর্ব্বল করুণা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পণ্ডিত মহাশয় নিধির টানা টানিতে গাড়িতে উঠিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন কখনই ভাল ছিল না। তিনি প্রায়ই মাঝে মাঝে মনে করিতেন, তাঁহার স্নেহভাগিনী করুণার দশা কি হইল! এইরূপ অনুতাপে যখন কষ্ট পাইতেছিলেন, এমন সময়ে দৈবক্রমে মোহিনীর সহিত সত্য সত্যই তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তাহার নিকট করুণার সমস্ত সংবাদ পাইয়া আর থাকিতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি কলিকাতায় আসিলেন; প্রথমে মহেন্দ্রের কাছে গেলেন, সেখানে নরেন্দ্রের বাড়ির সন্ধান লইলেন, বাড়িতে আসিয়াই নরেন্দ্রের ঐ নিষ্ঠুর অত্যাচার দেখিতে পাইলেন।

সেই মূর্চ্ছার পর হইতে করুণার বারবার মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। পণ্ডিত মহাশয় মহা অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি যে কি করিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। এই সময়ে তিনি নিধির অভাব অত্যন্ত অনুভব করিতে লাগিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি তাড়াতাড়ি মহেন্দ্রকে ডাকিতে গেলেন। মহেন্দ্র ও রজনী উভয়েই আসিল। মহেন্দ্র যথাসাধ্য চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। করুণা মাঝে মাঝে রজনীর হাত ধরিয়া অতি ক্ষীণ স্বরে কথা কহিত, পণ্ডিত মহাশয় যখন অনুতপ্ত হৃদয়ে করুণার নিকট আপনাকে ধিক্কার দিতেন, যখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন "মা, আমি তোকে অনেক কষ্ট দিয়াছি,' তখন করুণা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে অতি ধীর স্বরে তাঁহাকে বারণ করিত। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত, নরেন্দ্রকে ডাকিয়া দিবে, সে কহিত "কাজ নাই।" সে জানিত নরেন্দ্র কেবল বিরক্ত হইবে মাত্র!

আজ রাত্রে করুণার পীড়া বড় বাড়িয়াছে। শীয়রে বসিয়া রজনী কাঁদিতেছে। আর পণ্ডিত মহাশয় কিছুতেই ঘরের মধ্যে স্থির থাকিতে না পারিয়া বাহিরে গিয়া শিশুর ন্যায় অধীর উচ্ছ্বাসে কাঁদিতেছেন। নরেন্দ্র গৃহে নাই। আজ করুণা একবার নরেন্দ্রকে ডাকিয়া আনিবার জন্য মহেন্দ্রকে অনুরোধ করিল। নরেন্দ্র যখন গৃহে আসিলেন, তাঁহার চক্ষু লাল—মুখ ফুলিয়াছে

Page - 192 to 227
Damaged

কেশ ও বস্ত্র বিশৃঙ্খল। হতবুদ্ধি প্রায় নরেন্দ্রকে করুণার শয্যার পার্শ্বে সকলে বসাইয়া দিল। করুণা কম্পিত হস্তে নরেন্দ্রের হাত ধরিল, কিন্তু কিছু কহিল না।

কবিতা-পুস্তক।

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

সকল পুস্তকের উদ্দেশ্যই হয় জ্ঞান না হয় আমোদ না হয় উভয়ের সম্মিশ্র। এখানে আমোদ শব্দটি আমরা অতি প্রশস্তভাবে ব্যবহার করিতেছি। ডিকুইন্সি বলেন যে উচ্চ অঙ্গের কাব্য বা নাটক পড়িয়া আমরা আমোদ পাই—এ কথা বলিতে গেলে সে সকল কাব্য বা নাটকের অবমাননা করা হয়; তিনি বলেন আমাদের হৃদয়ের নিভৃত বিজনে অনেক মহান্ ভাব এমন সুষুপ্ত ভাবে অবস্থান করে যে প্রাত্যহিক জীবনের কোন ঘটনাই তাহাদিগকে জাগাইয়া দিতে পারে না,—কিন্তু প্রকৃত কবিদের কাব্য পাঠ করিতে করিতে সেই সকল ভাব জাগরিত হইয়া উঠে এবং আমরা এই দীন হীন ক্ষুদ্র জীব হইতে যে প্রকৃত পক্ষে কত দূর উচ্চপদবীগত তাহার প্রতি তখন আমাদের চেতন হয়। এস্থলে সেই সকল কাব্য গুলিকে আমোদ বা জ্ঞানপ্রদ বলা অপেক্ষা শক্তিপ্রদ বলা উচিত। কিন্তু ডিকুইন্সীর উত্তরে আমরা বলি যে ঐ শক্তিপ্রদ গুণটি উচ্চ-অঙ্গের জ্ঞান ও আমোদের সমষ্টি বলিলে কোন দোষ হয় না। এ বিষয়ে তর্ক না তুলিয়া আমরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম যে সকল পুস্তকের উদ্দেশ্যই প্রশস্ত ভাবে জ্ঞান কিম্বা আমোদ কিম্বা উভয়ের সমষ্টি। এই সিদ্ধান্তটি মনে রাখিলে অনেক পুস্তকের সমালোচনা সহজ হইয়া পড়ে।—এই সিদ্ধান্তটির উপর দৃষ্টি রাখিয়াই আমরা বলিতে বাধ্য হইলাম যে বঙ্কিম বাবুর কবিতা-পুস্তক আমাদিগের ভাল লাগিল না—জ্ঞানের কথা এস্থলে উল্লেখ করাই বাহুল্য মাত্র, কিন্তু আমোদ —সাধারণ, সামান্য, অকিঞ্চিৎকর আমোদ পর্য্যন্ত এ পুস্তকের কোন স্থল পাঠ করিয়া আমরা পাইলাম না—বঙ্কিম বাবুর কোন গ্রন্থই যে এরূপ নীরস, নির্জীব, স্বাদ-গন্ধহীন—কিছুই না—হইবে, তাহা আমরা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই।

প্রথম কবিতা পৃথ্বীরাজ-মহিষী সংযুক্তার বিষয়। বিষয়টি অতিশয় উচ্চ ও মহৎ। পৃথ্বীরাজ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন—সেই দুঃস্বপ্ন যবন-কর্ত্তৃক ভারত বিজয়ের আভাস মাত্র, ক্রমে সেই স্বপ্ন প্রকৃত ঘটনায় পরিণত হইল—ঘোরির মহম্মদ আসিয়া স্থানেশ্বরে হিন্দুরাজকে পরাভব করিলেন, সংযুক্তা নিরুপায় হইয়া চিতারোহণ করিলেন।—এই বিষয়টির উপর যদি এক জন প্রকৃত কবির কল্পনা খেলিতে

পাইত, তাহা হইলে ইহাকে সূর্য্যকিরণ-সংযুক্ত স্ফাটিকের ন্যায় নানা বর্ণে সুরঞ্জিত করিতে পারিত, কিন্তু বঙ্কিম বাবু যেন পরীক্ষা স্থলে "সংযুক্তা কে ছিল"—"স্থানেশ্বরের যুদ্ধে কি হইল" এবং "সংযুক্তা কি রূপে মরিল"—এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। সমস্ত কবিতাটিতে এমন একটি ভাব নাই, এমন একটি কথা নাই, যাহাতে হৃদয় নাচিয়া উঠে, যাহাতে ধমনী দিয়া রক্ত প্রবলতর বেগে প্রবাহিত হয়—যাহাতে আর্য্য-গৌরবের কণামাত্রও কল্পনার চক্ষে বিভাসিত হয়।—অনর্থক শব্দ আড়ম্বরে কবিতাটির কায়া বৃদ্ধি হইয়াছে—অসঙ্গত-মেদ-স্ফীত রোগীর ন্যায় ইহার লাবণ্য-শ্রী নাই—জীবনের আভাস মাত্রও আছে কি না সন্দেহ। পৃথ্বীরাজ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সিহরিয়া উঠিলেন,—মহিষীকে স্বপ্নের কথা ও আশঙ্কিত উৎপাতের কথা বলিয়া দুঃখে ও ভয়ে নিবেদন করিলেন

"বার বার বুঝি এই বার শেষ।
পৃথ্বীরাজ নাম বুঝি না রয়।"

তখন

"শুনি পতিবানী, যুড়ি দুই পাণি
জয় জয় জয় বলে রাজরানী
জয় জয় জয় পৃথ্বীরাজে জয়
জয় জয় জয় বলিল বামা,
কার সাধ্য তোমা করে পরাভব,
ইন্দ্র চন্দ্র যম বরুণ বাসব,
কোথাকার ছার তুরস্ক পহ্লব,
জয় পৃথ্বীরাজ প্রথিত নামা॥

* * *

এত বলি বামা দিল করতালি
দিল করতালি গৌরবে উছলি"। ইত্যাদি।

আর্য্য-মহিষীর সহস্রবার সঘনে "জয় জয়" করাতে আমাদের শৈশব কালের একটি কথা মনে পড়ে——ভূতের স্বপ্ন দেখিয়া সহসা জাগিয়া পড়িয়া যখন ভয়সূচক ক্রন্দন করিয়া উঠিতাম, তখন ঐরূপ সঘনে বারংবার "রাম রাম" উচ্চারণ করিয়া ভীত ধাত্রী প্রেতযোনিকে খেদাইতে চেষ্টা করিতেন। পৃথ্বীরাজের মত বীরপুরুষের পক্ষে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ভীত হওয়া এবং তাঁহার রানী সংযুক্তার পক্ষে সহস্র "জয় জয়" ধ্বনি করিয়া আশ্বাস প্রদান করা যে কতদূর কল্পনার ব্যভিচার তাহা আর কি বলিব! সিজরের মৃত্যুর পূর্ব্বআভাসস্বরূপ তাঁহার মহিষী যখন নানা প্রকার দুঃস্বপ্ন, নানা অমঙ্গল-লক্ষণ দেখিয়া সিজরকে রোমের সাধারণ সভাস্থলে যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন তখন সিজর এই বলিয়া উত্তর দিলেন—"ভীরুরাই প্রকৃত মৃত্যুর পূর্ব্বে শত সহস্রবার মরিয়া থাকে—কিন্তু বীরপুরুষ একবার ব্যতীত আর মৃত্যু আস্বাদন করে না।" সে যা হউক, সংযুক্তা হিন্দুমহিলা হইয়া কেমন করিয়া "ইন্দ্র" ও "বাসব" ভিন্ন ভিন্ন দেবতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন? কিন্তু সংযুক্তার এই শিক্ষার দোষ মার্জ্জনীয় হইলেও তাঁর এরূপ স্থলে ঘন ঘন করতালি দেওয়া মার্জ্জনীয় হইতে পারে না—তাঁহার ঘোর করতালি "দেখিয়া হাসিল ভারতপতি"—তিনি ত স্বচক্ষে রানীর ওরূপ উন্মাদ অবস্থা

দেখিয়া হাসিবেনই—আমরা কল্পনার চক্ষে দেখিয়াই হাসি সম্বরণ করিতে পারিতেছি না;—ওরূপ করতালির উপর করতালি অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারই সাজে—রাজ রানীর ত কথাই নাই———কোন ভদ্র কুলনারী সহসা ওরূপ করিলে তাঁহাকে লোকে উন্মাদ মনে করিবে না ত আর কি করিবে।

দ্বিতীয় কবিতাটি 'আকাঙ্ক্ষা'—অর্থাৎ রাধিকা-সুন্দরী শ্রীকৃষ্ণকে কি কি হইতে অভিলাষ করিতেছেন এবং শ্যামসুন্দর তাহার কি কি উত্তর দিতেছেন তাহার একটা তালিকা। আমাদের মতে উত্তর-প্রত্যুত্তর-কবিতাতে প্রায়ই বড় একটা প্রকৃত কবিতা থাকিতে পারে না; কারণ উত্তরগুলি প্রায়ই হৃদয় অপেক্ষা বুদ্ধি-সাপেক্ষ—এরূপ স্থলে কেমন করিরা খুব জবাব দিব ইহাই কবির উদ্দেশ্য হয়। প্রাচীন হরু ঠাকুর বা রাম বসু প্রভৃতি প্রকৃত কবিরা প্রশ্ন কবিতায় যতখানি কবিত্ব দেখাইয়াছেন, উত্তর কবিতায় তাহার শতাংশের একাংশও দেখাইতে পারেন নাই। স্বীকার করি যে তাহাদের উত্তরে কতকটা কারিগুরি, বাক্যবিন্যাসের কারিগুরি, দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা ব্যতীত প্রকৃত কবিতার আভাস মাত্রও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্কিম বাবুর 'সুন্দর সুন্দরী' দেখিয়া শুকশারীর পুরাতন কবিতাটি আমাদের মনে পড়িল—

শুক বলে আমার কৃষ্ণ কদম তলায় থানা,
শারী বলে আমার রাধা করে আনাগনা,
নইলে কিসের থানা,
শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধ'রে ছিল,
শারী বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল,
নইলে পারবে কেন ?,

কিন্তু 'শুক শারীর' কবিতার সহিত 'সুন্দর সুন্দরীর' কবিতার এই প্রভেদ—যে প্রথমটি উত্তর কাটাকাটির দৃষ্টান্ত, দ্বিতীয়টি মনস্তুষ্টিকর উত্তর প্রত্যুত্তরের দৃষ্টান্ত। সুন্দরী শ্রীকৃষ্ণকে নানা বস্তু হইতে অভিলাষ করিতেছেন, সুন্দরও তাহাই হইতে উত্তরে অভিলাষ করিতেছেন,—কিন্তু সুন্দরী, রমণী-প্রকৃতি-সুলভ লজ্জায় সকল কথা খুলিয়া বলিতে পারিতেছেন না, সুন্দর সুরসিক পুরুষের মত কেবল সুন্দরীর অভিলাষের উপর মাত্রা চড়াইতেছেন।

সুন্দরী বলিলেন

কেন না হইলে তুমি চাঁদের কিরণ,
ওহে হৃষীকেশ,
বাতায়নে বিষাদিনী, বসিত যবে গোপিনী.
বাতায়ন পথে তুমি লভিতে প্রবেশ,
আমার প্রাণেশ!

সুন্দর উত্তর করিলেন

কেন না হইনু আমি চন্দ্রিকার লেখা,
রাধার বরণ,
রাধার শরীরে থেকে,রাধারে ঢাকিয়ে রেখে
ভুলাতাম রাধা রূপে অন্য জন মন,
পর ভুলান কেমন।

সুন্দরী বলিলেন—

কেন না হইলে তুই কানন কুসুম,
রাধা প্রেমাধার—
না ছুতেম অন্য ফুলে,বাঁধিতাম তোরে চুলে,
মোর প্রাণাধার।

সুন্দর উত্তর করিলেন

কেন না হইনু হায় কুসুমের দাম,
কণ্ঠের ভূষণ;
এক নিশা স্বর্গ সুখে, বঞ্চিয়া রাধার বুকে,
ত্যজিতাম নিশি গেলে জীবন যাতন,
মেখে শ্রীঅঙ্গে চন্দন।

দুঃখের বিষয় আমরা 'তথাস্তু' বলিতে পারিলাম না।

তৃতীয়. অধঃপতন সঙ্গীতটিতে বঙ্কিম-ভাবের(?) রসিকতার চূড়ান্ত হইয়াছে। কিন্তু বিষয়ের দোষে রস মারা পড়িয়াছে,—হাসিতে হাসিতে অধঃপতনে যাইতেছি কখনও যেন আর কাঁদিতে হইবে না—এ ভাব কি ভয়ানক ভাব! মানুষ মরিতেছে তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাস্য পরিহাস আমোদ-প্রমোদ——আমোদ প্রমোদ করিবার আর কি স্থান নাই! কবিতাটিতে উত্তম রসিকতা প্রকাশ হইয়াছে; কিন্তু বিষয় [illegible] কাট-পতন—নাম শুনিলেই গা কাঁপে। রসিকতার হাস্যবদন দেখিয়া, সুন্দর হে-রজনীতে শ্মশান মধ্যে এক জন্তচ্ছেন্দরী রমণীকে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিতে দেখিয়া—কাহারো যে হাসি পাইবে. সহৃদয় মানব প্রকৃতিতে ত এরূপ লেখে না; তবে যদি গ্রন্থকার দানব-প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া কবিতাটি রচিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা বিকট হাস্য হাসাইবার মত—ঘোরতর একটি অধঃপতনের পাথেয় সম্বল হইয়াছে—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

চতুর্থ—'সাবিত্রী'——এই কবিতাটির স্থানে স্থানে দুএকটী সুন্দর বর্ণনা আছে—যখন যমরাজ শোকাতুরা সাবিত্রীর সম্মুখীন হইতেছে কবি লিখিতেছেন

'হেরে আচম্বিতে এ ঘোর-শঙ্কটে,
ভয়ঙ্কর ছায়া আকাশের পটে
ছিল যত তারা তাহার নিকটে,
ক্রমে ম্লান হ'য়ে গেল নিবিয়া,*
সে ছায়া পশিল কাননে,—অমনি
পলায় শ্বাপদ, উঠে পদধ্বনি,
বৃক্ষ শাখা কত ভাঙ্গিল আপনি,
সতী ধরে শবে বুকে অাঁটিয়া ॥

কিন্তু গ্রন্থকার যে সত্যবানকে জীবন দান না করিয়া সাবিত্রীকে পর্য্যন্ত মারিয়া ফেলিলেন কেন—তাহা ত আমরা বুঝিতে পারি না। কোথায় সতীত্বের অমোঘ প্রভাবে যমহস্ত হইতেও পতিব্রতা সতী মৃত স্বামীকে ফিরিয়া লইবেন,—না সাবিত্রীও এ দেশীয় শত সহস্র স্ত্রীর মত যমের নিকটে সহমরণের বর প্রার্থনা করিয়া পতির সঙ্গেই সহমরণে অন্তর্ধান হইলেন। যদি কোন পুরাণে এরূপ কথা থাকিত তা হইলেও বুঝিতাম যে গ্রন্থকার কি করিবেন,—কিন্তু তাহা নয়, বঙ্কিম বাবু স্বেচ্ছামত পুরাণের উৎকর্ষ সাধন করিতে গিয়া দেশীয় একটি অতি সুন্দর কাহিনীর সুন্দরতম অংশটুকু একেবারে মৃত্তিকাসাৎ করিয়াছেন। আমরা স্বীকার করি যে স্বামীর সহিত ইচ্ছা পূর্ব্বক সহমরণে যাওয়া বিশেষ অনুরাগের লক্ষণ।

* ছায়ার নিকট তারা ম্লান হইয়া নিভিয়া গেল—ইহা কিরূপ সঙ্গত বুঝিতে পারি না। ছায়া কি দিবাকর তুল্য ?

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

কিন্তু তাহা মহান সতীত্বের পরাকাষ্ঠা নহে;—অসতীর অগ্রগণ্যা ক্লিয়োপেট্রাও আন্‌টনীর মৃত্যুর পর ইচ্ছাপূর্ব্বক জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন,—তিনিও মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ইরাস্ নামক সহচরীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন "ত্বরায়—ত্বরায়—রে শান্ত ইরাস্—আর বিলম্ব করিস না—আমি যেন শুনিতে পাইতেছি আমাকে আনটনী ডাকিতেছেন, আমি যেন দেখিতে পাইতেছি তিনি আমার এই আত্ম-বিসর্জ্জনরূপ মহৎ কার্য্য দেখিবার জন্য জাগিয়া উঠিতেছেন"। স্বীকার করি যে এ কথা-গুলি সেক্‌সপিয়ারের, কিন্তু সেক্‌সপিয়র ইতিহাসের মুলোচ্ছেদ করিয়া কপোলকল্পিত কতকগুলি প্রলাপ বাক্য কহেন নাই—তিনি ইতিহাসকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও কল্পনা-প্রাচুর্য্য খুবই দেখাইয়াছেন—বঙ্কিম বাবু বিপরীত প্রথা অবলম্বন করিয়া বিপরীত ফল উৎপাদন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে আণ্টনী ক্লিয়োপেট্রার স্বামী ছিল না—কিন্তু তাহাতে কি এ'ল গেল—তাহাতে আরও সপ্রমাণ হইতেছে যে সতী স্ত্রী না হইলেও অনুরাগের ঝোঁকে এক জন অসতীও সহমরণে যাইতে পারে; মনে কর—ক্লিয়োপেট্রার শেষ-দশায় যখন আণ্টনীর সহিত প্রণয় হইল—তখন আণ্টনীর যদি বিবাহই হইত, তাহা হইলেই কি ক্লিয়োপেট্রার পূর্ব্বের বেশ্যাবৃত্তি ভুলিয়া তাঁহার ইচ্ছামৃত্যু দেখিয়াই তাঁহাকে সতী ও পতিব্রতা কহিতাম?—সহমরণে যাওয়াই কি সাবিত্রীর অলৌকিক পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা মনে করিতে হইবে?—পুরাণে তাহা বলে না। পুরাণে এই কথাই বলে যে সাবিত্রী আপনার সতীত্ব-প্রভাবে উত্তেজিত হইয়া এই সঙ্কল্প করিলেন যে সতীত্বের অলৌকিক মাহাত্ম্যে যমের হস্ত হইতে পর্য্যন্ত আমার মৃত স্বামীকে ফিরাইয়া আনিব। সেই সঙ্কল্প অনুসারে তিনি একাকিনী চতুর্দ্দশীর ভীষণ নিশীথ-যোগে বিকট অরণ্যে মৃত পতিকে ক্রোড়ে লইয়া যমরাজের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন—যমরাজ সাবিত্রীকে দেখিয়া প্রীত হইলেন—প্রীত হইয়া অবশেষে সত্যবানকে সতী স্ত্রীর আলিঙ্গনে প্রত্যর্পণ করিলেন।—পুরাণের এ কথা কেহ বিশ্বাস করিবেন না বটে, কিন্তু ইহার ভিতর একটি ভাব আছে—এবং সেই ভাবের প্রভাবে সাবিত্রীর গল্পটী ভারতবাসিনীদের হৃদয়ের শিরা এবং উপশিরায় ঘোর ঘনিষ্ঠ ভাবে বাতায়নে [illegible]ছে। দুই তিন সহস্র সতী স্ত্রী বাতায়ন সহিত সহমরণে গিয়াছে—কিন্তু [illegible]হাদের সহমরণকে সতীত্বের যার পর [illegible] মাহাত্ম্য লক্ষণ মনে করে না। পুরাণের সহিত বাল্যক্রীড়া করা আমাদের মতে যুক্তি-সঙ্গত নহে।

পঞ্চম—"আদর"—এ কবিতাটি মন্দ নহে—ইহার প্রথম কথা-গুলিই অতি সুন্দর হইয়াছে—

"মরুমাঝে যেন একই কুসুম,
পূর্ণিত সুবাসে,
বরষার রাত্রে যেন একই নক্ষত্র,
আঁধার আকাশে,

নিদাঘ সন্তাপে যেন একই সরসী,
বিশাল প্রান্তরে,
রতন শোভিত যেন একই তরণী
অনন্ত সাগরে,
তেমনি আমার তুমি প্রিয়ে সংসার
ভিতরে,

কিন্তু গ্রন্থকার কিছু বাড়াবাড়ি করিতে গিয়া হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িয়াছেন—তিনি আরো বলিতেছেন

সুশীতল ছায়া তুমি নিদাঘ সন্তাপে,
রম্য বৃক্ষতলে,
শীতের আগুন তুমি, তুমি মোর ছত্র
বরষার জলে।

এই কথাগুলি পড়িয়া বাউলদের একটি পুরাণ গান আমাদের মনে পড়িল—

"গৌর আমার নাকের নথ, কণ্ঠের কণ্ঠমালা
গৌর আমার কানের দুল, হাতের বাজু বালা
গো-উ-র-হ-রি।

ষষ্ঠ—"বায়ু"—এই কবিতাটি একটি প্রহেলিকা স্বরূপ। ইহার শীর্ষে "বায়ু" শব্দটি না থাকিলে ইহা একটি সুন্দর হেঁয়ালী হইতে পারিত। বায়ু বলিতেছে—

"আমিই রাগিণী, আমি ছয় রাগ,
কামিনীর মুখে আমিই সোহাগ,
বালকের বাণী অমৃতের ভাগ,
মম রূপান্তর!"

"কামিনী সোহাগ" বা "বালকের বাণী" যে বায়ুরই রূপান্তর তাহা এক জন কবি অপেক্ষা এক জন বৈজ্ঞানিক বুঝাইয়া দিলে ভাল হইত। এই জন্যই কবি ক্যাম্প্‌বেল বলিয়াছেন যে "কঠোর বিজ্ঞান শাস্ত্র আসিয়া প্রকৃতির মুখ হইতে মোহিনী অবগুণ্ঠন তুলিয়া লয় এবং সকল বস্তুকেই পাঞ্চভৌতিক নিয়মের অধীন করিতে চাহে"। —আমরা বিজ্ঞানের অবমাননা করিতে চাহি না—কিন্তু কবির কল্পনা হইতে বিজ্ঞানের তন্ন তন্ন দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য রাখা উচিত। কিন্তু বায়ুর আরও বক্তব্য আছে—সে বলিতেছে

আমি বাক্য, ভাষা আমি,
সাহিত্য বিজ্ঞান স্বামী
মহির ভিতর—"

এত কথা—আরও বিস্তর বিস্তর কথা পর্য্যায়ক্রমে না বলিয়া বায়ু ত এক কথা বলিতে পারিত—"আমি সংসারের জীবন—সংসারে যাহা কিছু আছে আমি না থাকিলে কিছুই থাকিত না।" বায়ু অতিশয় বাচাল, তাই আরো বলিতেছে—

"উড়াই খগে গগনে—"

গ্রন্থকার মনে করিলেন যে বায়ুর এ কথা সহজে কেহ বিশ্বাস করিবে না, অথবা বুঝিতে পারিবে না,—তিনি সেই জন্য পাঠকদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া নীচে টীকার ছলে বলিয়াছেন "Vide Reign of Law, by Duke of Argyll—chap VII. Flight of Birds." কিন্তু গ্রন্থকার এস্থলে টীকা না করিয়া বায়ু কেমন করিয়া "সাহিত্য বিজ্ঞান স্বামী" হইল তাহা বুঝাইয়া দিলে আমরা প্রকৃত পক্ষে উপকৃত হইতাম।

সপ্তম—"আকবর সাহের খোষ রোজ" এ কবিতাটি কতক সুশ্রাব্য হইয়াছে—কিন্তু ইহাতে আবার কল্পনার যতদূর

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

ব্যভিচার হইয়াছে এমন আর কুত্রাপি হয় নাই। একটি ক্ষত্র-কুলনারী আকবর সার খোষ রোজ দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি "খোষরোজের" অশ্লীল ব্যাপার দেখিয়া ঘৃণায় ও ক্রোধে সে স্থল হইতে পলাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পথ না দেখিতে পাওয়ায় যখন তিনি কাতর স্বরে রোদন করিতেছেন তখন আকবর সা সেইখানে আসিয়া পড়িল এবং রমণীর রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া রমণীর ধর্ম্মনাশ কামনায় সবলে তাঁহাকে ধরিয়া টানিতে লাগিলেন—তখন রমণী নিরুপায় হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

"শুকাল বামার বদন নলিনী
ডাকে ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মা দুর্গে,
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি বাঁচাও জননী,
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মে দুর্গে——"

এত "ত্রাহির" আদ্য শ্রাদ্ধ হইলেও পাষণ্ড যখন কিছুই শুনিল না, তখন রূপসী ছুরিকা বাহির করিয়া আকবর সাকে বধ করিতে কৃতসংকল্প হইল। সম্রাট আশ্চর্য্য হইয়া এবং প্রীত হইয়া নিরস্ত হইলেন। তখন আর্য্যকুলনারী অসি নামাইলেন—

হাসিয়া রূপসী, নামাইল অসি,
বলে মহারাজ এ বড় রস—
রমণীর রণে হার মান তুমি
পৃথিবী-পতির বাড়িল যশ!
দুলায়ে কুণ্ডল, অধরে অঞ্চল,
হাসে খল খল ঈষৎ হেলে,
বলে মহাবীর এই বলে তুমি
রমণীরে বল করিতে এলে?

সহৃদয় পাঠকমাত্রকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে এই কল্পিত ছবিখানি কতদূর বীভৎসকর! ইহা কি একটি রোষান্বিতা অগ্নিশিখাবৎ ক্ষত্রকুলনারীর প্রতিমা, না লীলাময়ী যবন-বেগমের বিভ্রমবিলাসের মূর্ত্তি?——থাক্—আর আমরা পারি না—"মন এবং-সুখ" ইত্যাদি নানা বিষয়ক কতক গুলি যে কবিতা আছে তাহা সকলই এক ছাঁচে ঢালা, সুতরাং সে গুলির সমালোচনা করা বাহুল্য—"ললিতা" ও "মানস" নামক কবিতা দুটি গ্রন্থকার পঞ্চদশ বয়সের সময় লিখিয়াছিলেন—সুতরাং শৈশবরচনা প্রায় সকলই যেমন হইয়া থাকে, এ দুটিও সেই রূপ।

সমস্ত কবিতাপুস্তকের মধ্যে তিনটি গদ্য-পদ্যই আমাদের ভাল লাগিয়াছে। উপসংহার কালে আমরা একটিমাত্র কথা বলিব—বঙ্কিম বাবু উপন্যাস লিখিয়া যতদূর প্রতিষ্ঠাবান্ হইয়াছেন, এই নিকৃষ্ট কবিতা খানির প্রভাবে তাঁহার সে যশ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না। আমরা বিলক্ষণ জানি যে ভাল এক জন উপন্যাস-লেখক ভাল কবি হইতে পারেন না। সর্ ওয়াল্টর স্কটের কবিতাগুলি পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান সমালোচকদের মতে ছন্দগ্রথিত উপন্যাস মাত্র। কিন্তু তাহা না হইলেও সকল ব্যক্তিতে সর্ ওয়াল্টর স্কটের প্রতিভা সম্ভাবিত নহে। কবি এবং উপন্যাস-লেখক ভিন্ন উপাদানে নির্ম্মিত,—তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টি ভিন্ন ভাবে নিক্ষিপ্ত হয়, এক জন কেবল ঘটনাগুলি এমন করিয়া সাজাইতে চাহেন যে তাহাতে উদ্দেশ্য-সাধন হইতে পারে—অপর জন ঘটনার প্রতি ঈষৎ মাত্র দৃষ্টি রাখিয়া কেবল ভাবের বিকাশের দিকেই লক্ষ্য স্থির রাখেন।—স্কটের লেডী অফ্ দি লেকের সহিত বাইরণের "জওয়ারের" তুলনা করিয়া দেখিলে আমাদের কথার সার্থকতা সপ্রমাণ হইবে।

বোম্বাই রায়ৎ।

তৃতীয় ভাগ।

এক দিকে এই সকল সালিসী কোর্ট আর এক দিকে কঠোর আইনবদ্ধ আদালত। বিনা ব্যয়ে আপসে বিবাদ ভঞ্জন একের কার্য্য—অপরের কার্য্য বিবাদানল প্রজ্বলিত করিয়া অর্থী প্রত্যর্থী উভয়েরই অর্থনাশ করা। একবার আদালতে মকদ্দমা উপস্থিত হইলে আর শান্তি নাই—বিরাম নাই। ইহার চূড়ান্ত হইতে যে কালবিলম্ব হয় তাহাতে কত ধূর্ত্ততা প্রবঞ্চনা মিথ্যা সাজাইবার সময় পাওয়া যায়। প্রথম কোর্টে মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে জিলা জজের নিকট আপীল—তার পর বোম্বাই হাইকোর্টে—কখনো বা বিলাতে রাণীর বিচারালয় পর্য্যন্ত না গিয়া পরাজিত পক্ষ ক্ষান্ত হয় না। ইহাতে কত বিলম্ব ও অর্থব্যয়, বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে কি ভয়ানক বিবাদ বিদ্বেষ প্রদীপ্ত হয়। ইহা অপেক্ষা সালিসী কোর্টের সহজ ও শান্তিময় প্রণালী কত প্রার্থনীয়। বোম্বাই অঞ্চলের একজন জিলা জজ সালিসী কোর্ট ও আদালতের কার্য্যপ্রণালীর সম্মিলন প্রস্তাব করিয়া East Indian Association সভায় এক প্রবন্ধ* পাঠ করেন। তাঁহার মতে এই উভয় কোর্ট একত্রে মিলিয়া কার্য্য করিলে তাহা হইতে অনেক শুভফল প্রসূত হইতে পারে। তিনি বলেন ইহার প্রত্যেক কোর্টেরই দোষ গুণ লক্ষিত হয়। এই উভয় কোর্টের বিচারক বিদ্যা বুদ্ধিতে সমান নহে। পঞ্চায়তের একজন মেম্বর সুশিক্ষিত মুন্সফের তুল্য বিচক্ষণ বুদ্ধিমান কার্য্যদক্ষ আইনজ্ঞ হইবে এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু তেমনি আবার আর কতকগুলি বিষয়ে পঞ্চায়ত কোর্টের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে। পঞ্চায়তের লোকেরা গ্রামের মধ্যে থাকিয়া আপনার গ্রামের বৃত্তান্ত সকল জানিতেছে শুনিতেছে—গ্রামবাসীদিগের চরিত্র রীতি নীতি তাহারা বিশেষ রূপে অবগত। হয়ত সাক্ষীদের হাব ভাব দেখিয়া তাহারা সাক্ষ্য ভাল করিয়া ওজন করিতে পারিবে, সাক্ষ্যের সত্যাসত্য সহজে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে। তাহারা মোটামুটি বিচার করিয়া যেরূপে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবে মুন্সেফ হয়ত সহস্র আইন খাটাইয়া তাহাতে কৃতকার্য্য হইবেন না। আর এক দিক্ দেখিতে গেলে মুন্সেফ হয়ত তাহাদের অপেক্ষা বিচারক্ষম বহুদর্শী, মুন্সেফ হয়ত অপক্ষপাতে বিচার করিয়া দিবেন—পঞ্চায়তের পক্ষপাত-দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই ক্ষণে এই দুই কোর্ট পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য করিতেছে বলিয়া তাহারা তাদৃশ ফলোপ-

* "The Panchayat; a remedy for Agrarian disorders in India." read before The East India Association by Mr. William Wedderhwm (Bombay Civil Service)

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

ধায়ী হয় না, কিন্তু তাহারা সম্মিলিত হইলে তাহাদের পরস্পরের দোষ খণ্ডন ও উপকারিতা বর্দ্ধন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। এই রূপে উভয় কোর্টে মিলিয়া কার্য্য করা আমাদের প্রাচীন প্রথার অনুযায়ী, পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র দেশে বাদী প্রতিবাদী প্রথমে পঞ্চায়তের নিকটে যাইয়া আপনাদের বিবাদ ভঞ্জনের জন্য আবেদন করিত—সে বিচার মনের মত না হইলে অসন্তুষ্ট পক্ষ রাজকর্ম্মচারী ন্যায়াধীশের শরণাপন্ন হইত। এখনো কতকটা এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। প্রত্যেক বড় বড় গ্রামে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী সমূহে এক একটী পঞ্চায়ত কোর্ট স্থাপিত হউক। তাঁহাদের নিকট প্রথমতঃ সামান্য দেশ-সম্বন্ধীয় মকদ্দমার বিচার হইবে। তাঁহারা যতগুলি মকদ্দমা আপসে মিট মাট করিয়া দিতে পারেন তাহা সাধ্যমত করিয়া দিবেন—অবশিষ্ট গুলি যাহা সহজে নিষ্পত্তি হওয়া দুষ্কর তাহা মুন্সফের বিচারালয়ে আনীত হইবে। মুন্সফ কোর্ট এক স্থানে আবদ্ধ থাকিবে না—মুন্সফ গ্রামে গ্রামে সরকিট ভ্রমণ করিয়া বিচার-কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। যে গ্রামে পঞ্চায়ত কোর্ট প্রতিষ্ঠিত, তথায় উপস্থিত হইলে তিনি পঞ্চায়তের মতে তাহার সভাপতি হইয়া বিচারাসনে বসিবেন ও তাহাদের সাহায্যে গুরুতর মকদ্দমা সকলের নিষ্পত্তি করিবেন। যাহাতে অর্থী প্রত্যর্থী পঞ্চায়তের ব্যবস্থা অমান্য করিয়া অকারণে আদালতে মকদ্দমা আনিতে না পারে তাহার জন্য ঐ সকল মকদ্দমার উপর ষ্টাম্প কর নির্দ্ধারিত করা আবশ্যক। আর মুন্সফ কোর্টের কার্য্য-প্রণালী সুশৃঙ্খল রূপে চলিতেছে কি না ও তাহার বিচার-কার্য্য ভাল মন্দ কিরূপ হইতেছে তাহার তত্ত্বাবধানের ভার জিলা জজের উপর থাকিবে। জিলা জজ ও তাঁহার সহকারিগণ মধ্যে মধ্যে সরকিট গমন করিয়া তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন।

এই পঞ্চায়ত-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে দেশের অশেষ হিত সাধিত হয়, বোধবিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। কিন্তু এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী না হইলে কিছুই হইবে না। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত এই মৃতপ্রায় তরু পুনরুজ্জীবিত হওয়া সম্ভব নহে। পঞ্চায়ত সভার সভাসদদিগকে কোন সম্মানসূচক পদবী প্রদান করা মন্দ নয়। তাহা হইলে জমীদার, উচ্চশ্রেণীর বণিক, পেনসনভুক লোক যাঁহাদের হাতে অগাধ সময় পড়িয়া আছে তাহা কিরূপে কাটাইবেন ভাবিয়া পান না, তাঁহারা স্থানীয় সভার সভাসদ হইবার প্রার্থী হইতে পারেন। এইরূপ সভা লোকের মধ্যে বিবাদ ভঞ্জন করিয়া জনসমাজে শান্তিরক্ষণে বিশেষ সহায়তা করিতে পারে তাহার আর সন্দেহ নাই।

দক্ষিণ রাইয়ত কমিসনরগণ প্রস্তাব করিয়াছেন যে ছোট ছোট দেশ সম্বন্ধীয় মকদ্দমার বিচার জন্য কতকগুলি বিশেষ কোর্ট স্থাপিত হওয়া উচিত। সরকিট কোর্টের ন্যায় স্থানে স্থানে তাহাদের অধিবেশন হইবে ও এই সকল কোর্টের তত্ত্বাবধানে প্রচলিত আদালতের মুন্সফ প্রভৃতি বিচা-

রকগণ নিযুক্ত থাকিবে। রাইয়তদিগকে আপনাদের ঘরবাড়ী কৃষিকার্য্য ছাড়িয়া দূরস্থিত আদালতে যাইতে বাধ্য করা তাহাদের উপর সামান্য অত্যাচার নয়। সরকিট কোর্টে ইহার অনেকটা উপশম হইতে পারে। তদ্ভিন্ন তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে বিচারের সৌকর্য্য ও বিলম্ব হ্রাসের সম্ভাবনা। অবিচারের নীচেই বিচারে কালবিলম্ব দূষণীয়। এইক্ষণকার বিচার-প্রণালীতে বিলম্ব ও দীর্ঘসূত্রতা বিশেষ প্রশ্রয় পায় বলিয়া বাদী প্রতিবাদী অনেক সময় সুবিচারের ফল হইতে বঞ্চিত হয়। এই সকল অমঙ্গল নিবারণ উদ্দেশে কমিসনরগণ বলেন যে বিচারকেরা ভ্রমণে বাহির হইয়া প্রধান২ গ্রামে গিয়া আদালত খুলিবেন ও সেই সময়ে গ্রামের অধীনস্থ পল্লীসমূহের সমুদায় মকদ্দমা তাঁহাদের কোর্টে উপস্থিত করিতে হইবে। গ্রামের মণ্ডলেরা প্রতিবাদীদিগকে আনিয়া হাজির করিতে আদিষ্ট হইবে—কার্য্য-প্রণালী যতদূর সহজ হইবার তাহা হইবে এবং প্রতিবাদীর যদি আপনার পক্ষে কিছু বলিবার থাকে সে তাহা ব্যক্ত করিবে, এইরূপ হইলে অনেক জাল প্রতারণা মিথ্যাসাক্ষ্য উঠিয়া যাইবে, প্রতিবাদিগণ মন খুলিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনে সক্ষম হইবে, সাক্ষীরাও অকুতোভয়ে অন্যের পক্ষ হইয়া সাক্ষ্যদান করিতে পারিবে। প্রতিবাদিগণের প্রবাস যাপনের কষ্ট দূর হইবে। এইক্ষণে যে সকল মকদ্দমার বহুকষ্টে দীর্ঘকালে মীমাংসা হয় তাহা অনতিপরিশ্রমে অল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি হইবে—বিচারে ন্যায় ও ত্বরা উভয়ই রক্ষা পাইয়া অর্থী প্রত্যর্থীর সন্তোষ সাধন করিবে।

অধুনাতন আদালতে কার্য্য-প্রণালী রাইয়তের পক্ষে বিষম সঙ্কটাবহ তাহার আর সন্দেহ নাই। দাবীদার আসিয়া তাহার দাওয়ার আরজী দাখিল করিলে পর প্রতিবাদীর প্রতি কোর্টে হাজির হইবার সমন জারী হয়, কিন্তু অনেক সময় এই সমন যথাস্থানে পৌঁছে কিনা সন্দেহ। এমন হইতে পারে যে বেলিফ বাদীর টাকায় ক্রীত, সে সমন জারী না করিয়াও কোর্টে মিথ্যা রিপোর্ট প্রেরণ করিল। ডিক্রী-জারীর সময় রাইয়ত হয়ত প্রথম জানিতে পারিল যে তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত—সে অমনি দৌড়িয়া কোর্টে গিয়া নিবেদন করিল "দোহাই ধর্ম্মাবতার, আমি এ মকদ্দমার কিছুই জানি না।" সে আপনার কথা সমর্থন করিতে পারে না পারে তাহ দৈবের উপর নির্ভর। রাইয়ত যদি বা সমন পাইল, তাহাকে কোর্টে আসিয়া দাওয়ার উত্তর দিতে হইবে—উকীল নিযুক্ত করিতে হইবে—সাক্ষীর ডাকিবার খরচা দিতে হইবে, এই সকল বিভীষিকা দেখিয়া সে আদালতে ঘেঁসিতেই সঙ্কুচিত হয়। অতএব অধিকাংশ মকদ্দমা যে প্রতিবাদীর অবর্ত্তমানে নিষ্পত্তি হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? তদনন্তর রাইয়তের উপর একবার ডিক্রী করিয়া লইতে পারিলেই মহাজনের কার্য্যসিদ্ধ হইল। সে যে সদ্য সদ্য ডিক্রী-জারী করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহা নহে কিন্তু

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

সে সেই ডিক্রী রাইয়তের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া সময়ে সময়ে তাহার নিকট হইতে টাকা শস্য গ্রহণ করে, অথবা তাহাকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করে। তৎপরে ইচ্ছা হইলে আবার সম্পূর্ণ ডিক্রী-জারী করিয়া লয়। এইরূপ প্রবঞ্চনায় আইন তাহার সহায়, কেন না আইনানুসারে ডিক্রীর টাকা কোর্টে আনিয়া অথবা কোর্টকে জানাইয়া ডিক্রীদারকে দিতে হইবে। কিন্তু রাইয়ত ত এ নিয়মের কিছুই জানে না। সে একবার আপনার যথাসর্ব্বস্ব বেচিয়া কিনিয়া ডিক্রীর টাকা শুধিয়াছে—তাহার উপর আবার ডিক্রী-জারীর সংবাদ পাইয়া কোর্টে গিয়া কাঁদিয়া পড়ে "দোহাই ধর্ম্মাবতার, আমি ডিক্রীর সব টাকা শুধিয়াছি—বাদীর আর এক-পয়সাও পাওনা নাই।" বিচারক কি করিবেন—তাঁহার হাত পা বদ্ধ—হয়ত বলিতে বাধ্য হন "তুই আপসে বাদীকে টাকা দিয়াছিস্—কোর্টে হাজির করা হয় নাই—এখন আর আমি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারি না"—এই বলিয়া তাহাকে দূর করিয়া দেন। দৈবাৎ কখন এই অত্যাচার মাজিষ্ট্রেটের কর্ণগোচর হইলে ফৌজদারীতে ইহার বিচার হইতে দেখা যায় ও তখন মহাজন তাহার দুষ্কৃতির উপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হয়।

উল্লিখিত বিবরণ পাঠে সহজে প্রতীতি হইবে, দরিদ্র প্রতিবাদীর ন্যায়-লাভ কিরূপ দুর্ঘট। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাহার যন্ত্রণাভোগ। প্রথমতঃ মকদ্দমার ব্যয়-বাহুল্য হেতু তাহার পক্ষে আদালতের দ্বার ত একপ্রকার রুদ্ধ বলিলে হয়। যদি কখন প্রবেশ করিতে পায় ত আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া জয়লাভ করাও তাহার পক্ষে সহজ নহে। আর তাহার বিরুদ্ধে একবার যদি ডিক্রী বাহির হইল তাহা হইলে আর তাহার নিস্তার নাই। তখন হইতে তাহার মন্দভাগ্য উদয়—তাহার সুখশান্তি সকলি অস্তমিত হইল—সেই অবধি সে হয়ত মহাজনের দাসত্বে তাহার সমুদায় জীবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য হয়।

রাইয়তেরা প্রায়ই অজ্ঞান—লেখাপড়া কিছুই জানে না—আপনাদের হিতাহিত কিছুই বুঝে না। সামান্য হিসাব-জ্ঞান না থাকায় অনেক সময় তাহারা প্রতারিত হয়। তাহারা বুঝে, এক লেখায় দাঁড়ায় আর একপ্রকার। রাইয়ত যে টাকা কর্জ্জ করিতে চায় ও যাহার জন্য সে খত লিখিয়া দেয় অনেক সময় তাহা পূরাপূরি প্রাপ্ত হয় না—কখনো বা একেবারে কিছুই পায় না। অনেক সময় মহাজন দেনার টাকা অথবা শস্য পাইয়াও তাহা রাইয়তের হিসাবে জমা করিয়া লন না। দেনার টাকা পাইলে তাহার রসিদ দিবার ত নিয়ম নাই, সুতরাং দেনা শুধিয়াও তাহা আদালতে সপ্রমাণ করা রাইয়তের পক্ষে সামান্য কঠিন ব্যাপার নহে ও কাজেই দেনা বারবার পরিশোধ করিয়াও অনেক সময় তাহার নিস্তার নাই।

রাইয়তের উপর মহাজনের যে অত্যাচার—আদালতে যে সকল ঋণ সম্বন্ধীয় মকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহা হইতে তাহার রাশি রাশি প্রমাণ সংগৃহীত হইতে পারে। বোম্বাই হাইকোর্ট রিপোর্ট পাঠ করিলে পাঠকেরা তাহার কতক আভাস প্রাপ্ত হইতে পারেন। এবিষয়ে তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য নিম্নলিখিত মকদ্দমাটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, ইহা হইতে রাইয়তের ব্যবহার-জ্ঞান সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। *

এই মকদ্দমার পত্তন একটী বন্দকথতের উপর। দুইজন রাইয়ত মহাজনের নিকট হইতে ৩০০ টাকা কর্জ্জ করিয়া প্রায় বিশ বিঘা জমি বন্ধক দিয়া ১৮৬২ সালে এক খত লিখিয়া দেয়। খতের করার এই যে সুদের পরিবর্ত্তে রাইয়তেরা উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধভাগ মহাজনের বাটীতে প্রতিবর্ষে আনিয়া উপস্থিত করিবে। প্রতিবর্ষে ২০টাকা করিয়া ৩০০ টাকা পরিশোধ করিতে হইবে। ১৫ বৎসরের পূর্ব্বে সে ঋণ পরিশোধ হইয়া গেলেও মহাজনকে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত শস্যের অর্দ্ধভাগ বর্ষে বর্ষে আনিয়া দিতে হইবে আর খতের তারিখ হইতে চারি মাসের মধ্যে যদি সরকারী দফতরে মহাজনের নামে জমি দাখিল করা না হয় তাহা হইলে সেই জমি মহাজনের নিকট ১০০ টাকায় বিক্রীত হইবে। অবশিষ্ট ২০০ টাকা একবৎসর পরে চাহিবা মাত্র সুদ শুদ্ধ আনিয়া দিতে হইবে। রাইয়ত যদি বার্ষিক শস্যার্দ্ধভাগ দিতে অক্ষম হয় অথবা জমি মহাজনের নামে করারমত দাখিল করা না হয় কিম্বা প্রতিবর্ষে ২০ টাকা দিবার ব্যতিক্রম ঘটে, কি জমি পতিত রাখা হয় তাহা হইলে একশত টাকার মূল্যে সেই জমির উপর মহাজনের সম্পূর্ণ অধিকার হইল। শস্যার্দ্ধভাগের মূল্য যতই হউক না কেন—আসল টাকার দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক হইলেও তাহা কখনই অদেয় থাকিবে না।

এই খতের চারিজন জামীন। তাহারাও দেনা পরিশোধের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। তাহাদের দুইজনে আপনাদেরও জমি বন্ধক দিয়া এই অঙ্গীকার করে যে মূল ঋণী দেনা পরিশোধে অক্ষম হইলে জামীনদারদের সেই জমি শুদ্ধ একশত টাকার মধ্যে বিক্রীত গণ্য করা যাইবে। অপর দুই ব্যক্তি এই করার করে যে উক্ত বন্ধক জমি হইতে ঋণ আদায় না হইলে আমরা যেমন করিয়া হউক আমাদের ঘর বলদ কৃষিযন্ত্র গৃহসামগ্রী সমস্ত বেচিয়াও তোমার টাকা পরিশোধ করিব।

মহাজনেরা ১৮৬৪ সালে ৫০০ টাকা মায় খরচা আদায় করিবার জন্য নালিশ করে ও তাহাদের আবেদন এই যে আসল ঋণী ও জামিনদের জমীর স্বত্বের উপর তাহাদের ক্রয়াধিকার আদালত হইতে নিরূপিত হয় ও সেই সকল জমি ও ফসলে তাহাদের দখল দেওয়া হয়। আর বন্ধকীকৃত ঘর বলদ কৃষিযন্ত্র গৃহসামগ্রী বেচিয়া তাহার ৫০০ টাকা আদায় করা হয়।

* Bombay High Court Reports Vol 3.

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

প্রতিবাদিগণ উত্তর দেয় আমরা এ খত লিখিয়া দিই নাই, আর একটী খত লিখিয়া দিয়াছি—যাহার করার অপেক্ষাকৃত সহজ। তাহাতে আমরা শস্যের কতক ভাগ দিতে স্বীকৃত হইয়াছি বটে কিন্তু আমাদের দোষ নাই—আমরা সেই ভাগ বাদীদের দিতে প্রস্তুত হইলেও তাহারা তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হয় নাই।

মুন্সেফের বিচারে বন্ধক খত সাব্যস্ত হইল ও তিনি নির্ণয় করিলেন যে মূল ঋণিগণ তাহাদের করার মত কার্য্য করিতে সমর্থ হয় নাই সুতরাং তাহাদের জমীর উপর বাদীদের সম্পূর্ণ স্বত্ব জন্মিয়াছে, ও তাহারা খরিদার রূপে জমি দখলের অধিকারী। আদালতের ডিক্রী হইল যে ১০০ টাকা মূল্যে বাদীদিগকে সেই জমি দখল দিতে হইবে। আরো হুকুম হইল যে ঋণী ও তাহার অভাবে জামীনদের মহাজনদিগকে মূল ঋণের অবশিষ্ট ২০০ টাকা ও ও সুদের হিসাবে ৩০০ টাকার শস্য দেওয়া বিধেয়।

জিলা জজের নিকট আপীলে সেই হুকুমনামা বাহাল রহিল।

পরে প্রতিবাদীরা এই ডিক্রীর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিল।

চীফ জষ্টিস সাহেব বলিলেন ;—

আমরা এই Equity কোর্টের বিচারাসনে বসিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এই কোর্ট হইতে এই বন্ধক খত সদৃশ অন্যায় ও কঠোর করার পূর্ণ খত অনুমোদিত ও কার্য্যে পরিণত হওয়া কখনই উচিত নহে। ইহা সত্য যে যে স্থলে প্রতারণা নাই সে স্থলে উপযুক্ত মূল্যের অসদ্ভাবে কোন চুক্তি রহিত করা অথবা তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে না দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। কিন্তু মূল্যের স্বল্পতার সঙ্গে যখন প্রবঞ্চনা—প্রতারণা—যথার্থ মূল্য গোপন, বিষয়ের অযথা বর্ণন, অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন—জড়বুদ্ধি কিম্বা অজ্ঞান ইহার কিছু না কিছু সম্মিলিত দেখা যায় তখন Equity কোর্টের বিবেচনা-যোগ্য যে এরূপ করার গ্রাহ্য হইবে কি না—তাহা কার্য্যে পরিণত করা উচিত কি না? এই সকল কারণে অনেক সময় অল্প মূল্যের বিক্রী রহিত করা আবশ্যক হইয়া পড়ে।

আমরা এরূপ কোন সাধারণ নিয়ম বাঁধিয়া দিতে চাহি না যে জানিয়া শুনিয়া কোন ব্যক্তি কোন করারে প্রবিষ্ট হইলে তাহার কঠোরতা নিবন্ধন সে তাহা হইতে মুক্তিলাভের অধিকারী হইবে। কিন্তু এই মকদ্দমায় যখন দেখা যাইতেছে যে অজ্ঞান রাইয়ত যাহারা লেখাপড়া কিছুই জানে না—আপনাদের নাম স্বাক্ষর করিতেও যাহারা অক্ষম, তাহারা যে সময়ে আপনাদের কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য কর্জ্জ করিতে উদ্যত, তাহাদের তখনকার টাকার নিতান্ত প্রয়োজন দেখিয়া মহাজনেরা এমন কঠোর করার তাহাদের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়াছে—যখন দেখিতে পাই রাইয়তেরা লিখিয়া দিয়াছে যে তাহারা শস্যের নিয়মিত অর্দ্ধাংশ যোগাইতে অক্ষম হইলে ও অন্যান্য কারণ উপস্থিত হইলে তাহারা

আপনাদের জমি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত—এত অল্প মূল্যে যে তাহা ঋণের তৃতীয়াংশ মাত্র—যে ঋণের টাকা জমির বার্ষিক উপস্বত্বের অর্দ্ধাংশেরও অধিক নহে—আর এরূপ করিয়াও তাহারা ঋণের অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশের জন্য সুদ শুদ্ধ দায়ী—যখন দৃষ্ট হইতেছে যে বার্ষিক উৎপন্ন শস্য দিবার কোন ত্রুটি না হইলেও, করার মত অপরাপর কার্য্য করিতে সক্ষম হইলেও, মূল টাকা পরিশোধ করিতে পারিলেও ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা শস্যার্দ্ধভাগ দানে বাধ্য, তখন এই অন্যায় পীড়নকারী কঠোর-করার-পূর্ণ খত রহিত করা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি, কেন না ইহাতে ঋণিগণ একপ্রকার প্রতারিত হইয়াছে অনুমান না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। আমরা কোন মতে বুঝিতে পারি না কেমন করিয়া কোন মনুষ্য সহজ বুদ্ধিতে এইরূপ লিখিয়া দিতে সম্মত হইবে যদি তাহারা কি লিখিয়া দিতেছে তাহা ভাল করিয়া স্পষ্ট জানিতে পারে ও তাহার ফলাফল বিবেচনা করিতে সমর্থ হয়। যদিও জিলাজজের মতে আমরা মত দিতে বাধ্য হইতেছি যে এই খত রাইয়তেরা লিখিয়া দিয়াছে—এই খত তাহারা লিখিয়া দিয়াছে ইহা যদিও সত্য হয় তথাপি লিখন পঠনে অসমর্থ অবোধ লোকের নিকট একবার এইরূপ লেখা পাঠ করিলেই যে তাহা তাহাদের বোধগম্য হইবে তাহা প্রত্যাশা করা যায় না—এই সকল অসাধারণ দুরূহ করার তাহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া উচিত।

এই বলিয়া এই ঘোর অন্যায় কঠোর বন্ধক খত হাইকোর্ট হইতে অগ্রাহ্য হয় ও রায়তেরা তাহাদের যথার্থ দেনার টাকা দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করে। যদি হাইকোর্টে এই মকদ্দমার আপীল না হইত তবে গরীব বেচারী রাইয়তদিগকে কি অত্যাচারই ভোগ করিতে হইত।

দুষ্টবুদ্ধি মহাজনেরা গরীব রাইয়তের উপর শাঠ্য সকল বিস্তার করিতে না পারে এই জন্য কমিসনরগণ এই রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে প্রত্যেক তমস্থক হয় কোন রেজিষ্ট্রার কি কোন গবর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারীর সমক্ষে লিখিত পঠিত ও স্বাক্ষরিত হয়। এই রূপ কোন নিয়ম প্রচলিত হইলে কেবল যে রাইয়তের লাভ তাহা নহে। কিন্তু অনেক সময় সদাশয় মহাজনেরও তাহা কার্য্যকর হইতে পারে। অনেক মকদ্দমায় এই রূপ দেখা যায় যে, যে সকল খত সত্য সত্যই লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে ঋণী তাহা অস্বীকার করে ও গ্রামস্থ লোকদিগকে আপনার পক্ষে ডাকিয়া তাহা লিখিত ও স্বাক্ষরিত হয় নাই ইহা আদালতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা পায়। উল্লিখিত প্রণালী অবলম্বিত হইলে এই রূপ মিথ্যা শপথের পথ অবরুদ্ধ হয়। কোন্ পক্ষ সত্য তাহা আপীলে নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন—কারণ প্রথম কোর্টের জজ সাক্ষীদের ভাব ভক্তি দেখিয়া তাহাদের সাক্ষ্যের সত্যাসত্য কতকটা নিরূপণ করিতে সক্ষম হয়েন—আপীল কোর্টে সুকৌশল-গ্রথিত শিক্ষিত সাক্ষীদলের অসত্যজাল আবিষ্কৃত

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

হওয়া সহজ নহে। অনেক সময় এই রূপ ঘটে যে ঋণী খত লিখিয়া দিবার সময় নাবালক ও আপনার হিতাহিত বোধে অসমর্থ, খতের মর্ম্ম তাহারা কিছুই বুঝে না, তথাপি ছলবল কৌশলে তদুপরি তাহাদের নাম স্বাক্ষরিত হয়। যখন সেই খতের দাবীতে মকদ্দমা উপস্থিত হয় তখন ঋণী অজ্ঞান আলস্য ভয় নিরাশা বশতঃ বিচারালয় হইতে দূরে থাকে, সুতরাং অবর্ত্তমানে তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী হইয়া যায়, করারের প্রকৃত স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকে। যদি কোন নিযুক্ত কর্ম্মচারীর সমক্ষে তমসুক লিখিয়া দিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় তাহা হইলে নাবালকের উপর এরূপ অত্যাচার স্থান পায় না। এক দিকে অবোধ রাইয়ত ধূর্ত্ত মহাজনের প্রবঞ্চনা হইতে নিষ্কৃতি পায়, অন্যদিকে মহাজনের ন্যায্য টাকা মিথ্যা সাক্ষ্যে ডুবিয়া যাইবার আশঙ্কা দূর হইয়া সুদের দর কমিয়া যায়, তাহাতে রাইয়তের মঙ্গলেরই সম্ভাবনা। যদি মহাজনের ন্যায্য পাওনা ডুবিয়া যাইবার ভয় দূর হয়—যদি ঋণের পরিমাণ সহজে সপ্রমাণ হইবার উক্তরূপ কোন উপায় নির্দ্ধারিত হয়—তবে যে সকল স্বল্প সম্পত্তি সম্পন্ন মহাজন এক্ষণে ভয়ে অগ্রসর হইতে চায় না তাহারা বড় বড় মহাজনের প্রতিস্পর্দ্ধী হইতে সাহসী হইবে ও এই প্রতিস্পর্দ্ধিতায় সুদের দর আপনা হইতে কমিয়া গিয়া পরিণামে রাইয়তের কল্যাণ সাধিত হইবে।

কেহ কেহ পরামর্শ দেন যে এই ক্ষণে মহাজনেরা ঋণীর নিকট হইতে অপরিমিত সুদ গ্রহণ করেন তাহার প্রতিবিধান করা আবশ্যক। তাঁহাদের মতে সুদের এক নিয়মিত দর বন্ধন করা উচিত, তাহা অপেক্ষা অধিক দরের সুদ ধার্য্য হইলে আদালতে তাহা অগ্রাহ্য হইবে। এই রূপ সুদের সীমা বন্ধনকারী কোন আইন করা তাঁহাদের অভিপ্রেত। হিন্দু শাস্ত্রে অপরিমিত সুদ গ্রহণ করা নিষেধ। মনু লিখিয়াছেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাতি সুদ দিয়া টাকা ধার করিতে পারেন কিন্তু সুদ নিয়া টাকা ধার দিতে পারিবেন না। যথা—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবাপি বৃদ্ধিং নৈব প্রযোজয়েৎ
কামং তু খলু ধর্ম্মার্থং দদ্যাৎ পাপীয়সেঽল্পিকা

—ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয় বৃদ্ধি যোজনা করিবেন না কিন্তু যে পাপবুদ্ধি চাহিবে তাহাকে ধর্ম্মার্থে অল্প সুদ ইচ্ছামত দিতে পারিবেন—

দশম অধ্যায়—১১৭।

সুদের প্রতিরোধক আরো কতকগুলি নিয়ম আছে, যথা—

বশিষ্ঠবিহিতাং বৃদ্ধিং সৃজেৎ বিত্তবিবর্দ্ধিনীং
অশীতিভাগং গৃহ্লীয়ান্মাসাদ্বার্দ্ধুষিকঃ
শতে ॥ ১৪০

দ্বিকং শতং বা গৃহ্লীয়াৎ সতাং ধর্ম্ম মনুস্মরন্
দ্বিকং শতং হি গৃহ্লানো ন ভবত্যর্থকিল্বিষী ॥ ১৪১

দ্বিকং ত্রিকং চতুষ্কং চ পঞ্চকং চ শতং সমং।
মাসস্য বৃদ্ধিং গৃহ্লীয়াদ্বর্ণানামনুপূর্ব্বশঃ
॥ ১৪২

অষ্টম অধ্যায়।

বৃদ্ধি ব্যবসায়ী ব্যক্তি বিত্ত বর্দ্ধনকারী বশিষ্ঠ-বিহিত সুদ গ্রহণ করিতে পারিবেন অর্থাৎ মাসে শতের অশীতি ভাগ গ্রহণ করিবেন।

শতের ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া শতকরা দুয়ের হিসাবে গ্রহণ করিবেক,—যে ব্যক্তি শতকরা দ্বিক গ্রহণ করেন, তিনি অর্থদোষে দোষী হয়েন না।

বর্ণানুক্রমে শতকরা দ্বিক ত্রিক চতুষ্ক অথবা পঞ্চক মাসিক বৃদ্ধি গ্রহণ করিবেক অর্থাৎ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে দ্বিক, ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে ত্রিক, বৈশ্যের নিকট হইতে চতুষ্ক এবং শূদ্রের নিকট হইতে পঞ্চক।

সুদ গ্রহণ সম্বন্ধে হিন্দু-শাস্ত্রের এক বিশেষ নিয়ম এই যে, এককালে সুদ শুদ্ধ দেনা গ্রহণ করিলে মূলধন অপেক্ষা অধিক সুদ গৃহীত হইবে না।

যথা মনু—

কুসীদবৃদ্ধি দ্বৈগুণ্যং নাত্যেতি সকৃদাহৃতা।
ধান্যে সদে লবে বাহ্যে নাতিক্রমতি
পঞ্চতাং ॥ ১৫১

কৃতানুসারাদধিকা ব্যতিরিক্তা ন সিধ্যতি।
কুসীদপথমাহুস্তং পঞ্চকং শত মর্হতি ॥ ১৫২

অষ্টম অধ্যায়।

ঋণের টাকা এককালে আহৃত হইলে তাহার দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক সুদ গৃহীত হইবে না—ধান্য, ফল, লোম অথবা বাহক জন্তু সম্বন্ধে ঋণের পঞ্চগুণ অতিক্রম করিবেক না।

নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অতিরিক্ত সুদ গ্রহণ করিলে তাহা অসিদ্ধ—তাহাকে কুসীদপথ কহে। ঊর্দ্ধ সংখ্যা শতকরা পঞ্চক মাত্র ঋণীর নিকট হইতে প্রাপ্য।

উক্ত নিয়মকে "দাম দুপট" কহে ও এপ্রদেশের আদালত সকলে ঐ নিয়ম প্রচলিত। ঋণ আদায় করিবার সময় মহাজন কখন আসল অপেক্ষা সুদের টাকা অধিক লইতে পারে না—আসলের দ্বিগুণ পর্য্যন্ত 'সকৃদাহৃত' সুদের সীমা। হিন্দুশাস্ত্রের এই নিয়ম ছাড়িয়া দিলে এক্ষণকার আইন অনুসারে সুদের দর অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় চুক্তি অনুসারে নিরূপিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে আইনকর্ত্তাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত কি না এই লইয়া অনেক সময় অনেক তর্ক বিতর্ক শুনা যায়। কমিসনরদিগের মত এই যে আইন দ্বারা সুদের দর নির্দ্ধারিত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে।—আইন দ্বারা সুদের দর বাঁধিয়া দিলে তাহাতে যে ঋণীদিগের লাভের সম্ভাবনা নাই, তাহা পরীক্ষায় প্রমাণীকৃত হইয়াছে। বার্ত্তাশাস্ত্রেরও সিদ্ধান্ত এই যে, এবিষয়ে আইন বাঁধিতে গেলে ফলোপধায়ী হইবে না। ঋণীর টাকার প্রয়োজন ও তাহাকে ধার দিবার মত মহাজনের অর্থের প্রাচুর্য্য—এই দুয়ের উপর সুদের দর নির্ভর করে। যদি আইনের দ্বারা সুদের দর বাজার-দর অপেক্ষা অধিক স্থিরীকৃত হয়, তাহা সুতরাং কোন কার্য্যেরই হইবে না। যদি বাজার দর অপেক্ষা সুদের দর অল্প নির্দ্ধারিত হয় আর এইরূপ নিয়ম করা যায় যে, ঐ নির্দ্ধারিত দরের ঊর্দ্ধে সুদ গৃহীত হইবে না, তাহা হইলে হয়ত ধার কর্জ একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়।

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

অথবা কাহারো টাকা কর্জ করিবার যদি নিতান্তই আবশ্যক হয়, তবে সে নিয়মিত দরের অপেক্ষা এত অধিক সুদ দিতে বাধ্য হয়, যাহাতে আইন ভঙ্গের আশঙ্কা না রাখিয়াও মহাজনে তাহাকে ধার দিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে। সুদের দর বৃদ্ধির জন্য যে মহাজনেরই দোষ এরূপ মনে করা অন্যায়। যদি মহাজনেরা মিলিয়া এইরূপ চক্রান্ত করে যে, চলিত দর অপেক্ষা অধিক দরে সুদ না পাইলে টাকা ধার দিব না, তাহা হইলে উত্তমর্ণের ব্যবসায়ে এত অধিক লাভ দেখিয়া অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী আসিয়া সে চক্রান্ত ভাঙ্গিয়া দিবে সন্দেহ নাই। সামান্যতঃ বিবেচনা করিতে গেলে ঋণ-প্রার্থীকে নিজ স্বার্থ বুঝিয়া দর করিতে দিলেই ভাল হয়—মহাজনের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, তাহাতে দরের সাম্যভাব আপনাপনিই দাঁড়াইবে। কিন্তু একটী কথা এই যে, যে স্থলে চুক্তি-শাস্ত্রের নিয়ম খাটাইলে অন্যায় করা হয়, সে স্থলে কি কর্ত্তব্য। একজন রাইয়ৎ যদি নিতান্ত গরজে পড়িয়া কর্জ করিতে আসে, আর মহাজন তাহার গরজ বুঝিয়া তাহার নিকট হইতে কোন অন্যায় কঠোর সর্ত্ত লিখাইয়া লন, তবে সে সর্ত্ত হয়ত আদালতে অগ্রাহ্য হইবে। এই প্রকার অল্প টাকার ধার কর্জকারী রাইয়তের মহাজনের সহিত এরূপ অধীনতা সম্বন্ধ—একের উপর অন্যের অন্যায় ব্যবহার এরূপ সহজ-সাধ্য যে, এই সকল রাইয়তের রক্ষার জন্য কোন বিশেষ আইন করিলে অযুক্তি-যুক্ত হয় না। ৫০০ টাকার অনধিক দেনার মকদ্দমায় শতকরা ৯টাকার হিসাবে কিম্বা অন্য কোন নিয়মিত দরে সুদ ধরিয়া দেওয়া ও তদতিরিক্ত টাকা অগ্রাহ্য করা—কোর্টের এইরূপ সম্পূর্ণ অধিকার থাকা উচিত। এইরূপ হইলে মহাজনের অত্যাচার হইতে রায়তেরা অনেকটা নির্ব্বৃতি লাভ করে। যে সকল লোকেরা ৫০০ টাকার অধিক টাকা ধার কর্জ করে, তাহারা প্রায়ই আপনার হিতাহিত বুঝিতে সক্ষম আর যে সকল মহাজনের অধিক টাকার কারবার, তাহাদের ভদ্রতা সততার উপরও বিশ্বাস করা যাইতে পারে, সুতরাং এই সকল লোকের জন্য কোন বিশেষ আইন আবশ্যক করে না—তাহাদের পরস্পর চুক্তিই তাহাদের উপর বন্ধনকারী।

বোম্বাই প্রদেশে রাইয়তওয়ারী বন্দবস্ত প্রচলিত বলিয়া সুদের কতকটা বর্দ্ধিতাকার দৃষ্ট হয়। এই বন্দবস্তে সদর খাজনা সময়ে সময়ে বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা থাকাতে রাইয়তের ভূস্বত্বের অনিশ্চিত মূল্য—টাকা ধার দিবার সময় মহাজন তাহার উপর দৃষ্টি রাখিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক দরে সুদ লইতে বাধ্য হয়।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে দেনার টাকা আদায় করিবার ১২ বৎসর পর্য্যন্ত মেয়াদ ছিল, ঐ মেয়াদ অতীত না হইলে ঋণীর নিকট হইতে নূতন খত করিয়া লইবার রীতি ছিল না। তখনকার আইন অনুসারে শতকরা ১২ টাকার অধিক সুদ আদালতে অগ্রাহ্য হইত ও আসলের অধিক সুদ এককালীন পাইবার নিয়ম ছিল

না, সুতরাং কোন মহাজন ১০০ টাকা কর্জ দিয়া এককালে তাহা আদায় করিতে গেলে বার বৎসর অন্তে তিনি উর্দ্ধ ২০০ টাকার ডিক্রী পাইতে পারিতেন। এক্ষণে ঐ বিষয়ে তামাদির নিয়ম ৩ বৎসর, কাজেই রাইয়তেরা প্রায় দুই বৎসর অন্তর সুদ সমেত নূতন খত লিখিয়া দিতে বাধ্য হয়। অতএব ১০০ টাকার খত, শতকরা ২৫ টাকা মায় সুদ তাহা উল্লিখিত প্রকারে পুনঃ পুনঃ নবীকৃত হইয়া ১২ বৎসরের শেষে ঋণীর স্কন্ধে ১১৩৯ টাকার বোঝা নিক্ষেপ করিবে। রাইয়ত কমিসনর মধ্যে শম্ভুপ্রসাদ নামক একজন দেশীয় কমিসনর তামাদি সংক্রান্ত ৩ বৎসরের নিয়ম রাইয়তের ঋণভারগ্রস্ত হইবার এক প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তিনি রাইয়ত ও মহাজনের অনেকানেক পরীক্ষিত হিসাব হইতে স্বমত সমর্থন করিয়াছেন। এই সকল হিসাব হইতে জানা যায় যে ১৮৫৯ এর পর থেকে প্রজাদিগের ঋণভার ক্রমিকই বৃদ্ধি পাইতেছে। যথা—

১৮৫৯ এর পূর্ব্বে কর্জের টাকার সমষ্টি	...	২৬০০
সুদ		১৪৬০
		৪০৬০
দেনা শোধ		৩৪৬০
বাকী		৬০০
১৮৫৯ এর পরে কর্জের টাকার সমষ্টি	...	২৯৩০
সুদ		৪৪২০
		৭৩৫০
দেনা শোধ		২৭৪০
বাকী		৪৬১০

শম্ভুপ্রসাদের মতে তামাদির পূর্ব্বকার মত দীর্ঘ মেয়াদ হইলে রায়তের বিস্তর উপকারের সম্ভাবনা। অন্যান্য কমিসনরেরা কিন্তু এই কথা বলেন যে, যদিও তামাদির নিয়ম পরিবর্ত্তনে রাইয়তের কতকটা অসুবিধা হইয়াছে, তথাপি তাহাদের হিসাব ১২ বৎসর ফেলিয়া রাখা অপেক্ষা ৩ বৎসর অন্তর দেনার নূতন বন্দবস্ত করাই শ্রেয়স্কর ও তাঁহারা এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন যে অন্যান্য বিহিত উপায় অবলম্বিত হইলে আগেকার ১২ বৎসর মেয়াদে প্রত্যাবর্ত্তন অনাবশ্যক হইবে।

প্রচলিত নিয়মানুসারে মারওয়াড়ীর অনুগ্রহের উপর রাইয়তের সকল নির্ভর। মারওয়াড়ীর হস্তেই খত রক্ষিত হয়, রাইয়ত তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অবসর পায় না। মারওয়াড়ী আপন ইচ্ছামত হিসাব প্রস্তুত করে, রাইয়ত তাহা গৃহে লইয়া গিয়া সময়মত পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে না। অনেক সময় এমন দেখা গিয়াছে যে, রাইয়ত ঘোরতর কষ্টে পড়িয়া তাহার ভূমি সম্পত্তি মহাজনের নিকট বন্দক রাখিয়াছে—অনেক বৎসর পরে তাহার অবস্থা একটু ভাল হইলে সে অথবা তাহার সন্তান সন্ততিগণ আপনাদের বন্ধক

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

বিষয় ছাড়াইয়া লইবার জন্য যত্নশীল হয়, কিন্তু তখন মহাজন অথবা তাহার বংশজ লোকেরা বহু কাল ভুক্ত বিষয় ছাড়িয়া দিতে সম্মত নহে। রাইয়ত আদালতে যাইতে বাধ্য হয়। মহাজন উত্তর দেয়—"এ সম্পত্তি বাদীর নহে—ইহা ত আমাদেরই হস্তে বংশ পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে—আমরা বন্ধকের কিছুই জানি না।" খত মহাজনেরই হস্তে রক্ষিত—বাদী সে বন্ধক কি রূপে সপ্রমাণ করিবে? এই সকলের প্রতিবিধান করা নিতান্ত আবশ্যক। এই প্রকার অন্যায় নিবারণের একটী সহজ উপায় আমাদের মনে হইতেছে। যে সকল ষ্ট্যাম্প কাগজের উপর খত লিখিত হয়, তাহার যদি দুই ভাগ পরস্পর সংযুক্ত থাকে—মধ্যে ছিদ্রময় রেখা (যেমন চেক বহিতে সচরাচর দৃষ্ট হয়)—আর যখন তাহার এক ভাগে খত লিখিত হয় তখন যদি তাহার সারাংশ অপর ভাগে লিখিবার নিয়ম থাকে, তাহা হইলে সেই শেষোক্ত ভাগটী খত হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া রাইয়তকে দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ হইলে মূল খতের এক প্রস্ত রাইয়তের হস্তে রক্ষিত হয়। এই দুই ভাগ সহজে মিলাইয়া দেখিবার জন্য দুয়ের উপরই সমান নম্বর থাকা আবশ্যক ও এইরূপ নিয়ম করা উচিত যে এক প্রস্তের উপর ঋণীর নাম ও অপর প্রস্তের উপর মহাজনের নাম স্বাক্ষরিত হইবে। যদি রাইয়তের হস্তস্থিত কাগজে কোন ভুল কি মিথ্যা বিষয় সন্নিবেশিত হয়, তাহা সহজে ধরা পড়িবে ও ঋণী তাহা মহাজনের নিকট হইতে তখনি শোধন করিয়া লইতে পারিবে। মহাজন রাইয়তকে মিথ্যা লিখিয়া দিতে সাহসী হইবে না, কেন না যদি সে তাহার খতের দাবীতে প্রকৃত ঋণের অধিক টাকার জন্য নালিস করিতে যায়, তাহা হইলে তাহার নিজনাম স্বাক্ষরিত অপর প্রস্ত আদালতে উপস্থিত হইলেই তাহার প্রতারণা আবিষ্কৃত হইবে। এখনকার নিয়ম অনুসারে দেনার টাকার কতক ভাগ পরিশোধ করিলে তাহা কখন কখন মূল খতের পৃষ্ঠে লিখিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সে খত মহাজনের নিকটেই থাকে—ঋণী কখন তাহা দেখিতে পায় ও কর্জের টাকা লইয়া "এখন খত কাছে নাই পরে লিখিয়া দিব" এই বলিয়া মহাজন অনেক সময় ওজর করিয়া কাটায়। কিন্তু খতের অপর প্রস্ত ঋণীর হাতে থাকিলে আর এরূপ হইতে পারে না—টাকা দিবার সময় সে তাহার সংখ্যা সেই কাগজের উপর লিখিয়া দিতে মহাজনকে সহজেই বাধ্য করিতে পারে। এইরূপ হইলে রাইয়ত তাহার নিজের হিসাব সহজেই বুঝিতে পারে ও মহাজন কর্ত্তৃক তাহার প্রতারিত হইবার তাদৃশ সম্ভাবনা থাকে না। ইহাতে আর এক প্রকার প্রবঞ্চনার দ্বার রুদ্ধ হয়। কখন কখন এরূপ ঘটে যে, খতের মেয়াদ অতীত হইলে পরেও রাইয়তের ধার শুধিবার সঙ্গতি নাই, মহাজনেও তাহারে বিরক্ত করিতেছে ও আদালতে যাইবার জন্য ব্যস্ত, তখন রাইয়ত অনেক বলিয়া কহিয়া পুরাতন খতের পরিবর্ত্তে তাহাকে এক নূতন খত লিখিয়া দেয়। এই সকল স্থলে নূতন খত লিখিয়া লইয়াও প্রলুব্ধ মহাজন তাহাতে পুরাতন দেনার পরিশোধ স্বীকার করেন না। পুরাতন খতের পরিবর্ত্তে নূতন খত লিখিত হইয়াছে রাইয়তের তাহা সপ্রমাণ করিবার কোন উপায় নাই। যদি নূতন খতে পুরাণ ঋণের কোন উল্লেখ না থাকে তাহা হইলে মহাজন এই দুই খতের পৃথক টাকা আদায় করিয়া লইতে সক্ষম হয়—তাহার বিরুদ্ধে ঋণীর কোন কথা কহিবার উপায় থাকে না। আবার ইহার বিপরীতে কখন কখন দেখা যায় যে ঋণী তাহার ঋণভার হইতে মুক্ত হইবার জন্য মিথ্যা করিয়া বলে যে পুরাতন দেনার পরিবর্ত্তে সে নূতন খত লিখিয়া দিয়াছে। উল্লিখিত প্রণালী অবলম্বিত হইলে, রাইয়ত ও মহাজন উভয়েরই এই প্রকার অসত্য ব্যবহারের দ্বার রুদ্ধ হইবে, সুতরাং মিথ্যা মকদ্দমা উঠিয়া ন্যায়ের আদালতকে কলঙ্কিত করিতে পারিবে না।

এক্ষণকার আইনের বলে মহাজনের কর্জ আদায় করিবার যেরূপ সুবিধা, রাইয়ত তাহার পাকচক্র হইতে সে পরিমাণে সুরক্ষিত নহে, এই বিষয় লইয়া কমিসনরগণ অনেক কথা কহিয়াছেন। তাঁহাদের মতে প্রচলিত আইন মহাজনের অত্যাচারের বিশেষ পোষকতা করে। পূর্ব্বকার দেশীয় প্রথানুসারে মহাজন রাজার নিকট হইতে ঋণ আদায় করিবার বিশেষ কোন সাহায্য পাইত না। তখনকার ঋণ আদায়ের প্রথা

স্বতন্ত্র ছিল। মহাজন ইচ্ছামত ঋণীকে কারারুদ্ধ করিয়া ও খাটাইয়া লইতে পারিতেন। ঋণ আদায়ের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হইত তাহা এই:—

"তাগাদা" অর্থাৎ ঋণীকে টাকার জন্যে বার বার তাগাদা করিয়া উত্যক্ত করা—

"মোহসলী" অর্থাৎ তাগাদা করিবার জন্য ঋণীর নিকট দূত পাঠান ও ঋণীকে তাহার খোরাক যোগাইতে বাধ্য করা—

"ধন্না" ঋণীর দ্বারে ধন্না দিয়া বসিয়া থাকা—

"ত্রাগা" অর্থাৎ টাকা না পাইলে ঋণীকে আত্মহত্যা করিবার ভয় দেখান—

ইত্যাদি অনেক প্রকার নিয়ম ছিল; ইহাতে যেমন ঋণীর উপর পীড়ন তেমনি মহাজনেরও সামান্য কষ্টভোগ নহে। মহাজনের টাকার জন্য রাইয়তের বলদ কৃষিযন্ত্র প্রভৃতি ক্রোক করিয়া তাহাকে নিঃসম্বল করিবার নিয়ম দেশীয় রাজত্ব কালে প্রচলিত ছিল না। ঋণের জন্য বংশ পরম্পরা ভোগ্য ভূমি সম্পত্তি বিক্রীত হইত না। মহারাষ্ট্র দেশে কখনই এরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। সেখানকার রাইয়তেরা অধিকাংশই মিরাসদার বলিয়া গণ্য ছিল ও মিরাসী স্বত্বের নিয়মই এই যে রাইয়ত সে স্বত্ব হইতে কখনই বঞ্চিত হইবার নয়—ছাড়িয়া দিলে যখনি ইচ্ছা তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারিত। ১৮২৭ সালের আইনে মহাজনের ঋণ আদায় সম্বন্ধে নিজস্ব ক্ষমতা প্রত্যাহৃত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে আদালত সকল স্থাপিত হয়। তথাপি তখনকার

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

আইন ঋণীর পক্ষে অনেক সুবিধাজনক ছিল—সুদের দরের সীমা নিরূপিত ছিল, মহাজনেরা তদতিরিক্ত সুদ গ্রহণ করিতে পারিত না ; অপিচ কৃষকের স্বীয় জীবিকা ও কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যে সকল বস্তুর প্রয়োজন, তাহার ক্রোক ও বিক্রয় নিষিদ্ধ ছিল। কাল সহকারে এই সকল নিয়ম পরিবর্ত্ত হইল। বর্ত্তমান আইন সম্বন্ধে কমিসনরগণ নিম্নলিখিত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন;—

ঋণ আদায় করিতে হইলে হয় ঋণীর উপার্জ্জিত ও অর্জনীয় বিষয় বিক্রয়, নয় তাহার ও তাহার পরিবারের কায়িক পরিশ্রম গ্রহণ করা—এই দুই উপায় অবলম্বিত হইতে পারে। যে আইনে অবাধে এই সকল উপায় নিয়োজিত হয়, তাহা পারত পক্ষে মহাজনেরই বিশেষ অনুকূল। এদেশের আইন এবিষয়ে মহাজনের যেন পক্ষপাতী। আর কোন আধুনিক আইন তেমন আছে কি না সন্দেহ। এই আইন মতে ঋণী সপরিবারে মহাজনের নিকট ধন প্রাণে যেরূপ আবদ্ধ, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যদিও আইনে দাসত্বের কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই, তথাপি যখন অশক্ত ঋণীকে বন্দীখানায় প্রেরণ করা মহাজনের ইচ্ছাধীন, তখন পক্ষান্তরে দাসত্বই প্রশ্রয় পাইতেছে বলিতে হইবে। কেন না অনেক দেনদার কারাবাস অপেক্ষা মহাজনের দাসত্ব অল্প যন্ত্রণাদায়ক জ্ঞান করিয়া তাহাতেই ব্রতী হইবে সন্দেহ নাই। কারাবাস ভয়ে যে অনেক সময় রাইয়তকে মহাজনের দাসত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এইত ঋণের জন্য ঋণীর কায়িক দায়িত্বের কথা বলা হইল। তাহার বৈষয়িক দায়িত্ব সম্বন্ধে দৃষ্ট হইবে যে, আইনে মহাজনের হস্তে ঋণীর বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইবার অগাধ ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে। ঋণীর নিজের কিম্বা তাহার স্ত্রী-পুত্র পরিবারের একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুও সে ক্ষমতার বহির্ভূত নয়। ঋণীর পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত বিক্রয় করিবার কোন বাধা নাই, একবার মাত্র তাহাকে হৃতসর্ব্বস্ব ও নিঃসম্বল করিয়া ছাড়িয়া দিলেই যে, সে নিস্তার পাইল তাহা নহে, কিন্তু যখনি আবার সে যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করে, অমনি মহাজন আসিয়া তাহা নিঃশেষ করিয়া লইতে পারে। এইরূপে তাহাকে পুনঃ পুনঃ পীড়ন করিবার ক্ষমতা আইন কর্ত্তৃক মহাজনের হস্তে অর্পিত। সভ্যজাতির আইনে মহাজনকে যতদূর আশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহার অধিক প্রদত্ত হইয়াছে। যে সাধারণ সর্ব্ববাদী সম্মত আইন অনুসারে দেউলিয়া হইয়া ঋণের দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভের নিয়ম আছে, এদেশের রাইয়তের ভাগ্যে সে লাভ টুকুও নাই। এবিষয়ে আর কোন দেশে ভারতবর্ষের আইনের ন্যায় কঠোর আইন আছে কি না সন্দেহ। মুসার বিধানেও "ঋণী সাতবৎসর চাকরী করিয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হইত।"

কমিসনরগণ যখন এদেশীয় আইনের উপর উক্তরূপ দোষারোপ করিয়াছিলেন, তখন নূতন দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইন (Civil Procedure Code) প্রচলিত হয় নাই, আইন-প্রস্তুত-কারী-জাঁতায় পেশিত হইতেছিল মাত্র। এই আইনের গুণে পূর্ব্বকার ঋণ সম্বন্ধীয় কঠোর নিয়ম সকল অনেকাংশে সংশোধিত হইয়াছে। ঋণী মহাজনের নানাবিধ অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। এক্ষণে আর তাহার হলবলদ প্রভৃতি আবশ্যক সামগ্রী সকল ডিক্রীজারীদ্বারা ক্রোক ও বিক্রয় করিবার নিয়ম নাই।—দেনার দরুণ কারাবাসের মেয়াদ স্বল্পীকৃত হইয়াছে—যাহাতে রাইয়তের ভূসম্পত্তি প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা অনেক অল্প দরে বিক্রীত হইতে না পারে তাহার বিহিত উপায় সকল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ও সে যাহাতে অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে ঋণবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে তাহার উপযোগী (Insolvency) নিয়ম সকল রচিত হইয়াছে।

এই সম্বন্ধে আর একটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। দেনার জন্য রাইয়তের জমী হস্তান্তর হইতে দেওয়া উচিত কি না, এবিষয়ে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়। অনেকানেক বিদ্বানের মত এই যে, স্থাবর সম্পত্তি একশ্রেণীর লোকের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিবার নিয়ম কখন হিতাবহ হইতে পারে না। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ভূমির ব্যবস্থাও প্রতিজনের স্বেচ্ছাধীন রাখা কর্ত্তব্য। প্রকৃতির নিয়মই এই যে বলীর হস্তে দুর্ব্বলের পরাজয়—ধনীর নিকট দরিদ্রের পরাজয়। ধনবান্ জমীদার নির্ধন রাইয়তের স্থান অধিকার করিলে মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল নাই। যে সকল লোক আপনাদের বিষয় আপনারা রক্ষা করিতে অক্ষম—বিষয়ের উন্নতি সাধনে অসমর্থ তাহাদের ঠেকা দিয়া রাখিবার প্রয়োজন কি ? তাহাতে কি দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে ? গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বৃদ্ধি হইবে? আধুনিক ব্রিটিশ রাজ্যের নিয়মই এই যে যাহারা ইহার নবোত্থিত ঘটনাস্রোতের সহিত সন্তরণ করিয়া কার্য্য করিবে, তাহাদেরই জয়। লক্ষ্মী তাহাদের প্রতিই প্রসন্ন। ধন সঞ্চয় করিলেই ভূমি সম্পত্তি করিবার স্বাভাবিক স্পৃহা উদ্দীপ্ত হয়, তাহা কি কতকগুলি কৃত্রিম নিয়ম দ্বারা নির্ব্বাপিত করা উচিত ? রাইয়ত আবহমান কাল হইতে একখণ্ড ভূমি কর্ষণ করিয়া আসিতেছে বলিয়া ই কি তাহার স্বত্ব চিরস্থায়ী রাখিতে হইবে ? সে যদি ঋণভারে এরূপ আক্রান্ত হইয়া পড়ে যে গবর্ণমেণ্টের খাজনার জন্যও তাহাকে মহাজনের শরণাপন্ন হইতে হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা কি কৃষিকার্য্য সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে—সে জমী তাহার হস্ত হইতে মহাজনকে দিলে কি ভাল হয় না ?

ইহার বিপক্ষ দলের লোকেরা বলেন, এরূপ যুক্তি যেমন শ্রুতিমধুর, কার্য্যে তেমন ফলোপধায়ী দেখা যায় না। বার্ত্তা-শাস্ত্রের সমুদয় নিয়ম এদেশে খাটে না। দেখিতে হইবে যে অমুক নিয়ম এদেশের সামাজিক অবস্থার উপযোগী কি না। জাতিভেদ প্রথা —চিরন্তর দেশাচার—কুলাচার সকল দিক্

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

ভাবিয়া তাহার ফলাফল নিরূপণ করিতে হইবে। অহিফেন সেবন অনিষ্টকারী সত্য, কিন্তু তাহা একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইলে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। ভূমির উপর দেশীয়দের মমতা এরূপ প্রগাঢ়—সামাজিক নিয়ম ও কুলাচারের সঙ্গে তাহা এরূপ অনুস্যূত, যে তাহা ভগ্ন করিয়া সেই ভূমি পরহস্তগামী করা সামান্য কঠোর কার্য্য নহে। এতৎ সম্বন্ধে হিন্দু সমাজের একান্নবর্ত্তী পরিবারের নিয়ম বিবেচনা-যোগ্য। এক পরিবারের মধ্যে প্রতিজনে স্ব স্ব অংশ হস্তান্তর করিবার অধিকারী অথবা এইরূপ স্থলে পরিবারস্থ সমস্ত লোকের সাধারণ সম্মতি আবশ্যক কি না—এবিষয়ে হিন্দু আইন শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় মতভেদ দৃষ্ট হইবে। বোম্বাই অঞ্চলে বৈধ বিক্রয়ের জন্য সর্ব্বসম্মতি আবশ্যক, এই নিয়ম হিন্দু শাস্ত্র সম্মত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। একত্রিত পরিবারের অবিভক্ত স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে অপর কোন ব্যক্তি প্রবিষ্ট হইলে সমূহ অনিষ্টের সম্ভাবনা। এক পরিবারের বসতিবাটীর একভাগ ক্রয় করিয়া তাহাতে যদি একজন ভিন্ন জাতীয় আগন্তুক আসিয়া বাস করে, তাহা হইলে হয়ত সমুদায় পরিবারকে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য করিতে পারে।

তুমি বলিতেছ ধন হইলেই ভূমি সম্পত্তি করিবার ইচ্ছা জন্মে, কিন্তু তাহা না করিলেই বা ক্ষতি কি? সেই ধন বাণিজ্য ব্যবসায়ে পরিচালিত হইলে কি দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় না? আরো জিজ্ঞাস্য এই, যখন মহাজন রাইয়তের যথা-সর্ব্বস্ব বিক্রয় করাইয়া তাহার ভূমি দশমাংশ মূল্যে কিনিয়া অধিকার করে, তখন তাহারা কি সেই ভূমির উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হয়? কৃষি কার্য্যের উন্নতি সাধন, বাপী পুষ্করিণী খনন—ভূমির সারবত্তা বর্দ্ধন—মহাজন জমীদার কি এই সকল কার্য্যে মনোযোগী হন? তাঁহাদের যত্নে কি ভূমির মূল্য বৃদ্ধি—কৃষির উন্নতি—কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে দেখা যায়? অনেক সময় ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। মহাজন সেই পুরাতন রাইয়তকেই নিযুক্ত করেন—ভূমি ও ফসলের অবস্থা সমানই থাকে—কৃষি কার্য্যের উন্নতি নাই, কেবল কৃষকের অবস্থান্তর উপলক্ষিত হয়—পূর্ব্বে যে ব্যক্তি স্বয়ং ভূস্বামী ছিল, সে এক্ষণে মহাজনের খেতুত হইয়া সেই ভূমি কর্ষণ করে ও আপনার শ্রমজাত সমস্ত দ্রব্য প্রভুর চরণে ঢালিয়া দেয়। এই সকল মহাজনের অর্থোপার্জনশক্তি ভিন্ন এমন আর কি শক্তি—কি ঔদার্য্য—পৌরজনোচিত এমন কি গুণ আছে, যে তাহা দেখিয়া রাজা রাইয়তের সর্ব্বনাশ করিয়া তাহাদিগকে প্রশ্রয় দিতে প্রবৃত্ত হইবেন?

যে সকল প্রদেশে রাইয়তওয়ারী বন্দবস্ত প্রচলিত, রাজাই সেখানকার ভূস্বামী—রাজাই জমিদার। তিনি যাহাকে ইচ্ছা ভূমি দান করিতে পারেন। তিনি যদি এরূপ নিয়ম করেন যে কোন মহাজন রাইয়তকে তাহার স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না, তাহাতে কাহারো কোন কথা কহিবার অধিকার নাই। রাজা বলিতে পারেন, আমি কোন মধ্যবর্ত্তী ভূস্বামী চাহি না। তুমি

হয় নিজে ভূমি কর্ষণ কর কিম্বা অন্য কোন কৃষককে তোমার স্থান অধিকার করিতে দেও। যদি তোমার স্বত্ব বিক্রয় করিতে ইচ্ছা কর, তবে তাহা মহাজনের নিকট করিও না। যে ব্যক্তি স্বয়ং কৃষিকার্য্য চালাইতে অক্ষম, সে যেন ভূম্যধিকারী না হয়।" রাজা এইরূপ নিয়ম করিতে পারেন যে তাঁহার সম্মতি ব্যতীত কোন রাইয়ত তাঁহার অধিকৃত ভূমি হস্তান্তর করিতে পারিবে না। তিনি এইরূপ নিয়ম প্রচার করিতে পারেন যে, যতটুকু ভূমির উপস্বত্ব হইতে একটী পরিবারের সচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহাতে কোন মহাজনের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার থাকিবে না। সেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমীর ফসল ও তাহা চাস করিবার উপযোগী হল বলদ প্রভৃতি এবং রাইয়তের বসতিবাটীর উপর ডিক্রীজারী করিয়া তাহা কেহ নিলামে বিক্রী করাইবার অনুমতি পাইবে না। তাহার অতিরিক্ত ভূমি এবং কেবল ততটুকু মাত্র কোর্টের আদেশক্রমে নিলামের পাত্র হইতে পারে। *

রাইয়তকে ঋণভার হইতে মুক্ত করিবার জন্য যে সকল উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা ও তদ্ভিন্ন অন্যান্য উপায় বিবেচনা পূর্ব্বক অচিরাৎ অবলম্বন করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আইনসভা হইতে প্রজাদিগের মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়া তাহাদের জন্য বর্ষে বর্ষে ভূরি ভূরি আইন বর্ষণ হইতেছে। ইহা হইতে দেশীয় সংবাদপত্রের মুখবন্ধ করিয়া এক ভয়ঙ্কর আইনের সৃষ্টি হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে রাজস্ব-বর্দ্ধনকারী ভীষণ-দর্শন আইন-রাক্ষস সকল প্রসূত হইতেছে। কিন্তু ১৮৭৫ সালে যে কমিশন বসে, তাহার দ্বারা বোম্বাই রাইয়তের শ্রীবৃদ্ধি সাধনোপযোগী যে সকল উপায় সূচিত হয়, তাহা বিধিবদ্ধ করিয়া আইন প্রস্তুত করিতে এত বিলম্ব হইবার কারণ কি? রাজাই যখন জমীদার—জমীদারের অধিকারের সঙ্গে জমীদারের কর্ত্তব্য ভার তাঁহাকে বহন করিতে হইবে। শুদ্ধ নিয়মিত খাজানা আদায় করিয়া রাজভাণ্ডার স্ফীত করিতে পারিলেই যে তিনি সে ভার হইতে মুক্ত হইলেন তাহা নহে—রাইয়তের সুখ দুঃখের প্রতি তাঁহার বিশেষরূপ দৃষ্টি করা আবশ্যক। তিনি যদি মহাজনের অত্যাচার হইতে রাইয়তকে উদ্ধার করিতে চাহেন, তবে তিনি নিজেই মহাজনের স্থান গ্রহণ করুন। গবর্ণমেণ্ট হইতে যদি রাইয়তদিগকে প্রয়োজন মত অল্প সুদে টাকা ধার দিবার নিয়ম জারী হয়, তাহা হইলে বিস্তর শুভফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। এইরূপ নিয়ম জারি করিবার বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক নাই। যেখানে মহাজন বৎসরে শতকরা ৩৬টাকার হিসাবে সুদ না লইয়া ক্ষান্ত হয় না, সেখানে গবর্ণমেণ্ট তাহার ষষ্ঠাংশ সুদ গ্রহণ করিলেও ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। মহাজনের টাকা আদায় করিবার যে বিঘ্ন বিপত্তি, গবর্ণমেণ্টের তাহার শতাংশের একাংশও

* The land and the law in India. By Raymond West.

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

নহে। গবর্ণমেণ্ট মহাজনের স্থান অধিকার করিলে রাইয়ত প্রবঞ্চনার ভয় হইতে মুক্ত হয়। জাল খত, হিসাবে গোল, সকলি ঘুচিয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট রাইয়তের মহাজন হউন, গবর্ণমেণ্ট আবার তাহাদের কোষাধ্যক্ষ হউন। রাইয়ত অনেক পরিশ্রমে অল্প স্বল্প যাহা কিছু জমাইতে পারিবে, তাহা সে গবর্ণমেণ্টের হস্তে গচ্ছিত রাখিয়া নিঃশঙ্ক হউক। এক্ষণে যেমন Saving's Bank স্থানে স্থানে স্থাপিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বত্র বিস্তারিত হউক, যাহাতে ক্ষুদ্র পল্লীর রাইয়ত পর্য্যন্ত তাহার ফলভাগী হইতে পারে।

ব্রিটিশ শাসন যদি অসংখ্য অসংখ্য রাইয়তের কল্যাণকর না হইল, তবে আর কি হইল। পরিশ্রমী মিতাচারী বিনীত রাইয়ত, মোগল, মহারাষ্ট্রী, পিণ্ডারীদিগের লুটপাট দৌরাত্ম্যের মধ্যে যদি উন্নতশির থাকিয়া আত্মরক্ষণে সমর্থ হইত, তাহা হইলে ব্রিটিশি রাজ্যের আশ্রয়ে তাহাদের কত কল্যাণের সম্ভাবনা। কত বৎসর যুদ্ধ বিপ্লবের নামগন্ধ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে—অন্যায় অত্যাচারের স্থানে বিশুদ্ধ ন্যায়ের আদালত সকল স্থাপিত হইয়াছে—বাণিজ্য ব্যবসা প্রযুক্ত হইয়াছে—অনিয়মিত করের পরিবর্ত্তে ভূমির পরিমিত খাজানা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও রাইয়তের এরূপ দুর্দ্দশা কেন? চতুর্দ্দিক্ হইতেই তাহার আর্ত্তনাদ শ্রবণ করা যায়। সে দুরূহ ঋণভারে আক্রান্ত। মহাজনের দৌরাত্ম্যে তাহারা ধন প্রাণে মারা যাইতেছে। মহাজন আদালতের সাহায্য লইয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিতেছে—তাহার বসতিবাটী—ধন ধান্য—পশু—পরিবার বস্ত্র পর্য্যন্ত ডিক্রীজারী করিয়া লুটিয়া লইতেছে। তাহার পিত্রার্জ্জিত ভূমি সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় করিয়া তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতেছে—তাহাকে চিরদাসত্বে নিযুক্ত অথবা কারাবদ্ধ করিয়া পীড়ন করিতেছে। ইহার কারণ কি? ইহার ঔষধ কি? এই সকল অত্যাচার নিবারণের উপায় কেন অচিরাৎ অবলম্বিত হয় না?

আমাদের বিবেচনায় সকল অপেক্ষা রাইয়তের কল্যাণ সাধনের উৎকৃষ্ট উপায় তাহাকে শিক্ষা দান। শিক্ষাদান ব্যতীত আর আর সমস্ত উপায় ব্যর্থ হইবে। যতদিন রাইয়তেরা অজ্ঞান জালে আবৃত থাকিবে, যতদিন না তাহারা আপনার হিতাহিত বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারিবে, ততদিন তাহাদের নিস্তার নাই। তাহার মঙ্গল উদ্দেশে যতই কর না কেন, শিক্ষার অভাবে সে তাহার সম্যক্ লাভ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইবে। কাল যদি গবর্ণমেণ্ট আইনের বলে তাহার সমুদায় দেনা পরিশোধ করিয়া দেন, রাইয়ত সেই অজ্ঞানান্ধ থাকিলে পরশ্ব আবার হয়ত ঋণপাশে বদ্ধ হইয়া পূর্ব্বদশা প্রাপ্ত হইবে। শিক্ষাদানই এই সকল দুর্গতি নিবারণের একমাত্র ঔষধ। যেমন উচ্চশ্রেণীর লোকদের হিতকারী উচ্চ শিক্ষা দানে গবর্ণমেণ্ট ব্রতী হইয়াছেন, সেইরূপ নিম্নশ্রেণীস্থিত সাধারণ জনগণের উপযোগী সহজ লিখন পঠন

শিক্ষা প্রচারেও তাঁহাদের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্তে গ্রামে গ্রামে ও ক্ষুদ্র পল্লীসমূহেও বিদ্যালয় পাঠশালা সকল স্থাপিত হউক। সুদ্ধ লেখাপড়া শিক্ষা নয়, অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় কৃষিবিদ্যা শিক্ষাও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। স্থানে স্থানে কৃষিবিদ্যালয়—স্থানে স্থানে উন্নত কৃষিকার্য্যের উৎসাহ-বর্দ্ধনকারী আদর্শক্ষেত্র সকল (Model farms) প্রতিষ্ঠিত হউক—অসংখ্য অসংখ্য প্রজাপুঞ্জের জ্ঞান চক্ষু প্রস্ফুটিত হউক—তাহার বুদ্ধিবৃত্তি সকল মার্জ্জিত হউক—তাহাদের অবস্থার উপযোগী শিক্ষালাভের উপায় সকল কল্পিত হউক। তাহা হইলে রাজা প্রজা উভয়েরই কল্যাণ—তাহা হইলেই ব্রিটিশ রাজ্যের কীর্ত্তিস্তম্ভ ভারতবর্ষে এরূপ বদ্ধমূল হইবে যে তাহা কোনকালেই বিলুপ্ত হইবে না।

লিখিতে লিখিতে "বোম্বাই ঋণগ্রস্ত রাইয়ত রক্ষণকারী বিল" আমাদের হস্তগত হইল। এই বিল সম্প্রতি কক্রেল সাহেব ভারতবর্ষীয় আইন সভায় উপস্থিত করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, রাইয়ত কমিসনের পরিশ্রম ব্যর্থ যায় নাই, তাঁহারা রাইয়তদিগের ঋণ মোচনের যে সকল উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছেন, তাহা লইয়া কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে আন্দোলন চলিতেছে ইহা এক শুভ চিহ্ন। প্রস্তাবিত আইন সেই আন্দোলনের ফল স্বরূপ পরিগণিত হইতে পারে।

কক্রেল সাহেবের বক্তৃতা হইতে জানা যাইতেছে যে গতবর্ষে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট, ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর সাহেব কর্ম্মত্যাগ করিবার কিছু পূর্ব্বে, কমিসনের সমুদায় রিপোর্টখানি সমালোচন করিয়া ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টে এক পত্র লেখেন। মহারাষ্ট্রীয় রাইয়তদের ঘোরতর ঋণভার ও তৎকারণ বিষয়ে কমিসনরগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তাহার সহিত একমত হইয়াছেন, কিন্তু প্রচলিত খাজানার আকার অথবা সেই খাজানা আদায়ের কঠোর নিয়মাবলী যে রাইয়তদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন নাই।

ভূমি সম্পর্কীয় খাজানার আকার ও রাজস্ব আদায় বিষয়ে কমিসনরগণ যে সকল অস্ফুট মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের বিবেচনায় কার্য্যে পরিণত করা কঠিন। তাহা করিতে হইলে ফসলে খাজানা গ্রহণ করিবার প্রাচীন প্রথা অবলম্বন করিতে হয়। এই অবনতিকারক প্রথার পুনঃ প্রবর্ত্তনে গবর্ণমেণ্ট কখনই সম্মতি দিতে পারেন না। আর যদি খাজানার কোন নিয়মিত দর বাঁধিয়া না দেওয়া যায়, তাহা হইলে রাইয়তের কি দেয়, তাহা লইয়া গোল উঠিবার সম্ভাবনা। গবর্ণমেণ্ট ও রাইয়তের এই অনিশ্চিত সম্বন্ধ থাকিলে তাহা হইতে যে অমঙ্গল নিরাকৃত হইবার কথা হইতেছে, তদপেক্ষাও অধিক অমঙ্গল প্রসূত হইবে।

এক্ষণকার আইন ও আদালতের হাঙ্গামে রাইয়তের যে অবস্থান্তর লক্ষিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট এই অভিপ্রায়

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

প্রকাশ করেন যে, রাইয়তের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার দুই প্রধান কারণ,—এক দেনা আদায় সম্বন্ধীয় মকদ্দমায় তামাদি মেয়াদের স্বল্পীকরণ ও রাইয়তের বিরুদ্ধে মকদ্দমার একতরফা নিষ্পত্তির সুলভতা। অতএব তাঁহারা কমিসন রিপোর্টে প্রস্তাবিত বিষয়ের মধ্যে এই সকল বিষয় অনুমোদন করিয়াছেন।

১। রাইয়তেরা মহাজনদিগকে যে সকল কর্জ্জখত লিখিয়া দেয়, তাহা একজন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর সমক্ষে লিখিত ও রেজিষ্টরি করা হয়।

২। দেনার টাকা পাইলে রাইয়তকে অবশ্য তাহার রসিদ দিতে হইবে। রাইয়তের ইচ্ছামত তাহাকে মধ্যে মধ্যে হিসাব দেখাইতে ও লিখিয়া দিতে হইবে।

৩। দেনার মকদ্দমা উপস্থিত হইলে আদালতে যাহাতে তাহার সুবিচার হয় তাহার উপায় বিধান করা।

১৮৫৯ সালের পূর্ব্বে দেনার জন্য যে তামাদি আইন প্রচলিত ছিল, বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তাহা পুনঃ স্থাপন করিবার পরামর্শ দেন।

দেনার জন্য গ্রেপ্তার ও কারাবাস উঠাইয়া দেওয়া ও স্থাবর সম্পত্তির উপর ডিক্রীজারী করিয়া তাহা নিলাম হইতে মুক্ত রাখা—এই দুই প্রস্তাব তাঁহাদের মনঃপূত হয় নাই।

ইহার পর আবার এই বর্ষে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত বিষয় সকল আইনে বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করেন।

প্রথমত (ক) যে কোন মকদ্দমা উপস্থিত হউক না কেন, প্রতিবাদী উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক, কোর্ট তাহার সম্পূর্ণ বিচার করিতে বাধিত হইবে।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি কোর্টে আসিয়া পৈতৃক ঋণ শুধিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে সে অন্য কথা, কিন্তু তাহা না হইলে কেহ পৈতৃক ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য নয়।

(গ) চক্রবৃদ্ধি সুদ (Compound Interest) অগ্রাহ্য, আসল টাকার অধিক সুদ কেহ এককালীন দিতে বাধ্য হইবে না।

দ্বিতীয়ত (ক) কোন ঋণী উপস্থিত হইয়া ঋণ পরিশোধে অসামর্থ্য জানাইলেই সে তাহা হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হইবে, তাহাকে কোর্টে গ্রেপ্তার করিয়া আনিবার আবশ্যক নাই।

(খ) যে জমী দেনার জন্য বন্ধক রাখা না হয়, আর সেই বন্ধক খত আইন মত রেজিষ্টরি করা না হয়, কোর্টের হুকুমে সে জমীর নিলাম হইবে না।

প্রস্তাবিত আইনে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হইবার কথা হইতেছে তাহা এই;—

১। প্রতিবাদী গ্রেপ্তার না হইয়াও যদি কোর্টে আসিয়া ঋণ মুক্তির জন্য আবেদন করে, তবে তাহার অবস্থানুসারে তাহাকে দেউলিয়া স্থির করা কোর্টের ক্ষমতা থাকিবে।

২। যে জমী দেনার জন্য বন্ধক রাখা হইয়াছে তাহা ব্যতীত অপর কোন জমী দেনার ডিক্রীতে নিলামের পাত্র নহে।

৩। স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক সম্বন্ধীয় চুক্তি লিপিবদ্ধ ও রেজিষ্টরি করিতে হইবে।

উপরি উক্ত আইন এইক্ষণে কেবল মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত কয়েকটী তালুকে আবদ্ধ—ইহার ফলাফল দেখিয়া ভবিষ্যতে ইহা অন্যান্য স্থানে বিস্তারিত হইবে এইরূপ আশা করা যাইতে পারে।

মেকলের ভারতবর্ষ প্রবাস।

(২)

খ্রীষ্টাব্দ ১৮৩৪ ফেব্রুয়ারি মাসে মেকলে ভারতবর্ষ প্রয়াণোদ্দেশে তাঁহার হানা ভগিনী সমভিব্যাহারে পোতারোহণ করেন। ইংলণ্ড ছাড়িয়া অবধি এদেশে পদনিক্ষেপ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সমুদ্র ভ্রমণের বিশেষ কোন বর্ণনীয় ঘটনা নাই। এই সমুদ্র ভ্রমণের কথা উল্লেখ করিয়া মেকলে এক স্থানে লিখিয়াছেন—"আমার সহযাত্রীদের বিশেষ বিবরণ হানার নিকট হইতে পাইবে, এ আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি। কেন না হানা সকলেরই সঙ্গে আশ্চর্য্য মিশিতে পারিত। সন্ধ্যার সময় পুরুষদের সহিত নৃত্য করা—সকাল বেলায় মহিলাদের সঙ্গে উপকথা ও বক্তৃতাদির গ্রন্থ পাঠ—এই তার কাজ। ঘরের কোন স্ত্রীলোকের সহিত আমার কখন সাক্ষাৎ হইলে আমি বিনয় রক্ষার মত দু চারিটি কথা কহিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতাম, কিন্তু তাহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ যত অল্প হয় তাহার চেষ্টার ত্রুটি করিতাম না। আহারের সময় ভিন্ন আমার জনমানবের সঙ্গে একটু কথা কওয়াও প্রায় ঘটিত না। আমার হাতে যত সময় পড়িয়া ছিল এতটা সময় আর কখনো আমার ইচ্ছামত কাটাইবার সুযোগ পাইয়াছি কি না সন্দেহ। আর ইহাও আহ্লাদের সহিত বলিতে পারি যে আমি আপনিই আপনাতে সন্তুষ্ট থাকিতাম—কাজের অভাব বোধ হইত না। আমি আমার সমুদ্র ভ্রমণের সমুদায় কাল প্রগাঢ় ও দিন দিন নূতন আনন্দের সহিত নিরবধি গ্রন্থপাঠ করিতাম। গ্রীক লাতিন স্পানীয় ইতালীয় ফরাসিস ইংরাজী ছোট বড় মধ্যম রাশি রাশি পুস্তক গলাধঃকরণ করিতাম।"

১০ই জুনে জাহাজ মান্দ্রাজ আসিয়া নোঙর করিল। ভারতবাসীদের মধ্যে মেকলের প্রথম পরিচয় এক নাবিকের সঙ্গে—সে সেই উত্তরঙ্গ সমুদ্রের উপর দিয়া তাহার ক্ষুদ্র নৌকা বাহিতে বাহিতে জাহাজে আসিয়া উপস্থিত। "তাহার মস্তকে ত্রিকোণাকৃতি একটি টুপি ভিন্ন আর কোন পরিধেয় বস্ত্র ছিল না। সে আমাদের মধ্যে কেমন ভদ্র ও অসঙ্কুচিত ভাবে বিচরণ করিতেছিল—তাহার কৃষ্ণবর্ণ ও অনাবৃত দেহ দেখিয়া আমি আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই।" তৎপরে অন্যান্য দূত আ-

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

সিয়া সংবাদ দিল যে গবর্ণর জেনেরাল সাহেব নীলগিরি পর্ব্বতে উতকামুণ্ড নগরে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ সে স্থান পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। সে সময়কার কর্ম্মের ভীড় এমনি যে কৌন্সিল সভার অধিবেশন আবশ্যক—ইংলণ্ড হইতে নবাগত সভ্য তথায় না গেলে চলে না। মেকলের তাঁহার ভগিনীর জন্য ভাবনা হইল যে কি করিয়া এই প্রখর গ্রীষ্মের সময় তাঁহাকে লইয়া দুই শত ক্রোশ পথ অতিক্রম করেন। সৌভাগ্যক্রমে কলিকাতা হইতে সুবিখ্যাত বিশপ উইলসনের নিকট হইতে তিনি এক পত্র পাইলেন যে তাঁহারা ভ্রাতা ভগিনীতে তাঁহার বাটীতে ভারতবর্ষ প্রবাসের প্রথম কয়েকদিন যাপন করেন। হানা এই সুযোগে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন ও তথায় তিনি বিশপের ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। গবর্ণর জেনেরলের স্ত্রী তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন ও ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে ভাব দৃঢ়ীভূত হইল। মেকলে মান্দ্রাজে নামিয়া নূতন দেশ, নূতন লোকের মধ্যে পড়িয়া তাঁহার ভগিনীর বিচ্ছেদ যন্ত্রণা বিস্মৃত হইলেন।

প্রথম কয়েক সপ্তাহ তাঁহার পক্ষে সকলি নূতন ও কৌতূহলময় বোধ হইল। তিন মাস সমুদ্র যাপনের পর প্রথমে ডাঙ্গায় নামাই এক প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন। তার পর আবার সকলি নূতন দৃশ্য। কাল মাথার উপর সাদা পাগড়ী পরিচ্ছদ নূতন প্রকার। ঘর বাড়ী গাছ পালা জলবায়ু তাঁহার স্বদেশের মত কিছুই নয়। এই আশ্চর্য্য দৃশ্যের প্রত্যেক অঙ্গই তাঁহাকে আনন্দে অভিষিক্ত করিল ও তাঁহার স্মৃতি-ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিল। তাঁহার মানস-ক্ষেত্রে কতই ভাব কতই ছবি আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথমে উঠিয়াই ১৫ তোপধ্বনির অভিবাদনে তাঁহার স্মরণ হইল যে তিনি জেতৃজাতি ও রাজপুরুষের একজন। কোন পদচ্যুত রাজা কি নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তাঁহার মনে হইত—আমার সম্মুখে এমন একজন রাজা দেখিতেছি যিনি পুরাকালে প্রথম শ্রেণীর ইউরোপীয় রাজ্যের ন্যায় এক বিস্তৃত রাজ্য শাসন করিতেন। বরগণ্ডীয় ড্যুকের সহিত ফরাসির রাজার যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাঁহার সহিত মোগল সম্রাটেরও হয়ত সেইরূপ সম্বন্ধ ছিল। একটুকু বাহ্যিক সম্মান প্রদর্শন ভিন্ন তিনি হয়ত দিল্লীর সম্রাটের আর কোন ধার ধারিতেন না। সেই রাজা এক্ষণে রাজ্য চ্যুত পঞ্চম চারলস্ অথবা স্বীডনের রাণী ক্রিষ্টিনার ন্যায় একটুকু অকিঞ্চিৎকর জাকজমক ভোগ করিয়াই সন্তুষ্ট। ইহাঁদের রাজসভা কতকগুলি শূন্য আড়ম্বরেই পূর্ণ, কতকগুলি অকর্ম্মণ্য শস্ত্রধারী অবৈতনিক সৈন্য সামন্ত ইহাঁদের নিশানতলে নিযুক্ত—আর ইংরাজ রাজাকে আপনার ভ্রাতা অথবা মিত্র বলিয়া সম্ভাষণ করত শোক কিম্বা অভিনন্দন সূচক পত্র লিখিবার অধিকার ভিন্ন তাঁহাদের আর কোন অধিকার নাই।

মান্দ্রাজে নামিবার এক সপ্তাহের মধ্যে

তিনি ভ্রমণে বাহির হয়েন—রাত্রে পরিভ্রমণ—দিবসে প্রখর রৌদ্রের সময় বিশ্রাম, এই তাঁহার যাত্রার নিয়ম। ভারতবর্ষ দেখিয়া তাঁহার মনে যে সকল ভাব প্রথমে উদয় হইয়াছিল তাহা তাঁহার ভগিনী মার্গরেটের পত্রে প্রতিবিম্বিত দেখা যায়। সেই পত্রের কতক কতক নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

"১৭ই জুনের বিকাল বেলায় আমি মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করিলাম। আমার লোকজন মিলিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ৩৮ জন। আমি এক পাল্কীতে, আমার ভৃত্য আমার পিছনের আর এক পাল্কীতে। সে একজন মিশ্রবর্ণ (Half caste)। ছাড়িবার সময় বলিল যে সে একজন রোমান কাথলিক পরে ক্রুসের আকারে পরাবর্ত্তন করিয়া চোক উল্টাইয়া বলিল যে সে তাহার রক্ষণকারী সেণ্টের শরণাপন্ন হইয়াছে। তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস এই যে আমাদের যাত্রা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে। আমার স্মৃতিপথে গিল্বার চাকর উদয় হইল, সে তাহার মনিবের একটী বাক্স লুটিবার ফন্দি করিতেছিল। তাহার সঙ্গীদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া ফিরিয়া আসিলে তাহার মনিব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কোথা গিয়াছিলে? সে উত্তর করিল আমি চর্চে গিয়া আমাদের শুভ যাত্রার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলাম। আমি কিন্তু ভুল বুঝিয়াছিলাম। আমার ভৃত্যের চরিত্র নিতান্ত মন্দ নয়। আমি যতদূর দেখিয়াছি সে একজন সচ্চরিত্র ব্যক্তি, দেশীয় ভাষা ভাল জানে—কেহ অধিক দাম চাহিলে তাহার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করিতে পারে আর অলস বেয়ারাকে ধমকান—বিছানা প্রস্তুত করা—ভাত তয়ার করা এসকল কাজে নিপুণ। কিন্তু তার একটী রোগ আছে—সে কথায় কথায় নানা পরামর্শ দিয়া আমাকে জ্বালাতন করে, এর জন্য একদিন দেখিতেছি বিলক্ষণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। তার নাম শুনে আমি না হেসে থাকতে পারি না—তাহার নাম কি জান? পীটর প্রিম।

ভ্রমণের অর্দ্ধেক পথ দিনের আলোতেই পরিভ্রমণ করিলাম, সেই সময়ের মধ্যে যাহা কিছু দেখিলাম তাহা আমার আশানুরূপ কিছুই নহে। এ প্রদেশের কত অল্পভাগ আবাদ, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইংলণ্ডের হাইলণ্ড অপেক্ষা এখানকার লোক সংখ্যা অধিক বোধ হয় না। শুনিতে পাই যে ভারতবর্ষের পল্লীগ্রাম সমুদয় রাস্তা হইতে দূরে দূরে অবস্থিত, আর এখন যে জমী পতিত শুষ্ক মরুভূমি তুল্য দৃষ্ট হইতেছে তাহা বর্ষান্তে ধান্যে আচ্ছাদিত হইবে।"

১৯ এ জুনে তিনি মহীসুরের সীমায় প্রবেশ করিয়া পরদিন প্রাতে বাঙ্গালোরে উপনীত হইলেন ও তথায় প্রধান সেনাপতির আলয়ে তিন দিন অবস্থিতি করিলেন। তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া মহীসুর যাত্রা করেন। মহীসুরের বিবরণ লিখিতে লিখিতে মেকলে একস্থানে শ্রীরঙ্গপট্টনের বর্ণন করিয়াছেন।—

শ্রীরঙ্গপট্টন দেখিবার জন্য আমার

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

অনেকদিন হইতে বড়ই কৌতূহল ছিল। এই সহরটি ভারতবর্ষের অনেকানেক প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনার স্থান। ইহা ভারতের সর্ব্বাগ্রগণ্য রাজার আবাসভূমি। শৈশবকাল হইতে আমি প্রায় প্রতিদিনই ইহার কথা শুনিতাম। শ্রীরঙ্গপট্টন-বিজয়ের একটি চিত্র ক্লাফামের এক দোকানের জালানার উপর অবলম্বিত ছিল, আমার মনে পড়ে আমি বাল্যকালে তাহা অতি কৌতূহলের সহিত দেখিতাম। ঐ স্থান দেখিবার অবসর পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম আর যদিও অনেক আশা করিয়া গিয়াছিলাম সে আশা ভঙ্গ হয় নাই।

সহরটি জনশূন্য প্রতীয়মান হইল, কিন্তু ইহার দুর্গ, ভারতবর্ষের দুর্গ সকলের মধ্যে যাহা প্রখ্যাত, তাহা অক্ষত রহিয়াছে। চেলসীর কাছ দিয়া যে টেম্‌স নদী গিয়াছে, তাহা যতটা প্রশস্ত এখানকার নদীও তদ্রূপ—ইহা দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া প্রাচীর বেষ্টন করিয়াছে। প্রাচীরের ঊর্দ্ধভাগে একটী মসজিদের স্তম্ভদ্বয় দৃষ্টিগোচর হয়। মসজিদটি সুরক্ষিত ও সুরক্ষিত হইবার উপযুক্ত বটে কিন্তু টিপুর প্রাসাদ ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে বন্দিগৃহে ইংরাজ কয়েদিগণ অবরুদ্ধ ছিল তাহার গবাক্ষগুলি আমি অতীব কৌতূহলের সহিত নিরীক্ষণ করিলাম। ও সেই জলদ্বার দেখিলাম যাহা নদীতে গিয়া পড়িয়াছে—যেখানে Duke of Wellington তখন Colonel Wellesley সদ্যঃপাতি টিপুর মৃতদেহ দেখিতে পাইয়াছিলেন যাহার উত্তাপ তখনো যায় নাই। যে স্থানে ইংরাজ সৈন্যগণ সমূহ শঙ্কটের মধ্যে যুদ্ধ করিয়া দুর্গ প্রবেশ করিয়াছিল তাহা এখনো দৃষ্ট হয়। এই নগর ১৫ বৎসর মাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে কিন্তু ইহার মধ্যেই রাজপ্রাসাদ ভগ্নপ্রায় লক্ষিত হইতেছে। ইহার প্রাঙ্গণ বনজঙ্গলে আবৃত। ইহার দরবারশালা যাহা এক সময় এমন নামাঙ্কিত ছিল তাহা এখনো তাহার পূর্ব্ব মহত্ত্বের চিহ্ন কতক প্রকাশ করিতেছে। ইহা অনেক গুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাষ্ঠ স্তম্ভের উপর রক্ষিত, স্তম্ভ সকল কাল পাথরের পায়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বে এই সকল স্তম্ভ সোনার কাজে অনুরঞ্জিত ছিল—এক এক স্থানে এখনো পর্য্যন্ত তাহার চাকচিক্য দেখা যাইতেছে। আর কতিপয় বর্ষের মধ্যে এই প্রকাণ্ড গৃহের চিহ্নমাত্রও বিদ্যমান থাকিবে না। আশ্চর্য্য যে ইংরাজেরা তাহাদের পরাজিত সুলতানের পূর্ব্ব গৌরবের এই স্মৃতিচিহ্ন অধিকতর যত্নের সহিত রক্ষা করে নাই। Lord Wellesley র সাধারণ রীতি এরূপ ছিল না। তাঁহার সুরুচি ও উদারতার চিহ্ন অন্যত্রে প্রত্যক্ষ করিলাম। টিপু তাঁহার পিতার এক সমাধি মন্দির ও সেই সঙ্গে এক মসজিদ নির্ম্মাণ করেন—এই সকল গৃহ গবর্ণমেণ্ট যত্নের সহিত রক্ষা করিতেছেন। দুর্গ হইতে দোধারি ঝাউ ও পুষ্প বৃক্ষ পরিশোভিত এক সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া এই সমাধি মন্দিরে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ইহা অতি সুন্দর ও ইহার সহিত আমাদের দেশের ভালরূপ

খোদিত প্রস্তরের "গথিক চ্যাপেলের" সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। ইহার মধ্যে কবরত্রয় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত কোরাণ মন্ত্রময় অতি চমৎকার চাদরে আচ্ছাদিত। মধ্যে হাইদর—দক্ষিণে টিপুর মাতা—বামে স্বয়ং টিপু শয়ান।

মহীসুর অবস্থানকালে সিংহাসনচ্যুত রাজার সহিত মেকলের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার মুখশ্রী—কথোপকথন—প্রাসাদ—অলঙ্কার—সৈন্য হস্তী—সভাসদ প্রভৃতি তিনি একপত্রে বিস্তারিত বর্ণন করিয়াছেন। ২৪ এ জুন সন্ধ্যার সময় আবার তিনি যাত্রা আরম্ভ করিয়া পরদিন মধ্যাহ্নে নীলগিরি আরোহণ আরম্ভ করেন। পর্ব্বতের উচ্চদেশে আরোহণ করিয়া তিনি এক বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সেখানে ১ ক্রোশ পর্য্যন্ত একটা হনুমান ছাড়া আর কোন জনমানুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। হঠাৎ একটা রাস্তা ফিরিয়া দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে চতুর্দ্দিকে মনোহর হরিতবর্ণ পাহাড় শ্রেণী, মধ্যে একটী সরোবর, তাহার ধারে ধারে লাল খোলার বাটী, তাহার মধ্য হইতে একটী সুন্দর ভজনমন্দির শোভা পাইতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা যে বড় গৃহ তাহা গবর্ণর জেনেরালের বাসগৃহ—প্রস্তরময় প্রশস্ত ও সুন্দর। মেকলে ইহাতে প্রবেশ করিয়া সহসা গবর্ণর জেনেরলের সম্মুখে উপনীত হইলেন। দেখিলেন লাট সাহেব একটা কার্পেট্ বিছান পুস্তকগৃহে অগ্নির ধারে বসিয়া আছেন। মেকলেকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ ও সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। মেকলেও তাঁহার গুণগানে ত্রুটি করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন-যাহা দেখিলাম তাহাতে আমি তাঁহার যতদূর ব্যখ্যা শুনিয়াছি তাঁহাকে তাহার যোগ্যই বোধ হইল—যেন সততা—সরলতা—বদান্যতা মূর্ত্তিমান। Lord William Bentinck এর প্রথম দর্শনে তাঁহার যেরূপ ভাব মনে হইয়াছিল তাঁহার সহিত অনেককাল একত্র সহবাস ও কার্য্যালাপে সেই ভাব আরো দৃঢ়ীভূত হয়। মেকলে তাঁহাকে কত ভাল বাসিতেন ও ভক্তি করিতেন, তাহার আভাস তাঁহার রচনার স্থানে স্থানে পাওয়া যায় ও কলিকাতার Town Hall এর সম্মুখস্থ ময়দানে যে প্রতিমূর্ত্তি বিরাজিত. তাহার পাদপীঠোপরি যে প্রশংসাবাদ লিখিত আছে, তাহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

মেকলে তাঁহার বন্ধু এলিস্‌কে এই সময়ে যে পত্র লেখেন তাহা এই;—

উতকামণ্ড

১ জুলাই ১৮৩৪

উতকামণ্ড কোথায় তাহা জানিবার জন্য ম্যাপ দেখা বৃথা—কোন মানচিত্রে এখনো ইহা স্থান পায় নাই। এ একটা নূতন আবিষ্ক্রিয়া—এখানে ইউরোপীয় লোকেরা স্বাস্থ্যলাভ উদ্দেশে আগমন করে। ইহা সাগর পৃষ্ঠ হইতে ৭০০০ ফুট ঊর্দ্ধে অবস্থিত।

লণ্ডন যখন উননের মত গরম, আমি এই Equator এর ১৩ ডিক্রী উত্তরের ঘরের সব দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া কাষ্ঠাগ্নির উত্তাপ সেবন করিতেছি। আমার

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

শয্যা রাশি রাশি কম্বলে আচ্ছাদিত ও আমার কৃষ্ণকায় ভৃত্যেরা চতুর্দ্দিকে কাশির জ্বালায় অস্থির। তাহাদের মধ্যে একজন শীতে এরূপ জড়সড় হইয়াছে যে আর দিনকতক সূর্য্য দেখা না দিলে আমি আমার এই গৃহে এমন একটী দৃশ্য দেখিতে পাইব যাহা সেক্সপিয়র বলিয়া গিয়াছেন ইংরাজদের চক্ষে অত্যন্ত প্রিয়দর্শন—সে কি না ভারতবাসীর মৃতদেহ। *

মান্দ্রাজ হইতে এই স্থান পর্য্যন্ত শত মাইল আমি মানবপৃষ্ঠেই ভ্রমণ করিলাম। সর্ব্বশুদ্ধ তাহা মন্দ লাগে নাই। মহীসুরের রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে তাঁহার সাজসজ্জা চিত্রশালা দেখাইবার জন্য মহাব্যস্ত। তার মধ্যে ছ সাতটা চিত্র আমাদের দেশের গ্রাম্য পাঠশালায় যে সকল ছবি সচরাচর দৃষ্ট হয় তাহা অপেক্ষা নিতান্ত মন্দ নয়। কিন্তু সকলের সেরা ছবি বলিয়া তিনি আমাকে যাহা দেখাইলেন তাহা Duke of Wellington এর ছবি, ইহা অবশ্য কোন সময়ে ইংলণ্ডের কোন বিপনীমস্তকে শোভা পাইয়াছিল।

* * * * *

আমি এখানে সুখে আছি। গবর্ণর জেনেরলের মত সাদাসিদে ভাল মানুষ আর আমি দেখি নাই। যে সকল প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহার সঙ্গে এখানে আসিয়াছে, তাঁহারা বুদ্ধিমান বটে কিন্তু আমি লণ্ডনে যে সমাজে বিচরণ করিয়াছি, বিদ্যা বুদ্ধিতে ইহারা সে সমাজের লোকদের সমতুল্য নহে। তথাপি আমি যে ভাবিয়াছিলাম এদেশে আমার মনের মত লোক পাইব তাহা মিথ্যা নহে, আর সকলেই বলিতেছে যে কলিকাতায় এবিষয়ে আমার মনোরথ সিদ্ধ হইবার আরো অধিক সম্ভাবনা। যাই বল, লণ্ডনেই হউক আর যে কোন স্থানেই হউক, আত্মসুখের জন্য অন্যের উপর যত কম নির্ভর করিতে হয় ততই ভাল। সমুদ্রের উপর সঙ্গহীন হইয়া আমার আপনাকে আপনি সুখী রাখিবার ক্ষমতা আমি পরীক্ষাতেই জানিতে পারিয়াছিলাম। আমি অপর্য্যাপ্ত অধ্যয়ন করিতাম, কিছুতেই আশ মিটিত না—ইলিয়াড, অডিসি, বরজিল, হরেস, সীজারের টীকা, বেকন—দান্তে—পিত্রার্ক—আরিয়ষ্টো—তাসো ডনকিকসোট—গিবনের রোম—মিলের, ভারতবর্ষ—ভলটেয়রের সমুদয় ৭০ খণ্ড গ্রন্থ, সিসমণ্ডির ফ্রান্স আর ৭ প্রকাণ্ড কাণ্ড বায়োগ্রাফিয়া ব্রিটানিকা ইত্যাদি। আমার গ্রীক লাটিনে এখনো মরিচা ধরে নাই। ইলিয়াড় আগেকার মত তত ভাল লাগিল না—অডিসি আরো বেশী ভাল লাগিল। হরেস পড়িয়া বড়ই আমোদ হইল—বরজিলে তেমন নয়। নরচরিত্র বর্ণনাই বল আর দেবদেবী বর্ণনাই বল—এ দুয়েতেই কেমন তাঁহার রচনা নৈপুণ্যের অভাব বোধ হইল। Virgil এর শেষ ছয় সর্গ যাহা তিনি সম্পূর্ণ সংশোধন করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাহা প্রথম ছয় সর্গ অপেক্ষা ভাল লাগিল, কবি যখন ইতালি প্রদেশে বিচরণ করেন, তখন তাঁহাকে আমার বেস ভাল লাগে। তাঁহার দেশবর্ণনা—তাঁহার জাতীয় অনুরাগ,—কথায় কথায় স্বদেশের গুণগান—তাহার ইতিবৃত্ত পুরাবৃত্তের সমালোচন এই সকল সমধিক প্রশংসনীয়। এই বিষয়ে তিনি অনেক সময়ে Sir Walter Scott কে আমার মনে উদিত করিয়া দিতেন, যদিও তাঁহাদের উভয়ের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য অল্পই।

টাসোর জেরুজলম আমার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল লাগিল। আরিয়ষ্টো খুবই ভাল লাগিল। আর দান্তে কে প্রথমেও যেমন এখনও তেমনি মনে করি অর্থাৎ তিনি মিলটন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি—হোমরের সহিত সমান সমান যান, কেবল সেক্সপিয়র তাঁহাকে ছাড়াইয়া অনেক এগিয়ে গিয়েছেন।

কলিকাতা পৌঁছিয়াই আমি হিরডোটস পড়িতে আরম্ভ করি। তুমি তার অনুবাদ কর না কেন?—তুমি তা বেস করতে পার যে, আর তার ভাল অনুবাদ অনেক আসল রচনার সঙ্গে সমকক্ষ হইতে পারে। আমার ইচ্ছা যে তুমি এ বিষয়টা একবার ভেবে দেখ। এই কাজে প্রত্যহ ১৫ মিনিট ব্যয় করিলে ইহা ৫ বৎসরে নিঃশেষিত হয়। ইহার টীকাগুলি অত্যন্ত কৌতূহলজনক করা যাইতে পারে। তুমি এইক্ষণে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া বিব্রত রহিয়াছ, তোমার যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি, তাহাতে সে সকল শোভা পায় না।

আমি আমার কর্ম্মকাজ আরম্ভ করিয়াছি। প্রমাণ-শাস্ত্র বিষয়ে আমার যে ক্ষুদ্র বই রচিত হইতেছে; তাহা দেখিলে ইংলণ্ডের জজদের চক্ষু স্থির হয়। এতে আমার অনেক পরামর্শ দাতা জুটিয়াছে। একজন মান্দ্রাজী আমাকে আইন শাস্ত্রের উপর একটী প্রস্তাব লিখিয়া পাঠাইয়াছে। এই বুদ্ধিমান লোকটী লেখেন "এ দেশে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার কুরীতি প্রচলিত আছে, মহাশয়ের তাহা অবিদিত নাই। জজ কোন্ কথা বিশ্বাস করিবেন ভাবিয়া উঠিতে পারেন না। মহাশয় যদি লোকদিগকে সত্য সাক্ষ্য দেওয়াইতে পারেন তাহা হইলে মহাশয়ের নাম চিরস্থায়ী হইবে ও কোম্পানি বাহাদুরের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। মানুষকে কেমন করে সত্য সাক্ষ্য দেওয়াইতে হয় তার উপায় আমি জানি—আপনার নাম ও কোম্পানির লাভের জন্য তাহা আমি মহাশয়ের নিকট নিবেদন করিতেছি। যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে মহাশয় তাহার ডান পায়ের বুড় আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিবেন, তাদ্বারা মহাশয়ের কীর্ত্তি প্রসারিত হইবে"—ইহা কি আইনজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা নয়?

এই খানে থামা যাক্। ইংলণ্ডে চিঠি লিখতে গেলে মনে হয় যেন আমার কলম আর থামতে চায় না।

* * * * *

* Tempest Act 2. Sc. 2.
Any strauge beast there makes a man. When they will not give a doit to relieve a lame beggar, they will lay out ten to see a dead Indian.

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

নীলগিরিতে মেকলে জুন ও জুলাই মাস অতিবাহিত করিলেন। তিনি লেখেন—

এখনো পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে আমি মূর্ত্তি পূজার বিশেষ কিছু দেখি নাই। আর যাহা কিছু দেখিয়াছি তাহা যদিও অর্থহীন, কিন্তু তাহার সহিত বীভৎসভাব কিম্বা অশ্লীলতার সংশ্রব নাই। উতকামণ্ডে এরূপ কোন লক্ষণই দৃষ্ট হয় না। এই ছয় সপ্তাহের মধ্যে আমি এমন কিছুই দেখি নাই যাহাতে এদেশকে 'হীদেন' দেশ বলিয়া মনে হইতে পারে। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী নীচের ক্ষেত্র হইতে আসিয়া এখানে বসতি করিয়াছে। ইউরোপীয় পর্য্যটকদের পরিচর্য্যা করাই তাহাদের ব্যবসা। জাতি ও ধর্ম্ম নিয়া তাহাদের বড় গোলযোগ করিতে দেখা যায় না। এই সকল পাহাড়ের আদিমবাসী তোড়া নামক এক অদ্ভুত জাতি আছে। দিনকতক হইল তাহাদের মধ্যে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার এক মহাউৎসব হইয়া গিয়াছে। সে দিন আমার সভার দিন না হইলে আমি তাহা দেখিতে যাইতাম। কিন্তু পরে যাহা শুনিলাম তাহাতে বোধ হয় না যে না যাইবার দরুণে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। প্রেতাত্মার কল্যাণোদ্দেশে বলদ বলিদানেই সেই অনুষ্ঠানের পর্য্যবসান। বলির জন্তুরা ভয়ানক চীৎকার করিতেছিল। যে পর্য্যন্ত না একটা ইঙ্গিত করা হইল সে পর্য্যন্ত লোকেরা দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল ও কথা কহিতেছিল। ইঙ্গিত শুনিবামাত্র স্ত্রীলোকেরা উচ্চৈঃস্বরে রোদন আরম্ভ করিল। আমি এই পৃথিবীতে ৩৩ বৎসর জীবিত থাকিয়া অবশ্য এতটুকু জ্ঞানলাভ করিয়াছি যে বলদেরা আহত হইবার সময় চীৎকার ধ্বনি করে আর স্ত্রীলোকে ইচ্ছা করিলেই চক্ষে জল আনিতে পারে।"

যখন মেকলে নীলগিরিতে বাস করিতেছিলেন তখন বর্ষাকাল। পর্ব্বতের উপর মেঘমালা সঞ্চরণ করিতেছে—বারিধারা অজস্র ঝরিতেছে। তিনি বলেন "আমার সম্মুখে ১০০ হাত দেখিতে পাইতাম এমন সময় অতি বিরল। সমুদয় মাসের মধ্যে আমি দুই ঘণ্টা চলিয়া বেড়াইবার অবকাশ পাই নাই।"

"অবশেষে Lord William এর নিকট হইতে বিদায় লইলাম। পথের মধ্যে আমার বেয়ারাদের ডাক বসান গেল—আমার পালকী প্রস্তুত—পরদিন ছাড়িবার কথা, এমন সময় এমন একটী ঘটনা উপস্থিত হইল যে, তাহা হইতে এদেশীয়দের রীতি নীতি চরিত্র বিষয়ে তোমার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা জন্মিতে পারিবে।*

আমার নূতন চাকর একজন খৃষ্টান কিন্তু তেমনি খৃষ্টান, এদেশের মিসনরিগণ যাদের জন্মদাতা। এখানকার ইংরাজদের কতকগুলি চাকর মিলিয়া তাহার ধর্ম্মের জন্য তাহার উপর ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিল। অবশেষে তাহারা Lord William এর একজন পাচকের ঈর্ষানল প্রজ্জলিত করিয়া তুলিল। তাহার বাস্তবিক কারণ থাকুক বা না থাকুক আমি ঠিক বলিতে পারি না। এদিকে এক চমৎকার নাট্যাভিনয় উপস্থিত—উক্ত পাচক ওথেলোর স্থান অধিকার করিল—তাহার কুৎসিতা কর্কশা পত্নী ডেস্‌ডিমোনা—একজন করনলের ভৃত্য ইয়াগো আর আমার চাকর Cassio; রুমালের বদলে একটা মিছা[illegible] টুকরা আমার বাক্স হইতে ডেস্‌ডিম জঙ্গ হাতে গিয়া পড়িয়াছিল ও [illegible] আরিভহা চুষিতে ধরা পড়িয়াছিলেন। যদি এই অভিনয়ে আমার কিছু সাজিবার থাকে তাহা Roderigo, যাহাকে Shakespeare 'নির্ব্বোধ' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, আর যার থলিতেও পয়সা ছিল অনুমান হয়।

আমার ছাড়িবার পূর্ব্ব দিবসে সন্ধ্যার সময় এক দঙ্গল লোক আসিয়া আমার বাঙ্গলা আক্রমণ করিল। তাহাদের সঙ্গে দেশীয় জজ আসিয়া উপস্থিত। তাহারা যে কি বকাবকি আরম্ভ করিল আমি তাহার একটা কথাও বুঝিতে পারিলাম না। সেই জজ একটু ইংরাজি জানিতেন, আমি তাঁহাকে আমার ঘরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, যে বৃত্তান্তটা কি, তিনি আমাকে সব বুঝাইয়া দিলেন। আমার চাকরের বিরুদ্ধে তাহারা যে অভিযোগ করিয়াছিল তাহার সত্যতার প্রতি এখনো আমি সন্দিগ্ধ। তাহার চরিত্রের উপর যে আমার বড় বিশ্বাস ছিল তাহা নহে, আর যাহারা তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা পাইতেছিল, তাহাদিগকে সত্যবাদী বলিয়াও আমার বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু তখন আমার ভৃত্যটিকে হারানো আমার পক্ষে এত অসুবিধাজনক যে কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করিয়া তাহাদের মামলার আপসে নিষ্পত্তি করিয়া দিতে আমি সম্মত হইলাম। সামান্যতঃ দেখিতে গেলে ইহা বড় কষ্টসাধ্য ছিল না, কেন না এদেশের ছোট লোকেরা এ সকল বিষয়ে বড় কিছু মনে করে না। স্বামী যিনি, তিনি কতক টাকা পাইলে খুসী হইয়া চলিয়া যাইতেন কিন্তু আমার ভৃত্যের নির্যাতনকারী দল আসিয়া মধ্যস্থ হইল—তাহাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে তাহার অপরাধের বিচার হয়—তাহার মুখে চুন কালি পড়ে—সে উত্তম মধ্যম কশাঘাত পায়—তাহার সম্মুখে তাহারা ঢাক বাজাইয়া নৃত্য করিতে পারে—গাধার পৃষ্ঠে পুচ্ছমুখীন চড়াইয়া তাহাকে সহরময় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতে পারে।

আপসে মিটমাট হইবার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া আমি জজকে তৎক্ষণাৎ এই মকদ্দমার বিচার করিতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু লোকেরা তাহাতেও বাধা দিতে লাগিল—এর বিচারটা শীঘ্র নিষ্পত্তি না হয় এই তাহাদের মর্ম্মান্তিক বাসনা। আমি তাহাদের কত বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম—বলিলাম কল্যই আমার যাত্রার দিবস নির্দ্ধারিত হইয়াছে, আমার ভৃত্য দোষীই হউক নির্দ্দোষীই হউক, আমার সঙ্গে যাইতে না পাইলে তাহার কর্ম্মটী যায়। আমি যত

* ইংরাজেরা আমাদের দেশের লোকের রীতি চরিত্র বিষয়ে এইরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করেন!!

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

ভদ্রতার সহিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতে যাই, তাহারা ততই অবাধ্য হইয়া উঠে। তাহারা কিছুতেই বুঝিবে না। বলিতে কি, বলবান কর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত হওয়া তাহাদের এমন অভ্যাস যে বিনয়কে তাহারা দুর্ব্বলতার চিহ্ন জ্ঞান করে। জজ বলিলেন আর কোন সাহেবকে তিনি ছোট লোকদের সহিত এরূপ ভদ্র ব্যবহার করিতে দেখেন নাই। কিন্তু আর আমি ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিলাম না, তাহাদের ভয়ানক বিদ্বেষ ও নির্লজ্জ অন্যায়াচরণ দর্শনে আমার গা জ্বলিয়া গেল। আমি বসিয়া তথাকার সেনাপতিকে সন্ধ্যার মধ্যেই যাহাতে এই মকদ্দমার বিচার হয় তাহার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া এক পত্র লিখিলাম। তাহাই হইল। কোর্ট বসিল ও সমস্ত রাত্রিই এই মকদ্দমার গোল চলিতে লাগিল। অবশেষে জজের রায়ে আমার ভৃত্য নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইল। আমি তখন জানিতাম না, পরে শুনিলাম যে এই সুযোগ্য বিচারপতি এই মামলা উপলক্ষে ২০ টাকা ঘুস খাইয়াছিলেন।

ডেস্‌ডিমোনার স্বামী গত কল্য যে টাকা লইতে অস্বীকার করিয়াছিল, এক্ষণে তাহা সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু এখন আমি তাহাকে এক পয়সা দিতেও সম্মত হইলাম না। যে সকল দুরাত্মা এই গোলযোগ বাধাইয়াছিল তাহাদের রাগের আর সীমা রহিল না। আমার ভৃত্য পরদিন ১১টার সময় ছাড়িবে ও আমি তাহার পশ্চাতে দুটোর সময় ছাড়িব এই ধার্য্য হইল। আমি চাহিয়া দেখি, না কতকগুলি লোক তাহাকে তাহার পালকীর মধ্য হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছে—তাহার পাগড়ী ছিড়িয়া ফেলিয়াছে—তাহাকে প্রায় বিবস্ত্র করিয়া ফেলিয়াছে—ও বোধ হইল যেন তাহারা তাহাকে ছিড়িয়া কাটিয়া খাইতে উদ্যত। আমি একটা লাঠি হাতে তাহাদের মধ্যে দৌড়িয়া গিয়া পড়িলাম। তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার আর অন্য কোন উপায় ছিল না ও আমার মনে হইল অ; শুধু তাহার নয়, আমারো জীবন সংসম্মুখে আমি গরীব বেচারীকে কষ্টসৃষ্টে ধাময় অতি ম—তাহার স্বদেশীয়দের ন্যায় সেও নিতান্ত ভীরু স্বভাব, দেখিলাম সে মূর্চ্ছাপ্রায় হইয়াছে। একজন সেনা নাপিত যে আমার ক্ষৌর কর্ম্ম করিত, সে দৌড়িয়া কতকগুলি পুলিসের লোক ডাকিয়া আনিল। আমি আমার বেয়ারাদের বলিলাম ফের্, এখনি আমাকে সেনাপতির বাড়ীতে নিয়ে চল্। সেখানে আমার অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় নাই। যখন করনল সাহেব জজ আর কৌন্সলের সাহেব বাদী, তখন বিচারে কালবিলম্ব হইবার কোন কথাই নাই। আমি তিন কথায় আমার যাহা বক্তব্য তাহা বলিলাম। তিন মিনিটের মধ্যে বিদ্রোহীগণ বন্দীশালায় প্রেরিত হইল আর আমার ভৃত্য একজন সিপাই সঙ্গে করিয়া রাস্তায় গিয়া নিরাপদে উত্তীর্ণ হইল।"

পরদিন প্রত্যুষে মেকলে পাহাড় হইতে নামিতে লাগিলেন।

"প্রায় একঘণ্টাকাল নীচে নামিয়া আমরা মেঘ ও কুয়াসা হইতে মুক্ত হইলাম—আমাদের সম্মুখে মহীসুরের ক্ষেত্র, যেন হরিত পল্লবের সমুদ্র—তাহার উপর সূর্য্য মহা গৌরবে প্রকাশ পাইতেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হওয়া আমার স্বভাব নয়, আমিও কিন্তু এসময়ে আনন্দাশ্রু বিসর্জন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পালকীর মধ্য হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পদব্রজে চলিতে লাগিলাম। দুই ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ৩০০০ ফীট নামা গেল। প্রত্যেক পথ পরিবর্ত্তনে নিম্নস্থিত অসীম জঙ্গলের নূতন নূতন ভাগ দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইল। এই বিস্তীর্ণ জঙ্গল, স্বভাবজনিত — পৃথিবীর সঙ্গে যাহার সমান বয়স, তাহার সহিত আমাদের দেশের ভাল ভাল কৃত্রিম উদ্যানের সাদৃশ্য দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম। পাহাড়ের উপত্যকায় অবতরণ করিয়া আমরা এমন শোভাময় কাননের মধ্য দিয়া চলিলাম যে তাহা ঈডন কাননের একভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এত বড় বড় বৃক্ষ আমি কখন দেখি নাই। এমন কত শত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাদপ দেখিলাম যাহার ক্ষুদ্রতম বৃক্ষও আমাদের দেশের প্রকাণ্ড ওকের সহিত তুলনা হইতে পারে। তৃণ ও বনফুল সকল আমার মাথার সঙ্গে সমান উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে, সূর্য্যের সঙ্গে এতদিন আমার দেখা সাক্ষাৎ নাই, এখন উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইতেছে। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আবার আমি পালকী হইতে নামিয়া ফিরিয়া দেখিলাম যে আমরা যে পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি তাহা আমার ১০ ক্রোশ পিছনে পড়িয়া আছে, এখনো সেই মেঘ বৃষ্টি কুয়াসায় পূর্ণ—যাহার মধ্যে আমি এতদিন বাস করিতেছিলাম।

"১৬ই মঙ্গলবার মান্দ্রাজে জাহাজে চড়িলাম। কলিকাতায় যাইবার পথে আমি পোর্টুগীস ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলাম আর যতটা আবশ্যক বোধ করি তাহা এক প্রকার শিখিয়াও লইলাম। লুসিয়াড পড়িলাম ও আবার আর একবার পাঠ করিতেছি। কামোয়েন্‌সকে আমার যত ভাল কবি বলিয়া মনে ছিল, তাহা বোধ হইল না। কিন্তু এই সকল বিষয়ে প্রথমেই আমার যেরূপ মন্তব্য দাঁড়ায় তাহা এতবার ভ্রমাত্মক দেখিয়াছি যে এখনো আমার আশা হয় যে এত বিচক্ষণ লোকে যাহা ভাল বলিয়াছে আমিও তাহাদের মতের সহিত মিলিতে পারিব। বিদেশীয় ভাষায় যে কোন বিখ্যাত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি তাহার প্রথম পাঠে কখনই আমি আশানুরূপ উৎকর্ষ গ্রহণ করিতে পারি নাই। কেবল দান্তের কাব্য ও ডন কিক্সোট ঐ নিয়মের বহির্ভূত—তাহাদের প্রথমে পড়িয়াই আমার আশাতীত উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইয়াছিল।"

তাঁহার পোর্টুগীস অধ্যায়নের বড় সময় রহিল না, এক সপ্তাহের মধ্যেই জাহাজ গঙ্গাসাগরে আসিয়া পড়িল। তিনি কলিকাতায় লাট সাহেবের বাটীতে উত্তীর্ণ হইয়া তথায় ছয় সপ্তাহ কাল বাস করিলেন।

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

সেখানে তাঁহার ভগিনী সুখস্বচ্ছন্দে রহিয়াছেন দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। নবেম্বর মাসে তাঁহারা পৃথক বাড়ী করিয়া জাঁকজমকে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বাটী কলিকাতার সকল বাটীর মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত, এইক্ষণে তাহা Bengal Clubএ পরিণত হইয়াছে।

পিত্রার্কা ও লরা।

এ কথা বোধ হয় বলাই বাহুল্য যে দান্তের মত পিত্রার্কাও একজন প্রখ্যাতনামা ইতালীয় কবি ছিলেন। দান্তে যেমন তাঁহার মহাকাব্যের মহান ভাব দ্বারা সমস্ত ইউরোপমণ্ডল উত্তেজিত করিয়াছিলেন, পিত্রার্কাও তেমনি তাঁহার সুললিত গীতি ও গাথা দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু দান্তে ও পিত্রার্কে আবার অনেক বিষয়ে এমন সৌসাদৃশ্য ছিল যে সকল বিষয় উল্লেখ করিতে হইলে আমাদের এই প্রবন্ধটী অতি দীর্ঘকায় হইয়া পড়ে, সেই জন্য কেবল তাঁহাদের প্রণয়ের কথাই বর্ণনা করিতেছি।

দান্তের যেমন বিয়াত্রীচে, পিত্রার্কার তেমনি লরা। দান্তের ন্যায় তাঁহার লরাও অপ্রাপ্য, অনধিগম্য, দান্তের ন্যায় তিনিও দূর হইতে লরাকে দেখিয়াই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। পিত্রার্কারও লরার সহিত তেমন ভাল করিয়া কথা বার্ত্তা, আলাপ পরিচয় হয় নাই। লরার ভবনে পিত্রার্কা কখনও যাইতে পান নাই, লরার নিকট হইতে তাঁহার প্রেমের কিছুমাত্র প্রত্যুপহার পান নাই। পিত্রার্কা কহিয়াছেন, লরা সঙ্গীত ও কবিতার প্রতি উদাসীন। তাঁহার সমক্ষে তাহার মুখশ্রী সর্ব্বদাই দৃঢ় ভাব প্রকাশ করিত। পিত্রার্কা তাঁহার অসংখ্য চিঠির মধ্যে একবার ভিন্ন কখনো লরার নামোল্লেখ করেন নাই, বোধ হয়, বন্ধুবর্গের প্রতি সাধারণ চিঠিপত্রে লরার নাম ব্যবহার করিতে তিনি কেমন সঙ্কোচ বোধ করিতেন, বোধ হয় মনে করিতেন তাহাতে সে নামের গৌরব হানি হইবে। লরার যৌবনের অবসান, লরার মৃত্যু, তাঁহার প্রতি লরার ঔদাসীন্য কিছুই তাঁহার মহান্ প্রেমকে বিচলিত করিতে পারে নাই। বরঞ্চ লরার মৃত্যু তাঁহার প্রেমকে নূতন বল অর্পণ করে, কেননা এ পৃথিবীতে লরার সহিত তাঁহার সম্পর্ক অতি দূর ছিল, লরার প্রেম তাঁহার অপ্রাপ্য ও তাঁহার প্রেম লরার অগ্রাহ্য ছিল, কিন্তু লরা যখন দেহের সহিত সমাজ বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তখন পিত্রার্কা অসঙ্কোচে লরার আত্মার চরণে তাঁহার প্রেম উপহার দিতেন ও লরা তাহা অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতেছেন কল্পনা করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। পিত্রার্কা কহিতেছেন—

যে রাত্রে লরা এই পৃথিবীর দুঃখ যন্ত্রণা চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিলেন, তাহার পররাত্রে তিনি স্বর্গ হইতে এই শিশিরে (শিশিরাক্ত পৃথিবীতে) নামিয়া আসিলেন, তাঁহার অনুরক্ত প্রেমিকের নিকট আবিভূ ত হইলেন ও হাত বাড়াইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—'সেই স্ত্রীলোক, যাহাকে দেখিয়া অবধি তোমার তরুণহৃদয় জন-কোলাহল হইতে বিভিন্ন পথে গিয়াছে, তাহাকে চেন'! যখন আমার অশ্রুজল তাঁহার বিয়োগ-দুঃখ সূচনা করিল, তখন তিনি কহিলেন, 'যতদিন তুমি পৃথিবীর দাস হইয়া থাকিবে, ততদিন কিছুতেই সু[illegible] হইতে পারিবে না। পবিত্রহৃদয়েরা জা[illegible], মৃত্যু, অন্ধকার-কারাগার হইতে মুক্তি। যদি আমার আনন্দের এক সহস্রাংশও তুমি জানিতে, তবে আমার মৃত্যুতে তুমি সুখ অনুভব করিতে!' এই বলিয়া তিনি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বর্গের দিকে নেত্র ফিরাইলেন। তিনি নীরব হইলে আমি কহিলাম, 'ঘাতকদিগের দ্বারা প্রযুক্ত যন্ত্রণা ও বার্দ্ধক্যের ভার কি সময়ে সময়ে মৃত্যু-যন্ত্রণাকে তীব্রতর করে না?' তিনি কহিলেন "স্বীকার করি, যন্ত্রণা ও সম্মুখস্থ অনন্তকালের আশঙ্কা মৃত্যুর পূর্ব্বে অনুভব করা যায়, কিন্তু যদি আমরা ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করি, তবে প্রাণত্যাগ নিশ্বাসের ন্যায় অতি সহজ হয়! আমার বিকশিত যৌবনের সময় যখন তুমি আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসিতে, তখন জীবনের প্রতি আমার অত্যন্ত মায়া ছিল, কিন্তু যখন আমি ইহা[illegible]ার দৃশ্য পরিত্যাগ করিলাম, তখন নির্ব্বাসন হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার আমোদ অনুভব করিতে লাগিলাম। তখন তোমার প্রতি দয়া ভিন্ন অন্য কষ্ট পাই নাই!' আমি বলিয়া উঠিলাম 'সেই সত্যপ্রিয়তা যাহা তুমি পূর্ব্বে জানিতে এবং সর্ব্বান্তর্যামীর নিকট থাকিয়া এখন যাহা অধিকতর জান, সেই সত্য-প্রিয়তার নামে জিজ্ঞাসা করিতেছি, বল, আমার প্রতি সেই দয়া কি প্রেমের দ্বারাই উত্তেজিত হয় নাই?' আমার এই কথা শেষ না হইতে হইতেই দেখিলাম, সেই স্বর্গীয় হাস্য, যাহা চিরকাল আমার দুঃখের উপর শান্তি বর্ষণ করিয়া আসিয়াছে, সেই হাস্যে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—তিনি নিশ্বাস ফেলিলেন ও কহিলেন "চিরকাল তুমি আমার প্রেম পাইয়া আসিয়াছ ও চিরকালই তাহা পাইবে। কিন্তু তোমার প্রেম সংযত করিয়া রাখা আমার উচিত মনে করিতাম!' মাতা যখন তাহার পুত্রকে ভর্ৎসনা করেন, তখন যেমন তাঁহার ভালবাসা প্রকাশ পায় এমন আর কখনো নয়। কতবার আমি মনে মনে করিয়াছি—উনি উন্মত্ত অনলে দগ্ধ হইতেছেন, অতএব উহাঁকে আমার হৃদয়ের কথা কখনো বলিব না! হায়, যখন আমরা ভালবাসি অথচ শঙ্কায় ত্রস্ত থাকি, তখন এ সব চেষ্টা কি নিষ্ফল! কিন্তু আমাদের সম্ভ্রম বজায় রাখিবার ও ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট না হইবার এই একমাত্র উপায় ছিল। কতবার আমি রাগের ভান করিয়াছি, কিন্তু তখন হয়ত আমার হৃদয়ে প্রেম যুঝিতে-

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

ছিল! যখন দেখিতাম তুমি বিষাদের ভরে নত হইয়া পড়িতেছ, তখন হয়ত তোমার প্রতি সান্ত্বনার দৃষ্টি বর্ষণ করিতাম, হয়ত কথা কহিতাম! দুঃখ এবং ভয়েই নিশ্চয় আমার স্বর পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল, তুমি হয়ত তাহা দেখিয়াছ! যখন তুমি রোষে অভিভূত হইয়াছ তখন হয়ত আমি আমার একটী দৃঢ়-দৃষ্টির দ্বারা তোমাকে শাসন করিতাম! এই সকল কৌশল, এই সকল উপায়ই আমি অবলম্বন করিয়াছিলাম। এইরূপে কখনো অনুগ্রহ, কখনো দৃঢ়তার দ্বারা তোমাকে কখনো সুখী কখনো বা অসুখী করিয়াছি, যদিও তাহাতে শ্রান্ত হইয়াছিলে, কিন্তু এইরূপে তোমাকে সমুদয় বিপদের বাহিরে লইয়া গিয়াছিলাম, এইরূপে আমাদের উভয়কেই পতন হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলাম—এবং এই কথা মনে করিয়া আমি অধিকতর সুখ উপভোগ করি!' যখন তিনি কহিতে লাগিলেন, আমার নেত্র হইতে অশ্রু পড়িতে লাগিল—আমি কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর দিলাম—যদি আমি তাঁহার কথা স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক বিশ্বাস করিতে পারি, তবে আমি আপনাকে যথার্থ পুরস্কৃত জ্ঞান করি!—আমাকে বাধা দিয়া তিনি কহিলেন, বলিতে বলিতে তাঁহার মুখ আরক্তিম হইয়া আসিল 'হা—অবিশ্বাসী, সংশয় করিতেছ কেন? যদিও আমার হৃদয়ে যেমন ভালবাসা ছিল আমার নয়নে তেমন প্রকাশ পাইত কি না, সে কথা আমার রসনা কখনই ব্যক্ত করিবে না, কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি—তোমার ভালবাসায়, বিশেষতঃ তুমি আমার নামকে যে অমরত্ব দিয়াছ তাহাতে যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম এমন আর কিছুতে না। আমার এই একমাত্র ইচ্ছা ছিল তোমার অতিরিক্ততা কিছু শমিত হয়। আমার কাছে তোমার হৃদয়ের গোপন-কাহিনী খুলিতে গিয়া তাহা সমস্ত পৃথিবীর নিকট খুলিয়াছ এই কারণেই তোমার উপরে আমার বাহ্য-ঔদাসীন জন্মে। তুমি যতই দয়ার নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে ভিক্ষা করিয়াছ,আমি ততই লজ্জা ও ভয়ে নীরব হইয়া গিয়াছি। তোমার সহিত আমার এই প্রভেদ ছিল—তুমি প্রকাশ করিয়াছিলে, আমি গোপন করিয়াছিলাম—কিন্তু প্রকাশে যন্ত্রণা যে বর্দ্ধিত হয় ও গোপনে তাহা হ্রাস হয় এমন নহে।' তাঁহার অনুরক্ত তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার সহিত যুক্ত হইবার আর কত বিলম্ব আছে? লরা এই বলিয়া চলিয়া গেলেন, 'যতদূর আমি জানি তাহাতে তুমি আমার বিয়োগ সহিয়া অনেক দিন পৃথিবীতে থাকিবে।" পিত্রার্কা লরার মৃত্যুর পর ছাব্বিশ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন।

এইরূপে পিত্রার্কা লরার দৃঢ়তা, তাঁহার প্রতি উদাসীনতার মধ্য হইতেও তাঁহার আপনার ইচ্ছার অনুকূল অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি সহজেই মনে করিতে পারেন যে, লরার তাঁহার প্রতিই এত বিশেষ উদাসীনতার কারণ কি, তিনি ত তাহার বিরক্তি-জনক কোন কাজ করেন নাই। অবশ্যই লরা তাঁহাকে ভাল বাসে। এই মীমাংসা অনেকে বুঝিতে না পারুন,

কিন্তু ইহার মধ্যে অনেকটা সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। লরা যদি তাঁহাকে ভাল না বাসিত, তবে অন্য লোকের সহিত যেরূপ মুক্তভাবে কথা বার্ত্তা করিত, তাঁহার সহিতও সেইরূপ করিত; একথটার মধ্যে অনেকটা হৃদয়-তত্ত্বজ্ঞতা আছে, কিন্তু ইহা যে ঠিক সত্য, তাহা বলা যায় না, লরা যে তাঁহাকে ভাল বাসিত, তাহার কোন প্রমাণ নাই। পিত্রার্কা যেরূপ প্রকাশ্যভাবে কবিতা দ্বারা তাঁহার প্রণয়িনীর আরাধনা করিতেন, তাহাতে লরা তাঁহার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইয়া বিবেচনার কাজ করিয়াছিল—পিত্রার্কার সহিত সামান্য কথোপকথনেও তাহার উপর লোকের সন্দিগ্ধ-চক্ষু পড়িত, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ লরার স্বামী অতিশয় সন্দিগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে লরা অতিশয় সুগৃহিণী ছিল বলিয়াইত স্থির হইয়াছে। যদি সত্য সত্যই লরা মনে মনে পিত্রার্কাকে ভাল বাসিতেন, তবে আমরা লরার একটী মহান্ মূর্ত্তি দেখিতে পাই—ভাল বাসিয়াছেন অথচ প্রকাশ করেন নাই—পিত্রার্কার প্রেমে কিছুমাত্র উৎসাহ দেন নাই—বরং তাঁহার প্রেমের স্রোত ফিরাইতেই চেষ্টা করিয়াছিলেন—প্রেম তাঁহাকে তাঁহার কর্ত্তব্য পথ হইতে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারেন নাই, বরং বোধ হয় তাঁহাকে কর্ত্তব্য পথে অধিকতর নিয়োজিত করিয়াছিল।

জন কোলাহল হইতে দূরে থাকিবার জন্য পিত্রার্কা ভোক্লুসের উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই উপত্যকার দৃশ্য অতিশয় সুন্দর। এখানকার মোহিনী বিজনতার মধ্যে থাকিয়া, পিত্রার্কার হৃদয় হইতে যে প্রথম কবিতা উৎসারিত হয় তাহা লরার উদ্দেশে প্রেম-গীতি। প্রকৃতির প্রতিসৌন্দর্য্যের মধ্যে তিনি যেন লরার সত্বা অনুভব করিতেন।

প্রতি উচ্চ-শাখা ময় সরল কানন,
প্রতি স্নিগ্ধ ছায়া মোর ভ্রমণের স্থান;
শৈলে শৈলে তাঁর সেই পবিত্র-আনন
দেখিবারে পায় মোর মানস-নয়ন।
সহসা ভাবনা হ'তে উঠি যবে জাগি,
প্রেমে মগ্ন মন মোর বলেগো আমায়
'কোথায় ভ্রমিছ ওগো, ভ্রমিছ কি লাগি?
কোথা হোতে আসিয়াছ, এসেছ
কোথায়?"
হৃদে মোর এই সব চঞ্চল-স্বপন
ক্রমে ক্রমে স্থির চিন্তা করে আনয়ন,
আপনারে একেবারে যাই যেন ভুলি
দহেগো আমারে শুধু তারি চিন্তাগুলি।
মনে হয় প্রিয়া যেন আসিয়াছে কাছে
সে ভুলে উজলি উঠে নয়ন আমার,
চারিদিকে লরা যেন দাঁড়াইয়া আছে
এ স্বপ্ন না ভাঙ্গে যদি কি চাহিগো আর?
দেখি যেন (কেবা তাহা করিবে বিশ্বাস?)
বিমল সলিল কিম্বা হরিত কানন
অথবা তুষার-শুভ্র উষার আকাশ
তাঁহারি জীবন্ত-ছবি করিছে বহন!

* * * *

দুর্গম-সংসারে যত করিগো ভ্রমণ,
ঘোরতর মরু মাঝে যতদূর যাই,

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

কল্পনা ততই তার মূরতি মোহন
দিশে দিশে আঁকে যেন দেখিবারে পাই।
অবশেষে আসে ধীরে সত্য সুকঠোর
ভাঙ্গি দেয় যৌবনের সুখস্বপ্ন মোর!
কখনো বা সেই মনোহর শৈলের প্রতি
নির্ঝর তটিনী বৃক্ষলতায়, তিনি তাঁহার
বিষণ্ণ-মর্ম্মের নিরাশা সঙ্গীত গাহিয়া গাহিয়া বেড়াইতেন—
বিমল বাহিনী ওগো তরুণ-তটিনী!
উজ্জ্বল-তরঙ্গে তব, প্রেয়সী আমার—
ভক্ত হৃদয়ের মম একমাত্র দেবী
সৌন্দর্য্য তাঁহার যত ক'রেছেন দান!
শুনগো পাদপ, তুমি, তব দেহ পরে
ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন সে দেবী,
নত হ'য়ে প'ড়েছিল ফুল পত্রগুলি
বসনের তলে; বক্ষ সুবিমল তার
পরশিয়াছিলে তব সুধা আলিঙ্গনে!
তুমি বায়ু সেইখানে বহিতেছ সদা
যেই খানে প্রেম আসি দেখাইলা মোরে
প্রিয়ার নয়নে শোভে ভাণ্ডার তাহার!
শুনগো তোমরা সবে আর একবার
এই ভগ্ন-হৃদয়ের শেষ দুঃখ গান!

অবশ্য ফলিবে যদি ভাগ্যের লিখন!
অবশ্যই অবশেষে প্রেম যদি মোর
অশ্রুময় আঁখিদ্বয় করেগো মুদিত,
ভ্রমিবে যখন আত্মা স্বদেশ আকাশে
তখন দেখোগো যেন এই প্রিয়-স্থানে
অভাগার শেষ-চিহ্ন হয়গো নিহিত!
মরণের কঠোরতা হবে কত হ্রাস,
যদি এই প্রিয় আশা, সেই ভয়ানক
অনন্তের পথ করে পুষ্প-বিকীরিত!
এই কাননের মত সুশীতল ছায়া
কোথা আছে পৃথিবীতে, শ্রান্ত আত্মা যেথা
এক মুহূর্ত্তের তরে করিবে বিশ্রাম!
নাহিক এমন শান্ত হরিত-কবর
যেখানে সংসার-শ্রমে পরিশ্রান্ত-দেহ
ঘুমাইবে পৃথিবীর দুখ শোক ভুলি!

বোধ হয় একদিন সে মোর প্রেয়সী
স্বর্গীয়-সুন্দরী সেই নিষ্ঠুর-দয়ালু—
একদিন এইখানে আসিবে কি ভাবি,
যেই খানে একদিন মুগ্ধ নেত্র মোর
উজ্জ্বল সে নেত্র পরে রহিত চাহিয়া!
হয়ত নয়ন তাঁর আপনা আপনি
খুঁজিয়া খুঁজিয়া মোরে চারিদিক পানে
আমার কবর সেই পাইবে দেখিতে!
হয়ত শিহরি তার উঠিবে অন্তর,
হয়ত একটি তার বিষাদ-নিশ্বাস
জাগাইবে মোর পরে স্বর্গের করুণা!

* * * *

এখনো সে মনে পড়ে—যবে পুষ্প-বন
বসন্তের সমীরণে হইয়া বিনত
সুরভি কুসুম রাশি করিত বর্ষণ,
তখন রক্তিম-মেঘে হইয়া আবৃত
বসিতেন প্রকৃতির উপহার মাঝে।
কভুবা বসনে তাঁর কভুবা কুন্তলে
প্রকৃতি কুসুম-গুচ্ছ দিত সাজাইয়া।
চারিদিকে তাঁর, কভু তটিনী-সলিলে,—
কভুবা তৃণের পরে পড়িত ঝরিয়া
পুষ্প বন হ'তে কত পুষ্প রাশি রাশি!

চারিদিকে তরু লতা কহিত মর্ম্মরি
"প্রেম হেথা করিয়াছে সাম্রাজ্য বিস্তার!"
পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পিত্রার্কার মনে মনে বিশ্বাস ছিল, বা এক একবার বিশ্বাস হইত যে লরা তাঁহাকে ভালবাসে। অনেক কবিতাতেই তাঁহার এই বিশ্বাস প্রকাশ পাইত। অনুরাগের নেত্র অনুরাগের কাহিনী যেমন পড়িতে পারে, যুক্তিকে তাহার নিকট অনেক সময় পরাস্ত মানিতে হয়। লরার দৃঢ়-দৃষ্টির মধ্যে হয়ত পিত্রার্কা গুপ্তপ্রেমের আভা দেখিতে পাইয়াছিলেন, যুক্তি এখন তাহা অনুধাবন করিতে পারিতেছে না, হয়ত তখনো পারিত না। এক সময়ে পিত্রার্কা যখন দূর-দেশে ভ্রমণ করিবার জন্য যাইতেছিলেন, তখন লরাকে দেখিয়া তিনি কহিতেছেন—
সুকোমল ম্লান ভাব কপোলে তাঁহার
ঢাকিল সে হাসি তাঁর, ক্ষুদ্র মেঘ যথা!
প্রেম হেন উথলিল হৃদয়ে আমার
আঁখি কৈল প্রাণপণ কহিবারে কথা!
তখন জানিনু আমি স্বরগ-আলয়ে
কি করিয়া কথা হয় আত্মায় আত্মায়;
উজলি উঠিল তাঁর দয়া দিকচয়ে
আমি ছাড়া আর কেহ দেখেনিগো তায়!

* * * *

সবিষাদে অবনত নয়ন তাঁহার
নীরবে আমারে যেন কহিল সে এসে,
"কে গো হায় বিশ্বাসী এ বন্ধুরে আমার
লইয়া যেতেছে ডাকি এত দূর-দেশে?"
শীতের পত্রহীন তরুশাখায় বসিয়া সন্ধ্যাকালে বিহঙ্গম বিষণ্ণ-সঙ্গীত গাহিতেছিল, কবির হৃদয়ের স্বরে তাহার স্বর মিলিয়া গেল, তিনি গাহিয়া উঠিলেন—
হারে হতভাগ্য বিহঙ্গম সঙ্গীহীন!
সুখ-ঋতু অবসানে গাহিছিস্ গীত!
ফুরাইছে গ্রীষ্ম ঋতু ফুরাইছে দিন
আসিছে রজনী ঘোর আসিতেছে শীত!
ওরে বিহঙ্গম, তুই দুখ-গান গাস্
যদি জানিতিস্ কি যে দহিছে এ প্রাণ
তা হ'লে এ বক্ষে আসি করিতিস্ বাস,
এর সাথে মিশাতিস্ বিষাদের গান!
কিন্তু হা—জানি না তোর কিসের বিষাদ,
ভ্রমিস্‌রে যার লাগি গাহিয়া গাহিয়া,
হয়ত সে বেঁচে আছে বিহঙ্গিনী প্রিয়া,
কিন্তু মৃত্যু এ কপালে সাধিয়াছে বাদ!
সুখ দুঃখ চিন্তা আশা যা' কিছু অতীত,
তাই নিয়ে আমি শুধু গাহিতেছি গীত!
যখন তাঁহার লরার বর্ত্তমানে প্রকৃতির মুখশ্রী আরো উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিত, তখন তিনি গাহিতেন—
কি সৌন্দর্য্য-স্রোত হোথা পড়িছে ঝরিয়া!
স্বর্গ দিতেছেন ঢালি কি আলোক-রাশি!

* * * *

চরণে হরিত-তৃণ উঠে অঙ্কুরিয়া
শত বর্ণ-ময় ফুল উঠিছে বিকাশি!
হর্ষময় ভক্তি ভরে সায়াহ্ন-বিমান
সমুদয় দীপ তার ক'রেছে জ্বলিত,
প্রচারিতে দিশে দিশে তার যশোগান
পাইয়া যাহার শোভা হোয়েছে শোভিত!
আবার কখনো বা সন্ধ্যাকালে একাকী বিজনে বসিয়া ভগ্নহৃদয়ে নিরাশার গীতি গাহিতেছেন।—

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

স্তব্ধ সন্ধ্যাকালে যবে পশ্চিম আকাশে
রবি অস্তাচল-গামী প'ড়েছে ঢলিয়া,
বৃদ্ধ যাত্রী কোন এক অজ্ঞাত প্রবাসে,
শ্রান্ত-পদক্ষেপে একা যেতেছ চলিয়া!
তবু যবে ফুরাইয়া যাবে শ্রম তার,
তখন গভীর ঘুমে মজিয়া বিজনে
ভুলে যাবে দিবসের বিষাদের ভার,
যত ক্লেশ সহিয়াছে সুদূর-ভ্রমণে!
কিন্তু হায় প্রভাতের কিরণের সনে
যে জ্বালা জাগিয়া উঠে হৃদয়ে আমার,
রবি যবে ঢলি পড়ে পশ্চিম গগনে,
দ্বিগুণ সে জ্বালা হৃদি করে ছার খার!

প্রজ্বলন্ত রথচক্র নিম্ন পানে যবে
লয়ে যান সূর্য্যদেব, অসহায় ভবে
রাখি রাত্রি-কোলে, যার দীর্ঘীকৃত ছায়া
প্রত্যেক গিরি শিখর সমুন্নত-কায়া
উপত্যকা পরে দেয় বিস্তারিত করি;
তখন কৃষক হল ল'য়ে স্কন্ধোপরি,
ধরি কোন গ্রাম্যগীত অশিক্ষিত স্বরে,
চিন্তা ঢালি দেয় তার বন্য-বায়ু পরে!

* * * *

চিরকাল সুখে তারা করুক্ যাপন!
আমার আঁধার দিনে হর্ষের কিরণ
এক তিল অভাগারে দেয়নি আরাম,
এক মুহূর্ত্তের তরে দেয়নি বিরাম;
যে গ্রহ উঠিয়া কেন উজলে বিমান
আমার যে দশা তাহা রহিল সমান!

দগ্ধ হোয়ে মর্ম্মভেদী মর্ম্ম-যন্ত্রণায়
এ বিলাপ করিতেছি, দেখিতেছি হায়—
অতি ধীর পদক্ষেপে স্বাধীনতা সুখে
হল-যুগ-মুক্ত বৃষ ধায় গৃহ-মুখে!
আমি কি হবনা মুক্ত এ বিষাদ হ'তে,
সদাই ভাষিবে আঁখি অশ্রু-জল-স্রোতে!
তার সেই মুখপানে চাহিল যখন
কি খুঁজিতেছিল মোর নয়ন তখন?
এক দৃষ্টে চাহিনু স্বর্গীয় মুখপানে
সৌন্দর্য্য অমনি তার বসি গেল প্রাণে
কিছুতে সে মুছিবে না যত দিনে আসি
মৃত্যু এই জীর্ণ-দেহ না ফেলে বিনাশি!

এই বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করি, যে, পিত্রার্কা তাঁহার সমসাময়িক লোকদিগের নিকট হইতে যেমন আদর পাইয়াছিলেন, এমন বোধ হয়, আর কোন কবি পান নাই। এক দিনেই তিনি প্যারিস্ ও রোম হইতে লরেল-মুকুট গ্রহণ করিবার জন্য আহূত হন। তিনি নানা দেশে ভ্রমণ করেন, এবং যে দেশে গিয়াছিলেন সেই খানেই তিনি সমাদৃত হইয়াছিলেন। নৃপতিরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিতেন। তিনি যে রাজসভায় বাস করিতেন, কখনো তাঁহাকে অধীনভাবে বাস করিতে হয় নাই, তিনি যেন রাজ-পরিবার মধ্যে ভুক্ত হইয়া থাকিতেন। লরার নামকে তিনি অমরত্ব প্রদান করিলেন বলিয়া তিনি মনে মনে যে সন্তোষময় গর্ব্ব অনুভব করিতেন, তাঁহার সে গর্ব্ব সার্থক হইল। পাঁচশত বৎসরের কালস্রোত পৃথিবীর স্মৃতি পট হইতে লরার নাম মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। তাঁহার নামের সহিতই চিরকাল লরার নাম যুক্ত হইয়া থাকিবে; পিত্রার্কাকে স্মরণ করিলেই লরাকে মনে পড়িবে, লরাকে স্মরণ করিলেই পিত্রার্কাকে মনে পড়িবে।

গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার আবির্ভাব কাল।

ইতি-পূর্ব্বে আমরা প্রাচীন ভারতের শিল্প সংগ্রহ করিয়া পাঠকবর্গের নয়নাগ্রে উদিত করিতেছিলাম, প্রতিবন্ধকবশতঃ মধ্যে তাহা স্থগিত হইয়াছিল, পুনরায় তাহা ধরা গেল।

পূর্ব্বকালের লোকেরা যেরূপে কাল নির্ণয় করিত, তাহার কিয়দংশ মাত্র ব্যক্ত করা হইয়াছিল, পরন্তু যাহাতে শিল্প-সংযোগ আছে তাহার কিছুই ব্যক্ত করা হয় নাই, এক্ষণে তাহাই বক্তব্য।

কাল-জ্ঞানের নিমিত্ত যখন নাড়ীর গতি শ্বাস প্রশ্বাস, বর্ণোচ্চারণ ও সূর্য্যের ছায়া প্রভৃতি অবলম্বিত হইত, সহজেই বুঝা যায় যে তখন পর্য্যন্তও কোন প্রকার কালজ্ঞানোপযোগী যন্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই। এই বীজভূত কালের অব্যবহিত পরেই বিবিধ যন্ত্রের সৃষ্টি হয়। যে কিছু কালজ্ঞান-সাধন-শিল্প সমস্তই গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যামূলক। সুতরাং গণিত জ্যোতির্বিদ্যা এদেশের কত পুরাতন তাহা নির্ণয় করিয়া পশ্চাৎ তদুৎপন্ন শিল্পগুলির বর্ণন করিব।

গণিত ও জ্যোতির্জ্ঞানশাস্ত্র যে এদেশের কত পুরাতন তাহা নিঃসন্দিগ্ধ নির্ণয় করা সুকঠিন। 'বেলি' নামক ফরাশীস্ দেশীয় একজন জ্যোতিবেত্তা ব্যক্ত করিয়াছেন যে "৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুদিগের যে সকল জ্যোতিগ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল তাহা অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়।" কেসিনি প্লেফেয়ার প্রভৃতি ইউরোপীয় সুবিখ্যাত পণ্ডিতদিগকেও বেলির এই মতের পোষকতা করিতে দেখা যায়। যিনি ভরতখণ্ডীয় শাস্ত্রেরই আধুনিকত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত কোন উপায় অবশিষ্ট রাখেন নাই, সেই বেণ্টিলি সাহেবও নিজ শেষ রচিত গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন যে "প্রায় ৩২৯০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুরা চন্দ্রের সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ভোগ নিরূপণ করিয়াছিলেন।" অজ্ঞান বশতঃ বা বুদ্ধি-পক্ষাঘাত বশতঃ অন্যে স্বীকার করুন আর নাই করুন, আমরা দেখিতে পাই যে, পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্ব প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থেও গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার বীজ নিহিত আছে। গণিত-বিদ্যার মূল সূত্র স্বরূপ অঙ্ক ও অঙ্কস্থাপন বিধি সর্ব্বাগ্রে আর্য্য জাতির হৃদয় হইতে আবির্ভূত হইয়াছিল, ইহা শুক্ল যজুর্ব্বেদের সপ্তদশ অধ্যায়ের একটী নিগদ-বাক্যের দ্বারা নির্ণয় হয়। যথা—

"একা চ দশ চ দশ চ শতঞ্চ শতঞ্চ

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

সহস্রঞ্চ সহস্রঞ্চাযুতঞ্চাযুতঞ্চ নিযুতঞ্চ নিযুতঞ্চ প্রযুতঞ্চার্ব্বুদঞ্চ ন্যর্ব্বুদঞ্চ সমুদ্রশ্চ মধ্যঞ্চান্তশ্চ পরার্দ্ধঞ্চ।"

তৎকালে গণিতবিদ্যার সূত্রপাত না থাকিলে যজুর্ব্বেদ কোন ক্রমেই এরূপ সংখ্যা ও সংখ্যাস্থাপনের পরিচায়ক বাক্য ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইতেন না।

এখন সকল দেশেই গ্রহণ গণনা হইতেছে, কিন্তু ইহার প্রসূতি এই ভারতবর্ষ। ঋগ্বেদের ৪র্থ অষ্টকের ২য় অধ্যায়ের ১২ বর্গের একটী ঋকে লিখিত আছে যে, অত্রি-গোত্রীয় ঋষিরাই সর্ব্বাগ্রে সূর্য্যগ্রহণ গণনার মূল আবিষ্কার করেন, তৎপূর্ব্বে আর কেহ তাহা জানিত না। যথা—

"যং বৈ সূর্য্যম্ স্বর্ভানুস্তমসাবিধ্যদাসুরঃ।
অত্রয়স্তমন্ববিন্দন্ নহ্যন্যে অশক্নুবন্॥"

[আসুরোঽসুরকুলজঃ স্বর্ভানুঃ রাহুঃ যং সূর্য্যং তমসা নিজচ্ছায়য়া অবিধৎ বিদ্ধমকরোৎ তং তথাবিধং সূর্য্যং অত্রয়োঽত্রিগোত্রজা ঋষয়োঽন্ববিন্দন্ প্রাপ্তবন্তঃ। সূর্য্যমণ্ডলবেধবিষয়কং তত্ত্বজ্ঞানং প্রাপ্তবন্ত ইত্যর্থঃ। নহি অন্যে জনা অশক্নুবন্ সূর্য্যমণ্ডলবেধকারণং যাথাতথ্যেনাবাগন্তুং শক্তা নাঽভুবন্ ইত্যর্থঃ।]

এইরূপ, ঋগ্বেদের প্রথমাষ্টকের ২য় অধ্যায়ে তাৎকালিক ঋষিগণের মলমাস পরিচয় পাওয়া যায়, যে মলমাস গণণা লইয়া ইউরোপে কত হুলস্থুল ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। যথা—

"বেদ মাসো ধৃতো ব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ
বেদায় উপজায়তে।"

[ধৃতব্রতঃ বরুণদেবঃ প্রজাবতঃ কালস্য সর্ব্বাধায়ত্বাৎ প্রজাঃ সন্তি এষু তান্ দ্বাদশ মধু মাধবাদিভিশ্চৈত্র বৈশাখাদিভির্বা-নামভিঃ প্রসিদ্ধান্ মাসঃ মাসান্ বেদ জানাতি। তথা উপজায়তে দ্বাদশমাসানা মন্যত মস্য কস্যচিৎ উপ সমীপে জায়তে প্রাদুর্ভবতি। বেদ জানাতি তমপি ইতি শেষঃ।]

এই মলমাস বিষয়ক জ্ঞানটী অল্প জ্যোতির্জ্ঞতার কার্য্য নহে। মলমাস কি? তাহা এস্থলে বুঝাইয়া দিতেছি, দেখুন, ঋগ্বেদের সময়ে লোকের কি পর্য্যন্ত গণিত বিদ্যার জ্ঞান ছিল।

"যস্মিন্মাসে ন সংক্রান্তিঃ সংক্রান্তিদ্বয়মেবব
মলমাসঃ সবিজ্ঞেয়ো মাসঃ স্যাত্তু ত্রয়োদশঃ।"

[বৈদিক-কাঠকগৃহ্য]

একচন্দ্রভোগ্য মাসের মধ্যে যদি সংক্রান্তি অর্থাৎ সূর্য্যসংক্রম না হয়, অথবা আদ্যন্তে দুইবার সংক্রম হয়, তাহা হইলে সেই চন্দ্রের মাসটি মলমাস, ইহা দ্বাদশের অতিরিক্ত ত্রয়োদশ মাস বলিয়া গণ্য।

এইরূপ কৃষ্ণযজুঃ সংহিতাতে "মধুর্মাধবঃ শুক্রঃ শুচির্নভা নভস্য" ইত্যাদি ক্রমে ১২টী সূর্য্যভোগ্য সৌর মাসের নির্ণয় আছে। এই সকল দেখিলে কাহার না প্রতীতি হইবে যে পুরাতন ঋষিদিগেরও গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় জ্ঞান ছিল? তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, তৎকালের কোন বিদ্যারই উত্তম পাটী, সুশৃঙ্খলা, ও বিস্তীর্ণতা ছিল না। ক্রমে কাল যত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ততই পল্লবিত হইয়াছে। বিশেষরূপে

মনোনিবেশ পূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিলে প্রতীত হয় যে অন্যান্য দেশ যখন অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন, ভারতবর্ষ তখন সমধিক প্রোজ্জ্বল বিদ্যালোকে পরিপূর্ণ। পুরাতন গ্রীস্ রাজ্যে যখন এই শাস্ত্রের আলোচনার কোন প্রসঙ্গই ছিল না, এদেশে তখন ইহার বিশেষ উন্নতি।

দুই শত বৎসরাধিক হয় নাই ইউরোপে যে শাস্ত্রের আলোচনারম্ভ হইয়াছে, ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা তাহা দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিলেন। কথিত আছে যে, রোমরাজ্য পতনের পরেও ইউরোপ অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন ছিল। অনন্তর আরব দেশ হইতে তথায় শাস্ত্র সকল সংগৃহীত হইলে ক্রমে তাহা তদ্দেশীয়দিগের বুদ্ধি গোচরে আইসে। ইউরোপ যেমন আরবের শিষ্য, আরবও তেমনি ভারতবর্ষের শিষ্য। আরব যে ভারতবর্ষের ছাত্র তাহা তাহাদিগকে নিজমুখে স্বীকার করিতে দেখা যায়। ভারতবর্ষের পণ্ডিতগণের নিকট হইতে আরববাসীদিগের উপদেশ গ্রহণ করিবার বিবরণ অনেক আরবী গ্রন্থে সুস্পষ্ট উল্লিখিত আছে। আর ভাষায় রচিত "আয়নুল্ অম্বা ফিতব কাতুল্ অম্বা" নামক গ্রন্থে এই অঙ্গীকার বিশেষরূপে ব্যক্ত আছে। এই গ্রন্থ ন্যূনাধিক ৬৫০ বৎসরের পূর্ব্বের রচিত। ইহাতে লিখিত আছে যে, ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা আরবের অন্তঃপাতী বোগ্দাদের রাজ সভাতে গমন পূর্ব্বক জ্যোতিষ ও চিকিৎসাদি বিবিধ বিদ্যার উপদেশ শ্রবণ করাইতেন। কঙ্ক নামক একজন ভারতীয় পণ্ডিত ৬৯৪ শকে অলমন্‌সুর বাদশাহের সভাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইনি ঔষধ ও রোগ নিরূপণ বিষয়ে অতি সুপণ্ডিত এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তৎকালে ইহার সঙ্গে যে সকল পুস্তক ছিল, তন্মধ্যে এক পুস্তক "বিহৎসিন্দহিন্দ" নামে খ্যাত ছিল।

এই "বিহৎসিন্দহিন্দ" পুস্তকখানি কি? অনেকে অনুমান করেন যে উহা সংস্কৃত "ব্রহ্মসিদ্ধান্ত"। আবার কেহ বলেন, উহা বরাহমিহির কৃত "বৃহৎসংহিতা"।

উক্ত আরবী গ্রন্থে আরও লিখিত আছে যে তথায় ভারতবর্ষ হইতে আর একজন পণ্ডিত গমন করেন, তাঁহার নাম 'বাখর'। আমাদের বিবেচনা হয়, ইনিই আমাদের আচার্য্য ভাস্কর। কেননা পূর্ব্বোক্ত আরবী গ্রন্থ অনুসারে তদীয় গ্রন্থ সকল প্রায় ১১৫০ শকে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, এবং ইহার সহিত ভাস্করাচার্য্যের বর্ত্তমানকালের বিরোধ হয় না। ভাস্কর স্বয়ং তাঁহার গোলাধ্যায় পুস্তকে লিখিয়াছেন যে তাঁহার "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" গ্রন্থ ১০৭২ শকে সমাপ্ত হয়। যথা—

"রসগুণপূর্ণমহীসম শক-নৃপসময়েঽভবন্মমোৎপত্তিঃ।
রসগুণবর্ষেণ ময়া সিদ্ধান্ত শিরোমণী রচিতঃ"॥

অর্থাৎ শক-রাজার ১০৩৬ বৎসরে আমার জন্ম হয়, আমার ৩৬ বৎসর বয়সে মৎপ্রণীত এই সিদ্ধান্ত শিরোমণি রচনা করিলাম।

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

ভাস্করাচার্য্যের "করণ-কুতুহল" নামে আর এক গ্রন্থ ছিল, তাহা ১১০৫ শকে সমাপ্ত হয়। অতএব উক্ত বাখর যে ভাস্করাচার্য্য তাহা অসম্ভাবিত নহে।

"আয়নুল অম্বা" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, ৭০৭।৮ শকে "হারূন্‌অল্‌রশীদ" নামক বাদশাহের একবার উৎকট পীড়া হয়, কোন প্রকারে প্রতীকার না হওয়াতে তিনি ভারতবর্ষ হইতে "মঙ্ক" নামক এক-জন সুবিখ্যাত চিকিৎসককে লইয়া যান এবং তাঁহারই চিকিৎসায় তিনি রোগ মুক্ত হন। এই মঙ্ক আরবদেশে থাকিয়া মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত বলিয়া সম্মান প্রাপ্ত হন এবং আরবী ও পারসিক ভাষাতে অ-নেক সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া দেন।

এই মঙ্ক যে কে, তাহা এখন অনুমান করা দুঃসাধ্য। এতদ্ভিন্ন অনেক জ্যোতি-র্ব্বেত্তা ও চিকিৎসা-বিশারদ ব্যক্তিরা আর-বের রাজসভায় গমনাগমন করিয়াছিলেন। ইহাঁদেরও বিবরণ উক্ত গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণিত আছে। ইহাঁদের সঙ্গে যে সকল বৈদ্য গ্রন্থ ছিল, উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সেই সকল পুস্তকের মধ্যে এক গ্রন্থের নাম "সরক," অপর দুই গ্রন্থের নাম "সশ্রদ্" ও "যিদান"। 'সরিক' বা 'সরক' এত-দ্দেশীয় 'চরক' আর 'সশ্রদ্' ও 'যিদান' 'সুশ্রুত' ও "নিদান" হইবার সম্ভাবনা। পরন্তু মাধব করের নিদান না হইয়া অন্য কাহার নিদান হইতে পারে।

প্রায় ১১১৯ শকের একজন আরবী গ্রন্থকর্ত্তা 'তারা খুল হোকমা' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, হিন্দুদিগের তিন প্রকার জ্যোতিষ, তন্মধ্যে কেবল সিন্দহিন্দ জ্যো-তিষ আরবদেশীয়রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আরও লেখেন যে, আরবীয়েরা 'বিয়াফর' নামক এক সঙ্গীত গ্রন্থ ও 'কলিল্ দমন' নামক এক নীতি গ্রন্থ ভারতবর্ষ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থানুসারে বিয়া-ফরের অর্থ বিদ্যাফল, আর কলিল দমন্ বা দনম্, যাহা ইউরোপে বিদপাই ও পিল-পাই নামে খ্যাত আছে তাহা অতি পুরা-তন পঞ্চ-তন্ত্র হইতে সংগৃহীত বলিয়া প্রতীত হয়। কেননা, উভয় গ্রন্থের ঐক্য দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে তাহার প্রথমা-ধ্যায়ে করটক ও দমনক নামক দুই শৃগা-লের গল্প আছে। এই দুই শব্দ বিকৃত হইয়া কলিল দমন্ হইয়া থাকিবেক।

এদেশীয়দিগের নিকট আরবীয়দিগের বিদ্যাশিক্ষার বৃত্তান্ত যে কেবল আরবীগ্রন্থে পাওয়া যায় এমত নহে। প্রাচীন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ দেখা যায়। মহাত্মা আর্য্যভট্ট সংস্কৃত দশ গীতিকা নামক গণিত গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন যে 'আমি ম্লেচ্ছ ছাত্রগণের সুখ বোধের নিমিত্ত স্বতন্ত্র গণিত গ্রন্থ রচনা করিয়াছি, এক্ষণে অভিজ্ঞদিগের নিমিত্ত ইহা করিতেছি।' *

'তারিখুল্ হোকমা' গ্রন্থে আরও লি-খিত আছে যে, ভারতবর্ষ হইতে যে এক গণিত গ্রন্থ পাওয়া যায় তাহা অল্‌খুবা রেজ্‌মি' নামক একজন আরবী গ্রন্থকর্ত্তা

* 'ম্লেচ্ছাস্তেবাসি বোধায়' ইত্যাদি আর্য্য-গীতির প্রারম্ভে দেখ।

আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়া স্বদেশীয় দিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। আরবীগ্রন্থ-কর্ত্তৃগণ প্রায় একবাক্যে স্বীকার করেন যে উক্ত অলখুব রেজমি, অল্‌মান মুনের রাজ্যকালে ও তাহারাও পূর্ব্বে অন্যূন ৭৩৫ শকে জীবিত ছিলেন, তিনি বহুতর আরবী-দিগকে হিন্দু গণিত বিদ্যায় শিক্ষা দিয়া-ছিলেন, এবং ইনিই সর্ব্বাগ্রে বীজগণিত প্রচার করেন।

এই সকল দেখিয়া স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, আরবীয়েরা গ্রীশদিগের অপেক্ষাও সর্ব্বা-গ্রে ভারতবর্ষ হইতে গণিত শাস্ত্র প্রাপ্ত হয়, কারণ, খবারেজ্‌মীর অনেককাল পরে আ-বুল্‌ফা অন্‌বুজ্জানী নামক পণ্ডিত, যিনি প্রায় ৮০৫২ শকে গণিত বিদ্যাধ্যয়ন আরম্ভ ক-রেন, তিনি ডায়াফেলটেস্ নামক গ্রীক্ গণিত-বেত্তার গ্রন্থ আরবীভাষায় আনীত করিয়া আরবীয়দিগকে গ্রীশীয় গণিত শিক্ষা দেন, এবং আরবীয়েরা আলমান্‌সুরের রাজ্য-কালে প্রায় ৬৯৪ শকে হিন্দুদিগের নিকট হইতে জ্যোতিষশাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করেন। ইহাঁর রাজত্বের পর, কতিপয় রাজার রাজ্যাবসানে, যখন হারূন্ অলর-শীদ্ তদ্দেশে রাজা হন, তখনও তদ্দে-শীয়েরা প্রথমতঃ গ্রীকদেশীয় জ্যোতিবিদ্যা-উপদেশ গ্রহণ করেন এবং তখনই আল্-মেজিষ্ট নামক গ্রীক্ ভাষার গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদিত হয়।

অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, গণিত বিদ্যার বীজগণিত অংশটিই এদে-শের অতি আদিম। এই দেশেই সর্ব্বপ্রথমে বীজগণিত শাস্ত্রের উন্নতি হয়। গ্রীকদে-শীয় যত বীজগণিত আছে, তন্মধ্যে ডায়ো-ফেণ্টেসের গ্রন্থ সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। ডা-য়োফেণ্টস্ রোম-সম্রাট জুলিয়ানের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। আর এ দেশীয় বীজ-গণিত যত আছে, তন্মধ্যে আর্য্যভট্টের গ্রন্থই সর্ব্বাধিক প্রাচীন। এই আর্য্যভট্ট * ব্রহ্মগুপ্তাদি অপেক্ষা বহুল পুরাতন। ইহার জীবন কাল গ্রীকদেশীয় ডায়াফেণ্টেসের জীবন হইতে অল্প দূরবর্ত্তী নহে। ভাবিয়া দেখ যে, অন্যূন ১৫০০ শত বৎসরের আর্য্য-ভট্ট, আর ডায়োফেণ্টস, এই দুই ব্যক্তির

* আরবদেশীয় পুরাতন গ্রন্থকারগণ ক-হেন যে, ৬৯৪।৫ শকে খলিফঅল্ মানসুরের অধিকার কালে তত্রস্থ পণ্ডিতেরা তিনপ্রকার হিন্দু জ্যোতিষের সমাচার প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। তন্মধ্যে এক প্রকার জ্যোতিষ শিক্ষা করেন, অপর দুই প্রকারের নাম মাত্র শুনিয়াছিলেন। তাহার একপ্রকার অর্যবহর বা আর্যভর। এই অর্যভর অব-শ্যই আর্য্যভট্ট। প্রধান পুরাতন জ্যো-তির্বেত্তা ব্রহ্মগুপ্ত ৫৫০ শকে এবং বরাহ-মিহির ৪২৭ শকে জীবিত ছিলেন। ইহা-দের পূর্ব্বকালিক বিষ্ণুচন্দ্র, ত্রাসেন, দুর্গ-সিংহ। ইহাঁরা সকলেই স্ব স্ব গ্রন্থে আর্য্য-ভট্টের নাম ও বচন উল্লেখ করায় সপ্রমাণ হই-তেছে যে আর্য্যভট্ট ১৪০০ চতুর্দ্দশ শত বৎ-সরেরও পূর্ব্বের লোক। ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি শালিবাহন রাজার শক গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু আর্য্য তাহার নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। তিনি যৌধিষ্টিরাব্দ বলিয়াই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে অনুমান হয় যে বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে অথবা শালি-বাহন শক প্রচারের পূর্ব্বে আর্য্যভট্ট।

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

মধ্যে কি পরিমাণ কাল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই উভয় ব্যক্তির গ্রন্থ তুলনা করিলে প্রতীত হয় যে, ডায়োফেণ্টেসের সময়ে গ্রীক্‌দেশে কেবল গণিতবিদ্যার সূত্রপাত মাত্র হইয়াছিল। আর আর্য্যভট্টের সময়ে এদেশে উহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহাঁর সময়ে যে সকল কঠিন কঠিন সমীক্রিয়া ও কুট্টক গণিত এবং অন্যান্য বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয় তাহা ডায়োফেল্‌টসের মনেও উদিত হয় নাই। ২০০ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল বীজগণিত বিষয়ক সিদ্ধান্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের অবিদিত ছিল, এবং ইউলর নামক বিখ্যাত ফরাসিস্ পণ্ডিত, যিনি ১০০ বৎসর পূর্ণ হয় নাই পরলোক গত হইয়াছেন, তিনি যে কুট্টক প্রশ্নের সিদ্ধান্ত বহু আয়াসে করিয়া গিয়াছেন এবং তিনি যে সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিতে অক্ষম হইলে ১৬৮৮ শকে লেগ্রেঞ্জ নামক পণ্ডিত অতিকষ্টে তাহার সিদ্ধান্ত করেন, এইরূপ অপরাপর কঠিন প্রশ্ন, যাহা ১০০ বৎসর, বা ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপস্থ পণ্ডিতেরা গণনা করিয়াছেন, আমাদের পুরাতন আর্য্যভট্ট সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর করিয়া গিয়াছেন। ১২০০ বৎসর পূর্ব্বের ব্রহ্মগুপ্ত, আর ৭৫০ বৎসরের ভাস্করাচার্য্য তত্তাবতের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আর্য্যভট্টের সময়ে যখন গণিতবিদ্যায় এতাদৃশ উন্নতি ছিল, তখন অবশ্য তাঁহার অনেক পূর্ব্ব হইতেও উহার আংশিক চর্চ্চা চলিয়া আসিয়াছিল সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষে যে বহু পূর্ব্বে গণিত-বিদ্যার প্রচার ছিল, সংস্কৃত কাব্য ইতিহাসাদি গ্রন্থেও তাহার ঈঙ্গিত পাওয়া যায়। নলোদয় কাব্যের ৪র্থ উচ্ছ্বাসে, রাজা ঋতুপর্ণের গণনা বিদ্যার প্রভাব দেখিয়া নলরাজা বিস্ময়াপন্ন হন। এই আখ্যায়িকা মহাভারত হইতে গৃহীত। রাজা ঋতুপর্ণ একটী বৃক্ষের তাবৎ ফলপত্রাদি গণনা করিয়াছিলেন, প্রচ্ছন্ন সারথি নল তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। মহাভারতেও ঠিক এইরূপ ভঙ্গীর লিপি। নলোদয়ের টীকাকার জ্ঞানকর মিশ্র অক্ষবিদ্যাকে গণনার এক সামান্য অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'যতোহয়ংরাজা ফলগণনাদক্ষ, অতঃপাশ গণনা সোবিদোঽপি স্যাৎ" এই রাজা যখন ফল গণনায় নিপুণ, তখন অবশ্য ইনি অক্ষগণনায়েও নিপুণ।

প্রাচীনকালের অক্ষক্রীড়ায় বোধহয় কোন বিশেষ প্রকারের গণনার প্রয়োজন হইত, সেই জন্যই গণনাবিশারদেরাই অক্ষনিপুণ হইতে পারিতেন। যুধিষ্ঠির পাশক্রীড়ায় রাজ্য হারাইয়া অবশেষে মহর্ষি বৃহদশ্বের নিকট অক্ষবিদ্যা শিক্ষা করেন। গণিত সম্বন্ধ না থাকিলে সামান্য পাশা খেলার উপর এরূপ লিখনভঙ্গী আসিতে পারে না। ঋতুপর্ণ রাজা যে বৃক্ষের ফল পত্র গণনা করিয়াছিলেন, তাহাতে নিশ্চিত কোন প্রকার অঙ্কবিদ্যার সাহায্য ছিল।

সম্প্রতি যশোদানন্দন সরকার আর্য্যভট্টের দশ গীতির গণিতাংশ ইংরাজী অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কুতূহলপরতন্ত্র পাঠকবৃন্দ তাহা দেখিলে লিখিত

বৃত্তান্ত সমূলক কি অমূলক বুঝিতে পারিবেন। যাহা হয় না বলিয়া লোকের এখনও বিশ্বাস আছে, সে সমস্তই তাহাতে দেখিতে পাইবেন।

১ অবধি ৯ পর্য্যন্ত অঙ্কমূর্ত্তি "একং দশ শতঞ্চৈব সহস্রমযুতং তথা।" ইত্যাদি দশ গুণোত্তর গণিত সংখ্যা সর্ব্বাগ্রে ভারতবর্ষেই সৃষ্ট হয়, ইহা লিওনার্ডের গ্রন্থেও এসিয়াটিক্ রিসর্চ্চ গ্রন্থে স্বীকৃত হইয়াছে।

প্রসঙ্গ ক্রমে আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে এ সকল বিস্তৃত হও, প্রকৃত প্রস্তাব অর্থাৎ ভারতীয় কাল-জ্ঞান-সাধন শিল্পের প্রতি মনোযোগ কর। বহু শত বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে কাল নির্ণয়ের নিমিত্ত যে সকল যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল, আগামী পত্রিকায় তাহা ব্যক্ত করিব। ৭৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বাখর্ বা ভাস্করাচার্য্যের বচন ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রমাণ দিব। প্রমাণগুলি ও যন্ত্রগুলি যে বহু পুরাতন, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্তই এই স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিত হইল।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

লীলা।

(গাথা)

"সাধিনু—কাঁদিনু—কতনা করিনু—
ধন মান যশ সকলি ধরিনু—
চরণের তলে তার—
এত করি তবু পেলেম না মন
ক্ষুদ্র এক বালিকার!
না যদি পেলেম—নাইবা পাইনু—
চাইনা চাইয়া তারে!
কি ছার সে বালা!—তার তরে যদি
সহে তিল দুখ এ পুরুষ-হৃদি,
তা হলে পাষাণো ফেলিবে শোণিত
ফুলের কাঁটার ধারে!
এ কুমতি কেন হোয়েছিল বিধি,
তারে সঁপিবারে গিয়াছিনু হৃদি!
এ নয়ন-জল ফেলিতে হইল
তাহার চরণ-তলে?

বিষাদের শ্বাস ফেলিনু, মজিয়া
তাহার কুহক বলে?
এত আঁখিজল হইল বিফল,
বালিকা হৃদয়, করিব যে জয়
নাই হেন মোর গুণ?
হীন রণধীরে ভালবাসে বালা;
তার গলে দিবে পরিণয় মালা!
একি লাজ নিদারুণ!
হেন অপমান নারিব সহিতে,
ঈর্ষ্যার অনল নারিব বহিতে,
ঈর্ষ্যা?—কারে ঈর্ষ্যা? হীন রণধীরে?
ঈর্ষ্যার ভাজন সেও হল কিরে
ঈর্ষা যোগ্য সেও কি মোর?
তবে শুন আজি—শ্মশান-কালিকা
শুন এ প্রতিজ্ঞা ঘোর!

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

আজ হোতে মোর রণধীর অরি—
শত নৃকপাল তার রক্তে ভরি
করাবো তোমারে পান,
এ বিবাহ কভু দিবনা ঘটিতে
এ দেহে রহিতে প্রাণ!
তবে নমি তোমা—শ্মশান-কালিকা!
শোণিত-লুলিতা—কপাল মালিকা!
কর এই বর দান—
তাহারি শোণিতে মিটায় গো তৃষা
যেন মোর এ কৃপাণ!"
কহিতে কহিতে বিজন-নিশীথে
শুনিল বিজয় সুদূর হইতে
শত শত অট্ট হাসি—
একেবারে যেন উঠিল ধ্বনিয়া
শ্মশান-শান্তিরে নাশি!
শত শত শিবা উঠিল কাঁদিয়া
কি জানি কিসের লাগি!
কুস্বপ্ন দেখিয়া শ্মশান যেন রে
চমকি উঠিল জাগি!
শতেক আলেয়া উঠিল জ্বলিয়া—
আঁধার হাসিল দশন মেলিয়া,
আবার যাইল মিশি!
সহসা থামিল অট্ট হাসি ধ্বনি
শিবার রোদন থামিল অমনি
আবার ভীষণ সুগভীর তর
নীরব হইল নিশি!
দেবীর সন্তোষ বুঝিয়া বিজয়
নমিল চরণে তাঁর।
মুখ নিদারুণ—আঁখি রোষারুণ—
হৃদয়ে জ্বলিছে রোষের আগুন
করে অসি খর ধার!

গিরি-অধিপতি রণধীর সাথে
লীলার বিবাহ হবে,
হরষে রোয়েছে আমোদে মাতিয়া
গিরিবাসীগণ সবে।
অস্তে গেল রবি পশ্চিম শিখরে,
আইল গোধূলী কাল,
ধীরে ধরণীরে ফেলিল আবরি
ক্রমশঃ আঁধার জাল।
ওই আসিতেছে লীলার শিবিকা
নৃপতি-ভবন পানে
শত অনুচর চলিয়াছে সাথে
মাতিয়া হরষ গানে।
জ্বলিছে আলোক—বাজিছে বাজনা
ধ্বনিতেছে দশ দিশি।
ক্রমশঃ আঁধার হইল নিবিড়
গভীর হইল নিশি।
চলেছে শিবিকা গিরিপথ দিয়া
সাবধানে অতিশয়,
বন মাঝ দিয়া গিয়াছে সে পথ
বড় সে সুগম নয়।
অনুচরগণ হরষে মাতিয়া
গাইছে হরষ গীত—
সে হরষধ্বনি—জন কোলাহল
ধ্বনিতেছে চারিভিত।
থামিল শিবিকা, অনুচরগণ
সহসা সভয় গণি
সহসা সকলে "দস্যু দস্যু" বলি
করি কোলাহলধ্বনি।
শত বীর-হৃদি উঠিল নাচিয়া
বাহিরিল শত অসি,
শত শত শর মিটাইল তৃষা
বীরের হৃদয়ে পশি।

আধার ক্রমশঃ নিবিড় হইল
বাধিল বিষম রণ
লীলার শিবিকা কাড়িয়া লইয়া
পলাইল দস্যুগণ।
* * * * *
কারাগার মাঝে বসিয়া রমণী
বরষিছে আখি জল।
বাহির হইতে উঠিছে গগনে
সমরের কোলাহল।
"হে মা ভগবতী—শুন এ মিনতি
রাখ এ মিনতি মোর!
দুখিনীর আর কেহ নাই মাগো
তারো এ বিপদে ঘোর!
যদি সতী হই, মনে মনে যদি
তাঁহারি চরণ সেবি—
পতি বোলে যারে করেছি বরণ
বাঁচাও তাঁহারে দেবি!
মোর তরে দেবি এ শোণিত-পাত!
আমি মা—অবোধ বালা,
জনমিয়া আমি মরিনু না কেন
ঘুচিত সকল জ্বালা!
মোর তরে তিনি হারাবেন প্রাণ?
না-না মা রাখ একথা—
ছেলবেলা হোতে অনেক সহেছি—
আর মা দিওনা ব্যথা!"
কহিতে কহিতে উঠিল আকাশে
দ্বিগুণ সমর-ধ্বনি—
জয় জয় রব, আহতের স্বর
কৃপাণের ঝনঝনি!
সাঁজের জলদে ডুবে গেল রবি,
আকাশে উঠিল তারা;

একেলা বসিয়া বালিকা সে লীলা
কাঁদিয়া হোতেছে সারা!
সহসা খুলিল কারাগার দ্বার—
বালিকা সভয় অতি,—
নিদারুণ হাসি হাসিতে হাসিতে
বিজয় পশিল তথি।
অসি হোতে ঝরে শোণিতের ফোটা,
শোণিতে মাখানো বাস,
শোণিতে মাখানো মুখের মাঝারে
স্ফুরে নিদারুণ হাস!
অবাক্ বালিকা;—বিজয় তখন
কহিল গভীর রবে—
"সমর-বারতা শুনেছ কুমারী?
সে কথা শুনিবে তবে?"
"বুঝেছি—বুঝেছি-জেনেছি—জেনেছি!
বলিতে হবেনা আর,—
না—না, বল বল—শুনিব সকলি
যাহা আছে বলিবার।
এই বাঁধিলাম পাষাণে হৃদয়,
বল কি বলিতে আছে!
যত ভয়ানক হোক্‌না সে কথা
লুকায়োনা মোর কাছে!"
"শুন তবে বলি" কহিল বিজয়
তুলি অসি খর ধার—
"এই অসি দিয়ে বধি রণধীরে
হরেছি ধরার ভার!"
"পামর-নিদয়—পাষাণ-পিশাচ!"
মূরছি পড়িল লীলা,
অলীক বারতা কহিয়া বিজয়
কারা হোতে বাহিরিলা।
সমরের ধ্বনি থামিল ক্রমশঃ,
নিশা হোল সুগভীর।

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

বিজয়ের সেনা পলাইল রণে—
জয়ী হল রণধীর।

* * * * *

কারাগার মাঝে পশি রণধীর
কহিল অধীর স্বরে—
"লীলা!—রণধীর এসেছে তোমার
এস এ বুকের পরে!"
ভূমিতল হোতে চাহি দেখে লীলা
সহসা চমকি উঠি,
হরষ আলোকে জ্বলিতে লাগিল
লীলার নয়ন দুটি।
"এস নাথ এস অভাগীর পাশে
বোস একবার হেথা,
জনমের মত দেখি ও মুখানি
শুনি ও মধুর কথা!
ডাক নাথ সেই আদরের নামে
ডাক মোরে স্নেহভরে
এ অবশ মাথা তুলে লও সখা
তোমার বুকের পরে!"
লীলার হৃদয়ে ছুরিকা বিঁধানো
বাহিছে শোণিত-ধারা—
রহে রণধীর পলক বিহীন
যেন পাগলের পারা
রণধীর-বুকে মুখ লুকাইয়া,
গলে বাঁধি বাহুপাশ,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিল বালিকা,
"পুরিল না কোন আশ!
মরিবার সাধ ছিল না আমার
কত ছিল সুখ আশা,
পারিল না সখা করিবারে ভোগ
তোমার ও ভালবাসা!
হারে হা পামর, কি করিলি তুই?
নিদারুণ প্রতারণা!
এতদিন কার সুখ সাধ মোর
পূরিল না পূরিল না!"
এত বলি ধীরে অবশ বালিকা
কোলে তার মাথা রাখি,
রণধীর মুখে রহিল চাহিয়া
মেলিয়া অবাক্ আঁখি!
রণধীর ক্রমে শুনিল সকল
বিজয়ের প্রতারণা।
বীরের নয়নে উঠিল জ্বলিয়া
রোষের অনল-কণা!
'পৃথিবীর সুখ ফুরালো আমার,
বাঁচিবার সাধ নাই।
এর প্রতিশোধ তুলিতে হইবে,
বাঁচিয়া রহিব তাই!'
লীলার জীবন আইল ফুরায়ে
মুদিল নয়ন দুটি,
কারাগার হোতে রণধীর তবে
বাহিরে আইল ছুটি।
দেখে বিজয়ের মৃতদেহ সেই
রয়েছে পড়িয়া সমর-ভূমে!
রণধীর যবে মরিছে জ্বলিয়া
বিজয় ঘুমায় মরণ ঘুমে!
শত ভাগে তার কাটিয়া শরীর
দলি তারে পদতলে,
পাগলের মত পড়ে রণধীর
বিপাশা নদীর জলে।
তটিনী-সলিল উছসি উঠিল
ডুবি গেল রণধীর,
মরণের কোলে ঘুমায়ে পড়িল
আহত-হৃদয়-বীর!

গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ।

গেটের বোধ হয় বিশেষ পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। যিনি জর্ম্মাণ-সাহিত্যের অহঙ্কার ও অলঙ্কার স্বরূপ,—যিনি "ফষ্ট" নামক নাটক লিখিয়া মানব হৃদয়ের সূক্ষ্মতম শিরা পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন, যিনিই প্রথমে ইউরোপমণ্ডলে আমাদের শকুন্তলার আদর বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, তাঁর আর নূতন পরিচয় কি দিব?—কিন্তু তিনি অদ্বিতীয়রূপে সূক্ষ্মদর্শী ও বহুদর্শী হইয়াও জীবনে কতদূর দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন তাহা দেখাইবার জন্য পাঠকদের সম্মুখে তাঁহার প্রেম-কাহিনী আজ উদ্ঘাটিত করিতেছি—

গেটে তাঁহার পঞ্চদশ বৎসর বয়স হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ভাল বাসিয়া আসিয়াছেন, অথচ বিয়াত্রীচে বা লরার ন্যায় তাঁহার একটি প্রণয়িনীরও নাম করিতে পারিলাম না। দান্তে ও পিত্রার্কার প্রেম প্রেমের আদর্শ, আর গেটের প্রেম পার্থিব অর্থাৎ সাধারণ। শুদ্ধ যে গেটের দুর্ব্বল প্রেম নিরাশা ও উপেক্ষা সহিয়াই স্থির থাকিতে পারে না এমন নহে, সে প্রেমের প্রধান স্বভাব এই যে, তাহার আশা পূর্ণ হইলেই সে আর থাকিতে পারে না। গেটের প্রেম এক দ্বারে নিরাশ হইলে অমনি আর এক দ্বারে যাইত, আবার আশা পূর্ণ হইলেও থাকিত না। গেটের পক্ষে আশাপূর্ণতা ও নৈরাশ্য উভয়ই সমান কার্য্য করিত; এ প্রেমের উপায় কি? গেটের জীবনে এক একটি প্রেম-আখ্যান শেষ হইলে, অমনি তাহা লইয়া তিনি নাটক রচনা করিতেন, দান্তে বা পিত্রার্কার ন্যায় কবিতা লিখিতেন না। বাস্তব ঘটনাই নাটকের প্রাণ, আদর্শ জগৎই কবিতার বিলাস-ভূমি। যাহা হইয়া থাকে, নাটককারেরা তাহা লক্ষ্য করেন—যাহা হওয়া উচিত কা[illegible]রের চক্ষে তাহাই প্রতিভাত হয়। গেটে তাঁহার নিজের প্রেম নাটকে গ্রথিত করিতে পারিতেন, সাধারণ লোকেরা তাহাতে তাঁহার নিজ-হৃদয়ের আভাস পাইত। কিন্তু বিয়াত্রীচের প্রতি-অভিবাদনে, দান্তের হৃদয়ে যে ভাবতরঙ্গ উঠিত, তাহা তিনি কবিতাতেই প্রকাশ করিতে পারিতেন, তাহা দান্তে ভিন্ন আর কাহারো মুখে সাজিত না।

গেটে কহেন, বাল্য কালে তিনি ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া দেখিতেন তাহা কিরূপে সজ্জিত আছে—পাখীর পালক ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া দেখিতেন তাহা ডানার উপর কিরূপে গ্রথিত আছে। বেটিনা তাঁহার প্রণয়িনীদের মধ্যে এক জন। তিনি বলেন, রমণীর হৃদয় লইয়াও গেটে সেইরূপ করিয়া দেখিতেন। তিনি তাহাদের প্রেম উদ্রেক করিতেন—এবং প্রেম-কাহিনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য কল্পনার সাহায্যে নিজেও কিয়ৎ পরিমাণে প্রেম অনুভব করি-

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

তেন, কিন্তু সে প্রেম তাঁহার ইচ্ছাধীন, প্রয়োজন অতীত হইলেই সে প্রেম দূর করিতে তাঁহার বড় একটা কষ্ট পাইতে হয় নাই। গেটে নিজেই কহেন, যদি বা প্রেম লইয়া তাঁহার হৃদয়ে কখনো আঘাত লাগিত, সে বিষয়ে একটা নাটক লিখিলেই সমস্ত চুকিয়া যাইত।* যত খানি পর্য্যন্ত ভাল বাসিলে কোন আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই, গেটে তত খানি পর্য্যন্ত ভাল বাসিতেন, তাহার ঊর্দ্ধে আর নহে।

বাল্যকাল হইতেই গেটের সকল শ্রেণীর লোকদের রীতিনীতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিবার ভাব ছিল। এই কারণে তিনি এক এক সময় অত্যন্ত নীচ শ্রেণীর লোকদের সহিত মিশিতেন। তিনি পঞ্চদশ বৎসর বয়সে এক বার এই রূপ এক শ্রেণীর লোকদের মধ্যে একটি রাত্রিভোজে উপস্থিত ছিলেন। অভ্যাগতগণ বার বার মদ্য প্রার্থনা করিলে দাসীর পরিবর্ত্তে একটী বালিকা আসিল। সে মৃদু হাস্যে নমস্কার করিয়া কহিল—"দাসী অসুস্থা, শুইতে গিয়াছে, আপনাদের কি প্রয়োজন, আমাকে অনুমতি করুন!" এই রমণীকে দেখিয়া গেটের হৃদয় অতিশয় মুগ্ধ হইল—তিনি তাহাকে অতিশয় সুন্দরী দেখিলেন—তাহার বসন, ভূষণ, গঠন, তাহার টুপিটি পর্য্যন্ত তাঁহার বড় ভাল লাগিল। গেটে এই প্রথম প্রেমে পড়িলেন। গেটে তাহার বাড়িতে যাইবার কোন ছুতা না পাইয়া গির্জ্জায় গিয়া উপাসনার সময় তাহাকেই দেখিতেন। কিন্তু তথাপি উপাসনা ভঙ্গ হইলে পর তাহার সহিত কথা কহিতে বা তাহার সঙ্গ লইতে সাহস করিতেন না! এবং অন্য প্রেমিকদের ন্যায় দূর হইতে তাহার নমস্কার পাইয়াই পরিতৃপ্ত হইতেন—পরিতৃপ্ত না হউন্ সুখী হইতেন। এই রমণীর নাম গ্রেষেণ। যে বাড়িতে তাহাকে প্রথমে দেখিয়াছিলেন সেই বাড়িতে কোন উপায়ে পুনরায় তাহার সহিত একবার মিলন ধার্য্য করিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। যেন এক জন রমণী এক জন যুবাকে লিখিতেছে, এই রূপ ভাবের এক খানি প্রে[illegible]মের পত্র তাহাকে প[illegible]ড়িয়া শুনাইলেন। সে শুনিয়া কহিল—"স[illegible]ুন্দর হইয়াছে বটে। কিন্তু এমন সুন্দর চিঠি প[illegible] যদি সত্য সত্য লেখা হইত, তবে বেশ[illegible] হইত।" গেটে কহিলেন, "বাস্তবিক সে [illegible] যুবা যদি এই চিঠিখানি পাইয়া থাকে বি[illegible] আর যে মহিলাকে সে প্রাণাপেক্ষা [illegible] ভাল বাসে সেও তাহাকে এই রূপ

*ম্যানফ্রেডের সমালোচনায় গেটে লিখিয়াছেন যে, বাইরণ ফ্লোরেন্সে এক বিবাহিতা মহিলার প্রেমে পড়েন, কিন্তু এই প্রেমবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া স্বামী আপন স্ত্রীকে হত্যা করে, কিন্তু সেই রাত্রেই বিছানার উপরে তাহারো মৃতদেহ দৃষ্ট হয়, বাইরণ সেই রাত্রেই ফ্লোরেন্স ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। মান্‌ফ্রেডে যে রমণীর প্রেতাত্মার কথা বর্ণিত আছে সে পূর্ব্বোক্ত মহিলা। গেটে লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু এ গল্পটির কোন মূল নাই, সম্পূর্ণ কাল্পনিক। গেটে নিজের সাদৃশ্য মনে করিয়াছিলেন, বাইরণও আপনার জীবনের ঘটনা হইতেই উক্ত নাটক লিখিয়া থাকিবেন।

ভাল বাসে, তাহা হইলে সে কি সুখীই হইত!" গ্রেষেণ কহিল "হাঁ কথাটা শুনিতে যেমনই হউক্—নিতান্ত অসম্ভব নহে।" গেটে কহিলেন "আচ্ছা মনে কর, এক জন যে তোমাকে চেনে, মাথায় করিয়া পূজা করে, ভাল বাসে, সে যদি তোমার সম্মুখে এই চিঠি খানি দেয়, তবে তুমি কি কর?" গ্রেষেণ ঈষৎ হাসিয়া, একটু ভাবিয়া চিঠিটা লইল ও তাহার নীচে আপনার নাম সই করিয়া দিল। গেটে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন। সে কহিল—"না—চুম্বন করিও না—উহা ত সচরাচর হইয়া থাকে, ভাল বাসিতে হয় ত ভালই বাস।" প্রেমিকের এরূপ সাহসিকতা আমাদের কাছে কেমন কেমন লাগে বটে—কিন্তু ইয়ুরোপীয়দের চক্ষে এরূপ দৃশ্য ও তাহাদের কর্ণে এরূপ কথাবার্ত্তা চিরাভ্যস্ত। গেটের জীবনচরিত পড়িবার সময় অবশ্য কতকটা তাঁহাদের দেশীয় আচার ব্যবহারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। পরে গেটে সেই চিঠিটি লইয়া কহিলেন "এচিঠি আমার কাছেই রহিল—সমস্ত গোল চুকিয়া গেল, তুমি আমাকে বাঁচাইয়াছ!" গ্রেষেণ কহিল "আর কেহ না আসিতে আসিতে এই বেলা তুমি চলিয়া যাও।" গেটে কোন মতে তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন না। কিন্তু সে স্নেহের সহিত তাঁহার দুই হস্ত ধরিয়া এমন দয়ার্দ্র ভাবে কহিল যে, গেটের চক্ষে জল আসিল, গেটে কল্পনায় দেখিলেন তাহারো চক্ষে যেন জল আসিয়াছে! অবশেষে তাহার হস্ত চুম্বন করিয়া চলিয়া আসিলেন। গেটে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া প্রত্যহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন; নানাবিধ ভোজে, নানা প্রমোদ স্থানে, তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। গেটে এক দিন গ্রেষেণদের বাড়িতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আছেন, সহসা তাঁহার মনে পড়িল তিনি তাঁহাদের দ্বারের চাবি আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। কহিলেন—তাঁহার বাড়ি ফিরিয়া যাওয়া অনর্থক, অনেক গোল মাল না করিয়া বাড়িতে প্রবেশ করা অসম্ভব। তাহারা সকলে কহিল—"বেশ ত—এস, আমরা সকলে মিলিয়া আজ এই খানেই রাত্রি জাগরণ করিয়া কাটাইয়া দিই।" গেটের তাহাতে কোন আপত্তি ছিল না। এমন কি, আমাদের এক এক বার সন্দেহ হয়, তিনি ইচ্ছা করিয়াই বা চাবি আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন! কাফি পান করিয়া সকলে রাত্রি জাগরণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আস্তে আস্তে তাস খেলা বন্ধ হইল, গল্প ক্রমে ক্রমে থামিয়া আসিল, গৃহের কর্ত্রী তাঁহার চৌকির উপর ঘুমাইতে আরম্ভ করিলেন, অভ্যাগতগণ ঢুলিতে লাগিলেন। গেটে এবং গ্রেষেণ জানালার এক ধারে বসিয়া অতি মৃদুস্বরে কথা বার্ত্তা কহিতেছিলেন, ক্রমে গ্রেষেণেরও ঘুম আসিল, তাঁহার মস্তকটি সে ধীরে ধীরে গেটের কাঁধে রাখিল, ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল। গেটেও অল্পে অল্পে ঘুমাইয়া পড়িলেন। এই রূপে সে রাত্রি কাটিয়া গেল। কিন্তু

তিনি যে এই রূপ নীচ শ্রেণীর লোকদিগের সহিত মিশেন ইহা তাঁহার পিতার কানে গেল। তিনি মহা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এই মনোবেদনায় গেটে অত্যন্ত পীড়িত হইলেন, এমন কি, তাঁহার মস্তিষ্কের পীড়া জন্মিবার উপক্রম হইয়াছিল। তিনি গ্রেষেণ ও তাহার বন্ধুদের ভাবনায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহার বন্ধুকে গ্রেষেণের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—বন্ধুটি ঘাড় নাড়িয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"সে বিষয়ে তোমার বড় একটা ভাবিতে হইবে না—সে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই; সে দিব্য স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে। সে স্পষ্টই স্বীকার করিল যে, "হাঁ আমি তাঁহাকে অনেক বার দেখিয়াছি বটে, এবং দেখিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি—কিন্তু সর্ব্বদাই বালকটির ন্যায় তাঁহার প্রতি আমি ব্যবহার করিতাম—আর আমার তাঁহার প্রতি ভগিনীর মত ভালবাসা ছিল।" এই রূপে অতি গম্ভীরা-গৃহিণী-ভাবে গ্রেষেণ যাহা যাহা বলিয়াছিল, তাঁহার বন্ধু সমস্ত বলিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু শেষ কথাগুলি আর গেটে শুনিলেন না—গ্রেষেণ যে তাঁহাকে ক্ষুদ্র বালকটি মনে করিত তাহাই তাঁহার প্রাণে বিঁধিয়া গেল। ওকথাটা তাঁহার বড়ই খারাপ লাগিল—তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, গ্রেষেণের উপর হইতে তাঁহার সমস্ত ভাল বাসা চলিয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার বন্ধুকে স্পষ্টই বলিলেন, এখন হইতে সমস্তই চুকিয়া বুকিয়া গেল। গেটে গ্রেষেণের কোন সম্পর্কে আর রহিলেন না—তাহার নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করিতেন না। এমন কি, পূর্ব্বে তিনি তাহার মুখশ্রী যেরূপ চক্ষে দেখিতেন, এখন তাহা বিপরীত ভাবে দেখিতে লাগিলেন—এত দিনে তাহার যথার্থ ভাব বুঝিতে পারিলেন—তাহার মমতাশূন্য নীরস মুখশ্রী তাঁহার চক্ষে পরিস্ফুট হইল। কিন্তু হৃদয়ের আঘাত যন্ত্রণা শীঘ্র নিবৃত্ত হইবার নহে। তিনি কহিলেন—"যে সকল বন্ধুদের ব্যবহারে স্পষ্টই বোধ হয়, তোমার চরিত্র তাহারা সংশোধন করিতে চাহিতেছে তাহাদের দ্বারা কোন ফল জন্মে না—এক জন স্ত্রীলোক যাহার ব্যবহারে সহসা মনে হইতে পারে সে তোমাকে নষ্ট করিতেছে সেই স্ত্রীলোকই অলক্ষিত ভাবে তোমার চরিত্র সংশোধন করে।" তিনি তাঁহার লিখিত উপাখ্যানের এক স্থানে লিখিয়াছেন—"কুমারীরা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বালকদের অপেক্ষা আপনাকে মহা বিজ্ঞ মনে করে—আর তাহাদিগকে প্রথমে যে বেচারী ভালবাসা জানায়—তাহাদের নিকট তাহারা মহা দিদিমার চালে চলিতে থাকে।" একথাটা সত্য—এবং অনেক অশ্রুজলের মধ্য হইতে তিনি এসত্যটি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। গেটের প্রেম বহুদিন অলস ও নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকে নাই—আনষেন্ নামক আর একটি সুশ্রী বালিকা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। গেটের এই বারকার প্রেম-কাহিনীতে আমরা প্রেমের আর এক মূর্ত্তি দেখিতে পাইব।

আনষেন্ অল্পবয়স্ক, সুন্দরী, প্রফুল্ল এবং প্রিয়দর্শন ছিল। গেটে স্বীয় মোহিনী শক্তির বলে তাহার প্রেম আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এবং সে প্রেমকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। কিন্তু তেমনি গেটে সে বালিকার প্রেমের উপর অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করিতেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেন—যে কারণেই হোক্ তাঁহার মন খারাপ হইলেই তিনি সেই বেচারীর উপরে আক্রোশ প্রকাশ করিতেন,—কেন? না সে প্রাণপণে তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিত বলিয়া। তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখা তাহার ব্রত ছিল, এই সুমহৎ অপরাধে তিনি তাহার প্রতি ক্রমাগত অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন! অনর্থক অসূয়া ও অকারণ সন্দেহে তিনি আপনাকে ও তাহাকে সর্ব্বদাই অসুখী করিতেন। এই সকল প্রণয়ের অত্যাচার আনষেণ্ অনেক দিন পর্য্যন্ত সহ্য করিয়াছিল, প্রশংসনীয় ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিয়া জড়া- কিন্তু আর সহিল না। ক্রমাগত জ্বালা- হইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঘাতের পর আঘা- পাইয়া অবশেষে তাহার ধৈর্য্য টুটিয়া গেল। অন্যায় অত্যাচারে তাহার প্রেম ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইয়া গেল। এদিকে গেটে তাহাকে সত্য সত্য মনের সহিত ভালবাসিতেন। আনষেণ্ যখন বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল তখন গেটের চৈতন্য জন্মিল। এত দিন আনষেণ্ তাঁহাকে সাধিয়া আসিতে ছিল, এখন তাঁহার সাধিবার পালা পড়িল। তিনি তাহার প্রেম পুনর্জীবিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু আর হয় না, আনষেণের মন আর ফিরিবার নহে. একেবারে তাঁহার উপর হইতে তাহার প্রেম চলিয়া গিয়াছে। কিছুদিন পরে আনসেনের বাসভূমি লিপ্‌সিক্ হইতে তাঁহার জন্মভূমি ফ্র্যাঙ্কফোর্টে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। তখন অ্যানসেনের সহিত চিঠি লেখালিখি সুরু করিলেন—লিখিলেন—"আমাকে মনে রাখিবার জন্য অনুরোধ করিবার বোধ হয় আবশ্যক নাই; যে ব্যক্তি সার্দ্ধ দুই বৎসর প্রায় তোমাদের পরিবার মধ্যে ভুক্ত হইয়া বাস করিয়াছিল, যে ব্যক্তি অনেক সময় তোমার অসন্তোষের কারণ হইয়াছিল সত্য কিন্তু তথাপি তোমার প্রতি সর্ব্বদাই অনুরক্ত ছিল, সহস্র ঘটনা বোধ হয় তাহাকে তোমার স্মৃতিপথে উদিত করিয়া দিবে—অন্ততঃ তুমি তাহার অভাব অনুভব করিবে—তুমি না কর আমি অনেক সময় করিয়া থাকি।" দিন কতক গেটে তাহার সহিত চিঠি লেখালিখি করিয়াছিলেন—কিন্তু তাহার মন আর বিচলিত করিতে পারেন নাই। অবশেষে তাহার বিবাহ-বার্ত্তা শুনিয়া কহিলেন—

"আমি তোমার লেখা আর দেখিতে চাহি না— তোমার কণ্ঠস্বর আর শুনিতে চাহি না—আমি যে স্বপ্নে মগ্ন রহিয়াছি তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তুমি আমার আর একটি মাত্র পত্র পাইবে, এ অঙ্গীকার আমি নিশ্চয় পালন করিব এবং এই রূপে আমার ঋণের এক অংশ মাত্র পরিশোধ দিব, অবশিষ্ট টুকু আমাকে মার্জ্জনা করিও।" আর একটি পত্র লিখিয়া-

ছিলেন—তাহাতে কহিয়াছিলেন "আমার নিজের বিষয়ে বিশেষ কিছুই বক্তব্য নাই—আমি সবল সুস্থ শরীরে পরিশ্রম করিয়া অতি সুখশান্তিতে কাল যাপন করিতেছি—তাহার প্রধান কারণ—এখন আর আমাকে কোন স্ত্রীলোকে পায় নি।" এই রূপে গেটে তাঁহার হৃদয়-জ্বালা শান্তি করিতে আন্বেষণের দ্বারে নিরাশ হইয়া কল্পনার দ্বারে আশ্রয় লইলেন—একটা নাটক লিখিয়া ফেলিলেন। এই নাটকের নাম "প্রেমিকের খেয়াল।" এরিডনকে (গ্রন্থের নায়ককে) তাঁহার প্রণয়িনীর সখী কহিলেন—"অ্যামীন (নায়িকা) তোমাকে এত ভাল বাসে যে, কোন স্ত্রীলোক তেমন ভাল বাসে নাই" নায়িকাকে তাহার সখী কহিল "যে পর্য্যন্ত তাঁহার অসুখের সত্য কোন কারণ না থাকিবে সে পর্য্যন্ত তিনি একটা না একটা কারণ কল্পনা করিয়া লইবেন; তিনি জানেন যে, তুমি তাঁহা অপেক্ষা আর অধিক কিছুই ভাল বাসো না—তুমি তাঁহাকে সন্দেহের কোন কারণ দাও না বলিয়াই তিনি তোমাকে সন্দেহ করেন। এক বার তাঁহাকে দেখাও যে তাঁহাকে না হইলেও তোমার চলে। তাহা হইলে এখনকার একটি চুম্বন অপেক্ষা তখনকার একটি দৃষ্টিতে অধিকতর সন্তুষ্ট হইবেন।" এই খানেই গেটের দ্বিতীয় প্রেমাভিনয়ের যবনিকা পড়িয়া গেল।

এক সময়ে গেটে গোল্ড্স্মিথের "বাইকার" নামক উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত ছিলেন। এমন সময়ে তিনি শুনিলেন, ষ্ট্রাস্‌বর্গের নিকটে অবিকল প্রিম্‌রোস্ পরিবারের ন্যায় এক পাদ্রী পরিবার বাস করেন। তিনি কৌতূহল বশত তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিলেন। দেখিলেন—পাদ্রির কনিষ্ঠা কন্যা ফ্রেড্‌রিকার সহিত সোফিয়ার অনেক সাদৃশ্য আছে। সে পরিবারের মধ্যে গেটে দুই দিন বাস করিলেন—এবং সেখানে তাঁহার অতুল্য মোহিনী শক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় ফ্রেড্‌রিকার জন্য নিঃশ্বাস ফেলিয়া আসিলেন—বোধ হয় ফ্রেড্‌রিকাও তাঁহার জন্য নিশ্বাস ফেলিয়াছিল। কিছু দিন পরে আবার সহসা এক সন্ধ্যাকালে তাহাদের সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অলিভিয়া ও ফ্রেড্‌রিকা দুই বোনে দ্বারের কাছে বসিয়াছিল। আদরের সহিত তিনি সেখানে আহূত হইলেন। আলোতে আসিবা মাত্র মারীরা অলিভিয়া তাঁহাকে দেখিয়া হাসিয়া উঠিল দেখিয়া গেটের অদ্ভুত পরিচ্ছদ দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। ফ্রেড্‌রিকা কহিল "কই—আমিত হাসিবার মত কিছুই দেখিতে পাই নাই"—কিন্তু ফ্রেড্‌রিকা দেখিতে পাইবে কেন?

এই কাহিনী শেষ করিবার পূর্ব্বে ইহার অন্তর্ভূত আর একটি উপাখ্যান বলিয়া লই। গেটে ইতিপূর্ব্বে এক ফরাসী শিক্ষকের নিকট নৃত্য শিখিতেন। তাঁহার শিক্ষকের দুই কন্যা ছিল, দুই জনই যুবতী ও রূপবতী—ইহাদের মধ্যে কনিষ্ঠাটি আর এক জনের প্রেমাসক্তা। জ্যেষ্ঠা লুশিন্দা তাঁহার

প্রেমে পড়িল, কিন্তু তিনি কনিষ্ঠা এমিলিয়ার প্রেমে পড়িলেন। এক সময়ে লুশিন্দা রোগ-শয্যায় শয়ান ছিল—তাহার ঘরের পার্শ্বে এমিলিয়া ও গেটে বসিয়াছিলেন। এমিলিয়া গেটের নিষ্ফল প্রেম লইয়া কথোপকথন করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে এমিলিয়া গেটেকে কহিল—"তোমাতে আমাতে তবে এই পর্য্যন্ত।" গেটেকে দ্বার পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া এমিলিয়া কহিল "আমাদের এই শেষ দেখা। তোমাকে যাহা কখনো দিই নাই ও দিতাম না, আজ তাহা দিলাম।" এই বলিয়া গেটের গলা ধরিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিল। উন্মত্ত গেটে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন—এমন সময়ে লুশিন্দা তাহার রোগ-শয্যা হইতে বিশৃঙ্খল-বসনে ছুটিয়া আসিয়া এমিলিয়াকে কহিল "তুমি একলা কেবল উঁহার নিকট হইতে বিদায় লইতে পারিবে না।" এমিলিয়া গেটেকে ছাড়িয়া দিল—লুসিন্দা গেটের বক্ষ জড়াইয়া ধরিল—ও তাহার স্বর্ণবর্ণ কেশপাশ দিয়া তাঁহার মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। লুশিন্দা অনেক ক্ষণ নীরবে এই অবস্থায় রহিল—গেটে ত কতকটা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে লুশিন্দা গেটেকে ছাড়িয়া দিয়া ব্যাকুল-নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আবার কিয়ৎক্ষণ পরে ছুটিয়া গিয়া চুম্বনে চুম্বনে তাঁহাকে যেন প্লাবিত করিয়া দিল; পরিশেষে কহিল—"এখন আমার অভিশাপ শুন—আমার পরে প্রথম যে তোমার ঐ অধর চুম্বন করিবে—চিরকাল তাহার দুঃখের পর দুঃখ হউক্! যদি সাহস হয় তবে পুনরায় চুম্বন করিও—কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন। এখন তুমি বিদায় হও—যত শীঘ্র পার, বিদায় হও!" গেটে বিদায় হইতে কিছুমাত্র কালবিলম্ব করিলেন না!

এখন আমরা পুনরায় ফ্রেড্‌রিকার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করি। পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় মিলন কালে গেটে ফ্রেডেরিকার সহিত গ্রাম-পথে ভ্রমণ করিতেছেন—দিন গুলি অতি শীঘ্র ও অতি সুখে চলিয়া যাইতেছে—কিন্তু এ পর্য্যন্ত সেই অভিশাপের ভয়ে গেটে কখনো ফ্রেডরিকাকে চুম্বন করেন নাই। এই খানে পুনরায় পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, বৈদেশিকের জীবন চরিত্র পড়িবার সময় আপনাকে কতকটা তাহাদেরই রীতি নীতি প্রথা সহাইয়া লওয়া প্রয়োজনীয়। তাহাদের কার্য্য তাহাদেরই আচার ব্যবহারের সহিত তুলনা করিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য। এক প্রকার তাস খেলা আছে, হারিলে চুম্বন দণ্ড দিতে হয়—গেটে এই চুম্বনের পরিবর্ত্তে কবিতা উপহার দিতেন—কিন্তু যে মহিলার তাঁহার নিকট হইতে চুম্বন প্রাপ্য থাকিত তাঁহার যে মর্ম্মে আঘাত লাগিত তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু গেটে অধিক দিন এরূপ সামলাইয়া চলিতে পারেন নাই। একটি নাচের উৎসবে গেটে ফ্রেডেরিকার সহিত নাচিয়াছিলেন—গেটের নাচ ফ্রেডেরিকার বড় ভাল লাগিয়াছিল। নাচ শেষ হইলে উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া নির্জ্জনে গিয়া আলিঙ্গন ক-

রিয়া কহিলেন, উভয়ই উভয়কে মনের সহিত ভাল বাসেন। দিনে দিনে উভয়ের ভালবাসা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল—অবশেষে গেটের বিদায় লইবার সময় আত্মীয়দের সম্মুখেই ফ্রেড্‌রিকা তাঁহাকে চুম্বন করিল। গেটে ফ্রেড্‌রিকার প্রেমকে বরাবর পালন করিয়া আসিয়াছিলেন—কিছুই বলা কহা হয় নাই, অথচ এক প্রকার স্থির হইয়া গিয়াছিল যেন তিনি বিবাহ করিবেন। কিন্তু গেটে জানিতেন তাঁহার বিবাহ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। বিদায় হ'ব হ'ব সময়ে ঐকথা তাঁহার স্মরণ হইল। তখন ফ্রেড্‌রিকাকে দেখিলে তাঁহার মন কেমন অসুস্থ হইত—ফ্রেড্‌রিকা হইতে দূরে থাকিতে পারিলেই একটু শান্ত হইতেন। বিদায়কালে গেটে অশ্বে আরোহণ করিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন—ফ্রেড্‌রিকা তাঁহার হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মনে মনে বিবাহ করিব না জানিয়াও বালিকার প্রেমকে প্রশ্রয় দেওয়া যে অন্যায় হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু ফ্রেড্‌রিকা তাঁহাকে কিছুমাত্র তিরস্কার বা তাঁহার নামে কোন দোষারোপ তা'সে করে নাই। গেটের হৃদয় হইতে প্রেম যেরূপ ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়াছিল, ফ্রেড্‌রিকারও সেই রূপ হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না। যাহা হউক্ অবিবাহিত অবস্থাতেই তাহার মৃত্যু হয়। গেটে ফ্রেড্‌রিকা সম্বন্ধে কহেন—

"গ্রেষেণ আমার নিকট হইতে দূরীকৃত হইয়াছিল—আনষেণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল—কিন্তু এই প্রথম আমি নিজে দোষী হইয়াছিলাম। আমি একটি অতি সুন্দর হৃদয়ের অতি গভীরতম স্থান পর্য্যন্ত আহত করিয়াছিলাম। অন্ধকারময় অনুতাপে সেই অতি আরামদায়ক প্রেমের অবসানে কিছু কাল যন্ত্রণা পাইয়াছিলাম, এমন কি, তাহা অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মানুষকে ত বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, কাজে কাজেই অন্য লোকের উপরে মনোনিবেশ করিতে হইল।"

এখন গেটে ষারলোট্ নামক এক রমণীর প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। কেজ্‌নার নামক যুবার সহিত ষার্‌লোটের বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। উভয়ই উভয়ের প্রেমে আসক্ত। কেজ্‌নারের প্রণয়ে অসূয়া বা সন্দেহ কিছুমাত্র ছিল না; যাহাকে সে ভাল মনে করিত তাহারই সহিত ষার্লোটের আলাপ করাইয়া দিত। এই রূপে গেটের সহিত ষার্লোটের প্রথম আলাপ হয়। প্রেমিক-যুগলের সহিত গেটের প্রণয়-সম্বন্ধ ক্রমেই পাকিয়া উঠিতে লাগিল। ষার্লোট ব্যতীত তিনি আর থাকিতে পারেন না। তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া ওয়েট্‌স্লারের উর্ব্বর ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। যদি কাজ কর্ম্ম হইতে অবসর পাইতেন তবে কেজ্‌নারও তাঁহাদের সহিত যোগ দিতেন। এই রূপ ধীরে ধীরে তাহারা পরস্পরের সহিত এমন মিলিত হইয়া গেল যে, এক জনকে নহিলে যেন আর এক জনের চলিত না। যতখানি উপযুক্ত, অলক্ষিত ভাবে গেটের তদপেক্ষা প্রেম জন্মিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ষার্লোটের মন কেজ্‌নার হইতে গেটের প্রতি ধাবিত হয় নাই। ক্রমে ক্রমে তাহাদের বিবাহের সময় হইয়া আসিতেছে—গেটে দেখিলেন, তাঁহার হৃদয়েও প্রেম দিন দিন বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে—গেটে দেখিলেন এইবেলা হইতেই দূরে পলায়ন করা সৎপরামর্শ। দূরে প্রস্থান করিলেন ও এই বিষয় লইয়া তাঁহার বিখ্যাত উপাখ্যান "যুবা ওরার্থরের যন্ত্রণা" লিখিয়া ফেলিলেন। লেখাও শেষ হইল আর তাঁহার প্রেমও শেষ হইল। এখন তিনি আবার নূতন পথে যাইবার বল পাইলেন।

নূতন পথে যাইতে তাঁহার বড় বিলম্ব হয় নাই। লিলি নামক এক ষোড়শবর্ষীয়া বালিকার (আমাদের দেশে যুবতী) সহিত তাঁহার প্রণয় জন্মিল। সে বালিকার অনেক গুলি অনুরাগী বা বিবাহাকাঙ্খী ছিল। তাহাদের সকলকেই তাহার প্রেমে বন্দী করিবার দিকে লিলির বিশেষ যত্ন ছিল, কিন্তু দৈব ক্রমে আপনি গেটের প্রেমে জড়াইয়া পড়িল—একথা সে নিজেই গেটের কাছে স্বীকার করিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের প্রেম বাড়িয়া উঠিল ইহা বলা বাহুল্য। অবশেষে তাঁহাদের অবস্থা এমন হইয়া উঠিল যে সুদূর বিচ্ছেদের কথা মনে করিতেও কষ্ট হইত; উভয়ের উভয়ের উপর এমন বিশ্বাস জন্মিয়া গেল যে, অবশেষে তাঁহারা বিবাহের বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু উভয়েরই কর্ত্তৃপক্ষের তাহাতে অমত হইল। অবশেষে এক জন রমণী মধ্যস্থা হইয়া উভয় পক্ষকেই সম্মত করাইল। যত দিন কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সম্মত হন নাই তত দিন গেটে বড়ই যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন, কিন্তু সম্মত হইলে পর তাঁহার মনের নূতন প্রকার পরিবর্ত্তন হইল। তখন সমস্ত নূতনত্ব চলিয়া গেল। যখন লিলিকে হস্তপ্রাপ্য মনে করিলেন তখন লিলির উপর আর টান থাকিবে কেন? লিলির নিকট হইতে বিদায় না লইয়া তিনি আস্তে আস্তে ফ্র্যাঙ্কফোর্ট্ ত্যাগ করিয়া চলিলেন। তিনি বলেন তিনি লিলিকে ভুলিতে পারেন কিনা—এবং লিলির উপর বাস্তবিক তাঁহার কতখানি প্রেম আছে, তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি বিদেশে যাইতেছেন। কিন্তু এই পরীক্ষার কথা যখনি তাঁহার মনে আসিয়াছে, তখনি বুঝা গিয়াছে বাস্তবিক তাঁহার প্রেম নাই। যদি তাঁহার প্রেমের তেমন গভীরতা থাকিত তবে কি পরীক্ষার কথা মনেই আসিত? কিছু দিন বিদেশে থাকিয়া আবার তিনি ফ্র্যাঙ্কফোর্টে ফিরিয়া আসিলেন। ইতি মধ্যে লিলির আত্মীয়-বর্গ লিলির প্রেম বিনষ্ট করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল—কিন্তু লিলি কহিল, সে গেটের জন্য সমস্ত ত্যাগ করিতে পারে—এমন কি, গেটে যদি সম্মত হন, তবে সে তাঁহার সঙ্গে আমেরিকায় যাইতে পারে। কি সর্ব্বনাশ—গেটে তাঁহার বাড়ি ঘর ছাড়িয়া কোথা এক সাত সমুদ্র পার আমেরিকা—সেইখানে যাইবেন! তাও কি হয়? লিলি গেটের জন্য সমস্ত করিতে পারে, কিন্তু গেটে তাহার জন্য বড় একটা ত্যাগ স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। ত্যাগস্বীকার করা দূরে থাকুক,

কোন ত্যাগ স্বীকার করিতে না হইলেও তিনি লিলিকে বিবাহ করেন কিনা সন্দেহ। আবার গেটে আস্তে আস্তে পলাইবার চেষ্টা দেখিলেন। এক বার লিলির ঘরের জানালার সম্মুখে দাঁড়াইলেন—দেখিলেন যেখানে পূর্ব্বে প্রদীপ জ্বলিত, সেইখানেই জ্বলিতেছে—লিলি পিয়ানো বাজাইয়া তাঁহারই রচিত একটি গান গাহিতেছে—তাহার প্রথম ছত্র।

"হায়—কি সবলে মোরে করিয়াছে আকর্ষণ!"

এ গানটি কিছুকাল পূর্ব্বে তিনিই লিলিকে উপহার দিয়াছিলেন। যাহা হউক—গেটে লিলির সবল আকর্ষণ ত ছিঁড়িলেন।

যে ব্যক্তি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এক জনের পর আর এক জনকে ভাল-বাসিয়া আসিয়াছিলেন, ও ভালবাসা পাইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার প্রেমের কথা আর কত বলিব। তাঁহার ছিয়াত্তর বৎসর বয়সের সময় মাডাম জিমানৌস্কা তাঁহার প্রেমে পড়েন!

গেটের এই প্রেম-কাহিনী সমুদয়ে পাঠকেরা যে মহাকবি গেটের হৃদয় জানিতে পারিবেন মাত্র তাহা নহে—প্রেমের বিচিত্র মূর্ত্তিও দেখিতে পাইবেন।

ফুলবালা।

আজি পূরণিমা নিশি,
তারকার মাঝে বসি
অলস-নয়নে শশি
মৃদু-হাসি হাসিছে!
পাগল পরাগে ওর,
লেগেছে ভাবের ঘোর,
যামিনীর পানে চেয়ে
কি যেন কি ভাবিছে!
কাননে নিঝর ঝরে
মৃদু কল কল স্বরে,
অলি ছুটা-ছুটি করে
গুন্ গুন্ গাহিয়া!
সমীর অধীর-প্রাণ
গাইয়া-উঠিছে গান
তটিনী ধরেছে তান,
ডাকি উঠে পাপিয়া!

সুখের স্বপন মত
পশিছে সে গান যত—
ঘুমঘোরে জ্ঞান-হত
দিক-বধূ শ্রবণে,—
সমীর সভয়-হিয়া—
মৃদু মৃদু পা টিপিয়া
উঁকি মারি দেখে গিয়া
লতা-বধূ-ভবনে!
কুসুম-উৎসবে আজি
ফুলবালা ফুলে সাজি,
কত না মধুপ রাজি
এক ঠাঁই কাননে!
ফুলের বিছানা পাতি
হরষে প্রমোদে মাতি
কাটাইছে সুখ-রাতি
নৃত্য-গীত-বাদনে!

মাথার উপরে আটকে তপন
প্রজাপতি পাখা মেলি!
এস দেখি কবি ঐ খানটিতে
দাঁড়াই গাছের তলে,
শুনি চুপি চুপি, মালতী-বালায়
ভ্রমর কি কথা বলে!
কহিছে ভ্রমর "কুসুম-কুমারি—
বকুল পাঠালে মোরে,
তাই লো মালতী এসেছি হেথায়
বারতা শুনাতে তোরে!
অশোক বালক কিযে হইয়াছে
সে কথা বলিব কারে!
তোর মত হেন মোহিনী বালারে
উপেখিতে সে কি পারে?
তবু তার তরে অপেখিয়া তুই
র'বি কি হেথায় বোন?
পরাণ সঁপিয়া অশোক তবুকি
পাবে নাকো তোর মন?
ভাবে একা বসি—বারতা পুছিলে
করিয়া থাকে সে চুপ,
কি কুখনে আহা দেখিল ও তোর
মন-মজানিয়া রূপ!
চমকি উঠিল মালতী-বালিকা
ঘুম হ'তে যেন জাগি,
অবাক্ হইয়া রহিল বসিয়া
কি জানি কিসের লাগি!
"চলিয়া গিয়াছে অশোক কুমার?"
কহিল ক্ষণেক পর
"চলিয়া গিয়াছে অশোক আমার
ছাড়িয়া আপন ঘর?
তবে আর আমি—তবে আর আমি
থাকিব কিসের আশে?
যাইব অশোক গিয়েছে যেখানে
যাইব তাহার পাশে!
বনে বনে ফিরি বেড়াব খুঁজিয়া
শুধাব' লতার কাছে,
খুঁজিব কুসুমে খুঁজিব পাতায়
কোথায় অশোক আছে!
খুঁজিয়া খুঁজিয়া অশোকে আমার
যায় যদি যাবে প্রাণ—
আমা হ'তে তবু হবেনা কখনো
পিরীতির অপমান!"
ছাড়ি নিজ বন চলিল মালতী
চলিল আপন মনে
অশোক বালকে খুঁজিবার তরে
ফিরে কত বনে-বনে!
"অশোক" "অশোক" ডাকিয়া ডাকিয়া
লতায় পাতায় ফিরে
ভ্রমরে শুধায় ফুলেরে শুধায়
"অশোক এখানে কিরে?"
হোথায় নাচিছে অমল সরসী
চল দেখি হোথা কবি—
নিরমল জলে নাচিছে কমল
মুখ দেখিতেছে রবি!
রাজহাঁস দেখ সাঁতারিছে জলে
শাদা শাদা পাখা তুলি,
পিঠের উপরে পাখার উপরে
বসি ফুল-বালা গুলি!
চল দেখি কবি শুধাই হোথায়
"অশোক হেথা কি আছে?"
হোথায় বসিয়া ফুলবালা গণ,
চল উহাদের কাছে!

এখানেও নাই, চল যাই তবে—
ওই নিঝরের ধারে,
মাধবী ফুটেছে, শুধাই উহারে
বলিবারে যদি পারে।
বেগে উথলিয়া পড়িছে নিঝর—
ফেন গুলি ধরি ধরি
ফুল শিশুগণ করিতেছে খেলা
রাশ রাশ করি করি!
আপনার ছায়া ধরিবারে গিয়া
না পেয়ে হাসিয়া উঠে—
হাসিয়া হাসিয়া হেথায় হোথায়
নাচিয়া খেলিয়া ছুটে!
ওগো ফুলশিশু! খেলিছ হোথায়
শুধাই তোমার কাছে,
অশোক বালকে দেখেছ কোথাও,
অশোক হেথা কি আছে?
এখানেও নাই এস তবে কবি
কুসুমে খুঁজিয়া দেখি—
ওই যে ওখানে গোলাপ ফুটিয়া
হোথায় রোয়েছে,—এ কি?
এ কে গো ঘুমায়—হেথায়—হেথায়—
মুদিয়া দুইটি আঁখি
গোলাপের কোলে মাথাটি সঁপিয়া
পাতায় শরীর রাখি!
এই আমাদের অশোক বালক
ঘুমায়ে আছে গো হেথা!
দুখিনী ব্যাকুলা মালতী-বালিকা
খুঁজিয়া বেড়ায় কোথা?
চল চল কবি চল দুই জনে
মালতীরে ডাকি আনি,
হরষে এখনি উঠিবে নাচিয়া
কাতরা কুসুম রাণী!
সে আবার কোথা বেড়ায় ঘুরিয়া
আনিগে তাহারে খুঁজি
হয়ত এখন মাধবী কাননে
ফুল করিতেছে পুঁজি।

* * * *

কোথাও তাহারে পেনুনা খুঁজিয়া
এখন কি করি তবে?
অশোক বালক না যায় কোথাও
বুঝায়ে রাখিতে হবে!
গোলাপ-শয়নে ঘুমায় অশোক
দুখ তাপ সব ভুলি,
চল দেখি সেথা কহিব আমরা
সব কথা তারে খুলি!
দেখ দেখ কবি—অশোক-শিয়রে
ওই না মালতী হোথা?
গোলাপ হইতে লয়েছে তুলিয়া
কোলে অশোকের মাথা
কতযে বেড়ানু খুঁজিয়া খুঁজিয়া
কাননে কাননে পশি!
কখন্ হেথায় এসেছে বালিকা?
রোয়েছে হোথায় বসি!
ঘুমায়ে রোয়েছে অশোক বালক
শ্রমেতে কাতর হোয়ে,
মুখের পানেতে চাহিয়া মালতী
কোলেতে মাথাটি লোয়ে!
ঘুমায়ে ঘুমায়ে অশোক বালক
সুখের স্বপন হেরে,
গাছের পাতাটি লইয়া মালতী
বীজন করিছে তারে।
নত করি মুখ দেখিছে বালিকা

ফুল-বাস পরিয়া
হাতে হাতে ধরিয়া
নাচি নাচি ঘুরি আসে কুসুমের রমণী!
চুল গুলি এলিয়ে
উড়িতেছে খেলিয়ে
ফুল-রেণু ঝরি ঝরি পড়িতেছে ধরণী!
ফুল-বাঁশী ধরিয়ে
মৃদু তান ভরিয়ে
বাজাইছে ফুল-শিশু বসি ফুল-আসনে।
ধীরে ধীরে হাসিয়া
নাচি নাচি আসিয়া
তালে তালে করতালি দেয় কেহ সঘনে!
কোন ফুল রমণী
চুপি চুপি অমনি
ফুল-বালকের কানে কথা যায় বলিয়ে;
কোথাও বা বিজনে
বসি আছে দুজনে
পৃথিবীর আর সব গেছে যেন ভুলিয়ে!
কোন ফুল-বালিকা
গাঁথি ফুল-মালিকা
ফুল-বালকের কথা এক মনে শুনিছে,
বিব্রত শরমে,
হরষিত মরমে,
আনত আননে বালা ফুল দল গুনিছে!

দেখেছ হোথায় অশোক বালক
মালতীর পাশে গিয়া,
কহিছে কতকি মরম-কাহিনী
খুলিয়া দিয়াছে হিয়া!
ভ্রূকুটি করিয়া নিদয়া-মালতী
যেতেছে সুদূরে চলি,
মৃদু-উপহাসে সরল প্রেমের
কোমল-হৃদয় দলি!
অধীর-অশোক যদিবা কখনো
মালতীর কাছে আসে,
ছুটিয়া অমনি পলায় মালতী
বসে বকুলের পাশে!
থাকিয়া থাকিয়া সরোষ ভ্রূকুটি
অশোকের পানে হানে—
ভ্রূকুটি সে-গুলি বাণের মতন
বিঁধিল অশোক-প্রাণে।
হাসিতে হাসিতে কহিল মালতী
বকুলের সাথে কথা,
মলিন-অশোক রহিল বসিয়া
হৃদয়ে পাইয়া ব্যথা!
মন দলিবার চাতুরী যতেক—
সকলি মালতী জানে—
অশোক হৃদয় বিঁধিতে লাগিল
তীখন তীখন বাণে!
দেখ দেখি চেয়ে মালতী-হৃদয়ে
কাহারে সে ভাল বাসে!
বল দেখি মোরে, হৃদয় তাহার
রয়েছে কাহার পাশে?
ওই দেখ তার হৃদয়ের পটে
অশোকেরি নাম লিখা!
অশোকেরি তরে জ্বলিছে তাহার
পিরীতি-অনল-শিখা!
এইযে নিদয়-চাতুরী সদত
দলিছে অশোক-প্রাণ—
অশোকের চেয়ে মালতী-হৃদয়ে
বিঁধিছে তাহার বাণ!
মনে মনে করে কত বার বালা,—

অশোকের কাছে গিয়া—
কহিবে তাহারে মরম-কাহিনী
হৃদয় খুলিয়া দিয়া !
ক্ষমা চাবে গিয়া পায়ে ধোরে তার,
খাইয়া লাজের মাথা—
পরাণ ভরিয়া লইবে কাঁদিয়া—
কহিবে মনের ব্যথা !
তবুও কি যেন আটকে চরণ
সরমে সরে না বাণী,
বলি বলি করি বলিতে পারেনা
মনো-কথা ফুল-রাণী !
মন চাহে এক ভিতরে ভিতরে—
প্রকাশ পায় সে আর,
সামালিতে গিয়া নারে সামালিতে
এমন জ্বালা সে তার !
মলিন-অশোক ম্রিয়মান মুখে
একেলা বসিয়া রহিল সেথা,
নয়নের বারি নয়নে নিবারি
হৃদয়ে লুকায়ে হৃদয়-ব্যথা !
দেখেনি কিছুই, শোনে নি কিছুই
কে গায় কিসের গান,
রহিয়াছে বসি, বহি আপনার
হৃদয়ে বিঁধানো বাণ !
কিছুই নাহি রে পৃথিবীতে যেন,
সব সে গিয়েছে ভুলি !
নাহি রে আপনি—নাহি রে হৃদয়
রোয়েছে ভাবনা-গুলি !
ফুল-বালা এক, দেখিয়া অশোকে
আদরে কহিল তারে !
কেনগো অশোক—মলিন হইয়া
ভাবিছ-বসিয়া কারে ?

আজিকার এই সুখের নিশীথে
মলিন কেন বয়ান ?
তা হবেনা ভাই আইস হেথায়
গাহিতে হইবে গান !
এত বলি তার ধরি হাত খানি
আনিল সভার পরে—
"গাওনা অশোক—গাও" বলি তারে
কত সাধাসাধি করে।
নাচিতে লাগিল ফুল-বালা দল—
ভ্রমর ধরিল তান—
মৃদু মৃদু মৃদু বিষাদের স্বরে
অশোক গাহিল গান।

গান—

গোলাপ ফুল—ফুটিয়ে আছে
মধুপ হোতা যাস্‌নে—
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে
কাঁটার ঘা খাস্‌নে !
হেথায় বেলা, হোথায় চাঁপা
শেফালী হোথায় ফুটিয়ে—
ওদের কাছে মনের ব্যথা
বলিবি বল্ ফুটিয়ে !
ভ্রমর কহে "হোথায় বেলা
হোথায় আছে নলিনী—
ওদের কাছে বলিবনাকো
আজিও যাহা বলিনি !
চাবি দিয়া যা রেখেছি হৃদে
গোলাপে তাহা খুলিব,
তাহার পরে তখন নয়
কাঁটার ঘায়ে জ্বলিব !"
বিষাদের গান কেনগো আজিকে ?
আজিকে প্রমোদ-রাতি !

হরষের গান গাওগো অশোক
হরষে প্রমোদে মাতি !
হরষে এলিয়ে প'ড়েছে জোছনা।
হরষে বহিছে মৃদুল বায়—
হরষে নাচিছে লতা পাতা ফুল
হরষে সরসী উথলি যায় !
সবাই কহিল "গাওগো অশোক
গাওগো প্রমোদ গান
নাচিয়া উঠুক কুসুম-কানন
নাচিয়া উঠুক প্রাণ !"
কহিল অশোক "হরষের গান
গাহিতে বোল' না আর—
কেমনে গাহিব ? হৃদয়ে আমার
বাজিছে বিষাদ তার।
এতেক বলিয়া অশোক বালক
বসিল ভূমির পরে—
কে কোথায় সব, গেল সে ভুলিয়া
আপন ভাবনা ভরে !
কিছু দিন আগে—কি ছিল অশোক !
তখন আরেক ধারা,
নাচিয়া ছুটিয়া এখানে সেখানে
বেড়াত অধীর পারা !
নবীন-যুবক, শোহন-গঠন,
সবাই বাসিত ভাল—
যেখানে যাইত অশোক যুবক
সেথান করিত আলো !
কিছু দিন হ'তে এ কেমন ভাব—
কোথাও না যায় আর।
একলা-টি থাকে বিরলে বসিয়া
হৃদয়ে পাষাণ ভার !
অরুণ-কিরণ হইতে এখন
বরণ বাহির করি
রাঙায় না আর ললিত বসন
মোহিনী তুলিটি ধরি ;
পূরণিমা-রেতে জ্যোছনা হইতে—
অমিয় করিয়া চুরি
মধু নিরমিয়া নাহি রাখে আর
ভাণ্ডার-ঘর পুরি !
ক্রমশ নিভিল চাঁদের জ্যোছনা
নিভিল জোনাক পাঁতি—
পূরবের দ্বারে উষা উঁকি মারে,
আলোকে মিশাল রাতি !
প্রভাত-পাখীরা উঠিল গাহিয়া
ফুটিল প্রভাত-কুসুম-কলি—
প্রভাত শিশিরে নাহিবে বলিয়া
চলে ফুল-বালা পথ উজলি'।
তার পর-দিন রটিল প্রবাদ
অশোক নাইক ঘরে
কোথায় অবোধ কুসুম-বালক
গিয়েছে বিষাদ-ভরে !
কুসুমে কুসুমে পাতায় পাতায়
খুঁজিয়া বেড়ায় সকলে মিলি—
কি হবে—কোথাও নাহিক অশোক
কোথায় বালক গেল রে চলি !
কহে কলপনা "খুঁজি চল গিয়া
অশোক গিয়াছে কোথা—
সুমুখে শোভিছে কুসুম কানন
দেখ দেখি কবি হোথা !
ঘাড় উঁচু করি হোথা গরবিনী
ফুটেছে ম্যাগনোলিয়া—
কাননের যেন চখের সামনে
রূপরাশি খুলি দিয়া !

সাধাসাধি করে কত শত ফুল
চারি দিকে হেথা হোথা—
মুচকিয়া হাসে গরবের হাসি
ফিরিয়া না কয় কথা !
মনে ঠিক দিয়া আছেন গরবে
আমিই সরেশ ফুল ;
সকল কানন বেড়ালে খুঁজিয়া
মোর না মিলিবে তুল !
সোনার কমলে তবুত সকলে
সবচেয়ে সেরা বলে ?
সেই খেদে হায় ম্যাগনোলিয়া
ভিতরে ভিতরে জ্বলে !
হাসিয়া ভ্রমর কোহে যায় কানে
উপহাস করি কত—
নলিনীর মত ফুল না দেখিনু
খুঁজিনু কানন যত !
ফুস্ ফাস্ কোরে বায়ু বোলে যায়
গরবীর কানে কানে,
এত আছে ফুল নলিনীর মত
না দেখিনু কোনখানে !
মরমে মরমে জ্বলিয়া জ্বলিয়া
চুপ করি থাকে বালা—
কেহই তাহার নহেক আপন,
কাহারে কহিবে জ্বালা।
হ্যাদে দেখ কবি সরসী ভিতরে
পদ্ম কেমন ফুটেছে !
এপাশে ওপাশে পড়িছে হেলিয়া—
প্রভাত সমীর উঠেছে !
ঘোমটা ভিতরে লোহিত অধরে
মধুর কোমল হাসি
বিলায় ছড়ায় হেথায় হোথায়
সৌরভ রাশি রাশি !
নিরমল জলে নিরমল রূপে
পৃথিবী করিছে আলো
পৃথিবীর প্রেমে তবু নাহি মন,
রবিরেই বাসে ভাল !
কানন বিপিনে কত ফুল ফুটে
কিছুই বালা না জানে
হৃদয়ের কথা কহে সুবদনী
সখীদের কাণে কাণে।
হোথায় দেখেছ লজ্জাবতী লতা
লুটায়ে ধরণী পরে,
ঘাড় হেঁট করি কেমন রয়েছে
মরম-সরম ভরে।
দূর হোতে তার দেখিয়া আকার
ভ্রমর যদিবা আসে
সরমে সভয়ে মলিন হইয়া
সোরে যায় এক পাশে !
গুণ গুণ করি যদিবা ভ্রমর
শুধায় প্রেমের কথা—
কাঁপে থর থর, না দেয় উতর,
হেঁট করি থাকে মাথা !
ওই দেখ হোথা রজনীগন্ধা
বিকাশে বিশদ বিভা,
মধুপে ডাকিয়া দিতেছে হাঁকিয়া
ঘাড় নাড়ি নাড়ি কিবা !
চমকিয়া কহে কল্পনা বালা—
দেখিয়া কানন ছবি,
ভুলিয়ে গেলাম যে কাজে আমরা
এসেছি এখানে কবি !
ওই যে মালতী বিরলে বসিয়া
সুবাস দিয়াছে এলি,'

দুইটি নয়ন ভরি,
নয়ন হইতে শিশিরের মত
সলিল পড়িছে ঝরি !
ঘুমায়ে ঘুমায়ে অশোকের যেন
অধর উঠিল কাঁপি !
"মালতী" "মালতী" বলিয়া বালার
হাত-টি ধরিল চাপি !
হরষে ভাসিয়া কহিল মালতী
হেঁট করি আহা মাথা—
"অশোক—অশোক—মালতী তোমার
এই যে রয়েছে হেথা।"
ঘুমের ঘোরেতে পশিল শ্রবণে
"এইযে রোয়েছে হেথা !"
নয়নের জলে ভিজায়ে পলক
অশোক তুলিল মাথা !
একিরে স্বপন ? এখনো একিরে
স্বপন দেখিছ নাকি ?
আবার চাহিল অশোক বালক
আবার মাজিল আঁখি !
অবাক্ হইয়া রহিল বসিয়া
বচন নাহিক সরে—
থাকিয়া থাকিয়া পাগলের মত
কহিল অধীর স্বরে !
"মালতী—মালতী—আমার মালতী"—
মালতী কহিল কাঁদি
"তোমারি মালতী—তোমারি মালতী !"
অশোকে হৃদয়ে বাঁধি !
"ক্ষমা কর মোরে অশোক আমার—
কত না দিয়েছি জ্বালা—
ভাল বাসি বোলে ক্ষমা কর মোরে
আমি যে অবোধ বালা !
তোমার হৃদয় ছাড়িয়া কখন
আর না যাইব চলি,—
দিবস রজনী রহিব হেথায়
বিষাদ ভাবনা ভুলি !
ওহৃদয় ছাড়ি মালতীর আর
কোথায় আরাম আছে ?
তোমারে ছাড়িয়া দুখিনী মালতী
যাবে আর কার কাছে ?"
অশোকের হাতে দিয়া দুটি হাত
কত যে কাঁদিল বালা !
কাঁদিছে দুজনে বসিয়া বিজনে
ভুলিয়া সকল জ্বালা !
উড়িল দুজনে পাশাপাশি হোয়ে
হাত ধরাধরি করি—
সাজিল তখন পৃথিবী জগৎ
হাসিতে আনন ভরি !
গাহিয়া উঠিল হরষে ভ্রমর
নিঝর বহিল হাসি—
দুলিয়া দুলিয়া নাচিল কুসুম
ঢালিয়া সুরভি-রাশি !
ফিরিল আবার অশোকের ভাব
প্রমোদে পূরিল প্রাণ—
এখানে সেখানে বেড়ায় খেলিয়া
হরষে গাহিয়া গান !
অশোকে মালতী মিলিয়া দুজনে
জোনাকের আলো জ্বালি
একই কুসুমে মাথায় বরণ,
মধু দেয় ঢালি ঢালি !
বরষের পরে এল হরষের যামিনী
আবার মিলিল যত কুসুমের কামিনী।
জ্যোছনা পড়িছে ঝরি সুমুখের সরসে—

টল মল ফুল দলে,
ধরি ধরি গলে গলে,
নাচে ফুল বালা দলে,
মালা দুলে উরসে—
তখন সুখের তানে মরমের হরষে
অশোক মনের সাধে গীত-ধারা বরষে।

গান

দেখে যা—দেখে যা---দেখেযালো তোরা
সাধের কাননে মোর
(আমার) সাধের কুসুম উঠেছে ফুটিয়া,
মলয় বহিছে সুরভি লুটিয়া রে—
(সেথা) জ্যোছনা ফুটে
তটিনী ছুটে
প্রমোদে কানন ভোর!
আয় আয় সখি আয় লো হেথা
দুজনে কহিব মনের কথা,
তুলিব কুসুম দুজনে মিলি রে—
(সুখে) গাঁথিব মালা,
গণিব তারা,
করিব রজনী ভোর!
এ কাননে বসি গাহিব গান,
সুখের স্বপনে কাটাব প্রাণ,
খেলিব দুজনে মনেরি খেলা রে—
(প্রাণে) রহিবে মিশি
দিবস নিশি
আধো আধো ঘুম-ঘোর!

ব্রহ্ম-দেশীয় নাটক ও নাটকাভিনয়।

কোন জাতির সাহিত্য আলোচনা করিয়া দেখিলেই সে জাতির সভ্যতার অবস্থা আমরা কিয়ৎ পরিমাণে অবগত হইতে পারি। ব্রহ্মবাসীদিগকে—চলিত-ভাষায় — মগদিগকে আমরা নিতান্ত অসভ্য মনে করি। কিন্তু যে জাতির মধ্যে নাটক ও নাটকাভিনয়ের জ্বলন্ত অনুরাগ বিদ্যমান, সে জাতিকে অসভ্য বলা কতদূর সঙ্গত একবার ভাবিয়া দেখা উচিত।

নাটকাভিনয় ব্রহ্মবাসীদিগের একটি জাতীয় অনুষ্ঠান। ব্রহ্ম-দেশের সমস্ত অধিবাসীর মনের উপর ইহার প্রবল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়; কি ইতর কি ভদ্র, নাটকাভিনয় দর্শন করিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র ও লালায়িত। "পুয়ে" অর্থাৎ নাটকাভিনয় দেখিবার জন্য নাট্যশালায় এত লোকের সমাগম হয় এবং এত অধিক লোকের সমাগম সত্ত্বেও এরূপ নিস্তব্ধভাবে ও সুশৃঙ্খলরূপে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হয় যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। দর্শকেরা অভিনয় দর্শনে একেবারে মুগ্ধ হইয়া যান—কখন বিপন্ন ধার্ম্মিকদিগের দুর্দ্দশায় মমতা প্রকাশ করেন—কখন বা নাটকস্থ হাস্যোদ্দীপক অংশের অভিনয়ে উচ্চ হাস্যে গগনতল বিদীর্ণ করেন।

অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের পরিচ্ছদ অতি সুন্দর ও জমকালো। কিন্তু রঙ্গভূমির স্থান ও আনুষঙ্গিক দৃশ্য প্রভৃতি নিতান্ত সাদাসিধা ও সামান্য। নাট্যগৃহ বাঁস দিয়া নির্ম্মিত ও তাহার ছাদ তৃণ-দ্বারা আচ্ছাদিত কিন্তু অতি উজ্জ্বল বর্ণের রেশম ও অন্যান্য বস্ত্রে মণ্ডিত। গৃহের মধ্য স্থলে অভিনয়-মঞ্চ। অভিনয়-মঞ্চের মধ্য স্থলে একটি বৃক্ষের শাখা রোপিত—ইহা সমস্ত বন-দৃশ্যের স্থলাভিষিক্ত। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই একটি মাত্র বৃক্ষশাখায়, ব্রহ্মবাসী দর্শকদিগের কল্পনা-চক্ষে সমস্ত অরণ্যের চিত্র প্রতিভাত হয়। এই বৃক্ষশাখার চতুর্দ্দিকে দীপাবলী স্থাপিত হয় ও কদলী-মিশ্রিত গুড়ির উপর সরা রাখিয়া—তাহাতে পিট্রোলিয়ম তৈল দিয়া প্রদীপ জ্বালানো হয়। খ্যাত-নামা দর্শকদিগের বসিবার জন্য উচ্চ বংশ-মঞ্চ সকল পার্শ্ব-ভাগে নির্ম্মিত হয়—ও সাধারণ দর্শকগণ চক্রাকারে ঘেঁসা-ঘেঁসি করিয়া ভূমি-তলেই উপবেশন করে। নাট্যশালার পশ্চাদ্ভাগে বাদ্য-স্থান এবং এই বাদ্য-স্থানের পশ্চাৎদিকে অভিনেতৃগণের পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তনের স্থান ও প্রবেশ-প্রস্থানের পথ।

নাটকীয় ঘটনা-বিন্যাস বিষয়ে ব্রহ্ম-দেশীয়দিগের বিভিন্ন নাটকের মধ্যে পরস্পর বিলক্ষণ সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। নাটকীয় পাত্রের মধ্যে—কোন রাজকুমারীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী কোন রাজপুত্র—মহারাজা রাজপুত্রের পিতা—কঠোর সুবিজ্ঞ মন্ত্রিগণ—রাজার বিনীত পারিষদগণ—এবং রাজকুমারীর সখীগণ—এই সকলই প্রতি নাটকে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। নাটকাভিনয়ের মধ্যে মধ্যে রাজ-দরবার—সমারোহে রাজ-যাত্রা ও নৃত্য হইয়া থাকে। রাজকুমারের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় তাঁহার একটি অনুচর থাকে—সে আমাদের বিদূষকের কাজ করে। রাজকুমারীর সখীগণের সহিত তিনি উপস্থিত-মতে যে সকল রসিকতা করেন তাহাতেই দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে মহা হাসি পড়িয়া যায়। ব্রহ্মদেশীয় ভাষার প্রকৃতি এইরূপ যে উহার একটি কথার অর্থ, উচ্চারণের তারতম্যে অনেক বদলিয়া যায়। এই জন্য ঐ ভাষা দ্ব্যর্থ ও শ্লেষাত্মক বাক্য-রচনার পক্ষে অতীব অনুকূল। নাটকের কথাবার্ত্তাগুলি বেশির ভাগ সাধারণ কথোপকথনের ন্যায়—মাঝে মাঝে স্বগত-উক্তি, সমবেত সঙ্গীত ও নৃত্যের যোজনা থাকায়—কথাবার্ত্তার "এক-ঘেয়েত্ব" নষ্ট হয়। কোন কোন নাটকের স্থানে স্থানে এরূপ সরল অকৃত্রিম কবিত্ব আছে ও নাটকের ঘটনা-বিন্যাস অতীব অদ্ভুত ও অলৌকিক হইলেও এবং নাটকীয় পাত্র বিশেষের চরিত্রে অসঙ্গতি-দোষ সত্ত্বেও এরূপ চমৎকার দৃশ্য সকলের সংস্থান আছে যে, ভাল অভিনয় হইলে সভ্যতর দেশের সুশিক্ষিত লোকদিগেরও চিত্ত কিয়ৎপরিমাণে আকৃষ্ট হইতে পারে। তাহার উদাহরণ-স্বরূপ একটি নাটক আমরা নিম্নে অবিকল অনুবাদ করিয়া পাঠকগণের বিচারের উপর নির্ভর করিতেছি।

রজত-গিরি।

(ব্রহ্মদেশীয় নাটক)

*পাত্রগণ।

পাঞ্চালের রাজা।—(পিঙ্গালা)

রাজকুমার সুধনু (থুদানু)— পাঞ্চাল-রাজের পুত্র ও উত্তরাধিকারী।

ধর্ম্মরাজ (দ্রুমরাজা)—অপ্সরা-নগরীস্থ রজত-গিরির রাজা।

মুকুন্দ (মোজলিন্দ)—এক জন শীকারী।

পাবক (পায়ক)—সন্ন্যাসী।

মোহক (মোক)—দৈবজ্ঞ।

আর এক জন সন্ন্যাসী।

মন্ত্রীগণ—রাজকর্ম্মচা[illegible]

[illegible]ারা—দৈত্য (বেলু)

—রক্ষক অনুচর ইত্যাদি।

রাজকুমারী দামিনী (দয়াগিনায়)—ধর্ম্ম-রাজের কন্যা।

ছয় জন রাজকুমারী—দামিনীর ভগিনী।

মালা। (মালা)—পাঞ্চাল-প্রাসাদের পরিচারিকাদিগের প্রধান।

মানিনী (মানিঙ্গয়া) মুকুন্দের স্ত্রী।

কুমারী পরিচারিকাগণ ইত্যাদি।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।—পাঞ্চাল রাজার প্রাসাদের একটি শালা। মন্ত্রিগণ-পরিবৃত রাজা সিংহাসনাসীন—সেই শালার দূরস্থ এক বিভাগে রাজকুমার কাঞ্চন-শয্যায় নিদ্রিত; অনুচর-গণ পাহারা দিতেছে।

রাজা।

সুবিশ্বস্ত মন্ত্রিগণ! বল দেখি সবে—
তোমরাত চিরকাল আনন্দের সাথে
করিয়াছ সেবা মোর—যথা গ্রহ তারা
গগন-প্রাঙ্গন মাঝে উল্লাস-আনন্দে
চন্দ্রমার চারিদিকে বেড়ায় ঘুরিয়া—
এবে বল দেখি সবে, যে অবধি আমি
আছি সিংহাসনে—অসন্তোষ কারে বলে
জেনেছে কি প্রজাগণ ক্ষণ কাল তরে?

মন্ত্রিগণ।

কভু না কভু না প্রভু!

রাজা।

তবে শোন বলি—
পরামর্শ চাই আমি একটি বিষয়ে।
আমাদের নয় শুধু—সমস্ত প্রজার
ভাল মন্দ তদুপরি করিছে নির্ভর।
তোমরা তো জান ভাল সুধনু কুমারে.
জম্বুদ্বীপ*-এক সীমা হ'তে সীমান্তর
যাঁহার সুযশ কীর্ত্তি হয়েছে প্রচার।
বল সবে মন্ত্রিবর, বল গো তোমরা—
আমাদের পুত্র সে যে সূর্য্যসম তেজে—
কেননা এখনি হবে অভিষেক তার?

প্রথম মন্ত্রী।

এ প্রস্তাবে এদাসের পূর্ণ অভিমত।
সুবিখ্যাত সূর্য্য বংশ হ'তে জন্ম যাঁর,

---

*আমাদিগের পাঠকগণের পাঠ-সুখকর করিবার জন্য ব্রহ্মদেশীয় নামগুলি অস্ম-দেশীয় আকারে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে।

* জম্বুদ্বীপ এই কথাটি মূলেও আছে।

মহা মহা গজপতি যাঁর পদে নত,
মহা তেজী অশ্ব যিনি করেন দমন,
মহা মহা ধনু যিনি বাঁকান্ হেলায়,
সর্ব্ব-মহীপতি চেয়ে প্রতাপ যাঁহার,
এমন বীরেরে দিতে সিংহাসন ছাড়ি
বিলম্ব কিসের প্রভু? মহা-সমারোহে
যৌব-রাজ্যে আজি তিনি হোন্ অভিষেক।

[রাজা ও মন্ত্রিগণের প্রস্থান]

রাজকুমার।

(নিদ্রা হ'তে জাগিয়া)

অবসন্ন দেহ মোর হীরক-শয্যায়
আছে বৃথায় শয়ান। জনম বৃথায়
মোর রাজ-গৃহে—হায়! বৃথা রাজ্য-ধন।
দুঃখ-ভারে অবসন্ন—ঐশ্বর্য্য-বিভব
না পারে জুড়াতে মোর হৃদয়-যাতনা।
হ্যারো ওই বাতায়নে প্রিয়তমা মোর
রূপবতী সখী মাঝে আলো করি দিক
আছেন দাঁড়ায়ে—কিন্তু সেযে গো স্বপন!
স্বপ্ন গেছে ছুটি, এবে জাগ্রৎ শূন্যতা
হাসিতেছে আমা-পানে বিদ্রুপের হাসি।
মনে হল—"শুয়ে আমি সোনার শয্যায়,
পাশে আছে প্রিয়া মোর গভীর নিদ্রায়"
(এ পোড়া হৃদয়ে আহা নিদ্রাতেই সুখ)
অস্ত গেলে দিনমণি পঙ্কজ মলিন—
প্রিয়ার বিরহে আমি হয়েছি তদ্রূপ—
অবসন্ন ম্রিয়মান মৃতের সমান।

অনুচর।

কেঁদনা কেঁদনা প্রভু—মুছ অশ্রুজল।
স্বর্গের অপ্সরা যথা কেশ-গুচ্ছ-দাম
ভাল বাসে জড়াইতে পারিজাত দিয়া,
কিন্তু যতক্ষণ আসি বসন্ত-পবন
নাহি করে সে কুসুমে জীবন প্রদান
না পারে তুলিতে তাহা—সেই রূপ প্রভু
সময় হইলে সিদ্ধ হবে মনস্কাম,
হৃদয়ের প্রেম-জ্বালা জুড়াবে আপনি।

(প্রস্থান)

২ দৃশ্য — অরণ্য। (মুকুন্দের প্রবেশ)

মুকুন্দ।

ওরে আমার প্যাঁচা-মুখী, খ্যাঁদা-নাকি, শুয়োর-চখি, থ্যাবড়া-ঠোঁটি প্রাণ প্রিয়সী! ওঠ্—আমাকে কি কিছু খেতে টেতে দিবি? আমি পাহাড়ে শীকার কত্তে যাচ্চি, লক্ষ্মী আমার শীগ্‌গির ওঠো।

মানিনী।

হতভাগা আপ্ত-গর্জে মিন্‌সে কোথাকারে! কিসের জন্যে এত তাড়াতাড়ি? দেখ্‌চিস্‌নে আমি শীতে থর্‌থর্ ক'রে কাঁপ্‌চি, গায়ে একটা ছেঁড়া ন্যাকড়া, এতে কি শীত আট্‌কায়? আবার তাতে এই দুপুর রাত্তির, ব্যাপার খানা কি বল্ দিকি? আর আমি তোর জ্বালা সইতে পারি নে। যত দিন না তুই ভাল ব্যাভার শিখ্‌বি, নাথিয়ে নাথিয়ে তোর দফা নিকেস্ কর্‌ব, হতভাগা মিন্‌সে কোথাকারে! এই নে এক ঘটি জল, আর এই নে এক কুন্‌কে চাল, এখন এই নিয়ে জঙ্গলে দৌড়ো, যদি আজকের খাবার মত কিছু শীকার করে না আন্‌তে পারিস্ তো টের্‌টা পাবি, গালাগালি দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেব।

(প্রস্থান)

মুকুন্দ।

দেখ্‌রে সবাই, চলে মুকুন্দ শীকারী
রূপবতী প্রিয়সীর কোমল আজ্ঞায়
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি অরণ্যের মাঝে।
আসুক সহস্র শত্রু নাহি করি ভয়।

(সমবেত বাদ্যকারীগণের প্রতি)

যথা ঘোর ইরম্মদ গগন বিদারি
ভূকম্পে কাঁপায় সব পৃথিবী জলধি
সেইরূপ বজ্ররবে বাজা তূরি-ভেরী!

(ঘোর বাদ্য— মুকুন্দের প্রস্থান—কিঞ্চিৎ পরে পুনঃপ্রবেশ—কোমল বাদ্য।)

মুকুন্দ।

কি সুখ ভ্রমিতে হেন ছায়াময় বনে!
তারা সম জুঁই যথা সুরভি নিশ্বসে,
মলয়-সমীর বহে মাতিয়া চৌদিকে,
ইন্দ্রধনু রঙ্গে আঁকা বিহঙ্গ-মিথুন
উড়ি উড়ি বসে কিবা এ শাখে ও শাখে—
বিশ্রাম করি না কেন হেথা ক্ষণকাল।

(চমকিয়া)

ওকি! ব্যাঘ্র-গরজন অদূর পাহাড়ে!
আহাহা মানিনি তুই আছিস্ একাকী,
হৃদয় ব্যাকুল হয় ভাবি যবে তোরে।
হিংস্রজন্তু মুখ হতে রক্ষা পাইবারে
চলিতে হইবে মোরে আরো কিছু পথ।

(পদ্মসরোবরে পৌঁছিয়া)

একি! একি! কি সুন্দর মনোহর স্থান!
নিশ্চয় হইবে কোন ইন্দ্রজাল-ভূমি।
সুন্দর সরসী-ধারে জীব জন্তু কত
তৃষ্ণা নিবারিতে আসে—পদ-চিহ্ন তাই।
জুঁথি জাতি পঙ্কজিনী অসংখ্য ফুলের
মিশ্রিত সুরভি-ভার বহিছে মলয়—
জুড়াইছে আহা কিবা ঘর্ম্মাক্ত শরীর!
শুক-পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চক্রাকারে—
মানিকের চক্র যেন ঘুরিছে গগনে।
নানাজাতি পাখি কিবা গাইতেছে গান,
জুড়াইয়া যাইতেছে হৃদি মন প্রাণ।
ইচ্ছা করে মানিনি রে! থাকিতিস হেথা
আমাসনে ভুঞ্জিতিস স্বরগীয় সুখ
এ স্বচ্ছ সরসী-তীরে—যাহার সলিলে
শত শত হিরা জ্বলে ভানুর কিরণে,
পঙ্কজ-মুকুল ভাসে যাহার উরসে
শুভ্র, নীল—যেন কত মুকুতা মানিক।
প্রসারিত বট-বৃক্ষ-শীতল ছায়ায়
শুইয়া আহ্বানি এবে কোমল নিদ্রায়।

(নিদ্রা)

৩ দৃশ্য — অপ্সর-ভূমি কিম্বা রজত-গিরি-দেশ।

রঙ্গভূমির একপার্শ্বে রাজা ধর্ম্মরাজ
এবং অপর পার্শ্বে তাঁহার
৭ কন্যা।

প্রথম রাজকুমারী।

চির-সহচরি সবে প্রাণের ভগিনী!
ভুঞ্জিতেছি এক সাথে শান্তি-সুখ মোরা
অপ্সর নগরে; এবে এসেছে সময়
উতরিয়া মর্ত্তাধামে—যথা চির-রীতি—
পঙ্কজ-সরসী-মাঝে, পদ্মে দিয়া লাজ,
খেলিব মনের সুখে; আয় ভাই তোরা
পিতৃ-রাজ অনুমতি লই এই বেলা।

দ্বিতীয় রাজকুমারী।

অনুপমা রূপবতী ভগিনি আমার!
লও গিয়া অনুমতি রাজার নিকট,

আমরা সবাই বোন ভাল বাসি তোমা
প্রাণের সমান—চল হব অনুগামী।

(সকলে রাজার নিকট গমন।)

প্রথম রাজকুমারী।

পিতৃ-দেব! মহারাজ! বংশের তিলক!
অপ্সর প্রদেশ-স্বামী, মহা-ধনুর্ধর!
সুমেরু অচল-সম অটল-শকতি!
—কন্যাগণ তব পদে করিছে প্রণতি।
দাও অনুমতি পিতঃ যাব মর্ত্ত্য-ধামে,
পঙ্কজ-সরসী-তীরে উপবন-ছায়ে
খেলিব মনের সুখে; ক্লান্ত হলে দেহ
জুড়াইব গিয়া সেই সরসী-সলিলে।

রাজা।

ইচ্ছা হয় যাও সবে প্রাণের প্রতিমা।
কিন্তু মনে থাকে যেন, মর্ত্ত্য সেই দেশে
মলিন মানবগণ করয়ে বসতি।
শান্তি-সুখ নাহি তথা হেথাকার ন্যায়,
বিপদ হইতে তিল নাহিক নিষ্কৃতি।
দেখো সাবধান! প্রতি পদ বিবেচিয়া
দেব-বুদ্ধিবলে তবে করিবেক কাজ।
শিরোধার্য্য করি এই উপদেশ মোর
যাও সবে, কিন্তু এস শীঘ্র দেশে ফিরি।

প্রথম রাজকুমারী।

অনুমতি দিলে পিতঃ—প্রণমি তোমায়।
লঘু গতি সবে মোরা বিলম্ব না জানি,
ত্বরায় আসিব ফিরি শ্রীচরণ-তলে।

(প্রস্থান।)

৪ দৃশ্য।—পদ্ম-সরোবর।

(বট-বৃক্ষতলে মুকুন্দ নিদ্রিত ও

৭ রাজকুমারীর প্রবেশ)

প্রথম রাজকুমারী।

সুরম্য সরসী ওরে! কোমল সুন্দর
কত ভাব জাগে হৃদে হেরি তোর জল,
আনন্দের উৎস তুই—স্ফটিক-দর্পন!
এই যে বহিছে বায় মৃদুমন্দ-গতি—
সুরভি ফুলেরি উহা আকুল নিঃশ্বাস।
কোন্ বিধি বল্ দেখি সৃজিল রে তোরে?

(ভগিনীগণের প্রতি)

আয় বোন খুলে ফেলি' রত্ন অলঙ্কার,
হীরকের কর্ণদুল মণি-মুক্তা-হার,
খেলি সবে মনসুখে এই সরোবরে।
অর্দ্ধ অঙ্গ ঢাকা রবে স্ফটিক তরঙ্গে—
রজত নীরদে যেন চপলা খেলিবে।

(অপ্সরাগণের অবগাহন ও মুকুন্দের জাগরণ।)

মুকুন্দ।

শুভ লগ্নে সুনিশ্চিত জনম আমার!
নারী-রত্ন মহারত্ন কথায় যে বলে
মর্ম্ম তার বুঝিলাম এত দিন পরে।
সামান্য মানবী নহে, দেবকন্যা এযে!
কর্ণ-দুল কণ্ঠ হার কিবা ধরে শোভা,
প্রভাত-শিশির সম জ্বলিছে মুকুতা!
সমস্ত গগনে যাঁর রজত-মহিমা—
এমন চন্দ্রমা সেও হোথা পায় লাজ।
অসাড় হতেছে দেহ, ইন্দ্রিয় অবশ,
এ দৃশ্য মানবে কভু পারে গো সহিতে?

(অচেতন হইয়া ভূমে পতন ক্রমে চেতন লাভ)

সৌন্দর্য্য-আদর্শ ওয়ে—নাহিক উপমা—
হাসিয়া উড়ায় যেন চিত্রকর-তূলি।
পারি যদি ধরিবারে একটি সুন্দরী,
রাজপুত্রে ভেট দেই এই দণ্ডে আমি।
পুরস্কার কত পাব—নাহি তার শেষ,
দারিদ্র্য-ঘুচিবে মোর চিরকাল-তরে।
হয়েছে! পাবক নামে পবিত্র গোসাঁই
করেন বসতি এই সরোবর ধারে—
তাঁর কাছে আছে এক সম্মোহন-ফাঁসি,
ধরা পড়িবেক তাহে ত্রিদিবের পাখি।
এই ব্যালা যাই তবে—বিলম্বে কি কাজ?

(প্রস্থান)

৫ দৃশ্য—পদ্মসরোবর-তীরস্থ বনে সন্ন্যাসীর আশ্রম।

(সন্ন্যাসী পাবক এবং মুকুন্দের প্রবেশ)

পাবক।

যে জন্য এসেছ বাছা জানি আমি সব,
একটি উপায় আছে ও কার্য্য সাধিতে।
দৈত্য-রাজ দেয় মোরে সম্মোহন ফাঁসি,
কমণ্ডলু ভিতরে তা আছে অনাদরে।
তাহে মোর নাহি কাজ—অস্পৃশ্য আমার,
ইচ্ছা হয় লয়ে তুমি—সাধ তব কাজ।

মুকুন্দ।

বড় দয়া তব—লও কৃতজ্ঞ-প্রণাম।

(সম্মোহন ফাঁসি লইয়া প্রস্থান)

৬ দৃশ্য—পদ্ম-সরোবর।

(অপ্সরাদিগের জল-ক্রীড়া—মুকুন্দের প্রবেশ ও সম্মোহন ফাঁসি নিক্ষেপ করিয়া রাজকুমারী দামিনীকে ধৃত করন—অবশিষ্ট ৬ অপ্সরা উড্ডীয়মান হইয়া অপ্সর-দেশে পলায়ন।)

দামিনী।

কি বিপদ ভাগ্যে মোর হ'ল অকস্মাৎ!
রক্ষা কর রক্ষা কর—কোথা গেলে বোন?
এ দারুণ কষ্ট হতে মুক্ত কর মোরে।
বৃথা এবে যুঝ যুঝি—সর্ব্ব অঙ্গ হ'ল
পাষান-প্রতিমা সম কঠিন অবশ!
কোথা গেলি রক্ষা কর—এই বেলা আয়—
নহিলে মরিল তব প্রাণের ভগিনী!

মুকুন্দ।

বৃথা বাক্য ছেড়ে দাও অপ্সর-ঈশ্বরী,
ও কথা কি সাজে তব চারু ওষ্ঠাধরে?
বিপদ ভাবিছ যারে নহে তো বিপদ—
বরঞ্চ সে পূর্ব্বজন্ম-সুকৃতির ফল।
এ দেশের রাজা যিনি মহা-পরাক্রম,
যাঁর পরে অদৃষ্টেরো নাহিক প্রভাব,
শত শত মহীপতি যাঁর পদে নত,
সে রাজার আছে এক পুত্র গুণবান।
অভাবের মধ্যে শুধু একটি অভাব—
স্ত্রীরত্ন চাইকো তাঁর নাশিতে আঁধার।
মোহন ফাঁসিতে তাই ধরেছি তোমায়
করিতে তাঁহার সেই সিংহাসন-ভাগী।

দামিনী।

শোন মোর কথা ওগো দয়ালু শীকারী!
অপ্সর দেশের রাজা—রজ-গিরি-স্বামী—
তাঁর কন্যা আমি হই জাতিতে অপ্সরা,
তুমি মোরে বল দেখি, তোমারেই মানি,
কেমনে অপ্সরা হয়ে মানবেরে ভজি?

অতএব ছাড় মোরে করি অনুনয়,
ঘৃণিত বিবাহে জেদ্ কোরো না গো তুমি।

মুকুন্দ।

সুন্দরী অপ্সরা-রাণী কেন দুঃখ কর,
অদৃষ্ট প্রসন্ন তব—সুকৃতির ফল।
এমন প্রবল রাজা বিক্রমে কেশরী
হৃদয়ে বিভবে তাঁর হবে অধিকারী।
এস এস সুন্দরি গো হও অনুগামী,
ভবিষ্য-পতির গৃহে চলহ এখনি।

(দামিনীকে লইয়া
মুকুন্দের প্রস্থান)

৭ দৃশ্য—পাঞ্চাল রাজার প্রাসাদ-শালা।

(রাজকুমার ও মুকুন্দের প্রবেশ)

মুকুন্দ।

মহান্ রাজকুমার! যাঁহার মহিমা
শত শত নৃপতিরে করে অতিক্রম,
যাঁর পদতলে তারা সদা নতশির,
অনুপম অতুলন ধরে যাঁর রূপ
নয়ন-রঞ্জন সর্ব্ব কুসুমের গুণ!—
করহ শ্রবণ—আমি ভ্রমিতে ভ্রমিতে
এক অরণ্যের মাঝে, দিব্য রম্য স্থান—
হরিণ হরিণী যথা চরে অবিরাম—
আইলাম অকস্মাৎ পদ্ম-সরোবরে।
হেরিলাম সাত দেবী অতুল রূপসী
পক্ষি ঝাঁক সম উড়ি নাবিল সে তীরে।
উহার একটি, ধ'রে এনেছি গো জালে,
দুর্লভ সে উপহার সঁপিব ও পদে।
দামিনী দেবীরে প্রভু লও দয়া করি,
অপ্সর-রতন তিনি অতুল রূপসী,
তপত কাঞ্চন সম নির্ম্মল নির্দ্দোষী।

রাজকুমার।

সুযোগ্য মুকুন্দরাম! আন ত্বরা করি
তব চারু উপহার মম সন্নিধানে।

(মুকুন্দের প্রস্থান
ও দামিনীকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

রাজকুমার।

হা! কি হেরি এ নয়নে! ও মুখ নেহারি
নয়ন-রঞ্জন শশি, লাজে অধোমুখে
মেঘ-ঘোমটার মাঝে লুকাবে এখনি!
রচে যারে শিল্পী কত সুন্দর আকারে—
হেন কাঞ্চনেরো কান্তি হোথা হার মানে।
পদ্ম-সম পবিত্র বা প্রভাত-শিশির!
কিবা আহা গণ্ডস্থল অতি সুকোমল—
প্রজাপতি-পক্ষে যেন সুকুমার রেণু।
মুখে কি সুরভি শ্বাস! মরি কি সুন্দর
এলায়ে পড়েছে কেশ যামিনী-বরণ।
কণ্ঠ-স্বরে আহা কিবা সঙ্গীত উথলে,
মধুর লাবণ্য ক্ষরে প্রত্যেক গতিতে!
উনিই আমার যোগ্য হৃদয়-ঈশ্বরী
ওঁরেই করিব আমি অর্দ্ধ অঙ্গ-ভাগী।

পাত্রমিত্রগণ।

সত্য বটে হেন রূপ দেখি নাই কভু,
গুণেতেও অতুলনা হেন মনে লয়।

রাজকুমার।

মোহিনি ললনে ওগো অপ্সর-কুমারি!
পঙ্কজ-মুকুল সম ও তব কপোলে
লজ্জার রক্তিম রাগ—ঈষৎ বিকাশে!
পূর্ব্ব জন্মে পুণ্য যাহা করেছি সঞ্চয়

তাহারি সুফল এই কহিনু তোমারে।
তাহারি কারণে দুই বিভিন্ন অদৃষ্ট
এক সূত্রে, এক গ্রন্থে, হতেছে বন্ধন।
এখনও বিমুক্ত আমি—দাও অভিমতি—
যখন বসিব ওগো পিতৃ-সিংহাসনে
তুমিও বসিবে তাহে হয়ে রাজ-রাণী।

দামিনী।

কি ক'রে হইবে তাহা রাজপুত্র ওগো!
জাতিতে পৃথক মোরা—দূর দেশবাসী,
আকাশ পাতাল ভেদ আমা-তোমা-সনে।
অপ্সর প্রদেশে জন্ম, জাতিতে অপ্সরা,
রজ-গিরি-রাজা যিনি তাঁহারি দুহিতা।
কেমনে মিলিব বল মর্ত্ত্য রাজা সনে,
অধঃপাত হবে, মান খোয়াব তাহলে।
অতএব রাজপুত্র করি অনুনয়
দাও ছেড়ে যাই চলে পিতার আলয়।

রাজকুমার।

তা হবে না তা হবে না হৃদয়-রতন!
পৃথিবীতে আছে যত সুন্দর সামগ্রী
তা সবার তুমি যে গো অমূল্য সমষ্টি।
জীবন যায় বা যদি তাহাও স্বীকার,
তোমা সম রত্ন তবু ছাড়িব না-কভু।
করিও না পরিতাপ প্রাণ প্রিয়তমা
হৃদয়ে রাখিতে তোমা নিতান্ত বাসনা।

(হস্তগ্রহণ)

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

(প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্য কালে দামিনীর সহিত রাজকুমারের বিবাহ—দামিনী গর্ভবতী ও শত্রু-সৈন্য কর্ত্তৃক পাঞ্চাল দেশ আক্রমণ।)

ক্রমশঃ।

ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

পারিস্ নগর-প্রবাসী কোন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনশীল শ্রেষ্ঠ কুলোদ্ভব হিন্দু যুবক সম্প্রতি আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি মহাশয়কে যে এক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন ও সেই পত্র-সম্বলিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ভারতবর্ষীয়দিগের দ্বারা তৎ-লাভের বিধিবদ্ধ উপায় বিষয়ে ইংরাজি ভাষায় যে একটি যুক্তিগর্ভ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা গত আশ্বিন মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকটিত হইয়াছে। এই* প্রবন্ধটি শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেরই মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা অতি উপাদেয় ও সময়ের উপযোগী।

তিনি বলেন "ইহা অতি সুখের বিষয় যে শিক্ষিত ভারতবর্ষীয়দিগের মনে আজ কাল একটি স্বাধীনতার ভাব উদ্বোধিত হইতেছে এবং এই স্বাধীনতার ভাব আমরা ইংরাজদিগের নিকট হইতেই শিক্ষা পাইয়াছি। ইংলণ্ডের সংশ্রবে যদি আমরা আর কোনও উপকার না পাইয়া থাকি অন্তত এই উপকারটি আমাদের সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই যে

* শীঘ্রই ইহা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইবে।

জাতীয় স্বাধীনতার ভাব ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইতেছে, ইহাতে আমাদের যতই আহ্লাদ হউক না কেন—আমাদের আর একটি দিক আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। যে সকল নিয়ম পালন না করিলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা যায় না, সেই সকল নিয়ম পালন পক্ষে কত দূর চেষ্টা হইতেছে? এখন তো কেবল স্বাধীনতা বিষয়ে সভায় মহা আড়ম্বরে বক্তৃতা হইতেছে—সংবাদ-পত্রে অনর্গল লেখা চলিতেছে এবং কবিতা নাটকের ছড়াছড়ি হইতেছে—কিন্তু কাজে কি হইতেছে? আমাদিগের স্বদেশ-বৎসলদিগের দেশানুরাগ কি শুদ্ধ বাক্যেই বদ্ধ থাকিবে? বক্তৃতা কবিতা প্রভৃতির উপকারিতা আছে বটে কিন্তু উহাই কি যথেষ্ট?—উহার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য চাই। যে সকল কার্য্যগত উপায়ে স্বাধীনতা লাভ হইতে পারে, তাহা অবলম্বন করা আবশ্যক। স্বাধীনতা লাভের যে সকল নির্দ্দিষ্ট অকাট্য নিয়ম আছে অগ্রে তাহার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।" অবিকল অনুবাদ না করিয়া আমরা তাঁহার প্রবন্ধের প্রথমাংশের স্থূল মর্ম্ম ব্যক্ত করিলাম। এবং এ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত আমাদের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। কিন্তু তার পরেই তিনি এই মর্ম্মে বলিতেছেন যে "জোর যার মুলুক তার" কিম্বা "বল যার অধিকার তার" এই নিয়মটি উদ্ভিদ্ জগতে, জীব জগতে, এমন কি সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে কার্য্য করিতেছে। বলবান দুর্ব্বলের স্থান অধিকার করিবেই করিবে। ডার্‌উইনের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়মই এই। এই নিয়মটি যেমন প্রকৃতির মধ্যে, তেমনি মনুষ্য সমাজে বিলক্ষণ খাটে। ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য-স্থল। যাঁহার বল আছে তাঁহারই অধিকারের কথা মুখে আনিবার অধিকার আছে। "Only he dares speak of right or rights who has might, exclaims she in her Book of Revelations which we term History." প্রকৃতি-জননী অথবা ইতিহাসের এই শাসন-বাক্য যিনি লঙ্ঘন করিতে সাহসী হন তিনি তাহার ফল-ভোগ করেন—অবাধ্য শিশুর ন্যায় বেত খাইয়া আবার সিধা পথে, ফিরিয়া আইসেন।" কিন্তু আমরা লেখক মহাশয়ের এই মতের সহিত সম্পূর্ণরূপে সায় দিতে পারি না। "জোর যার মুলুক তার"—এই নিয়ম উদ্ভিদ্‌জগতে, পশু জগতে এবং পশুবৎ অপূর্ণ পূর্ব্বতন মানব-সমাজে খাটিতে পারে কিন্তু সভ্য সুপ্রতিষ্ঠ মনুষ্য-সমাজে এ নিয়ম শোভা পায় না। এই নিয়মের নেতৃত্ব ও ঔচিত্য স্বীকার করিলে সভ্য-সমাজের একেবারে ভিত্তিমূলে আঘাত করা হয়। এই নিয়মানুসারে সম্পূর্ণরূপে চলিতে গেলে অরাজকতা বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়া সমাজ-বন্ধন একেবারে ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া যায়। এ নিয়মকে প্রশ্রয় দিলে চৌর্য্য দস্যুতা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অত্যাচারকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এক জন বলবান দস্যু এক জন দুর্ব্বলের ধন বলপূর্ব্বক অপহরণ করিলে সেই ধনে কি ঐ দস্যুর অধিকার জন্মে? "বল যার অধিকার

তার" এই নীতি-সূত্রটি মানিতে গেলে ঐ দস্যুর অপহৃত ধনে অধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি ইহা স্বীকার করিবেন? সেই রূপ যদি কোন বলবান জাতি কোন দুর্ব্বল জাতির দেশ কাড়িয়া লয়, তাহা হইলে সেই জাতি কি দস্যুতা অপরাধে অপরাধী নহে? এক জন সামান্য দস্যুর সহিত তাহার প্রভেদ কি?—সংখ্যায় অধিক এই মাত্র। ব্যক্তিগত সম্পত্তি-অধিকারের যে মূল-নিয়ম, জাতি-গত সম্পত্তি-অধিকারেরও যে সেই একই মূল-নিয়ম তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে দেশের যে অধিবাসী, সেই দেশ সেই অধিবাসীদিগের স্বাভাবিক ন্যায্য সম্পত্তি! এই রূপ যদি দেশ-অধিকারের ন্যায়-সঙ্গত একটি স্বাভাবিক নির্দ্দিষ্ট সীমা না থাকে, বলই যদি অধিকারের নিয়ম হয়—তাহা হইলে পৃথিবীতে যুদ্ধ-বিগ্রহের আর অবধি থাকে না। যুদ্ধানল চিরকালই প্রজ্জ্বলিত থাকে—"সভ্যতা" বলিয়া একটি শব্দ আর মানব-ইতিহাসে কুত্রাপি স্থান পায় না।

মানব সমাজের সভ্যতা বা উন্নতির ইতিহাসকে তিনটি কালে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

প্রথম।—সংগ্রাম্-প্রধান কাল।
দ্বিতীয়।—স্বার্থ-প্রধান কাল।
তৃতীয়।—ন্যায়-ধর্ম্ম-প্রধান কাল।

আর এক কথায়——

প্রথম।—তামসিক কাল।
দ্বিতীয়।—রাজসিক কাল।

তৃতীয়।—সাত্ত্বিক কাল।

সাঙ্গ্রামিক কালের বহু পূর্ব্বের যে কাল, সে কাল মনুষ্য-সমাজের ইতিহাসে ধর্ত্তব্যই নহে—যেহেতু সে সময়ে মনুষ্যের সমাজ-বন্ধন আদৌ হয় নাই। যখনি রীতিমত যুদ্ধ বিগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে, তখনই বুঝা যাইতেছে মনুষ্যদিগের মধ্যে একটি সম্মিলনের ভাব উৎপন্ন হইয়াছে, কারণ বিনা সম্মিলনে বৃহৎ যুদ্ধ ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারে না এবং যখনি মনুষ্যের মধ্যে পরস্পর সম্মিলন আরম্ভ হইয়াছে, তখনই বলিতে হইবে সমাজ বন্ধন-কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। সাঙ্গ্রামিক কালে, কোন কোন জাতির মধ্যে কোন কোন বলবান পুরুষ উত্থিত হইয়া কতক সংখ্যক লোককে আপনার কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিয়া শুদ্ধ আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিবার জন্যই, কিম্বা কোন নীচ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই, অন্য জাতির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত, তখন প্রধানতঃ শারীরিক বলেরই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। এই যুদ্ধ-বিগ্রহে সে সময়ে মনুষ্য-সমাজের অনেক উপকার সাধিত হইয়াছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহ দ্বারা মানব-সমাজের বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে প্রথম সংমিশ্র আরম্ভ হইল, বলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বলের বৃদ্ধি হইল, পরস্পরের ভাল পরস্পর অনুকরণ করিতে লাগিল, জেতৃজাতি বিজিত জাতির নিকট কতকটা উপকার লাভ করিল, এবং বিজিত জাতিও জেতৃ-জাতির নিকট অনেক বিষয়ে উপকৃত হইল। সংগ্রামের অনেক অশুভ ফল সত্ত্বেও সকল কালেই বিশেষতঃ অসভ্যকালে

ইহারও যে বিশিষ্ট উপকারিতা আছে তাহা কেনা স্বীকার করিবে। এই যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতেই বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে সম্মিলন আরম্ভ হয়, বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়, জাতীয় স্বার্থভাবের প্রথম সঞ্চার হয় এবং এইরূপে জন-সমাজ সভ্যতার দ্বিতীয় সোপানে উত্থিত হয়।

সভ্যতার এই দ্বিতীয় কাল, জাতীয় স্বার্থের কাল। সাংগ্রামিক কালের লোকে যে রূপ প্রধানতঃ নীচ প্রবৃত্তির অধীন হইয়াই অন্য জাতির সহিত সংগ্রাম করে, যুদ্ধের জন্যই যুদ্ধ করে, রক্তের পিপাসু হইয়াই রক্তপাত করে, একালের লোক সেরূপ করে না। একালে যুদ্ধ-বিগ্রহ উচ্চতর স্বার্থের অধীন। স্বজাতীয় ধন লাভের পন্থা করিবার জন্য, বাণিজ্যের সুবিধা করিবার জন্য, এক কথায় উচ্চতর স্বার্থের জন্য যদি যুদ্ধ-বিগ্রহ আবশ্যক হয়, তবেই এই কালের লোক যুদ্ধ বিগ্রহে প্রবৃত্ত হয়।

ক্রমে পৃথিবীতে যত জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি হয় ততই ব্যক্তিগত নীচ প্রবৃত্তি সকল মন্দীভূত হয়, জাতিগত অতিরিক্ত স্বার্থপরতার হ্রাস হয়, তখন এক জাতির স্বার্থ অপর জাতির স্বার্থের সহিত বিরোধী হয় না, প্রত্যুত সকল জাতির এক স্বার্থ হইয়া উঠে, তখন ন্যায় ধর্ম্ম মঙ্গলের অখণ্ড রাজত্ব পৃথিবীতে স্থাপিত হয়, তখন আর শারীরিক বলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে না, তখন পৃথিবীর সকল জাতিই পরস্পরের সহিত সৌহার্দ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পৃথিবীতে নির্ভয়ে সুখে সঞ্চরণ করে। কিন্তু এই ন্যায়-ধর্ম্ম-প্রধান কাল, এই সাত্ত্বিক কাল, এই সত্যকাল, এই স্বর্গীয় কাল, পৃথিবীতে সম্পূর্ণরূপে আবির্ভূত হইতে এখনও বহু বিলম্ব আছে। এত বিলম্ব যে, সে এখন আমাদের কল্পনাতেও আইসে না। কিন্তু সমস্ত মানব-সমাজের গতি যে ঐ দিকে, তাহার নিদর্শন এখন হইতেই পাওয়া যাইতেছে।

সমগ্র পৃথিবী যত দিন না সভ্যতার এক সমভূমিতে দণ্ডায়মান হইবে ততক্ষণ এই ন্যায় ধর্ম্মের কাল পৃথিবীতে সম্পূর্ণরূপে আবির্ভূত হইবে না। পৃথিবীর একাংশে যদি এই জ্ঞান ধর্ম্মকাল আবির্ভূত হয়, আর অন্যভাগে যদি সাংগ্রামিক কাল কিম্বা স্বার্থ-কাল বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে যে অংশে জ্ঞান ধর্ম্ম কালের আবির্ভাব হইয়াছে সে কাল সেখানে কখন বহুদিন স্থায়ী হইতে পারে না। পূর্ব্বতন ভারতবর্ষ তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। পূর্ব্বতন ভারতবর্ষে ধর্ম্ম-মূলক সভ্যতার প্রথম আভাস প্রকাশ পাইয়াছিল। তৎকালীন হিন্দুগণ এই সার বুঝিয়াছিলেন যে "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ"। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন ন্যায়-ধর্ম্মের বর্ম্মে তাঁহারা সুরক্ষিত আছেন, বিদেশীয় লোক আসিয়া যে তাঁহাদিগের দেশ আবার আক্রমণ করিবে, এ কথা তাঁহাদের মনে আদৌ উদয় হয় নাই, তাঁহারা দিব্য নিশ্চিন্ত ছিলেন—পার্থিব বিষয়ে বড় মনোযোগ দিতেন না—পারমার্থিক বিষয় লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন! বিদেশীয় আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে রীতিমত

প্রস্তুত ছিলেন না—সুতরাং তাঁহারা বিদেশীয়দিগের হস্তে সহজে পরাভূত হইলেন। এই আক্রমণের ফল এই হইল—বৈদেশিকেরা সুসভ্য হিন্দুদিগের সংশ্রবে সভ্যতা-সোপানের এক ধাপ উপরে উত্থিত হইল—এবং সুসভ্য হিন্দুগণের সভ্যতা ও উন্নতি বৈদেশিকদিগের অত্যাচারে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

সভ্যতার ইতিহাস-পাঠে এই একটি বিষয় শিক্ষা পাওয়া যায় যে, পৃথিবীর কোন অংশের কোন জাতি পৃথিবীর অন্যান্য জাতিদিগকে বহু পশ্চাতে রাখিয়া—আপনি একাকী অত্যন্ত দ্রুতগতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না—তাদৃশ দ্রুতগতি অগ্রসর হইতে গেলেই আবার পতন হয়। সমগ্র পৃথিবীকে সভ্যতার সমভূমিতে আনয়ন করিবার জন্য প্রকৃতি-দেবীর নিয়ত চেষ্টা। গ্রীকেরা যখন সভ্যতার চূড়ান্ত সীমায় উত্থিত হয়—রোমকেরা আসিয়া তাহাদিগের দেশ জয় করে—এবং গ্রীকদিগের সংশ্রবে রোমকদিগের সভ্যতা বৃদ্ধি হয়; আবার যখন রোমকেরা সভ্যতার চূড়ান্ত সীমায় উত্থিত হয়—গথ্ ভাণ্ডাল প্রভৃতি উত্তর প্রদেশীয় জাতিগণ তাহাদিগকে জয় করে—এবং বিজিত রোমকদিগের সংশ্রবে তাহারা আবার সভ্যতা-পথের পথিক হয়। এইরূপ পৃথিবীর ইতিহাসে এক দিকে পতন, আর এক দিকে অভ্যুদয়, এক দিকে অবনতি আর এক দিকে উন্নতি নিয়ত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন পাত্রে জল রাখিয়া অগ্নিতে জ্বাল দিলে যেমন পাত্রস্থ নিম্ন তলের জল-রাশি কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইলে উপরি ভাগে উত্থিত হয়—তাহার স্থান আবার অব্যবহিত উপরিস্থ অপেক্ষাকৃত শীতল জল-স্তবক আসিয়া অধিকার করে—এইরূপ প্রক্রিয়ায় ক্রমে ক্রমে সমস্ত জল-রাশির উষ্ণতা সমান হইয়া পড়ে—সেই রূপ সভ্যতা ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর সর্ব্বাংশে সমানরূপে বিস্তৃত হইবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছে।

"বল যার অধিকার তার" এই নীতি-সূত্রটির বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। যদিও ইদানিন্তন ইউরোপে এই নিয়মটি পূর্ব্বতন সাংগ্রামিক কালের ন্যায় প্রবল নহে, তথাপি এই নিয়মটির কার্য্য এখনও সেখানে বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। এখন শুদ্ধ যুদ্ধের জন্যই যুদ্ধ হয় না, জাতীয় স্বার্থের উদ্দীপনায় যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত হয়। ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়ন এক বার এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, ইউরোপের সকল রাজ্যের নির্দ্দিষ্ট সৈন্যদলের (Standing army) সংখ্যার লাঘব করা হউক, কিন্তু তাহাতে কেহই সম্মত হয়েন নাই, এবং তাহার অব্যবহিত পরেই ফরাসিস্ জর্ম্মাণ যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। অতএব দেখা যাইতেছে 'বল যার অধিকার তার' এই নিয়ম এখনও মনুষ্য-সমাজ হইতে তিরোহিত হয় নাই।

কিন্তু লেখক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের স্থানে স্থানে এই নিয়মটি সম্বন্ধে যেরূপ ভাবে লিখিয়াছেন তাহাতে হঠাৎ এইরূপ প্রতীতি

হয় যেন তিনি ঐ নিয়মটির উৎকৃষ্টতা ও চিরস্থায়িতা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি এক স্থলে বলিয়াছেন।

* * * * "In these Nature once more asserts her eternal law—once more gives the Hero who reigns not by the so-called right of conventional inheritance but of Might which alone gives you the right!"

* * * * *

"And look how the nation blooms and flourishes once more under the sway of its just rightful king, because chosen by Nature on account of his acknowledged might and there-fore his inviolable right to rule."

আমরা এই বলাধিকারের নিয়মকে উৎকৃষ্ট নিয়ম বলিতে পারি না—এই নিয়মানুসারে চলিতে কাহাকে উপদেশ দিতে পারি না। মানব-সমাজের অপূর্ণতা হেতুই এই নিয়মটির অস্তিত্ব—ইহাকে আমরা কখন অনন্ত-কালের (Eternal Law) নিয়ম বলিতে পারি না। ন্যায়ের নিয়মই অনন্ত কালের নিয়ম। বলাধিকার-নিয়মের উৎকৃষ্টতা স্বীকার করিলে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—যুদ্ধ বিগ্রহের আর অবধি থাকে না—সুতরাং সভ্যতার গতি একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায়। বলই যদি অধিকারের নিয়ম হয়, তাহা হইলে কোন রাজ্যেরই শাসন-কার্য্য স্থায়ী পত্তন ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। দণ্ডে দণ্ডে রাজ-শাসনের পরিবর্ত্তন হয়। আজ এক রাজা এক রাজাকে বলপূর্ব্বক সিংহাসনচ্যুত করিল—কল্য আর এক জন প্রবলতর রাজা আসিয়া বলপূর্ব্বক তাহার স্থান আবার অধিকার করিল—প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করিয়া আছে—যখনই তাহার ক্ষমতা হইবে অমনি সে আর এক জনের বস্তু বলপূর্ব্বক অপহরণ করিবে। এই জন্যই সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য-শাসন সম্বন্ধে এই সাধারণ নীতিটি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—যে দেশের যে চিরন্তন রীতি, সেই রীতি-অনুসারে সাধারণ প্রজাদিগের ব্যক্ত কিম্বা অব্যক্ত সম্মতি-ক্রমে সেই দেশের রাজা কিম্বা শাসনকর্ত্তা কিম্বা শাসনকর্ত্তৃগণ সেই দেশের শাসন-ভার প্রাপ্ত হয়েন। যতক্ষণ না তাঁহারা ন্যায়ের নিয়ম লঙ্ঘন করেন ততক্ষণ তাঁহারা স্বীয় অধিকার হইতে বিচ্যুত হইতে পারেন না—অন্য দেশের লোক আসিয়া যদি কোন দেশের প্রজাদিগের বিনা সম্মতিতে সেই দেশ আক্রমণ করে, তাহা হইলে তাহারা সেই দেশের অনধিকার-প্রবেশী শত্রু বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহারা বলপূর্ব্বক ঐ দেশ অধিকার করিলেও—ঐ দেশে তাহাদিগের যে ন্যায্য অধিকার—ন্যায্য স্বত্ব বর্ত্তিয়াছে এরূপ বলা যাইতে পারে না। রাজনীতি-সম্বন্ধে এইরূপ একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা নিরূপিত হইয়াছে বলিয়াই পূর্ব্বতন সাংগ্রামিক কাল অপেক্ষা ইদানিন্তন সভ্য-সমাজে যুদ্ধ বিগ্রহের ক্রমশ হ্রাস হইতেছে। লেখক মহাশয় এক স্থলে বলিয়াছেন;—"Abundant blessings flow to the conquered inspite of the

bloody resistance they might offer or curses and imprecations they might heap on their hated conquerors."—অনেক সময় পরাজিত জাতি জেতৃ-জাতির নিকট বহুবিধ উপকার প্রাপ্ত হয় সত্য—তাহা আমরাও স্বীকার করি এবং সে বিষয় আমরা পূর্ব্বে উল্লেখও করিরাছি। কিন্তু তাই বলিয়া "বল যার অধিকার তার" এই নিয়মটিকে কখনই উৎকৃষ্ট নিয়ম বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। এক জন দস্যু এক জন দুর্ব্বলের ধন অপহরণ করিয়া দীন দুঃখীগণকে দান করিতে পারে, তাহা বলিয়া সে যে দস্যুতা-অপরাধে অপরাধী নহে কিম্বা সে যে সমাজের নিকট দণ্ডনীয় নহে, এ কথা কেহই স্বীকার করিবে না। জগৎ-বিধাতার কার্য্য-প্রণালীই এইরূপ যে তিনি অশুভ ঘটনা হইতেও কিঞ্চিৎ শুভ উদ্ধার করেন। তাহা বলিয়া যাহা অন্যায় তাহা কখনই ন্যায় হইতে পারে না। যদি লেখক মহাশয়ের বলিবার অভিপ্রায় এই হয় যে, সমস্ত পৃথিবীতে—এমন কি তাহার সভ্যতম অংশ ইউরোপেও যে নিয়ম এখনও কার্য্যতঃ প্রচলিত রহিয়াছে তাহারই কথা তিনি বলিতেছেন, কোন্ নিয়মকে মনুষ্যসমাজের নেতৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত করা উচিত, সে বিষয় তিনি বলিতেছেন না, তাহা হইলে তাঁহার মতের সহিত আমাদিগের কিছুমাত্র অমিল নাই। ইহা সত্য যে, সমস্ত পৃথিবীতে এখনও 'বল যার অধিকার তার' এই নিয়মটি কার্য্যতঃ প্রচলিত রহিয়াছে। সভ্যতাভিমানী ইউরোপ মুখে এই নিয়মটি স্বীকার করেন না বটে কিন্তু কার্য্যতঃ এই নিয়মানুসারে অনেক সময়ে চলিয়া থাকেন। তবে অসভ্যদিগের সহিত তাঁহাদিগের এই প্রভেদ যে, অসভ্যেরা স্পষ্টাপষ্টি এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হয়, আর তাঁহারা তাহার উপর একটি ন্যায়-ধর্ম্মের আবরণ দিয়া স্বীয় অভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন রাখেন। তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া এই যে একটি ন্যায়-ধর্ম্মের আবরণ দিতে হয়, ইহাও অপেক্ষাকৃত উন্নতির লক্ষণ বলিতে হইবে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে বলাধিকারের নিয়ম ক্রমশই খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে। ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যতই মনুষ্যসমাজে সভ্যতার বাস্তবিক উন্নতি হইবে ততই 'বল যার অধিকার তার' এই নিয়মটির উপর "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" এই নিয়মটি জয়লাভ করিবে। ইউরোপীয় সভ্যতার এক্ষণে এতটুকু উন্নতি হইয়াছে যে, ইউরোপীয়েরা জ্ঞানত বুঝিয়াছেন যে ন্যায়ের নিয়মই শ্রেষ্ঠ নিয়ম, তবে অপূর্ণতা হেতু রাজনৈতিক ব্যাপার সম্বন্ধে স্বার্থ-অন্ধ হইয়া কার্য্যতঃ প্রায়ই এই নিয়মের ব্যভিচার করেন। এবার আমরা স্থানাভাব-প্রযুক্ত এই খানেই শেষ করিলাম। লেখক মহাশয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন ভারতীর আগামী সংখ্যায় তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

গঞ্জিকা।

দাড়ি-তত্ত্ববিবেক।

তুরিতানন্দ গোস্বামীর জনৈক প্রবীণ চেলা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম অধ্যায়।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন প্রভো, আপনি দাড়ি রাখিয়াছেন কেন?

বৈশম্পায়ন উত্তর করিলেন, মহারাজ, আপনি অতি অন্যায় প্রশ্ন করিতেছেন। প্রথমতঃ দাড়ি রাখিয়াছি কেন এ জিজ্ঞাসা করিবার কাহারও অধিকার নাই। যদি এ প্রশ্নের উত্তর আজিকে আপনাকে দেওয়া যায়, তাহা হইলে ক্রমেই আপনার প্রশ্রয় বাড়িবে;—আজ জিজ্ঞাসা করিলেন দাড়ি রাখিয়াছ কেন, কাল জিজ্ঞাসা করিবেন কাণ রাখিয়াছ কেন? পরশু জিজ্ঞাসা করিবেন নাক রাখিয়াছ কেন? প্রকৃতি-বিকৃতির জ্ঞান থাকিলে এ প্রশ্ন করিতেন না।

আমাদের দেশের কোন লোক চীনের দেশে গিয়া যদি নাক ঘসিয়া চীনদিগের নাকের সঙ্গে সমান করিতে চেষ্টা করে, পরে সে দেশে ফিরিয়া আসিয়া যদি আমাদের কাহাকে জিজ্ঞাসা করে আপনি নাক ঘসেন নাই কেন—সে যেরূপ প্রশ্ন এও মহারাজ সেইরূপ। মনুষ্যগণ স্বাভাবিক বিষয়ে তৃপ্ত না হইয়া প্রকৃতির বিকৃতি ইচ্ছা করে। কোন কোন লোক আপনার কুকুরের লেজ ও কাণ কাটিয়া দিয়া থাকে, ভাবে আমার কুকুর বড় রাগী হইবে। কিন্তু লেজ ও কাণ কাটিয়া দিলে কে না রাগে? লক্ষ্মণ যদি স্পূর্ণনখার নাসিকা ছেদন না করিতেন তাহা হইলে লঙ্কাকাণ্ড আদৌ উপস্থিত হইত না। দায়্রা সোপর্দ্দের মোকদ্দামা উঠিতে পারে এমন কাজ কেন? বিকৃতি-প্রিয় লোকে কুকুরের লেজ কাটিয়া ফেলে কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে লেজে ও বাকি কুকুরে অনেক তারতম্য আছে। বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে লেজই পাকা-মাল। কুকুরের ভয় হইলে লেজটা নিচের দিকে গুটাইয়া লয়, রাগ হইলে লেজটা খাড়া করে, সোহাগ হইলে লেজটা নাড়ে। লেজটা কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া অপেক্ষা কুকুর ফেলিয়া দিয়া লেজ রাখা অনেক ভাল। এইরূপ বিকৃতি-প্রিয় লোক দাড়ি ছেদন করিয়া পুরুষত্বের বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে। অতএব দাড়ি রাখিয়াছ কেন, এ প্রশ্নের উত্তর-দায়ক আমি হইতে পারি না বরং মহারাজ আমিই জিজ্ঞাসা করিবার অধিকারী—আপনি দাড়ি ছেদন করিয়াছেন কেন? যে ছেদন করে প্রমাণের ভার তার শিরে। প্রমাণ সম্বন্ধের আইনে যেরূপ বিধান আছে তাহাতে কোন বিষয়ের কৃতকর্ম্মাকেই প্রমাণ দিতে হয়; অতএব দাড়ি যে ছেদন করে তাহাকেই কারণ বিন্যাস করিতে হইবে। ইহা দ্বারাই দাড়ি

ধারণ কেন এই জিজ্ঞাসার অধিকার নিরূপিত হইতেছে।

আর এক কথা, দাড়ি রাখিয়াছেন কেন, এই বাক্যের মধ্যে রাখা শব্দটি অপ্রসিদ্ধ। এই স্থলে রাখা শব্দটি আদৌ প্রয়োগ হইতে পারে না। রাখা এই বাক্য যদি ব্যবহার করা যায় তো “নাক রাখা” “কাণ রাখা” কেনইবা না ব্যবহার করা যাইবে?

অতএব দাড়ি রাখা কিম্বা না রাখার পরিবর্ত্তে দাড়ি ছেদন কিম্বা না ছেদনের কথা আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। এতক্ষণে প্রকৃত প্রশ্নে উপনীত হওয়া গেল। এক্ষণে দাড়ি ছেদন করা কিম্বা না করা ইহার কোন্ পক্ষে অধিক ক্লেশ বা সুবিধা তৌল করিয়া দেখা যাউক। দাড়ি ছেদন না করিবার পক্ষে সচরাচর যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হয় তাহা এই—প্রথমতঃ, ছেদন না করিলে মুসলমানের মত দেখায়। দ্বিতীয়ত, দাড়ি থাকিলে দাড়ি ধরিয়া মারিবার সুবিধা। তৃতীয়তঃ আহারের ব্যাঘাত। চতুর্থতঃ পুত্র প্রভৃতি স্নেহের পাত্রদিগের মুখ-চুম্বনের অসুবিধা। এই কয়েকটি অসুবিধার প্রকৃতি আলোচনা করিতে হইবে।

প্রথম অসুবিধার উত্তর—মুসলমান জাতি এদেশে আসিবার পূর্ব্বে সমস্ত হিন্দুজাতির প্রায় শ্মশ্রুছেদন নিষেধ ছিল। মুসলমান এ দেশের রাজা হইলে পর, কাহাকে প্রণাম করি, কাহাকে সেলাম করি—ইহা লইয়া সর্ব্বদা গোলযোগ উপস্থিত হইত। মুসলমান-জাতি রাজপুরুষ—দাড়ি ছেদন প্রসঙ্গে তাহারা কেন সম্মত হইবে?—সুতরাং আমাদের হিন্দুজাতিকেই দাড়ি ছেদন করিয়া হিন্দুর পরিচয় দিতে হইয়াছিল। এই নিমিত্তই সচরাচর আমাদের মধ্যে ছেদনের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ দাড়ি ধরিয়া মারিবার বিষয়ে এই বক্তব্য যে, আকবর শা প্রভৃতি বড় বড় রাজাদেরই আজানুলম্বিত দাড়ি ছিল।—যাহারা দেড়ে তাহারা যে একের চেয়ে দেড় গুণে বড় তাহা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব যারা মার্‌নে-ওয়ালা তাদেরি দাড়ি ছিল—যাদের দাড়ি ছিল না তারাই মার্‌খানে-ওয়ালা। ধূম দেখিলেই যেমন অগ্নির সত্তা উপলব্ধি হয়, সেইরূপ দাড়ি দেখিলেই বলের সত্তা উপলব্ধি হয়—এই হেতু প্রায়ই দেড়ের দাড়ি দেখিবা মাত্র অদেড়ের নাড়ি ছাড়িয়া যায়; অতএব দেড়ের দাড়ি পর্য্যন্ত হাত উঠিতে পারে, অদেড়ের এরূপ ভরসা কোথায়? তৃতীয়ের উত্তর এই, আহারের অসুবিধা মনঃকল্পিত মাত্র। আস্য-কুহরের যেরূপ আয়তন তাহাতে লোমে বাধিয়া যাইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। চতুর্থ আপত্তি সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, লম্বমান দাড়ির কোমল অগ্রভাগ ও ছিন্ন দাড়ির কুট্‌কুটে অগ্রভাগের ঘর্ষণ—এ দুয়ের বিস্তর প্রভেদ। চামরের কোমল অগ্রভাগের সহিত বুরুজের কঠিন অগ্রভাগের যেরূপ প্রভেদ ইহারও সেইরূপ।

এক্ষণে ছেদনে কি কি ক্লেশ তাহার প্রকৃতি আলোচনা করা যাউক।

প্রথমতঃ ক্ষৌর কর্ম্ম করা অভ্যাস থাকিলে দুই এক দিন ক্ষৌর না করিলেই দাড়ি কুট্‌কুট করে। ইহাকে বলে স্বকৃত চুল্‌কানি!

দ্বিতীয়তঃ প্রাতঃকালে নাপিত সম্মুখে বসিয়া ক্ষুর শাণায়—পরে বাম হাত দিয়া মুখে জল দিতে আরম্ভ করে। ব্যাটা যে ভাবে মুখ-খানা চট্‌কায়, মনে হ’লে বড় ঘৃণা হয়। বিশেষতঃ বাঁ হাতে চূলের টিকি ধরিয়া ঘাড় নোয়াইয়া যেরূপ ভাবে মাথাটা এদিক্ ওদিক্ নাড়ায়—বোধ হয় যেন আমার মাথা আমারই নয়!

তৃতীয়তঃ—অতি তীক্ষ্ণ ক্ষুর ধারের উপর কেন যে বাহার বা দেশাচারের অনুরোধে কোমল কণ্ঠ-নলী সমর্পণ করা হয় বুঝা যায় না। নাক নয়—কাণ নয়—যে তাহা এক দিন কাটিয়া ফেলিলেও চলে—কেন না, পৃথিবীতে নাক-কাণ-কাটা লোকের অভাব নাই, কিন্তু এক জন অস্ত্রধারীর হস্তে দশ মিনিট্ কালের জন্যও কি কণ্ঠ নিরুদ্বেগে গচ্ছিত রাখা যাইতে পারে? শাস্ত্রে আছে “নদীনাঞ্চ নখীনাঞ্চ শৃঙ্গীনাং শস্ত্রপাণিনাং বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।” কোন ধারেই যাওয়া উচিত নয়—কি কূপের ধার—কি ক্ষুরের ধার—কি টাকার ধার—সকল ধা[illegible]

এব[illegible]

ক্ষুরে কামানো সকলের পক্ষে সকল অবস্থায় সহজ নহে—এতদ্ব্যতীত নাপিতের গায়ের দুর্গন্ধ অতীব কষ্টজনক। ছেদনের সুবিধা এবং অসুবিধা এই দুই ফর্দ্দে যে যে বিষয়ের উল্লেখ করা গেল তুলনায় ছেদনের ক্লেশ কত অধিক তাহা বলা যায় না। স্ত্রীপুরুষের শরীরের বাহ্য লক্ষণের মধ্যে মুখমণ্ডলের গোঁপ-দাড়ি ও তাহার অভাবই প্রধান। অতএব স্ত্রীপুরুষের পরিচয়ের প্রধান লক্ষণ যে গোঁপ-দাড়ি তাহা ছেদন করা পুরুষত্বের বিলক্ষণ হানিকর কি না? যাত্রার দলে যারা স্ত্রী সাজে তাহাদিগের দাড়ি গোঁপ ছেদন না করিলে চলে না—তবেই পুরুষের মেয়ে সাজিবার প্রয়োজন হইলে তাহারা আপনার মুখকে অন্য-রূপ করে। সামান্যতঃ দেখা যায় যে, প্রকৃতির অভ্যন্তরে পুরুষজাতিই অধিক সুশ্রী এবং পূর্ণতার দিকে প্রবণ,—পুরুষ শব্দের অর্থই পূর্ণ। অতএব পূর্ণতার কতক অংশ বাদ দিয়া পুরুষ বলিয়া পরিচয় দেওয়া অতি অজ্ঞানের কর্ম্ম সন্দেহ নাই।

স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ-জাতি স্বভাবত যে সুশ্রী তাহা তো প্রকৃতিতে পড়িয়া আছে—কে না জানে ময়ূরী অপেক্ষা ময়ূর সুশ্রী—[illegible]গী অপেক্ষা মোরগ সুশ্রী—চটকী অপেক্ষা [illegible]ক সুশ্রী—সিংহী অপেক্ষা সিংহ সুশ্রী? [illegible]হ বলিতে পারেন যে চূল সম্বন্ধে এরূপ [illegible] কেন না চলে? উত্তর—যেহেতু পু[illegible]-শরীরের দাড়ি-গোঁপ স্ত্রী অপেক্ষা অতি[illegible]ক্ত বস্তু—সেই হেতু পুরুষ-শরীরে তাহার কারণও অতিরিক্ত বলিতে হইবে। উভয়

শরীরের কারণ সমান থাকিলে কার্য্যও সমান হইত।

প্রথমতঃ দাড়ি ছেদনের প্রয়োজনই নাই, বরং ইহাতে শোভা বর্দ্ধন হয়, এবং অনেক সময় ইহা সর্দ্দি কাশি নিবারণ করিয়া গলা-বন্দের কাজ করে। এই দাড়ি যাহারা পয়সা খরচ করিয়া ছেদন করে তাহাদের অপেক্ষা আহাম্মক আর দুনিয়ায় নাই। ক্ষৌর কার্য্যের জন্য মাসের মধ্যে অন্ততঃ চার পয়সা করিয়া নাপিতকে দিতে হয়, তাহা জমাইলে দেশের কত উপকার সাধিত হইতে পারে বলা যায় না। সমস্ত হিন্দুজাতিকে না ধরিয়া যদি বাঙ্গালীদিগের জন-সংখ্যা ধরা যায়—যদি বাঙ্গালীদিগের জন-সংখ্যা এক কোটি হয়, আর ক্ষৌর কর্ম্মের জন্য প্রত্যেক বাঙ্গালীর যদি ৪ পয়সা মাসে খরচ হয়—তাহা হইলে এই চার পয়সা বাঁচাইলে ৬২৫০০০,টাকা মাসে পাওয়া যায়, এই টাকা সাধারণ হিতোদ্দেশে ব্যয় করিলে দেশের কত না উন্নতি সাধন হয়! গবর্ণমেণ্ট যে এত ট্যাক্সের জন্য উৎপাত করেন, দাড়ি ছেদন নিষেধের আইন করিয়া এই টাকা সহজে উঠাইয়া লইতে পারেন, কারণ ঐ টাকা ত এমনেও নাপিতকে দিতে হয়। আর এক কথা, সংস্কার-প্রিয় নব্য সম্প্রদায়দিগকে উৎপীড়ন করিবার জন্য প্রবীণ সম্প্রদায়ের যে দুইটি মহাঅস্ত্র আছে তাহা নাপিত ও ধোপা বন্ধ করা, দাড়ি ছেদন না করিলে উহার একটি অস্ত্র হইতে অনায়াসে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এই সকল কারণেই মহারাজ আমি দাড়ি ছেদন করি নাই।

জন্মেজয় কহিলেন, ভগবন্ আপনার যুক্তিগর্ভ বিচার শ্রবণ করিয়া আমার বিলক্ষণ জ্ঞান লাভ হইল ও আমি কৃতার্থ হইলাম। আজ হইতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি আমিও দাড়ি রাখিব—ওঁ বিষ্ণু—দাড়ি ছেদন করিব না!

ইতি শ্মশ্রু-তত্ত্ব-বিবেক গ্রন্থে শ্মশ্রু-ছেদন নামকোয়ং প্রথমোধ্যায়ঃ।

মুক্তকণ্ঠতা।

বৃদ্ধ রাজা লিয়ার রাজকার্য্য হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কাল কাটাইবার জন্য গনরীল্, রিগান্ ও কর্ ...লীয়া নামক কন্যাত্রয়কে ডাকিলেন, এ... তাহাদিগকে সমস্ত রাজ্য বিভাগ করি... দিবার সংকল্প প্রচার করিলেন। কন্যা... রাজ-সমক্ষে উপস্থিত হইলে রাজা বলিলে... "আজ হইতে আমি রাজ্য-ভার পরিত্যা... করিব, এখন বল, তোমাদের মধ্যে কে আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ মমতা ... সেই অনুসারে আমি তাহা- ... অধিক ... রু- ... ষ্ঠা ... ভদ ... ার ... থা-

আমি আপনাকে অধিকতর ভালবাসি।" মধ্যম কন্যা রিগান্ বলিলেন, "আর্য্য, যে উপাদানে আমার জ্যেষ্ঠ ভগিনী গঠিত আমিও সেই উপাদানে গঠিত। কিন্তু আমি যতদূর বলিতে পারি, তিনি ততদূর বলিতে পারিলেন না, আমি এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আপনাকে ভালবাসা ব্যতীত আমার আর অন্য কোন আমোদ আহ্লাদই ভাল লাগে না।" বৃদ্ধ রাজা উল্লসিত হইয়া তাঁহার রাজ্যের তিন ভাগের দুই ভাগ কন্যাদ্বয়কে দিলেন। এবং পরিশেষে কনিষ্ঠ কন্যা কর্ডিলীয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে, তোমার ভালবাসা বিষয়ে তুমি কি বলিতে পার?

কর্ডিলীয়া। আর্য্য, কিছুই বলিতে পারি না।

লিয়ার। কিছুই না?

ক। কিছুই না।

লি। কিছুই নার ফল কিছুই না, তা জান? আর কি বলিতে হয় বল?

ক। আর্য্য, আমি অভাগিনী, আমি আমার হৃদয়ের কথা মুখে প্রকাশ করিতে পারি না। আপনি আমার পিতা,—কন্যা পিতাকে যতদূর ভাল বাসিতে পারে, আমি ততদূরই আপনাকে ভালবাসি। তাহার অধিকও নয়, তাহার কমও নয়। * * * আমার ভগিনীরা যদি অখণ্ড হৃদয়ের সহিত আপনাকেই ভাল বাসেন তবে তাঁহারা আদৌ বিবাহ করিয়াছিলেন কেন?

লি। এই কি তোমার হৃদয়ের কথা?

ক। হাঁ পিতঃ।

লি। তুমি এত অল্প-বয়স্ক, অথচ এত দূর নিষ্ঠুর?

ক। আর্য্য, অল্পবয়স্কা হ'লেও আমি সত্যবাদিনী।

লি। তবে সত্যবাদিত্বই তোমার সর্ব্বস্ব হোক! আজ হইতে তুমি আর আমার কন্যা নও। তোমার সঙ্গে আজ হইতে আমার সকল সম্পর্ক রহিত হইল।

এই বলিয়া বৃদ্ধ রাজা রাজ্যের অপর অংশ টুকুও অপর দুই কন্যাকে ভাগ করিয়া দিলেন এবং সরলহৃদয়া কর্ডিলীয়াকে একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। কিছু দিন পরে ঐ দুই ভাগ্যবতী কন্যা সমস্ত রাজ্য হস্তগত করিয়া পিতাকে নানা প্রকার যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিল, এমন কি, উহাদের নৃশংস ব্যবহারে লিয়ার উন্মত্ত হইয়া ঘোর ঝড় ঝটিকাতে, ঘোর বজ্র-বৃষ্টিতে কন্যাদের গৃহে দুই দণ্ডের জন্য আশ্রয় পর্য্যন্ত পাইলেন না—সেই ঘোর ঝড় ঝটিকাতে, সেই ঘোর বজ্র-বৃষ্টিতে, বৃদ্ধ দুর্ব্বল রাজাধিরাজ বিশাল প্রান্তর-মধ্যে পরিত্যক্ত বন্য পশুর ন্যায় নিরাবরণে উন্মত্ত হইয়া বিচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরিশেষে পরিত্যক্ত কর্ডিলীয়া আসিয়াই পিতাকে উদ্ধার করেন, এবং বহু যত্নে ও বহু প্রয়াসে পিতার উন্মত্ততার কিঞ্চিৎ উপশম করেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বৃদ্ধ রাজার উপর আমাদের মমতার উদ্রেক হইলেও কি তাঁহাকে আমরা

ঘোর নির্ব্বোধ, তোষামোদপ্রিয় ও ক্ষমা-শূন্য মনে করি না? কিন্তু যে যাহাই মনে করুক, সমাজ! তুমিও কি লিয়ারকে অপরাধী মনে করিবে? তুমি ভাবিয়া দেখদেখি তুমি তাঁহা অপেক্ষা কত সহস্র গুণে নির্বোধ তোষামোদপ্রিয় ও ক্ষমা-মার্জ্জনাশূন্য! তুমি ভাবিয়া দেখদেখি তুমি এইরূপ কত সহস্র মিস্টভাষিণী গনরীলকে তোমার বক্ষে স্থান দিয়া কত সহস্র সত্য-বাদিনী কর্ডিলীয়াকে দূরে নিক্ষেপ কর। তুমি যদি জানিতে যে কেবল তোমারই ঐ নির্বুদ্ধিতা, তোষামোদপ্রিয়তা ও ক্ষমা-শূন্যতা হেতু কত লোক সহস্র আবরণে হৃদয় আবরিত করিয়া রাখে, তুমি যদি জানিতে যে কেবল তোমারি ভয়ে কত কঠোর মর্ম্ম-যাতনা মর্ম্মের নিভৃত নিলয়ে নিলীন হইয়া থাকে, কত আর্ত্তনাদ জনকোলাহলের মধ্যে নিস্তব্ধ থাকিয়া হিমালয়ের বিজন কন্দরে প্রতিধ্বনিত হয়, কত মর্ম্মভেদী দীর্ঘ শ্বাস দিবসে অবরুদ্ধ থাকিয়া নিশীথ-পবনে তরঙ্গিত হইতে থাকে, তাহা হইলে তুমি বৃদ্ধ রাজাকে কোন দোষেই দোষী করিতে পারিতে না।

ইংলণ্ডের কাল্পনিক কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি শেলীর কথা মনে হইলে কার না হৃদয় ব্যথিত হয়? তিনি যখন অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন, যখন তাঁর বয়স ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র, তখনই অলৌকিক প্রতিভা ও ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ হেতু বাইবেল-বর্ণিত রক্ত-পিপাসু ঈশ্বরের বিষয়ে তাঁহার অনেক সংশয় জন্মায়। সেই সকল সংশয় ভঞ্জন করিবার নিমিত্ত তিনি ঐ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেই প্রবন্ধে তিনি বাইবেল-বর্ণিত ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রচলিত যুক্তিসমূহ অগ্রাহ্য করিয়া উৎকৃষ্ট-তর যুক্তি প্রদর্শনের জন্য কৃতবিদ্য খ্রীষ্টানদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন মাত্র। ত্রয়োদশ বৎসরের বালকের এই অহঙ্কার দেখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে যুক্তি দ্বারা নিরস্ত না করিয়া বিদ্যালয় হইতে একেবারে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু তবুও তাঁহার সরল মুক্তকণ্ঠতা নির্ব্বাপিত হইল না। অষ্টাদশ বৎসর বয়সে তিনি একখানি কবিতা লিখিয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার মত প্রচার করিলেন। সেই কবিতা প্রচার হইলে সমস্ত ইংলণ্ড শেলীর বিপক্ষে খড়্গ-হস্ত হইল—পরিশেষে ইংলণ্ডের প্রধানতম বিচারালয়, তাঁহার বক্ষ হইতে তাঁহার পুত্র কন্যাকে পর্য্যন্ত ছিনিয়া লইলেন—ভগ্নহৃদয় শেলী বিশ বৎসর বয়সে উত্ত্যক্ত হইয়া জন্মের মত ইংলণ্ডের নিকট বিদায় লইয়া ইতালীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্টুয়ার্ট মিলের কি হইল? তিনি মুক্তকণ্ঠে কোথাও আপনার প্রকৃত নাস্তিকতা প্রচার করা দূরে থাকুক, প্রকাশ পর্যন্ত করেন নাই, কোথাও ধর্ম্ম বিষয়ক তাঁহার নিজের কোন মতই জীবদ্দশায় প্রকাশ করেন নাই—পিতৃ-উপদেশ অনুসারে তিনি ধর্ম্মবিষয়ে মনের বিশ্বাস আমরণ সন্তর্পণে গোপন করিয়া আসিয়াছিলেন, অথচ সকলেই মিলের তর্ক বিতর্কের গূঢ় উদ্দেশ্য বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিল। তিনি গোপনে সাধারণের মনকে যত দূর নাস্তিকতা-প্রবণ করিয়াছিলেন, শেলীর মুক্তকণ্ঠতা তাহা করিতে পারে নাই, পারিবারও সম্ভাবনা ছিল না, অথচ শেলী ইংলণ্ড হইতে জন্মের মত নির্ব্বাসিত হইলেন, আর মিল ইংলণ্ডের মহাসভার সভ্য পর্য্যন্ত নির্ব্বাচিত হইলেন!

সমাজ!—তুমি কি তবে লিয়ার অপেক্ষাও শতগুণে নির্ব্বোধ, তোষামোদপ্রিয় ও ক্ষমাশূন্য নহ? কে না জানে যে, কপটতা অপেক্ষা জগতে আর কষ্টকর কিছুই নাই, যে, কপটতা-হেতু হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়, বিবেক-বুদ্ধি কলুষিত হয়, একটি মিথ্যার উপরোধে সহস্র মিথ্যার অনুবর্ত্তী হইতে হয়, কে না জানে একটি কপট ব্যক্তিকে আমরণ নাটকাভিনয়ের অভিনেতৃ-ব্রতে দীক্ষিত হইতে হয়, স্বভাবের সহজ উচ্ছ্বাসকে বহু প্রয়াসে অবরুদ্ধ রাখিয়া বিকৃত ভান ধারণ করিতে হয়, তবে কিসের জন্য একটি মনুষ্যও জীবনের কোন ভাগেই কপটতা গরল পোষণ করিবে? সমাজ! তুমিই তাহার উত্তর দাও। অবশ্য স্বীকার করি যে সংসারে এমন অনেক লোক আছে যাহারা ইয়াগোর মত কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য দুর্ভেদ্য ছলনা-আবরণে আপনাদিগকে আবরিত করিয়া রাখে, স্বীকার করি যে, সংসারে আবার এমনও অনেক লোক আছে যাহাদের প্রকৃতিই এমনি বিকৃত যে কপটতাতেই তাহাদের আনন্দ ও তদ্দ্বারা অন্যকে প্রতারণা করিয়াই তাহাদের গৌরব—কিন্তু তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেও সংসারের কোন্ ব্যক্তি হৃদয়ের শিরা ও উপশিরা পর্য্যন্ত সকলের সমক্ষে প্রকাশ করিতে পারে?" যেখানে মনুষ্য সেই খানেই হৃদয়, যেখানে হৃদয় সেই খানেই দুর্ব্বলতা, কিন্তু যেখানে দুর্ব্বলতা সেই খানেই কি মার্জ্জনা আছে? মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে কত শুভকর, কত অশুভকর, কত পবিত্র, কত অপবিত্র ভাব উদয় হইতেছে—কিন্তু সকলেই কি তাহা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিতে পারে? বরঞ্চ আমরা অমানিশার গভীর নিস্তব্ধ কালে মনের সকল ভাব প্রকাশ করিতে পারি. বরঞ্চ তরঙ্গাহত সমুদ্র-তীরে দাঁড়াইয়া তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়-উচ্ছ্বাস মিশাইতে পারি, তবু সমাজের সমক্ষে প্রকৃত আত্ম-পরিচয় দিতে পারি না। কেন না, সমাজ! তোমার বিবেচনা নাই, তোমার ক্ষমা নাই। ইহা ত সচরাচর দেখিতে পাই যে, যে লোক আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া, আত্মীয় বিসর্জ্জন করিয়া, হিতাহিত জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়া সমাজের মনোরক্ষা করিতে পারে, সেই সমাজের পূজ্য দেবতা। ইহা ত প্রত্যহই দেখিতে পাই যে, যিনি লৌকিকতার প্রচলিত অভিধানের কৌশলময় বাক্যাবলী কণ্ঠস্থ করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতে পারেন, যিনি হৃদয়ের ভীষণ রৌরব অপ্রকাশিত রাখিয়া স্বর্গের প্রশান্ত ভাব মুখমণ্ডলে প্রকাশ করিতে পারেন,—যিনি আন্তরিক অকপট মত ও বিশ্বাসের বিরোধী হইয়া পথের সামান্য ভিখারীদের কটাক্ষ ও ইঙ্গিতের ক্রীতদাস

রূপে জীবনের প্রধান কার্য্যসমূহ পর্য্যন্ত বিধিবদ্ধ করিয়া লইতে পারেন,—তিনিই সমাজের পূজ্য দেবতা! যখন এই সকল শুনিতে পাই; দেখিতে পাই, অনুভব করিতে পাই, তখন আর মুক্তকণ্ঠ হইয়া আমরা কি কিছু বলিতে সাহসী হইতে পারি? এইরূপে কপটতার দিনদিন শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া মুক্তকণ্ঠতা আপনা-আপনিই সঙ্কুচিত হইয়া আইসে, লোকে হৃদয়ের ভিতর হৃদয় লুকাইতে অভ্যাস করে, এবং দিন দিন মিথ্যা কথার ন্যায়-শাস্ত্র ও অলঙ্কার-শাস্ত্র উৎকর্ষ লাভ করে। আমরা সকল সাহিত্যে এবং সকল দেশেই শিশুদিগের, কৃষকদিগের ও অসভ্য জাতিদিগের সরলতার প্রশংসাই শুনিতে পাই, কিন্তু সভ্য-সমাজ যদি ক্ষমা-মার্জ্জনা জানিত, তাহা হইলে সরলতা আর অবস্থা-বিশেষে বা লোক-বিশেষে আবদ্ধ থাকিত না। শিশুরা ভবিষ্যতের কথা ভাবিতেই পারে না, কৃষকেরা সরলতার ফলাফল বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারে না, এবং অসভ্য জাতিরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলেও সে বিষয়ে দৃকপাতও করে না। কিন্তু আমরা ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে পারি, সরলতার ফলাফল সহজেই জানিতে পারি এবং তাহা জানিতে পারিয়া আমাদিগকে তাহার প্রতি দৃকপাতও করিতে হয়। কিন্তু সমাজ যদি মুক্তকণ্ঠতার সহায়তা করিতে জানিত, সমাজ যদি হৃদয়ের দুর্ব্বলতা মার্জ্জনা করিতে জানিত, সমাজ যদি প্রকৃত অপরাধের বিবেচনা পূর্ব্বক শাস্তি দিতে জানিত, তাহা হইলে অনেক সময়ে ও অনেক স্থলে মনুষ্যকে আর মনুষ্যের চক্ষে প্রহেলিকারূপ জটীল পদার্থ হইয়া দাঁড়াইতে হইত না। যাঁহারা ক্ষমা-হীন সমাজপরায়ণ তাঁহারা যদি একবার ভাবেন যে ঈশ্বর যদি তাঁহাদের সকল অপরাধের,সকল প্রকার দুর্ব্বলতার সমুচিত শাস্তি দেন, তাহা হইলে তাঁহাদের উপায় কি হয়, যদি একবার ভাবেন যে তাঁদের হৃদয়ের সহস্র আবরণ একবার ছিন্ন হইলে কত বিভীষিকা প্রকাশিত হইয়া পড়ে, আর তখন কতদূর তাঁরাই আবার সমাজের উদার বিবেচনা ও প্রশস্ত মার্জ্জনার ভিখারী হইয়া পড়েন,তাহা হইলে প্রত্যেক মনুষ্যের কি এক স্ফূর্ত্তিময় স্বাধীন ভাব, পরস্পরের কি এক হৃদ্যতার ভাব, এবং সমস্ত সংসারের কি এক প্রশান্ত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

সকল দেশের সাহিত্যেই স্ত্রীলোককে কপট-পটু ও ছলনাময়ী বলিয়া বর্ণনা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, স্ত্রীলোক যদি ছলনাময়ীই হয়—সে কাহার দোষে? সভ্যতা-নিবন্ধন স্ত্রীলোকদের শারীরিক নির্য্যাতন অপেক্ষাকৃত অনেক কমিয়াছে বটে,—কিন্তু অবস্থা বিশেষে তাহাদের দুর্ব্বলতার মার্জ্জনা কোথায়?

যাহাই হউক, মনুষ্যসমাজে মুক্তকণ্ঠতা বিষয়ে অনেক স্থলে এখন শুভকর পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে। বিজ্ঞানবিষয়ে মুক্তকণ্ঠতার জন্য কোপরনিকস্ বা গেলেলীয়ো যে সময়ে নানা প্রকার নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন, বা ধর্ম্ম-বিষয়ে মুক্তকণ্ঠতার জন্য

রিড্‌লি বা ল্যাটিমর যে সময়ে জ্বলন্ত অনলে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, সে সময় আর ইউরোপে নাই, এমন কি, বঙ্গদেশেও রাজা রামমোহন রায়ের সময় নাই—কিন্তু এই বঙ্গদেশে যদি এইরূপ সকল বিষয়ে মুক্তকণ্ঠতার মার্জ্জনা থাকিত, তাহা হইলে কি সুখের, কি সৌভাগ্যের বিষয় হইত! তাহা হইলে চর্ম্মচক্ষু দিয়া লোকে লোকের মন দেখিতে পাইত, হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস মিশিত এবং সকল হৃদয়ই স্বাধীনতার বলে বলীয়ান হইতে পারিত। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় যে সভ্য ইংরাজেরাই আমাদের একটি বিষয়ে সরল মুক্তকণ্ঠতার বিঘ্ন করিয়াছেন—তাঁহারা এত দিন পরে আবার আমাদের রাজনৈতিক বিষয়ে মুক্তকণ্ঠতার পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়াছেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত আমাদিগের রাজনৈতিক দুঃখ যন্ত্রণা হইলে আমরা রোদন করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু এখন সে রোদনের অধিকার, সে অশ্রুপাতের সান্ত্বনা পর্য্যন্ত আর আমাদের নাই—মর্ম্মদাহ হইলে মর্ম্মের স্তরে স্তরেই সে আগুণ জ্বলিবে, তাহার স্ফুলিঙ্গ মাত্রও আর প্রকাশ পাইতে পারিবে না।

বঙ্গ-সাহিত্য।

আমরা পর্য্যায়ক্রমে বঙ্গ-সাহিত্যের প্রধান প্রধান কবি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাসের কবিতা ও কবিত্ব-শক্তির সমালোচনা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু কোন প্রবাসী বহুদিন পরে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলে স্বদেশের আজন্ম-পরিচিত জলবায়ুর প্রভাবে যেমন তাহার হৃদয় নাচিয়া উঠে, আজ কবিকঙ্কণের বিষয় লিখিতে আমাদেরও সেইরূপ একটি অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধি হইতেছে। এখন যদিও আমরা আর সেই শ্যামল যমুনার মৃদুতরঙ্গ দেখিতে পাইতেছি না, সেই ব্রজাঙ্গনার কণ্ঠস্থ বনফুল-মালার সুরভি-উচ্ছ্বাস উপভোগ করিতে পারিতেছি না, এখন যদিও সেই দুর্জ্জয় দুর্গ-বেষ্টিত অযোধ্যার রাজগৌরব আমাদের নেত্রপথ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে ও সরযূর ধীর প্রবাহ দিগন্তে মিশিয়া গিয়াছে, তবুও আমরা নিরানন্দ নহি। এখন আমরা বঙ্গদেশের ভিতরে থাকিয়া ও অজয়-নদের উপকূলে বসিয়া তিন শত বৎসর পূর্ব্বের দেশীয় বাজার বিপনী, দেশীয় গৃহস্থ আশ্রম, দেশীয় আচার ব্যবহার সকলি যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাইতেছি। শুদ্ধ তাহা নহে,কবিকঙ্কণের অপূর্ব্ব কবিতা পড়িতে পড়িতে আমরাও যেন কালের উজান প্রবাহে ভাসিয়া গিয়া সেই জনকোলাহলে মিশিতে পারিতেছি, ব্রাহ্মনদিগের বেদপাঠ হইতে মুসলমানদের কোরাণ পাঠ পর্য্যন্ত, গৃহস্থ-বাটীর সতাসতীনের গণ্ডগোল হইতে বাঙ্গাল নাবিকদের রোদন পর্য্যন্ত,হাটবাজারের বেসাতীর ধরণধারণ হইতে সওদাগরীর বিপুল ব্যাপার

পর্য্যন্ত পাঠ করিতে করিতে আমাদের হৃদয় নানাপ্রকার রসে আপ্লুত হইয়া উঠে। কবিকঙ্কণের লেখনীর কেমন একটি মোহিনী শক্তি আছে, চিত্রকার্য্যে তাঁহার মত রং ফলাইতে অদ্যাবধি আমরা বঙ্গদেশে কোন কবিকেই দেখিতে পাই নাই। তাঁহার ছন্দতন্ত্র দোষ আছে, গ্রাম্যতা দোষ আছে, অতিশয়োক্তি দোষ আছে,এমন কি,দুই একস্থলে কল্পনার ব্যভিচারও আছে বটে, কিন্তু তাঁহার নর-নারী-প্রতিমা-মাত্রেই সজীব, তাহাদের শিরায় শিরায় যেন উষ্ণ শোনিত-ধারা প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহার বর্ণিত বহির্জগত প্রকৃত জগতের প্রতিবিম্বস্বরূপ; এবং তাঁহার কল্পনার পরিধি দিগন্তব্যাপী। তিনি প্রাচীন পরম্পরাগত দুইটি গল্প অবলম্বন করিয়া যে কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা রামায়ণ ও মহাভারতের মত বঙ্গসাহিত্যের একটি স্তম্ভ-স্বরূপ,বিপুল অথচ বিচিত্র,বজ্রায়স সদৃশ সারবান্ অথচ স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর উদ্দেশ্য ভগবতীর মহিমা কীর্ত্তন;—কিন্তু কবিকঙ্কনের ভগবতী ঠিক পুরাণের ভগবতী নহেন। পুরাণের ভগবতীর কথা মনে হইলে আমাদের হৃদয়ে ভক্তি-মিশ্রিত ভয়ের সঞ্চার হয়। যিনি সকল দেবতার শক্তি সমন্বিতা ও সকল দেবতার আরাধ্যা, যাঁহার অধিষ্ঠান পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমাচলের শিখরস্থিত কৈলাশপুরিতে এবং যাঁহার আরোহণ পশুশ্রেষ্ঠ কেশরীপৃষ্ঠে, অসুর-উৎপীড়িত দেবতাদের যিনি একমাত্র ভরসা-স্বরূপ ও সমস্ত স্বর্গমণ্ডলের যিনি একমাত্র রক্ষাকর্ত্রী, সে দেবতা কবিকঙ্কণের ভগবতী নহেন। কবিকঙ্কণের ভগবতী কেবল দয়া ও দাক্ষিণ্য, কেবল স্নেহ ও মমতায় গঠিত। এক এক সময়ে তিনি ভক্তের অরাতী-বিনাশ সংকল্প করিয়া পুরাণের চণ্ডীভাব ধারণ করিতে গিয়াছেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার তিনি মনুষ্য মধ্যে মানুষ-জননী হইয়া ভক্তকে হৃদয়ে তুলিয়া লইয়াছেন। পুরাণের ভগবতীর কাছে কেবল ব্রহ্মা বিষ্ণু বাসবেরই বর প্রার্থনা করিতে সাহস হয়, কবিকঙ্কনের ভগবতীর কাছে যেমন তেমন প্রকারে কোন প্রাণীই আবদার করিতেও সঙ্কুচিত হয় না। পুরাণের ভগবতী তেজোময় দেবতা, কবিকঙ্কনের ভগবতী স্নেহময়ী জননী। ধনপতি সদাগর সিংহলরাজ কর্ত্তৃক সিংহলে কারারুদ্ধ হইয়া আছেন, তাঁহার কোন সংবাদই পাওয়া যাইতেছে না,তাঁহার দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র শ্রীমন্ত পিতৃ-অন্বেষণে বহির্গত হইলেন, খুল্লনা পরম চণ্ডীপরায়ণা, সুতরাং আপন দ্বাদশবর্ষীয় বালকটিকে উদ্দেশে চণ্ডীর হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলেন। শ্রীমন্ত শ্রীদুর্গাকে স্মরণ করিয়া বঙ্গদেশ হইতে সিংহল যাত্রা করিলেন। সাগর মধ্যে কালিদহে তিনি কমলেকামিনী দেখিলেন, সিংহলরাজকে গিয়া তিনি কমলে কামিনীর বিবরণ দিলেন, কিন্তু রাজা স্বচক্ষে তাহা দেখিতে আসিলে তিনি কমলে কামিনী দেখাইতে পারিলেন না। রাজা শ্রীমন্তকে প্রতারক ভাবিয়া মশানে তাঁহাকে বধ করিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন। নিরপরাধী বালক মশানে আপনাকে নিরুপায় দেখিয়া

এবং সম্মুখে খরসান খড়্গ দেখিয়া মাতৃ-উপদেশ অনুসারে বিপদে বিঘ্নবিনাশিনীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। কোথায় সমুদ্র-গর্ভে সিংহল-দ্বীপ, আর কোথায় হিমাচল-শিখরে কৈলাশপুরী, কিন্তু হৃদয়-উচ্ছ্বসিত আরাধনা ভক্তবৎসল দেবতার নিকটে কখনই অরণ্যে রোদন হয় না। সিংহলে শ্রীমন্তের কাতরোক্তি শুনিয়া কৈলাসে ভগবতী উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন; প্রিয়সখী পদ্মাকে তিনি ব্যাকুল ভাবে বলিতে লাগিলেন—

——"পদ্মা, আজি দেখি বড় অমঙ্গল,
মুখ হৈতে খসে পান, সচকিত হয় প্রাণ,
আসন করয়ে টল মল।
আইস পদ্মা প্রিয়সখী, খড়ি পেতে দেখ দেখি
মন স্থির নহে কি কারণ,
অধর ভুজঙ্গ নরে, কে মোর স্মরণ করে
গ'ণে ঝাট কর নিরূপণ,
কপালে টনক নড়ে, অঙ্গে ধুতি নাহি পড়ে
স্পন্দন করয়ে ডানি আঁখি,
হেন মনে অনুমানি, কিবা মোর হয় হানি,
আজি বড় অমঙ্গল দেখি॥"

পদ্মা সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক, প্রভৃতি চৌদ্দ লোকের বার্ত্তা গণনা করিয়া শেষে ভগবতীকে বলিল "তোমারি ব্রতের দাসী খুল্লনার" পুত্র শ্রীমন্ত সদাগর

"মায়ের বচনে সাধু বাপের কারণ,
বহিত্র সাজিয়া আইল দক্ষিণ পাটন,
কালীদহে দেখে সাধু কামিনী কুঞ্জরে,
বিবাদ করিল গিয়া রাজার গোচরে,
হারিলেক সেই সাধু সাক্ষীর বচনে,
তারে বলি দেয় রাজা দক্ষিণ মশানে,
জীবনে কাতর তব দাসীর নন্দন,
সঙ্কট দেখিয়া করে তোমার স্মরণ॥"

তখন

কোপেতে লোহিত আঁখি, চণ্ডীকা বলেন সখী
শুন পদ্মা আমার বচন,
রাজারে করি সংহার, ছিরায় দিব রাজ্যভার
ঝাট কর সেনার সাজন,
গায়ে আরোপিল টাঙ্গি, তবক বেলক সাঙ্গি
ভুষণ্ডী ভাঙ্গস খরসান,
যমদণ্ড ভিন্দীপাল, টাঙ্গ টাঙ্গী করতাল
অসিপত্র কামান কৃপান।
চণ্ডী কৈল অট্ট হাস, দেবগণে লাগে ত্রাস,
নিনাদে ভরিল ত্রিভুবন,
যেন দৈত্য-রণ কালে, মেলি যত দিকপালে,
দিল তারে নিজ প্রহরণ।
চণ্ডীকার ক্রোধ দেখি, দেবগণ হৈয়া দুখী
কোলাহল হৈল সুরপুরে।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র নিতান্ত ভীত হইয়া নারদ-মুনিবরকে ভগবতীর কাছে প্রেরণ করিলেন,

"চণ্ডীকারে জিজ্ঞাসা করেন মহামুনি,
কহ গো এমন বেশে কোথায় সাজনি?
তোমার ক্রোধের কালে প্রলয় সমান,
কার তরে হেন বেশে ক'রেছ প্রয়াণ?

ভগবতী সমস্ত বৃত্তান্ত মহামুনিকে বলিলে পর, মুনিবর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন যে "যে রণসজ্জা দেখিলে ত্রিভুবন কম্পিত হয়, আজ একটি সামান্য মনুষ্য বধ করিতে সেই রণসজ্জা?" নারায়ণী ঈষৎ লজ্জিত হইলেন, এবং মহামুনির উপদেশ মতে

একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী রূপ ধারণ করিলেন—

জরাধি ব্রাহ্মণী অস্থি চর্ম্ম বিলোচনা,
মায়াকাশ শ্বাস ভ্রমে চপল লোচনা,
বাতে হইল কাঁকলি, জঘন হইল ভেড়ি,
উছাটের ঘায়ে চণ্ডী যান গড়াগড়ি,
বাম কক্ষে নিল মাতা রঙ্গণ চুপড়ি,
সব্য করে নিল মাতা সিদ্ধ বেত্র লড়ি,
করে নিল কুসুম চন্দন দুর্ব্বাধান,
বেদমন্ত্রে শ্রীমন্তেরে করিতে কল্যাণ।"

তাহার পরে মশানে আসিয়া

"কাঁকে ঝুড়ি হাতে লড়ি,উচ্চৈস্বরে বেদ পড়ি
বিনয়ে বলেন ধীরে ধীরে,
করযুত রুত গর্ব্বা, কুসুম চন্দন দুর্ব্বা,
আরোপিল কোটালের শিরে
কোটাল আইলাম তোমার সন্নিধান,
তুমি বড় ভাগ্যবান, এই কেতু মাগি দান,
ব্রাহ্মনীর করহ সম্মান।
জ্বরাযুত হইল তনু, বসি যে ধরিয়া জানু
ভূমি ধরি উঠি যে যতনে,
হেন জন নাহি কোলে,হাতেতে ধরিয়া তোলে
দোসর সাক্ষাৎ বন্ধু জনে।
নাতিটী হ'য়েছি হারা, দেখিলাম তার পারা
আইলাম তোমার সন্নিধান,
চিনিনু আপন নাতি, কোটাল পাইলে কথি,
বাপের পুন্যেতে কর দান।
শিশুমতি মোর নাতি, নাহি জানে চাঙ্কাতি,
নহে খণ্ড বাটিপাড় চোর,
শুনহ আমার বানি, ইথে নাহি হবে হানি,
কৃপা করি নাতি দেহ মোর।"

কিন্তু কোটাল রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনের ভয়ে বৃদ্ধব্রাহ্মনীর কোন অনুনয়-বিনয় শুনিল না। তখন ব্রাহ্মনী সদর্পে হতাশ-হৃদয় শ্রীমন্তকে ক্রোড়ে লইয়া মশানে বসিলেন, এবং ভৈরব হুহুঙ্কারে দিক্‌মণ্ডল আলোড়িত করিয়া তুলিলেন। দেবীর হুহুঙ্কার শ্রবনে ডাকিনী দানারা আসিয়া মশান মন্থন করিতে লাগিল, এবং আগত রাজসৈন্যদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিল।—শেষে সিংহলরাজ আপনি যুদ্ধে আসিলেন এবং তিনিও পরাস্ত হইলেন। তখন রাজার যেন দিব্য চক্ষু উন্মীলন হইল এবং তিনি কুঠার গলে বান্ধিয়া যোড়-করে ভগবতীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। কোমল-হৃদয় ভগবতী সদয় হইয়া রাজার মৃত সৈন্যদলের প্রাণ দান পর্য্যন্ত করিলেন। পরিশেষে রাজকন্যার সহিত শ্রীমন্তের বিবাহ দিয়া, শ্রীমন্তের পিতাকে মুক্ত করিয়া স্বীয় সেবিকা খুল্লনার হস্তে সকলকে সমর্পণ করিলেন।

কালকেতুর উপাখ্যানটিও অতিশয় সুন্দর। ভগবতী-ভক্ত কালকেতু জাতিতে ব্যাধ বলিয়া পশুপক্ষী শীকার করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। কিন্তু তবুও দারিদ্র্য বশতঃ তিনি ও তাঁহার ধর্ম্মশীলা পত্নী ফুল্লরা বিষম কষ্টে দিন যাপন করিতেন। মমতাময়ী ভগবতী তাঁহাদের দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া নানা অলঙ্কার পরিয়া ষোড়শী কুলকামিনী রূপে তাঁহাদের কুটীরে আবির্ভূত হইলেন। এবং অনেক ছলনার পর কালকেতুকে গুজরাটের অধিপতি করিয়া দিলেন।

পূর্ব্বে যখন কালকেতু ব্যাধ ছিলেন,

তখন ফুল্লরা সেই মাংস লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাইত। সেই বিক্রয়ের কড়ি হইতে সংসার চলিত। কিন্তু বার'মাসে বিক্রয়ের কিরূপ অসুবিধা হইত, ও সমস্ত বৎসর উভয়ের কি রূপ দারিদ্র্য-কষ্ট হইত, ফুল্লরা ভগবতীর নিকটে এই রূপে সেই বার মাসের দুঃখ ও কষ্ট বর্ণনা করিতে লাগিলেন—

বৈশাখে বসন্ত ঋতু খরতর খরা,
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা.
পদ পোড়ে খরতর রবির কিরণে,
শিরে দিতে নাহি আটে খাঁয়ার বসনে,
বৈশাখ হইল বিষ, বৈশাখ হইল বিষ,
মাংস নাহি খায় লোকে করে নিরামিষ।
সুপাপিষ্ট জ্যৈষ্ঠ মাস প্রচণ্ড তপন,
রবি-করে করে সর্ব্ব শরীর দাহন,
পসরা এড়িয়া জল খাইতে না পারি,
দেখিতে দেখিতে চীলে করে আধা সারি,
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠমাস, পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠমাস,
হুঁইচির ফল খায় করি উপবাস।
আষাঢ়ে পরিল মহী নবমেঘ জল,
বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল,
মাংসের পসরা লয়ে ভ্রমি ঘরে ঘরে,
কিছু খুদ কুঁড়া মিলে উদর না পুরে,
বড় অভাগ্য মনে গণি, বড় অভাগ্য মনে গণি
কত শত খায় জোঁক, নাহি খায় ফণি।
শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি,
মাংসের পসরা লয়ে ফিরি ঘরে ঘরে;
আচ্ছাদন নাহি গায়ে স্নান বৃষ্টিনীরে,
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান,
লঘু বৃষ্টি হইল কুঁড়ায় আইসে বাণ।
ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল,
নদনদী একাকার আট দিকে জল,
কত নিবেদিব দুঃখ, কত নিবেদিব দুঃখ,
দরিদ্র হইল স্বামী, বিধাতা বিমুখ।
আশ্বিনে অম্বিকা পুজা করে জগজ্জনে,
ছাগল মহিষ মেষ দিয়া বলিদানে,
উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা,
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা,
কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে,
দেবীর প্রসাদে মাংস সবাকার ঘরে।
কার্ত্তিক মাসেতে হৈল হিমের জনম,
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ,
নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়,
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়,
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান,
জানু, ভানু, কৃষাণু, শীতের পরিত্রাণ।
মাস মধ্যে মার্গশীর্ষ নিজে ভগবান,
হাটে মাঠে,গৃহে গোঠে সবাকার ধান,
উদর পূরিয়া অন্ন দৈবে দিল যদি,
যমসম শীত তাহে নিরমিল বিধি,
অভাগ্য মনে গণি, অভাগ্য মনে গণি,
পুরানো দোপাটা গায় দিতে টানাটানি।
পৌষেতে প্রবল শীত সুখী সর্ব্বজন,
তুলা তনূনপাৎ তৈল তাম্বুল তপন,
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ,
অভাগী ফুল্লরা মাত্র শীতের ভাজন,
হরিণ বদলে পাই পুরাণো খোসালা,
উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা,
বৃথা বনিতা জনম, বৃথা বনিতা জনম,
ধূলি ভয়ে নাহি মেলি নয়নে নয়ন।

নিদারুণ মাঘমাস সদাই কুজঝটি,
আন্ধারে লুকায়ে মৃগ নাপায়ে আখেটি,
ফুল্লরার আছে কত কর্ম্মের বিপাক,
মাঘ মাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক,
নিদারুণ মাঘ মাস, নিদারুণ মাঘ মাস,
সর্ব্বজন নিরামিষ কিম্বা উপবাস।
সহজে শীতল ঋতু এ ফাগুণ মাসে,
পীড়িত তপস্বীগণ বসন্ত বাতাসে,
শুন মোর বাণী, শুন মোর বাণী,
কোন্ সুখে আমোদিনী হইবে বাধিনী,
ফাগুণে দ্বিগুণ শীত খরতর খরা,
খুদ সেরে বান্ধা দিনু মাটিয়া পাথরা,
কতবা ভুগিব আমি নিজ কর্ম্মফল,
মাটিয়া পাথর বিনা না ছিল সম্বল,
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান,
আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান।
মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ,
মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ,
বনিতা পুরুষ দোঁহে পীড়িত মদনে,
ফুল্লরার অঙ্গ পোড়ে উদর দহনে,
দারুণ দৈব দোষে, দারুণ দৈব দোষে,
একত্র শয়নে স্বামী যেন যোল ক্রোশে॥

বাস্তবিক এই বর্ণনাটীর মত কৌশলময়ী রচনা, এমন অল্প কথায় এত প্রকার ভাব বিন্যাস আমারা বঙ্গসাহিত্যে কোথাও আর পাই নাই। কবিকঙ্কণের কল্পনা-সমুদ্র কেবল ভাব-তরঙ্গময়,ইদানীন্তন কবিদের কল্পনা প্রায়ই কেবল শব্দফেণময়। আমরা উদাহরণ স্বরূপ এখনকার এক জন সুপ্রসিদ্ধ কবির একটী বর্ণনার সঙ্গে কবিকঙ্কণের একটী বর্ণনা তুলনা করিয়া দেখিব। সেই সুপ্রসিদ্ধ কবি একটী মায়াকানন এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

মোহিনী মোহকর মহীরুহ রাজি
প্রকাশিল সুন্দর কিসলয়ে সাজি।
ধাবিল সমীরণ মলয় সুগন্ধি ;
চুম্বনে ঘন ঘন কুসুম আনন্দি।
কাঁপিল ঝর ঝর তরুশিরে সাধে,
শিহরিত পল্লব মর মর নাদে।
হাসিল ফুলকুল মঞ্জুল মঞ্জুল,
মোদিত মৃদুবাসে উপবন ফুল্ল।
কোকিল হরষিল কুহরবে কুঞ্জ ;
শোভিল সরোবরে সরোজিনী পুঞ্জ।
নাচিল চিতসুখে ময়ুর কুরঙ্গ ;
গুঞ্জরে ঘন ঘন মধুপানে ভৃঙ্গ।
সুন্দর শতদল প্রিয়তর আভা
সুরব অরধ অরধ শশী শোভা ;
শোভিল সুতরুণ স্থল জল অঙ্গে ;
বিরচিলা হ্লাদিনী মায়াবন রঙ্গে।

কিন্তু কবিকঙ্কণ কালীদহের উদ্যানটী এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

শুন কর্ণধার তারা, দেখয়ে সকল নেয়া,
মনোহর কমল উদ্যান।
ধন্য সিংহলের রাজা, কিবা করে শিব পূজা,
কিবা পূজা করে ভগবান।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, শতদল বিকসিত,
কহ্লার কুমুদ কোকনদ।
হেন মোর হয় জ্ঞান, দেবতার এ উদ্যান,
দেখি বহু কুসুম-সম্পদ॥
নাহি জানি কিবা হেতু, এককালে ছয় ঋতু,
গ্রীষ্ম হিম শিশির বসন্ত।
সঙ্গে মকরকেতু, বরষা শরৎ ঋতু,
বিরহী জনেরে করে অন্ত॥
রাজ-হংস করে কেলি, কৌতুকে মৃণাল তুলি,
প্রিয়মুখে করে আরোপন।
চঞ্চুপুটে বিন্ধে মাছে, সারস সারসী নাচে,
উড়ে বৈসে খঞ্জনী খঞ্জন॥
ডাহুক ডাহুকী ডাকে, চক্রবাকী চক্রবাকে,
বদনে বদনে আলিঙ্গন।
সঙ্গে চারি পাঁচ জানি, তাণ্ডব করয়ে কানী,
মন্দ মন্দ মেঘের গর্জ্জন॥
হেন লয় মোর মতি, দেবতার এই কীর্ত্তি,
অপরূপ দেখি কালীদহে।
কনক কুমুদ ফুটে, কান্তি কারু নাহি টুটে,
চিত্র গন্ধ লয়ে বায়ু বহে।

এখন, সহৃদয় পাঠক মাত্রকেই জিজ্ঞাস্য এই যে এই দুইটি বর্ণনার কোনটি পড়িলে সমস্ত শরীর পুলকিত ও হৃদয় মুগ্ধ হয়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

দুঃখিনী। প্রথম খণ্ড। শ্রীহরিশ্চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা বি, পি, এস্‌ যন্ত্রে মুদ্রিত। শকাব্দা ১৮০০।

ইহা একখানি পদ্যগ্রন্থ। একদা কোন মেঘাচ্ছন্ন অমানিশাতে পথভ্রান্ত হইয়া পথিক একটী বনের ভিতর উপস্থিত হন। তিনি সেই কাননের ভীষণ ভাব ও বজ্রের গম্ভীর নিনাদে ভীত হইয়া বনদেবীকে স্মরণ করেন। পরে বনদেবী তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিলে—তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন। এমন সময়ে বিদ্যুদ্ভালোকে বন উজ্জ্বলিত হইলে তিনি দেখিতে পাইলেন একটী রমণী অচেতন হইয়া ভূমে পতিত আছেন। পথিক অনেক যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে জানিতে পারিলেন তিনি ভারত-জননী। এই বিপদের সময় সম্মুখে আত্মীয় জন দেখিয়া ভারত-জননীর শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল—তিনি পথিককে আপনার দুঃখের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বাল্মীকির জন্য শোক করিলেন—ব্যাসদেবের জন্য শোক করিলেন—মৃত সকল সন্তানের জন্যই শোক প্রকাশ করিলেন, অধিক কি

আয় রে ক্ষেত্রমোহন এ বঙ্গ ভবনে;
কলে পাখাটানা, আর কল ময়দার—
কে সৃজিবে এবে ?

বলিয়া দুঃখ করিতে ত্রুটী করিলেন না। যাহা হউক, এ পুস্তক খানির ভাষা প্রাঞ্জল এবং স্থানে স্থানে ভাবও সুন্দর বটে। হরিশ বাবু যত্ন করিয়া লিখিলে এক জন মন্দ কবি হইবেন না।

বারইয়ারি পূজা—প্রহসন—জনৈক পাণ্ডা কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা গণেশ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ আনা।

পল্লীগ্রামে বারইয়ারী পূজা যেরূপ

কুৎসিত নিয়মে সম্পন্ন হয় এবং "পাণ্ডাগণ" সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া যে সকল ঘৃণিত কার্য্য করিয়া থাকেন—তাহাই অবলম্বন করিয়া পুস্তক খানি লিখিত হইয়াছে। এই ঘৃণিত পদ্ধতি যতই আমাদের দেশ হইতে উঠিয়া যায় ততই দেশের মঙ্গল।

সভ্যতা সোপান। দৃশ্য সমাজ চিত্র। প্রজাহিতাকাঙ্ক্ষিনা কেনচিদ্বান্ধবেন প্রণীতম। কলিকাতা গুপ্ত প্রেস। মূল্য চারি আনা।

বাঙ্গালীগণ পাশ্চত্য সভ্যতার অনুকরণ করিতে গিয়া—তাহার দোষ গুলি শিখিয়া লন এবং তাহা হইতে যে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হয় গ্রন্থকার তাহাই চিত্রিত করিয়াছেন। টামস গ্রউটের চরিত্রটী সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে।

কল্পদ্রুম। মাসিক পত্র। শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত। ১২৮৫ সাল ভাদ্রমাস।

এই মাসিক পত্রের এই খানিই প্রথম সংখ্যা,—সম্পাদক মুখবন্ধে বলিয়াছেন "পতিত মনুষ্যগণকে পরিত্রাণ করিবার জন্য ঈশ্বরকেও মর্ত্তভূমে আসিতে হইয়াছিল, এক্ষণে আবার সেই মনুষ্যের উপকারার্থে কল্পতরুকে স্বর্গ পরিত্যাগ করিতে হইতেছে"—আমরাও ব্যাকরণের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া "আগচ্ছ বরদে দেবি" বলিয়া কল্পক্রমকে কৃতাঞ্জলিপুটে আহ্বান করিতেছি। মর্ত্তলোকের আব্‌-হাওয়া স্বর্গের গাছ গাছড়ার পক্ষে নিতান্ত শুভকর না হইলেও, পণ্ডিতবর বিদ্যাভূষণের যত্নে যে কল্পদ্রুম অমৃত ফল প্রসব করিবে তাহা আমাদের ভরসা আছে।

প্রকৃতি-রঞ্জন। মাসিক পত্র। মাঘ-বৈশাখ। রাজকীয় যন্ত্রে মুদ্রিত।

এখানি এক খানি সুন্দর মাসিক পত্র। বাস্তবিক "অশিক্ষিত বা সামান্য-শিক্ষিত ব্যক্তিগণের বোধগম্য" এমন পরিপাটী এক খানি মাসিক পত্রের এত দিন অভাব ছিল। 'প্রকৃতিরঞ্জন' সে অভাব দূর করিয়াছে। ইহার প্রবন্ধগুলি যেমন সরল ভাষায় লিখিত, তেমনি হৃদয়-গ্রাহী।

ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

পূর্ব্ব সংখ্যার ভারতীতে আমরা "বল যার অধিকার তার" এই নিয়মটির বিষয় আলোচনা করিয়াছি—এক্ষণে লেখক মহাশয় ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ পক্ষে যে সকল অবশ্য-পালনীয় নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। তিনি বলেন—বাণিজ্য, শিল্প, রাজনৈতিক ভাব (Political spirit) ও বিজ্ঞান—এই গুলিই ভারতবর্ষীয়দিগের বিশেষ অভাব — রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের এই গুলিই মুখ্য নিয়ম ও সাধন —এই গুলিই আমাদের সকল রোগের মহৌষধি।

কিন্তু প্রথমেই এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, ভারতবর্ষীয়দিগকে একটি সমগ্র জাতি বলা যায় কি না? ভারতবর্ষীয় বলিলে ভারতবর্ষবাসী মুসলমান ও খৃষ্টান পর্য্যন্ত তাহার অন্তর্ভুক্ত হয় কি না? যদি তাহাদিগকে ছাড়িয়া শুদ্ধ হিন্দুজাতিকেই ধরা যায়—তাহা হইলেও এক্ষণে হিন্দুগণের যে রূপ অবস্থা, তাহাদিগকে কি এক জাতি বলিয়া মনে হয়? যে জাতির মধ্যে একতা-সূত্র নিবদ্ধ হইয়াছে—যাহারা সকলে এক ভাবে, এক উৎসাহে উত্তেজিত হয়—যে জাতির মধ্যে এক জনের বিপদ উপস্থিত হইলে সাধারণ-বিপদ বলিয়া সকলে মনে করে, সেই জাতির জাতীয়তার প্রকৃত পত্তন-ভূমি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিতে হইবে —যতক্ষণ তাহা না হইবে ততক্ষণ সে জাতি জাতি-নামের যোগ্য নহে। সমস্ত হিন্দুজাতির মধ্যে এখন একতা নাই—এখন হিন্দুজাতিকে একটি সমগ্র জাতি বলিয়াই যেন বোধ হয় না। লৌকিক আচার ব্যবহার ভাষা প্রভৃতিতে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশ প্রত্যেক প্রদেশ হইতে ভিন্ন। এক্ষণে পঞ্জাবি, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী, মাদ্রাজি, মহারাষ্ট্রী প্রত্যেককেই এক একটি স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া বোধ হয়। যত দিন না এই বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে বিজাতীয় বৈষম্যগুলি দূরীকৃত হইয়া একতা-সূত্র নিবদ্ধ হইবে, ততদিন আমরা স্বাধীনতার উপযুক্ত হইব না, স্বাধীনতার অধিকারী হইব না, ততদিন আমাদিগের স্বাধীনতার আশা দুরাশা মাত্র। এই একতার অভাবেই আমরা স্বাধীনতা হারাইয়াছি,এবং পৃথিবীর অনেক জাতিই এই একতার অভাবেই স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। অতএব সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একতার অভাবই প্রধান অভাব। এই একতা-সাধন পক্ষে বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি যে অতীব কার্য্যকারী তাহাতে সন্দেহ নাই—কোন জাতির মধ্যে বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্যের রীতিমত উৎকর্ষ সাধন হইলে, সে জাতির মধ্যে শুধু যে একতার সুবিধা হয় তাহা নহে, কিন্তু একত্র

হইয়া সাধারণ স্বার্থ রক্ষার্থ কি করিয়া কার্য্য করিতে হয়, কি করিয়া কার্য্যে সফলতা লাভ করা যায়—তাহার যথার্থ উপায় অবলম্বন করিবারও ক্ষমতা জন্মে।

সহস্র বৎসর দাসত্ব-ভারে প্রপীড়িত হইয়া স্বাধীনতার স্বাভাবিক ভাব—স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি—স্বাভাবিক স্পৃহা আমরা হারাইয়াছি। আমরা হৃদয়ের দ্বারা এক্ষণে স্বাধীনতার আস্বাদ পাই না—এক্ষণে জ্ঞান দ্বারা স্বাধীনতার উপকারিতা ও আবশ্যকতা আমাদিগকে বুঝিতে হইতেছে। হৃদয়ের স্বাভাবিক উত্তেজনায় এক্ষণে আমরা একত্র হইতে পারি না—এক্ষণে জ্ঞান দ্বারা একতার উপকারিতা বুঝিয়া তবে আমাদিগকে ঐক্য-সাধনে চেষ্টা করিতে হয়। অতএব একতা-সাধন পক্ষে এক্ষণে জ্ঞানানুশীলন যে সর্ব্ব প্রথমে প্রয়োজন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মনুষ্য-প্রকৃতিতে বুদ্ধির সহিত হৃদয়ের, জ্ঞানের সহিত ভাবের একটি স্বাভাবিক যোগ আছে। ইহারা পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করে। আমরা যদি প্রথমে জ্ঞানের কথায় কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হই—আর যদি পুনঃ পুনঃ সেই কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে থাকি—ক্রমে তাহা আমাদিগের ভাবের সহিত মিশ্রিত, হৃদয়ের সহিত জড়িত হইয়া যায়—ইহাই মানব-প্রকৃতির নিয়ম। আমরা যদি এক্ষণে জ্ঞান দ্বারা একতার উপকারিতা বুঝিয়া তাহার সাধনায় প্রবৃত্ত হই—ক্রমে আমরা ভাব দ্বারা চালিত হইয়া একত্র হইতে সমর্থ হইব। আমরা ভাবের সহজ পথ হারাইয়াছি—এক্ষণে আমাদিগকে দুরূহ জ্ঞানের পথ দিয়া ভাবের পথে উপনীত হইতে হইবে। সাধারণ জ্ঞানানুশীলন ও শিক্ষা এই জন্য নিতান্ত আবশ্যক। উচ্চতর বিজ্ঞান-চর্চ্চাও যে একতা-সাধনের বিলক্ষণ সহায়তা করে, বিজ্ঞান-প্রসূত বাষ্পীয় শকট, তাড়িৎ-বার্ত্তাবহ প্রভৃতি তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। তাহাদিগের সাহায্যে ভারতবর্ষের দূরবর্ত্তী প্রদেশ সকলের মধ্যে পরস্পর যাতায়াত কেমন সহজ হইয়া পড়িয়াছে—বাণিজ্য-ব্যাপারের কেমন সুগমতা হইয়াছে—এই রূপে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশীয় জাতিদিগের মধ্যে দ্রব্যের বিনিময় ও ভাবের বিনিময় দ্বারা একতার পথ কেমন অল্পে অল্পে উন্মুক্ত হইতেছে। তবে, এই সকল বাষ্পীয় শকট, তাড়িৎ-বার্ত্তাবহ প্রভৃতি যদি আবার আমাদিগের স্বজাতীয় বিজ্ঞান চর্চ্চার ফল হইত—যদি স্বজাতীয় ধনে ও স্বজাতীয় চেষ্টায় ঐ সকল ব্যাপার আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হইত, তাহা হইলে আর আমাদের সুখের সীমা থাকিত না—তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্য আরও সফল হইত—দেশের শ্রী সৌভাগ্য আরও বর্দ্ধিত হইত—ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইত। এক্ষণে "পর দীপ-মালা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।" অতএব বিজ্ঞান-চর্চ্চা যে জাতীয় উন্নতির প্রধান সোপান ও রাজ-নৈতিক স্বাধীনতা লাভের বিশিষ্ট উপায় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই একতা-সাধনের পক্ষে আমাদের

দেশে অনেক গুলি বাধা আছে এবং আরও নূতন নূতন বাধা উপস্থিত হইতেছে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুগণের মধ্যে অন্য বিষয়ে যতই কেন বিভিন্নতা থাকুক না, তাহাদিগের ধর্ম্ম এক ছিল। হিন্দু-ধর্ম্ম হইতে নানা সম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছিল বটে—কিন্তু সে সমুদায় হিন্দুধর্ম্মের শাখা-প্রশাখা বলিয়া পরিগণিত। বৌদ্ধধর্ম্ম যদিও হিন্দুধর্ম্ম হইতে প্রসূত, তথাপি হিন্দুধর্ম্মের অব্যবহিত অধীনতা স্বীকার না করায় উহা ভারতবর্ষে বহুদিন তিষ্ঠিতে পারে নাই। আমাদিগের সনাতন ধর্ম্মদর্পণে যে উপধর্ম্ম-মলা পড়িয়াছে, তাহা মার্জ্জিত করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা সম্পাদন কর তাহাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু নিরর্থক কোন নূতন ধর্ম্ম আনিয়া একতার বিঘ্ন সাধন করা স্বদেশ-বৎসলদিগের পক্ষে যুক্তিসিদ্ধ নহে। সেই জন্য এক্ষণে যাঁহারা ব্রাউপর'কে একটি নূতন বিজাতীয় ধর্ম্ম বহিস্বীকার।তপন্ন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁ[illegible]জনৈতি[illegible]তান্ত ভ্রান্ত সন্দেহ নাই। ভাষার বিভিন্নতা আর একটি একতার ব্যাঘাত—কিন্তু ইহাকে আমরা তত গুরুতর বলিয়া মনে করি না—কেন না, হিন্দুস্থানী ভাষা ব্যবহারতঃ সমস্ত ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা হইয়া পড়িয়াছে। কি বাঙ্গালী—কি বোম্বাইবাসী—কি মান্দ্রাজি—প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাষা থাকিলেও সাধারণ হিন্দুস্থানী ভাষায় ইহাঁদের পরস্পরের মধ্যে অনায়াসে কথোপকথন চলিতে পারে। তবে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে সাধারণের মধ্যে হিন্দুস্থানী ভাষার যাহাতে আরও অধিক চালনা ও শিক্ষা হয় তৎপ্রতি দেশহিতৈষী মাত্রেরই যত্ন করা বিশেষ আবশ্যক। এক কথায়—আচার ব্যবহারে, ভাবে, ধর্ম্মে, জ্ঞানে যতই ভারতবর্ষ একতার দিকে অগ্রসর হইবে, ততই হিন্দুগণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হইবে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পক্ষে আমাদিগের দুই প্রকার অভাব আছে। সমস্ত ভারতবর্ষের সাধারণ অভাব এবং ভারতবর্ষের অভ্যন্তরস্থ প্রত্যেক প্রদেশের বিশেষ বিশেষ অভাব। সমস্ত ভারতবর্ষের সাধারণ অভাবের মধ্যে একতার অভাব দেদীপ্যমান—এবং বিজ্ঞান ধর্ম্ম শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি এই একতা-সম্পাদনের বিশিষ্ট উপায়—সুতরাং এ সকলও সমস্ত ভারতবর্ষের সাধারণ অভাবের মধ্যে ধর্ত্তব্য—এবং এই সকল অভাব মোচনার্থ ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশকেই সাধারণরূপে মনোযোগ দিতে হইবে—কিন্তু এই সাধারণ অভাব ব্যতীত প্রত্যেক প্রদেশের আবার বিশেষ বিশেষ অভাব আছে—যে প্রদেশের যে বিশেষ অভাব তৎ-মোচনার্থ সেই প্রদেশবাসীদিগের বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ আবশ্যক। পঞ্জাবীদিগের শরীরে বল আছে, মনের তেজ আছে—হয়তো জ্ঞানের অভাবই তাহাদিগের মুখ্য অভাব। বোম্বাই-বাসীদিগের মধ্যে বাণিজ্য-ব্যবসায়ের তেমন অভাব নাই—হয়তো মানসিক তেজের অভাব। হিন্দুস্থানীদিগের শারীরিক বলের অভাব নাই. হয়তো বুদ্ধির অভাব। বাঙ্গালী-

দিগের বুদ্ধির অভাব নাই—তাহাদিগের শারীরিক বল সাহস ও একতার নিতান্ত অভাব। এই রূপ প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অভাব, এবং এই সকল অভাব মোচনার্থ প্রত্যেক জাতির বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ আবশ্যক। অন্যান্য প্রদেশের কি কি বিশেষ অভাব তাহা আমরা নিশ্চয় রূপে অবগত নহি—বঙ্গদেশের যে বিশেষ অভাব, প্রথমে তাহার আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইব। এক্ষণে শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা বলবতী হইয়াছে—এই স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হইবার জন্য প্রথমেই কি আবশ্যক? অন্য ভারতবাসীদিগের পক্ষে যাহাই হউক, বাঙ্গালীদিগের মুখ্য ও বিশেষ অভাব কি? রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের মুখ্য ও প্রথম সাধন কি?

কে না জানে, বাঙ্গালীজাতি শরীরের দুর্ব্বলতা ও ভীরুতার জন্য জগদ্বিখ্যাত। শারীরিক দুর্ব্বলতা ও ভীরুতাই বাঙ্গালি জাতির কলঙ্ক। এবং শারীরিক দুর্ব্বলতা হইতে চরিত্রের আর যে সকল দোষ স্বভাবতই প্রসূত হইতে পারে, তাহার সমস্তই বাঙ্গালী জাতিতে বর্ত্তিয়াছে। আলস্য, জড়তা, নিরুৎসাহ, অনুদারতা, ক্ষুদ্রতা, বৃথা-অভিমান প্রভৃতি শারীরিক দুর্ব্বলতার যে সকল অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহা বাঙ্গালী জাতির মধ্যে বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। অতএব এই অভাবটি যত দিন না মোচন হইবে ততদিন বাঙ্গালী জাতির কোন আশা নাই। এই অভাব মোচন না হইলে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া বিজ্ঞান চর্চ্চাই হউক—বাণিজ্য শিল্পের অনুশীলনই হউক বা রাজনৈতিক উদ্যমের পরিচয় দিয়া (Political spirit) সভায় বক্তৃতারই ধূমধাম হউক, বাঙ্গালীর প্রকৃত অভাব কিছুতেই ঘুচিবে না—তাহারা কখনই প্রবল জাতিদিগের মধ্যে গণ্য হইবে না—তাহারা কখনই রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হইবে না। এক্ষণে শারীরিক উন্নতির উপর আমাদিগের সকল উন্নতি নির্ভর করিতেছে। শরীর দুর্ব্বল হইলে—কি বিজ্ঞান, কি বাণিজ্য, কিছুতেই সম্যক্ রূপে উৎকর্ষ লাভ করা যায় না। মাড়োয়ারিরা বাণিজ্য-ব্যাপারে যেরূপ শারীরিক কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করে, তাহা কি দুর্ব্বল বাঙ্গালীর সাধ্য?—সাধ্য নাই বলিয়া কেঁয়ে মাড়োয়ারিরা বাঙ্গালার সকল বিপণীতেই বাণিজ্য-ব্যাপারে বাঙ্গালীদিগকে অতিক্রম করিয়া তাহাদিগের স্থান ক্রমে ক্রমে অধিকার করিতেছে। বিজ্ঞানের কথা যদি বল—এত দিনকল ব্যাপিয়া তো বিজ্ঞানের আলোচনা হইতেছে—কৈ তাহা হইতে স্থায়ী ফল কি ফলিয়াছে? স্থায়ী ফল ফলিতেছে না কেন, তাহার কারণ কোন পূর্ব্ব সংখ্যায় ভারতীতে যেরূপ চিত্রবৎ বিবৃত হইয়াছে, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে। "খর্ব্বকায় রুগ্ন শীর্ণ কতকগুলি লোকের কাছে কত দূর আশা করা যায়? শারীরিক বলের অভাবে তাহাদের মনের মহত্ত্ব জন্মিবে কোথা হইতে? তাহারা অত্যাচারে, অভাবে, শিশু ও অবলার ন্যায় ক্রন্দন করিতে পারে, পুরুষের মত,

বীরের মত অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারে না। আধ ঘণ্টা কঠিন বিষয় চিন্তা করিলে মাথা ঘুরিয়া যাইবে, দুই চারিটি চিন্তা-সাধ্য পুস্তক লিখিলে মাথার পীড়া হইবে। তবে এখন নূতন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করিবে কি করিয়া? যাঁহারা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত, তাঁহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানান্বেষণে ব্যস্ত থাকেন, কত রাত্রি নিদ্রাহীন নেত্রে তারকার দিকে চাহিয়া থাকেন, কত দিবস আহার ত্যাগ করিয়া সূর্য্যগ্রহণের প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। এ সকল কি আমাদের দৃষ্টি-অভাবে চসমা-চক্ষু, রাত্রি-জাগরণে অজীর্ণ-রোগী, বিশ্রাম-অভাবে রুগ্ন দেহ, বায়ুর দোষে শীর্ণ-ধাতু বি এ এমের কর্ম্ম?"—যদি তর্কের খাতিরেও আপাতত স্বীকার করা যায় যে, জ্ঞানানুশীলন শারীরিক বলের উপর নির্ভর করে না, তথাপি ইহা কে স্বীকার করিবে যে, বিনা শারীরিক বলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত বা রক্ষিত হইতে পারে? রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ পক্ষে বাহুবল অর্জ্জনই প্রথম সাধন। শারীরিক বলই রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রথম পত্তন-ভূমি। তবে, বাহুবল ও জ্ঞানবলের মধ্যে জ্ঞানবল যে উৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। কেন না, বাহুবলের সীমা আছে, জ্ঞানবলের সীমা নাই। এখনকার যুদ্ধ-বিগ্রহে বাহুবলের অপেক্ষা জ্ঞানবলের উপরেই অনেকটা জয়-পরাজয় নির্ভর করে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া এক্ষণে বাহুবলের প্রয়োজন যে একেবারে চলিয়া গিয়াছে তাহা নহে—বরং দুই পক্ষের মধ্যেই যদি জ্ঞানবল সমান থাকে—এবং উহার এক পক্ষে বাহুবলের আধিক্য থাকে, তাহা হইলে সে স্থলে যে পক্ষে বাহুবলের আধিক্য, সে পক্ষ যে জয় লাভ করিবে তাহা এক প্রকার নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে। অতএব বিজ্ঞান-অনুশীলনই কি বাঙ্গালীর পক্ষে যথেষ্ট?—বিজ্ঞান হইতে আমরা বন্দুক লাভ করিতে পারি বটে, কিন্তু সেই বন্দুক ঘাড়ে করিয়া ১০। ২০ ক্রোশ অবিশ্রান্ত অগ্রসর হইয়া ভীষণ বিপক্ষ, সৈন্যের সম্মুখবর্ত্তী হওয়া কি শারীরিক বল ও সাহসের কর্ম্ম নহে? লেখক মহাশয় তো এক স্থলে আপনিই বলিয়াছেন যে—"Nay history proves more—It proves that even if the conquering race occupy an inferior scale of civilization, even if it be destitute of those arts and sciences which are generally recognized as the inevitable concommitants of a civilized life and have no other qualities to recommend itself but manly courage, abounding energy and undisguised frankness, its hammering down the tottering remnants of a highly civilized but exceedingly corrupt nation is of rare service to humanity as a whole. It is hardly necessary to allude to those whom we mean. We mean of course the Franks, the Goths

and the Vandals." অতএব তিনি এই স্থলে আপনিই প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পক্ষে বিজ্ঞান শিল্পই মুখ্য সাধন নহে—এবং ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য-স্থল। কিন্তু তিনি আর এক স্থলে বিজ্ঞানকে স্বাধীনতা লাভের মুখ্য সাধন বলিতেছেন—"Thus science—that which our present wise and benevolent Ruler has already proposed seems to be the chief remedy—yea the panacea to say to all the frightful maladies which our dear country is so intensely suffering from. Following his advice, let us direct our efforts to a thorough cultivation and as much as possible to a wide diffusion of Science. It is Science, it is 'Culture' in the German sense of that word that should now engage our best energies, inorder that we may in due time reap its golden fruits which are:—National Prosperity, National Liberty, and as the full mature outcome of all, a free vigorous and noble National Literature."—অতএব উদ্ধৃত দুই স্থল যে পরস্পর বিরোধী তাহা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইতেছে। এবং লেখক মহাশয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের যে সকল উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে শারীরিক বল ও সাহস এবং ধৈর্য্য বীর্য্য প্রভৃতি বীর-ধর্ম্মকে একেবারেই ধরেন নাই বলিয়াই এই বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বলি—সভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ পক্ষে বিজ্ঞান ও বাহুবল উভয়ই আবশ্যক। ফ্রাঙ্ক, ভাণ্ডাল, গথ প্রভৃতি বিজ্ঞান-শিল্প-বিহীন অসভ্যেরা যদি কেবল পৌরুষ সাহস, অপরিমিত উদ্যম এবং অপ্রচ্ছন্ন সরলতার বলে জগদ্বিজয়ী রোমকদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, তবে বাঙ্গালিজাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য কি বিজ্ঞান শিল্পই বিশিষ্ট উপায়—মুখ্য সাধন—সকল রোগের মহৌষধি? যদি জগদ্বিজয়ী রোমকদিগের স্বাধীনতা রক্ষার পক্ষে পৌরুষ সাহস প্রভৃতিই নিতান্ত আবশ্যক হয় এবং সেই সকল গুণের অভাবই তাহাদিগের পতনের কারণ হয়, তাহা হইলে চির-দাসত্ব-পীড়িত হীনবল ভীরু বাঙ্গালি জাতির পক্ষে কি ঐ সকল গুণের অর্জ্জন-চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে আরও প্রয়োজন নহে? বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্যকে আমরা অনাদর করিতে বলিতেছি না—অনাদর করা দূরে থাকুক, বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্যকে আমাদের সভ্যতা ও উন্নতির প্রধান সোপান বলিয়া মনে করি। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই, কেবলমাত্র বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্যের বলে কোন জাতি এপর্য্যন্ত স্বকীয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই।

স্বাধীনতা লাভের পক্ষে এখন শারীরিক বল ও সাহসের নিতান্ত প্রয়োজন। লেখক

মহাশয় লর্ড লিটনকে এই জন্য সাধুবাদ দিয়াছেন যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণের দিন এই মর্ম্মে বক্তৃতা করেন যে, হিন্দুদিগের শিক্ষা ও উন্নতির পক্ষে বিজ্ঞান যেমন উপকারী, এমন আর কিছুই নহে। কিন্তু আমরা বলি, লর্ড লিটন মুখে মাত্র এই বক্তৃতা করিয়া যত না আমাদিগের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন, তদপেক্ষা আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণর ক্যাম্বেল সাহেব বিদ্যার্থীদিগের জন্য ব্যায়ামচর্চ্চা ও কর্ম্মার্থীদিগের জন্য অশ্বারোহণ শিক্ষার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া আমাদিগের অধিক কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই। এক্ষণে জ্ঞানানুশীলনে যেরূপ সকলে মনোযোগী হইতেছেন, শারীরিক বল, সাহস, উদ্যম, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণসকল যে উপায়ে বাঙ্গালিরা অর্জ্জন করিতে পারে, তাহারও প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া শিক্ষিত বঙ্গবাসী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ধৈর্য্য বীর্য্য দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণসকল যে অনেক পরিমাণে শারীরিক বলের উপর নির্ভর করে তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। যদিও কেবল সুশিক্ষার প্রভাবেই অনেক সময় আমাদিগের কর্ত্তব্য-বোধ ও অন্যান্য উচ্চতর স্পৃহা মনে উদ্বোধিত হইয়া আমাদিগকে পুরুষোচিত মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে শারীরিক বল আমাদিগের সহায় না থাকিলে আমরা সেই সকল কার্য্যে আশানুরূপ ফল লাভে সমর্থ হই না, আমাদিগের উচ্চ স্পৃহা সকলকে কার্য্যে সম্যক্‌রূপে পরিণত করিতে পারি না। শিক্ষিত বঙ্গবাসীগণ অনেক সময় "বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া" করিয়া জগতের সমক্ষে যে হাস্যাস্পদ হয়েন তাহার কারণ কি?—কারণ আর কিছুই নহে—শিক্ষার প্রভাবে আমাদিগের মনে নানা প্রকার উচ্চ স্পৃহা উদিত হয়—কর্ত্তব্য-বুদ্ধি দ্বারা উৎসাহিত হইয়া সেই সকল স্পৃহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আমরা অনেক বৃহৎ বৃহৎ অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করি কিন্তু কার্য্যকালে আমাদের স্বাভাবিক দৈহিক দুর্ব্বলতা-প্রসূত জড়তা আসিয়া আমাদিগকে সেই সকল অনুষ্ঠান সমাপ্ত করিতে দেয় না—কিম্বা সমাপ্ত হইলেও তাহাদিগকে স্থায়ী করিতে দেয় না।

এক্ষণে বঙ্গবাসীগণ কি উপায়ে শারীরিক বল ও সাহস সঞ্চয় করিবেন ভাবিতে গেলে নিরাশ হইতে হয়। আমাদের দেশের জল-বায়ু, ভূমি ও ভৌগোলিক সংস্থান সকলই শারীরিক বলের বিরোধী—মন্‌টেস্‌কু হইতে আরম্ভ করিয়া বকল ও টেন পর্য্যন্ত সকলেই জাতীয় চরিত্রের উপর বাহ্য প্রকৃতির কত দূর প্রভাব তাহার ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছেন—এই বাহ্য প্রকৃতির প্রভাব ভাবিতে গেলে বাঙ্গালীরা যে কোন কালে বীর-জাতি হইবে এরূপ আশা মন হইতে একেবারে দূর করিতে হয়। কিন্তু বাহ্য প্রকৃতিকেও জয় করিতে পারে এরূপ আর একটি প্রবলতর শক্তি মনুষ্যের অন্তরে নিহিত আছে—সেটি মনের শক্তি—

ইচ্ছার শক্তি—অধ্যবসায়ের শক্তি—এই শক্তির প্রভাবেই মনুষ্যগণ বাহ্য প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের কঠোর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তাহার মধ্যেও সুন্দর পুরী নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে—নীরস মরুভূমিকেও প্রফুল্ল উদ্যানে পরিণত করিতে পারিয়াছে—অপার সাগরকেও আয়ত্তের মধ্যে আনিতে সক্ষম হইয়াছে। আমরা যখন জ্ঞান দ্বারা বুঝিয়াছি যে, শরীরের দুর্ব্বলতাই আমাদিগের জাতীয় অবনতির প্রধান কারণ—তখন যদি আমরা ইচ্ছাকে বলবতী করিয়া অধ্যবসায়-সহকারে—যে সকল সামাজিক প্রথা আমাদের শরীরের বল-নাশক, সেই সকল সামাজিক প্রথাকে উন্মূলিত করিয়া—স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন ও ব্যায়াম চর্চ্চা প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিয়া শারীরিক বলের সাধনা করি—তাহা হইলে কি আমরা জল বায়ু ভূমি প্রভৃতির প্রাকৃতিক প্রভাবকে কিয়ৎপরিমাণে অতিক্রম করিতে পারি না?—বকল্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জাতীয় চরিত্রের উপর জল বায়ুর প্রভাব যত দূর প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ততদূর বাস্তবিক কিনা তাহা অধুনাতন কোন কোন চিন্তাশীল লেখক সন্দেহ করিয়া থাকেন। বিখ্যাত লেখক Bagehot তাঁহার "Physics and Politics" গ্রন্থের ১৮৩ পৃষ্ঠায় বলেন, "Climate and physical surroundings, in the largest sense, have unquestionably much influence; they are one factor in the cause, but they are not the only factor; for we find most dissimilar races of men living in the same climate, and affected by the same surroundings; and we have every reason to believe that those unlike races have so lived as neighbours for ages." প্রসিদ্ধ জাতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত Wallace সাহেব বলেন Papuan ও Malay জাতি একই গ্রীষ্ম-প্রধান প্রদেশে যুগ-যুগান্তর হইতে পাশাপাশি রহিয়াছে অথচ তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রকার বিভিন্নতা বিদ্যমান। তাঁহার গবেষণায় আরও প্রকাশ পায় যে, জন্তুদিগের পক্ষেও প্রাকৃতিক অবস্থার প্রভাব, সকল স্থানে ও সকল অবস্থায় বলবৎ নহে। তিনি বলেন—"Borneo closely resembles New Guinea, not only in its vast size and freedom from volcanoes but in its variety of geological structure, its uniformity of climate, and the general aspect of the forest-vegetation that clothes its surface. The Moluccas are the counterpart of the Philippines in their volcanic structure, their extreme fortility, their luxuriant forests, and their frequent earthquaqes; and Bali, with the east end of Java, has a climate almost as arid as that of Timor. Yet between these corresponding groups of islands, constructed, as it were, after the same patern, subjected to the same climate, and bathed by the same oceans, there exists the greatest possible contrast, when we compare their animal productions. Nowhere does the ancient doctrine—that differences or similarities in the various forms of life that inhabit different countries are due to corresponding physical differences or similarities themselves—meet with so direct and palpable a contradriction. Borneo and New Guinea, as alike physically as two distinct countries can be, are zoologically as wide as the poles asunder; while Australia with its dry winds, its open plains, its stony deserts and its temperable climate yet produces birds and quadrupeds which are closely related to those inhabiting the hot, damp, luxuriant forests which everywhere clothe the plains and mountains of New Guinea"—অতএব বাঙ্গালী যুবকগণ যদি অধ্যবসায়-সহকারে ব্যায়াম-চর্চ্চা প্রভৃতি উপায়ের অনুসরণ করেন, তাহা হইলে কেনই বা না বাহ্য প্রকৃতির প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া শারীরিক বল-সঞ্চয়ে সমর্থ হইবেন? কিন্তু এই প্রকার অধ্যবসায়ের পূর্ণ ফল যাঁহারা অচিরাৎ দেখিতে চাহেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই নিরাশ হইবেন—কেন না, যে নিয়মে আমরা পূর্ব্বপুরুষের দোষগুণের উত্তরাধিকারী হই, সেই কৌলিক নিয়মের প্রভাবে আমরা আমাদিগের অধ্যবসায় সত্ত্বেও—পূর্ব্বপুরুষদিগের দুর্ব্বল শারীরিক গঠন ও প্রকৃতির উত্তরাধিকার হইতে একেবারেই অব্যাহতি পাইব না, পরন্তু ক্রমে ক্রমে ব্যক্তিগত চেষ্টা ও অধ্যবসায় কৌলিক অধিকারের প্রভাবকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে।

প্রত্যেক ব্যক্তি কিম্বা জাতির উন্নতির মূলে—এমন কি, সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রধানতঃ দুইটি মূল নিয়ম দৃষ্ট হয়। একটি কৌলিক গুণ-প্রবাহের নিয়ম (Principle of Heredity) আর একটি উপযোগিতার নিয়ম (Principle of Adaptibility). এই দুইটি নিয়মই মনুষ্য-সমাজে একত্র কার্য্য করিতেছে। প্রথমোক্ত নিয়মটির প্রভাবে আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের দোষ-গুণের উত্তরাধিকারী হই, এবং শেষোক্ত নিয়মটির অনুযায়ী আমাদিগের নিজ চেষ্টায় আপনাদিগকে অবস্থা ও ঘটনার উপযোগী করিয়া লইতে সমর্থ হই। যাহা বরাবর হইয়া আসিয়াছে তাহাই রক্ষা করিবার জন্য এবং তাহারই স্থায়িত্ব সম্পাদনের জন্য একটি নিয়ম সতত চেষ্টা করে, অপর নিয়মটি দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে আমাদিগকে অবস্থা ও ঘটনার উপযোগী করিয়া অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তনের দিকে—উন্নতির দিকে লইয়া যায়—এক কথায় একটি রক্ষণশীল—আর একটি পরিবর্ত্তনশীল বা উন্নতিশীল। এই দুই নিয়মে সমাজের শ্রেণীগত সাদৃশ্য রক্ষিত

হয় ও ব্যক্তিগত বিভিন্নতা সম্পাদিত হয়। নূতন নূতন ঘটনা ও অবস্থা-স্রোতে আমরা একেবারে ভাসিয়া না যাই, কৌলিক নিয়ম আসিয়া তাহার প্রতিরোধ চেষ্টা করে এবং কৌলিক নিয়মানুসারে যে দোষ-প্রবাহ বংশপরম্পরাক্রমে প্রবাহিত হইবার কথা, উপযোগিতার নিয়ম আসিয়া তাহার পরিশোধন চেষ্টা করে; এইরূপে এই দুই নিয়মের ঘাত-প্রতিঘাতে মনুষ্য-সমাজ উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

আমরা বাঙ্গালি-জাতি যেমন একদিকে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে দয়া, ধর্ম্ম,তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভৃতি সদ্গুণের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি, সেইরূপ আর এক দিকে তাঁহাদিগের ভীরুতা, নির্ব্বীর্য্যতা প্রভৃতি দোষেরও উত্তরাধিকারী হইয়াছি। এইক্ষণে এই দোষগুলি আমাদিগের চরিত্র হইতে অপনীত করিবার জন্য বাহিরের ঘটনাবলী ও অবস্থা কতদূর অনুকূল ও উপযোগী দেখা আবশ্যক। বলিষ্ঠ সাহসী ইংরাজ-জাতির সংশ্রব ও দৃষ্টান্ত একদিকে যেমন এই উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে উপযোগী, সেইরূপ আর একদিকে ইংরাজি সভ্যতা তাহার প্রতিকূল কি না তাহা আমাদিগের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। Mill মিল তাঁহার সভ্যতা নামক প্রবন্ধে এই মর্ম্মে বলেন যে, ইংরাজি সভ্যতার প্রভাবে ইংরাজদিগের বীর্য্য দিন দিন হ্রাস হইতেছে। তিনি বলেন—"There has crept over the refined classes, over the whole class of gentlemen in England, a moral effeminacy, an inaptitude for every kind of struggle. They shrink from all effort, from every thing which is troublesome and disagreeable. The same causes which render them sluggish and unenterprising, make them, it is true for the most part, stoical under inevitable evils. But heroism is an active, not a passive quality, and when it is necessary not to bear pain but to seek it, little needs be expected from the men of the present day. They can not undergo labour, they can not brook ridicule. they can not brave evil tongues : They have not hardihood to say an unpleasant thing to any one whom they are in the habit of seeing, or to face even with a nation at their back, the coldness of some little coterie which surrounds them."

যদি বলিষ্ঠ ইংরাজজাতিকেও ইংরাজি সভ্যতা দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতে পারে, তাহা হইলে চির-দুর্ব্বল বাঙ্গালি জাতি তো উহার দ্বারা আরও দুর্ব্বল হইবার কথা। এখনও ইংরাজদিগের প্রকৃতিতে কুল-পরম্পরাগত এত খানি সার সঞ্চিত আছে,অ্যাঙ্গ্লোস্যাক্সন রক্তের এত অধিক তেজ আছে যে, তাহারই বলে তাহারা ইংরাজি সভ্যতার দৌর্ব্বল্যজনক প্রভাব কথঞ্চিৎ অতিক্রম করিতে সমর্থ

হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালিজাতির সে সারও নাই, সে তেজও নাই, অথচ সেই ইংরাজি সভ্যতার সমস্ত ভার তাহাদিগের দুর্ব্বল স্কন্ধে চাপানো হইয়াছে। বাঙ্গালিজাতির পুরুষ পরম্পরায় অর্জ্জিত অন্তরের সারবত্তা ও শারীরিক বল নাই বলিয়াই তাহারা কোনও বিদেশীয় জাতির প্রভাব এ পর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। যখন মুসলমানদিগের আধিপত্য ছিল, তখন আমরা মুসলমানদিগের সভ্যতায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম, এক্ষণে আবার ইংরাজি সভ্যতায় সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। মুসলমানদিগের আমলে তাহাদিগের অনুকরণে চাপকান কাবা পরিয়াছিলাম, এক্ষণে আবার একেবারেই হ্যাট্ কোট্ পেণ্ট্লুন পরিতে আরম্ভ করিয়াছি!

কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, মুসলমানি সভ্যতা ইংরাজি সভ্যতা অপেক্ষা আরও দৌর্ব্বল্যজনক। মুসলমানদিগের তুলনায় ইংরাজের সংশ্রব আমাদের পক্ষে যে অনেক উপকারী তাহাতে সন্দেহ নাই। মুসলমান সভ্যতার সহিত আলস্য ও বিলাসের মূর্ত্তিমান প্রতিরূপ-আতর গোলাব তাকিয়া গদি প্রভৃতি যেন একেবারে জড়িত, এবং ইংরাজি সভ্যতা-গত বিলাস-সামগ্রীর মধ্যেও অপেক্ষাকৃত কার্য্যতৎপরতা ও উদ্যমের ভাব লক্ষিত হয়। ইহা কে না স্বীকার করিবে যে, ইংরাজদিগের সংসর্গে, শিক্ষায় ও দৃষ্টান্তে আমাদিগের কার্য্য-তৎপরতা ও শ্রমশীলতা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু ইহা আমাদিগের স্বাভাবিক নহে, সুতরাং ইহার উপর নির্ভর করা যায় না। শারীরিক বল ও স্ফূর্ত্তি হইতে স্বাভাবিক ভাবে যে উদ্যম-তৎপরতা প্রসূত হয়, তাহাই অপেক্ষাকৃত অধিক ফলপ্রদ ও স্থায়ী। ইংরাজি সভ্যতার প্রভাবে আমাদের এত অভাব বৃদ্ধি হইয়াছে যে, আর অল্পে সন্তুষ্ট হইবার যো নাই। জীবিকার উপায় করিবার জন্য আকুল হইয়া সকলকে ইতস্ততঃ বেড়াইতে হইতেছে, এমন কি, উহার জন্য আমাদিগের যুবকদিগকে সাত সমুদ্র পার হইয়া দূর দেশে যাইতে হইতেছে। এত উদ্বেগ ও এত চিন্তা বাঙ্গালীর দুর্ব্বল শরীরে কি সহ্য হইবে? এক্ষণে ইংরাজদিগের শাসনে আমাদিগের মধ্যে যেরূপ এক দিকে কার্য্য-তৎপরতা,উদ্যম ও স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি হইতেছে—সেইরূপ আর এক দিকে আমাদিগের দৈহিক বল-সঞ্চয়ের প্রতি লোকের কি সেরূপ যত্ন ও মনোযোগ দেখা যায়? মুসলমানদিগের আমলে তেমন সুশাসন ছিল না—দস্যুদিগের প্রাদুর্ভাব ছিল, সুতরাং সকলকে দায়ে পড়িয়া শারীরিক বল ও সাহস অর্জনের চেষ্টা করিতে হইত। তখন লেখা পড়ারও এত চাপ ছিল না, সুতরাং শরীরের প্রতি অনেকটা লোকের দৃষ্টি থাকিত। বিপদের সহিত সংগ্রাম না করিলে কখনই সাহস ও আত্ম-নির্ভরের শিক্ষা হয় না। কিন্তু এক্ষণে আমাদের বিপদের লেশমাত্র আশঙ্কা নাই। আমরা শান্তির ক্রোড়ে দিব্য আরামে শুইয়া আছি। রাজপুরুষদিগের উপর সমস্ত নির্ভর, আপনার উপর কিছুই নির্ভর

করিতে হয় না। পুলিসের এমনি শাসন, জীবন-সম্পত্তি রক্ষার জন্য আমাদিগের নিজের কোন চেষ্টা পাইতে হয় না। এই জন্য শারীরিক বল ও সাহস অর্জনের নিমিত্ত আমাদিগের কোন প্রয়োজনই বোধ হয় না। তাতে আবার লেখা পড়ার এত চাপ যে, এতদ্দেশীয় যুবকেরা শরীরের প্রতি মনোযোগ দিতে অবকাশ পান না এবং রাজপুরুষদিগেরও সে দিকে দৃষ্টি নাই। আমরা এ কথা বলি না যে, অরাজকতা হউক, অশান্তি হউক, লেখা-পড়া দেশ হইতে উঠিয়া যাউক, কেবল শারীরিক বল অর্জনে লোকের চেষ্টা হউক। তাহা আমাদিগের বলিবার অভিপ্রায় নহে। আমরা বিলক্ষণ জানি যে, জ্ঞান-বিরহিত শারীরিক বল পশুতেই শোভা পায়—তাহা মনুষ্যের উপযুক্ত নহে, এবং ইহাও বিলক্ষণ জানি যে, যদি কোন জনসমাজে অরাজকতা অশান্তি থাকে, জীবন-সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্তই সকলকে আকুল হইতে হয়, তাহা হইলে সে সমাজের অন্তর্ভূত কোন ব্যক্তি শিল্প বাণিজ্য বিজ্ঞান সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না, সুতরাং সভ্যতা ও উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু আমাদিগের বলিবার অভিপ্রায় এই যে, যেহেতু আমাদিগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা শারীরিক বল ও সাহস অর্জনের অনুকূল নহে, সেই জন্যই আরও, দেশের লোক ও রাজপুরুষদিগের এই বিষয়ে অধিক মনোযোগী হওয়া উচিত। আমরা এক্ষণে যে শান্তি উপভোগ করিতেছি তাহা নির্জীবের শান্তি—তাহা মৃতদেহের শান্তি—তাহা বলবান জীবন্ত পুরুষের শান্তি নহে। শান্তিকে রক্ষা করিবার জন্যও বলের প্রয়োজন। যদি আমাদিগের নিজের বল না থাকে, তাহা হইলে শান্তি রক্ষার জন্য চিরকালই পরের উপর নির্ভর করিতে হইবে। যে শান্তি রক্ষার জন্য পরের উপর নির্ভর করিতে হয়, সে শান্তির স্থায়িত্ব কোথায়? আজ যদি ইংলণ্ড আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যান, আমাদিগের এতটুকুও কি বল-সঞ্চয় হইয়াছে যে, আমরা নিজ বলে আপনাদিগের মধ্যে শান্তি রক্ষা করিতে পারি? সত্য, ইংলণ্ডের প্রসাদে আমরা তাড়িৎ-বার্ত্তাবহ পাইয়াছি—বাষ্পীয় শকট পাইয়াছি, বাষ্পীয় আলোক লাভ করিয়াছি, কিন্তু ইংলণ্ড যদি আজ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যান—তা হইলে উহার অবশিষ্ট আর কি থাকে? তাড়িৎ-বার্ত্তাবহ প্রভৃতি কি তড়িতের ন্যায় তিরোহিত হয় না? এবং বাষ্পীয় শকট প্রভৃতি কি বাষ্পের ন্যায় বায়ুতে বিলীন হইয়া যায় না? ইংলণ্ডের কামান বন্দুক বেয়নেট, শত্রুর আক্রমণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে সত্য—কিন্তু ইংলণ্ড আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে কি আমরা শিশুর ন্যায় একেবারে অসহায় ও নিরুপায় হইয়া পড়ি না?

আমরা ইংলণ্ডের নিকট আর কিছুই চাহি না—আমাদিগের বাহ্য সুখ-সমৃদ্ধি হোক্ বা না হোক্ তাহাতে ক্ষতি নাই। তিনি যদি আমাদিগের মৃতবৎ নির্জীব দেহে এতটুকু বল-সঞ্চার করিতে পারেন যে আমরা

আপনার উপর নির্ভর করিতে পারি—আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারি—আপনার উন্নতি আপনারাই সাধন করিতে পারি—তাহা হইলেই আমরা তাঁহার নিকট প্রকৃত উপকার লাভ করিব—এবং তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হইব।—তিনি যদি আমাদিগের অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লন—তিনি যদি উপযুক্ত দেশীয় লোকদিগকে রাজ্যের উচ্চ পদে অভিষিক্ত করিতে কৃপণতা করেন—তিনি যদি ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে অনৈক্য-বীজ বপন করেন—তিনি যদি দেশীয় বাণিজ্যের প্রতি বিদ্বেষ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করেন—তিনি যদি দেশীয় সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করেন—তিনি যদি দেশীয়দিগকে পদে পদে অবিশ্বাস করেন—তিনি যদি আমাদিগকে চিরকাল শৈশব দশায় রাখিতে চেষ্টা করেন—তাহা হইলে আমরা কি কখন স্বাধীনতা-লাভের উপযুক্ত হইতে পারি? স্বীকার করি আমাদিগের নিজের চেষ্টা, নিজের অধ্যবসায়ের উপর অনেকটা নিজের উন্নতি নির্ভর করে কিন্তু আমরা সহস্র বৎসরের অধীনতায় একেবারে চিররোগীর ন্যায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি—আমাদিগের দুর্ব্বল চেষ্টায় কত দূর হইতে পারে? তাহাতে যদি আবার কোন উচ্চতর প্রভু-শক্তি আসিয়া আমাদিগের উন্নতির পথে সহায়তা করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহাতে কণ্টক রোপণ করেন, তাহা হইলে কি আমরা এক পদও অগ্রসর হইতে পারি? লেখক মহাশয় এক স্থলে বলিয়াছেন "Do you think if we *deserve* libety, that is so say, if we have slowly but surely developed those conditions which alone entitle a nation to that grand golden privilege, England would be willing to withhold us from it—England, the land of noble heroic patriots?"

লেখক মহাশয়ের ন্যায়, স্বাধীনতার জন্মভূমি ইংলণ্ডও অনেক সময়ে আমাদিগকে এই আশ্বাস দিয়া থাকেন যে, অগ্রে উপযুক্ত হও, তবে তোমাদিগকে আমি উচ্চ অধিকার প্রদান করিব—কিন্তু উপযুক্ত হইবার অবসর না দিলে কেহ কখন কি উপযুক্ত হইতে পারে?—পিতা যদি তাঁর দুর্ব্বল সন্তানকে অষ্টে-পৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া রাখিয়া তাহাকে বলেন যে, অগ্রে তুমি উপযুক্ত হও তবে তোমাকে আমি পদচারণা করিতে দিব—সে যেরূপ আশ্বাস-বাক্য ইহাও তদ্রূপ। শিশুকে পদচারণা শিক্ষা দিবার সময় শিশু পদে পদে স্খলিত-পদ হয়—কিন্তু এই রূপ পদস্খলনের ওজর করিয়া যদি তাহাকে বলা হয়—তোমার এখনও উপযুক্ত বল হয় নাই, যখন বল হইবে তখন পদচারণা করিও—এ যেরূপ কথা উহাও সেই রূপ। সমস্ত হিন্দুজাতি জেতৃজাতির ইচ্ছামাত্র ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে—লেখক মহাশয় এই রূপ বিভীষিকা দেখাইয়াছেন, কিন্তু চিরকাল শৈশব দশায় থাকা অপেক্ষা একেবারে পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হওয়াই কি প্রার্থনীয় নহে?

ইংলণ্ডের একবার ভাবা উচিত, কি মহান

ভার বিধাতা তাঁহার স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন—বিংশতি কোটি মানবের সুখ-শান্তি-স্বাধীনতা তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে। তিনি প্রথমে জয় করিবার উদ্দেশে এখানে আসেন নাই—বাণিজ্যের জন্যই আসিয়াছিলেন—মুসলমানের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া আমরা তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আনিয়া তাঁহার হস্তে আমাদিগের যথা-সর্ব্বস্ব সমর্পন করিয়াছি বলিলেও হয়। একবার তিনি স্মরণ করিয়া দেখুন, যে পলাশির যুদ্ধে সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি প্রবেশ লাভ করিতে পারিলেন, সে যুদ্ধে কাহার সাহায্যে তিনি জয় লাভ করিলেন ?—আমরা দাসত্ব-অত্যাচারে প্রপীড়িত হইবার জন্য তাঁহাকে ডাকি নাই, দাসত্ব-অত্যাচার হইতে মুক্ত হইবার জন্যই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলাম—এই মহৎ সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার জন্যই বিধাতা ভারতবর্ষকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন,অতএব ইংলণ্ড আমাদিগের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা ও আশা উদ্দীপিত করিয়া যেন তাহা আবার কঠোর ফুৎকারে নির্ব্বাণ করিতে চেষ্টা না পান—এখন তিনি যেন না বলেন যে, অগ্রে উপযুক্ত হও, পরে তোমাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিব। তিনি আমাদিগকে অগ্রে স্বাধীনতার অবসর দিন—স্বাধীনতা-স্ফূর্ত্তির পরিসর দিন—স্বাধীনতার শিক্ষা দিন—তাহার পরে বলুন "অগ্রে স্বাধীনতার জন্য উপযুক্ত হও, পরে তাহার আকাঙ্ক্ষা করিও"।

ব্রহ্ম-দেশীয় নাটক ও নাটকাভিনয়।

রজত-গিরি।

(ব্রহ্মদেশীয় নাটক)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

১—দৃশ্য—পঞ্চাল রাজার প্রাসাদ—শালা।

(মন্ত্রিগণ-পরিবৃত রাজা আসীন)

রাজা।

পাত্র মিত্র মন্ত্রিগণ ! তোমরা সকলে
যুদ্ধ-বিদ্যা-বিশারদ—কর অবধান !
উজীনের লোক আসি, পঞ্চাল সীমায়
করিয়াছে আক্রমণ—আজ্ঞা এই মোর,
সৈন্যগণ-নেতা হয়ে কুমার সুধনু
এখনি করুন্ যাত্রা অরাতি-বিরুদ্ধে—
হেন নির্ম্মূলিবে যেন ফেরে না কেহই
দোসর-নিধন-বার্ত্তা দিতে নিজ দেশে।—

(রাজার প্রস্থান)

(রাজকুমারের প্রবেশ)

প্রথম মন্ত্রী।

সিংহ-রাজ সম রাজকুমার মহান !
তুচ্ছিয়া শকতি তব শত্রু দুঃসাহসী
উড়ায়েছে এই রাজ্যে বিদ্রোহ-পতাকা।
আমাদের প্রভু তব পূজনীয় পিতা
মোরে পাঠায়েছে তেঁই বলিতে তোমায়

তাঁর আজ্ঞা এই—যেন হয়ে সৈন্য-নেতা
এই দণ্ডে শত্রুকুলে করহ নির্ম্মূল।

রাজকুমার।

রাজাজ্ঞা এখনি আমি করিব পালন।
অশ্ব গজ পদাতিক করহ প্রস্তুত।
যুদ্ধ-আয়োজন-সজ্জা কর বিধিমতে,
মুহূর্ত্ত বিলম্ব কভু করিব না হেথা।

(মন্ত্রিগণের প্রস্থান।)

(দামিনীর প্রবেশ।)

রাজকুমার।

সুচারু শশাঙ্কসম ভবিষ্য-মহিষী !
এমনি সৌন্দর্য্য তব—নাহি প্রয়োজন
মণি মুক্তা অলঙ্কারে ভূষিতে শরীর,
প্রত্যেক গতিতে তব এমনি লাবণ্য—
বায়ু ভরে মৃদু মন্দ দোলে যে পদ্মিনী
সেও হার মানে—এবে শোন মোর কথা।
কর্ত্তব্যের অনুরোধে অরাতি-বিরুদ্ধে
যাইতেছি হেথা হ'তে, করো না বিলাপ,
সহচরিগণ-মাঝে মনের আনন্দে
নিরাপদে থাক প্রিয়ে প্রাসাদ-ভিতরে।

দামিনী।

হা ! নাথ বুঝিবা এবে হয়েছ বিস্মৃত
আমি যে মানব নহি, জাতিতে অপ্সরা—
ফেলে গেলে হেথা মোরে, কার পানে চাব?
কার মুখ হেরি পাব সান্ত্বনা আরাম ?
তা হবে না ওগো নাথ—ছাড়িব না কভু,
যেথায় যাইবে তুমি আমিও যাইব,
তাড়াইলে তব পদ জড়ায়ে ধরিব।
নিষ্ঠুর সোয়ামি ওগো ! এইকি সময় ?
গর্ভে ধরিয়াছি তব প্রিয়তম সুতে—
এই সময়ে কি নাথ ত্যজিবে আমারে ?
নিতান্ত যাইবে যদি—একটু দাঁড়াও,
আঁখি-ভ'রে দেখে লই জনমের তরে।
চ'লে যদি যাও নাথ আমায় ফেলিয়ে
কি আগুন জ্বলিবে যে এ মোর হৃদয়ে
শত বার পুড়ে যদি বিশ্ব হয় খাক্,
শীতল সে অগ্নি তবু মোর জ্বালা কাছে।
মরিলেই ভাল ছিল—কেন না মরিনু,
প্রাণ হল ওষ্ঠাগত—বদ্ধ হল বাক্—

(ক্রন্দন)

রাজকুমার।

উপায় নাহিক প্রিয়ে, মুছ অশ্রুধার,
হাঁসি মুখে দাও প্রিয়ে আমারে বিদায়।
কোরো না বিলাপ—করি শত্রু-দলে জয়
মুহূর্ত্তে ফিরিব আমি যুদ্ধ-ক্ষেত্র হতে।
যত দিন আমি প্রিয়ে না আসি স্বদেশে,
ইষ্টদেবে পূজা দিও আমার উদ্দেশে।

দামিনী।

এস এস মৃত্যু মোরে লও দয়া করি,
দুঃখভার হতে মোরে মুক্ত কর আসি।
হৃদয়ে হৃদয় মোর পড়িছে ঢলিয়া
বৃক্ষ হতে পক্ক ফল পড়ে যথা খসি !

(পালঙ্কে মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

(পতাকাধারী ও সেনা-নায়কগণ সমভিব্যাহারে মন্ত্রিগণের প্রবেশ)

প্রথম মন্ত্রী।

প্রস্তুত সকলি প্রভু শাস্ত্র-বিধি-মতে
সুসজ্জিত সৈন্যগণ যুদ্ধ-যাত্রা তরে

বড়ই অধৈর্য্য—প্রভু চল, ত্বরা করি,
লয়ে যাও তাহাদের যুদ্ধ-ক্ষেত্র-মুখে।

রাজকুমার।

সুভীষণ সৈন্য-দল—শত শত বীর—
পদ-ভরে যার ধরা আমূল কম্পিত,
হেন সৈন্য-দল-নেতা কেনা হতে চায়?
আগমন-বার্ত্তা মম ঘুষুক কামান।
(দামিনীর প্রতি)
বিদায় হই গো প্রিয়ে—ফিরিব ত্বরায়!
হৃদি হতে ওষ্ঠে শ্বাস আসিতে যে দেরি—
তার আগে আমি পুন দেখিব তোমায়।
(প্রস্থান)

২ দৃশ্য—জঙ্গলে সেনা—নিবেশ

(সেনানায়কগণ ও মন্ত্রিগণ-পরিবেষ্টিত রাজকুমার)

প্রথম মন্ত্রী।

সুসংবাদ আনিয়াছি প্রভু সন্নিধানে।
যে দিন করেছ প্রভু যুদ্ধ-যাত্রা হেথা
যে ফুল এসেছ ফেলি, হয়েছে প্রফুল্ল—
রাজবালা করেছেন সন্তান প্রসব।
বহুমূল্য নবরত্নসম মনোহর,
বিপদ আপদ হতে মুক্ত একেবারে।

রাজকুমার।

মিত্রগণ! এ সংবাদে হলেম প্রসন্ন,
লও কৃতজ্ঞ—প্রসাদ—রাখিলাম নাম
* মঙ্গল তাহার, এবে তোমাদের হাতে
যাই সঁপি পুত্র-দারা বিশ্বাসের ভরে।
(প্রস্থান।

* মূলে——মুং কিয়াউ।

৩ দৃশ্য—পঞ্চাল রাজ প্রাসাদ-শালা।

রাজা।

সুবিশ্বস্ত বন্ধুগণ! পড়িলে বিপাকে
যাহাদের সুবুদ্ধির লইগো আশ্রয়—
কর অবধান——আমি হীরক পালঙ্কে
আছি শুয়ে, দেখিলাম শত শত অসি
নিষ্কোষিত সমুদ্যত জিহ্বা-লকলকি
চকিত চপলা সম চম'ক চৌদিকে।
দেখিলাম আরো, মম অস্ত্র তিন পাকে
অজগর সম আছে জড়ায়ে প্রাচীরে।
মোহক দৈবজ্ঞে এবে আনো ত্বরা করি,
কি সূচনা করিতেছে, বলুক গণিয়া।
(মন্ত্রিগণের প্রস্থান)

মোহক দৈবজ্ঞকে লইয়া
পুনঃ প্রবেশ।

মোহক।

(স্বগত)সুঘটনা বলি এরে—হয়েছে সুযোগ।
রাজকুমার উদ্ধত আমার উপরে
বরিষেছে নানাবিধ অপমান-রাশি,
প্রতিশোধ দিতে তার এই তো সময়।
স্ত্রীকে তাঁর বড় ভাল বাসেন কুমার,
শুধ-শুদ্ধ আমি এবে করিব আদায়
হ'রে তার প্রাণ। (প্রকাশ্যে) এবে শোন
মহারাজ।
দাসেরে করিবে মাপ, সত্য-অনুরোধে
শুনিতে যদ্যপি হয় অপ্রিয় সংবাদ।
তব স্বপ্ন সূচে যাহা শোন গো রাজন—
চক্রান্ত করিবে শত্রু তোমার বিরুদ্ধে,
পদে-পদে বিপদ ঘটিবে ক্রমাগত,
অবশেষে মৃত্যু আসি গ্রাসিবে রাজন।

রাজা।

সত্যই কি হবে হেন? নাহি কি উপায়
খণ্ডিতে অশুভ এই, আচার্য্য মশায়?

মোহক।

একটি উপায় আছে, শুন গো রাজন—
কঠোর অদৃষ্ট তাহা করিছে আদেশ।
শত শত গো-মহিষ কালিকা * মন্দিরে
বলিদান দাও—আর সকলের শেষে
দিতে হবে বলি প্রভু দামিনী বালারে।

রাজা।

বৃথায় সংগ্রাম করা অদৃষ্টের সনে।
ভীষণ বিপত্তি এই খণ্ডিবার তরে
যে পণ চাহিবে, এবে দিতেই তা হবে।
অতএব গো-মহিষ কর আয়োজন,
বানাও মন্দির এক, কাঞ্চন-মণ্ডিত,
তাহার মাঝারে দিব্য যজ্ঞবেদী এক;
কালিকা দেবীরে তাহে করহ স্থাপন।
তার পর রূপবতী অপ্সর-দুহিতা
আমাদের বধূমাতা যাইবেন তথা।
(প্রস্থান।)

৪ দৃশ্য—পাঞ্চাল রাজপ্রাসাদে
—রাজকুমারী দামিনীর ঘর।

(রাজকুমারী নবকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া পালঙ্কে আসীন)

মন্ত্রিগণের প্রবেশ।

আইলাম রাজাজ্ঞায় তোমার নিকটে।
কুসংবাদ আছে এক—বলিতে ডরাই।
প্রভুর আদেশ এই—শোন রাজবালা,
বলিদান হবে তব কালিকা-মন্দিরে।

* মূলে—য়ীতনাত—রাজাদিগের ভাগ্যের উপর এই দেবতার বিশেষ প্রভাব।

দামিনী।

শুনিতে তো ভুলি নাই? অথবা নিশ্চয়
হইয়াছে ভ্রম তব—একি কভু হয়?
ভালবাসেন রাজা মোরে প্রাণের সমান,
পারেন কি দিতে তিনি মরণ আদেশ?

মন্ত্রিগণ।

হা! রাজকুমারি ওগো। রাজ-আজ্ঞা যাহা
ঠিক বলিয়াছি মোরা—নাহি তাহে ভুল।

দামিনী।

হা! কি দশা হল মোর। আমার এ দুখ—
অসীম জলধি চেয়ে অপার অগাধ!
অভাগা পত্নীরে তাঁর ভ্রুক্ষেপ না করি
চলিয়া গেলেন নাথ যুদ্ধক্ষেত্র মাঝে,
আজ্ঞা হ'ল এবে মোর মরনের তরে।
—আর তো নাথেরে কভু পাব না দেখিতে।
(ক্রন্দন)
নাহি জানি পূর্ব্ব জন্মে কি পাপ করেছি
তারি তরে ভুগিতেছি এ ঘোর বিপত্তি—
অপ্সরা কুমারী হয়ে কি কুক্ষণে আমি
আইলাম মর্ত্ত্য দেশে মরিবার তরে।
(সন্তানের প্রতি)
নির্দ্দোষের প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়-রঞ্জন!
জন্মশোধ হৃদে ধরি আয় বাছা তোরে।
আরো আয় বুকে ঘেঁসি—জুড়াক্ হৃদয়।
প্রকৃতির শুভ্র উৎস মাতৃস্তন হ'তে
পান কর বাছা এই শেষ বার তরে—
কেমনে ছাড়িব তোরে?—জনকেরে তোর?
কি যে জ্বালা জ্বলে হৃদে বলিব কেমনে,
বিধাতা গো কেন এত আমা পরে বাম?
এত কেন ষড়যন্ত্র অবলা বিরুদ্ধে?

আমি যে বাসিগো ভাল প্রাণের সমান
স্বামী-পুত্র-ধনে,——বল কেমনে এখন
ছাড়িয়া উভয়ে যাই ফিরিয়া স্বদেশে
একটি না দিয়া শেষ বিদায়-চুম্বন ?
কেঁদনা কেঁদনা বাছা—যাইবার আগে
পূর্ণ বক্ষ হ'তে দুধ গালিয়া পাত্রেতে
তোর তরে আমি বাছা যাইব রাখিয়া।
যে ফুলে মালিকা গেঁথে পরি গো খোঁপায়—
তাচেয়ে সুন্দরতর আমার যে নাথ
আসিবেন ফিরি যবে—বলিবেন আর
"কোথায় দামিনী মোর"—বলিস্ তাহারে
তাঁরি তরে সহিলাম এসব যন্ত্রণা।
তো-হ'তে ছিঁড়িয়া বাছা যেতে হবে এবে।
ঐ দেখ্ মেঘ রাশি জমেছে আকাশে,
বহু দূর পথ আর, রয়েছে সম্মুখে।
পরিয়া আবার সেই পরী-পরিচ্ছদ,
দীর্ঘ পক্ষ বিস্তারিয়া আবার সেরূপ,
উধাও উড়িব পুনঃ সেই শূন্য মাঝে,
ইন্দ্রধনু রঙ্গে যাহা রঞ্জিত কেমন।
মৃদুমন্দ অনিলের কোমল পরশে
দুই ফাঁক হবে সেই মেঘ-যবনিকা,
প্রবেশিব তার মাঝে আমি ধীরে ধীরে !

[বাদ্যকরদিগের প্রতি জনান্তিকে]

ঊর্দ্ধগতি হয়ে যবে উঠিব আকাশে,
কোমল সঙ্গীত যেন চরে মোর সাথে।
বিদায় লইরে বাছা এই শেষ বার—
তুমিও দাও গো নাথ অন্তিম বিদায়।
একবার আসি' যদি হেথা প্রাণনাথ
বিদায় চুম্বন মোর করিতে গ্রহণ,
কি সুখের হত আহা—না চলে চরণ,
থাকিলেও মৃত্যু-হেথা কি করি এখন।

(প্রস্থান—ধীরে ধীরে যাত্রা, ও যাত্রা কালীন তিনি তিন বার ফিরিয়া আসিয়া পুত্রকে চুম্বন)

৫ দৃশ্য—অরণ্যমাঝে সন্ন্যাসীর আশ্রম।

(সন্ন্যাসী ও দামিনীর প্রবেশ)

সন্ন্যাসী।

কে তুমি গো অনুপম রূপসী ললনা ?
বলয় প্রকোষ্ঠে শোভে, কণ্ঠে স্বর্ণহার,
মুক্তা-মালা দিয়া গাঁথা কৃষ্ণ কেশপাশ,
লুব্ধ আঁখি একবার হেরিলে ওরূপ—
ফিরিতে না চায় আর—ফেলে না পলক।
কোন্ স্বর্গধাম হ'তে বল গো রূপসী
নাবিলে মরত দেশ ? নিষ্ঠুর অদৃষ্টে
কেন বা আশ্রম মাঝে আনিল তোমায়?
নৃশংস পতির কোপ এড়াইতে কি গো
ভ্রমিতেছ পলাইয়া—কিম্বা অভাগিনী
রাজপুত্রী কোন, জয়ী পিতৃ শত্রু হ'তে
প্রাণ ভয়ে পলাইয়া এসেছ হেথায় ?
সত্য বল মোরে বাছা নাহি কোন ভয়।

দামিনী

তোমারে বলিব পিতঃ সমস্ত খুলিয়া
আমার এ জীবনের দুখের কাহিনী—
শোন তবে প্রভু আমি বিবাহিত নারী,
রাজপুত্র স্বামী মোর, প্রাণ হ'তে প্রিয়,
যৌবরাজ্যে শীঘ্র তাঁর হবে অভিষেক,
দেশবৈরী যুঝিবারে যেতে হল তাঁরে,
আমি রহিলাম পড়ি—পতি নাই ঘরে—
মহারাজ পিতা তাঁর—পরামর্শ পেয়ে
কুলোকের, আদেশিলা মম বলিদান

কালিকা সমীপে, তাই বাঁচাইতে প্রাণ
যাইতেছি পলাইয়া। তাই তব দ্বারে।
রাজপুত্র-স্বামী মোর শুনিবেন যবে
আমি নিরুদ্দেশ, তিনি তখনি আমার
সন্ধান করিতে ধ্রুব আসিবেন পিছে।
খুঁজিতে খুঁজিতে যবে আসিবেন হেথা,
দিও তাঁরে অঙ্গুরীটি ও গো তপোধন !
আরো দিও মন্ত্র-পড়া এ শিকড়টুকু,
বিপদ সম্পদে নাথে রক্ষিবে সতত।

সন্ন্যাসী।

আচ্ছা, দিব বাছা—কিন্তু যাইবার আগে,
বলে যাও কোন পথে বলিব যাইতে।

দামিনী।

প্রথমেতে এক দানা প্রচণ্ড ভীষণ,
অরণ্য গভীরে তার বিরোধিবে পথ,
—জটিল অরণ্য মাঝে পড়ি আটকিরা
বাহিরিতে করিবেন বহু যোঝাযুঝি।
কাটিলে এ ফাঁড়া, উষ্ণ দ্রব ধাতু-স্রোত
পুন আটকিবে পথ, তার মধ্য হ'তে
ভীম সর্পদৈত্য এক তুলিবেক ফণা,
পা দিয়া তাহারে যেন করেন দলন।
হয়ে পরাভূত দৈত্য যন্ত্রণার দায়ে
এলাইয়া পাক হবে সটান বিস্তৃত—
সেই সেতু দিয়া নাথ যাবেন অক্লেশে।
দেখিতে পাবেন শেষে সাম্রোক যুগল,
শিমুল বৃক্ষেতে বসি আছে উচ্চদেশে,
খাদ্যের সন্ধানে তারা পিতার প্রাসাদে
আসে প্রতিদিন, নাথে বোলো তপোধন !
এই সব কথা যাহা কহিনু তোমায়।

সন্ন্যাসী

কোরো না সন্দেহ বাছা কহিব তাঁহারে।

দামিনী

বিদায় হইগো—লও কৃতজ্ঞ-প্রণাম।

(প্রস্থান)

৬ দৃশ্য—রজত-গিরি-রাজার প্রাসাদ।

(রাজা আসীন—কোমল বাদ্যের সহিত দামিনীর প্রবেশ)

রাজা

একি ! দেখি রে কি পুনঃ আমার দামিনী ?
বল বাছা বল বল বন্দি ছিলে যবে
মর্ত্ত্যমাঝে, কি উপায়ে পলাইলে হেথা ?

দামিনী।

পিতা ওগো ! পূর্ব্ব জন্মে করেছি সুকৃতি,
পাঞ্চাল রাজপুত্র সাথে একত্র মিলিয়া,
তাই বুঝি এ জনমে লিখিল বিধাতা
ভাগ্যবতী পত্নী হব সুধনু রাজার—
কিন্তু সুখ ক্ষণস্থায়ী—বীরশ্রেষ্ঠ স্বামী
দেশবৈরী নাশিবারে গেলা ফেলি মোরে।
স্বামীর আশ্রয়-ছায়া হারালাম যেই—
রাজা তাঁর পিতা, শুনি কুলোকের বাণি
কালী কাছে বলি মোর করিলা আদেশ।
এই কথা শুনি আমি, সময় বুঝিয়া
পলায়ে এলাম হেথা শ্রীচরণ তলে।

রাজা।

পাত্র মিত্র অনুচর ! করহ প্রস্তুত
কুমারীর থাকিবার যোগ্য আয়োজন।
দাস দাসী এক দল কর নিয়োজিত,
কটাক্ষে পালয়ে যেন উঁহার আদেশ।

মন্ত্রিগণ।

রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম সবে।

(প্রস্থান)

৭ দৃশ্য—পাঞ্চাল প্রাসাদের বহিঃ প্রাঙ্গণ।

(পরিচারিকাগণের নেতা হইয়া মালার প্রবেশ)

মালা

ওলো সহচরী তোরা! শোন্ বলি কথা,
জয়ী রাজপুত্র দেশে এসেছেন ফিরি,
গুয়া পান আর ভাল খাবার করিয়া
আয় গিয়া ভেট দেই তাঁর পদ তলে।

(সেনানায়কগণ সমভিব্যাহারে রাজকুমারের প্রবেশ)

রাজকুমার।

দমনিয়া শত্রুদলে অতুল প্রতাপে,
প্রতিমুহূ শুনিতেছি কখন আবার
হেরিব নয়নে মোর প্রাণের দামিনী!
এস এস মালা এস—কিন্তু এ কিরূপ?
তোমাদের কর্ত্তৃরাণী সকলের শেষে
আসিবেন কিগো হেথা ভেটিতে পতিরে?
কে করেছে বন্দী তাঁরে প্রাসাদ-প্রাচীরে?
"মঙ্গল" কুমার মোর সেই বা কোথায়?
পিতৃ কোলে ঝাঁপাইতে কাঁদিছে না কি সে?
কিন্তু কেন ম্লান এত হেরি তোমা মালা?
এলায়ে পড়েছে কেশ কেন অযতনে?

মালা।

প্রস্তুত হওগো প্রভু শুনিবার তরে
এক অশুভ সংবাদ—গেছ চলি যেই—
দুষ্ট কয়েক ব্রাহ্মণ—চক্রান্ত করিয়া
মহারাজে ব'লেক'য়ে কালিকা সমীপে
রাজকুমারীর বলি করেন সুস্থির।
এসংবাদ শুনে তিনি—পক্ষ বিস্তারিয়া
গিয়াছেন পলাইয়া জনমের তরে।

রাজকুমার

বল বল মালা ওগো—পলালে দামিনী
পুত্রের কি দশা হ'ল বল ত্বরা করি।

মালা

ছুয়ো না রাণীরে প্রভু, অতি অনিচ্ছায়
গিয়াছেন চলি, যথা নব-পক্ষ-ধারী
পক্ষীর শাবক অল্প উড়ি পক্ষভরে
বহুক্ষণ এক স্থানে করে ঝটাপটি—
সেই রূপ তিনি "যাব কিনা যাব" ভাবে
বহুক্ষণ ধরি প্রভু ছিলেন হেথায়।
অবশেষে পাত্র ভরি নিজ দুগ্ধ দিয়া—
দ্রব-মুক্তা ফল-সম—মিশায়ে তা-সহ
অশ্রু-ধারা ফোঁটা, তিনি উধাও হইয়া
সুদূর আকাশ মাঝে হলেন অদৃশ্য।
মোরা রহিলাম যারা পিছনে পড়িয়া,
পালিলাম শিশুটিকে করিয়া যতন।
সে অবধি বরাবর স্বর্ণ-দোলা পরে
শিশুটি ঘুমায় যবে—থাকি মোরা জাগি।

রাজকুমার।

শোন বীরগণ! সবে কর অবধানঃ—
দুর্দ্দান্ত অরাতিদল আক্রমিয়া যবে
যুদ্ধানল জ্বালাইল সমস্ত পাঞ্চালে,
করিলাম যাত্রা আমি তোমাদের সাথে
স্বদেশ রক্ষার তরে—সেই অবকাশে
রাজা পরামর্শ পেয়ে ধূর্ত্ত দৈবকের,
করিলেন দামিনীর মরণ আদেশ
নিতান্ত অন্যায় রূপে—নিশ্চয় এ কথা
প্রবাদ-আকারে শোকে ঘোষিবে জগতে।
শতবার পৃথ্বী যদি হয় গো বিনষ্ট,

এ কথা তবু না কভু হবে তিরোহিত।
স্বর্গের বিহঙ্গী সম আহা সে রূপসী
অযোগ্য মরতে ত্যজি গেছেন উড়িয়া।
যাইব সন্ধানে তাঁর যা থাকে অদৃষ্টে।
ব্রহ্মাণ্ড হউক ধ্বংশ শত শত বার,
পারিবে না টলাইতে এ মম সঙ্কল্প।
সাজ, সবে সৈন্যগণ—বাজাও দুন্দুভি,
সসৈন্যে যাইব আমি প্রিয়ার উদ্দেশে।
বল গিয়া মহারাজে যত দিন আমি
দামিনীরে নাহি পাই, ফিরিব না দেশে।

(প্রস্থান)

৮ দৃশ্য।—সন্ন্যাসীর আশ্রম।

(সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

সন্ন্যাসী।

কি হেতু বিষম এই সৈন্য কোলাহল?
একি দেখি! চতুরঙ্গে ভীম সৈন্যদল
অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত আসিছে এ দিকে,
মুর্হমুহ কাঁপে ধরা তার পদ-ভরে।

(রাজকুমারের প্রবেশ)

সন্ন্যাসী।

মহাবল-পরাক্রান্ত হে রাজকুমার।
কোন দূর দেশ হতে, কিশের উদ্দেশে
সসৈন্যে হইল তব হেথা সমাগম?

রাজকুমার।

পঞ্চাল রাজার পুত্র আমি গুরুদেব!
সুধনু নামেতে খ্যাত একবার যবে,
শত্রু নিধনিতে যাই স্বদেশ ছাড়িয়া,
মহারাজ পিতা মোর দুষ্টের কথায়
দিলেন আমার স্ত্রীর মরণ আদেশ।
সে কথা শুনিয়া সতী গেছেন পলায়ে।
প্রেম-আশা ভরে তাই রজ-গিরি দেশে
দ্রুতগতি যাইতেছি প্রিয়ার উদ্দেশে।
আশ্রম-সৌন্দর্য্য হেরি হইয়া মোহিত
এলাম দেখিতে তাই আরো সন্নিকটে।

সন্ন্যাসী।

দুই দিন হ'ল আজ—একটি ললনা
রূপেতে উর্ব্বসী সম—হরিণীর প্রায়
আইসে হেথায়, বলে রাজকুমারী সে,
না জানি কি দেশ——বুঝি রজগিরি নাম।
পূর্ব্বজন্ম ফলে বুঝি হে রাজকুমার,
আলাপ তাহার সাথে তব সংঘটন।
কিন্তু সে সুকৃতি-ফল এবে অবসান,
তা সহ সৌভাগ্য তব—জানিবে নিশ্চয়।
বিবেচনা কর বৎস কতটা প্রভেদ
মানব ও অপ্সরার প্রকৃতির মাঝে,
উভয়ে কেমনে বল হইবে মিলন?
প্রেমে অন্ধ হয়ে বাছা বিঘ্নপূর্ণ পথে
যাইতেছ বহু কষ্টে,—কিন্তু কিবা ফল
তাহে—বিবেচনা ক'রে দেখ গো রাজন।
রূপে গুণে অনুপম এমন যুবক,
তোমার উচিত হয় বিবাহ করিতে
উৎকৃষ্ট ললনা এক উমার সমান।
সুবুদ্ধির কাজ কর,—ত্যজি তার আশা
এই বেলা যাও ফিরি আপনার দেশে।

রাজকুমার।

যা বলিলে মানি ওগো পবিত্র গোসাঞি,
তোমা হেন ঋষি-মুখে বেশ শোভা পায়,
কিন্তু মুহূর্ত্তেক তরে আমি তপোধন
তাহার সন্ধানে কভু হব না বিরত।
স্বর্গ মর্ত্ত্য যদি গো বা রসাতলে যায়,
—ইন্দ্র দেব হানে যদি বজ্র মম শিরে,

অদমিত তবু আমি খুঁজিব প্রিয়ায়।
রেখো না বিলম্বি মোরে ওগো তপোধন,
ব'লে দাও কোন পথে গিয়াছেন প্রিয়া।

সন্ন্যাসী।

যাবে যদি যাও তবে—কিন্তু গো রাজন,
যাইবার আগে লও অঙ্গুরিটি এই—
দিয়াছেন প্রিয়া তব—আর এ শিকড়,
নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে তোমা বিঘ্নময় পথে,
পূর্ণ করিবেক তব সর্ব্ব মনোরথ।
বহু দূর পথ তব—পথের মাঝারে
ভীষণ দৈত্যের হাতে পড়িবে প্রথম,
তার পরে পাবে এক অরণ্য দুর্গম।
শেষে দ্রব-ধাতু-স্রোত পাইবেক পথে,
সর্প-দৈত্য এক তথা রহে অবিরাম।
এ সমস্ত বিঘ্ন হ'তে হইলে গো পার,
বহুদূরে দেখিবেক সিমুলের গাছে—
সাম্রোক-যুগল এক। উড়িলে তাহারা,
অনুসরি গতি তার পাবে রজ-গিরি—
বলিলাম যাহা—শোনা দামিনীর কাছে—
করেছিল অনুনয় তোমারে বলিতে—
যাও তবে বৎস এবে করি আশীর্ব্বাদ,
সিদ্ধ হোক্ মনোরথ—পূর্ণ হোক্ আশ।

রাজকুমার।

প্রণাম লও গো পিতঃ—হইনু বিদায়।

(প্রস্থান)

৯ দৃশ্য।—ঘোর তমসাবৃত অরণ্য।

বটবৃক্ষতলে রাজকুমারের অবস্থান—একটা দৈত্যের প্রবেশ।

দৈত্য।

এই তো হেথায় আমি—দৈত্য মোর সম
ভীম-দরশন কেবা?—হয়েছে সময়,
যাব এবে হিমালয়—অরণ্যের মাঝে—

(বাদ্যকরদিগের প্রতি

বাজা তোরা বীর-বাদ্য দুন্দুভি দামামা,
তোল্ খুব্ গণ্ডগোল—আকাস ছাইয়া
পড়িবে সকল চোখ তবে আমা পরে।
সূর্য্যের সহস্র রশ্মি কেন্দ্রীভূত হয়ে
যেনরে আমার শিরে হয়েছে পতিত।

(রাজকুমারকে দেখিয়া)

হা হা বেশ! এযে মানুষের গন্ধ পাই।
বড় ভোজ জুটে গেছে, বড় মজা আজ।

(রাজকুমারের নিকটে গমন)

(ঘোর বাদ্য)

রাজকুমার।

(উঠিয়া)

হতভাগা দৈত্য ওরে! স্পর্দ্ধাএত তোর!
সূর্য্যবংশ অবতংশ বীরের সহিত
আসিস্ যুঝিতে তুই—নাহি প্রাণে ভয়?
হীরক্-ভূষিত এই স্বর্ণ বাণ দিয়া
অপদার্থ প্রাণ তোর হরিব এখনি!

(বাণ দ্বারা দৈত্যকে হনন—বিজয়-ভেরীর ঘোর রোল—রাজকুমারের অগ্রসর হওন, ও অরণ্যের বংশ-বনে তাঁহার আটক)

পারি না পারি না আর—অবসন্ন দেহ,
যে দিকে ফিরি না কেন লতিকার জাল
দুর্গম জটিল—মোর আটকিছে গতি।
—হ্যাঁ হ্যাঁ সেই মহামন্ত্র শিকড়ের গুণ
পরীক্ষা করিনা কেন, এই তো সময়।

(শিকড়ের গুণে বন হইতে নির্গত হইয়া অগ্রসর)

রজত গিরির ও গো অপ্সরা রূপসী!

কি কষ্ট না সহিতেছি তোমার কারণে।
পরবত পথে যাই কিম্বা বনমাঝে,
দৈত্য কিম্বা হিংস্র ব্যাঘ্রে নাহি করি ভয়,
অমূল্য রতন ওগো, তোমারি কারণে—
প্রেমের অধীন তব যুঝিছে নিয়ত।

(তপ্ত দ্রব ধাতু স্রোতের নিকট আগমন)

ওকি দেখি হোথা? তপ্ত দ্রব ধাতু-নদী
ফুটিতেছে টগ-বগি, তার মধ্য হ'তে
ভীম সর্প-দৈত্য এক তুলিয়া মস্তক
হাঁ করি আমার পানে রয়েছে তাকায়ে।
—মন্ত্র-মূল পুনর্ব্বার করি গো বাহির,
সে ঔষধি গুণে দৈত্য-পৃষ্ঠ মাড়াইয়া
অনায়াসে নির্ব্বিঘ্নে তরিব ঘোর নদী।

(দৈত্য-পৃষ্ঠে নদী পার হইয়া শিমুল বৃক্ষ তলে আগমন—বৃক্ষোপরি সাম্রোক্ পক্ষিযুগল)

স্ত্রী সাম্রোক্।

প্রিয়তম ভাই ওগো! জনম অবধি
একত্র রয়েছি—কভু হইনি পৃথক্,
এক বাসা মাঝে দোঁহে আছি চিরকাল,
—খাদ্য অন্বেষণে বল কোথা আজ যাই?

পুরুষ সাম্রোক্।

জান না কি তুমি বোন্ ধর্ম্ম-রাজ বালা—
দামিনী সুন্দরী গৃহে এসেছেন ফিরি?
সেই উপলক্ষে বোন্ অপ্সর প্রাসাদে
রাজকীয় মহাভোজ বসিবে আজিকে।
অতএব যাই চল রজ-গিরি দেশে,
সে ভোজের অংশভাগী হইব আমরা।

(রাজকুমার নিজ শরীরের উপর মন্ত্র পড়া শিকড় চূর্ণ ছড়াইয়া অদৃশ্য হইলেন—ও একটি সাম্রোকের পক্ষ মধ্যে উপবেশন করিলেন—সাম্রোকদ্বয় উড্ডীয়মান্)

১০ দৃশ্য।—রজতগিরির প্রাসাদ।

প্রাঙ্গণস্থ কূপ।

(৭ জন পরিচারিকার জল উত্তোলন)

(রাজকুমারের প্রবেশ)

রাজকুমার।

স্বর্গের দেবতা সবে—কর অবধান,
দামিনীর সঙ্গে দেখা ভাগ্যে যদি থাকে,
কোনরূপ চিহ্ন তার কর প্রদর্শন।
যদি এই সাত জন রূপসীর মাঝে
স্বর্ণ কুম্ভ এক জন না পারে তুলিতে,
তবেই জানিব মম অদৃষ্ট প্রসন্ন।

(৬ জন বালিকার কুম্ভ উত্তোলন—সপ্তম বালিকা তুলিতে অক্ষম)

সপ্তম পরিচারিকা।

সুন্দর যুবক ওগো—আইস নিকটে,
অক্ষম তুলিতে কুম্ভ—দাও গো তুলিয়া।

(রাজকুমারের কুম্ভ উত্তোলন ও তন্মধ্যে অঙ্গুরী নিক্ষেপ)

(প্রস্থান)

১১ দৃশ্য।—দামিনী রাজকুমারীর ঘর।

(সহচরী সমভিব্যাহারে হাত ধুইতে ধুইতে কুম্ভ মধ্যে রাজকুমারীর অঙ্গুরী দর্শন)

দামিনী।

ওমা! একি! ওমা! অবসন্ন হল দেহ—
উলটপালট চিন্তা—দেহ মন দুই
অসাড় অবশ—মম প্রাণনাথ
এত দিন পরে বুঝি আইলেন হেথা।
—ধন্য বীর-হিয়া তব! ধন্য অধ্যবসা!
অতিক্রমি সব বাধা উতরিলা আসি
আমার নিকটে—কি না স'হেছেন নাথ
আমার উদ্দেশে—ভাবি হৃদয় ব্যথিছে!

(ধর্ম্মরাজের প্রবেশ)

রাজা।

কেন বাছা ম্লান মুখ দেখি গো তোমার,
বজ্রাহত লতা যেন লুণ্ঠিত ধরায়?

দামিনী।

প্রিয়তম পিতঃ ওগো—এই অঙ্গুরীয়
অঙ্গুলি হইতে আমি ছাড়িনি কখন,—
কিন্তু সাধিতে উদ্দেশ্য আমি একবার
ত্যজিয়াছিলাম ওরে অঙ্গুলি হইতে।
ফিরিয়া পেলাম এবে যেমনি গো আমি
কুম্ভ মধ্যে দিছি হাত—অমনি আঙ্গুলে
আপনি আসিল উঠি; অভ্রান্ত সূচনা
আমার প্রাণের স্বামী এসেছেন হেথা।
মধুর বিস্ময়ে হেন হয়ে অবিভূত
অবসন্ন হব তাহে আশ্চর্য্য কি পিতঃ?

রাজা।

(অনুচরদিগের প্রতি)
কূপ হ'তে কুম্ভ এই কে আনিল বল!

একজন পরিচারিকা।

দাসীরে করিবে মাপ—ওগো মহারাজ,
কুম্ভ উঠাইতে মোর হয় নি শকতি—
একটি যুবক ছিল কূপের নিকটে,
তাঁহার সাহায্য প্রভু যাচিলাম আমি,
আমা হ'য়ে তবে তিনি তুলিলেন উহা।

রাজা।

আনো তারে ত্বরা করি দরবার গৃহে!

(প্রস্থান)

১২ দৃশ্য—প্রাসাদস্থ দরবার শালা।

সিংহাসনে রাজা আসীন—মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে রাজকুমারের প্রবেশ।

রাজা।

কে তুমি যুবক ওগো—রূপ-গুণবান,
সিংহসম সুসাহসী, কিবা মন্ত্রবলে
আসিয়া পড়িলে এই রজ গিরি দেশে?
সমস্ত খুলিয়া বল—কোরো না গোপন।

রাজকুমার।

বলি শোন মহারাজ, পঞ্চালের রাজা
তাঁর পুত্র আমি, তাঁর উত্তরাধিকারী।
পূর্ব্বজন্ম সুকৃতির শুভি পুণ্য ফলে
পত্নিরূপে লভি তব চারু দুহিতায়,
সে মিলনে জন্মিয়াছে পুত্ররত্ন এক।
কিন্তু আমাদের সুখ ক্ষণস্থায়ী অতি।
গৃহছাড়ি একবার শত্রুর বিরুদ্ধে
করিয়াছিলাম যাত্রা, এহেন সময়
দুষ্টের মন্ত্রণা পেয়ে পিতা মহারাজ
করিলেন স্থির মম প্রাণের দামিনী
কালিকা-মন্দিরে শীঘ্র হবে বলিদান।
শুনিয়া সংবাদ হায় দামিনী আমার
এসেছেন পলাইয়া তাঁর নিজ দেশে।

ধূলি কণা গণি প্রাণে প্রেম তুলনায়।
আমি করিয়াছি যাত্রা তাঁহার উদ্দেশে,
পদানত তাই এবে শ্রীচরণ তলে।

রাজা।

পাত্র মিত্র মন্ত্রিগণ! কর অবধান।
বলিছেন ইনি মম দুহিতার প্রেমে
হইয়া চালিত এবে এসেছেন হেথা।
উচ্চ হেন পুরস্কার লভিবার তরে,
দেখাইতে হবে প্রেম সত্য কত দূর,
আরো দিতে হবে ওঁর গুণের পরীক্ষা।
অতএব শীঘ্র আনো অস্ত্রাগার হ'তে
প্রখ্যাত ধনুক সেই, যাহার ছিলায়
ত্রিশ-মন গুরুভার ঝোলে অবিরত।
পারে কি না দেখা যাক্ বিদেশী যুবক
বাঁকাইতে সেই ধনু দুর্নম্য কঠিন।

(প্রস্থান

১৩ দৃশ্য—প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ।

(রাজা, মন্ত্রিগণ, এবং রাজকুমারের প্রবেশ)

প্রথম মন্ত্রী।

এই লও ধনু যুবা,—রাজ আজ্ঞা এই—
বাঁকাইয়া ধনুকেরে দাও গো পরীক্ষা।

(রাজকুমারের ধনুর্গ্রহণ)

রাজকুমার।

এসেছে অদৃষ্ট এবে চূড়ান্ত সীমায়,
সফল হইগো যদি বাঁকাইতে ধনু,
দামিনী আমার হবে চিরকাল তরে,
নতুবা খোয়াব আমি সরবস্ব ধন।

(ধনু বাঁকাইতে চেষ্টা ও তাহা বক্রকরণ)

প্রথম মন্ত্রী।

রাজপক্ষি পক্ষ সম সুবক্র ধনুক—
লৌহসম সুকঠিন—ইঁহার হস্তেতে
তৃণ যেন মহারাজ! বাখানি যুবারে!

রাজা।

পরীক্ষা এখনো কিন্তু হয় নাই শেষ।
অশ্বশালা হ'তে আনো দুষ্ট অশ্ব এক,
আর এক বন্য হস্তী যাহার মস্তকে
কঠোর অঙ্কুশ আজো হয়নি পরশ,
জ্বল জ্বল চক্ষু দুটি ঘোষিছে যাহার
অদমিত বন্য তেজ, চড়ি তদুপরি
যুবা করুক দমন। শুনিলে আদেশ?

মন্ত্রিগণ।

এ বিষম পরীক্ষায় আছ কি প্রস্তুত?

রাজকুমার।

ধনুকের পরীক্ষা কি হয় নি যথেষ্ট?
আচ্ছা বেশ মহারাজ অশ্ব গজ আনো,
কিছুতেই পিছ্পাও হব নাকো আমি।

(অশ্ব গজ আনয়ন)

(নাট্যশালার বাদ্যকরদিগের প্রতি)
উৎসাহ-জনন সুর ভীম বজ্রনাদে
বাজাও তোমরা, ঘোর প্রতিধ্বনি তায়,
যেন ব্যাপি চারিদিকে কাঁপায় ধরণী
আমূল পর্য্যন্ত তার থর থর করি।

(অশিক্ষিত অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া রঙ্গভূমির চতুর্দ্দিকে পর্য্যটন, পরে অবরোহণ)

বন্য হস্তি শিরে এবে করি পদার্পণ।

(হস্তীর উপর আরোহণ)

শস্ত্রযুক্ত চরণের ইঙ্গিত নির্দ্দেশে
চলিছে যে দিকে আমি ফিরাইছি ওরে।

(অবতরণ)

প্রথম মন্ত্রী।

(রাজার প্রতি)

এ পরীক্ষাতেও প্রভু যুবক উত্তীর্ণ।

রাজা।

দুহিতা আমার যত তাদের সম্মুখে
সাত ভাঁজ যবনীকা হিরক-খচিত
হোক লম্বমান, আর তার মাঝে দিয়া
প্রত্যেকে অঙ্গুলি এক করুক বাহির,
একে একে অতি সাবধানে ; ইহার মাঝারে
ব'লে যদি দিতে পারে দামিনী অঙ্গুলী,
তবেই জানিব আমি নিশ্চয় যুবক
দামিনীর পাণিগ্রহে ন্যায্য অধিকারী।

(যবনিকা নিক্ষেপ, সকল রাজকুমারীর একে একে যবনিকা মধ্য দিয়া অঙ্গুলী বাহির করণ)

রাজকুমার।

স্বর্গের দেবতাগণ ! হইয়া সহায়,
দয়া করি পাঠাওগো হেন নির্দর্শন,
নির্ব্বাচিতে পারি যাতে যথার্থ অঙ্গুলি।

(দামিনীর অঙ্গুলী বাহির করন, ও তাহার উপর একটি মধুমক্ষিকার উপবেশন)

ধ্রুব এই নিদর্শন (অঙ্গুলী গ্রহণ) এত দিন পরে।
পরশি ও চারু হস্ত আমার শরীর
হতেছে লোমাঞ্চ। ইহাতেই বুঝিতেছি
আমার এ নির্ব্বাচন হয়েছে সফল।
দাও এবে মহারাজ মোর পুরস্কার।

রাজা।

অর্জিলে সাহসী বীর নিজগুণ-বলে
পুরস্কার তব এবে, কর আলিঙ্গন।

(যবনিকার পশ্চাৎ হইতে দামিনীকে বাহির করিয়া সম্মুখে আনয়ন)

তোমার প্রত্নীকে দেখ, উহার বয়ান
লজ্জার রক্তিম রাগে রেঙ্গেছে কেমন!
কি আর বলিব দোঁহে—আশীর্ব্বাদ করি
চিরজীবী হ'য়ে থাক সুখে কাল হরি।

সমাপ্ত

প্রাচীন ভারতের শিল্প।

পুরাতন কালে এ দেশে কি কি শিল্প ছিল তাহা অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত আমরা "প্রাচীন ভারতের শিল্প প্রচার" এই শীর্ষক দিয়া যে সকল প্রস্তাব লিখিয়াছি তাহাতে কালজ্ঞান-সাধন শিল্পের কিয়দংশ মাত্র ব্যক্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশ, যাহাতে বিশেষ নৈপুণ্য ও শিল্প সংযোগ আছে তাহা এতৎপ্রস্তাবে সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত করিব এবং ভবিষ্যতে অন্যান্য শিল্পের কথাও বলিব। আন্দোলন ও অনুসন্ধান দ্বারা পুরাতন পিতৃ-পুরুষদিগের গুণপনা যতই প্রকটিত হয় ততই মনে-স্ফূর্ত্তি ও জাতীয় গৌরবের প্রতি দৃষ্টি পরিচালিত হয়। এই নিমিত্তই এতদ্বিধ প্রস্তাব লেখা ভারতীর অভিপ্রেত।

৭৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বাথর বা ভাস্করাচার্য্যের লিপি ও তাহার বহুপূর্ব্ববর্ত্তী সূর্য্যসিদ্ধান্তের রচনাবলী উপলক্ষ্য করিয়া অতি পুরাতন কালনির্ণায়ক যন্ত্র গুলির কথা বলিব বটে, পরন্তু সেই সকল বিলুপ্ত-চিহ্ন যন্ত্রাবলীর আকার প্রকার ও নির্ম্মাণ-পরিপাটী যথাযথ রূপে ব্যক্ত করা এক্ষণে অসম্ভব। সে সকল যন্ত্র এখন অনাবশ্যক, তথাপি কুতূহল বশত যদি কেহ তাহা নির্ম্মাণ করিতে চাহেন তবে তাহাদের স্বতন্ত্র চেষ্টার আবশ্যক হইবে।

পুরাতন জ্যোতির্গ্রন্থে লিখিত আছে, কালবিনির্ণয়ের নিমিত্ত পূর্ব্বে ত্রিবিধ প্রণালীর যন্ত্র ছিল। ছায়া-যন্ত্র ঘটী-যন্ত্র ও স্বয়ম্বহ যন্ত্র। যথা—

"কালস্য দিনগতাব্দেঃ সূক্ষ্মজ্ঞাননিমিত্তং
স্বয়ম্বহগোলাতিরিক্তানি স্বয়ম্বহ-যন্ত্রাণি সাধয়েৎ গণকঃ শিল্পাদি স্বকৌশল্যেন কারয়েৎ।" [রঙ্গনাথ]

"ছায়াযন্ত্রৈরনেকধা।"

[সূর্য্যসিদ্ধান্ত]

"ঘটার্দ্ধস্তনাকারং যন্ত্রং ঘটীযন্ত্রম"

[রঙ্গনাথ]

অতএব কালের সূক্ষ্ম নির্ণয় করা পূর্ব্বকালের লোকের অসাধ্য ছিল না, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

ছায়া-যন্ত্র।—ছায়া-যন্ত্র চারি প্রকার ছিল।

শঙ্কু (১)
যষ্টি (২)
ধনু (৩)
চক্র (৪)

যন্ত্রযষ্টি নামক ছায়াযন্ত্রটী এক্ষণে শ্বেতদ্বীপীয় ভাষায় "স্যণ্ডাইল্" নাম ধারণ করিয়া আছে। অন্যান্য ছায়াযন্ত্রের নির্ম্মাণ-পদ্ধতি এবং গণিতাদি বিচার, যাহা সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থে লিখিত আছে, গুরূপদেশ ব্যতীত তাহা সুপরিপাটীক্রমে বুঝান যায় না। সুতরাং তাহা অঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইতে বিরত হইলাম। পরন্তু কাশীস্থ বেধালয় বা মানমন্দিরে এই সকল যন্ত্র ভগ্নাবভুগ্ন অবস্থায় বিরাজ করিতেছে, বুদ্ধিমান্ পর্য্যটকগণ তাহা হইতে কথঞ্চিৎ আভাস পাইতে পারেন।

সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থে "শঙ্কু" নামক ছায়াযন্ত্রের বিষয় এই রূপ বর্ণিত আছে।

"সমতলমস্তকপরিধিঃ
ভ্রমসিদ্ধো দন্তিদন্তজঃ শঙ্কুঃ।
তচ্ছায়াতঃ প্রোক্তং
জ্ঞানং দিগ্‌দেশকালানাম্॥"

শঙ্কু নানক যন্ত্র হস্তিদন্ত দ্বারা নির্ম্মিত, এবং তাহার শিরোভাগ ও পরিধি সমতল। এই যন্ত্রের দ্বারা দিঙ্‌নির্ণয়, ও কালনির্ণয় হয়।

শুনা যায়, পূর্ব্বকালের লোক সকল অতি সরল ছিল। তাহা মিথ্যা না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহারা যে চমৎকারি বা আ-

শ্চর্য্যজনক বিদ্যা সম্বন্ধে কুটিল ছিলেন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই কারণেই আমাদের দেশ হইতে জ্যোতির্বিদ্যা, মায়াবিদ্যা (ভোজবাজী) যোগ ও শিল্প লুক্কায়িত হইয়াছে। সূর্য্যসিদ্ধান্তকার কালনির্ণায়ক বহুতর যন্ত্রের বিষয় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বলিয়া অবশেষে বলিলেন,—

"শঙ্কুযষ্টিধনুশ্চক্রৈশ্ছায়াযন্ত্রৈরনেকধা।
গুরূপদেশাৎবিজ্ঞেয়ং কালজ্ঞানমতন্দ্রিতৈঃ।"

"গুরোর্ণির্ব্যাজকথনাৎ অতন্দ্রিতৈরভ্রমৈঃ পুরুষৈঃ কালজ্ঞানং বিজ্ঞেয়ং সূক্ষ্মত্বেনাবগন্তব্যম্"

গুরু যদি অকপটে উপরোক্ত যন্ত্রের উপদেশ করেন তবেই তদ্দ্বারা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে কালনির্ণয় করিতে পারিবেক। নচেৎ পারিবেক না। যাহাই হউক, কালনির্ণয়ের নিমিত্ত যে পূর্ব্বে ৪।৫ প্রকার ছায়াযন্ত্র ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

ঘটী-যন্ত্র। এই ঘটী-যন্ত্র অনেক প্রকারের ছিল। তন্মধ্যে কতকগুলি নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বয়ংবহ, এবং কতক গুলি সাপেক্ষ অর্থাৎ অনির্ব্বহ। সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থে এই দ্বিবিধ যন্ত্রেরই নির্ম্মাণপদ্ধতি ও তাহার কার্য্যকারিতা প্রভৃতি বর্ণিত আছে। পূর্ব্বোক্ত ছায়াযন্ত্র সকল নির্ম্মল দিবাতেই কার্য্যকারী হয়, রাত্রে কি মেঘাচ্ছন্ন দিনে হয় না। এই নিমিত্ত সর্ব্বকাল-সাধারণ যন্ত্রের আবশ্যকতা বিধায় সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ এই দ্বিবিধ ঘটী-যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহা উল্লিখিত গ্রন্থ দ্বয়ে স্পষ্ট লিখিত আছে।

জলযন্ত্র কপালযন্ত্র, রেণুযন্ত্র প্রভৃতি সাপেক্ষ ঘটী যন্ত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এবং ময়ূর-যন্ত্র ও বানর যন্ত্র প্রভৃতি নিরপেক্ষ স্বয়ংবহ যন্ত্র বলিয়া গণ্য।

জলযন্ত্র বা কপাল যন্ত্র কিংবা রেণুযন্ত্র অদ্যাপি প্রচলিত আছে। যাহাকে তামী ঘড়ি ও বালি ঘড়ি বলে তাহাই জলযন্ত্র ও রেণুযন্ত্র। ময়ূর ও বানর প্রভৃতি যন্ত্র এক্ষণে নাই সুতরাং ইহাদেরই বিবরণ ব্যক্ত করা আবশ্যক।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের উপদেশ এই যে,—

তোয়যন্ত্রকপালাদ্যৈর্ময়ূরনরবানরৈঃ। সসূত্ররেণুগর্ভৈশ্চ সমাক্ কালং প্রসাধয়েৎ॥

এই শ্লোকের মধ্যে যে "ময়ূর" ও "বানর" যন্ত্রের উল্লেখ আছে, আচার্য্য রঙ্গনাথ ইহার অর্থ বিশদ করিয়া বলিয়াছেন যে,—

"ময়ূরাখ্যং স্বয়ম্বহযন্ত্রং নিরপেক্ষং
বানর যন্ত্রঞ্চস্বয়ম্বহং নিরপেক্ষম্।
এতৈঃ সসূত্ররেণুগর্ভৈঃ। সূত্রসংহিতা
রেণবো ধূলয়োগর্ভে মধ্যে যেষাং তৈঃ।
সূত্রপ্রোতাঃ ষষ্টিসংখ্যাকা মৃদ্ঘটিকা ময়ূরোদরস্থা মুখাৎ ঘটিকান্তরেণ স্বতএব নিঃসরতীতিলোকপ্রসিদ্ধ্যা তাদৃশৈর্যন্ত্রৈরিত্যর্থঃ। এবং ময়ূরাদি স্বয়ংবহসাধনানি বহবঃ—"ইত্যাদি।

যন্ত্রটি ময়ূরাকৃতি, তাহার উদরে সূত্রগ্রথিত মৃন্ময় ঘটিকা-সূচক ৬০টি অংশ থাকে। প্রত্যেক ১ দণ্ড অন্তর তাহার মুখ দিয়া সেই সূত্র-গ্রথিত এক এক অংশ আপনা আপনি নির্গত হইতে থাকে। ইহার নাম ময়ূরযন্ত্র। বানরযন্ত্রও এইরূপ। উদরে

বালুকা-প্রপূরিত থাকিলে মুখ দিয়া প্রতিদণ্ডে এক ঝলক করিয়া বালুকা নির্গত হয়।

এই স্বয়ম্বহ-যন্ত্র-নির্ম্মাণ অতিকষ্টসাধ্য ব্যাপার এবং সকল ব্যক্তির সম্বন্ধে সুলভ নহে। পরন্তু এই স্বয়ম্বহ প্রক্রিয়া কেবল পারদ, সূত্র, আরা ও তৈলাক্ত জল, এই কএক বস্তুর দ্বারাই সাধিত হইত কিন্তু কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া উহার যোজনা করা হইত তাহা এক্ষণে আর আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। সূর্য্যসিদ্ধান্তকার বলিয়াছেন, স্বয়ংবহক্রিয়ার প্রযোগ অতি দুর্লভ। যথা—

"পারদারাস্তু সূত্রাণি শুল্বতৈলজলানি চ।
বীজানি পাংসবস্তেষু প্রয়োগাস্তেঽপি দুর্লভাঃ।" সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থে কএকটি স্বয়ংবহ যন্ত্রের নির্ম্মাণোপায় লিখিত আছে, আমরা তাহা সুস্পষ্ট হৃদ্বোধ করিতে অসমর্থ। প্রদর্শনের জন্য কএকটি শ্লোক এস্থলে উদ্ধার করিয়া দিতেছি, আশা করি, শিল্পনিপুণ বুদ্ধিমান পাঠকেরা চেষ্টা করিলে তাহা খাটাইয়া লইতে পারিবেন।

শ্লোক—

লঘুকাষ্ঠজ সমচক্রে
সমসুষিরারাঃ সমান্তরা নেম্যাং।
কিঞ্চিদ্বক্রা যোজ্যাঃ
সুষিরস্যার্দ্ধে পৃথক্ তাসাম্।
রসপূর্ণে তচ্চক্রং
দ্বাধারাক্ষস্থিতং স্বয়ং ভ্রমতি॥
উৎকীর্য্য নেমিমথবা
পরিতোমদনেন সংলগ্নম্।
তদুপরি তালদলাদ্যম্
কৃত্বা সুষিরে রসং ক্ষিপেৎ তাবৎ॥
যাবদ্রসৈকপার্শ্বে
ক্ষিপ্তজলং নান্যতোযাতি
পিহিতছিদ্রং তদতঃ
চক্রং ভ্রমতি স্বয়ং জলাকৃষ্টম্॥ ইত্যাদি।

এই সকল স্বয়ংবহ প্রক্রিয়া এদেশ হইতে অনেক দিন লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। পাছে কেহ শিখিয়া লয় এই ভয়ে একাকী লুক্কায়িত হইয়া ইহার নির্ম্মাণ করা হইত। গ্রন্থকারেরাও লুক্কায়িত হইয়া নির্ম্মাণ করার উপদেশ দিতেন। যথা—

"একাকী যোজয়েদ্বীজং যন্ত্রে বিস্ময়কারিণি।"
সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

চমৎকারজনক স্বয়ংবহ যন্ত্রে বীজ অর্থাৎ পারদাদি সংযোগ কারিবার সময় একক হইবেক। এই প্রকারের দৌরাত্ম্যে এদেশ হইতে অনেকবিধ বিদ্যার মূলোচ্ছেদ হইয়া রহিয়াছে ইহা অল্প দুঃখের বিষয় নহে।

শিল্পসংহিতা নামক একখানি পুরাতন পুস্তক আছে, তাহাতে ময়ূর ও নরযন্ত্র ও বানর যন্ত্রের বিষয় অন্যরূপ প্রথায় উল্লিখিত হইয়াছে। ময়ূরযন্ত্রটি ধাতুময়। উহা এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, দণ্ড পরিবর্ত্তিত হইলেই পক্ষ প্রসারিত করিয়া ডাকিবে। আর নরযন্ত্রের বিষয় যেরূপ লিখিত আছে, তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি, দেখুন যে, নরযন্ত্রটির সহিত এক্ষণকার ক্লক্ ওয়াচ্" এর কি তারতম্য।

কম্পিতাঙ্গাং বিষুবতীমাকাশে চানুমানতঃ,

যদ্‌গত্যনুগতশ্চক্রবৎ পরিভ্রমতে গ্রহঃ।
তদ্দৃষ্টান্তানুগতে চক্রে প্রত্যক্ষং কালমানকৃৎ, যন্ত্রং কুর্য্যাৎ পরিধ্যংশাৎ চতুর্ব্বিংশতিভাগতঃ।
অহোরাত্রিপ্রমাণঞ্চ প্রত্যক্ষং জায়তে নৃণাম্॥
শিল্পসংহিতা, ২৪ অং

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, আকাশকল্পিত বিষুব রেখা দৃষ্টে লৌহাদি ধাতুতে বিষুববৎ রেখানুরূপ কল্পিত যন্ত্র করিবেক অর্থাৎ সেই রেখাযন্ত্রকে এমত কৌশলে রাখিবেক যে, যেন নিরন্তর সেই যন্ত্র দক্ষিণ ও বামে দোদুল্যমান হয় এবং যাহার গমনানুরূপ গ্রহ নক্ষত্রাদির চক্রাকারে গতি হয়। এতদ্দৃষ্টান্তে অনুমান দ্বারা কাল-নির্ণয়ক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবেক। ৩৬০ অংশে বিভক্ত আকাশমণ্ডলের পরিধিকে ২৪ অংশে ভাগ করিয়া দিবারাত্রি কালের নিরূপণ করিবেক। অর্থাৎ ১২ ভাগে দিবা ও ১২ ভাগে রাত্রি। অপিচ,

"বিষুবাখ্যং লৌহযন্ত্রং সব্যাসব্যভ্রমাত্মকম্।
যৎপ্রভাবাচ্চক্রমুখে ভ্রমতে নাড়িকণ্টকম্।
ঐ

দক্ষিণ বাম ভ্রমাত্মক কল্পিত বিষুবাখ্য লৌহযন্ত্র 'বোধহয় ইহাই এক্ষণকার পেণ্ডুলম্ অথবা হেয়ার্‌স্প্রিং', ইহারই প্রভাবে যন্ত্রোপরি নাড়ীবোধক কণ্টকের চক্রবৎ ভ্রমি হয়। আরও লিখিত আছে।

লৌহমুদ্রাং সঙ্কুচিতাং মনুষ্যাখ্যাং প্রকল্পয়েৎ।
পৃষ্ঠকস্থাঞ্চ তাং মুদ্রাং সূক্ষ্মশৃঙ্খলবেষ্টিতাম্।
গতানুগতমন্তব্য পূর্ণংজ্ঞাত্বা ষড়ঙ্গুলম।
ততঃ স্বাভাবিকং কুর্য্যুর্ব্বিলোমেন চ শিল্পিনঃ।
ঐ *

মনুষ্যাখ্য লৌহমুদ্রাকে সঙ্কুচিত অর্থাৎ জড়াইয়া কৌটার ভিতর রাখিয়া সূক্ষ্ম শৃঙ্খল দ্বারা বেষ্টন করত দ্বিতীয় কীলকে অর্থাৎ খুটিতে বান্ধিবেক। এই লৌহমুদ্রা আর মেন স্প্রীং এবং সূক্ষ্ম শৃঙ্খল আর চেইন তুল্য পদার্থ বলিয়া বোধ হইতেছে। বিষুবযন্ত্র অর্থাৎ পেণ্ডুলম বা হেয়ার স্প্রীংয়ের বলে ষড়ঙ্গুল-প্রমাণ সূক্ষ্ম শৃঙ্খল যখন ঐ মনুষ্যাখ্য লৌহযন্ত্রের বেষ্টন হইতে শিথিল হয় তখন তাহা অন্য কীলকে জড়াইবেক, শিল্পি তাহা অনুমান দ্বারা অনুভূত করিয়া পুনর্ব্বার তন্নিয়মে বিলোমপ্রকারে ঐ যন্ত্রের সূক্ষ্ম শৃঙ্খলকে জড়াইয়া দিবেক। ঐ ছয় অঙ্গুল-পরিমিত শৃঙ্খলের অনুলোম গতিতে অহোরাত্রের গতাগত দণ্ডাদি নির্ণয় হইবেক।

শিল্পসংহিতার ২৪ অধ্যায়ে এবং ২৮ অধ্যায়ে এই রূপ ঘটীযন্ত্রের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। অবশেষে এই রূপ উক্তির দ্বারা অধ্যায় সমাপ্ত করা হইয়াছে—

এষা ঘটী কালপরীক্ষণায় প্রকল্পিতা বিশ্বকৃদাত্মজেন।
সম্যক্ সুবিজ্ঞায় হিতায় জন্তোঃ শিষ্যান্ সমাদিশ্য গতোম্বরে পুনঃ।"
[শিল্পসংহিতা, ২৮ অং]

ব্রহ্মার পুত্র বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক এই কাল-

* এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ ও পুরাতন পুস্তক আমরা দেখি নাই। খণ্ডিত শ্লোক পাইয়া ইহা লিখিলাম; যদি কৃত্রিম না হয় তবে আশ্চর্য্য বটে।

পরীক্ষা কারক ঘটীযন্ত্র কল্পিত হইয়াছিল। শিল্পিবর বিশ্বকর্ম্মা সম্যক্ প্রকারে জ্ঞাত হইয়া মানবহিতার্থে পৃথিবীস্থ শিষ্যাদিগকে ইহা শিক্ষা প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার অম্বর-পথে গমন করিয়াছিলেন।

শিল্পসংহিতা যদি বাস্তবিক পুরাতন হয় তাহা হইলে এই ঘটীনির্ম্মাণ-প্রথা বিস্ময়কর বটে। না হইলেও পূর্ব্বোল্লিখিত ময়ূর ও বানর প্রভৃতি স্বয়ংবহ যন্ত্র গুলি প্রাচীন ভারতের সামান্য কীর্ত্তির বিষয় নহে।

অপিচ, সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইতে যে "পারদাম্বু সূত্রাণি" বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে, এই শিল্পসংহিতায় তাহাকে কালনির্ণায়ক না বলিয়া গ্রীষ্মাদি নির্ণায়ক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা—তুঙ্গবীজপ্রযুক্তিযোগাৎ তদ্বন্নির্ণীয়তে ঘর্ম্মঃ।"

[তুঙ্গবীজং পারদম্]

পারদ দ্বারা গ্রীষ্ম ও বাত্যা নির্ণয় করিবার কৌশল যদি শিল্পসংহিতা অবগত থাকেন, আর তাহা যদি অনধিক ৪০০ বৎসরের পুরাতন গ্রন্থও হয়, তাহা হইলে "থর্ণোমেটর ও বেরোমেটরের নির্ম্মাতাকে পুরাতন বস্তুর নূতন নাম প্রদান করিতে অত্যন্ত পটু বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারি।

"প্রসাদাৎ কস্যচিদ্ভূয়ঃ
প্রাদুর্ভবতি কালতঃ।" ইত্যলম্।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

মেকলের ভারতবর্ষ-প্রবাস।

মেকলে বলিয়াছেন যে এদেশে যে সকল বড় বড় ইংরাজের সহিত তাঁহার আলাপ হয় তাঁহারা লণ্ডন সমাজের বিদ্বজ্জনগণের সমস্পর্দ্ধী হইতে পারেন না। তাঁহার এ কথা বলিবার অধিকার ছিল। মেকলের সমসাময়িক নানা রত্নে যে সমাজের ভূষণ ছিল এ দেশে যে তাহার প্রতিরূপ দর্শন দুর্লভ, ইহা সহজেই মনে করা যাইতে পারে। তিনি পার্লমেণ্ট সভায় যে সকল সুবক্তার সহিত বাগযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় বাগ্মিতার পরিচয় দিতেন, যে সকল কবি বিদ্বান ও রসিক পুরুষদের Holland গৃহের ভোজনশালায় একত্রিত দেখিতেন, তাঁহাদিগকে মনে করিয়া এই ভারতবর্ষে প্রবাস তাঁহার নিকট কি নীরস, কি শূন্য প্রতীয়মান হইত। এই সকল লোকের কথা তাঁহার পত্রাবলির মধ্যে মধ্যে কথিত আছে। ইহাদের মধ্য হইতে Sidney Smith ও কবি Rogers, এই দুই জনকে বাছিয়া লইয়া দেখা যাউক তাহাদের বিষয় মেকলে কি বলেন। সিড্‌নি স্মিথ্ ইংলণ্ডের এক জন ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে তাঁহার ব্যবসায়ানুরূপ গাম্ভীর্য্য প্রকটিত ছিল না। তিনি রসিকতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার

কথা মেকলে তাঁহার এক পত্রে লিখিয়াছেন, যথা—

"কাল অমুকের গৃহে ভোজন করিলাম। সেখানে রামমোহন রায়ের * সঙ্গে দেখা হইবার কথা ছিল কিন্তু আর আর যে সকল বিদ্বান ও রসিক লোকের সমাগম হইয়াছিল তাঁহাদের পাইয়া তাঁহার অদর্শনের ক্ষোভ অনেকটা দূর হইল। দর্শনীয় পুরুষের মধ্যে প্রধান দুই জন উপস্থিত ছিলেন, রজস্ ও সিডনি স্মিথ্। আমি এদের পৃথক্ পৃথক্ অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু এই দুই জনকে আর কখন একসঙ্গে এক মজলিসে দেখি নাই! এ দেখায় একটা নূতনত্ব ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটু কৌতূহল মিশ্রিত ছিল, কেন না সকলেই জানিত ইহারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী, আর তাঁহারা পরস্পরের প্রতি যে সকল খরতর বাক্যবাণ প্রয়োগ করিতেন তাহা সকলেরই মুখস্থ। কে একজন বলিয়াছে যে সভার মধ্যে একজন রসিক পুরুষ থাকিলে আমোদ আছে,কিন্তু দুজন রসিকের মিলন অসহনীয়। একথা সত্য। আশ্চর্য্য এই সে রাত্রে তাঁহাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্তি হয় নাই। যখন একজন শ্রোতৃবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন তখন অন্যজন চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। আর ইহা বলা বাহুল্য যে সিড্‌নি স্মিথ্ রাজার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন আর বেচারা রজস্ প্রায়ই নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিলেন। কখন কখন মজলিস দুই দলে বিভক্ত হইতেছিল, ও তাঁহারা প্রত্যেকে এক এক দলকে পাইয়া বসিতে ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে আমার অনেক কথা হইল। * * * আমি সিড্‌নি স্মিথকে বলিলাম আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া রামমোহন রায়কে না দেখিবার ক্ষোভ অনেকটা মিটিল। সিড্‌নি বলিয়া উঠিলেন, কি? ক্ষোভ মিটিল? আপনি আমার অপমান করিতে চান? আমি ইংলণ্ডের একজন পুরোহিত, রাজ পুরোহিত,এমন বড় মানুষের বাড়ীর পুরোহিত—আর আমার সঙ্গে এক জন ভিখারী বামনের তুলনা? তাতে আবার সে জাতিচ্যুত,পতিত হয়েছে,আপনার ধর্ম্ম হ'তে ভ্রষ্ট হয়ে অন্য একটা ধর্ম্ম হাতড়ে বেড়াচ্ছে—খুঁজে পাচ্ছে না—শুনেছি না কি সে ম্লেচ্ছ, আবার গোপনে গোমাংস ভক্ষণ করে। যদি প্রাচীন কালের বৈদিক নিয়ম উচিত মত প্রচলিত থাকিত তা হলে তার কানে সিসে ঢালিয়া দেওয়া যাইত কি না বল দেখি?

সিড্‌নি স্মিথের দ্রুত হাস্যময় চীৎকারধ্বনি—তাঁহার পুরোহিতোচিত হৃষ্টপুষ্ট কায়, আর রজর্সের মৃদু মন্দ অথচ সুদৃঢ় স্বর ও শবাকার মুখ—এদুই যেমন পরস্পর বিভিন্ন এমন আর কিছুই নহে। তাঁহারা যেসকল কথা বলেন তাহার মধ্যে যেরূপ

* রামমোহন রায় তখন বিলাতে। তিনি সেখানকার সমাজে বহু সমাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন। সকলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যগ্র। যে দেশের লোকেরা সেক্সপিয়রের মতে মৃত হিন্দু দেখিবার জন্য লালায়িত, তাহাদের জীবন্ত হিন্দু দেখিবার জন্য না জানি কত কৌতূহল হইয়া থাকিবে!

প্রভেদ—তাঁহাদের বলিবার ধরণ ও ভাবভঙ্গীতেও সেই রূপ। রজর্সের কথাবার্ত্তা আশ্চর্য্য ঘসামাজা ও কৃত্রিম মনে হয়। তিনি যাহা বলেন তাহা বোধ হয় যেন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ও তাহা ছাপাইতে গেলে অধিক সংশোধনের আবশ্যক করে না। সিড্‌নি উপস্থিত বক্তা—প্রসঙ্গের ঝোঁকে যা মনে আসে তাই বলেন আর তাঁর হাস্য পরিহাসের অন্ত নাই।"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মেকলে তাঁহার ভগিনীদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। যাঁহারা তাঁহার লেখা দেখিয়াই তাঁহাকে জানেন, অথবা তাঁহার রাজনৈতিক কার্য্যে তাঁহার চরিত্র পাঠ করেন, তাঁহারা হয়ত সহজে বিশ্বাস করিতে পারেন না যে তাঁহার মনে ভালবাসার ন্যায় কোন কোমল ভাব স্থান পাইত। তাঁহাদের হয়ত তাঁহাকে কঠোর-হৃদয় প্রখর-বুদ্ধি তার্কিক বলিয়াই মনে হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা এরূপ মনে করেন তাঁহারা তাঁহার চরিত্রের কোমল ভাগটী অবগত নহেন। পরিবারের প্রতি মেকলের প্রগাঢ় মমতা ছিল। বাহিরের লোকের সহিত যদিও তিনি বড় মিশিতেন না তথাপি তাঁহার দুই একটী হৃদয়সখা ছিল, তাহাদের প্রতি তিনি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। সকল অপেক্ষা যিনি তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ ছিলেন তাঁহার নাম Ellis। বয়সে তিনি মেকলে হইতে বার বৎসর বড়। যদিও তাঁহারা একই কালেজের সহাধ্যায়ী কিন্তু কালেজে তাঁহাদের আলাপ পরিচয় হয় নাই। অনেক বৎসর পরে সমান কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রণয়ের সূত্রপাত হয়। তাঁহারা উভয়েই বারিষ্টরের ব্যবসায় অবলম্বন করেন। উভয়েরই প্রাচীন গ্রীক লাটিন ভাষার উপর অটল অনুরাগ। রুচি ও চরিত্রের সাদৃশ্য-গুণে তাঁহাদের পরস্পর এরূপ প্রগাঢ় প্রণয়ের সঞ্চার হইল যে তাহা জীবনের সমুদয় পরিবর্ত্তনের মধ্যে অক্ষত—সুখ দুঃখে অবিচলিত ছিল। মেকলে যেখানেই থাকুন, তাঁহার বন্ধুকে তাঁহার নিয়মিত পড়া শুনার হিসাব দিতে ভুলিতেন না, ও তিনি যে রাশি রাশি গ্রন্থ গলাধঃকরণ করিতেন তাহার বিস্ময়জনক তালিকা তিনি যে এলিসকে পত্র লিখিতেন তাহাতে দৃষ্ট হইবে। এলিস বিবাহিত ছিলেন—১৮৩৯ সালে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। মেকলে যখন পত্নী-শোক-কাতর প্রাণসখার অশ্রুজলের সহিত আপনার অশ্রুজল মিশাইলেন,তখন অবধি তাঁহার প্রণয়-বন্ধন আরো দৃঢ় ও অকাট্য হইল। মেকলে প্রথমে পরলোকগামী হয়েন—তাঁহার মৃত্যুর পর এলিস আর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না, বন্ধুবিচ্ছেদে ম্রিয়মান হইয়া এক বৎসর পরেই তিনি তাঁহার অনুগামী হইলেন।

মেকলে যদিও চিরকাল অবিবাহিত ছিলেন তথাপি গার্হস্থ্য জীবন তাঁহার অতীব আদরণীয় ছিল। তিনি স্ত্রীপুত্রহীন হইয়াও বিশেষ রূপে গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহার পিতা মাতা ভগিনীদিগকে সুখী করিবার জন্য তিনি কায়মনে তৎপর ছিলেন ও তাঁহাদের সংসর্গে স্বর্গের সুখ অনুভব করিতেন।

তিনি যে আত্মোন্নতির প্রতি যত্নশীল ছিলেন সে কেবল আপনার জন্য নয়, কিন্তু পিতা ও ভগিনীদিগের সন্তোষ সাধন তাঁহার এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি এক স্থানে স্পষ্টই বলিয়াছেন—"পৃথিবীতে আমার নাম হইবে—লোকে আমাকে মান্য করিবে—এ অভিলাষ আমার অহঙ্কারের সহিত তত সম্লিষ্ট নয় যত তোমাদের ভালবাসার সঙ্গে জড়িত, আমার মান সম্ভ্রমের অভিলাষও এইরূপে এক কোমল ভাব ধারণ করিয়াছে। আমার প্রিয় মাতা আমাকে যেরূপ স্নেহ করিতেন—তিনি ছেলেবেলা অবধি আমার অত্যুন্নতির প্রতি যেরূপ মনোযোগ দিতেন, তাহা হইতেই আমার এই ভাবের উৎপত্তি। আমি যাহাদের ভালবাসি তাহারা যাহাতে সুখে থাকে, বাল্য কাল হইতে আমার তাহাই ইচ্ছা, এই ইচ্ছা ও আমার যশোলিপ্সা—এই দুই ভাব এরূপ সম্মিলিত হইয়াছে যে সে দৃঢ়বন্ধন কখন ছিন্ন হইবার নহে।"

এই বিষয়ে মেকলেকে আরো বলিতে দেওয়া যাক, তিনি নিজের ভাব নিজে যেরূপ ব্যক্ত করিতে পারিবেন আমরা বাহির হইতে তেমন পারিব না। দাস-ব্যবসায়ের বিপক্ষাচারী মহাত্মা Wilberforceএর মৃত্যু উপলক্ষে তিনি তাঁহার ভগিনী হানাকে লিখিতেছেন—

তবে Wilberforce গিয়াছেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান জাজ্বল্যমান, তাঁহার চিত্ত প্রফুল্ল ছিল, যাতনায় নিতান্ত অবসন্ন না হইলে আর তাঁহার প্রফুল্লতা নষ্ট হয় নাই। মৃত্যুশয্যায় তিনি যে সকল কথা বলিলেন তাহাতে বোধ হইল তাঁহার অনেক দিন বাঁচিবার সাধ ছিল। যে ব্যক্তির সংসারের আকর্ষণ এত অল্প, যাহার পরলোকে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস, যাহার অর্থনাশ, শরীরক্ষয় হইয়াছে তাহার ওরূপ হওয়া আশ্চর্য্য বলিতে হইবে। এ কি প্রলোভন বল দেখি, যাহা আমাদের বর্ত্তমান এত প্রকার যন্ত্রণা সত্ত্বে, ভবিষ্যৎ সুখের আশা সত্ত্বেও আমাদিগকে জীবনের প্রতি এত আসক্ত করে! আমি তাহাকে যথার্থ ভালবাসিতাম—অর্থাৎ লোকের মধ্যে যেমন সচরাচর ভালবাসা হয়,—কিন্তু সে কতটুকু? পৃথিবী একজন লোককে হারাইয়া কতটুকু শোক করে? বড় বড় বিদ্বান সাধু পুরুষ ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া যে অভাব রাখিয়া যান তাহা কত শীঘ্র পূরণ হয়। আমি ভাবিতেছিলাম আমার কোন পরিচিত লোক মরিয়া গেলে আমার ভাব কি রূপ হয়? আমাদের নিজের স্বার্থপরতা দেখিয়া শেখা উচিত অন্যেরা আমাদের জন্য কত কাল শোক করিবে। যদি কল্যই আমার মৃত্যু হয়, তবে যাহাদের সঙ্গে আমি একত্রে প্রতি সপ্তাহে পানভোজন করিয়া থাকি তাহারা আমার অভাবে একটী সুস্বাদু সামগ্রীও অনাস্বাদে ফেলিয়া রাখিবে না—স্যাম্পেন পান করিতে করিতে কোন ললনাকে লক্ষ্য করিয়া একটী হাসিও কম হাসিবে না। অন্যের প্রতি আমারও ভাব ঐরূপ। শেলীর সে সুন্দর কবিতাগুলি কি?

Oh world! farewell!
Listen to the passing bell,
It tells that thou and I must part
With a light and heavy heart!

সমুদয় জগতে এমন দশ জন নাই যার অভাবে আমার ক্ষুধামান্দ্য হয়, কিন্তু দুটি একটি এমন আছেন যাদের বিয়োগে আমার হৃদয় ভগ্ন হইয়া যায়। পৃথিবীর ভাব যতই দেখিতেছি, যত অধিক লোকের সঙ্গে পরিচিত হইতেছি ততই আমার ভালবাসা আরো সঙ্কীর্ণ স্থানে বদ্ধ হইতেছে। ভগিনীদের উপর আমার মমতা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে, আমার দুই একটী পরীক্ষিত পুরাতন বন্ধুর প্রতি আমি ততই আসক্ত হইতেছি।"

আমরা দেখিতেছি মেকলের ভারতবর্ষ আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য অর্থোপার্জ্জন দ্বারা নিজের স্বাধীনতা ও পরিবারের সুখস্বচ্ছন্দতা সম্পাদন করা। ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি তাঁহার ইংলণ্ডবাসিনী ভগিনী দ্বয়কে লেখেন—

আমার টাকা কড়ার বিষয় মন্দ চলিতেছে না। আমার যত ব্যয় হইবে মনে করিয়াছিলাম তাহা অপেক্ষা অল্প ব্যয়ে আমার নির্ব্বাহ হইবে দেখিতেছি। যত কাল আমার এদেশে থাকা হইবে তাহার মধ্যে প্রতি বৎসর প্রায় ৭০,০০০ করিয়া জমিবে।

নাতালের সময় (Christmas) আমার পিতা ও তোমাদের সকলের জন্য ১০।১২০০০ টাকা বাড়ী পাঠাইতে পারিব। এতে যে আমার কি আনন্দ হইতেছে বলিতে পারি না। ইহাতে আমি প্রবাসের সমুদয় যন্ত্রণা—ঈশ্বরই জানেন সে কি বিষম যন্ত্রণা—সহ্য করিতে পারিতেছি। আর কয়েক বৎসরের মধ্যে—তোমাদের আমার এই পত্র প্রাপ্তির ৫ বৎসরের মধ্যেই—হয়ত আমি বাড়ী গিয়া তোমাদের সহিত মিলিতে পারিব। আমরা আপনার আলাদা বাড়ী করিয়া সুখসচ্ছন্দে বাস করিতে পারিব, আমাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কোন চিন্তা থাকিবে না—কাহারো ঋণপাশে বদ্ধ থাকিব না—আর রাজ্যের মধ্যে যে কোন পরিবর্ত্তন হউক তাহাতে আমাদের সৌভাগ্য অক্ষত থাকিবে। ইহা নিশ্চয় জেন, প্রিয় ভগিনীগণ! তোমাদের উপর ভালবাসা আমার সমানই থাকিবে। আমি কি তোমাদের ভুলিতে পারি। তোমাদের সুখ উদ্দেশেই আমি এদেশে পদার্পণ করিয়াছি—তোমাদের ভুলিয়া যাইব—এত হতেই পারে না।"

মেকলের ভগিনীগণের উপর যে মমতা তাহা ভ্রাতৃস্নেহের আদর্শ-স্বরূপ। আমাদের মধ্যে ভাইবনের যে ভালবাসা তাহা ক্ষণপ্রভার ন্যায় অস্থায়ী। তাহার প্রধান কারণ এই যে ভ্রাতা ভগিনীর একত্র সহবাস অল্প কালের জন্য, ভগিনী যে অল্প বয়সে পতিগৃহে বাস করিতে যান, তাহাতে ভ্রাতা ভগিনীর বাল্য-প্রণয় বদ্ধমূল হইবার সময় পায় না। পিতৃগৃহের একরূপ ভাব—একরূপ শিক্ষা, পতিগৃহে হয়ত তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। পিতৃগৃহে সুশিক্ষিতা কন্যা অশিক্ষিত পতির হস্তে পড়িয়া পতিগৃহে বধূজন-সুলভ নির্য্যাতন ভোগ করিয়া যে কি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় তার ভূরি ভূরি

দৃষ্টান্ত আমাদের পরিবারের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। স্ত্রী-চরিত্র স্বামীর দোষগুণ স্পর্শে নূতনরূপে সংরচিত হয়! যেমন আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, "যাদৃক্-গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি তাদৃক্ গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা" অর্থাৎ নদী যেমন সমুদ্রের সহিত মিলিয়া লবণাক্ত হয়, স্ত্রীও সেইরূপ ভর্ত্তার সহিত সংযুক্ত হইয়া ভর্ত্তৃগুণ-সম্পন্না হয়েন। এই কারণে ভ্রাতা ভগিনীর বাল্যপ্রণয় অধিককাল স্থায়ী হয় না। শুধু আমাদের মধ্যেই কেন, ভ্রাতা ভগিনীর প্রণয় সর্ব্বত্রই দুর্লভ। ভ্রাতা ভগিনীকে যতই ভাল বাসুন না কেন, সে ভালবাসার সম্পূর্ণ প্রতিদান কখনই সম্ভবে না। ভগিনীর হৃদয় শীঘ্রই অন্যের হইয়া পড়ে। এই কারণে মেকলেরও অনেক সময় কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। তিনি একে একে তাঁহার ভগিনীদিগকে হারাইলেন। তাঁহার ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার ভগিনী মারগ্রেটের বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। তাহাতে তিনি দুঃখ করিয়া লিখেন—

"ভাই বোনের ভালবাসা যতই নিঃস্বার্থ সুখময় সুকোমল হউক না কেন,তাহা অন্য অনুরাগের বলে এরূপ অভিভূত হইবার সম্ভাবনা যে বিবেকী ব্যক্তি কখন তাহার উপর আত্মসুখ-সেতু নির্ম্মাণ করিবেন না। কন্যা পিতৃগৃহ হইতে বিযুক্ত হইয়া অন্যত্র গমন করিবে, রক্তের যে স্বাভাবিক টান তাহা ছাড়িয়া অন্য বন্ধনে আবদ্ধ হইবে এ নিয়ম অকাট্য। ইহা পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। ইহা মানবপ্রকৃতিতে বদ্ধমূল। প্রেমের অদূরদর্শিতা বশত এই সামাজিক নিয়ম আমার কষ্টজনক হইতেছে বলিয়া ইহার জন্য আক্ষেপ করা নিতান্ত অমূলক স্বার্থপরতার কার্য্য।

আমার এক্ষণে আর একটী বাজী হারিবার বাকি আছে। যদি কখন সে আশঙ্কিত ঘটনা উপস্থিত হয় তাহার জন্য যেন প্রস্তুত হইয়া থাকি। যদি আর কাহারো হৃদয় গার্হস্থ্য দুঃখের জন্য সৃষ্ট হইয়া থাকে সে আমারই। আমার ভাগ্যে যখন সে ঘটনা উপস্থিত হইবে তখন হইতে পৃথিবীতে আমার এক যশোবাসনা ভিন্ন আর কোন সম্বল থাকিবে না। কিন্তু সকল রোগেরই ঔষধ আছে, এমন পীড়া নাই কালে করিয়া ও দায়ে পড়িয়া যাহা সহ্য করা না যায়। আমিই বা কি—আমার ন্যায় আমার পিতৃপুরুষেরা—কত লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি জীবন-সর্ত্তিতে বাজি জিতিবার আশয়ে দ্বিগুণ টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছে, আর তাহা হারাইয়া তাহাদের দ্বিগুণ জ্বালা সহ্য করিতে হইয়াছে।"

স্বদেশ ছাড়িবার দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মারগ্রেট ভগিনীর বিবাহ হইয়া যায়, তাঁহার ভারতবর্ষে আসিবার অনতিবিলম্বেই তাঁহার ভগিনী হানাও পরহস্তগতা হইলেন। এই বিবাহ যদিও মেকলের সম্পূর্ণ অভিমত ছিল, বরটি যদিও তাঁহার সম্পূর্ণ মনের মতন হইয়াছিল, তথাপি এমন শুভ ঘটনাতেও তিনি সর্ব্বতোভাবে সুখী হইয়াছিলেন বলা যায় না। এই উপলক্ষে

তিনি তাঁহার মারগ্রেট ভগিনীকে যে পত্র লেখেন তাহাতে তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ পাইতেছে—

"আমি তোমাকে যে বিষয় লিখিতে বসিয়াছি তাহা হানার পত্রে কতকটা অবগত হইয়া থাকিবে। হানার বিবাহের উদ্যোগ হইতেছে—এ বিবাহে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। তার জন্য যদি আমাকে এদেশে বর খুঁজিতে হইত তাহা হইলে এমন বর খুঁজিয়া পাইতাম না। ইঁহাকে পাইয়া হানা সুখী হইবে তাহা আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। ট্রেবেলিয়ানের বয়স ২৮ বৎসর। তিনি হেলিবরিতে শিক্ষালাভ করিয়া এদেশে আসিয়াছেন। এখানে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি কার্য্যকুশলতা, উদার রাজনীতিজ্ঞান ইত্যাদি কারণে তিনি তাঁহার সমবয়স্ক লোকদের অপেক্ষা সমধিক সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। প্রথমে তিনি Sir Edward Colebrook এর অধীনে কার্য্যারম্ভ করেন। লোকটা বিদ্বান ও লোকপ্রিয় বটে, কিন্তু তাঁর চরিত্র নিতান্ত মন্দ। এই ব্যক্তি ট্রেবেলিয়নকে আপনার দুষ্য ব্যবসায়ে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু যুবকের মন তাহাতে অবনত হইবার নহে। যখন তাঁহার ২১ বৎসর বয়ঃক্রমমাত্র আর Sir Edward এদেশের প্রায় সর্ব্বোচ্চপদে আরূঢ় ছিলেন, তখন সেই অল্পবয়সে তিনি সার এডওয়ার্ডের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ উপস্থিত করেন। তাহার উপর দিয়া এক প্রবল ঝটিকা বহিয়া গেল। তাঁহাকে প্রায় সকলেই তিরস্কার করিতে লাগিল, অনেকে তাহার সহিত আলাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করিল। কিন্তু তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আশ্চর্য্য ক্ষমতা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়া ছিলেন। কতক সপ্তাহ ধরিয়া বিচার চলিয়া তাঁহার অবশেষে জয় লাভ হইল। Sir Edward অপমানের সহিত কর্ম্মচ্যুত হইলেন। এখনকার গবর্ণমেণ্ট ও বিলাতের ডাইরেকটরগণ তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিল। তখন অবধি তাঁহার উন্নতির দ্বার মুক্ত হইল ও সকলেই ভাবিল তাঁহার ভাগ্য ফিরিয়াছে। লাট সাহেব তাঁহাকে বলিলেন তোমার কি ইচ্ছা বল আমি তাহাই পূর্ণ করিতে প্রস্তুত! Lord William সহজে কাহারো বশীভূত হন না, কিন্তু ট্রেবেলিয়নের উপর তাঁহার যথেষ্ট অনুগ্রহ। তিনি যে তাহার অন্ধ পক্ষপাতি তাহা নহে, কিন্তু তিনি বাস্তবিক তাহার গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া তাহাকে চিনিয়াছেন। * * *

তাঁহার যেমন গুণ, রূপও তেমনি, বিশেষতঃ অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহাকে অতি সুন্দর দেখায়। তিনি চঞ্চল বলিষ্ঠ ও সকল অপেক্ষা ভয়ানক উৎসাহজনক শিকার—যে বরাহশিকার তাহাতে বিলক্ষণ পটু। তাঁহার মুখশ্রী উত্তম ও উৎসাহানলে পূর্ণ—আমার বড়ই ভাল লাগে। কার কোন্ কুলে জন্ম তাহা জানিবার জন্য আমার বিশেষ আগ্রহ নাই,কিন্তু বলিতে কি—ইংলণ্ডের এক প্রাচীন উচ্চকুলে ইঁহার জন্ম।

তাঁহার বয়সের ২০ হইতে ২৫ বৎসর

পর্য্যন্ত তিনি এক সুদূর বিজন প্রদেশে অবস্থিত ছিলেন। সেখানে রাজকার্য্য ও শীকারেই তাঁহার সমস্ত সময় চলিয়া যাইত। একজন ইংরাজ স্ত্রী কি পুরুষের মুখ দর্শনও হয়ত তাঁহার ভাগ্যে ঘটিত না। ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া তিনি কথা কহেন না। তিনি ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক উন্নতিসাধনের চিন্তাতেই ব্যস্ত। কোর্টসিপ করিবার সময়ও তাঁহার আর কোন কথা নাই, বাষ্পপোতের চলাচল, দেশীয়দের শিক্ষাদান, চিনির করের সুব্যবস্থা, দেশীয় ভাষায় আরব্য অক্ষরের স্থানে রোমক অক্ষরের প্রয়োগ, ইত্যাদি বিষয়েই তিনি কথোপকথন করিতেন।

দেখিতে দেখিতে তাঁহার ভালবাসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমি তাহা প্রথম হইতেই দেখিয়াছিলাম। যদিও ওসব বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া আমার স্বভাব নয়, তথাপি হানার সুখের প্রতি আমি উদাসীন থাকিতে পারি না। পরিচিত বন্ধুদের মধ্যে তিনি কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন তাহার প্রতি স্বভাবতই আমার দৃষ্টি পতিত হইত। আমার বোধ হয় তাঁহার ভাব তিনি নিজে বুঝিবার আগেই আমি বুঝিয়াছিলাম, আর তাহাতে ব্যাঘাত দিবার ইচ্ছা করিলে আমি সহজেই কৃতকার্য্য হইতাম, কেন না ট্রেবেলিয়ানের প্রতি একটু বিরক্তিভাব প্রকাশ করিলেই তিনি ভগ্নোদ্যম হইতেন। কিন্তু প্রিয়তমা মারগ্রেট! এরূপ স্বার্থপরতা আমার মনে স্বপ্নেও উদয় হয় নাই! আমার প্রিয় হানাটিকে তাহার মনোমত পতি বরণ করিতে বাধা দেওয়া অপেক্ষা আমি তাহাকে সন্ন্যাসিনী-বন্দিশালায় পুরিয়া রাখি না কেন! অতএব আমি তাহাদের পরস্পর মিলন ও অনুরাগ বর্দ্ধনে সাহায্যদানেই যত্নবান হইলাম। আমার নিজের কষ্ট তোমাদের আর বলিয়া কি হইবে? তোমার সহিত যখন আমার বিচ্ছেদ হইল তখনই আমার হৃদয় ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল। কিন্তু যখন তোমাদের হারাইলাম তখন আমার হানা ছিল, আমার আর আর পরিচারকেরা ছিল, আমার বন্ধু ছিল—আমার দেশ ছিল। এখন আমার আপনার মনের বল ভিন্ন আর কিছুই নাই, আর আমার কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছি এই আত্মপ্রসাদটুকু আছে। এর জন্য দুঃখ করিয়া কি হইবে? আমার কষ্টের কারণ আমি আপনিই। বিবেক ও দূরদর্শিতার উপদেশ আমি অগ্রাহ্য করিয়াছি। পাশার কি দান পড়িবে তাহা বিবেচনা না করিয়া বাজি রাখিয়া আমার সুখ বিসর্জ্জন দিয়াছি। খড়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছি, বালির উপর ঘর বাঁধিয়াছি, আর এক্ষণে তাহার ফল ভোগ করিতেছি। আমার যে শাস্তি তাহা আমাকে ভোগ করিতেই হইবে। কেবল আমার কষ্টে অন্যে কষ্ট না পায় সেইটি দেখিয়া চলিতে হইবে।

হানা আমার সঙ্গে সাধ্যমত সদ্ব্যবহারে ত্রুটি করেন নাই। তিনি প্রস্তাব করিতেছেন আমরা সকলে মিলিয়া এক পরিবারের মত থাকিব, আর Trevelyan যদিও অন্যান্য

প্রেমিকের ন্যায় তাঁহার দেবীর একান্ত সেবার প্রার্থী, তবুও তিনি ঐ প্রস্তাবে আহ্লাদের সহিত সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। আমাদের দেশের ন্যায় এখানে ওরূপ একত্র বাস তেমন কিছু আশ্চর্য্য নয়। এখানে অনেক সময় ওরূপ ঘটিয়া থাকে, আর ইংলণ্ডে উক্তরূপ প্রণালী অবলম্বনের পক্ষে মহা বিঘ্নকারী যে চাকরদের লইয়া গণ্ডগোল এখানকার সংসারে তাহার কোন আশঙ্কা নাই। ইহাতে আমাদের এক বিশেষ সুবিধা এই হইবে যে আমরা উভয়েই অনেক টাকা বাঁচাইতে পারিব। ট্রেবেলিয়ন শীঘ্রই তাঁহার ফর্লোরি ছুটি পাইবেন কিন্তু আমার স্বদেশে যাত্রার সময় উপস্থিত না হইলে তাহা নেবেন না স্থির করিয়াছেন;

আমার পিতাকে অবশ্য আমি খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়া লিখিব। কিন্তু আমার মনের আসল ভাব তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম। ছেলেবেলায় যে সকল কবিতা কণ্ঠস্থ করিতাম তাহার একটি আমার মনে পড়িতেছে—এই কয়ছত্রে আমার জীবনবৃত্ত বর্ণিত দেখিতে পাইবে—

There were two birds that sat on a stone:

One flew away, and there was but one—

The other flew away, and then there was none;

And the poor stone was left all alone.

পাথরেতে বসে ছিল ছোট দুটি পাখী,
একটী উড়িয়া গেল—একটী রইল বাকি,
অন্যটীও উড়ে গেল, কেহ না রহিল,
বেচারী পাথর খানি একলা পড়িল।"

আর এক স্থানে তিনি কহিতেছেন—

"আমার যেন সকল বস্তুতে বিরাগ ও অবিশ্বাস জন্মিতেছে। আমার যে বুদ্ধির তারতম্য ঘটিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু বোধ হইতেছে যেন বুদ্ধিবৃত্তিতে আমার আর আর সমুদায় প্রবৃত্তি বিলীন হইয়া লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। আমার বিজ্ঞানস্পৃহা তেমনি রহিয়াছে, বরং এই সকল শোচনীয় ঘটনার মধ্যে আরো বলবতী হইয়াছে, অন্য দেশের অন্য কালের উচ্চমনা লোকদের সহিত আলাপ-তৃষ্ণা তেমনিই রহিয়াছে, বর্ত্তমান ভুলিয়া দূরস্থ অতীত ভবিষ্যৎ ঘটনার সহিত মিশিয়া যাইবার ক্ষমতা তেমনিই অনুভব করিতেছি। গ্রন্থঅধ্যয়ন আমার একমাত্র সম্বল হইয়া পড়িতেছে। আমি যদি আমার ইচ্ছামত কালক্ষেপ করিতে পারিতাম তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল পুস্তকালয় আমরা একত্রে দেখিয়া আসিয়াছি তাহার কোন একটার মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া সকলি খুলিয়া চাকিতাম। গ্রন্থঅধ্যয়ন আমার একমাত্র কাজ-ইহা ভিন্ন একদণ্ডকাল কাটাইতে প্রবৃত্তি হয় না।"

তাঁহার হানা ভগিনীর বিবাহের কিছু দিন পরেই তাঁহার আর একটা নিদারুণ শোকের কারণ উপস্থিত হইল। তাহা তাঁহার ভগিনী মারগ্রেটের মৃত্যু। এমন

গুণবতী সতী স্ত্রীর এত অল্পবয়সে মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার আত্মীয় বন্ধু সকলেই শোকাকুল হইয়াছিল। মেকলের হৃদয়ে যে আঘাত লাগিয়াছিল তাহা আর বলিবার নহে। তিনি তাঁহার বন্ধু এলিসকে সে সময়ে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশে তাঁহার শোকের উচ্ছ্বাস প্রতীয়মান হইবে। "গতমাসে আমি যে দারুণ ব্যথা পাইয়াছি এমন আর কখন পাই নাই। কষ্ট যে কি জিনিস তাহা আগে জানিতাম না। জানুয়ারির প্রারম্ভে বাড়ীর পত্রে আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর মৃত্যুসংবাদ পাইলাম। তারে আমি যে কত ভালবাসিতাম কি বলিব। তার মত যে আর কাউকে ভাল বাসিতাম না তা নয়, কেন না যে বোনটি আমার কাছে ছিল তাহাকেও আমি তেমনি ভালবাসি। কিন্তু আমায় যে যে ভালবাসে, মানুষকে মানুষে ততটা ভালবাসতে পারে কি না সন্দেহ। এখন কালেতে করিয়া যদিও আমার মনস্তাপের কতকটা উপশম হইয়াছে, তথাপি সে বিষয়ে লিখিতে গেলে আমার শোকানল জ্বলিয়া উঠে। আমি যে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ি নাই সে কেবল আমার বিদ্যানুরাগের দরুণ। আমি বই পড়িতে যে ভালবাসি সে আমার ভাগ্য বলিতে হইবে। কাল্পনিক জগতে বাস করা—প্রেতাত্মার সহিত আলাপ করা সামান্য সুখের নয়।

* * *

কাজকর্ম্ম ও বই নিয়াই আমার সমস্ত সময় কাটিয়া যায়। লোকদের সঙ্গে মেশাটেশা আমার বড় হইয়া উঠে না। আমার হৃদয়ে যে আঘাত লাগিয়াছে তাহা হইতে এখনো আমি সুধরিয়া উঠি নাই, আর কখন যে সম্পূর্ণ সুধরিয়া উঠিব তাহা মনে হয় না। আমি দেখিতেছি যে আথেন্স নগরী আমাদের জন্য যে বিদ্যারত্ন রাখিয়া গিয়াছে তাহার সম্ভোগে আমি যেমন মনের কষ্ট ভুলিতে পারি এমন আর কিছুতেই পারি না। গ্রীক লাটিন বিদ্যার উপর আমার অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

* * *

আমার শরীর মন্দ নাই। আমার ভগিনী ভগিনীপতি ও তাহাদের কন্যাটি ভাল আছে। কন্যাটিকে আমার সর্ব্বদা লালন পালন করিতে হয়। তার উপর আমার যেমন ভালবাসা জন্মিতেছে, জ্ঞানী ব্যক্তি আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকেও ততটা ভালবাসা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন কি না সন্দেহ। আমি এক্ষণে একটু সারিয়া উঠিতে আরম্ভ করিতেছি। এই বৎসরের প্রারম্ভে আমি যে ব্যথা পাইয়াছি তাহার চিহ্ন আমরণ আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবে। সাহিত্যই আমার প্রাণ রক্ষা ও আমার মনের প্রফুল্লতা সম্পাদন করিয়াছে। এখনো কর্ম্মকাজ শেষ হইলে আমি একটা বই হাতে না করিয়া একলা থাকিতে সাহস করি না। ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়া আমি কি রূপে জীবন ধারণ করিব বলিতে পারি না। রাজনীতির চর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়া সাহিত্য অনুশীলনেই জীবন ব্যয় করিতে আমি এক প্রকার কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। কোন বৃহৎ ঐতিহাসিক রচনায় আমার জীবন কাটিয়া যায় এই আমার ইচ্ছা।

* * *

তোমার গার্হস্থ্য সুখের ভাণ্ডার এমন পূর্ণ যে তাহা মনে করিয়া আমার হিংসা হয়। আমার ভাগ্যে যে তাহার কিছুই নাই এমন নয়। হানার মেয়েটিকে আমি তার বাপের মতই ভালবাসি। তাকে কথা কহিতে শেখান, তাকে লালনপালন করা প্রত্যহ এক ঘণ্টা আমার নিয়মিত কাজ। এখন সে বা—পা—মা পর্য্যন্ত বলিতে শিখিয়াছে। আর যখন বিবেচনা করা যায় যে তার বয়স ৮ মাস বৈ নয় তখন তাহাকে সেক্সপিয়র কিম্বা নিউটনের সমান প্রতিভাশালিনী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

* * *

আবার তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার পত্র পাইলে আমি সর্ব্বদাই আনন্দিত হই। আমাদের মিলনের দিন আসিতেছে মনে করিয়া আমি যেমন সুখী হই এখন অল্প বিষয়েই এমন সুখ আছে। বাড়ী যাবার সুখলাভের জন্য কয়েক বৎসর প্রবাসের কষ্ট ভোগ সত্য সত্যই প্রার্থনীয়। কিন্তু বাড়ী গিয়া যে সুখের প্রত্যাশা ছিল তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিল না—এখন আমার আর সে বাড়ী নাই। কিন্তু যে শোকের তীব্রতা কমিয়া গিয়াছে তাহা জাগ্রত করিবার প্রয়োজন কি ?"

মেকলে তাঁহার ভারতবর্ষ-প্রবাস-কালে

আর কিছু করুন আর না করুন কতকগুলি ভাষা শিখিয়া লইয়া ছিলেন আর অনেকগুলি গ্রন্থ চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি যখন স্বদেশ পরিত্যাগ করেন তখন তিনি গ্রীক লাটিন স্পানিষ ইতালীয় ফরাসি ইংরাজি এই কয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজ যাত্রা কালীন তিনি পোর্টগীজ ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন ও স্বদেশে ফিরিবার সময় পথে জর্ম্মন ভাষা অধ্যয়ন করেন। তিনি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছেন যে এমন কোন ভাষা নাই যাহা তিনি প্রত্যহ দশ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া চার মাসের মধ্যে আয়ত্ত করিতে না পারেন। তিনি বলেন, এক নূতন ভাষা শিখিতে হইলে আমি প্রথম বাইবেল পাঠ আরম্ভ করি, তা পড়িতে আর অভিধানের আবশ্যক হয় না। এইরূপে কতকদিন পড়িয়া গেলে—ব্যাকরণের সাধারণ নিয়ম জ্ঞান ও অনেকগুলি শব্দের অর্থ বোধ আপনাপনি হইয়া পড়ে। তার পরে একটা কোন ভাল নামাঙ্কিত গ্রন্থ আরম্ভ করা যায়। এইরূপে তিনি স্পেন পোর্টুগল জর্ম্মনি দেশের ভাষা সকল সহজে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। যদিও তিনি ইউরোপের প্রায় আধুনিক সমস্ত ভাষাই শিক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু লাটিন গ্রীকের উপরেই তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। বিশেষতঃ প্রধান প্রধান গ্রীক লেখকদের রচনা পাঠে তিনি যেরূপ আমোদ সম্ভোগ করিতেন এমন আর কিছুতেই করিতেন না। তাঁহাদের সহিত আলাপনে তিনি তাঁহার সমুদয়

কষ্ট বিস্মৃত হইতেন। প্লেটোর রচিত গ্রন্থাবলী তাঁহার অতীব হৃদয়গ্রাহী ছিল ও তিনি বলিয়াছেন যে প্লেটোর প্রতিভা প্রশংসার অতীত। সক্রেটিসের চরিত্রের প্রতি কিন্তু তাঁহার তাদৃশ শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি বলেন "তাঁহাকে যে কেন লোকেরা বিষ প্রয়োগের দণ্ডবিধান করিল তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি। তিনি প্রোটাগোরস প্রভৃতি লোকের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, আমার সহিত সেরূপ ব্যবহার করিলে আমি তাঁহাকে কখনই ক্ষমা করিতাম না।"

ক্রমশঃ

সাগর-সঙ্গমে।

(গাথা)

স্থান—সমুদ্রতীর, সময়—প্রাতঃকাল।

প্রথম সর্গ।

"যাতনার জ্বালা সহে না যে আর,
হৃদয় ছিঁড়িয়ে ফেলিব আজ,
সংসারের সাধ, জীবনের সাধ,
সকল সাধেতে হানিব বাজ!
সুখে কাজ নাই, সাধে কাজ নাই,
কাজ নাই এই জীবনে মোর,
দিগন্তে ঝাঁপিয়ে বহো গো জলধি!
সঁপিব এ প্রাণ হৃদয়ে তোর!
উঠিব পড়িব ভাসিয়ে যাইব,
উঠিবে পড়িবে তোমার ঢেউ,
কত যে সহেছি, কেমনে রহেছি,
জানিতে কভু না পারিবে কেউ,
অপার—অগাধ সলিলে তোমার
আমি যে ভাসিয়ে যেতেছি কোথা—
জানিবেনা কেউ— শুনিবেনা কেউ,
সুধাবেনা কেউ সে সব কথা!"
এই কথা বলি অভাগা বিজয়
ঝাঁপায়ে পড়িতে যেতেছে জলে,
সহসা তাহার পিছন হইতে
কে যেন তাহারে ধরিল বলে।
"কি কর কি কর, জ্ঞান-বোধহীন!
ছি ছি ছি তোমার নাহি কি লাজ,
এই এ বয়সে মনের হুতাশে—
হতাশে করিছ একি এ কাজ?
চল চল ফিরে আমার কুটীরে,
আমিই তোমার জননী মত,
সেবিব পালিব, যতনে রাখিব,
সাধিব তোমার বাসনা যত।"
নয়ন ফিরায়ে বিজয় নেহারে
পিছনে দাঁড়ায়ে কে এক নারী,
জননী সমান নারীর প্রধান,
পুণ্য-জ্যোতি ভায় নয়নে তাঁরি।
অর্দ্ধ বয়সী, পরমা রূপসী,
দেবী ভগবতী যেন রে হায়,
বচনে বরিষে অমৃতের ধারা,

উষার সুষমা নয়নে ভায়।
স্নান করি সবে উঠেছেন দেবী,
এখনো সজল এলানো কেশ,
সজল তাঁহার উজল মুরতি,
সজল তাঁহার বিমল বেশ।
"ক্ষম গো জননি" কহিল বিজয়,
"জীবনে আমার নাহি যে সাধ,
আমি কারো নই, কেহ নাহি মম,
অদৃষ্টে আমার সেধেছে বাদ।
মরিল ভগিনী, মরিল জননী,
জনক হইল পাগল প্রায়,
লোকের কথায়, মনের ব্যথায়,
ত্যেজিলেন তিনি আমারে হায়।
হৃদয় যাতনে, পিতৃ নির্যাতনে,
শূন্যময় সব হইল জ্ঞান,
এখন হেথায়, সাগর বেলায়
এসেছি কেবল তেজিতে প্রাণ!"
"ছি ছি ছি ও কথা" কহে মহামায়া,
"ব'লনা ব'লনা বাছারে আর,
মম বাসে আয়, জননীর প্রায়,
লাঘবিব তোর হৃদয় ভার!
আমিও যে হায় সাগর বেলায়
বাঁধিয়ে অদূরে কুটীর মম,
দুহিতাটি লোয়ে, নির্ব্বাসিত হোয়ে,
রহিয়াছি চির-দুঃখিনী সম!
কাঙ্গালিনী বেশে রোহেছি হেথায়,
কাঙ্গালিনী আমি নহি রে ধনে,
দুহিতা লাগিয়ে সকল ত্যেজিয়ে
প্রাসাদ ছাড়িয়ে রহেছি বনে।
চৌদ্দ বর্ষে তার জীবন সংশয়,
চৌদ্দ বর্ষ রহি সাগর তীরে,
ব্রত উদ্‌যাপিয়ে, দামিনী লইয়ে
আবার স্বদেশে যাইব ফিরে!
দ্বাদশ বৎসর হোয়েছে অতীত,
বাকী নাই দুটি বরষ বই—
ওই যে দামিনী, স্নান সমাপিয়ে
সাগর সলিলে দাঁড়ায়ে ওই—"
নেহারে যুবক দামিনীর পানে,
দ্বাদশবর্ষীয়া রূপসী বালা,
দ্বিতীয়ার শশী পড়িয়াছে খসি,
আধো ফোটো রূপে সাগর আলা।
আ-নাভী মগন সাগর সলিলে,
ঝাঁপিয়ে তরঙ্গ পড়িছে গায়,
ঢল ঢল ঢল জলধি কমল,
টলমল করে স্রোতের ঘায়!
পলকে পলকে দামিনী দলকে,
অধরে মধুর হাসির ছটা,
রূপের সাগরে অমৃতের ঢেউ,
লহরে লহরে তুলিছে ঘটা।
হেথায় হোথায়, সাগরের বায়,
কোথায় অলকা যেতেছে ছুটি,
ভাবেতে গলিয়ে পড়িছে ঢলিয়ে
টানা টানা বাঁকা নয়ন দুটি।
সরলতা সনে মাধুরী মিশায়ে,
চারুতার তুলি ধরিয়ে করে,
সরু সরু মরি ভুরু দুটি যেন,
এঁকে কে দিয়েছে নয়ন পরে!
লহরী লীলায় ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়
উজল রূপের উজল ছায়,
শ্যামল সাগর হ'য়েছে রে যেন
কষিত তরল হিরণময়!
দেখিয়ে বিজয়—হরষ হৃদয়,

পলক পড়ে না নয়নে আর,
"এই রূপ হেরি, সকল পাষরি"
ভাবিল "বহিব জীবন ভার!—
কেনই ত্যেজিব এছার জীবন,
ওরূপ যদি রে দেখিতে পাই—
শোকের সময় নেহারি ও রূপ,
অনলে উজল করিব ছাই!
চল চল তবে, মাতঃ মহামায়া,
(কহিল বিজয় আনত মুখে)
এ ছার জনম, এ ছার জীবন,
তোমারি কুটীরে কাটাব সুখে!"
এই কথা বলি সকলে মিলিয়ে,
করিল গমন কুটীর পানে,
আগে আগে যান দেবী মহামায়া,
পিছনে দামিনী বিজয় সনে।

দ্বিতীয় সর্গ।

নারীর-প্রধান জননী সমান,
দেবতা-প্রধান জননী মত,
দেবী মহামায়া বিজয়ের প্রতি
জননীর স্নেহ দেখান কত।
বিজয় দামিনী এক সাথে রয়,
এক বৃন্তে যেন দুইটি ফুল,
ফুটিতে লাগিল, শোভাতে বাড়িল,
জগতে যেন রে অসমতুল!
বিজলির প্রায় দিন বোহে যায়,
বিজলির মত বিজয়-মনে,
থাকিয়ে থাকিয়ে হরষের আলো
চমকে উঠিতে লাগিল প্রাণে।
বাড়িতে লাগিল দামিনী রূপসী,
বাড়িতে লাগিল রূপের ছটা,
দ্বিতীয়ার শশী, তৃতীয়ার শশী,
ক্রমে পূরণিমা জোছনা ঘটা।
ঘোর অমানিশা-আঁধার উপরে
সুধীরে যেমন অরুণ ওঠে,
কৃষ্ণপক্ষ পরে সুধীরে যেমন,
শশীর জোছনা ক্রমশঃ ফোটে—
শীতের প্রভাব ছাড়িয়া যেমন,
সুধীরে বহে সে মলয় বায়,
সুধীরে তেমতি বিজয়-হৃদয়ে
প্রেমের আলোক প্রকাশ পায়।
শুখালো ক্রমশঃ নয়নের নীর,
ঘুচিল ক্রমশঃ বিষাদ ভার,
আকাশে সুষমা, ধরায় সুষমা,
সুষমার মাঝে জীবন তার।
এ উহার পানে তাকাইয়া রয়,
কেন যে তাকায় জানে না কেউ,
উভের পরশে উভের হৃদয়ে
বোঝেনা কি এক ওঠে যে ঢেউ!
সাগর-বিজনে সুখের স্বপনে,
আধো আধো যেন ঘুমের ঘোরে,
দুইটি বরষ কাটালে দুজনা,
দুজনে জানেনা কেমন ক'রে।
সাগর বেলায়, দুজনে খেলায়,
সুখের মেলায় দুজনে মাতে,
উভয়ে সোঁপেছে উভয়ে হৃদয়,
উভের পরাণ উভের হাতে।
এক দিন প্রাতে প্রশান্ত উষাতে,
মৃদুল মলয় বহিছে ধীরে,
অস্ফুটো অস্ফুটো অরুণ আলোকে,
দাঁড়ায়ে দামিনী সাগর তীরে।
কাটিয়ে কাটিয়ে বিশাল তরঙ্গ,
সাঁতারে বিজয় জলধি-জলে,

উঠিছে পড়িছে খেলাতে ডুবিছে,
দামিনীরে ভয় দেখাবে বোলে।
দামিনী হাসিছে, দামিনী ভাবিছে
কখনো দামিনী কাঁদিছে যেন,
পূর্ণিমা নিশিতে শারদ আকাশে
জোছনা জলদে বিবাদ হেন।
দূর হোতে এক ডাকিনী-রূপিণী,
নেহারে বিজয় হরষে ভাসে,
নেহারে দামিনী, কুসুম-কামিনী
গ্রথিত তাহার প্রেমের ফাঁসে।
দেখি তাহা বুড়ি, যায় গুড়ি গুড়ি
দামিনীর বাড়ি ভিখারী বেশে,
হাতে লাঠি ধরি, আই ঢাই করি,
কুটীরে অতিথি হইল এসে।
বলে "ওগো কে গো আছ গো হেথায়,
সাগর-সঙ্গমে কুটীর-বাসী,
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জ্বোলে যায়,
পরাণ বাঁচাও হেথায় আসি।"
শুনি মহামায়া যান দ্রুতগতি,
অতিথি সেবার মহান কাযে,
রোহিণীরে করি অশেষ যতন,
আনিল তাহারে কুটীর মাঝে।
দিন যত যায়, রোহিণী সেথায়,
আদরে রহিল সেবিকামত,
দামিনীর সনে, বিরলে বিজনে,
উপকথা রাশি কহে সে কত।
পূজার লাগিয়ে মহামায়া যবে
উপনীত হন সাগর-বেলা,
বেল জুঁই যাতি, ফুল নানা জাতি,
নে যায় রোহিণী ভরিয়ে ডালা।
দিন যত যায়, রোহিণী সেথায়,
রহিল কতই আদর ভরে,
দূর এক বনে তাপস আশ্রমে,
রহেছে বিজয় মাসেক তরে।
বুঝে এক দিন বিধবা রোহিণী,
ইনিয়ে বিনিয়ে দেবীর কাছে,
কহিল "জননি, করেছ তুমি কি,
বিজয়ে কি হেথা রাখিতে আছে।
গিয়াছে বটে সে তাপস-আশ্রমে,
আসিতে তাহারে দিও না আর,
দামিনী আমার কামিনীর সার,
সঁপিবে কি তাঁরে হাতেতে তার?
বরঞ্চ জ্বলন্ত অনল মাঝারে,
দামিনীরে তব ফেলিয়ে দাও,
তবুও গো দেবি বিজয়ের হাতে,
সোঁপোনা তাহারে, মাথাটি খাও!
কুলে শীলে জেতে, মানিনু জননি,
বিজয় কুমার সমান বটে,
কিন্তু মাতঃ! কভু শোন নি কি কানে
উহার যে গুণ সকলে রটে?
মথুরা-নিবাসী বিজয় কুমার,
আলয়, আমার বাটীর গায়,
বালক বিজয় মায়েরে ছাড়িয়ে
আমারি নিকটে থাকিত প্রায়!
ক্রমে ক্রমে ক্রমে যৌবন-সোপানে
যখন চরণ ঠেকিল তার,
হইয়ে অধীর পরের নারীর
চাপালে মাথায় কলঙ্ক ভার!
জানিতে পারিল ভগিনী বিজয়া,
প্রচার করিল মায়ের আগে,
জননী তখন কঠোর বচন
কহিল বিজয়ে অসহ রাগে।

ক্রোধান্ধ বিজয় শাণিত কৃপাণে
শুধিল বোনের দ্বেষের ধার,
দুহিতার শোকে আত্ম-বিসর্জ্জন
সহজে করিল জননী তার!
বিজয়ের নামে কলঙ্কের ঢেউ,
ভূধর-প্রমাণ উঠিল বেগে,
শোকার্ত্ত জনক না পারিয়ে আর,
দূর কোরে তারে দিয়েছে রেগে।
সরলা সুমতি তুমি, মহামায়া,
না জানি তাহার অশেষ গুণ,
দিয়েছ তাহার আবাস হেথায়,
ডাকিয়ে এনেছ আপন খুন।
তোমার দামিনী—ভুবনমোহিনী,
অমীয় প্রকৃতি সরলা বালা,
জেনেছ কি দেবি, বিজয়েরে সেবি,
ঘটিবে তাহার কত কি জ্বালা?
বিজয় আমার নহেত অরাতি,
আপন গ্রামের আপন লোক,
দামিনীর কথা ভেবে পাই ব্যথা,
তাই প্রকাশিনু মনের ঝোঁক।"
কহিয়ে রোহিণী ফেলিল নয়নে
টেনে টুনে জল দু এক ফোঁটা,
কহিল "কালিকা করেন এ যেন,
দামিনীর পানে না চায় ওটা।
পুত্র-শোকে আমি আছি জ্বরজ্বর,
প্রতাপ আমার বিবাগী হোয়ে,
কোথায় চলিয়ে গিয়েছে ফেলিয়ে,
সুখী এবে শুধু দামিনী লোয়ে।"
বলিয়ে রোহিণী লইয়ে বিদায়,
চলিল রোহিণী আপন বাস,
ফুঁসিতে লাগিল মহামায়া সতী
বহিতে লাগিল অনল-শ্বাস।
এমন সময় সরলহৃদয়
দামিনী আসিল মায়ের কাছে,
কুসুম-কানন করিয়ে উজাড়,
কুসুমের সাজে সাজিয়া আছে!
কবরীটি গাঁথা মালতী মালায়,
অলকা ঝলকে যূথিকা ফুলে,
অফুট বেলার প'রেছে মালিকা,
পোড়েছে সে মালা চরণ-মূলে।
কুসুম পরাগে সুরভিত বাস,
কামিনী-পাপড়ী পোড়েছে গায়,
কুসুমে সেজেছে কুসুম-বালিকা,
কে তোরা হেথায় দেখিবি আয়।
হাসি-মাখা মুখ করে ঢল ঢল,
হরষে চপল নয়ন দুটি,
হেথায় হোথায়, হৃদয়ে মাথায়,
আকুল ভ্রমরা বেড়ায় ছুটি।
"এই দেখ গো মা সেজেছি কেমন,
উজাড় করিয়ে কুসুম-বন,
গোলাপের কাঁটা ফুটিল যে কত,
কিছুই আঘাতে দেইনি মন।
ভ্রমরের সনে করিয়ে সমর,
এই মা টগর এনেছি তুলে,
ফুঁ দিয়ে উড়ায়ে প্রজাপতিদলে
ছিনিয়ে এনেছি মাধবী ফুলে।
নাড়া দিনু যত বকুলের শাখা,
পড়িল কুসুম ধরণী ছেয়ে,
আবার—আবার এনেছি কাহারে,
নেহারো ও গো মা এদিকে চেয়ে—
তাপস-কুটীর তেয়াগি বিজয়
আসিতে ছিলেন মাসেক পরে,

সাগর বেলায় নিরখি তাহায়
এক সাথে মোরা আসিনু ঘরে।"
কহিতে কহিতে ঢুলে পড়ে আঁখি,
গুরুগুরু করে হৃদয় মাঝ,
অধরে ঈষৎ বিকশিত হাসি,
বিজয় কুমার এসেছে আজ।
বিজয়েরে ফিরে দেখি মহামায়া
দাবানল পারা জলিয়ে ওঠে,
থর থর থর কাঁপিছে অধর,
নয়নের কোণে আগুণ ছোটে।
বজ্র-ভীমনাদে কহে মহামায়া,
বামেতর হাত রাখিয়ে বুকে—
"দামিনী, তোমারে করিনু বারণ,
বিজয়ের নাম এনো না মুখে।
দিব না তাহার চরণ পরশে,
কলঙ্কিতে এই কুটীর মম,
তুমিও দামিনী পাষরিবে তায়,
ভাবিয়ে তাহারে পিশাচ সম।
বিজয়—বিজয়! কহিনু তোমারে,
যাও ছাড়ি এই কুটীর মোর,
আমাদের মাঝে উঠুক ভূধর,
বহুক সাগর তুফানে ঘোর।"
বলি মহামায়া—কঠোর মূরতি,
ভ্রূকুটি হানিল দুহিতা পানে,
স্তম্ভিত দামিনী বজ্রাহত প্রায়,
কি সে যে কি হ'ল, কিছু না জানে।
শূন্যে চাহি রয়, পড়ে না পলক,
চলে না চরণ, নড়ে না হাত,
সঘনে শুধুই বহে ঘন শ্বাস,
হৃদয় হোয়েছে রুধির সাৎ।
অবশ হাতের মালতীর ফুল,
ঝর ঝর ঝর প'ড়িছে ঝোরে,
খসিছে আঁচল, খসুক আঁচল,
ভ্রূক্ষেপ নাই তাহার পরে।
হৃদয়ে কপোলে বসিছে ভ্রমর,
বসুক ভ্রমর আপন মনে,
কুটীর যে কোথা, দামিনী যে কেবা,
কেবা যে বিজয় কেই বা জানে!

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

প্রকৃতি-তত্ত্ব।—শ্রীশ্রীরাম পালিত প্রণীত। বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৷৷০। এখানি একখানি ছন্দে গ্রথিত পদার্থ-বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক। স্থূল প্রকৃতি-তত্ত্বসমূহ ইহাতে সুন্দর-রূপে বিবৃত হইয়াছে, এবং কবিতা-আকারে ইহা প্রচারিত হওয়াতে সেই তত্ত্বসমূহ সহজেই লোকের কণ্ঠস্থ হইবার সম্ভবনা। বালক বালিকাদিগের পক্ষে এ পুস্তক খানি একটি বহুমূল্য রত্ন, বিজ্ঞান যে কি বস্তু এই পুস্তক পাঠে অতি অবলীলা ক্রমে তাহাদের বোধগম্য হইবে।

কুপিতকৌশিক নাটক।—সংস্কৃত হইতে সঙ্কলিত—৩০টী গীত সমেত। বুধোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৸০ আনা।

পুরাকালের রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানটি মুখে বলিলেও চক্ষে অশ্রু আকর্ষণ করে,

তাহাতে আবার এই নাটক খানি প্রখ্যাত সংস্কৃত নাটক চণ্ডকৌশিক হইতে সঙ্কলিত, সুতরাং ইহা যে আমাদের বিশেষ প্রীতিপ্রদ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা অনেক অনুবাদ অপেক্ষা এইরূপ সঙ্কলন ভালবাসি, কারণ ইহার দ্বারা মূল সংস্কৃতের উচ্চ ভাবগুলি সহজেই বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে মূল বিস্তার করিতে পারে। কিন্তু সঙ্কলনকার নাটকখানিকে দেশীয় যাত্রার উপযোগী করিতে গিয়া স্থানে স্থানে কল্পনার অত্যন্ত ব্যভিচার করিয়াছেন। চণ্ডমূর্ত্তি মহামুনি বিশ্বামিত্র রাজা হরিশ্চন্দ্রের ত্যাগ-স্বীকার দেখিয়া সবিস্ময়ে স্বগত বলিতেছেন 'উঃ! ব্যাটার মনের কি দৃঢ়তা!—ধন্য ধৈর্য্য! ধন্য মহানুভাবতা! তা যা হোক্, আমাকে কিন্তু ব্যাটার কতদূর দৌড় দেখিতে হইবে!'—নাটক খানির ৩০টী গীতের কোনটিই আমাদের ভাল লাগিল না। আমাদের মতে "নিশা অবসান হল, ভানুরশ্মি প্রকাশিল। ভয়ঙ্কর রাত্রিঙ্কর জন্তু সবে লুকাইল" ইত্যাদি গীতের ভাষাই নয়।

গোষ্ঠী কথা।—বুধোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য।০—এই পুস্তক খানি আমরা অতি আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি। বাস্তবিক এইরূপ একখানি পুস্তক এতদিন পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের পুস্তকালয়ে অভাবের মতন ছিল! প্রাচীন লোকদের হাস্যকর কথা ও হাস্যকর ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থকার আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।

ভারতীয় গ্রন্থাবলী। অর্থাৎ প্রাচীন ভারতবর্ষের গ্রন্থাবলীর বিবরণ, তাহাদের কাল নির্ণয় এবং সংক্ষিপ্ত সমালোচন। প্রথম খণ্ড। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। সোমপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১ টাকা।

এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে করিতে প্রতি পত্রে গ্রন্থকারের গবেষণা, চিন্তাশীলতা ও দেশানুরাগের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। বিস্তর বিস্তর নাটক ও কবিতার পরিবর্ত্তে যদি এইরূপ গ্রন্থ দিন দিন প্রচারিত হয় তা হইলে বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধির আর সীমা থাকিবে না। কিন্তু গ্রন্থকার দুএকস্থলে নিতান্তই স্খলিতপদ হইয়াছেন। তিনি ইউরোপীয়দিগকে আর্য্যবংশোদ্ভব প্রমাণ করিবার জন্য শব্দশাস্ত্র মন্থন করিতে গিয়া এই স্থির করিয়াছেন যে "বীর" হইতে Beer, "সুরা" হইতে Sherry এবং "মদিরা" হইতে Medeira উৎপন্ন হইয়াছে। আমাদের এক জন বন্ধু রহস্যচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে নলদময়ন্তী বনবাস-কালে সুন্দরবনে সমুদ্রের ধারে ছিলেন, কারণ Diamond Harbour শব্দটি, অর্থাৎ দময়ন্তী ও her (তাহার) বর—সেই বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।—গ্রন্থকারের মতের সহিত অন্য অন্য বিষয়েও আমাদের অনেক স্থলে অনৈক্য আছে—স্থানাভাবে তাহা প্রদর্শন করিতে পারিলাম না।

বন-কুসুম। দ্বিতীয় স্তবক। পদ্যগ্রন্থ। শ্রীশশীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। রায় যন্ত্রে মুদ্রিত। এই কবিতা পুস্তকের অনেকগুলি কবিতা আমাদের ভাল লাগিল। গ্রন্থকার পরে যে এক জন সুকবি হইবেন তার সন্দেহ নাই।

প্রকৃতি এবং তাহার মূল-নিয়ম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উন্নতির নিয়ম।

উন্নতি বলে কাহাকে—না নিকৃষ্ট সঙ্গ হইতে উৎকৃষ্ট সঙ্গে, নিকৃষ্ট শ্রেণী হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীতে, প্রবেশ করা। উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতে হইলে নিম্ন শ্রেণীকে যে-কোন নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় তাহাকেই বলে উন্নতির নিয়ম। উন্নতির নিয়ম রীতিমত আয়ত্ত করিতে হইলে সে নিয়মের প্রয়োজন কি তাহা সর্ব্বাগ্রে জানা আবশ্যক। রাজ-নিয়ম লিপিবদ্ধ করিবার প্রচলিত প্রথা যেমন—হেতুবাদ অগ্রে বিন্যাস করিয়া তবে বক্তব্য-যাহা তাহা বলা—এখানকার প্রথাও সেইরূপ মনে করিয়া উন্নতি-নিয়মের হেতুবাদটির প্রতি অগ্রে প্রণিধান মূলে যাউক্; সেটি এই;—যাহা মঙ্গল তাহাই প্রয়োজন, জগৎ-সৃষ্টি যার পর নাই মঙ্গল-ব্যাপার এ জন্য জগৎ-সৃষ্টি প্রয়োজন; অপূর্ণ বস্তুরই সৃষ্টি হইতে পারে, পূর্ণ যিনি তিনি নিত্যকালই পূর্ণ রূপে বর্ত্তমান আছেন, তিনি স্রষ্টা, তিনি সৃষ্ট হইতে পারেন না; সুতরাং সৃষ্ট যাহা কিছু তাহা অপূর্ণ হইতেই চায়; জগতের অস্তিত্বই অপূর্ণতা-নিবন্ধন। অগ্রে জগতের অস্তিত্ব সাধন হইলে তবে ত তাহার মঙ্গল-সাধন হইবে; অপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াই জগৎ আপনার অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, আর পূর্ণতার দিকে গতি প্রাপ্ত হইয়াই মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়াছে। যেহেতু একেবারেই জগতের অপূর্ণতা ঘুচিয়া গেলে এক অদ্বিতীয় পূর্ণস্বরূপই থাকেন তদ্ভিন্ন আর কোন কিছুই থাকে না,—জগৎ থাকে না; অতএব জগতের পক্ষে এই নিয়মই সর্ব্বতোভাবে কল্যাণ-জনক যে, তাহা ক্রমশই অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবে, কোন কালেই পূর্ণতায় পৌঁছিতে পারিবে না।

জগতের নিয়ম-পুস্তক হইতে উন্নতি-নিয়মের উপরি-উক্ত হেতুবাদটি উদ্ধৃত করা হইল। এখন—নিয়ম-পুস্তকটি পাওয়া যায় কোথায়? দূরে কোথাও নয় মনুষ্য আপনার মনোমন্দিরে তত্ত্ব করিলেই তাহার সন্ধান পাইতে পারে। মনুষ্যকে কে বলিয়া দিতেছে যে, জড়-জগৎ অপেক্ষা উদ্ভিদ-জগৎ, তদপেক্ষা জীব-জগৎ, নিকৃষ্ট জীব অপেক্ষা মনুষ্য, বৈষয়িক মনুষ্য অপেক্ষা আধ্যাত্মিক মনুষ্য—উন্নত; অথবা যাহা একই কথা, দেহ অপেক্ষা প্রাণ, তদপেক্ষা মন, তদপেক্ষা বুদ্ধি, তদপেক্ষা আধ্যাত্মিক আনন্দ—উন্নত, এ কথা কে বলিয়া দিতেছে? মনুষ্যের মনোমধ্যে পূর্ণতার একটি আদর্শ যাহা বিদ্যমান আছে তাহার সহিত তুলনা করিয়া কে তাহার কত নিকট-

বর্ত্তী কেবা কত দূরবর্ত্তী মনুষ্য তাহা বুঝিতে পারে; এবং সেই আদর্শ-নেত্রে স্পষ্ট দেখিতে পায় যে সমস্ত প্রকৃতি পূর্ণতারই অভিমুখে যাত্রা করিতেছে।

প্রকৃতি যদি ক্ষণকালের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়ান, আর সেই-সময় কেহ যদি আপনার চিত্ত-পটে তাঁহার একখানি আতপ-চিত্র তুলিয়া ল'ন, তবে তাহার দৃশ্যটি এইরূপ হয়;—পরমাত্মার মহিমা যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হইতেছে সেইটি তাবতের মধ্য-প্রদেশ; সেই জ্যোতির্ম্ময় মধ্য-প্রদেশ হইতে একটি ক্রমশঃ-প্রসারিত পরিধি-পরম্পরা জ্যোতি হইতে ছায়া, ছায়া হইতে অন্ধকার, অন্ধকার হইতে প্রগাঢ় অন্ধতামিস্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এ যা দেখা যাইতেছে ইহা প্রকৃতির স্থির-মূর্ত্তি—বাস্তবিক প্রকৃতি কোন কালেই স্থির নহেন, প্রকৃতির আদ্যোপান্ত সমস্ত নিয়তই বিচলিত হইতেছে;—ঐ যে জ্যোতির্ম্ময় মধ্য-প্রদেশ তাহা আরো জ্যোতির্ম্ময় হইবার দিকে যাত্রা করিতেছে, এবং দূর-দূরস্থিত সমস্ত পরিধি-পরম্পরা তাহার দৃষ্টান্তের অনুগামী হইতেছে।

প্রকৃতির ঐ যে চিত্র, উহার কোন স্থানেই নিরপেক্ষ ভাব নাই, পূর্ণ-ভাব নাই; প্রকৃতির মধ্যে যাহা ভাল তাহা অপেক্ষাকৃত ভাল, যাহা মন্দ তাহা অপেক্ষাকৃত মন্দ। ভাল-র সম্বন্ধেই—মন্দ-যাহা তাহা মন্দ; মন্দের সম্বন্ধেই—ভাল-যাহা তাহা ভাল;—প্রকৃতির ভিতরকার ভাল-মন্দ এ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সম্বন্ধ ছাড়িয়া বিচার করিলে প্রকৃতির সকলই ভাল সকলই মন্দ; সকলই ভাল—কেন না প্রত্যেক বস্তুর কোন না কোন ভাল গুণ আছে; সর্প যে এমন হিংস্র জীব সে-ও আপনাকে আপনি হিংসা করে না—শুধু তা নয়, আপনাকে আপনি আন্তরিক ভালবাসে; তবে ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পারে এমন কোন একটা ভালগুণ সর্পেতেও বিদ্যমান আছে? তা যদি হয়, তবে পৃথিবীর কোন্ বস্তুতে তাহা নাই? মনুষ্যের পক্ষে কোন বস্তু হয় ত অত্যন্ত হেয়, পশু বা উদ্ভিদের পক্ষে তাহাই হয়ত আবার অত্যন্ত উপাদেয়। অতএব পক্ষাপক্ষ বিবেচনা না করিলে প্রকৃতির সকলই ভাল। আবার সকলই মন্দ—কেন না যত কেন ভাল হউক না তাহার উপরে [illegible]রো এত ভাল আছে যে তাহার তুলনায় পূর্ব্বের ভাল নিতান্ত মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। অতএব [illegible]হার সম্বন্ধে উহা ভাল, উহার সম্বন্ধে ইহা [illegible] এইরূপ শুদ্ধ কেবল সম্বন্ধের উ[illegible] জগতের ভাল-মন্দ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

প্রকৃতির আতপ-চিত্র যাহা ইতি-পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার আদ্যোপান্ত সমস্তই সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে; প্রকৃতির মধ্য-স্থান হইতে চরম সীমা পর্য্যন্ত জ্যোতির্ম্মণ্ডল হইতে ছায়ামণ্ডল তথা হইতে অন্ধকারমণ্ডল পর্য্যন্ত, যেখানে যাহা আছে সম্বন্ধ-ছাড়া কেহই নহে; তবে কাহারো সহিত কাহারো দূর সম্বন্ধ, কাহারো সহিত কাহারো নিকট সম্বন্ধ এই যা প্রভেদ। জগতের মধ্যে প্রত্যেকের

সহিত প্রত্যেকের যে সম্বন্ধ রহিয়াছে, এবং পরমাত্মার সহিত সকলের যে সম্বন্ধ রহিয়াছে, সেই সম্বন্ধ-সূত্র অবলম্বন করিয়াই, নিম্ন নিম্ন মণ্ডল কাল-ক্রমে উচ্চ উচ্চ মণ্ডলে নীত হয়। সে সম্বন্ধ-সূত্র কিপ্রকার তাহা দেখা যাউক।

এক দিকে সাম্য অপর দিকে বৈষম্য এই দুইটির উপর ভর করিয়া সম্বন্ধের অবস্থিতি। প্রথমতঃ বস্তুদ্বয়ের মধ্যে বৈষম্য না থাকিলে তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ থাকিতে পারে না,—আর কোন বৈষম্য না থাকে স্থান-বৈষম্যও ত থাকিবে, তাহাও যদি না থাকে তবে দাঁড়াইবে এই যে, দেখিতেছি এক বস্তু বলিতেছি দুই বস্তু; কেন না সাম্যের পরাকাষ্ঠাও যা, একত্বও তা, একই কথা। শুদ্ধ কেবল একের উপর ভর করিয়া সম্বন্ধ দাঁড়াইতে পারে না, দুই বা ততোধিক বস্তুর মধ্যেই সম্বন্ধ বাধিতে পারে। এ ত গেল বৈষম্য—আবার মূলে সাম্য না থাকিলেও সম্বন্ধ সম্ভবে না। আমি সম্পূর্ণ পৃথক্ তুমি সম্পূর্ণ পৃথক্ তোমাতে আমাতে সম্বন্ধ কি? একটা কিছু তোমার আমার মধ্যে সাধারণ না থাকিলে সম্বন্ধ দাঁড়াইবে-যে—তা কিসের উপর? হয় এক পিতামাতার পুত্র, নয় এক পরিবারে বা দেশে বা পৃথিবীতে বাস, নয় এক ভাবের ভাবুক, যাহাই হউক না কেন, এক কোন কিছু গোড়ায় থাকা চাই নহিলে "সম্বন্ধ" কথাটাই অপ্রসিদ্ধ হয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে সম্বন্ধ-মাত্রই সাম্য এবং বৈষম্য এই দুই উপাদানে বিনির্ম্মিত।

সম্বন্ধ যদিও সাম্য-বৈষম্য উভয়ের কোনটিকেই ছাড়িয়া-থাকিতে পারে না কিন্তু তথাপি কোন সম্বন্ধ অপেক্ষা কোন সম্বন্ধ সাম্য-প্রধান কিম্বা বৈষম্য-প্রধান হইতে পারে; ঐরূপ অপেক্ষাকৃত সাম্য-প্রধান সম্বন্ধকে আমরা সংক্ষেপে সাম্য-সম্বন্ধ বলিব, এবং তাহার বিপরীত পক্ষকে বৈষম্য-সম্বন্ধ বলিব; যথা—গ্রহনক্ষত্রবাসী লোকদিগের অপেক্ষা ইংরাজদের সহিত আমাদের সাম্য-সম্বন্ধ, তদপেক্ষা স্বদেশীয় লোকদিগের সহিত আমাদের সাম্য-সম্বন্ধ, স্বদেশীয় অন্য লোক অপেক্ষা ভ্রাতৃগণের সহিত আমাদের সাম্য-সম্বন্ধ ইত্যাদি, আবার ইহার বিপরীত পথে চলিলেই পরপর বৈষম্য-সম্বন্ধ হইতে বৈষম্য-সম্বন্ধে উপনীত হই। বৈষম্য-সম্বন্ধ দুইরূপ—সম্বন্ধ বস্তুদ্বয়ের মধ্যে যাহার নিম্ন পদবী তাহার নিকট একরূপ, আর যাহার উচ্চ পদবী তাহার নিকট একরূপ; প্রথম প্রকারের বৈষম্য-সম্বন্ধকে গরীয়ান সম্বন্ধ বলা যাইবে, দ্বিতীয় প্রকারের বৈষম্য সম্বন্ধকে লঘীয়ান সম্বন্ধ বলা যাইবে। স্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে সাম্য-সম্বন্ধ, উচ্চ শ্রেণীর প্রতি নীচ শ্রেণীর গরীয়ান সম্বন্ধ, নীচ শ্রেণীর প্রতি উচ্চ শ্রেণীর লঘীয়ান সম্বন্ধ, এই তিন প্রকারের সম্বন্ধ প্রকৃতির আদ্যোপান্ত সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান রহিয়াছে।

দুই বস্তুর মধ্যে চিরকালই যে একই প্রকার সম্বন্ধ সমান ভাবে বর্ত্তমান থাকিবে তাহা হইতে পারে না। পূর্ব্বে যাহাদের মধ্যে বৈষম্য-সম্বন্ধ ছিল এখন তাহাদের মধ্যে সাম্য-সম্বন্ধ এবং কালে ততোধিক সাম্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে,

আবার তাহার বিপরীতও হইতে পারে, কিন্তু কোন সম্বন্ধ এমন হইতে পারে না যে, চিরকাল তাহা যেখানকার সেইখানে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবে। এ যা বলা হইল ইহার উদাহরণ সর্ব্বত্রই পড়িয়া আছে, তাহার মধ্যে যেটি সর্ব্বদা সকলের চক্ষে পড়ে সেইটি উল্লেখ করিলেই এখানকার পক্ষে যথেষ্ট হইবে—সেটি গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ। গুরু শিক্ষার দাতা, শিষ্য শিক্ষার গৃহীতা, প্রথমে উভয়ের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ থাকে; শিক্ষাদান সমাপ্ত হইলে উভয়ের মধ্যে সেরূপ সম্বন্ধ আর থাকে না; তখন পূর্ব্ব-সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া গুরুর নিকট শিষ্য যে কৃতজ্ঞ ও নম্র ব্যবহার করে তাহাতে ইহা বুঝায় না যে এখনও উভয়ের মধ্যে উপরিউক্ত দাতা-গৃহীতার সম্বন্ধ বলবৎ রহিয়াছে; তবে কি? না সংস্কার বশতঃ শিষ্যের হৃদয়ে সে সম্বন্ধ এমনি বদ্ধমূল হইয়াছে যে, তাহার হৃদয় তাহা কিছুতেই ভুলিতে পারে না—ভুলিতে চাহেও না—ভোলাও উচিত নহে। কিন্তু হৃদয়ের ভাব যাহাই হউক না কেন—পূর্ব্বে যেরূপ উভয়ের মধ্যে বিদ্যা-ঘটিত বৈষম্য-সম্বন্ধ ছিল, এক্ষণে তাহা আর নাই, তাহার স্থলে সাম্য-সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ উচ্চ-শ্রেণীর সহিত বৈষম্য সম্বন্ধ ক্রমে ক্রমে যতই সাম্য-সম্বন্ধে পরিণত হয় ততই নিম্ন শ্রেণীর উন্নতি সাধিত হইতে থাকে।

উন্নতি-বিষয়ের তথ্য-নির্ণয় করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে মনুষ্যের প্রতি দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য—কেন না মনুষ্যই উন্নতির আদর্শস্থল।

মনুষ্য কতকগুলি সম্বন্ধের অধীন; তাহার মধ্যে ছয়টি সম্বন্ধ সর্ব্বপ্রধান—তিনটি বৈষম্য-সম্বন্ধ এবং তিনটি সাম্য-সম্বন্ধ; এবং একটি বৈষম্য-সম্বন্ধের পর একটি সাম্য-সম্বন্ধ এইরূপ পর্য্যায়-ক্রমে উহারা পরপর অভিব্যক্ত হয়। যথা,—

সম্বন্ধ	ভাবের দিক্	জ্ঞানের দিক্
বৈষম্য	বিষয় সুখ	স্বার্থ
সাম্য	দম্পতি-প্রেম	সংসার ধর্ম্ম
বৈষম্য	বাৎসল্য	শক্তি
সাম্য	সৌহার্দ্দি	সৌন্দর্য্য
বৈষম্য	ভক্তি	শ্রেয়
সাম্য	অমায়িক প্রেম	সামঞ্জস্য

বিষয়ের সহিত—শরীর অন্নবস্ত্র বাসস্থান প্রভৃতি ভোগের উপকরণ-সামগ্রীর সহিত—মনুষ্যের যে সম্বন্ধ, তাহা বিষয়-সুখের সম্বন্ধ। বিষয়-সুখের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—স্বার্থ। বিষয়-সুখ স্বার্থ-দ্বারা নিয়মিত হইলে তবে তাহা রীতিমত চরিতার্থতা লাভ করে। স্বার্থ কি না স্বীয় অর্থ—আপনার প্রয়োজন। আপনার প্রয়োজন বুঝিয়াই বিষয়-সুখ সম্ভোগ করা কর্ত্তব্য। বিষয়-সুখ অবিচারে উপভোগ করা অজ্ঞানের কার্য্য; স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া—ফলাফল বিবেচনা করিয়া—বিষয়-সুখ উপভোগ করাই জ্ঞানের কার্য্য। বিষয় সুখের অন্ধ উত্তেজনা একদিকে এবং স্বার্থের

বিজ্ঞ পরামর্শ একদিকে—পূর্ব্বোক্ত উত্তেজনা যদি শেষোক্ত পরামর্শের সহিত সঙ্গত হয় তবেই তাহাকে কার্য্যে পরিণত করা নচেৎ তাহাতে ক্ষান্ত থাকাই বিধেয়। বিষয়-সুখের জন্যই আমি, এই ভাবটি মূঢ় ভাব; আমার জন্যই বিষয়-সুখ, এই ভাবটি সজ্ঞান ভাব; প্রথমটি অনর্থের ভাব, দ্বিতীয়টি স্বার্থের ভাব। বিষয়-সুখ এরূপে উপভোগ করা উচিত যাহাতে স্বার্থ আছে। এ বস্তু উপকার-জনক ইহা সেব্য, ও বস্তু অপকার-জনক উহা ত্যাজ্য—স্বার্থের এই পরামর্শ-গুলি শুনিয়া চলিলে বিষয়-সুখ নিরুদ্বেগে এবং নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারে নচেৎ তাহার পদে পদে বিপদ। বিষয়-সুখের এই যে সম্বন্ধ ইহাকে বৈষম্য-সম্বন্ধ বলি কেন? না যেহেতু বিষয়-সামগ্রীর সহিত মনুষ্যের যে সম্বন্ধ তাহা লঘীয়ান সম্বন্ধ; বিষয়ের নিকট হইতে মনুষ্য কেবল সুখ আদায় করে, তা' ভিন্ন দুপক্ষের মধ্যে সুখের আদান প্রদান চলিতে পারে না, সুতরাং সাম্য-সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না।

ইহার এক ধাপ উপরেই দাম্পত্য-সম্বন্ধ। বিষয়-সুখের সম্বন্ধে কেবল এক পক্ষের সুখই—আপনার সুখই সর্ব্বস্ব, দাম্পত্য সম্বন্ধে এক পক্ষের সুখদুঃখ এবং অপর পক্ষের সুখদুঃখ একই সুখদুঃখ। দম্পতি-প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—সংসার-ধর্ম্ম। অন্যের নিকট হইতে তুমি যেরূপ ব্যবহার চাও তাহার প্রতিও তুমি সেইরূপ ব্যবহার করিবে—ইহাই সংসার-ধর্ম্মের সার মর্ম্ম। পরস্পর পরস্পরের উপযুক্ত হইবে, এবং পরস্পর হিত-ব্যবহার বিনিময় করিবে—ইহাই সংসার-ধর্ম্ম। এইরূপ সংসার-ধর্ম্ম দ্বারা নিয়মিত হইলেই দম্পতি-প্রেম যথার্থ পথে চলে। এস্থলে এইটি মনে রাখা উচিত যে, কোন-একটি ভাব উপরের ধাপে অবস্থিতি করে বলিয়া তাহাতে নীচের ধাপের ভাব নাই-যে তাহা নহে, সে ভাব আছে, তবে কি না তাহার উপর আর একটি নূতন ভাব আবির্ভূত হইয়া তাহার মুখ-শ্রী নূতন করিয়া তুলিয়াছে। দম্পতি প্রেমের মধ্যে বিষয়-সুখ—যাহা কেবল আপনার-মাত্র সুখ—তাহা আছে কিন্তু তাহার উপর "একের সুখ অন্যের" এই নূতন একটি ভাব আবির্ভূত হইয়া বিষয়-সুখকে এক ধাপ উচ্চে তুলিয়াছে। এমনি আবার সংসার-ধর্ম্মের মধ্যে স্বার্থ-ভাব নাই—যে তাহা নহে—স্বার্থভাব আছে, কিন্তু ধর্ম্মের অনুমোদিত সেই যে স্বার্থ তাহা পরার্থের সহিত অবিচ্ছেদ্যরূপে সংযুক্ত হইয়া নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে,—ধর্ম্মের নিয়ম পুস্তকে আপনার স্বার্থ এবং পরের স্বার্থ উভয়ের একই অর্থ।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা সাম্য সম্বন্ধ ইহা ত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সাম্যই বল আর বৈষম্যই বল প্রকৃতির অভ্যন্তরে উভয়ই আপেক্ষিক, অর্থাৎ সহস্র সাম্য হইলেও তাহার মধ্যে কোন না কোন প্রকার বৈষম্য থাকিতেই চায়, আর সহস্র বৈষম্য হইলেও তাহার মধ্যে কোন না কোন প্রকার

সাম্য থাকিতেই চায়; দাম্পত্য যে এমন সাম্য-সম্বন্ধ তাহার মধ্যেও বৈষম্য থাকা নিতান্তই প্রয়োজন, সে বৈষম্য এইরূপ,—আমি যাহাকে ভালবাসি তাহার অবশ্য এমনি একটি গুণ থাকিবে যাহা আমাতে নাই; যদি কেবল আমার আপনার গুণ-গুলিই অন্যেতে দেখি, তাহা অপেক্ষা অধিক আর কিছুই না দেখি, তবে তাহাকে ভালবাসা আমার পক্ষে বাহুল্য। আপনার প্রতি আপনার ভালবাসা ত আছেই—আর একজন যদি সকল বিষয়ে ঠিক আমারই মত হয়, তবে তাহাকে ভালবাসায় তা অপেক্ষা অধিক কি আর আমার লাভ? কারণ ব্যতীত কার্য্য হইতে পারে না—আমি আপনাকে ছাড়িয়া পরকে যে ভালবাসিব তাহার অবশ্য একটা কারণ চাই—সে কারণ এই যে, আমাতে আমি যাহা পাই না—তাহাতে আমি তাহা পাই। আমার আপনার যে কিছু গুণ আছে তা'র ত আর আমার অভাব নাই, অন্যেতে তাহা অপেক্ষা নূতন কোন গুণ দেখিলে তবে ত তজ্জন্য আমার একটা অভাব বোধ হইবে—ভালবাসা জন্মিবে। এখন—দাম্পত্য-সম্বন্ধে যদি বৈষম্য না থাকিলেই নয় তবে তাহাকে সাম্য-সম্বন্ধ বলি কেন? সাম্য সম্বন্ধের অর্থ এই যে, এ পক্ষের যেমন কতকগুলি গুণ আছে যাহা ও-পক্ষের নিকট নূতন, ও পক্ষেরও তেমনি কতকগুলি গুণ আছে যাহা এপক্ষের নিকট নূতন; ইহার এই গুণগুলি উহার অভাব পূরণ করে, এবং উহার ঐ গুণগুলি ইহার অভাব পূরণ করে। পর-পক্ষের অভাব-পূরণের যোগ্যতা এ পক্ষেরও যেমন ও-পক্ষেরও তেমনি—ঠিক সমান, এই কারণেই দাম্পত্য সম্বন্ধকে সাম্য-সম্বন্ধ বলা হইয়াছে। দুই পক্ষ যদি অবিকল একই প্রকার হয়, উভয়ের মধ্যে যদি এরূপ কোন গুণ বৈচিত্র না থাকে যাহা লইয়া আদান প্রদান চলিতে পারে, তাহা হইলে উভয়ের সংসর্গে উভয়ের কোন উন্নতি হইতে পারে না; এ অবস্থায় উভয়ের মধ্যে দম্পতি-প্রেম কখনই সম্ভবে না।

ইহার আর এক ধাপ উপরে বাৎসল্য সম্বন্ধ। পুত্র-কন্যার প্রতি পিতামাতার যে সম্বন্ধ তাহা বাৎসল্য-সম্বন্ধ। বাৎসল্য সম্বন্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—শক্তি। পুত্র-কন্যাকে কোন মতে মানুষ করিয়া তোলা পিতা-মাতার মনোগত অভিপ্রায়; তাঁহারা তাহাদিগকে আপনাদের শক্তির অধীনে আনিতে পারিলে তবেই সে শুভ অভিপ্রায় ফলদায়ক হয়। বাৎসল্য যেমন দাম্পত্য হইতে প্রসূত, শক্তিও সেইরূপ সংসার-ধর্ম্ম হইতে প্রসূত; সংসার-ধর্ম্মের সার মর্ম্ম পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি যে, আমি যেমন অন্যের নিকট প্রত্যাশা করি অন্যের প্রতি আমিও যেন সেইরূপ ব্যবহার করি, তাৎপর্য্য তাহার আর-কিছু নহে কেবল পরস্পরের প্রতি আন্তরিক একটি সদিচ্ছা। পিতা মাতার আপনাদের মধ্যে আন্তরিক সেই যে সদিচ্ছা, তাহারই প্রভাবে সন্তানের উপর তাঁহাদের শক্তি সঞ্চারিত হয়। ধর্ম্মের মধ্যে যেমন স্বার্থ সংভুক্ত রহিয়াছে, সেইরূপ শক্তির মধ্যে

ধর্ম্ম সংভুক্ত রহিয়াছে—কেন না ধর্ম্মের শক্তিই শক্তি, অধর্ম্মের শক্তি অশক্তি বই নয়। সহাইয়া সহাইয়া শক্তি প্রকটন পূর্ব্বক পুত্র-কন্যাকে উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলা পিতামাতারই কার্য্য; ইহাতে পুত্র কন্যার কিছুমাত্র কষ্টও বোধ হয় না অথচ শিক্ষা লাভ হয়। এইরূপ ধর্ম্ম-গর্ভ শক্তি দ্বারা নিয়মিত হইলেই বাৎসল্য যথার্থ-পথে পদনিক্ষেপ করে। বাৎসল্য সম্বন্ধ বৈষম্য-সম্বন্ধ ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কেন না পিতার প্রতি পুত্রের ভাব এবং পুত্রের প্রতি পিতার ভাব পরস্পর বিভিন্ন। বিষয়-সুখের সম্বন্ধ প্রথম বৈষম্য সম্বন্ধ—ইহাতে শুদ্ধ কেবল আদানেরই ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়, বিষয় হইতে আমি রসাকর্ষণ করিব তাহাকে আমি পাল্‌টা কিছু দিব না—এই সে ব্যাপার। দাম্পত্য সম্বন্ধ প্রথম সাম্য-সম্বন্ধ, ইহাতে আদান-প্রদানের তুল্যতা দেখিতে পাওয়া যায়—ভালবাসা যেমনটি দেওয়া তেমনিটি পাওয়া এই তাহার ভাব। বাৎসল্য-সম্বন্ধ দ্বিতীয় বৈষম্য-সম্বন্ধ, ইহাতে প্রদানেরই ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়, সংসার-ধর্ম্ম সাধন করিয়া পিতামাতার যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহা পুত্র কন্যাগণেরই জন্য।

ইহার আর একধাপ উপরে সৌহার্দ্দ সম্বন্ধ—ইহা দ্বিতীয় সাম্য সম্বন্ধ। সৌহার্দ্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—সৌন্দর্য্য। সমবয়স্ক সঙ্গীগণের মধ্যে যেমন সৌন্দর্য্যের অনুশীলন হইতে পারে, গুরু-লঘু ব্যক্তির মধ্যে তেমনটি কখন সম্ভবে না। সৌন্দর্য্য এমন বস্তু নহে যাহা একাকী ভোগ করিয়া তৃপ্ত থাকা যায়; একটি সুন্দর রচনা বা ছবি বা গীত দেখিলে শুনিলে বন্ধু-সকলকে তাহা দেখাইতে শুনাইতে মন যায়। স্বামী বা স্ত্রী দুপক্ষের হইয়া অথবা উভয়ে একত্রে মিলিয়া সংসার-ধর্ম্ম অনুশীলন করিলে তবে যেমন তাহা তৃপ্তি-জনক হয়; সেইরূপ বন্ধুবর্গের চক্ষুর সহিত চক্ষু এবং মনের সহিত মন মিলাইয়া সৌন্দর্য্য অনুশীলন করিলে তবেই তাহা তৃপ্তিজনক হয়। ধর্ম্ম যেমন স্বার্থ নহে অথচ স্বার্থ, সৌন্দর্য্য সেইরূপ শক্তি নহে অথচ শক্তি। ধর্ম্মের মধ্যে স্বার্থ, সৌন্দর্য্যের মধ্যে শক্তি, থাকে,—কিন্তু সুশাসনে। সন্তানের উপর পিতা মাতার যে শক্তি-সঞ্চার হয় তাহা অবাধে হয়, বন্ধুবর্গের মধ্যে পরস্পর যে শক্তি-সঞ্চার হয় তাহা পরস্পর কর্ত্তৃক বাধা-যুক্ত। বন্ধুবর্গের সকলেই পরস্পরের উপর স্ব স্ব প্রকৃতি-সুলভ শক্তি চালনা করিবে, এইটির প্রতি কেহ হন্তারক না হইয়া আপনার শক্তি-চালনা করিলে তাহাই বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে শোভা পায়। সৌহার্দ্দের উপর অনিয়ন্ত্রিত শক্তির প্রভুত্ব খাটে না কিন্তু সৌন্দর্য্যের প্রভুত্ব সম্পূর্ণই খাটে। স্বামী-স্ত্রীর একতম পক্ষ যে-গুণ দ্বারা অন্যতমের মনোনীত হয়, আর পাঁচ জনের চক্ষে সে-গুণ হয়ত গুণই নহে,—এইরূপ-যে গুণ, যাহা স্বামীই কেবল স্ত্রীতে দেখিতে পায় অথবা স্ত্রীই কেবল স্বামীতে দেখিতে পায়, তদ্ভিন্ন আর কেহ দেখিতে

পায় না,ইহাকে সৌন্দর্য্য বলে না,—সৌন্দর্য্য বলে তাহাকেই যদ্দ্বারা জন সাধারণের মন আকৃষ্ট হয়। সৌহার্দ্দ রীতিমত উপভোগ করিতে হইলে বন্ধুগণের মনস্তুষ্টি জন্মাইতে পারে এমন কোন একটি লোকরঞ্জন গুণের অনুশীলন চাই,—আপনার যেটি ভাল লাগে তাহাই ভাল এভাব বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে কোন-প্রকারেই শোভা পায় না। যত প্রকার মনোরঞ্জন বিদ্যা আছে—সঙ্গীত-বিদ্যা, চিত্র-বিদ্যা, স্থপতি-বিদ্যা, এ সমস্তই সৌন্দর্য্যের সন্তান-সন্ততি ! সুন্দর মনের ভাব, শোভন দৃশ্য, শোভন বাক্য. শোভন সঙ্গীত, শোভন ব্যবহার, এই সমস্ত সৌহার্দ্দের পক্ষে সবিশেষ উপযোগী। অশোভন ব্যবহারে,অশোভন বাক্যে, অশোভন দৃশ্যে, সৌহার্দ্দ কুণ্ঠিত হয়; সৌন্দর্য্য দ্বারা নিয়মিত হইলে তবেই সৌহার্দ্দ রীতিমত চরিতার্থ হইতে পারে ।

এখন সৌহার্দ্দের সম্বন্ধকে সাম্য সম্বন্ধ বলিবার কারণ কি দেখা যাউক্। সুহৃন্মণ্ডলীর প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত প্রত্যেক ব্যক্তির তুল্য-মূল্যের আদান-প্রদান চলিতে থাকে; ইহাতে করিয়া মণ্ডলীটির উচ্চ নীচ ভাব-গুলি ক্রমে ক্রমে সমভূম হইয়া গিয়া উহার একটি বিশেষ লক্ষণ দাঁড়ায়; এবং সেই লক্ষণটি মণ্ডলীর অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিতেই সমানরূপে বর্ত্তে। ইহারই জন্য সৌহার্দ্দ সম্বন্ধকে সাম্য-সম্বন্ধ বলা হইয়াছে। দাম্পত্য-সম্বন্ধে একতম-পক্ষ দম্পতির স্থলাভিষিক্ত অথবা প্রতিনিধি হইতে পারে—এই প্রকার সাম্য; সৌহর্দ্দ-সম্বন্ধে প্রত্যেকে সুহৃন্মণ্ডলীর প্রতিনিধি হইতে পারে—এই প্রকার সাম্য ।

ইহার আর এক ধাপ উপরেই ভক্তির সম্বন্ধ—ইহা তৃতীয় বৈষম্য-সম্বন্ধ; কেন যে বৈষম্য সম্বন্ধ তদুপলক্ষে নূতন কিছুই বলিবার নাই—বাৎসল্যের সম্বন্ধ যে কারণে ইহাও সেই কারণে বৈষম্য-সম্বন্ধ। ভক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্রেয়। শ্রেয় দ্বারা ভক্তি নিয়মিত হইলেই তাহা রীতিমত চরিতার্থতা লাভ করে। অর্থাৎ যাহা শ্রেয় যাহা মহৎ তাহাতে ভক্তি সমর্পণ করা হইলেই ভক্তি রীতিমত চরিচার্থতা লাভ করিতে পারে। শ্রেয়ের বশ হইলে তবেই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গুরু ব্যক্তিদিগকে রীতিমত ভক্তি করিতে পারা যায়; শুভাকাঙ্ক্ষী শব্দের অর্থই এই যে তিনি শ্রেয় চাহেন। যিনি আমাদের শ্রেয় চাহেন না—শুদ্ধ কেবল আনুগত্য চাহেন, তাঁহাকে আমরা ভক্তি করিলে অপাত্রে ভক্তি সমর্পণ করা হয়,—এ সব স্থলে ভক্তি কিছুকাল পরেই অভক্তিতে পরিণত হয়। শ্রেয়ঃ-সাধন করিলে যাঁহার নিকট আদর-ভাজন হওয়া যায় তাঁহাকেই ভক্তি করা উচিত—তাহা হইলে ভক্তি শ্রেয়-দ্বারা নিয়মিত হইয়া সাধককে নিম্ন শ্রেণী হইতে উচ্চ শ্রেণীতে তুলিয়া লয়। সমকক্ষ সঙ্গীগণের মনোনীত হইলেই শ্রেয় হয় না, উচ্চশ্রেণীর মনোনীত হওয়া চাই তবেই বিষয়-বিশেষ শ্রেয়োগুণ-সম্পন্ন হয়। সৌন্দর্য্যকে যেমন উচ্চ মূল্যের শক্তি বলা যাইতে পারে, শ্রেয়কে সেইরূপ উচ্চ মূল্যের সৌন্দর্য্য বলা যাইতে পারে; এমন

কি, উচ্চ মূল্যের কবিতাতে শ্রেয়েরই সৌন্দর্য্য বিশেষরূপে প্রতিফলিত হইয়া থাকে।

ইহার আর এক ধাপ উপরে অমায়িক প্রেম, অর্থাৎ যে প্রেম মায়ার শৃঙ্খলে বদ্ধ নহে। অমায়িক দৃষ্টিতে দেখিলে—পর যে সেও আপনার হয়, ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে দেখিলে—আপনার যে সেও পর হয়। পর্ব্বতশিখর হইতে নিম্নস্থিত লোকালয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কুটীর ও প্রাসাদের মধ্যে যেমন বিশেষ কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় না, জগতের অতীত প্রদেশ হইতে জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উচ্চ নীচের তারতম্য সেই রূপ মনে অধিকার পায় না। জগতের মায়া-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া এবং পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইয়া, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যখন প্রেম প্রসারিত হয় তখন তাহাই অমায়িক প্রেম শব্দে উক্ত হয়। অসীমের সহিত সসীমের যে প্রেম-সম্বন্ধ তাহাই অমায়িক প্রেমের সম্বন্ধ। অমায়িক প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সামঞ্জস্য। জগতের যে স্থানে আমরা আছি সেইস্থানে থাকিয়াই আমরা যদি সমস্তের সহিত আপনার সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারি, তাহা হইলে কাহারো সহিত আমাদের আর বিবাদ থাকে না,—তাহা হইলে পদ্মপত্রে জল যেমন নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করে, সংসারে আমরা সেই ভাবে বিচরণ করি। প্রকৃতির যে একটি চিত্র ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার মধ্য-প্রদেশ-হইতে দূরদূরস্থিত অনন্ত পরিধি-পরম্পরা পর্য্যন্ত সামঞ্জস্যের কোথাও একটু ত্রুটি হইবার জো নাই। যেখানে যেটি চাই সেখানে সেইটি রহিয়াছে; যে-সময়ে যেটি চাই সেই সময়ে সেইটি আবির্ভূত হইতেছে; যেমনটি যেখানে শোভা পায় তেমনিটি সেইখানে স্থান গ্রহণ করিতেছে। প্রকৃতির মধ্য-দেশ বলিয়া যে স্থান উল্লেখ করা হইয়াছে, যেখানে, বলা হইয়াছে, পরমাত্মার মহিমা সর্ব্বপেক্ষা প্রকৃষ্ট-রূপে প্রতিবিম্বিত হইতেছে, তাহা কি উপাদানে নির্ম্মিত তাহা একবার ভাবিয়া দেখা যাউক। জগতের মধ্যে সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সামগ্রী কি? না চেতন পদার্থ; তাহা যদি হইল তবে সেই উপাদানেই প্রকৃতির মধ্যস্থল বিনির্ম্মিত। প্রকৃতির সেই মধ্য-দেশ সমুদায়-আত্মার সঙ্গম-স্থান। যদিও আমরা বলি আমাদের আত্মা শরীরের অভ্যন্তরে বাস করিতেছে কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে তাহা সর্ব্বথা সম্ভব নহে। ঘটের অভ্যন্তরে জল আছে ইহা সম্ভব বলি কেন—না ঘটও আকাশ-ব্যাপী জলও আকাশব্যাপী। আত্মার প্রভাব শরীরাভ্যন্তর হইতে প্রকটিত হয় এই অর্থেই বলা যায় যে আত্মা শরীরাভ্যন্তরে বাস করে; কিন্তু আত্মা আকাশের অতীত বস্তু—সুতরাং অনাকাশ প্রদেশেই তাহার অবস্থিতি; প্রকৃতির মধ্যদেশই সেই অনাকাশ প্রদেশ। জগতের সমুদায় আত্মা প্রকৃতির সেই মধ্য-স্থানে—পরমাত্মার সেই অভয় ক্রোড়ে—নিরাপদে বিধৃত রহিয়াছে।

প্রকৃতির সেই মধ্যদেশকে আধ্যাত্মিক জগৎ বলা যাইতে পারে। ভৌতিক জগৎ আমাদের শরীরের বাসস্থান, আধ্যাত্মিক জগৎ আমাদের আত্মার বাসস্থান। মনুষ্যের আত্মা পরমাত্মার সহিত অধ্যাত্ম-জগতে—মনুষ্যের অমায়িক আনন্দ দেবতাগণের সহিত দেবলোকে—মনুষ্যের বুদ্ধি মনুষ্যগণের সহিত বিজ্ঞান-রাজ্যে—মনুষ্যের মন পশ্বাদির সহিত মনো-রাজ্যে—মনুষ্যের প্রাণ উদ্ভিদগণের সহিত জীবন-রাজ্যে এবং মনুষ্যের শরীর ভূত-গ্রামের সহিত ভৌতিক জগতে বাস করিতেছে; জগতের আদ্যোপান্ত সমস্তই মনুষ্যের বাসস্থান। সমস্ত জগতের সহিত মনুষ্যের সহিত আদান-প্রদান চলিতেছে; জগৎ যেমন মনুষ্যের হিতসাধন করিতেছে মনুষ্য তেমনি জগতের হিতসাধন কবিতেছে,—সমস্ত জগতের সহিত মনুষ্যের এ যেমন সাম্য-সম্বন্ধ, অন্য কোন জীবেরই এরূপ সম্ভবে না। যেমন সুহৃন্মণ্ডলীর প্রভাব তদভ্যন্তরস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তিতে সংক্রমিত হইয়া সকলকে এক আত্মা সদৃশ করিয়া তোলে, সেইরূপ সমস্ত জগতের প্রভাব মনুষ্যের উপর কার্য্য করিয়া তাহাকে সকলের সহিত যোগযুক্ত—সকলের ভাবের ভাবুক— করিয়া তোলে; আবার উপযুক্ত হইলে যেমন সুহৃন্মণ্ডলীর প্রত্যেকেই সমস্ত মণ্ডলীর প্রতিনিধি রূপে গৃহীত হইতে পারে,সেইরূপ—উপযুক্ত হইলে, মনুষ্য, সমস্ত জগতের প্রতিনিধি রূপে গৃহীত হইতে পারে; যথা,—মনুষ্যের শরীর ভৌতিক জগতের, মনুষ্যের প্রাণ উদ্ভিদ্ জগতের, মনুষ্যের মন পশ্বাদি জগতের, মনুষ্যের আধ্যাত্মিক আনন্দ দেবলোকের এবং মনুষ্যের আত্মা পরমাত্মার প্রতিনিধি স্বরূপ। সমস্তের সহিত আত্মার যে খানে সামঞ্জস্য সাধিত হয়, সেই নির্বিবাদ এবং নিরাপদ স্থান হইতেই সমস্ত জগৎ এবং তাহার মূলাধার পরমাত্মার প্রতি প্রেম প্রসারিত হইয়া মোক্ষানন্দে পরিপ্লুত হয়।

উপরে বিষয়-সুখ এবং স্বার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া অমায়িক প্রেম এবং সামঞ্জস্য পর্য্যন্ত যে ছয়টি ধাপ প্রদর্শিত হইল সমস্ত জড়াইয়া মনুষ্যের একটি উন্নতি-সোপান প্রস্তুত রহিয়াছে। প্রত্যেক ধাপেই দেখা যায় যে, বিভিন্ন-প্রকৃতি দুই পক্ষের পরস্পর সংসর্গে উভয়ের অভাব সম বা বিষমভাবে পূরণ হইয়া উভয়েই উন্নতি লাভ করে। সে উন্নতি যে কি রূপ তাহার বিশেষ বিবরণ অতঃপর প্রদর্শিত হইতেছে।

মেকলের ভারতবর্ষ-প্রবাস।

মেকলে যেরূপে তাঁহার প্রবাস যাপন করিতেন তাহা তাঁহার পত্রপাঠে অবগত হওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন "মাসগুলো কেমন শীঘ্র চলিয়া যাইতেছে। আবার শীতকাল উপস্থিত, সকালে কুয়াসা—বনাতের কাপোড়—কড়াই সুঁটি, নূতন আলু এই সকল এখানকার শীতের আনুসঙ্গিক জিনিস। আমার জীবনস্রোত এক প্রকার সমান বহিয়া যাইতেছে। কোন সময় কি বই পড়ি আর আমার ছোট ভগিনীটির উত্তরোত্তর বয়োবৃদ্ধি—এই দুয়েতেই আমার দিবস গণনার সাহায্য হয়। নতুবা বৎসরের এক ভাগ ও অপর ভাগের মধ্যে কিছুই প্রভেদ দেখিতে পাইতাম না। গ্রীক লাটিন গ্রন্থ অধ্যয়ন—প্রাতর্ভোজন, কাজকর্ম্ম—একটা বই হাতে করিয়া সায়াহ্নে ভ্রমণ, রাত্রিভোজন—কাফি পান, শয়ন, এতেই আমার একদিনের জীবন বৃত্তান্ত দেখিতে পাইলে।"

৮ মার্চ ১৮৩৭

"এক্ষণে আমার কর্ম্মের ভীড় অত্যন্ত। কতক দিন থেকে আমি কাজকর্ম্মে ভারি ব্যস্ত রহিয়াছি। যাহা হোক্ আমার হস্তে যে গুরুভার নিহিত ছিল তাহা এক প্রকার শেষ হইয়াছে। আর এক মাসের মধ্যে আমাদের পীনাল কোড গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হইবে। এই ফৌজদারী আইন শতকোটি লোকের জন্য—ইহার সূত্র সকল সমর্থন ও ব্যাখ্যা করিয়া টীকা প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার ভালমন্দ ঈশ্বরই জানেন যখন শুধু এই বই খানির প্রতি দৃষ্টি করি তখন ইহার বিশেষ কিছু গুণ দেখিতে পাই না, কিন্তু ইংরাজি ফরাসিস্ কোড সকলের তুলনায় ইহাকে প্রাধান্য দিতে হয়। আমার শরীর পূর্ব্ববৎ সুস্থ আছে—সময় দ্রুত বেগে চলিয়া যাইতেছে। এক দিন আর দিনের সঙ্গে এমন সমান যে আমার অভ্যাসক্রমে কোন সময় কোন বই পড়ি তাহা সেই বইয়ের মধ্যে পেনিসল দিয়া টুকিয়া না রাখিলে কালের গতি নিরূপণ করা আমার পক্ষে কঠিন হইত। অমুক ঘটনা কোন্ সময় হইয়াছে তাহা জানিতে হইলে আমি ভাবিয়া দেখি সে দিন আমি কি বই পড়িতে ছিলাম—বইয়ের পাতা উল্টাইয়া তারিখ দেখিয়া দিন স্থির করি—তখন দেখিয়া অবাক হই যে আমি যাহা দু-তিন মাসের ঘটনা মনে করিতে ছিলাম তাহা হয়ত এক বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছে।"

মেকলের ন্যায় পেটুক পাঠক কেহ কুত্রাপি দৃষ্টি করে নাই। ভাগ্যে তিনি গ্রন্থ-কীট ছিলেন তাই তিনি তাঁহার প্রবাস কাল কথঞ্চিৎ যাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার না এদেশ পছন্দ হইত না তিনি এ দেশের লোকেদের সঙ্গেই

মিশিতেন। ইহা প্রসিদ্ধই আছে ইংরাজেরা বিদেশে গিয়া আপনাদের দ্বীপোচিত ক্ষুদ্রভাব পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তাঁহাদের চক্ষে তাঁহাদের দেশই সকল দেশের আদর্শ, তাঁহাদের সমাজই সকল সমাজের আদর্শ। সেই আদর্শ হইতে যাহা কিছু ভিন্ন তাহাই ধিক্কার-যোগ্য। মেকলে তাহাতে আবার ইংরাজের ইংরাজ। তিনি এ দেশের যাহা কিছু সমস্তই আপনার সেই ক্ষুদ্র মানদণ্ড দিয়া মাপিয়া দেখিয়া তাহার গুণদোষ নির্ণয় করিতেন। এ দেশের কিছুই তাঁহার ভাল লাগিত না। তিনি বলেন—"এ দেশের বায়ুর একটা বিশেষ দোষ দৃষ্ট হয়। মানুষের হস্তরচনার উপর ইহার বড়ই নিগ্রহ। লৌহে মরিচা পড়ে, ছুরির ধার নষ্ট হয়, সুতা ক্ষয় হয়, কাপড় ছিঁড়িয়া যায়, গ্রন্থ সকল জীর্ণ হয় ও তাহাদের মলাট খসিয়া পড়ে, কাষ্ঠ পচিয়া যায়, মাদুর ছিন্ন ভিন্ন হয়। প্রচণ্ড সূর্য্য, এই বিস্তীর্ণ জলাদেশের বাষ্প, আর উইপোকার অসংখ্য সৈন্যদল গৃহের উপর এই তিনের এরূপ দৌরাত্ম্য যে তিন বৎসর অন্তর গৃহসংস্কার আবশ্যক হইয়া পড়ে। আমাদের বাড়ীর তিন মাস আগে এই দশা হইয়াছিল আর যদি আমরা বর্ষার পূর্ব্বে রীতিমত বন্দবস্ত করিবার ত্রুটি করিতাম তাহা হইলে হয়ত আমার মাথার উপর ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িত। এই জন্য আমরা ছয় সপ্তাহ কাল আমাদের গৃহ ও পুষ্পোদ্যান ছাড়িয়া অন্যত্রে বাস করিতে বাধ্য হইলাম। এখানে দেশীয় রান্নার দুর্গন্ধে, দেশীয় বাদ্যধ্বনির জ্বালায় আমরা মারা যাই আর কি। আমরা এক্ষণে আমাদের গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছি, ইহার পর যে ছাড়িতে হইবে সে একেবারে স্বদেশ যাত্রার জন্য জাহাজে উঠিবার সময় ——ইহা মনে করিয়াও আনন্দ হইতেছে।" তিনি এক স্থলে এ দেশের খাদ্য সামগ্রীর বর্ণন করিয়া বলিতেছেন "এখানকার ফল যদ্বিশ্রী। তাহাদের মধ্যে যা অত্যন্ত সুস্বাদু তাহা আমাদের এপ্রিকট কিম্বা গুজবরি (টেপারীর) চেয়েও অধম।" আশ্চর্য্য যে এ দেশের ফলের কথা বলিতে গিয়া তাঁহার ভাল বোম্বাই আম মনে পড়িয়া জিহ্বায় জল আসে নাই। "ছেলেবেলায় ভাবিতাম যে কলাই বুঝি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল ও খর্জ্জুর রস অপেক্ষা সরস কিছুই নাই। আমার পিতা এই সকল দ্রব্য আস্বাদন করিয়াছেন বলিয়া আমার কেমন হিংসা হইত। কিন্তু এখন দেখিতেছি যেমন দূর হইতে মনে করা যায় তেমন কিছুই নয়। কলা আমাদের দেশের পচা পেয়ারার মত। একজন অন্ধ এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ জানিতে পারে না ইহা আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি। মান্দ্রাজে একটী গ্রামে এক রাত্রি বাস করিয়া ছিলাম। সেখানে তাল-রস চাখিয়া দেখিলাম। ইহা চাখিবার আমার বড়ই সাধ ছিল। সকালে আমাকে উঠাইয়া আমার চাকর আমাকে একটা পাত্রে করিয়া টাটকা রস আনিয়া দিল। আমি পান করিলাম—দেখি যে জিঞ্জর বিয়র মদ্যে আদার ভাগ অল্প থাকিলে যেমন স্বাদ তাহারও তেমনি আস্বাদ।"

মেকলে চৌরঙ্গির একটা সেরা বাড়ীতে বাস করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন "আমার একটা সুন্দর উদ্যান আছে। ইহা সবুজ তৃণ পরিচ্ছদে সুশোভিত, চারি ধারে বেড়াইবার কাঁকরের রাস্তা, মধ্যে মধ্যে ফুল গাছ ছড়ান। বর্ষার পরে এখন ইহা বেশ সুন্দর দেখিতে হইয়াছে আর শুনিতে পাই সম্বৎসর ইহার হরিদ্বর্ণ অপনীত হয় না। আমার লাইব্রেরি হইতে সিড়ি দিয়া এই বাগানে উত্তীর্ণ হওয়া যায় ও ইহা এমত ছায়া-সুলভ যে বেলা ১০টা পর্য্যন্ত এখানে আরামে বেড়ান যায়।" শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি এই সুরম্য স্থানে সূর্য্যোদয়ের পর দুই ঘণ্টা বই হাতে করিয়া বেড়াইয়া বেড়াতেন। প্রত্যহ প্রাতে তাঁহার ছোট পুঁটি আসিয়া তাঁহার পাঠ ভঙ্গ করিত। রুটির টুকরা ছড়াইয়া দিয়া কাকদের খাওয়ান তাহার কাজ ছিল ও যখন সে বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া রুটি বিতরণ করিত তখন তাহাকে বড় বড় পাখীদের উৎপাত হইতে রক্ষা করিতে তাহার মাতুলের সামান্য পরিশ্রম হইত না। যখন সূর্য্যের উত্তাপ তাঁহাকে গৃহের মধ্যে তাড়াইয়া দিত, তখন তিনি স্নান ভোজন প্রভৃতি নিত্য নিয়মিত ক্রিয়া সমাপন করিয়া আফিসের কাজকর্ম্ম আরম্ভ করিতেন।

কৌন্সিলের দিনে কিম্বা অন্য কোন বিশেষ প্রসঙ্গে তাঁহার গৃহের বাহির হইতে হইত, তদ্ভিন্ন অন্যান্য দিবসে তিনি প্রায় তাঁহার লাইব্রেরিতে থাকিয়া তাঁহার পড়া শুনা ও অপর কার্য্য করিতেন। কখন বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ প্রতিসাক্ষাৎ করিতেই তাঁহার সকালটা কাটিয়া যাইত কিন্তু ওরূপ সময়ব্যয় তাঁহার নিতান্ত বিরক্তিজনক বোধ হইত। ভাগ্যক্রমে তাঁহার বন্ধুগণ প্রায়ই গৃহে অনুপস্থিত থাকিতেন ও তখন কেবল তাঁহার নামের এক কার্ড পাঠাইয়া দিয়াই নিস্তার পাইতেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর তিনি তাঁহার ভগিনীর সঙ্গে বসিয়া হয় গ্রীক্ হইতে অনুবাদ, নয় কোন ফ্রেঞ্চ বই পাঠ করিতেন। সায়াহ্নে তাঁহারা দুজনে গাড়ী করিয়া গঙ্গাতীরে ভ্রমণে বাহির হইতেন ও সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রাত্রিভোজনে বসিতেন। ভোজনের সময় প্রায়ই বহু সংখ্যক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিত। এই সকল আঙ্গ্লো ইণ্ডিয়ান প্রথানুরূপ ভোজের উপর মেকলে অতিশয় বিরক্ত ছিলেন। "এর চেয়ে আর কিছুই, বিরক্তিজনক হইতে পারে না, যে, যে যার পাশে বসিয়া আছে সে তার সঙ্গে ভিন্ন অন্য কারো সঙ্গে কথা কয় না। যেরূপ কথাবার্ত্তা চলে তাহা নিতান্ত নীরস ও অর্থশূন্য। অভ্যাগতের মধ্যে সকল অপেক্ষা যিনি বড় বিবি আমাকে সর্ব্বদাই তার পার্শ্বে বসিতে হয় অর্থাৎ যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধা, কুৎসিতা গর্ব্বিতা তাঁহার সংসর্গে সকল অপেক্ষা আমার যন্ত্রণা ভোগ।"

ভারতবর্ষপ্রবাস-কালে মেকলে স্বদেশ

স্মরণ করিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেন, স্বদেশে ফিরিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইতেন। তিনি লিখিতেছেন " ইংলণ্ডের জন্য আমার প্রাণ যে কি ছট্ ফট্ করে, প্রবাস-যাপন আমার পক্ষে যে কি কষ্টজনক তাহা তোমাকে কি বলিব। আমার মনে হয় যে আর আমি কিছুই চাই না, কেবল আর একবার স্বদেশ দেখিয়া মরি। এই দূর দেশে প্রবাস অল্প কষ্টদায়ক নহে। যে ইহা পরীক্ষা করিয়া না দেখিয়াছে সে ইহার কিছুই বুঝিতে পারে না। জীবনের চিরাভ্যস্ত আচারব্যবহারের পরিবর্ত্তন, পুরাতন বন্ধু বান্ধবের বিচ্ছেদ, ভালবাসার সমুদায় জিনিস ১৫০০০ মাইল দূরে ফেলিয়া আসা—এ সকল আমার পক্ষে নিতান্ত অসহ্য যন্ত্রণা। যতই অর্থ, যতই প্রভুত্বের প্রলোভন আসুক না কেন, পুনর্ব্বার এরূপ কষ্ট স্বীকারে আমি কোন ক্রমেই সম্মত হইব না। কিন্তু ইহাও দেখিতেছি যে অনেকে এ রূপ কষ্টকে কষ্টই মনে করে না। কোম্পানির কর্ম্মচারীদের মনের ভাব আমার সঙ্গে মেলে না। তার কিন্তু কারণ আছে। তাহারা যে অল্প বয়সে এ দেশে প্রেরিত হয়, যখন তাহারা অপরিপক্ক স্কুলের ছাত্র, পৃথিবীর কিছুই জানেনা, তখন তাহাদের ওরূপ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। তাহারা গৃহের বাহির হইয়া স্বাধীন ক্ষেত্রে সহসা প্রবেশ করিয়া স্বাধীনতা-ঐশ্বর্য্য-ভোগে তাহারা গৃহ-বিচ্ছেদের কষ্ট বিস্মৃত হইয়া যায়। কতক বৎসরের মধ্যে এ দেশের জল বায়ু তাহাদের এক প্রকার সহ্য হইয়া যায়। ও ক্রমে এদেশ স্বদেশ অপেক্ষাও তাহাদের মনোনীত হয়। কিন্তু ৩৩ বৎসর বয়সে এদেশে আগমন স্বতন্ত্র কথা।"

অক্টোবর ১৮৩৬ সালে তিনি কলিকাতা হইতে তাঁহার পিতাকে লেখেন :—

সে দিন আপনার পত্রে আপনার শারীরিক মানসিক কুশল সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আমরা যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। আগামী পরশ্ব দিন আপনার ছোট নাত্নীটির প্রথম বৎসরের জন্ম দিন। এই উপলক্ষে আমার এখানে একটা পুতুল নাচ হইবে। ইহা দেশীয়দের মধ্যে অত্যন্ত প্রচলিত। ইংলণ্ডে যেমন Punch এর প্রদর্শন, ইহাও তেমনি, কেবল তার চেয়ে এতে নাট্যাভিনয়ের ভাগ অধিক ও এ দেশী আড়ম্বর পূর্ণ। আমাদের পাড়াপড়শির বন্ধুদের ছেলে পিলেদের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে আর বড় বড় লোকেরা বড় বড় খানা দিয়া যে আমোদে সময় কাটায় তা অপেক্ষা আমোদজনক হইবে সন্দেহ নাই।

আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমার পীনালকোড গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হইবে। জানিয়া শুনিয়া খুন ও রাজ্য সম্বন্ধীয় গুরুতর অপরাধ ভিন্ন অন্যান্য অপরাধে আমরা প্রাণদণ্ড উঠাইয়া দিয়াছি। এই আইন প্রচলিত হইলে ভারতবর্ষে দাসত্ব এক প্রকার উঠিয়া যাইবে। চাকরির জন্য কেহ কাহারো উপর দেওয়ানি কোর্টে দাওয়া করিতে পারিবে, কিন্তু একজন আর একজন স্বাধীন পুরুষের পতি যা না পারে,

প্রভু তাহার কোন দাসের উপর এরূপ কোন অন্যায়াচরণ করিতে পারিবেক না।

আমাদের ইংরাজি বিদ্যালয় সকল সুন্দর চলিতেছে। যত লোক বিদ্যা শিক্ষার জন্য অভিলাষী তাহাদের সকলদের শিক্ষাদান কঠিন, স্থল বিশেষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। কেবল এক হুগলী সহরে ১৪০০ বালক বিদ্যাভ্যাস করিতেছে। হিন্দুদের উপর এই শিক্ষার আশ্চর্য্য ফল ফলিতেছে। কোন হিন্দু ইংরাজি শিক্ষা পাইলে তাহার ধর্ম্মের প্রতি তাহার আন্তরিক শ্রদ্ধা চলিয়া যায়। কেহ কেহ দেশাচারের অনুরোধে ধর্ম্ম পালন করে, কিন্তু অনেকে একেশ্বরবাদী হইয়া পড়ে। কেহবা খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে যদি আমাদের শিক্ষা-প্রণালী আরো অধিক কাল স্থায়ী হয়, তাহা হইলে এই বঙ্গদেশের ভদ্র পরিবারের মধ্যে ৩০ বৎসর পরে আর একজন পৌত্তলিকও দৃষ্ট হইবে না। আর ইহাতে আমাদের মিসনরিদের ন্যায় ধর্ম্মপ্রচারের কোন চেষ্টাই আবশ্যক হয় নাই। কাহারো বিশ্বাসের স্বতন্ত্রতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে হয় নাই। জ্ঞান ও সত্যের প্রচারেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে। ইহা অতীব সন্তোষজনক।

আপনার নিকট এই পত্র পৌঁছিবার ছয় মাসের মধ্যে আমি স্বদেশে ফিরিবার উদ্যোগ আরম্ভ করিব। গৃহ প্রত্যাগমন আশায় আমার মনে যে কি বিচিত্র ভাবের উদয় হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত। এ আশা হয়ত নিরাশয়ে পরিণত হইবে। ইহার আনন্দ ভোগের জন্য আরো কয়েক মাস প্রবাস যাপন করা হয়ত সুবুদ্ধির কাজ হয়। আমার মনে হয় স্বদেশ গিয়া আমার কষ্টের কোন কারণ থাকিবে না—ইংলণ্ড দেশে ইংরাজদের মধ্যে বাস করা, আমার চিরপরিচিত দৃশ্য সন্দর্শন করা, আমার মাতৃ ভাষায় শব্দ শ্রবণ করাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আর আমি কিছুই চাই না।"

তাঁহার স্বদেশে ফিরিবার সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে আর অধিককাল তাঁহার প্রবাসে কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। ১৮৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি লিখিতেছেন " আমার ছাড়িবার দিন সন্নিকট। এদেশ হইতে এই হয়ত তোমাকে শেষ পত্র লিখিব। আমাদের যাত্রার জন্য জাহাজ স্থির হইয়াছে। লণ্ডন ও কলিকাতার মধ্যে যে সকল চলন্ত হোটেল সমুদ্রের উপর দিয়া যাতায়াত করে এ জাহাজখানি তাহার মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। দ্রুতগতির জন্য তত না হউক কিন্তু খাওয়া দাওয়ার বন্দবস্ত ও যাত্রীদের সুখস্বচ্ছন্দতা বিষয়ে ইহা প্রখ্যাত। কেপে গিয়া কতক কাল বিশ্রাম করিতে হইবে, তাই হয়ত পৌঁছিতে আমার মে মাসের শেষ কি জুনের আরম্ভ। ইংলণ্ড পৌঁছিবার আগে আমার জর্ম্মণ ভাষায় ভাল রূপ ব্যুৎপত্তি লাভের ইচ্ছা আছে। ইহার মধ্যে আমি অবসর মত এ ভাষা অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছি। লুথরের বাইবেল অনুবাদের প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে আর শিলরের ইতিহাসও চলিতেছে। জর্ম্মণ বইএর মধ্যে আমি গত্তে

শিলর লেসিঙ্গ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকদের গ্রন্থ সকল সংগ্রহ করিয়াছি। পথের মধ্যে সে সমুদয় শেষ করিবার ইচ্ছা আছে।

আমাদের পীনল কোড্ আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে আমার গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। ইহার দোষ যতই থাকুক ইহাতে শ্রম ও যত্নের ত্রুটি করি নাই। ইহা ভারতবর্ষের উপযোগী হউক বা না হউক আমি দেখিয়াছি ইহার রচনা আমার মানসিক উন্নতির পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়াছে।"

এদেশ হইতে বিদায় লইবার কিছু পূর্ব্বে তিনি লিখিতেছেন "এ বৎসর (১৮৩৭) বর্ষাকাল নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে। আমাদের বাড়ী তবুও অপেক্ষাকৃত ভাল—হানা আমাদের সকল অপেক্ষা সুস্থ রহিয়াছেন। পঁুটির মধ্যে মধ্যে অসুখ করিয়া থাকে। Trevelyan পীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছে, গঙ্গাসাগরে মধ্যে মধ্যে ষ্টীমার করিয়া ভ্রমণ করা তাঁহার স্বাস্থ্য রক্ষার একমাত্র উপায়। আমার একবার কঠিন জ্বর হইয়াছিল। ভাগ্যি দুই এক ঘণ্টার অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই—আর আমি সাবধানে থাকিয়া পুনরায় তাহা আসিতে দিই নাই। কিন্তু এই ব্যামর দরুণ প্রায় ১৫ দিবস পর্য্যন্ত আমি অশক্ত ও দুর্ব্বল ছিলাম। এদেশে এই আমার প্রথম হয়ত শেষ পীড়া ভোগ করিতে হইল। এই মারাত্মক জলা ভূমির মধ্যে আর এক বৎসর কাটাইতে হইবে না ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। যদি ও তিনি আর এক বৎসর অধিক থাকিলে আর এক লক্ষ টাকা অধিক জমাইতে পারিতেন কিন্তু প্রাণভয়ে সে লোভ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তাঁহার হাতে যে সমস্ত কাজ ছিল তাহা যত শীঘ্র পারেন সমাপন করিলেন। কৌন্সল সভার আসন, আইন কমিসন ও শিক্ষা কমিটির আসন পরিত্যাগ করিয়া ১৮৩৮ সালের প্রারম্ভে তিনি ট্রেবিলিয়নদের সমভিব্যাহারে স্বদেশ যাত্রা করিলেন।

যাহা বলা হইল তাহাতে মেকলের প্রবাস জীবনের এক ভাগমাত্র প্রদর্শিত হইল। তিনি যে সকল লোকোপযোগী কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, শিক্ষা ও আইন সম্বন্ধে ভারতবর্ষ তাঁহার নিকট হইতে যে সকল মহত্তর উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা বলিবার এখনকার অবশিষ্ট আছে।

তাঁহার প্রবাস জীবনে এমন কিছুই নাই যাহাতে তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার উদয় হয়। বরং এমন কতকগুলি বিষয় আছে যাহাতে তিনি আমাদের বিরাগ ভাজনই হইতে পারেন। আমরা জানি আমাদের দেশের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র মমতা ছিল না। তিনি কেবল অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্তে ভারতবর্ষে পদক্ষেপ করিয়াছিলেন। এ দেশের লোকদিগকেও যে তিনি সমধিক প্রীতি করিতেন, তাহা বোধ হয় না। বিশেষতঃ বঙ্গজাতির প্রতি অকারণ নিন্দা প্রয়োগ করিয়া তিনি আমাদের মধ্যে আপনার নামকে চিরকলঙ্কভাগী করিয়া রাখিয়া ছেন। আমরা তাঁহার সে অপরাধ কখনই ভুলিব না, কখনই মার্জ্জনা করিতে পারিব না। কিন্তু তাঁহার এই সকল বহু দোষ সত্ত্বেও যে সকল কার্য্যের জন্য তিনি আমাদিগকে তাঁহার ঋণ-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন, আর কোন সময়ে সে সমুদয় প্রদর্শন করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসঃ

কাতন্ত্র-জীবনী।

উপক্রমণিকা।

অধুনাতন সময়ে রত্নপ্রসবিত্রী ভারত ভূমিতে আর সেই পূর্ব্বকালীন ভুবনোজ্জ্বলকারী প্রভাকরসদৃশ দেবভাষার গগনস্পর্শী প্রদীপ বর্ত্তমান নাই; সেই মেদিনী-বিস্ময় প্রশংসনীয় সর্ব্ববিদাদর্শ সর্ব্বাদিম ভারতীয় ধর্ম্ম; পুরাণ, ন্যায়, দর্শন, জ্যোতিষ, গণিত, চিকিৎসা, সাহিত্য, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্র, যাহা একদা পৃথিবীস্থ যাবতীয় জাতিরই শিক্ষার প্রধান অবলম্বনীয় ছিল,—ক্রমে লোপ নিবন্ধন তাহা এখন নির্ব্বান প্রায়। কিন্তু এই ঘোরান্ধকার আর্য্যভাষাতে এখনো এতাধিক রত্নরাজি বিদ্যমান আছে, যাহা সংগ্রহ করিয়া বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ বসুন্ধরাস্থ বিদ্বজ্জনের শির্ষস্থানে আরোহণ করিয়া, সকলকে চমৎকৃত করিতেছেন।

মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যাপ্রভাবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভুবনমুগ্ধকারী ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্র সমূহের মাহাত্ম্য-বর্ণন জন্য কখন কখন পুরাবৃত্ত রূপ দুই একটী ক্ষীণালোক প্রজ্বলন করিয়া সাধারণ্যে পুণঃ ভারতের গৌরব বর্দ্ধন করিতেছেন। ইহা ভারতভূমির পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

যদিও কাতন্ত্র (১) সেই ভারতীয় রত্ন রাজির একটী উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ কিন্তু কাতন্ত্র সম্বন্ধীয় পুরাবৃত্ত সংগ্রহে এ পর্য্যন্ত কোনও পাশ্চাত্য কি প্রাচ্য মহাত্মাকে হস্তক্ষেপ করিতে দেখা যাইতেছে না। এই জন্যই কাতন্ত্ররচয়িতাগণ বিশিষ্ট-গুণান্বিত হইয়াও এখন সর্ব্বত্র পরিচিত নহেন। তাই আমরা কাতন্ত্রপ্রণেতাগণ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

ইতিহাস ব্যতীত নিঃসন্দিগ্ধ রূপে চিত্তে পুরাতত্ত্ব অবগত হওয়া বড়ই সুকঠিন ব্যাপার। দুর্ভাগ্যবশতঃ পুরাকালে আমাদের দেশে ইতিহাস-লিখন-প্রথা প্রচলিত না থাকাতে, ভারতের কত অপূর্ব্ব ঐতিহাসিক ঘটনা অতীত কাল-গর্ব্ভে যে বিলীন হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। এই জন্যই এখন একটী বিষয় অনুসন্ধান করিতে হইলে, শরীরের শোণিত শুষ্ক করিয়া শ্রম করিলেও প্রকৃত তত্ত্ব পাওয়া দুর্ঘট।

(১) ইহার অপর দুই নাম "কলাপ" এবং "কুমার"। এখন কাতন্ত্র, "কলাপ ব্যাকরণ" নামেই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

কাতন্ত্র ও তদ্ব্যাখ্যা-রচয়িতাগণের জীবনী, কাতন্ত্রের টীকা প্রভৃতিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে যে কিছু বর্ণিত আছে, তাহা ব্যতীত আর কোথাও তৎসম্বন্ধে আর কিছু পাওয়া যায় না। তবে তাঁহাদের সময় নিরূপণ ও আনুসঙ্গিক প্রমাণ বিষয়ে অন্যান্য গ্রন্থেও সাহায্য পাওয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত কাতন্ত্র-ব্যবসায়ীদের মধ্যে চির-প্রচলিত কিংবদন্তী দ্বারা যে সকল ঘটনা রক্ষিত হইয়াছে তাহা হইতেও মাঝে মাঝে দুই একটী বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা গৃহীত হইবে।

কাতন্ত্র-প্রণেতাদের মধ্যে মহাত্মা সর্ব্ববর্ম্মা, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ কাত্যায়ণ বররুচি মুনি, সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ দুর্গসিংহ, এই তিন জন মহামহোপাধ্যায়কেই সমান জ্ঞান করিতে হইবে; ইহাঁরা সকলেই দেব-ভাষা-সমুদ্র মন্থন করিয়া ব্যাকরণামৃত উদ্ধৃত করতঃ পৃথিবীর বিস্ময় প্রশংসার স্থল হইয়া রহিয়াছেন। ইহাদের একজনের অভাব হইলেই, কাতন্ত্র, সংস্কৃত ব্যাকরণ মধ্যে এত উচ্চ আসন লাভ করিতে পারিত না (২) এবং অধুনাতন সময়েও ভারতীয় সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিতগণের ঘরে ঘরে এত সমাদর পাইত না। কাতন্ত্র একটী ভারতীয় অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ; তন্নিবন্ধনই এই সংস্কৃত-বিলোপকারী ঊনবিংশ শতাব্দির ঘোরান্ধকারেও স্বীয় দীপ্তিতে বিদ্বজ্জনের নয়নে স্থান পাইতেছে; অন্যথা রাশি রাশি দেব-গ্রন্থের ন্যায় এত দিন কাতন্ত্রও অদৃশ্য হইয়া যাইত।

কাতন্ত্রের নানা সদ্গুণ সন্দর্শনে এবং ইহা ব্যাকরণ-শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিশেষ উপাদেয় গ্রন্থ জ্ঞানেই সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের জনৈক ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিত, গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিতগণ, এবং মহাপ্রাজ্ঞ শ্রীপতি, ত্রিলোচন, তর্ককেশরী রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি বিদ্যাবিশারদ মহোদয়গণ, কাতন্ত্রকে বহু সম্মান করিয়া ব্যাখ্যা, টীকা, পরিশিষ্ট বিরচণে কাতন্ত্রের অঙ্গ এক একটী অমূল্য দেব আভরণে বিভূষিত করিয়াছেন। (৩)

সর্ব্ববর্ম্মা, কাত্যায়ন, দুর্গসিংহ এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কাতন্ত্র টীকাকারদের সংক্ষিপ্ত জীবনী সন্নিবেশিত করাই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। পর পর অধ্যায়ে তাহাই প্রকটিত হইতেছে।

প্রথম অধ্যায়।

সর্ব্ববর্ম্মা।

ব্যাকরণ-শাস্ত্র-বিশারদ সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্ববর্ম্মা কাতন্ত্র (কলাপ সূত্র) প্রণয়ন করেন। (৪)

(২) অনেক পণ্ডিত এখনকার সংস্কৃত ব্যাকরণ মধ্যে পাণিনির পরেই কাতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া থাকেন।

(৩) ইহার বিস্তারিত বিবরণ যথা স্থলে বিবৃত হইবে।

(৪) দেব দেবং প্রণম্যাদৌ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বদর্শিনং
কাতন্ত্রস্য প্রবক্ষ্যামি ব্যাখ্যানং সর্ব্ববর্ম্মিকং।
দুর্গসিংহ।

পুরাকালে শালিবাহন নামক বসুধাধিপকে অবিলম্বে ব্যুৎপন্ন করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়া, আচার্য্য সর্ব্ববর্ম্মা কুমার নামক ভগবান ভবানীপুত্রের আরাধনা করেন। কুমারদেব তদীয় আরাধনায় বশীভূত হইয়া, নিজ ব্যাকরণ জ্ঞান আবির্ভাবের নিমিত্ত সিদ্ধোবর্ণ সমন্নায় (৫) এই পদ্যপাদরূপ সূত্র সর্ব্ববর্ম্মাকে প্রদান করেন (৬) সর্ব্ববর্ম্মা তাহা অবলম্বন করিয়াই কাতন্ত্র প্রণয়ন করেন।

কাতন্ত্র প্রণয়ন সম্বন্ধে একটী প্রাচীন উপখ্যান এইঃ—কোন রাজা [শালিবাহন] মহিষীর সহিত সলিলে যাইয়া জলক্রীড়া করিতেছিলেন; জলসিঞ্চনে সেই রাণী রতিরসে আত্মহারা হইয়া, নৃপতিকে বলিলেন "মোদকং (৭) দেহি দেব!" অর্থাৎ হে দেব আমাকে উদক (জল) দিও না। মূর্খতা নিবন্ধন রাজা সেই স্বরঘটিত পদ বুঝিতে না পারিয়া রাজ্ঞীকে মোদক (মোয়া) প্রদান করিলেন। তাহাতে সেই প্রজ্ঞাবতী রাণী "আমার যে পতি নৃপতি তিনি মূর্খ" এই বলিয়া নিন্দা করিলেন। শালিবাহন ভার্য্যার সমুদয় কথা গুরু সর্ব্ববর্ম্মার নিকট আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন (৮)। তন্নিবন্ধনই সর্ব্ববর্ম্মা তাহার শিক্ষার জন্য কাতন্ত্র প্রণয়ন করেন।

এতৎসম্বন্ধে অপর কিম্বদন্তী এইঃ—যখন সর্ব্ববর্ম্মা শালিবাহনের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া কুমারের আরাধনা করেন, তখন কুমার যে ময়ূরটীতে আরোহণ করিয়া তাঁহার নিকট অধিষ্ঠান হয়েন সেই শিখির কলাপ দেশে "সিদ্ধিবর্ণ সমন্নায়" এই কাতন্ত্রের প্রথম সূত্রটী লিখা থাকে। ঐ শ্লোকটী দৃষ্টিমাত্রই সর্ব্ববর্ম্মার অন্তরে ব্যাকরণ প্রণয়ন জ্ঞান অঙ্কুরিত হয়। এবং সেই সূত্রটী শির্ষস্থানে

(৫) অনুষ্টুপ ছন্দের নিয়মানুসারে এই সূত্রটীকে প্রথম অথবা তৃতীয় পাদে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অনুষ্টুপের লক্ষণ যথা—

শ্লোকে ষষ্ঠং গুরুজ্ঞেয়ং সর্ব্বত্র লঘুপঞ্চমং
দ্বিচতুঃ পাদয়োর্হ্রস্বং সপ্তমং দীর্ঘমন্যয়োঃ।
কালিদাস।

(৬) পুরাকিল শ্রীশালিবাহন্যভিধানং বসুধাধিপং ঝটিতি ব্যুৎপাদয়িতুং প্রতিশ্রুতবতা সর্ব্ববর্ম্মণাচার্য্যেন কুমারাভিধানো ভগবান ভবানীসুতঃ সমারাধিতঃ। সচ তদারাধনাধীনতামুপগতো নিজ ব্যাকরণজ্ঞান মাবির্ভাবয়িতুং পদ্যপাদরূপং সূত্রমিদমাদিদেশ। ইতি কলাপচন্দ্রঃ।

(৭) নিষেধার্থ মা শব্দের সহিত উদকং শব্দের সন্ধি পাইয়া (মা+উদকং)=মোদকং পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

(৮) রাজা কশ্চিৎ মহিষ্যা সহ সলিলগতঃ খেলয়ন্ পাণিতোয়ৈঃ সিঞ্চংস্তা ব্যাহৃতা সা রতিরসতয়া মোদকং দেহি দেব।

মূর্খত্বাৎ তন্নবুদ্ধ্যা স্বরঘটিতপদং মোদকস্তেন দত্তো রাজ্ঞী প্রাজ্ঞী ততঃসা নৃপতিমপি পতিং মূর্খমেণং জগর্হ ॥১
ভার্য্যায়া ভাষিতঞ্চৈব নিশম্য শালিবাহনঃ*।
সর্ব্বং নিবেদয়ামাস গুরবে সর্ব্ববর্ম্মণে ॥২
কলাপচন্দ্র।

* শালবাহনঃ ইতি বা পাঠঃ।

রাখিয়া কাতন্ত্র প্রণয়ন করেন। উল্লিখিত উপাখ্যান ত্রয়ের দ্বিতীয় উপাখ্যানটী অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। ঊনবিংশ শতাব্দির দেবাদর্শী লোকগণ হয়ত অপর দুইটী উপাখ্যানে দেব-সংশ্রব দেখিয়া কিছু আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু প্রথম উপাখ্যান হইতে কুমারানুগ্রহ বিষয়ক অংশটুকু বাদ দিলে তাহার অন্যান্য সত্যের প্রতি আপত্তি করার কোনও কারণ নাই। তৃতীয় উপাখ্যানটী হইতে আমরা এই সার সংগ্রহ করিতে পারি——যখন সর্ব্ববর্ম্মা ভগবান্ কার্ত্তিকের আরাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন হয়ত সেই সময়ে দৈবাৎ একটী শিখী তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল। কুমারবাহক শিখীকে অবলোকন করিয়া "আমার নিকট অদৃশ্য ভাবে কুমার দেব স্বীয় বাহনে উপস্থিত হইয়াছেন" হয়ত সর্ব্ববর্ম্মা এইরূপ মনে করিয়াছিলেন; আর শিখীর কলাপস্থিত চিহ্নটী সন্দর্শনে তাহা কুমার-লিখিত ব্যাকরণাভাষ স্বরূপ কোন বর্ণ কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাহাই কুমার-প্রসাদ বিবেচনা করিয়া তদবলম্বনে সাহসী হইয়া কাতন্ত্র বিরচন করিয়াছিলেন। যে হিন্দুসন্তানগণ ঘট পট প্রস্তর বৃক্ষ ও মৃৎপুত্তলীদিগকে দেবতা কল্পনা করিয়া ভক্তি সহকারে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন তাঁহাদের পক্ষে কুমারারাধনা কালে তাঁহার প্রকৃত বাহন—শিখির আগমন দর্শন করিয়া তাহা "কুমার অধিষ্ঠান" মনে করা অসম্ভব নহে। উল্লিখিত কাল্পনিক যুক্তি-সদৃশ কোন একটী ঘটনা না ঘটিলে, "সর্ব্ববর্ম্মা একজন গণ্ডমূর্খ ছিলেন; তিনি কেবল কুমারের অনুগ্রহে কাতন্ত্রের ন্যায় একখানি অত্যুৎকৃষ্ট ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছেন" একথা এখন কে বিশ্বাস করিবে?

সংবৎ-আবিষ্কারক উজ্জয়িনী-অধিপতি বিক্রমাদিত্য-নিহন্তারক (৯) এবং শকাব্দা-আবিষ্কারক শালিবাহন নৃপতি ব্যতীত, ভারত ইতিহাসে (বসুধাধিপ পদোপযুক্ত) অন্য কোন শালিবাহন নৃপতির নাম লক্ষিত হয় না। সুতরাং আমরা সর্ব্ববর্ম্মার শিষ্য শালিবাহন রাজাকে এবং শকাব্দা আবিষ্কারক শালিবাহনকে একি ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম।

শকাব্দা-আবিষ্কারক শালিবাহনের অধ্যাপক সর্ব্ববর্ম্মার সময় নিরূপণ করা তত কঠিন নহে। শক আরম্ভের কিছু পূর্ব্বে তাঁহার জন্ম হয় এবং কাতন্ত্র সূত্রও শকের পূর্ব্বেই প্রণয়ন করেন। কেননা যখন শালিবাহন অল্প বয়স্ক এবং অশিক্ষিত ছিলেন সেই কালেই সর্ব্ববর্ম্মা তাঁহার অধ্যয়নের জন্য কাতন্ত্র প্রণয়ন করেন। ইতিহাসে উল্লেখ আছে, শালিবাহন বিক্রমাদিত্যকে স্বীয় পরাক্রমে ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত করিয়া দাক্ষিণাত্য জয় পূর্ব্বক এত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন যে ঐ দেশে বিক্রমাদিত্যের সংবৎ উঠাইয়া দিয়া আপন

(৯) রাজাবলী ৭ পৃষ্ঠা, মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা প্রণীত "রাজতরঙ্গ" ৫২ পৃষ্ঠা এবং মার্শম্যান সাহেবের "ভারতইতিহাস" পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

নামে শক স্থাপিত করিলেন (১০) ইহা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বলা যাইতে পারে যখন তিনি সুশিক্ষিত বুদ্ধিমান, পরিণতবয়স্ক এবং প্রবল-প্রতাপান্বিত হইয়া ছিলেন তখনি বিক্রমাদিত্যের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা না হইলে বিক্রমাদিত্যের ন্যায় একজন প্রাতঃস্মরণীয় সুশিক্ষিত এবং ভুবনবিখ্যাত নৃপতি একটি অবোধ ও সামান্য নৃপতির সহিত কখনি ধর্ম্মযুদ্ধ করিতেন না। ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে কাতন্ত্র বিক্রমাদিত্যের পরলোক প্রাপ্তিরও কিছু পূর্ব্বে (শালিবাহনের অশিক্ষিত অবস্থায়) রচিত হইয়াছে।

বিক্রমাদিত্যের সংবৎ নামক অব্দের প্রায় ১৩৫ বৎসর পর শালিবাহনের শকাব্দা আরম্ভ হয়। কথিত আছে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য এবং তাঁহার পুত্র বিক্রমসেন সর্ব্বসমেত ৯৩ বৎসর রাজত্ব করেন;—(১১) ইহার মধ্যে বিক্রমসেন অতি অল্প দিন রাজত্ব করেন। আমরা আনুমানিক এই ৯৩ বৎসর রাজত্বকাল হইতে যদি বিক্রম সেনের রাজত্ব কাল অন্ততঃ ২০ বৎসরও বাদ দিই, তবে বিক্রমাদিত্য ৭৩ বৎসর রাজত্ব করেন ইহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, কেননা তিনি সংবতের আরম্ভ হইতে সিংহাসনে আরোহণ করেন ১২। তিনি ৭৩ সংবতে শালিবাহনের হস্তে ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইলে শকাব্দার ৬২ বৎসর পূর্ব্বে পরলোকপ্রাপ্ত হয়েন এমত স্বীকার করিতে হইবে। যখন শালিবাহন মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে নিহত করেন, তখন অবশ্য শালিবাহন পরিণতবয়স্ক এবং সুশিক্ষিত হইয়া ছিলেন। কাতন্ত্র যখন শালিবাহনকে ব্যুৎপন্ন করিবার জন্য বিরচিত হইয়াছিল, তখন বিক্রমাদিত্যের পরলোক প্রাপ্তির অন্যূন ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বে যে কাতন্ত্র বিরচিত হইয়াছে তাহার কোনও ভুল নাই। সুতরাং কাতন্ত্র শকাব্দার প্রায় ৮০। ৯০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃষ্টের জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে বিনির্ম্মিত হইয়াছে। এই সমুদয় যুক্তিতে আমাদের দৃঢ় প্রতীতি হইতেছে আচার্য্য সর্ব্ববর্ম্মা খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দির পূর্ব্বার্দ্ধে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

যদি আমরা উল্লিখিত যুক্তিতে পদস্খলিত না হইয়া থাকি তবে কাতন্ত্রের বয়ঃক্রম এখন ১৯০০ বৎসরের কিছু ন্যূন।

অনেকে সর্ব্ববর্ম্মাকে ক্ষত্রিয়বংশজ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদের মতকে একেবারে অযৌক্তিক জ্ঞান করিতে পারি না; কেননা "বর্ম্মা" বা

(১০) মার্শম্যান সাহেবের "ভারতইতিহাস" পঞ্চম অধ্যায় দেখ। রাজতরঙ্গে লিখিত আছে "বিক্রমাদিত্যের সাম্রাজ্যাবধি ১৩৫ একশত পঁইত্রিশ বৎসর হইলে শালিবাহন রাজার সন্তানেরা তাঁহার শক প্রবৃত্তি করিল। রাজতরঙ্গ ৫৩ পৃষ্ঠা।

(১১) রাজতরঙ্গ ৫৩ পৃষ্ঠা এবং রাজাবলি ৭ পৃষ্ঠা দেখ।

(১২) মার্শম্যান সাহেব কৃত "ভারত ইতিহাস" পঞ্চম অধ্যায় দেখ।

" বর্ম্মণ " উপাধি ক্ষত্রিয়গণের নামের পরেই ব্যবহার হইয়া থাকে (১৩) কিন্তু যদি " বর্ম্মা " শব্দ উপাধি না হইয়া নামের অঙ্গ বিশেষ (যেমন কালিদাস, সুশর্ম্মা, চন্দ্রগুপ্ত) হইয়া থাকে তবে আর এ সিদ্ধান্ত অব্যর্থ হইবে না। টীকাকারগণ অনেক স্থলে নামের পূর্ব্বে আচার্য্য শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন দেখিয়া কেহ কেহ সর্ব্ববর্ম্মাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন। আচার্য্য শব্দ যে কেবল ব্রাহ্মণকে বুঝাইবে তাহা নহে; শিক্ষাগুরু এবং বেদাধ্যাপক মাত্রকেই আচার্য্য বলা যায়, সুতরাং ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য বর্ণের লোকও আচার্য্য শব্দে অভিহিত হইতে পারেন। যখন সর্ব্ববর্ম্মার জাতি সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না তখন তাঁহার বর্ণ ঠিক-করা সহজ নহে; তবে অনুমানের আশ্রয় লইলে নামান্তে " বর্ম্ম " শব্দ দেখিয়া সর্ব্ববর্ম্মাকে ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়াই অধিক প্রত্যয় জন্মে!

অনেকে শালিবাহনকে দাক্ষিণাত্যের রাজা দেখিয়া, তাঁহার গুরু সর্ব্ববর্ম্মাকেও তদ্দেশনিবাসী বলিয়া থাকেন। রাজতরঙ্গের মতে শালিবাহনের বাসস্থান নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ তীরস্থ প্রতিষ্ঠান নগরে বর্ত্তমান ছিল (১৪)। অন্যান্য ইতিহাসের মতে কেবল প্রতিষ্ঠান নগরে বিক্রমাদিত্যের সহ শালিবাহনের ধর্ম্মযুদ্ধ হইয়াছিল (১৫)।

সর্ব্ববর্ম্ম কাতন্ত্রের সন্ধি, চতুষ্টয় এবং অখ্যাত এই অংশত্রয়ের সূত্র প্রণয়ন করেন। কৃত সূত্র তিনি প্রণয়ন করেন না (১৬)। সর্ব্ববর্ম্মাকৃত অন্যান্য গ্রন্থ আছে কি না, জানা যায় নাই। কেহ কেহ কাতন্ত্র-সম্মত গণ (ধাতুপাঠ) সর্ব্ববর্ম্মা কৃত বলিয়া অনুমান করেন।

সর্ব্ববর্ম্মা কাতন্ত্র সূত্র অতি সুন্দর প্রণালীতে প্রণয়ন করিয়াছেন। কাতন্ত্রের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও অনায়াস-বোধগম্য সূত্র অন্যান্য ব্যাকরণে প্রায় দৃষ্ট হয় না। " তত্র চতুর্দ্দশাদৌস্বরাঃ " " দশ সমানাঃ " " পূর্ব্বো হ্রস্বঃ " পরোদীর্ঘঃ। প্রভৃতি সূত্র সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও সহজে বুঝিতে পারেন। বলিতে কি সর্ব্ববর্ম্মার ন্যায়, অতিসরল অথচ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সূত্র বিরচনে প্রায় কোন বৈয়াকরণই কৃতকার্য্য হয়েন নাই। কাত্যায়ণ

(১৩) শর্ম্মবৎব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্যতু। গুপ্ত দাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ। বিষ্ণুপুরাণ।

(১৪) "বিক্রমাদিত্য কিছুকাল পরে আপন পরমায়ুর শেষ জানিয়া নর্ম্মদানদীর দক্ষিণ তীরস্থ প্রতিষ্ঠান নগরের শালিবাহন রাজার সহিত ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন।

৺ মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্ত্তী " রাজতরঙ্গ " ৫২ পৃষ্ঠা।

(১৫) রাজাবলী ৭ পৃষ্ঠা ও মার্শমানের " ভারতইতিহাস, ৫ ম অধ্যায় দেখ।

(১৬) বৃক্ষাদিবদমীরূঢ়াঃ কৃতিনা ন কৃতাকৃতঃ।

দুর্গসিংহ।

মুনি কাতন্ত্রের কৃৎ প্রকরণের সূত্র বিরচন করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার সূত্র সর্ব্ববর্ম্মা-প্রণীত সূত্রের ন্যায় তত সরল হয় নাই। সর্ব্ববর্ম্মাকৃত সূত্র সমূহে বৈয়াকরণিক লক্ষণ সকল (১৭) ও সুন্দর রূপ রক্ষিত হইয়াছে। কাতন্ত্রের এতগুলি গুণ থাকিলেও একটী দোষ লক্ষিত হয়, কাতন্ত্রের সূত্রগুলি ভারি বিশৃঙ্খল ভাবে লিখিত হইয়াছে। একটী অধিকারে একদা অনেক গুলি সূত্র রাখিবার জন্য যে যে সূত্র পূর্ব্বে থাকা উচিত তাহা পরে যোজিত হইয়াছে এবং পরের সূত্রগুলি পূর্ব্বে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে অবশ্য পৌনরুক্তি ও বাহুল্যাংশ গুলি বর্জ্জিত হইয়াছে কিন্তু শিক্ষার্থীদের পক্ষে কিছু অসুবিধা, কেননা একটী বৃত্তি সমুদয় ভাল রূপ কণ্ঠস্থ না থাকিলে প্রতি সূত্রে, টীকার সাহায্য ব্যতীত নিজে নিজে পদ প্রভৃতি সাধন করা প্রায়শই ঘটিয়া উঠে না। এবং এই জন্যই সমুদয় কাতন্ত্র ভালরূপ অভ্যাস না থাকিলে অন্যান্য ব্যাকরণে অগাধ বিদ্যা থাকিলেও কাতন্ত্রের নিয়মে সহজে পদ প্রভৃতি সাধিতে পারা যায় না। কাতন্ত্র-সূত্র গুলি এইরূপ বিশৃঙ্খল হওয়াতে একটী বিশেষ উপকারও দেখা যায়; শিক্ষার্থীদিগের বাধ্য হইয়া বিশেষ মনোযোগ করিয়া কাতন্ত্র-সূত্র অভ্যাস করিতে হয়, অন্যথা যাহারা কাতন্ত্র অধ্যয়নকালে একটুক মনোযোগের ত্রুটী করেন, তাঁহাদের বিষম বিভ্রাটে পতিত হইতে হয়। অন্যান্য ব্যাকরণের একটী সূত্র স্মরণ না থাকিলেও শ্রেণীবদ্ধতা নিবন্ধন তাহা অনায়াসে অনুসন্ধান করিয়া লওয়া যাইতে পারে কিন্তু কাতন্ত্রের একটী সূত্র খুজিয়া লওয়া সহজ ব্যাপার নহে। বোধ হয় মহাত্মা সর্ব্ববর্ম্মা ব্যাকরণ-শিক্ষার্থীদিগের বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার জন্যই কাতন্ত্র সূত্রচয় এত অশ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। যদি এমত হয় তবে তাঁহার উদ্দেশ্য প্রশংসনীয় এবং তাঁহার উদ্দেশ্য অনেক সফলও হইতেছে। কেননা প্রায়শই দেখা যায় মুগ্ধবোধ প্রভৃতি ব্যাকরণঅধ্যায়ী অপেক্ষা কাতন্ত্রাধ্যায়ীদের ব্যাকরণে অধিক ব্যুৎপত্তি জন্ম; তবে স্থল-বিশেষে ইহার ব্যভিচারও দৃষ্ট হয়।

কাতন্ত্রের তিনটী নাম;—কলাপ, কুমার, কাতন্ত্র।

১। শিখীর কলাপস্থিত সূত্র সন্দর্শনে, সর্ব্ববর্ম্মার অন্তরে ব্যাকরণ প্রণয়ন জ্ঞান জন্মে এবং তাহাতে সাহসী হইয়াই কাতন্ত্র বিনির্ম্মিত হয়; এই জন্যই ইহার নাম কলাপ। (১৮)

২। ভগবান্ কুমার, নিজ ব্যাকরণ জ্ঞান সর্ব্ববর্ম্মাকে প্রদান করেন; এবং তদবলম্বনেই সর্ব্ববর্ম্মা কাতন্ত্র প্রণয়ন করেন, এই জন্য ইহার নাম " কুমার "। (১৯)

(১৭) অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্‌গুরু নির্ণয়ং। নির্দ্দোষং হেতুমত্যর্থং সূত্রমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥

(১৮) এবং (১৯) ইহার বিবরণ পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

৩। সর্ব্ববর্ম্মা ঈষৎ তন্ত্রে (অল্পসূত্রে) এই ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছেন এই জন্য ইহার নাম কাতন্ত্র (২০) সর্ব্ববর্ম্মা এবং বোপদেব সম্বন্ধে এতদ্দেশীয় অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের মুখে একটা অস্বাভাবিক উপাখ্যান শুনিতে পাওয়া যায়;—তাঁহারা বলেন সর্ব্ববর্ম্মা এবং বোপদেব অভিন্ন ব্যক্তি। যখন সর্ব্ববর্ম্মা বৃদ্ধবয়সে পুণ্যোপার্জন জন্য বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বনবাসী হইবার উপক্রম করেন তখন তাঁহার কতিপয় শিষ্য তাঁহাকে বলিলেন "প্রভো! আপনি যে কাতন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা অতি বিস্তীর্ণ তাহা অধ্যয়ন করাতে বহু সময় অতিবাহিত হয়, এবম্প্রকার সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থ পাঠ করা অনেকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে না। অতএব আপনি লোকের হিতের নিমিত্ত একখানি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।" সর্ব্ববর্ম্মা তাহাদের বাক্যে সম্মত হইয়া বোপদেবের নাম গ্রহণানন্তর মুগ্ধবোধ বিরচন করিলেন। তিনি সেই সময়ে সতত ঈশ্বরচিন্তাতে ব্যাপৃত থাকিতেন বলিয়া মুগ্ধবোধ-সূত্রের দৃষ্টান্ত স্থলে ঈশ্বরের নাম প্রয়োগ করিয়াছেন যেমন "লক্ষ্মীশ" "রাম" "হরি" ইত্যাদি। আমাদের নিকট এই কিংবদন্তীটী নিতান্তই অমূলক বলিয়া বোধ হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সর্ব্ববর্ম্মা খ্রীঃ পুঃ প্রথম শতাব্দির পূর্ব্বার্দ্ধে প্রাদুর্ভূত হয়েন। ভরতচন্দ্র শিরোমণির মতে বোপদেবের ১১৮২ শকে (১২৬০ খৃষ্টাব্দে) জন্ম হয় এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে বোপদেব ১২০০ খ্রীস্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হয়েন; আর এক জন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ১৩০০ খ্রীস্টাব্দের লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (২১) সুতরাং সর্ব্ববর্ম্মা বোপদেবের প্রায় ১২।১৩ শত বৎসরের পূর্ব্বের লোক। সর্ব্ববর্ম্মা এই ১২।১৩ শত বৎসর জীবিত থাকিয়া পরে বোপদেব নাম গ্রহণ করিয়া মুগ্ধবোধ প্রণয়ন করিয়াছেন নিতান্ত মস্তিষ্ক-বিহীন লোক ব্যতীত ইহা এখন কে বিশ্বাস করিবে?

বোপদেবের কৃত একমাত্র মুগ্ধবোধ নহে। তাঁহার প্রণীত রাম ব্যাকরণ, কাব্যকামধেনু, কবিকল্পদ্রুম, কবিকল্পদ্রুমের টীকা, শত শ্লোক চন্দ্রিকা, ভাগবতের টীকাত্রয় (হরিলীলা, মুক্তাফল, পরমহংস প্রিয়া) প্রভৃতি গ্রন্থ আছে। (২২)

(২০) কাতন্ত্রস্যেতি। "অত্রি" কুটুম্ব ধারণে চুরাদাবিনন্তঃ তত্রান্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে অনেনেতি "স্বর বিদু গমি গ্রহামনিতি" করণে অন্ প্রত্যয়সচায়মনেকার্থত্বাৎ ধাতূনাং ব্যুৎপাদনেপিবর্ত্ততে তেন তন্ত্রমিহ সূত্রমুচ্যতে, ঈষত্তন্ত্রং কাতন্ত্রং, কুশব্দস্য তন্ত্র শব্দ পরে কাত্বীষদর্থেঽথ ইতি ঈষদর্থে কাদেশঃ।

ত্রিলোচন কৃত "কাতন্ত্র পঞ্জিকা"

(২১) শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন প্রণীত "বোপদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত" নামক প্রস্তাব দেখ। ঐপ্রস্তাবে হেমাদ্রি ও বোপদেবকে এক সময়ের লোক বলা হইয়াছে। হেমাদ্রি দাক্ষিণাত্যের দেবগিরীশ্বর মহাদেবর মন্ত্রী ছিলেন।

(২২) রামদাস বাবুর "বোপদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত" নামক প্রস্তাব দ্রষ্টব্য।

আমাদের বোধ হয় বোপদেব প্রথম মুগ্ধবোধ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত দেখিয়া তাঁহার শিষ্যদের প্রার্থনায় বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বনকালে সংক্ষিপ্ত করিয়া "রাম ব্যাকরণ" প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কালে লোকে সেই ঘটনা বিকৃতিভাবাপন্ন করিয়া এখন পূর্ব্বোক্ত অমূলক কিম্বদন্তী আকারে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। একটুক বিবেচনা করিলে আমাদের এই অনুমানই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া উপলব্ধি হইবে; কেন না মুগ্ধবোধ অপেক্ষা রামব্যাকরণ অতি সংক্ষিপ্ত এবং তাহাতে মুগ্ধবোধ অপেক্ষা ঈশ্বরের নামের আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সর্ব্ববর্ম্মা কাতন্ত্রের কেবল কতকটী সূত্র প্রণয়ন করেন। কেবল সেই সূত্রের সহিত মুগ্ধবোধের তুলনা করিলে মুগ্ধবোধ কাতন্ত্র অপেক্ষা অন্ত গুণ বৃহৎ হইবে। দুর্গসিংহ পরে ব্যাখ্যা ব্যাবৃত্তি ও বক্তব্যাদি সংযোগ করিয়া কাতন্ত্রের অবয়ব বৃদ্ধি করেন। সর্ব্ববর্ম্মাকৃত কাতন্ত্র-সূত্র হইতে মুগ্ধবোধ অনেক বড়, অতএব কাতন্ত্রকে সংক্ষিপ্ত করিতে গিয়া তিনি তদপেক্ষা প্রায় অন্ত গুণ বৃহৎ মুগ্ধবোধ প্রণয়ন করিয়াছেন ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে!! এই সকল কারণে পূর্ব্বোক্ত কিংবদন্তীটী যে একান্ত অস্বাভাবিক ও অমূলক তাহা বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে।

বোপদেব, অম্বষ্ঠ কুলোদ্ভব ছিলেন (২৩) সর্ব্ববর্ম্মা ক্ষত্রিয় কি ব্রাহ্মণ ছিলেন সুতরাং সর্ব্ববর্ম্মা এবং বোপদেব কখনই এক ব্যক্তি হইতে পারে না।

অধ্যাপক এগ্‌লীং সাহেব কাতন্ত্র সম্বন্ধে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন; তিনি বলেন "কাত্যায়নের পালি ব্যাকরণের নিয়-

বোপদেবকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (রামদাস বাবুর "বোপদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত" শির্ষক প্রস্তাব দ্রষ্টব্য) কিন্তু তৎসম্বন্ধে তিনি কোন ভাল প্রমাণ দেন নাই। নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি দেখিলে, তাহাকে অম্বষ্ট (বৈদ্য) বলিয়াই অধিক বিশ্বাস হয়।

বিদ্বদ্ধনেশ্বরচ্ছাত্রো ভিষক্ কেশবনন্দনঃ।
বোপদেবশ্চকারেদং বিপ্রো বেদপদাস্পদং॥*

বিশ্ব প্রকাশ অভিধানপ্রণেতা মহেশ্বর কবীন্দ্র তাঁহার, তাঁহার ভ্রাতা বোপদেবের এবং জনক কেশবের, এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন:—

তস্যাভবৎসূনুরুদারবাচো
বাচষ্পতিঃ শ্রীললনাবিলাসী।
সদ্বৈদ্যবিদ্যানলিনীদিনেশঃ
কৃষ্ণস্ততঃ সৎকুমুদাকরেন্দুঃ॥
যদ্ভ্রাতৃজঃ সকল বৈদ্যকতন্ত্ররত্নরত্নাকর শ্রীযমবাপ্যচ কেশবোভূৎ।

বিশ্বপ্রকাশের অবতরণিকা

* এ শ্লোকটীতে বিপ্র শব্দ আছে বলিয়াই বোপদেব ব্রাহ্মণ নহেন, ব্রাহ্মণেরা ভিষক শব্দে কখনই পরিচয় দেন না। বোপদেব অন্যান্য স্থলে বিপ্র শব্দ প্রয়োগই করেন নাই, যথা "বিদ্বদ্ধনেশ ছাত্রেন ভিষক্ কেশব সূনুনা।

(কবিকল্পদ্রুম)

মানুসারে কাতন্ত্র রচিত হইয়াছে" (২৪)। কাতন্ত্র সূত্রের সহিত কাত্যায়নের পালি ব্যাকরণের সূত্র-সাদৃশ্য-দেখিয়া হয়ত অনেকে এগ্‌লীং সাহেবের কথা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন; কেননা পালি ব্যাকরণ-রচয়িতা কাত্যায়ন বুদ্ধদেবের শিষ্য বলিয়া পরিচিত (২৫) সুতরাং তিনি খ্রীঃ পূঃ ৫৫০ কালে বর্ত্তমান ছিলেন। পরকীয় সর্ব্ববর্ম্মা যে, সে আদর্শের অনুসরণ করিবেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু অনেক কারণে আমরা এগলীং সাহেবের কথার উপর নির্ভর করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। বুদ্ধদেবের সময়ে "গাথা" নামক ভাষা প্রচলিত ছিল। এই গাথা ভাষাই পরিবর্ত্তিত হইয়া খ্রীঃ পূঃ ১৫০ বর্ষে অশোক রাজার সমকালে "পালী" নামে বিখ্যাত হয় (২৬) সুতরাং পালীভাষা বুদ্ধদেবের ৪০০ শত বৎসর পরে আরম্ভ হয়। একটী ভাষা ন্যূন কল্পে একশত বৎসর পর্য্যন্ত পরিপুষ্ট না হইলে সেই ভাষায় একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণের সৃষ্টি হওয়া অতীব অসম্ভব ব্যাপার। আমাদের বোধ হয় যখন পালীভাষা সর্ব্বাবয়ব প্রাপ্ত হয় তখনি কাত্যায়ন পালী ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন; অন্যথা তিনি অসম্পূর্ণ ভাষাতে পালী ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যাকরণ কখনি প্রণয়ন করিতে পারিতেন না। পালী ভাষা আরম্ভের একশত বৎসর পরেও যদি কাত্যায়নের ব্যাকরণ-প্রণয়ন-কাল অনুমান করিয়া লওয়া যায় তবে ঐ ব্যাকরণ বুদ্ধদেবের ৫০০ বৎসর পরে নির্ম্মিত হইয়াছে এমত স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের বিবেচনায় কাত্যায়নের পালী ব্যাকরণের ন্যায় একখানি অত্যুৎকৃষ্ট সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণ, একটি ভাষা অন্যূন ৩০০। ৪০০ বৎসরের পরিপক্ক না হইলে, তাহা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। যাহা হউক আ-

(২৪) শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন কৃত "ঐতিহাসিক রহস্য" দ্রষ্টব্য। কাত্যায়ন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে, রামদাস বাবু কাতন্ত্রের সদৃশ কাত্যায়নের পালি ব্যাকরণের কয়েকটী সূত্র উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন।

(২৫) "ঐতিহাসিক রহস্য" দেখ।

(২৬) সাহিত্য প্রবেশ (৯ম সংস্করণ) ২৪৩ পৃষ্ঠা দেখ। সাহিত্য প্রবেশ প্রণেতা বলেন "প্রথমতঃ পল্লীর সাধারণ লোক কর্ত্তৃক সংস্কৃতের সম্প্রসারণ ও বিপ্রকর্ষণ প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় উহা পালীভাষা নামে বিখ্যাত হইয়া থাকিবে। তিনি বলেন ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে গাথা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। অন্য একজন লেখক বলেন "সিংহলে গিয়া মাগধী ভাষা পালী নাম গ্রহণ করে" (৫ম ভাগ বান্ধব ২০ পৃষ্ঠা)

চন্দ্রগুপ্ত খ্রীষ্টের ২৯২ বৎসর পূর্ব্বে পরলোক প্রাপ্ত হন। তৎপরে, তদীয় পুত্র মিত্রগুপ্ত ও তদনন্তর পৌত্র অশোক রাজত্ব করেন। ১৮০০ শকের ৪১৭। ৪১৯ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অশোক সম্বন্ধে একটী অপূর্ব্ব প্রস্তাব লিখা হইয়াছে।

মরা মানিয়া লইলাম, কাত্যায়নের পালী ব্যাকরণ যেন পালী ভাষা সৃষ্টির ১০০ বৎসর পরেই নির্ম্মিত হইয়াছে; তবে ঐ ব্যাকরণ কাতন্ত্র হইতে মাত্র ৪০। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। সর্ব্ববর্ম্মার ন্যায় একজন সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ যুগযুগান্তরের পরিবর্দ্ধিত পরিবর্ত্তিত এবং পরিমার্জ্জিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভুবনমুগ্ধকর সংস্কৃত ব্যাকরণ সমূহের (২৭) আদর্শকে উপেক্ষা করিয়া ৪০। ৫০ বৎসরের অপরিপক্ক পালী ভাষোৎপন্ন নিয়ম অনুসারে একখানা উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছেন, যাহার মস্তিষ্ক আছে বোধ হয় তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও একথা অন্তরে স্থান দিবেন না। অতএব অধ্যাপক এগ্‌লীং সাহেব "কাত্যায়নের পালিভাষার ব্যাকরণ অনুসারে কাতন্ত্র রচিত হইয়াছে" এ কথা বলিয়া বাস্তবিকই বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ইনি এই প্রকার ভ্রমে পতিত হইয়া কেবল সর্ব্ববর্ম্মার মহতী প্রতিভার অবমাননা করিয়াছেন।

পরন্তু পালীভাষায় ব্যাকরণ-প্রণেতা কাত্যায়ন বুদ্ধদেবের শিষ্য কিনা সে সম্বন্ধে আমাদের বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে পালী ভাষার আরম্ভের ১০০ বৎসর পরে যদি তিনি পালী ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া থাকেন তবে উহা ৫০০ বৎসর পরে বিনির্ম্মিত হইয়াছে। তিনি বুদ্ধদেবের শিষ্য হইলে পালী ব্যাকরণ প্রণয়নের সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ৫০০ বৎসর হইয়াছিল!! এই জঘন্য যুগে লোকের পরমায়ু ৫০০ বৎসর হইতে পারে ইহা কে বিশ্বাস করিবে? সুতরাং পালী ব্যাকরণ-প্রণেতা যে বুদ্ধদেবের শিষ্য ইহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব। বোধ হয়, সমাজে বিশেষ আদৃত হইবার জন্য পালী ভাষার ব্যাকরণ-প্রণেতা কাত্যায়ন কিম্বা অন্য কেহ তৎপ্রণেতা কাত্যায়নকে বুদ্ধদেবের শিষ্য বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এ দেশে এবম্প্রকার প্রথা নিতান্ত অলৌকিক বিষয় নহে। অনেকেই জানেন এ দেশের প্রায় সমস্ত পুরাণপ্রণেতাগণই আপনাদের পুরাণকে সমাজে বিশেষ সম্মানিত করিবার জন্য ব্যাস নাম ধারণ করিয়াছেন কিন্তু সমগ্র পুরাণ যে এক লেখনী হইতে নিঃসৃত নহে বিবেচক পুরাণজ্ঞগণ তাহা সম্যক্ রূপে অবগত আছেন। (২৮)

(২৭) আপিশলি, কাশ্যপ, গার্গ্য, গালব, চাক্রবর্ম্মণ, ভরদ্বাজ, শাকটায়ন, শাকলা, সেনক, স্ফোটায়ন, পাণিনি এবং দাক্ষায়ণ (ব্যাড়ি) প্রভৃতি বহু সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণগণ সর্ব্ববর্ম্মার পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

(২৮) অধিকাংশ পুরাণ বেদব্যাসের নামে প্রচারিত হইয়াছে সেই রূপ মধুসূদন মিশ্র মহানাটক বিরচন করিয়া হনুমানের নামে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এষ শ্রীল হনুমতা বিরচিতে শ্রীমন্মহা নাটকে বীর শ্রীযুত রামচন্দ্র চরিতে প্রত্যুদ্ধৃতে বিক্রমৈঃ। মিশ্র শ্রীমধুসূদনেন কবিনা স-

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি সকল পর্য্যালোচনা করিলে পালী ব্যাকরণ প্রণেতাকে বুদ্ধদেবের ৭। ৮ পুরুষেরও অধস্তন লোক বলিয়া বিলক্ষণ প্রতীতি হয়; সুতরাং এ কাত্যায়ন বুদ্ধদেবের শিষ্যানুশিষ্য হইতেও অনেক পরকীয় লোক। আমরা বোধ করি এ কাত্যায়ন সর্ব্ববর্ম্মারও পরকীয় লোক এবং সর্ব্ববর্ম্মার কাতন্ত্রের নিয়মানুসারেই তাঁহার পালী ভাষার ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে। আমাদের যুক্তি এগলীং সাহেবের সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া পড়িল। আমরা এই স্থলেই সর্ব্ববর্ম্মার জীবনীর পরিসমাপ্তি করিলাম।

ছিন্নমুকুল।

প্রথম পরিচ্ছেদ—ভূমিকা।

বোম্বাই সহরের পারেল পাহাড়-শিখরস্থ একটি অট্টালিকাকক্ষে চারুশীলা রুগ্ন-শয্যায় শয়ান—নিকটে ভগিনী সুশীলা আসীন। তখন প্রাতঃকাল পাহাড়ের নিম্নদেশে দূরে সুনীল সমুদ্র সুধীর ভাবে তরঙ্গিত হইয়া, বক্ষ-স্থিত নৌকা সমূহকে বিলাস ভাবে মৃদুমন্দ দোলাইয়া, লীলাচ্ছলে বেলা ভূমিতে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল। সূর্য্য উঠিয়াছে, তাহার সহস্র কিরণমালা বিদ্যুত খণ্ডের ন্যায় সেই সমুদ্রে চমকিতেছিল। গাছের শিখরে শিখরে, দূরস্থ সুনীল পর্ব্বতের শিখরে শিখরে, প্রাতঃসূর্য্যের হেমাভ রশ্মি জ্বলিতেছিল। তটেই বোম্বাই সহর, পাহাড় হইতে সেই মহানগরীর বিচিত্র রমণীয়তা আরো দ্বিগুণ রমণীয় বোধ হইতে ছিল। এখনো যেন সহর সম্পূর্ণ জাগ্রত হয় নাই, এখনো বৈষয়িক কোলাহল আরম্ভ হয় নাই, এখনো প্রকৃতির প্রাকৃতিক শোভাই চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সুশীলা ভগিনীর সেই রুগ্ন মূর্ত্তি দেখিয়া সাশ্রু নয়নে তাঁহার সহিত কথা কহিতে কহিতে মাঝে মাঝে মুক্ত বাতায়ন দিয়া এক এক বার নিম্নস্থ সহরের প্রতি, এক এক বার সেই সূর্য্য-রশ্মি-শোভিত সমুদ্রের প্রতি চাহিতেছিলেন। সুশীলা দ্বাবিংশতির অধিক হইবেন না, দেখিতেও সুশ্রী, চক্ষু নাসিকা ওষ্ঠাধর সকলি সুগঠন। কিন্তু তাঁহার বিধবার বেশ, এবং তাঁহার সেই যুবতী-মুখে প্রৌঢ়ার বিজ্ঞতা ব্যাপ্ত হওয়ায় তাঁহার সেই সৌন্দর্য্যের তেমন আকর্ষণী শক্তি ছিল না। সহসা তাঁহার সেই সৌন্দর্য্য কাহারো চক্ষে লাগিত কি না সন্দেহ। ইহাঁরা দুই জনেই এলাহাবাদের মৃত ব্রাহ্ম তারাকান্ত মুখোপাধ্যায় নামক এক জন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কন্যা। চারুশীলা বিবাহের পর হইতে স্বামীর সহিত আসিয়া বোম্বাই ছিলেন, সুশীলা বাল্যকাল হইতেই পিত্রালয়ে বাস করিতেন। হঠাৎ সুশীলা এক দিন শুনিলেন যে বাণিজ্যে দেউলে হইয়া ভগিনীপতির মৃত্যু হইয়াছে, চারুশীলাও শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছে। শুনিয়া সুশীলা বোম্বাই আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বাঙ্গালির মেয়ে—একাকী এত দূর আসিতে সাহসী হইবে কি করিয়া? সুশীলার আর আপনার কেহই ছিল না। ভাগ্যে পূজার ছুটিতে তাঁহার দূর সম্পর্কীয় দেবর হিরণকুমার এলাহাবাদে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, তিনি সুশীলার বিপদ দেখিয়া সঙ্গে করিয়া বোম্বাই লইয়া আসিলেন।

কত দিন পরে আজ দুই ভগিনীতে সাক্ষাৎ—সেই চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় স্বামীর সহিত চারুশীলা বোম্বাই চলিয়া আসেন, তখন সুশীলা দশম বর্ষীয়া মাত্র। সেই অবধি আর তাঁহাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। তাহার পর এই অল্প দিনের মধ্যে দুজনের জীবনে কত ঘটনা ঘটিয়াছে, কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে! সেই বিদায়ের সময় জীবনের সবে আরম্ভ মাত্র, তখন জীবনে কতই সুখের আশা ছিল, ইহার মধ্যেই সকল ফুরাইয়াছে, ইহার মধ্যেই দীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে, দুজনেই বিধবা হইয়াছেন। এখন এই অবস্থায় দুজনের দেখা হইয়া তাঁহারা কত কাঁদিতেছিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে দুজনে কতই দুঃখের কথা কহিতেছিলেন, সে সকল এস্থলে বলা বাহুল্য মাত্র। অশ্রু মুছিতে মুছিতে একবার সুশীলা বাটীর সন্নিধানস্থ উদ্যানে দৃষ্টিপাত করিলেন—দেখিলেন উদ্যানে দুইটি বালক বালিকা খেলিতেছে। কিছু দূরে হিরণকুমার দাঁড়াইয়া তাহাদের খেলা দেখিতেছেন। হিরণকুমার অষ্টাদশবর্ষীয়, তাহার বর্ণ উজ্জ্বল, চক্ষু সুদীর্ঘ, দৃষ্টি শান্ত অথচ জ্যোতির্ম্ময়। যৌবনের প্রাক্কালে যে সকল মনের গুণ স্ফূর্ত্তি পাইয়া মানুষের বাহ্য প্রকৃতিকেও স্ফূর্ত্তিময় করিয়া তোলে, সেই সকল গুণের প্রাচুর্য্য বশতঃ যেন হিরণকুমারের মুখে, তাঁহার সমস্ত শরীরে একটি অলৌকিক তেজের ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। হিরণকুমার দেখিলেন বালকটি কখনো উদ্যানে কোদাল লইয়া মাটি কাটিতেছে কখনও দৌড়িয়া গাছের কোন শুষ্ক শাখা ভাঙ্গিতেছে, কখনও বা কোন জল-পাত্র হস্তে লইয়া ফুল গাছের গোড়ায় জল ঢালিতেছে। বালকটি দশমবর্ষীয়, শরীর সুগোল সুঠাম হৃষ্টপুষ্ট, মুখাবয়ব সুন্দর, কৃষ্ণ ভ্রুযুগের নীচে চঞ্চল চক্ষুর্দ্বয় যেন জ্বলিতেছে কুঞ্চিত কেশরাশি উন্নত ললাট বেষ্টন করিয়া তাহার গরিমা বৃদ্ধি করিতেছে। মুখশ্রী দেখিলে বালকটিকে সরল উদারচেতা, এবং কিছু উদ্ধতস্বভাব ব-

---

ন্দর্ভসজ্জীকৃতে যতোঽঙ্কঃ প্রথম বিদেহ তনয়ালাভাভিধানো মহান্।

মহানাটক ১ম অঙ্ক।

এই শ্লোকটী দেখিয়া মহানাটক হনুমানের প্রণীত বলিয়া অনেকের সংস্কার আছে। এই প্রকার উদাহরণ অনেক দেখান যাইতে পারে।

লিয়া বোধ হয়। বালিকাটি কিছু কৃশ, ক্ষুদ্র মস্তকে নিবিড় কেশজাল তাহার স্কন্ধদেশের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত আবরিত করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে তাহা স্থানভ্রষ্ট হইয়া বক্ষে কপোলে ছড়াইয়া পড়ায় তাহার ক্ষুদ্র মুখখানির মধুরতা আরো বৃদ্ধি করিতেছে। তাহার চক্ষু দুটি ঘননীল, দৃষ্টি প্রশান্ত এবং করুণ, দৃষ্টিতে যেন কেমন সঙ্কুচিত—কেমন শশঙ্কিত ভাব, চক্ষের পল্লব দুটি যেন কিসের ভাবে সর্ব্বদাই ভারাক্রান্ত, তাহাদের যেন সেই দীর্ঘায়তন চক্ষুর সমস্ত আয়তন বিকাশ করিবার সামর্থ্যই নাই। মুখ খানিতে শৈশবের প্রফুল্ল ভাব নাই, কেমন যেন ঈষৎ বিষণ্ণ ভাবে আবরিত। সমস্ত মূর্ত্তিতে একটি ভয়ের ভাব, একটি বিষণ্ণ ভাব, একটি করুণ ভাব বিকীরিত রহিয়াছে।

সহসা ইতস্ততঃ চাহিয়া বালক বালিকার নিকটে দৌড়িয়া আসিয়া বলিল "কনক, আয় আয় দেখবি কেমন ফুল ফুটেছে?" বালিকা আস্তে আস্তে বলিল "কোথায়"? "ঐ দিকে"—এই কথা বলিয়াই বালক কনকের হস্তাকর্ষণ পূর্ব্বক সেই দিকে তাহাকে লইয়া চলিল। বালিকা দুর্ব্বল, ভ্রাতার সঙ্গে সমান দৌড়িতে পারিল না, কষ্টে খানিক দূর আসিয়া পড়িবার উপক্রম করিল, অমনি বালক "তুই চলতে পারিসনে—তুই থাক" বলিয়া মনের বেগে সেই প্রস্ফুটিত ফুলবৃক্ষের নিকট দৌড়িল—তাহার আর বিলম্ব সহে না। বালকটি কিছু চঞ্চলচেতা, যখনি যা মনে আসে তখনি তাহা না করিয়া থাকিতে পারে না। বালক হইতে বালিকাটি আবার সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন, সে যেন দৌড়িতে জানে না, যেন চলিতে জানে না, একস্থানে দাঁড়াইয়া নিস্তব্ধ অনিমেষ লোচনে, সমুদ্রে-ক্রীড়া দেখিতেই সেই সপ্তম বর্ষীয়া বালিকা নিমগ্ন ছিল। তাহা দেখিতে দেখিতে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে কতকি ভাবের উদয় হইতেছিল কে বলিবে। সহসা একটি পুষ্পবৃক্ষস্থিত প্রজাপতির প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। সে অতি ধীরে ধীরে, অতি ভয়ে ভয়ে পদক্ষেপ করিয়া যে গাছে প্রজাপতি বসিয়াছিল সেই গাছের নিকট আসিল, এক দৃষ্টে প্রজাপতির দিকে চাহিয়া রহিল, পরে কি ভাবিয়া কে জানে সে আস্তে আস্তে তাহার ক্ষুদ্র হাতটি তুলিয়া প্রজাপতির গাত্র স্পর্শ করিতে গেল, অমনি প্রজাপতিটি উড়িয়া আর একটি বৃক্ষে গিয়া বসিল। বালিকার মুখকান্তি অমনি আরো বিষণ্ণতর হইয়া পড়িল, যেন মনে মনে বলিতে লাগিল "প্রজাপতি, তুমি পলাইলে কেন, আমি আদর করিয়া ছুঁইতে গেলাম তবে পলাইলে কেন?" বালিকা ক্ষুণ্ণমনে সেখানে হইতে সরিয়া একটি প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলের নিকট গেল, বিষণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই ফুলটি দেখিতে লাগিল। দেখিতেও ভয়, কে যেন এখনি আসিয়া তাহার দেখায় বাধা দিবে, কে যেন তাহার সেই ভালবাসার ফুলটি তাহার দেখা বন্ধ করিবার জন্যই তুলিয়া লইবে। বালিকাটি ফুলপানে চাহিয়া

চাহিয়া ধীরে ধীরে সেই ফুলটির বৃন্তে আপন কুসুম-হস্ত রাখিল, ধীরে ধীরে সেই ফুলটি তুলিয়া হস্তে লইয়া সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতে লাগিল। ফুল তুলিবার সময় বালক দেখে নাই, হঠাৎ এদিকে দৃষ্টি পড়ায়, ভগিনীর হস্তে ফুল দুস্টে, সক্রোধে ছুটিয়া আসিয়া কম্পিত স্বরে বলিল "আমার গোলাপ ছিঁড়িলি কেন" অমনি বালিকাটি ভয়ে জড়সড় হইয়া কাঁদ, কাঁদ, ভাবে ভ্রাতার মুখ পানে চাহিয়া রহিল, কি যেন বলিতে গেল কিন্তু পারিল না, কথা আটকিয়া গেল। আবার আরক্ত নয়নে তাহার ভ্রাতা বলিল "তুই যে বড় আমার ফুল ছিঁড়িলি!" বালিকা তেমনি করুণ দৃষ্টিতে তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিল। নীরবে ছলছল নেত্রে কত ক্ষমা প্রার্থনা করিল, কিন্তু কোন কথা ফুটিয়া বলিতে পারিল না। একবার অতি মৃদুস্বরে, অতিধীরে, অতি অস্ফুটস্বরে বলিল "আর তুলিব না" সে কথা ক্রুদ্ধ বালকের কর্ণে প্রবেশ করিল না। ভগিনীকে মৌনদৃষ্টে উত্তরোত্তর বালক আরো ক্রুদ্ধ হইয়া, কেন ফুল ছিঁড়িলি বলিতে বলিতে সরোষে বালিকাকে মারিতে হস্তোত্তলন করিল, কিন্তু কে একজন অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া অমনি তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। সেই ব্যক্তিটি হিরণকুমার। তিনি এতক্ষণ দাঁড়াইয়া তাহাদের খেলা দেখিতেছিলেন। বালক বালিকাকে মারিতে উদ্যত দেখিয়া তাঁহার বালিকার প্রতি মমতা হইল, হিরণকুমার থাকিতে না পারিয়া, ছুটিয়া আসিয়া বালকের হাত চাপিয়া ধরিলেন। বালক আশ্চর্য্য হইল, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল, সে কখনো কিছুতে বাধা পায় নাই, যখনি যাহা মনে করিয়াছে তখনি তাহা করিয়াছে, সহসা আজ বাধা পাইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল, সরোষে হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু চেষ্টা নিষ্ফল হওয়ায় আরো মনে মনে গর্জ্জিতে লাগিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বালকটিকে কিছু উদ্ধতস্বভাব বলিয়া বোধ হয়। বালক এদিকে সরল, এদিকে উদার, কিন্তু কাহারো প্রভুত্ব সে সহ্য করিতে পারে না, কিছুতে বাধা প্রাপ্ত হইলে সে অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া উঠে, সে মিস্ট কথার দাস কিন্তু বল পূর্ব্বক কেহ তাহাকে কিছুই করাইতে পারে না, সে অতি অল্পতেই ক্রুদ্ধ হয়, কিন্তু সে অতি অল্পক্ষণের নিমিত্ত। ছেলেবেলা হইতে সে বাপ মায়ের অতিশয় আদুরে, সে তাঁহাদের নিকট হইতে কখনো কোন বিষয়ে কোন ভর্ৎসনা খায় নাই, যখনি তাহার সহিত তাহার ভগিনীর বিবাদ হইয়াছে সে পিতামাতার কাছ হইতে তাহার পক্ষেই সমর্থন পাইয়া আসিয়াছে, সুতরাং তাহার উদ্ধত স্বভাব আরো বর্দ্ধিত হইয়া পড়িয়াছে। তা না হইলে তাহার পিতামাতা যত্ন করিয়া শিক্ষা দিতে জানিলে এই উদার বালকটির স্বভাব অতি নির্দ্দোষ হইতে পারিত। যাহা তাহার অদৃষ্টে কখনো হয় নাই তাহা আজ হওয়াতে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। হিরণকুমার তাহার হস্ত ধরায় সে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিল, এই ঘটনাটি তাহার শিরায় শিরায় বিঁধিল।

যখন দেখিল সে হাত ছাড়াইতে অক্ষম, তখন সে আর কিছু না করিয়া, মৌনভাবে আরক্ত লোচনে হিরণের দিকে চাহিয়া রহিল। পাছে হাত ছাড়িলে বালক আবার বালিকাকে মারে, সেই ভয়ে হিরণ হাত না ছাড়িয়া আস্তে আস্তে বলিলেন " আর মারবে না বল! " বালক এই কথায় আরো ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল " মারবো।"

হিরণ! "তবে তোমার হাত ছাড়িব না"

বালক। " হাত ছাড়িয়া দেও, তুমি হাত ধরিবার কে?" হিরণ আবার বলিলেন "বল মারিবে না,তাহা হইলে এখনি ছাড়িয়া দিব।" বালক আর একবার হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া অক্ষম হইলে সক্রোধে বলিয়া উঠিল "আমার বোন আমি মারিব—তুমি বলিবার কে?" বালককে এইরূপ ক্রোধান্ধ দেখিয়া, হিরণকুমার মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। বালক তাহাতে আরও যেন অপমানিত হইয়া নীরবে গর্জ্জিতে লাগিল। বালিকা এতক্ষণ ভয়ে এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল, এখন আস্তে আস্তে কাছে আসিয়া হিরণকে বলিল " দাদার হাত ছেড়ে দাও"—হিরণ হাত ছাড়িয়া দিল। বালক তখন গম্ভীর ভাবে আরক্ত অথচ অশ্রুময় লোচনে নিস্তব্ধে বাগান হইতে প্রস্থান করিল। অন্য সময় হইলে সে হয় তো মাতার নিকট আসিয়া কত অভিযোগ করিত—কিন্তু আজ তাহা করিল না, একাকী আজ শয়নগৃহে আসিয়া অনেকক্ষণ শুইয়া রহিল। হিরণ বালিকাকে কোলে লইয়া উদ্যান হইতে আসিলেন। বালিকা আসিতে আসিতে বলিল "কেন তুমি দাদার হাত ধরিলে?"

ইহার অনেক ক্ষণ পরে বালক বালিকা দুইটি মাতার রুগ্ন কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। বালকটি অন্য দিনের ন্যায় তত প্রফুল্ল নহে—যেন কিছু ম্রিয়মান,তাহা দেখিয়া পীড়িতা মাতা কিছু ব্যাকুল ভাবে তাহাকে কাছে ডাকিলেন। কাছে বসিলে চারুশীলা সেই দুর্ব্বল রুগ্নহস্তে ধীরে ধীরে তাহার মস্তকে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন "কেন রে প্রমোদ, আজ যে তোর মুখখানি শুকিয়ে গেছে।" বালক কথা কহিল না। ততক্ষণ বালিকা কনকলতা ভয়ে ভয়ে গৃহের একটি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে তাহার মাতা কিছুই বলিল না—একবার চাহিয়াও দেখিলেন না। মাতার পক্ষপাতিতা দেখিয়া সুশীলা তাহাকে ডাকিয়া কোলে বসাইয়া চারুশীলাকে বলিলেন "দিদি, এটি বুঝি তোমার ফেল্‌না মেয়ে?" চারুশীলার সেই রুগ্ন ওষ্ঠে একটু হাসির রেখা পড়িল। ক্রমে দিন যাইতে লাগিল—কত চিকিৎসক আসিয়া দেখিল কিছুতেই চারুশীলা আরোগ্য লাভ করিতে পারিলেন না। ১৫।১৬ দিন কষ্টে বাঁচিয়া ভগিনীর হস্তে সন্তানগুলি সঁপিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—পথহারা।

আট দশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। আজ শরৎ কালের এই প্রশান্ত অপরাহ্ন সময়ে পূর্ণযৌবনা স্ত্রীলোকের মত ভাগিরথী হেলিতে দুলিতে কানপুরের ক্রোড়-দেশ দিয়া আপনার আবেশেই বহিয়া যাইতেছে। অস্তপ্রায় সূর্য্যের সহস্র কিরণে আকাশের সহস্র জলদখণ্ড সুরঞ্জিত হইয়া গঙ্গার বক্ষে প্রতিফলিত হইতেছে।

সেই শোভাময়ী ভাগীরথীর অপর পারে একটি নিবিড় বনশ্রেণী দীর্ঘভাবে দূর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। বনশ্রেণী কোথাও সঙ্কীর্ণ, কোথাও বিস্তৃত—কোথাও নিবিড়। সেখানে কোথাও অশ্বত্থ বটের বিশাল শাখায় বসিয়া নানা বর্ণের পক্ষিগণ ঘোর কলরব করিতেছে—কোথাও ঝোপঝাপের মধ্য দিয়া কখনো দুই একটি বন্য শৃগাল, বন্য বরাহ ছুটিয়া যাইতেছে। অনেক দূর পর্য্যন্ত মনুষ্যের বসতির চিহ্ন কিছুই নাই—যে দিকে চাও কেবলি বনশ্রেণী। সহসা আজ অপরাহ্ণে—এই নিভৃত নিস্তব্ধ অরণ্য বন্দুকের গর্জ্জনে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। দুই একটি বন্য পশু যাহাদিগকে ইতিপূর্ব্বে বিচরণ করিতে দেখা গিয়াছিল, তাহারা সভয়ে নিবিড় বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে লুকাইল, ভীতি স্বরে কোলাহল করিয়া পক্ষিগণ নিকটস্থ ঝোপ ঝাপ হইতে উড়িয়া স্থানান্তরে গিয়া বসিল। দেখিতে দেখিতে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষস্থিত দুইটি সুন্দর পক্ষীর মধ্যে একটি সেই বন্দুকের গুলি-বিদ্ধ হইয়া বৃক্ষচ্যুত পল্লবের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে ভূমে লুটাইয়া পড়িল; আর একটি প্রাণ-ভয়ে উড়িয়া দূরস্থিত আর এক বৃক্ষের উপর গিয়া বসিল। উহার অনুসরণ করিয়া দুইটি বন্দুক-ধারী যুবা পুরুষ আবার সেই বৃক্ষের নিকট আসিলেন। যুবকের মধ্যে এক জন সেখানে আসিয়া অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন " প্রমোদ, ঐ দেখ! ঐ বসিয়া আছে, লক্ষ্য করিয়া মার।"

আট বৎসর পূর্ব্বে পারেল পাহাড়ে আমরা যে দুরন্ত বালক প্রমোদকে খেলিতে দেখিয়া আসিয়াছিলাম সেই বালকই এখনকার এই পরিণতবয়স্ক যুবা-পুরুষ হইয়া উঠিয়াছেন। সেই বাল্যকালের সৌন্দর্য্য তাহার মূর্ত্তিতে এখন পরিস্ফুট ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, তাহার সৌন্দর্য্যে তখন যাহা কিছু অভাব ছিল, এখন যৌবনে তাহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু এখনো প্রমোদের মনোবৃত্তির কিছুমাত্র বিকার হয় নাই, বাল্য-কালের দুরন্ত চঞ্চলচেতা প্রমোদ হইতে, এখনকার যুবা প্রমোদ স্বভাবে অতি অল্পই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বাল্যকালের মত যদিও আর প্রমোদ কোদাল পাড়ে না, ফুল তুলিলে ভগিনীকে মারে না, কিন্তু তথাপি এখনো প্রমোদ সেই প্রমোদ। তাহার বাল্য ক্রীড়ার পরিবর্ত্তে প্রমোদ যৌবনে এখন নানাবিধ ব্যায়ামের খেলার অনুরাগী, অতিশয় শিকারপ্রিয়, কলেজে ঝগড়া করিতে বড় পটু। প্রমোদের দৌরাত্ম্যে কলেজের কোন ছাত্রের দুষ্টমি করিয়া পার পাইবার যো নাই। প্রমোদ দুষ্ট ছাত্রের যম। এক কথায়—তখনকার সেই উদার চঞ্চল বালক, এখনকার উদার দুরন্ত যুবা। প্র-

মোদ এখন কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়েন, ছুটিতে কখনো কখনো এলাহাবাদে বাড়ী আসেন মাত্র। চারুশীলার মৃত্যুর পর সুশীলা,প্রমোদ ও কনকলতাকে সঙ্গে লইয়া এলাহাবাদে আসিয়াছিলেন। এবার আশ্বিন মাসে পূজার ছুটীতে প্রমোদ বাড়ী না গিয়া একটি বন্ধুর সহিত এই কানপুরে বেড়াইতে আসিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রমোদ বড় শীকারপ্রিয়। কানপুরে আসিয়া গঙ্গার এ পারে শীকারোপযুক্ত স্থান দেখিয়া প্রমোদ শীকার আশায় এই জঙ্গলে বন্ধুর সহিত আসিলেন। বন্য পশু বধ করা তাঁহাদের অদৃষ্টে ঘটিল না, বন্দুকের শব্দে কেহই আর বাসস্থান হইতে নির্গত হইল না, বরং দুই একটি বিচরণশীল পশুও সে শব্দে বাসস্থানে লুকাইল, সুতরাং পাখী মারিয়াই তাঁহাদের সাধ মিটাইতে হইল। যে বৃক্ষে সেই পলাতক পক্ষীটি আশ্রয় লইয়াছিল তাহার তলে থাকিয়া প্রমোদ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া আবার বন্দুক ছুঁড়িলেন। কিন্তু গুলি তাহার গাত্র স্পর্শ করিবার অগ্রেই সে ভীতমনে সে বৃক্ষ হইতে উড়িয়া গেল। মারিতে না পারিয়া প্রমোদ ক্ষুণ্ণ মনে সেখান হইতে অন্য স্থানে আসিলেন। দুই জনে যে কত পাখী ধ্বংশ করিলেন তাহার নির্ণয় নাই, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের রক্ত-পিপাসা মিটিল না। তাঁহারা আবার সে স্থান ছাড়িয়া অন্য দিকে গমন করিলেন। যাইতে যাইতে একটি বৃক্ষে প্রমোদ সেই পলাতক পাখীটিকে দেখিতে পাইলেন। এত পক্ষী মারিয়াও সেইটিকে বধ করিতে না পারায় প্রমোদ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, সুতরাং সেইটিকে দেখিয়াই, সেই বৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া দুই জনে ছুটিলেন। বৃক্ষতলে আসিয়া অতি ধীরে তাহার প্রতি বন্দুক ছুড়িলেন। কিন্তু এবারও লক্ষ্য করিতে দেখিতে পাইয়া পাখিটি অন্য বৃক্ষে উড়িয়া গেল। প্রমোদের আরো ক্ষোভ জন্মিল। তিনি মনের আবেগে, সেই পলাতক পক্ষীর অনুসরণ করিয়া, সে যে বৃক্ষে বসিল আবার সেই দিকে দৌড়িলেন। যাইতে যাইতে সে অন্যত্র গিয়া বসিল, আবার তিনিও পথ বদলাইয়া সেই দিকে দৌড়িলেন। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত, কিন্তু শীকারের উৎসাহে যুবারা এত মত্ত ছিলেন যে তাহা তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না। শ্রম-ক্লান্ত ঘর্ম্মাক্ত, তথাপি উৎসাহের সহিত সেই পক্ষীর উদ্দেশে, অন্য কোন দূরবর্ত্তী বৃক্ষের দিকে গমন করিলেন। তাঁহারা যখন বৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন অন্ধকার হইয়া আসিল, তখন আর পাখীটিকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা বিশ্রাম করিবার জন্য হতাশচিত্তে সেই বৃক্ষতলে বসিলেন। দেখিতে দেখিতে অগণ্য নক্ষত্রমালা আকাশে ফুটিতে লাগিল, গাছের কোলে খদ্যোত-পুঞ্জ জ্বলিতে আরম্ভ করিল, তাঁহারা তখন বাড়ী ফিরিয়া যাইবার মানসে বৃক্ষতল হইতে উঠিলেন। কানপুরে আসিয়া তাঁ-

হারা এই অল্পদিনের জন্য যে বাড়ীতে ছিলেন, এই জঙ্গল ছাড়াইয়া নদী পার হইয়া পরপারে তাঁহাদের সেই বাড়ী। বাসস্থানে যাইবার জন্য তাঁহারা উঠিয়া, অন্ধকারে পথ চিনিয়া চিনিয়া চলিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ চলিয়া চলিয়া বুঝিলেন, সেই অপরিচিত নূতন স্থানে পথ চিনিয়া বাড়ী যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে কত দুরূহ। দেখিলেন তাঁহারা যত চলিতেছেন, কিছুতেই জঙ্গল ছাড়াইতে পারিতেছেন না, যে পথে যান আবার ঘুরিয়া সেই জঙ্গলেই আসিয়া পড়িতেছেন। অনেক ক্ষণ এইরূপে পথহারা শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া সেই অরণ্য মধ্যে দুই বন্ধুতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ ঘুরিয়া অবশেষে ক্লান্ত হতাশ চিত্তে প্রমোদ বলিলেন " কি বিপদ! ক্রমে আরো আঁধার হ'য়ে এল, আমরা নদীতীর হ'তেও অনেক দূরে, কোন পথে গেলে যে তীরে পৌঁছিব তারো ঠিক নেই, কি করা যায়? আজ আমাদের এখানেই থাকতে হবে নাকি!" যামিনীনাথ বলিলেন "আমার তো আর চলিবারও শক্তি নাই, অত্যন্ত অবসন্ন হ'য়ে পড়েছি, তুমি যদি শীকারে ওরূপ উন্মত্ত না হইতে তাহা হইলে আমাদের এ দুর্দ্দশা ঘটিত না" কথা কহিতে কহিতে তাঁহাদের কর্ণ সেই অরণ্যবাসী পশুর রবে ধ্বনিত হইতে লাগিল। অন্ধকারময় ঝোপ ঝাপ ভেদ করিয়া, দুই একটি করিয়া, বন্য বরাহ, তাঁহাদের নিকট দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের দেখিয়া অজ্ঞাতভাবে প্রমোদের শীকার-লালসা তখনো জ্বলিয়া উঠিল, প্রমোদ সেই অন্ধকারেই লক্ষ্য করিয়া হস্তস্থিত বন্দুক ছুঁড়িলেন। অমনি বন্য পশুগণ চীৎকার করিতে করিতে ভীত মনে স্বস্ব বাসস্থানে পলায়ন করিল,বৃক্ষস্থিত নিদ্রিত পক্ষিগণ ঘুমাইতে ঘুমাইতে সে শব্দে চমকিত হইয়া একবার অস্পষ্ট স্বরে ডাকিয়া উঠিল, পক্ষীদের সভয় চমকে এক বার বৃক্ষ পত্র কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার সকল থামিয়া গেল, সহসা অরণ্যটি নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। এদিকে তাঁহারা পরিশ্রমে কাতর, ক্ষুধা তৃষ্ণায় আকুল হইয়া, প্রতিপদে বৃক্ষ ও লতা জালে বাধা প্রাপ্ত হইতে হইতে চলিতে লাগিলেন, সেই অন্ধকারময় জনশূন্য অরণ্যে এই অসহায় অবস্থায় পথহারা হইয়া তাঁহারা চলিতে লাগিলেন। ক্রমে নিতান্ত অবসন্ন ক্লান্ত হতাশ হইয়া, অগত্যা একটি বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন। সহসা এই সময় এই নীরব নৈশ গগনে সঙ্গীত-ধ্বনি উথলিয়া উঠিল, তাঁহাদের কর্ণকুহর সহসা মুগ্ধ হইয়া গেল। এই অসময়ে মনুষ্য-কণ্ঠ শুনিয়া তাঁহাদের জীবনে জীবন যেন ফিরিয়া আসিল। সেই ধ্বনি ক্রমে বাতাসে তাঁহাদের দিকেই আসিতে লাগিল। গানটী শুনিতে তাঁহারা এক মনে সেই দিকে কান পাতিলেন। প্রথমে সুরমাত্র, পরে অস্পষ্ট, ক্রমে স্পষ্ট কথাগুলি তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল, তাঁহারা শুনিলেন—

" সুশীতল মহীরুহ সুশীতল ছায়
তেয়াগি অনলকুণ্ডে ঝাঁপিতে যে চায়,

রমণীয় বেলা ভূমি করি পরিহার,
উন্মত্ত সাগর মাঝে যেতে সাধ যার,
দুর্গ ছাড়ি সহিবে যে ঝটিকা পীড়ন,
যাক সে এ বন ছাড়ি যথা তার মন।
এমন সুখদ কানন বাস,
পশেনা হেথায় শোকের শ্বাস,
হেথায় শান্তি বিরাজমান,
কলহের হেথা নাহিক স্থান,
এ ছেড়ে কি বৈজয়ন্তে কারো মনধায়"।

এই সময় অস্ফুট জোৎস্নায় অরণ্যটি ঈষৎ উজ্জ্বল হইল, ঘোর আঁধারের বিকট মূর্ত্তি যেন শমিত হইল, সেই অস্ফুট চন্দ্রালোকে তাঁহারা দেখিলেন, অদূরে এলায়িত কুন্তল-রাশি-শোভিতা রমণীমূর্ত্তি, সেই বন উজ্জ্বল করিয়া আছে। তাহার মধুময় গানে, এই নিস্তব্ধ রজনীর নিস্তব্ধতা, এই অরণ্যের ভীষণতা দূর করিতেছে। রমণী গাহিয়া গাহিয়া এই বনমধ্যে ভ্রমিতে লাগিল, নিস্তব্ধে নিষ্পন্দ ভাবে যুবকেরা তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। সহসা যেন মোহ ভাঙ্গিল, সহসা তাঁহারা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, রমণীকে কি জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা তাহার নিকটে আসিলেন। এই বনমধ্য হইতে এই নিশীথ সময়ে মনুষ্যকে সহসা বাহির হইতে দেখিয়া রমণী আশ্চর্য্য ভাবে গান বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কে? তোমরাই কি তবে কিছু আগে বন্দুক ছুঁড়তেছিলে?" সেই সময়, সেই অবস্থায়, সেই স্বরে প্রমোদের হৃদয়তন্ত্রী কাঁপিয়া উঠিল, তাঁহার কথা বন্ধ হইয়া গেল, প্রমোদ আর সে কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। প্রমোদের সঙ্গী যামিনীনাথ বলিলেন "হাঁ, আমরাই শীকার করিতে আসিয়া পথ হারাইয়াছি, তুমি বোধ হয় এইখানকার বাসেন্দা, তুমি বলিতে পার, কি করিয়া এখান হইতে নির্গত হইব?" রমণী বলিল "তোমরা কোথায় যাইবে" যামিনীনাথ উত্তর করিলেন "নদীতীরে পৌঁছিলে আমরা বাড়ী যাইতে পারি।" রমণী এই কথায় "সঙ্গে এস" বলিয়া নিস্তব্ধে পথ দেখাইয়া চলিল। উহাঁরা তাহার অনুসরণ করিলেন। শীঘ্রই রমণীর সহিত তাঁহারা তীরে আসিয়া পঁহুছিলেন। তীরে আসিয়া রমণী বলিল "তবে আমি যাই, পথ পাইলেতো?" কিন্তু তাঁহারা দেখিলেন সে রাত্রে নদীতে একখানিও খেয়া নৌকা নাই, পার হইয়া যাইবার কিছুই উপায় দেখিলেন না। অনেক দূরে কানপুরের সেতু, সে পথ রমণী বলিয়া দিতে অক্ষম হইল, সুতরাং তাঁহারা সে পথ চিনিয়া সেতু পর্য্যন্ত এ সময় কি করিয়া যাইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। রমণী তাঁহাদিগকে চিন্তিত দেখিয়া বলিল "সেতু ছাড়া কি তোমরা বাড়ী যাইতে পারিবে না?" যামিনী বলিল "আমাদের অদৃষ্টে আজ কি হইয়াছে জানি না, এই অরণ্যে রাত্রি কাটান ভিন্ন দেখিতেছি আর কোন উপায় নাই। সেতু কোথায় জানি না, গঙ্গায় এক খানিও নৌকা নাই, সুতরাং এই খানে আজ বাস করা ভিন্ন আমাদের কি উপায় আছে!" রমণী তাহাদের অবস্থা বুঝিয়া তাহার হৃদয়ে করুণার উদয় হইল।

রমণী বলিল "যদি আমাদের কুটীরে তোমরা থাকিতে চাও তো আমি লইয়া যাইতে পারি।" যুবকেরা মহা আহ্লাদিতচিত্তে তাহাতে সম্মত হইলেন। যুবতী তখন কেন তাঁহারা এখানে আসিলেন, কি করিয়া পথ হারাইলেন, তাহাদের নাম কি, এই সকল জিজ্ঞাসা করিতে করিতে পথ দেখাইয়া চলিল, যুবারা এক একটি করিয়া তাহার উত্তর, দিতে দিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—বিজন-কুটীর।

অরণ্য-প্রান্তে একটি কুটীরে তাঁহারা রমণীর সহিত আসিয়া পঁহুছিলেন। কুটীর দীপ শূন্য অন্ধকারময়। রমণী কুটীর-দ্বারে যুবাদিগকে রাখিয়া গৃহে গিয়া একটি প্রদীপ জালিল। যুবকেরা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সহসা দীপালোক-বিভাসিত, প্রফুল্লকুসুম-কান্তি-সদৃশ সহাস্য রমণী মূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহারা অবাক হইয়া দাঁড়াইলেন, মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় স্থিরদৃষ্টে সেই বন্য-কুটীর-বাসিনী বনদেবীর পানে চাহিয়া রহিলেন। রমণী চতুর্দশ বর্ষীয়া, আলুলায়িত নিবিড় কুন্তল-জাল মধ্যে শ্বেতপদ্মবৎ মুখখানি ঢল ঢল করিতেছে। বালিকা যথার্থই বনবালা, যুবতী-স্বভাব-সুলভ লজ্জা সে মুখে নাই, বিলাসভঙ্গি সে মুখে কিছুমাত্র নাই। ওষ্ঠাধর নির্দ্দোষ-বালিকার উপযুক্ত হাসিতে পূর্ণ। যুবকেরা সেই রমণীয় বনদেবী মূর্ত্তি নিস্তব্ধে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কাহার কি মনে হইতেছিল কে জানে, কিন্তু দেখিলে মনে হয় দুজনেই মুগ্ধ। কুটীরে আর কেহই ছিল না। বালিকা কুটীরের আর একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ হইতে কিছু খাদ্য সামগ্রী আনিয়া তাঁহাদিগকে আহার করিতে অনুরোধ করিল। তাঁহারা দুজনেই খাইতে বসিলেন, কিন্তু প্রমোদ প্রায় কিছুই খাইলেন না। যদিও কিছু পূর্ব্বে তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণায় সমান অবসন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন তাহা তাঁহার ঘুচিয়া গিয়াছিল। ঘোর বিস্ময়ে পড়িয়া তাঁহার হৃদয় এত নানা ভাবে পূর্ণ হইয়াছিল যে তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা সকলি বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

আহারান্তে বনবালা তাঁহাদের নিকট বসিয়া নিতান্ত সরল ভাবে কত কি গল্প করিতে লাগিল! তাঁহারা শুনিলেন, বালিকার পিতা নৈমিষারণ্যে মানৎরক্ষা করিতে গিয়াছেন, রাত্রেই আসিবার কথা আছে। বালিকা বলিল "পিতা যতক্ষণ না আসেন ততক্ষণ তাঁহার অপেক্ষায় আমি থাকিব। আপনাদের জন্য শয্যা প্রস্তুত, আপনারা শ্রান্ত হইয়াছেন ইচ্ছা করিলে এখনি শুইতে পারেন"। বলা বাহুল্য, নিদ্রার নাম গন্ধও এখন তাঁহাদের ছিল না, কিন্তু রমণীর কথায় অগত্যা তাঁহারা রমণী-প্রদর্শিত গৃহে গমন করিলেন।

যামিনীনাথ শীঘ্রই নিদ্রামগ্ন হইলেন, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা-তরঙ্গে প্রমোদের মন আন্দোলিত হইতে লাগিল।

তিনি ভাবিতে লাগিলেন "এ বিপিনে এ রমণী কে? অরণ্যে এ কুসুম কেমন করিয়া ফুটিল। পৃথিবীর দুর্লভ রত্ন এখানে কেন?" এইরূপ চিন্তাতে প্রায় সমস্ত নিশা অবসান হইল। রাত্রিশেষে ক্রমে তাঁহার শ্রমকাতর নয়ন নিমীলিত হইল. তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। যামিনীনাথ যে প্রত্যূষে কখন উঠিয়া গেলেন তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না।

এদিকে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল, তথাপি নীরজার পিতা তীর্থ হইতে ফিরিলেন না। নীরজা কখনও শুইয়া, কখনো বসিয়া, কখনো উদ্যানে গাহিতে গাহিতে বেড়াইয়া রাত্রি কাটাইল। প্রত্যূষে মধুময় সঙ্গীতধ্বনিতে যামিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি বাহিরে আসিয়া দেখিলেন তখনো ঘোর ঘোর, পূর্ব্বগগনে শুকতারা হাসিতেছে, শীতল মৃদু মৃদু বায়ু বহিতেছে, সেই বায়ুর হিল্লোলে সঙ্গীতধ্বনি উথলিত হইয়া গঙ্গার বক্ষ পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিতেছে। যামিনী দেখিলেন কৃষ্ণ মেঘময় আকাশস্থিত একটি তারকার ন্যায় এই আঁধার উদ্যান উজ্জ্বল করিয়া রমণী গাহিয়া বেড়াইতেছে। তাহাকে দেখিয়া যামিনী নিকটে আসিলেন। বালিকা জিজ্ঞাসা করিল "পথিক,কেমন ঘুমাইলে?" যুবা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কিছুক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া বলিলেন "তাহা আর কি বলিব।" রমণী ভুবনমুগ্ধকর সরল হাসি হাসিয়া বলিল "তবে বুঝি এখানে ভাল ঘুম হয় নাই" সেই হাসিতে মুগ্ধ হইয়া যামিনীনাথ বলিলেন "কেমন করিয়া হইবে।" বালিকা বলিল "আমি আরো ভাবিয়াছিলাম—সমস্ত দিনের শ্রান্তির পর সহজেই নিদ্রা আসিবে।" যুবা আর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "নিদ্রা! ঐ রূপরাশি দেখিবার পর কি করিয়া আর নিদ্রা আসিবে।" এই কথায় রমণী ঈষৎ গম্ভীর হইল, ওষ্ঠাধর হইতে হাসির রেখা উবিয়া গেল। রমণী বলিল "রূপ আবার কি?" যুবা এই কথায় যেন আশ্বাসিত হইলেন—কি যেন আশা করিতেছিলেন, সফল হইবার আশা হইল। তিনি বলিলেন "সুন্দরি, সব কি খুলিয়া বলিব—আমার হৃদয় আর আমার নাই—ঐ——রূপ—" এই কথায় বালিকার মুখকান্তি আরো গম্ভীর হইল—সে বলিল "ওরূপ কথা আর বলিও না। আমি এক দিন পিতার সহিত গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলাম—একটি ভদ্র যুবা আমাকে দেখিয়া পিতাকে বলিল, মহাশয়ের কন্যাটি অতি রূপবতী—শুনিয়া পিতা অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন—তুমি ওসব কথা আর কহিও না। তোমার সঙ্গী এতক্ষণ উঠিয়া থাকিবেন। সকাল হইয়াছে, চল দেখিয়া আসি।" এই বলিয়া বালিকা গৃহাভিমুখে গমন করিল। যুবা স্তম্ভিত ভাবে সেই খানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গমনশীল বালিকার প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। বালিকা গৃহে আসিয়া সুষুপ্ত প্রমোদের শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল—দেখিল, প্রমোদের ওষ্ঠাধরে ঈষৎ মৃদু হাসির রেখা, ঈষৎ ভিন্ন-পল্লবযুক্ত নয়নদ্বয় ঈষৎ আবেশময়। বালিকা দেখিল

প্রমোদ কোন সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছেন। সত্যই প্রমোদ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন—যেন আকাশ হইতে একটি তেজোময়ী রমণী নামিয়া তাঁহার শিয়রে, দাঁড়াইল—তিনি আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া তাহাকে ধরিতে হাত বাড়াইলেন, "রমণী বলিল এখন না" বলিয়াই যেন সে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। অমনি যুবার নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রমোদ দেখিলেন সত্যই তাহার শিয়রে সেই দেবীমূর্ত্তি। প্রমোদ বিস্মিতের ন্যায় তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। এই সময় যামিনী গৃহে প্রবেশ করিলেন। যামিনীনাথ দেখিলেন বিস্মিত-নেত্র প্রমোদের প্রতি রমণীর স্থির কটাক্ষ সন্নিবেশিত, সে কটাক্ষ স্নেহময়, সে কটাক্ষ মধুময়, বহ্নিপথবিবিক্ষু পতঙ্গের ন্যায় সে কটাক্ষ রমণী সহজে উঠাইতে অক্ষম। যামিনী সে কটাক্ষে যাহা দেখিলেন তাহাতে তাহার হৃদয়ে অনল জ্বলিল। প্রমোদ যামিনীকে দেখিয়া চমকিত ভাবে উঠিয়া বসিলেন। বালিকারও এতক্ষণে কথা ফুটিল. সে বলিল "বেলা হইয়াছে," তখন প্রমোদ শয্যা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। বালিকাও বাহিরে আসিয়া বলিল "এখন প্রাতঃকাল, এখন পথ চিনিয়া তোমরা স্বচ্ছন্দে যাইতে পারিবে।" যামিনী কিছু উত্তর করিলেন না, প্রমোদ বলিলেন "হাঁ, আজ আমরা এখনি যাইব, তোমাকে কাল কত কষ্ট দিয়াছি তাহার ঠিক নাই। তুমি কাল আশ্রয় না দিলে আমাদের কোন উপায়ই ছিল না, চিরকাল এঋণ আমাদের স্মরণ থাকিবে।" রমণী এই কথায় ঈষৎ লজ্জিত ভাবে বলিল—"অতিথিসৎকারে কষ্ট কি; পিতার সেবায় যেমন আমোদ, অতিথিসৎকারেও তেমনি আমোদ"

প্র। "তোমার পিতা কি কাল আসেন নাই? "তিনি তোমাকে এই অরণ্য মধ্যে রাখিয়া কি প্রকারে দূরে থাকেন—তোমার একাকী থাকিতে ভয় হয় না?"

নী। না। কখনো কখনো তীর্থে দু এক দিনের জন্য গিয়াও পিতা বেশী দিন করিয়া আসেন।"

প্র। তা তোমার ভয় হয় না?

নী। কিসের ভয়? আর পিতা চার পাঁচ দিনের বেশী তো কোথাও থাকেন না। তা ছাড়াও এখানে আমার অনেক সঙ্গী আছে। দুই একটি গরীব দুঃখী কাটুরিয়ারা এই বনে প্রায় প্রত্যহই কাট কাটিতে আসে, তাহারা ক্ষুধাতৃষ্ণা ভাঙ্গিতে প্রায়ই এই কুটীরে আসে। তাহাদের কন্যাদের সহিত আমি অনেক গল্প করি। পিতা কোথাও যাইবার সময় তাহাদের কাহাকেও এখানে রাখিয়া যান, তাহারাই গ্রাম হইতে আমার খাদ্য কিম্বা যখন যা প্রয়োজন আনিয়া দেয়।

প্র। "কই, কাল তো তাহারা কেহই আসে নাই।"

নী। কাল বিকালে তাহাদের একটি পার্ব্বণ ছিল বলিয়া তাহারা কেহই আসে নাই, আজ আসিবে এখন—ঐ যে লক্ষ্মী এসেছে।"

তাঁহারা দেখিলেন দূরে এক ষোড়শবর্ষীয়া হৃষ্টপুষ্ট কৃষ্ণবর্ণ গ্রাম্য কন্যা

আসিতেছে। প্রমোদ সে দিক হইতে নীরজার পানে চক্ষু ফিরাইয়া আবার বলিলেন "একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—আমরা কাল এখানে ছিলাম শুনিয়া তোমার পিতা কি বলিবেন?"

নী। "তিনি কি বলিবেন? নিরাশ্রয় পথহারা ব্যক্তিকে আশ্রয় দিলে তিনি কি বলিবেন? এখানে কত সময় কত পথহারা বিপন্ন কাঠুরিয়াকে আশ্রয় দিয়াছি তিনিতো কখনো কিছু বলেন নাই।" বালিকার সরলতায় প্রমোদের ঈষৎ হাসি আসিল, তিনি একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তবে আমরা চলিলাম, তোমার উপকার কখনো ভুলিব না। যদি আমাদের মত নিরাশ্রয় পথিককে কখনো আশ্রয় দেও তো তখন এই পথিকদের কথা আর এক দিন মনে করিও" বালিকা কোন উত্তর করিল না স্থির নেত্রে প্রমোদের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যামিনীকে প্রমোদ বলিলেন "তবে চল যাওয়া যাক।" যামিনী নীরজার দিকে চাহিয়া বলিলেন "তবে আসি," এই কথা বই আর যামিনী কিছুই বলিলেন না, রমণীও ইহার কোন উত্তর করিল না, সে যেন তখন কি ভাবনা মগ্ন ছিল। প্রমোদ আর একবার প্রশান্ত নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া সেখান হইতে গমন করিলেন।

সাগর-সঙ্গমে।

(গাথা)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মহামায়া কথা-শুনিল বিজয়,
শুনিল বিজয় আনত মুখে
শুনিল বিজয় আটকি নিশ্বাস,
বামেতর হাত চাপিয়ে বুকে।

নিস্তব্ধ বিজয়, নির্বাক বিজয়,
বিজয় পাথর-মূরতি প্রায়,
না সরে বচন, না চলে চরণ,
নয়নে কেবল বিজলি ভায়!

ক্ষণপরে মাথা তুলিয়ে বিজয়,
মহামায়া-প্রতি চাহিয়ে কয়—
(সেই সে বিজলি ঝলকে ঝলকে
পলকে নয়নে উদয় হয়—)

—"দেবী মহামায়া, লইনু বিদায়—
লতেছি বিদায় হরষ-ভরে,
তোমার কুটীর, তোমার দামিনী,
রহিল তোমারি জনম-তরে!

বিজয়ের মুখ দেখিতে হবে না,
শুনিতে হবে না সে নাম আর,
চলিলাম এই গরবের তেজে,
বিষাদের কোন ধারি না ধার।"

বলিয়ে বিজয়—সতেজ হৃদয়,
ছাড়িল কুটির পলক-পরে,
দামিনীর পানে নাহি চাহি আর
চলিল নিজেরি গরব-ভরে।

চলিল আপন গরবেরি ভরে,
যেখানে বহিছে সাগর ঢেউ,
যেখানে কাঁদিলে নয়ন-লহরী
দেখিতে কভু না পাইবে কেউ!

সেই খানে আসি অভাগা বিজয়,
সেই সে বিজন সাগর-কূলে,
ভাবিয়ে হৃদয়ে দামিনীর কথা,
কাঁদিতে লাগিল আপনা ভুলে!

কাঁদিতে লাগিল খুলিয়ে পরাণ,
কাঁদিতে লাগিল অযুত ধারে,—
"আমার দামিনী, সোনার দামিনী,
চলিনু কোথায় ফেলিয়ে তারে—

হৃদয়ের ধন, সরবস্ব ধন,
মৃত-সঞ্জীবনী স্নেহের লতা,
থাক্—সুখে থাক্—আমি ত বিজয়
চলিনু—চলিনু কে জানে কোথা!

এই যে সাগর—অগাধ—অপার,
সমুখে গড়ায় গরব-ভরে—
প্রবেশি কি তায় জুড়াব হৃদয়—
জুড়াব হৃদয় জনম-তরে?"—

কহিয়ে বিজয় ভাবিতে লাগিল,
উঠায়ে প্রলয় মরম-তলে,
কখনো অনল ছুটিছে নয়নে,
আবার অনল নিভিছে জলে।

কভু মোদে আঁখি, ঊর্দ্ধে কভু চায়,
কভু বা নয়ন পড়িছে ঢুলে,
ঊচ্চৈঃস্বরে শেষে গভীর বিজনে
কহিতে লাগিল আপনা-ভুলে—

"কেনই মরিব, কেনই ডুবিব
অপার—অগাধ সাগর-জলে,
জনমের সাধ, জীবনের সাধ
সব(ই) কি ফুরালো এ মহীতলে?

"নাহি কি বাসনা—নাহি কি রে আশা,
হেরিতে সেই সে দামিনী-মুখ?
নাহি কি বাসনা, নাহি কিরে আশা
কখনো জুড়িবে এ ভাঙ্গা বুক?

অয়ি চন্দ্র তারা, অয়ি বিভাবরি!
অয়ি লীলাময় শীতল বায়!
অয়ি তরঙ্গিত অতল সাগর—
দেবি বসুন্ধরে—জননী-প্রায়—

সাক্ষী করি এই তোমাদেরে সবে
বামেতর হাত হৃদয়ে রাখি—
বলিতেছে শুন অভাগা বিজয়
অনলে উজল করিয়ে আঁখি—

সত্য যদি আমি দামিনী-বালারে
ভালবেসে থাকি বিমল মনে—
অবশ্য আবার এই ইহলোকে
মিলিব—মিশিব তাহারি সনে—

যে প্রেমের নাম আত্ম-বিসর্জ্জন,
দেবতাই তার প্রভাব জানে,
অবশ্য তাই রে আবার—আবার—
মিলিব—মিশিব দামিনী সনে!

তবে—তবে আমি কেনই ডুবিব,
কেনই ঝাঁপিব সাগর জলে?
ছেড়ে'ছ কুটীর—ছাড়িনে ত আশা—
লুটাবো দামিনী চরণ-তলে!"

বলিয়ে বিজয়, সতেজ হৃদয়—
রগড়ি ফেলিল নয়ন-নীর,
" দেবী মহামায়া করুণ লাঞ্ছনা,
মরমে মরম রহিল স্থির। "

সাগর বেলায় আলু থালু হোয়ে,
চলিল বিজয় পাগল পারা,
হৃদয়ে বহিছে রুধিরের ধার,
নয়নে বহিছে সলিল ধারা—

পলকে চকিতে নেহারে বিজয়
দাঁড়ায়ে রোহিণী সমুখে তার,
মথুরা-বাসিনী সেই সে রোহিণী—
চিনিতে বাকী না রহিল আর!

কথা না কহিয়ে আনত হইয়ে
বিজয় মুছিল নয়ন ধীরে,
হৃদয়ের কথা, মরমের ব্যথা
যেন না রোহিণী জানিতে পারে।

কিন্তু সে রোহিণী, ডাকিনী রূপিণী,
ভ্রমিবার নয় ভুলের ঘোরে,
সহসা যেন সে বিজয়ে হেরিল,
কহিতে লাগিল ছলনা কোরে,

" বিজয় কুমার, বিজয় কুমার,
মথুরা-নিবাসী বিজয় মম,
কেন কেন হায় সাগর বেলায়
ভ্রমিছে এমন পাগল সম?

তোমার সে রূপ কোথায় লুকালো,
আলু থালু কেন চিকুর কেশ,
কেন ছল ছল নয়ন যুগল,
কেন বাছা এই সুদীন বেশ?

নেহারি তোমায় বুক ফেটে যায়,
এ কি এ দশা বিজয় ওরে!
আয় বুকে রাখি, প্রাণ ভোরে দেখি,
বেড়াস্ নে আর যাতনা ঘোরে। "

বলিয়া রোহিণী, ডাকিনী রূপিণী,
আঁচলে মুছিল নয়ন-ধার,
হৃদয়ে বহিছে গরল লহরী,
রসনে ক্ষরিছে পীযূষ সার।

সহসা যেন রে তাড়িত-প্রভাবে,
সরিয়ে বিজয় দাঁড়ালো পিছে,
কহিল কাতরে " জননী রোহিণী,
আমারে যতন করিছ মিছে।

আমি যে আমি সে—এমনি রহিব,
যতন কেবল যাতনাময়,
মরম-বিজনে গভীর গোপনে
থাকিতেই মম বাসনা হয়।

যাও তবে দেবী, যেথা তব কায,
অভাগার কথা ভেবো না মনে,
যা হই তা হই যেখানেই রই—
নিজের এ মন নিজেরি সনে।"

" সে কি কভু হয় " কহিল রোহিণী,
"আয় বাছা আয় আমার কাছে,
আমি যে তোমার জননী সমান,
কহ রে কি জ্বালা হৃদয়ে আছে।

মথুরা ছাড়িয়ে হেথায় আসিয়ে
কাহার কুটীরে করিলে বাস?
কোথায় ঢোলেছ—কিসেরি কারণে
ফেলিছ অমন গভীর শ্বাস?"

এদিক ওদিক নেহারি বিজয়,
কহিল বিজয় ক্ষণেক পরে—
" দেবী মহামায়া, দেবতা সমান,
আছিলাম আমি তাঁহারি ঘরে।

কি জানি কি ভাবি মহামায়া-দেবী
কুটীরে থাকিতে দিল না আর,
দামিনী—দামিনী—উঃ—সে দামিনী—
দেখিতে পাব না শ্রীমুখ তার!

দেখিতে পাব না শ্রীমুখ তাহার,
শুনিতে পাব না মধুর স্বর,
রোহিণী—রোহিণী—থাকুক ও কথা,
চলিলাম এই তাপস-ঘর।"

ইনিয়ে বিনিয়ে কহিল রোহিণী,
আঁচলে মুছায়ে বিজয় আঁখি,
" পাগল বিজয়! এখনো যে তোর,
জ্ঞানের উদয় হোল না দেখি—

মহামায়া তোরে করেছে বারণ
প্রবেশিতে তাঁর কুটীর দ্বার?
যাক্ সে দাসিনী, যাক্ মহামায়া,
তাদের কি তুই ধারিস ধার?

দেবী মহামায়া কপটের শেষ,
ভড়ঙ্গে কেবল ভুলাতে পারে,
চপল দামিনী চপলা-হৃদয়া,
কিসের কি দুঃখ তাহারি তরে?

এস এস বাছা আমার কুটীরে,
ওদের সহিত কি তব কাজ,
প্রতাপের শোকে ভাঙ্গা এ হৃদয়,
তোরে হেরে আরো ভাঙ্গিল আজ—

ওই মহামায়া, ভাল জানি তাঁয়,
রীত দেখে পতি দিল না স্থান,
দামিনীর পিতা কেবা—কে তা জানে?
নাবালক তুমি কি দিব জ্ঞান?"

" নাবালক আমি—কিবা জ্ঞান দিবে?
রোহিণী—রোহিণী—থাক্ সে জ্ঞান,
আমার দামিনী আমারি দামিনী,
দোষেও আমার-হৃদয়-প্রাণ!

চাহিনা জানিতে কিবা তার দোষ,
চাহিনা জানিতে হৃদয় তার,
ভালবাসি তারে—এই আমি জানি,
চাহিনা জানিতে কিছুই আর !"

" ভাল, ভাল, ভাল, তাই যেন হ'ল "
কহিছে রোহিণী মনের রীশে,
" মহামায়া তোরে তাড়ায়ে যে দিল,
এত অপমান সহিবি কিসে ?

বাসুদেব-সুত মথুরা-নিবাসী,
বিজয় কুমার তুই ত সেই !
এখন কি তোর ও ছার হৃদয়ে
একটু গরব-আভাস নেই ?

আবার আবার দামিনীর নাম,
সহজে আসিছে রসনে তোর,
এতেক লাঞ্ছনা খেয়ে কি এখনো
ভাঙ্গিল না তোর ঘুমের ঘোর ?"

শুনিয়ে বিজয় চমকে অমনি,
পলকে নয়নে অনল ভায়,
আবার—আবার—তখনি আবার
নয়নে সলিল-প্রবাহ ধায়।

ঊর্দ্ধ দিকে করি নয়ন যুগল,
চাপিয়ে দুহাত উরস পরে,
কহিতে লাগিল বিজয় কুমার
গভীর মরম-বিদার স্বরে—

" এই যে হৃদয় দেখিছ, রোহিণী,
কপালের দোষে মমতাময়,
মর্ম্মায় রুধিরে, প্রতি শিরে শিরে,
মমতা-অনল-লহরী বয়।

চেপে চেপে রাখি, আবরণে ঢাকি,
নিভাতে কতই যতন করি,
হৃদি-বিসর্জ্জন করিতেও পণ——
আপনি যখন আপন অরি।

জানি না কি আমি—বুঝি না কি আমি—
মহামায়া তেড়ে দিয়েছে মোরে,
তবুও—তবুও—ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
যেতে সাধ সেই অনল-ঘোরে।

উঠিয়ে পড়িয়ে—যাতনা সহিয়ে,
প্রতিজ্ঞা ক'রেছি কতই বার,
যাক্ মহামায়া দামিনী লইয়ে,
সে কুটীর পানে চাব না আর।

সে কুটীর পানে চাহিব না আর,
জ্বলিয়ে পুড়িয়ে হোক্ তা খাঁক্,
বিজয়ের তাতে কিবা এল গেল,
তাদের কুটীর তাদেরি থাক্—

কই রে তা পারি, নয়নের বারি
আপনি উথলি অমনি ধায়,
আমার দামিনী—সোনার দামিনী—
কেমনে না হেরি থাকিব তায় ?

কি ছার পৃথিবী, কি ছার জনম,
কি ছার হৃদয়, কি ছার প্রাণ,
দামিনীরে যদি দেখিতে না পেনু,
কি ছার নয়ন, কি ছার জ্ঞান !

কিন্তু—কিন্তু বলি, শুন গো রোহিণী,
সাক্ষী রাখি সব দেবতাগণে—
স্বার্থ-শূন্য যদি এ প্রণয় হয়,
আবার মিশিব দামিনী সনে।"

বলিয়ে বিজয় বিজলির প্রায়,
চলিয়ে গেল সে তাপস ঘরে,
অবাক্ রোহিণী মহামায়া কাছে,
গুড়ি গুড়ি গুড়ি আসিল পরে।

আসিয়ে দেখে যে দামিনী-রূপসী,
রূপসী আর ত নহে সে আর,
মলিন হোয়েছে নলিন বয়ান,
শীতের প্রভাত-শশীর প্রায়।

এলায়ে পোড়েছে বসন ভূষণ,
এলায়ে পোড়েছে কবরী রাশ,
নয়নে নাহিক নয়নের জ্যোতি,
শুখায়ে গিয়েছে অধর-হাস !

মহামায়া-কোলে কুসুম-বাগানে,
এলায়ে পোড়েছে কুসুম-বালা,
শরীর জ্বলিছে দাবানল তেজে,
মরমে জ্বলিছে মরম-জ্বালা।

নীরস বদন, নীরস রসন,
শূন্যে শূন্য-দৃষ্টি নয়ন দুটি,
যেখানের হাত পড়িয়ে সেখানে,
গড়ায় কুন্তল ভূমিতে লুটি।

নাহি যেন সাড়া, নাহি যেন প্রাণ,
মদীর ছায়ার প্রতিমা পারা,
বহিছে কেবল ঘন ঘন শ্বাস,
ঝরিছে কেবল নয়নে ধারা।

যাইয়ে রোহিণী হইল উদয়,
কহে মহামায়া কাতর-স্বরে—
"এসছ রোহিণী—বোস গো রোহিণী,
দেখ গো দামিনী কেমন করে !

নাহি কিছু খায়, শুতে নাহি যায়,
আপন ভাবেতে আপনি ভোর,
আপনিই ভাবে, আপনিই কাঁদে,
আপনি বেড়ায় বিজনে ঘোর !

আমারো সে নয়, নিজেরো সে নয়,
জানি না দামিনী কাহার তবে,
শুধাইলে তারে কহে না সে কথা,
আপনি মগন আপন ভাবে।"

শুনিয়ে রোহিণী কাঁপিতে কাঁপিতে,
রোষেতে জ্বলিয়ে কহিতে লাগে,
"শুন মহামায়া, না জানি বিজয়
কি ওষুধ কোরে গিয়েছে ভেগে।

কুটিল কপট বিজয় পিশাচ,
ধরিয়ে তাহারে আন'ত হেথা—
মড় মড় করি ছোলার মতন,
চিবায়ে খাইব তাহার মাথা।"

চমকি উঠিল দামিনী রূপসী,
চমকি উঠিল হৃদয় তার,
এ দিকে ও দিকে হেলায়ে নয়ন
চমকে নেহারে সকল ধার।

যে আগুণ চোখে জ্বোলে উঠে ছিল,
আবার—আবার নিভিয়ে গেল,
যেখানের হাত পড়িল সেখানে,
নয়নের পাতা মুদিয়ে এল।

দেখিয়ে রোহিণী, কহিল অমনি,
"এস গো দামিনী আমার সাথে,
দেখিবে কতই ফুটিয়াছে ফুল,
কেমন জোছানা আজিকে রেতে।

জোছানা মাখিয়ে সাগরের ঢেউ
অদূরে নাচিয়ে বহিয়ে যায়,
বাগানে কুসুম, তারকা-কুসুম
ফুটেছে সাগরে দেখিবি আয়।"

শুনিয়ে দামিনী কহে ধীর বাণি,
ঈষৎ ঈষৎ মেলিয়ে আঁখি,
"নড়িতে আমার নাহি যে শকতি,
শোভার সুষমা দেখিব বা কি!

উঠেছে চাঁদিমা—উঠুক চাঁদিমা,
বহিছে পবন—বহুক বায়,
ফুটেছে কুসুম—ফুটুক কুসুম,
হৃদয় তবুও অসাড় প্রায়!

ফাটিছে মরম—ফাটুক মরম,
নিভিছে পরাণ—নিভুক প্রাণ,
যেতেছি ভাসিয়ে—যাই না ভাসিয়ে,
ফিরাবো না তবু স্রোতের টান।

আমার—আমার—কি আছে আমার,
আছে শুধু এই শরীর খান,
যেতেছে ভাঙ্গিয়ে—যাক্ না ভাঙ্গিয়ে,
কিসের যতন—কিসেরি টান।"

মরি ক্ষতি নাই—মরণই ভাল,
কিন্তু—হা হৃদয়!—মরিলে পরে,
আর যে দেখিতে পাব না—পাব না—
সেই সে আমার———"

কহিতে কাহিতে দামিনীর আঁখি
আপনি যেন রে মুদিয়ে এল,
রসনা যেন রে হইল অবশ,
চেতনা যেন রে নিভিয়ে গেল।

ধরাধরি করি দামিনী বালারে,
নে গেল তাহারা কুটীর-ঘরে,
ঝর ঝর কাঁদে মহামায়া দেবী,
ধরিয়ে বালারে হৃদয় পরে।

ক্রমশঃ গভীর হইল যামিনী,
তবুও দামিনী চেতনা-হারা,
সঘনে কেবল বহে ঘন শ্বাস,
হৃদয়ে রুধির তুফান পারা।

দেখিয়ে রোহিণী ভাবে মনে মনে
"দামিনীর দশা একি রে আজ,
দেবতা জানেন ভাল ভেবে আমি
করিয়ে থাকি ত সকল কাজ।

কি হবে এখানে দাঁড়াইয়ে আর,
রজনী গভীর হইয়ে এল—"
বলিয়ে রোহিণী ভাবিতে ভাবিতে
পাশের সে ঘরে শয়নে গেল।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বীরেন্দ্র চরিতম্। শ্রীমাতঙ্গীচরণ গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রণীত। জ্ঞান রত্নাকর যন্ত্রে মুদ্রিত।

ইহা একখানি সংস্কৃত মহাকাব্য। এই গ্রন্থ হস্তগত হইবামাত্র আমাদের অত্যন্ত হর্ষ উপস্থিত হইল। হর্ষের কারণ এই যে, বহুদিন হইতে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়নে লোকের আর উৎসাহ ও অনুরাগ দৃষ্ট হয় না, এক্ষণে আবার দুই একটী গ্রন্থকার হিন্দু-সমাজের সৌভাগ্যক্রমে উদিত হইতেছেন। এই জন্য এই গ্রন্থখানি সাদরে পাঠ করিলাম। কবিত্ব পূর্ব্বাচার্য্যদিগের সহিত স্বর্গারূঢ় হইয়াছে, এক্ষণে যিনি ভাষার চাতুর্য্য দেখাইতে পারিবেন তিনিই সুলেখক। গোস্বামীমহাশয়ের সংস্কৃত রচনা প্রশংসনীয়, কিন্তু "বিভাবরীকাল ইবেন্দুনা খলু—"এই বাক্যটীর ন্যায় কোন কোন স্থলে রচনায় সংস্কৃতরীতির ব্যতিক্রম হইয়াছে। সুতরাং ইহা বাঙ্গলাগন্ধী পদ্য।

হেলেনা কাব্য—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। (সটীক) শ্রীআনন্দচন্দ্র মিত্র প্রণীত। প্রথম খণ্ড, ময়মনসিংহ—ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১ টাকা। দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা—রায় যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৸০ আনা।

এই হেলেনা কাব্য দুখানি মহাকাব্য। কিন্তু আমাদের মতে এবং পূর্ব্বাপর প্রথা অনুসারে যে বিষয়ের সঙ্গে দেশীয় পুরাণ-ইতিহাসের, দেশীয় আচার ব্যবহারের, দেশীয় ভাবপ্রকৃতির কোন প্রকার নিকট বা দূর সম্পর্ক নাই, সে বিষয় মহাকাব্যের প্রসঙ্গ হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। দ্বিতীয়তঃ হেলেনার মত স্ত্রীলোক—যিনি বিবাহের পূর্ব্বে দশমবর্ষ বয়স হইতে ট্রয়ের ভস্মাবশেষ কালে ষষ্টি বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন আলিঙ্গনে ক্রমাগত আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে মহাকাব্যের নায়িকা করা নিতান্ত অবিধেয়। মহাকাব্যের নায়ক কিম্বা নায়িকা বিশেষ বিশেষ গুণের আদর্শস্থল হওয়া উচিত। বিশেষতঃ যে খানে গ্রন্থকার বলিতেছেন—

" প্রমোদ উদ্যান মাঝে পুষ্পগৃহ-তলে,
দাঁড়ায়ে মলিন বেশে হেলেনা সুন্দরী—
জগতের রূপরাশি,—হায় রে যেমতি
বিন্ধ্যাচলে মহামায়া, পঞ্চবটী বনে
জনম-দুঃখিনী সীতা ; " ইত্যাদি—

সেখানে আমরা গ্রন্থকারকে কোন মতেই সাধুবাদ দিতে পারি না। প্রমোদ-উদ্যানে মলিনবেশা হেলেনার সঙ্গে " বিন্ধ্যাচলে মহামায়া " অথবা " পঞ্চবটী বনে সীতার" ভাবগত, প্রকৃতিগত, কল্পনাগত এমন কোন সৌসাদৃশ্যই নাই যাহার অনুরোধে মহান ভাবের প্রতিমাস্বরূপ " মহামায়া " অথবা ধৈর্য্য এবং সতীত্বের প্রতিমাস্বরূপ সীতার সঙ্গে আমোদপ্রিয় চপলহৃদয়া হেলেনার কোন বিষয়ে তুলনা

করিয়া তাঁহাদিগের অবনতি সাধন করা সুরুচির কায মনে হইতে পারে। যাহা হউক, গ্রন্থকার যে একজন সুমিষ্ট কবিতা-লেখক এবং বাঙ্গালা ভাষার উপর যে তাঁহার দিব্য অধিকার আছে তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি।

ভারতভৈষজ্যতত্ত্ব। প্রথম খণ্ড। শ্রীঅম্বিকাচরণরক্ষিত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। কলিকাতা, চিকিৎসাতত্ত্ব যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১৸০।

এই পুস্তকখানি আমরা বিশেষ সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলাম। দেশীয় গাছগাছড়া হইতে যে কত রোগের কত প্রকার ঔষধি পাওয়া যায় এবং তাহা কি রূপে, কি মাত্রায়, কি প্রকারে প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে হয় তাহা প্রদর্শন করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। ধনী লোকেরা ১৬ টাকা দর্শনী, ব্রহম গাড়ির ঘর্ঘর শব্দ, সোনার চেনের চাকচিক্য ও বিলেতী হাঁস্‌পাতালের চিকিৎসা-প্রথার মোহে যে রূপ সহসা মুগ্ধ হইয়া পড়েন, তাহাতে তাঁহাদের পক্ষে এ পুস্তক খানি ভাল না লাগিলেও লাগিতে পারে। কিন্তু যদি কেহ কখন দেখিয়া থাকেন পল্লিগ্রামের দীন-দুঃখীরা কি রূপ আগ্রহ সহকারে স্ত্রীর রূপার বালাবাজু অথবা খাবার পাথরবাটী পর্য্যন্ত বন্ধক দিয়া গ্রাম্য বিলেতী ঔষধালয় হইতে কলিকাতার উচ্ছিষ্ট ঔষধ কিনিতে যায়, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে অতি দুঃখের সহিত অবগত হইতে পারিবেন যে সেই দীন দুঃখীদের কুটীরের চারিধারেই হয় ত কত প্রকার সুলভ, সহজ এবং চমৎকার ঔষধ সকল রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে।

বীর-কলঙ্ক নাটক। প্রথম খণ্ড। শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র প্রণীত। কলিকাতা, বিডন যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৸০ আনা। মহাভারতের অভিমন্যু-বধ-প্রসঙ্গটি অবলম্বন করিয়া এই বিয়োগান্ত নাটক খানি রচিত হইয়াছে। ইহার এক স্থান উদ্ধৃত করিলেই ইহার সমস্ত পরিচয় দেওয়া হইবে। সপ্তরথী-বেষ্টিত অভিমন্যু যখন তুমুল সংগ্রাম করিয়া হতবল হইয়া পড়িয়াছেন, তখন অভিমন্যুকে লক্ষ্য করিয়া দ্রোণ বলিতেছেন—

"দ্রোণ। তোমার সকল অস্ত্রই গেছে—অবশিষ্ট ঐ অসি। যদি প্রাণের ভয় থাকে ত অবিলম্বে উহা ত্যাগ কর।

অভিমন্যু। প্রাণের ভয় কার আছে তা সকলেই দেখতে পাচ্চে। আর বীরত্ব প্রকাশ কোরতে হবে না, যথেষ্ট হোয়েছে।

* * * * *

দুঃশাসন। এখন মোরতে প্রস্তুত হ।

অভিমন্যু। তথাস্তু! তা তোমাকে কষ্ট পেয়ে বোলতে হবে না। তা আমি অনেক ক্ষণ বুঝতে পেরেছি।"

মুকুট-উদ্ধার। মহাকাব্য। শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় বিরচিত। কলিকাতা, সোমপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১ টাকা।

এই পুস্তক খানি একখানি রূপক মহাকাব্য। রামায়ণের সীতাহরণ, যুদ্ধ ও সীতার উদ্ধার ভাঙ্‌চুর করিয়া যবন কর্ত্তৃক ভারত উৎপীড়নই এই মহাকাব্যে বর্ণিত। গ্রন্থকারের কল্পনা-প্রাচুর্য্য, রচনা প্রণালী, এবং ভাষার সৌন্দর্য্যে আমরা নিতান্ত প্রীত হইয়াছি।

প্রকৃতি এবং তাহার মূল-নিয়ম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উন্নতির নিয়ম।

ইতিপূর্ব্বে উন্নতির একটি সোপান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে মাত্র, এক্ষণে সেই সোপান আরোহণ করিবার প্রণালী প্রদর্শিত হইতেছে। কি সে প্রণালী তাহা যদি অতি সংক্ষেপে—এক কথায়—বলিতে হয়, তবে "সঙ্গ" এই কথাটি বলিলেই সমস্ত বলা হয়। এক জনের যাহা আছে, আর এক জনের তাহা নাই, আবার শেষোক্ত ব্যক্তির যাহা আছে পূর্ব্বোক্তের তাহা নাই—এরূপ স্থলে যদি উভয়ের পরস্পর সঙ্গ-লাভ ঘটে, তবে উভয়েরই অভাব পূরণ হইয়া উভয়ই উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিবে ইহা দেখাই যাইতেছে। প্রতি মনুষ্য যদি আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত হইত, তাহা হইলে তাহার উন্নতি অন্যের সংসর্গের অপেক্ষা রাখিত না, তাহার উন্নতিরই অপেক্ষা থাকিত না, এবং যাহা নিতান্ত অসম্ভব ও অসঙ্গত—মনুষ্য পূর্ণতার পদবীতে আরূঢ় হইত।

কোন মনুষ্য যদি অল্প বয়সে কোন জনশূন্য অরণ্যময় উপদ্বীপে পরিত্যক্ত হয়, তবে তাহার নিকট কতটুকু উন্নতির প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? মনুষ্য যে এমন উন্নত জীব সে-ও ব্যাঘ্রের সংসর্গে ব্যাঘ্রীভূত হইয়াছে—এমনও মধ্যে মধ্যে শুনা গিয়া থাকে। অতএব মনুষ্যের উন্নতির প্রধান কারণ—সঙ্গ।

মনুষ্যের প্রথম সঙ্গ বিষয়ের সহিত। তদ্দ্বারা মনুষ্য কিরূপ উন্নতি লাভ করে, দেখা যাউক্। প্রথমতঃ মনুষ্য অন্যান্য জীব জন্তুদিগের ন্যায় বিষয়-দ্বারা চালিত হয়, পরে বিষয়ের অধীনতা অতিক্রম করিয়া স্বাধীন ভাব ধারণ করে। বিষয় যদি প্রথমে মনুষ্যকে বন্ধন না করে তবে পরে সে-বন্ধন ছেদন করিয়া মনুষ্য যে প্রকৃত পক্ষে মনুষ্য হইবে তাহার সম্ভাবনা থাকে না। বিষয়ের উপর প্রভুত্ব করিয়াই মনুষ্য আপন মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে পারে। বিষয়ের প্রতিকূলেই মনুষ্যের আত্মসত্তা পরিস্ফুট হয়। আত্মার একটা প্রতিপক্ষ চাই—বিষয়ই সেই প্রতিপক্ষ। বিষয়ের নিকট হইতে ভাব গ্রহণ করিয়া যে, আত্মা উন্নতি-লাভ করে তাহা নহে, পরন্তু বিষয়ের প্রতিকূলে আপনার ভাব আপনি উদ্দীপন করিয়াই আত্মা উন্নতি লাভ করে। বিষয়ের যে কি প্রয়োজন এখন তাহা বুঝা যাইতেছে;—বন্ধন অগ্রে, মুক্তি তাহার পরে। বিষয় আত্মার বন্ধন-কর্ত্তা, মোচনকর্ত্তা নহে; আত্মার মোচনকর্ত্তা আত্মা স্বয়ং আপনি। শুক্তির মধ্যে যেমন মুক্তা আছে, সেইরূপ বিষয়-বন্ধনের মধ্যে মনুষ্যের একটি মুক্তভাব আছে, সেই মুক্তভাবই আত্মার প্রাণ, জ্ঞানের প্রাণ। আত্মার সেই মুক্তভাব পরি-

স্ফুট হইবার জন্য একটা প্রতিপক্ষের সহিত সঙ্গ করা তাহার পক্ষে আবশ্যক, বিষয় সেই প্রতিপক্ষ।

বিষয়ের প্রভুত্ব অতিক্রম করিবার প্রথম পদ্ধতি—স্বার্থ-জ্ঞান। স্বার্থ-জ্ঞান কিনা আপনার প্রয়োজন জ্ঞান। বিষয়ের সহিত সঙ্গ করিবার প্রয়োজন কি? না তাহার বিরুদ্ধে চলিয়া আত্মা আপনার বল-পরীক্ষা ও বলসাধন করিবে। আত্মা যে একেবারেই বিষয়-বন্ধনে বদ্ধ হইবে না, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের অর্থ তাহা নহে। প্রথমে ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি নানা কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া প্রকৃতি তাহাকে চালাইয়া লইয়া বেড়াইবে, তাহার পর মনুষ্য সে বন্ধন ছেদন করিয়া—প্রকৃতির চালনায় নহে কিন্তু স্বার্থবোধে—আপনার প্রয়োজন-বোধে—বিষয়-সামগ্রী ব্যবহার করিবে, এই জন্যই পৃথিবীতে তাহার জন্ম। সে প্রয়োজন কি তাহা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি—বিষয়ের প্রতিপক্ষে আত্মার বল সমর্থন করা; বিষয়কে আয়ত্ত করা, বিষয়-কর্ত্তৃক আয়ত্তীকৃত না হওয়া।

মনুষ্য জন্মিবামাত্রই তাহার স্বার্থবোধ হয় না; তখন তাহার "আমি" বোধই নাই, আমার-প্রয়োজন-বোধ কোন্‌খানে থাকিবে? তাহার পরে মনুষ্যের যখন "আমি"-বোধ উৎপন্ন হয় কোথা হইতে হয়? বিষয়-হইতে কি? বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়-ব্যাপার উৎপন্ন হয় এ কথা ঠিক,—কিন্তু আমি-বোধ ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের প্রতিকূল বোধ—প্রত্যক্ বোধ—তাহা কেমন করিয়া বিষয় হইতে উৎপত্তি লাভ করিবে? একই সময়ে একই কারণ হইতে দুই বিরোধী ব্যাপার কেমন করিয়া উৎপন্ন হইবে? একই সময়ে একই বস্তু হইতে আলোক এবং অন্ধকার উভয়েরই উৎপত্তি হইতেছে—একই আঘাত-প্রয়োগ হইতে একই সময়ে দুই বিপরীত-মুখীন গতি উৎপন্ন হইতেছে—ইহা কেহ দেখিয়াছে না শুনিয়াছে না কখনো সম্ভবে! বিষয়-হইতে যখন ইন্দ্রিয়-ক্ষোভ উৎপন্ন হয়, তখন সেই একই সময়ে তাহা হইতে তাহার বিরোধী ব্যাপার উৎপন্ন হইবে—আত্ম-বোধ উৎপন্ন হইবে—ইহা কিরূপ কথা! এখন—আত্মবোধ যে বাস্তবিকই ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের বিরোধী পক্ষ তাহার প্রমাণ কি—এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পার। যদি এমন হইত যে, ইন্দ্রিয়-ব্যাপার যতই উত্তেজিত হয় আত্মবোধ ততই উদ্দীপ্ত হয়, এবং ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের যতই উপশম হয়, আত্মবোধ ততই নরম পড়িয়া আইসে; তবে অবশ্য বলিতে পারিতে যে, আত্মবোধ ইন্দ্রিয়-ব্যাপারেরই দলে; কিন্তু বাস্তবিক কি ঐরূপ হয়? ইন্দ্রিয়-ব্যাপার অত্যন্ত উত্তেজিত হইলে আত্মবোধ কমে না বাড়ে? এবং আত্মবোধের অত্যন্ত স্ফূর্ত্তি হইলে ইন্দ্রিয়-ব্যাপার উত্তেজিত হয়, না দমনে থাকে? কোন্‌টা সত্য? এক পক্ষ প্রবল হইলে অপর পক্ষ দুর্ব্বল হয়, পরীক্ষাতে ত এইরূপই দেখা গিয়া থাকে—ইহার অন্যথা কে কবে পরীক্ষা করিয়াছে? অতএব ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের বিরোধী বোধই—প্রত্যক্ বোধই—আত্মবোধ, ইহাতে আর

ভুল নাই। তাহা যদি হইল তবে ইন্দ্রিয়-ব্যাপার যেমন বিষয় হইতে উৎপন্ন হয়, আত্মবোধ—সেরূপ—বিষয়-হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইতেছে।

আত্মবোধ জন্মিয়া-অবধিই মুক্তির পক্ষপাতী। জ্ঞানের প্রথম সোপান যে, বিষয়-প্রত্যক্ষ, ইহাও আত্মার মুক্তিসাপেক্ষ—ইন্দ্রিয়-ব্যাপার হইতে কতক অংশে মুক্তিলাভ করিলে-পরেই আত্মা বিষয়কে প্রত্যক্ষ করিতে পারে। দর্শন-ব্যাপার শ্রবণ-ব্যাপার প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-ব্যাপার-সকল মনুষ্যের শৈশবাবস্থাতে যেমন, তাহার বয়স হইলেও তেমনি, আমিশ্র ভাবে চলিবারই কথা—পশ্বাদির তাহাই হইয়া থাকে—কিন্তু মনুষ্যের অল্প একটু বয়ঃপ্রাপ্তি হইলেই ইন্দ্রিয়-ব্যাপারকে দমন করত আমি-বোধ জন্ম গ্রহণ করে, এবং সেই "আমি"-বোধের দ্বারা ইন্দ্রিয়-ব্যাপার রূপান্তরিত হয়। আমি-বোধ অগ্রে হইলে তবেই বিষয় সকলকে আপনা হইতে ভিন্ন করিয়া প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। মনুষ্য যত দিন ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের সহিত জড়াইয়া থাকে—তত দিন তাহার আমি-বোধ থাকে না—তত দিন মনুষ্য কোনও বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। মনুষ্য যবে ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের প্রতিকূলে আপনাকে দাঁড় করায়, তখনই তাহার আত্মবোধ এবং বিষয়-বোধ উভয়ই সম্ভূত হয়; ইন্দ্রিয়-ব্যাপার বিষয়ের দলে, আর প্রত্যক্ বোধ আত্মার দলে পতিত হয়, এইরূপে দুই প্রতিপক্ষ উদ্ভূত হয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, বিষয়-বন্ধন হইতে কতক অংশে মুক্ত না হইলে, বিষয়কে প্রত্যক্ষ করা এমন যে সামান্য জ্ঞান, তাহাও সম্ভবে না। এস্থলে এইটি মনে রাখা কর্ত্তব্য যে বিষয়ের সহিত আত্মার যোগবশতঃ নহে পরন্তু বিয়োগ-বশতই বিষয়-প্রত্যক্ষ সম্ভবে। ইন্দ্রিয়-ব্যাপার বটে বিষয়-যোগে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু তাহার প্রতি-যোগেই আত্ম-জ্ঞান এবং বিষয়-প্রত্যক্ষ উভয়ই নিষ্পন্ন হয়।

যদি ইন্দ্রিয়-ব্যাপার আত্মজ্ঞানের বিরোধী তবে তাহাতে কাজ কি? তাহাকে সমূলে নির্ম্মূল কর না কেন—তাহা হইলে আত্ম-জ্ঞান খুব পরিস্ফুট হইবে! ইহার উত্তর এই যে আত্মজ্ঞানের কোন যদি বিরোধী পক্ষ না থাকে তবে সে কাহার প্রতিকূলে আত্ম-সমর্থন করিবে? ইন্দ্রিয়-ব্যাপার সেই বিরোধী-পক্ষ। ইন্দ্রিয়-ব্যাপারই যদি না থাকিল তবে তাহার বিরোধী পক্ষ কিরূপে থাকিবে—আত্মজ্ঞান কিরূপে থাকিবে? ইন্দ্রিয়-ব্যাপার আদবেই না থাকিলে আত্ম-জ্ঞান সম্ভবে না ইহার অর্থ আর কিছু নয়—যোদ্ধব্য না থাকিলে যোদ্ধা সম্ভবে না—এই মাত্র। এক পক্ষ না থাকিলে অপর পক্ষ থাকিতে পারে না বলিয়া তাহাদের মধ্যে যে, উৎপাদ্য উৎপাদক সম্বন্ধ, তাহা নহে; আপনার চির-বিরোধী বস্তুকে কেহ কখন উৎপাদন করিতে পারে? এ বিষয় ইতিপূর্ব্বে যথেষ্ট সপ্রমাণ করিয়াছি—আবার এখানে তাহা চর্ব্বিত চর্ব্বণের প্রয়োজন করে না। তবে এইটুকু আভাস দিয়া রাখিতে চাই যে, জীবাত্মার যদি ইন্দ্রিয়-

ব্যাপারাদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকিত তবে তাহা অপূর্ণ হইত না। পূর্ণ হওয়া এবং একেবারেই না হওয়া সৃষ্ট-বস্তুর পক্ষে উভয়ই সমান। পূর্ণ যিনি তিনি চিরকালই পূর্ণ আছেন এবং পূর্ণ থাকিবেন—সৃষ্ট বস্তু অপূর্ণ না হইলে হইতেই পারে না—সৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্বই অপূর্ণতা-নিবন্ধন—এবং তাহা অপূর্ণ বলিয়াই তাহার উন্নতির প্রয়োজন।

বিষয়কে জ্ঞানায়ত্ত করা, এবং বিষয়-বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া, একই কথা। জ্ঞান প্রকটন দ্বারা ইন্দ্রিয়-ব্যাপার প্রতিরোধ করত বিষয়-বন্ধন হইতে আপনাকে উদ্ধার করিলে-পর তবেই আত্মা বিষয়-সকল প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়; তেমনি আবার জ্ঞান-প্রকটন দ্বারা রিপুর উত্তেজনা প্রভৃতি মানসিকব্যাপার প্রতিরোধ করত মোহ-বন্ধন হইতে আপনাকে উদ্ধার করিলে-পর তবেই আত্মা আপনার সত্তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। ক্রোধের প্রাদুর্ভাব সময়ে তাহার উপর যদি জ্ঞান প্রকটন কর, অর্থাৎ ক্রোধ তোমাকে বিচলিত করিতেছে এইটি সবিশেষ উপলব্ধি কর, দেখিবে যে, ক্রোধ নরম পড়িয়া আসিয়াছে। আপনার অপূর্ণতার প্রতি যদি জ্ঞান প্রকটন কর, অর্থাৎ আমি যে কি অপূর্ণ এইটি সবিশেষ উপলব্ধি কর দেখিবে যে, আত্মার অন্তরাত্মা যিনি পূর্ণ-স্বরূপ তাঁহার অবলম্বন-প্রভাবে আত্মার শূন্য স্থান পূর্ণ হইয়াছে। গ্রীক দেশীয় তত্ত্ববিত্তম সক্রেটিস্ বলিয়াছিলেন যে আমি এই জানি যে, আমি কিছুই জানি না, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞান-বিষয়ে তিনি আপনার অপূর্ণতা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া পূর্ণ-জ্ঞানের অবলম্বনে জ্ঞানতৃপ্ত হইয়াছিলেন। অভাবের প্রতিকূলে ভাব প্রকটন করিয়া, অভাবের অভাব করিয়া, অভাব হইতে মুক্তিলাভ করাই—উন্নতি। রিপুর উত্তেজনায় চালিত না হইয়া—সজ্ঞান ভাবে—স্বার্থ-বোধে—বিষয় ব্যবহার করিলে মনুষ্য সেই উন্নতির প্রথম সোপানে আরূঢ় হয়।

শব-চ্ছেদ।

শব-চ্ছেদ-ক্রিয়া চিকিৎসা-শাস্ত্রের একটী প্রধান অঙ্গ। পূর্ব্বকালে এদেশে কোনপ্রকার শব-চ্ছেদ-ক্রিয়ার প্রচার ছিল কি না, জানিবার জন্য অনেকেই উৎসুক হন। আবার অনেকেরই বিশ্বাস যে, শব-চ্ছেদ-ক্রিয়া এদেশে কস্মিন্ কালেও উদ্ভূত হয় নাই। শবচ্ছেদ করা দূরে থাকুক, ঋষিরা শব স্পর্শও করিতেন না। মৃত শরীর স্পর্শ করিলে অশুচি হইতে হয়, এমন কি মৃত-শরীর-বাহী লোকের সঙ্গে গেলেও অশৌচ হয়।

"নারং স্পৃষ্ট্বাঽস্থি সস্নেহং সচেলং জলমাবিশেৎ।" যদি দৈবাৎ সরস মনুষ্যাস্থি ছোঁয়া পড়ে তবে পরিহিত-বস্ত্র-সমেত জলপ্রবেশ করিবে। এই সকল ব্যবস্থা এদেশের আধুনিক নহে; অতীব পুরাতন। সুতরাং সহজেই বুঝা যাইতেছে যে ঋষিরা শব-চ্ছেদ করিতেন না, যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, সমস্ত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়া গিয়া ছিলেন। তাঁহাদের বুদ্ধি-প্রভা বড়ই তীক্ষ্ণ ছিল, অনুমান-শক্তি অত্যধিক ছিল, ধ্যান-যোগে অধিক সামর্থ্য ছিল অর্থাৎ চিন্তা করিবার ক্ষমতা সর্ব্বাধিক ছিল, তৎপ্রভাবেই তাঁহারা ছেদভেদ না করিয়া শারীর তত্ত্ব লিখিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন।

এরূপ বিশ্বাস অভ্রান্ত নহে। চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি প্রাচীন বৈদ্যক গ্রন্থে এবং যাজ্ঞবল্ক্যীয় ও বাশিষ্ঠ প্রভৃতি যোগ-শাস্ত্রে শারীর তত্ত্বের যেরূপ সত্য-শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়, সেরূপ শৃঙ্খলা ও সেরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম লেখা বিনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে সমাধা হইবার সম্ভাবনা নাই। মৃত শরীর লইয়া অস্থি শিরা স্নায়ু প্রভৃতির অনুসন্ধান করা ও প্রত্যক্ষ করার বিলক্ষণ প্রথা ছিল, পরন্তু তাহা এক্ষণকার প্রথার অনুরূপ নহে। প্রথমে মৃত দেহ কুথিত করিয়া দেখার সৃষ্টি হয়, পরে নানাপ্রকার বিশদ উপায় প্রকটিত হইয়াছে। শব-চ্ছেদ-ক্রিয়াটী এদেশে প্রথমে কি আকারে প্রবর্ত্তিত হয় তাহা বর্ণন করিতেছি।

ভগবান্ ধন্বন্তরি, সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষিকুমারদিগকে মানব-দেহের অন্তর্বাহ্যবর্ত্তী ত্বক্, মাংস, মেদ, বসা, অস্থি, স্নায়ু, শিরা, ধমনী, অস্ত্র ক্ষুদ্রান্ত্র প্রভৃতির আকার, প্রকার, সংস্থান, এবং তত্ত্বাবতের কার্য্য প্রভৃতির উপদেশ সমাপ্ত করিয়া অবশেষে বলিলেন, বৎস সুশ্রুত!

"ত্বক্পর্য্যন্তস্য দেহস্য
যোঽয়মঙ্গবিনিশ্চয়ঃ।
শল্যজ্ঞানাদৃতে নৈষ
বর্ণ্যতেঽঙ্গেষু কেষুচিৎ॥
তস্মান্নিঃসংশয়ং জ্ঞানং
হর্ত্তুা শল্যস্য বাঞ্ছতা।
শোধয়িত্বা মৃতং সম্যক্
দ্রষ্টব্যোঽঙ্গবিনিশ্চয়ঃ॥
প্রত্যক্ষতো হি যদ্দৃষ্টং
শাস্ত্রদৃষ্টঞ্চ তদ্ভবেৎ।
সমাসতস্তদুভয়ং
তুর্য্যোজ্ঞানবিবর্দ্ধনম্॥"

উপরিবর্ত্তী ত্বক্ হইতে আরম্ভ করিয়া শাস্ত্রে যে কিছু অঙ্গ প্রত্যঙ্গগত পদার্থের নির্ণয় আছে, যাহা তোমাকে বলিলাম, এ সকল শল্য-জ্ঞান ব্যতীত বর্ণন করা দুঃসাধ্য। অতএব, যিনি এ বিষয়ের নিঃসংশয়জ্ঞান লাভের বাঞ্ছা করিবেন, শল্য-কার্য্যে অর্থাৎ ছেদভেদাদি কার্য্যে দক্ষ হইতে ইচ্ছা করিবেন। তিনি মৃত দেহ লইয়া তাহা উত্তম রূপে শোধিত করিবেন। অনন্তর শাস্ত্রনির্ণীত পদার্থ সকল প্রত্যক্ষ করিবেন। যাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় এবং শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় তাহাই গ্রাহ্য। যাহা প্রত্যক্ষে দেখা যায় তাহাই শাস্ত্রে জ্ঞাত হওয়া যায় সত্য; কিন্তু

শাস্ত্রে দেখা এবং প্রত্যক্ষে দেখা একত্র হইলেই জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, অন্যথা জ্ঞানের অপূর্ণতা থাকে। অতএব বৎস, সুশ্রুত! প্রত্যক্ষ করিবার জন্য শব-শোধন-ক্রিয়া ব্যবহার করিবে। যথা—

"সমস্তগাত্রম্ অবিষোপহতম্ অদীর্ঘব্যাধিপীড়িতম্ অবর্ষ-শতিকম্ নিঃসৃষ্টান্ত্রপুরীষম্ পুরুষম্ অবহন্ত্যামাপগায়াং নিবদ্ধম্ পঞ্জরস্থম্ মুঞ্জবল্কল-কুশশণাদীনামন্যতমেনাবেষ্টি-তাঙ্গম্ অপ্রকাশে দেশে কোথয়েৎ। সম্যক্ প্রকুথি-তঞ্চোদ্ধৃত্য ততো দেহং সপ্ত-রাত্রাৎ উশীরবালবেণুবল্কল-কূচীনামন্যতমেন শনৈঃ শনৈ-রবঘর্ষয়ন্ ত্বগাদীন্ সর্ব্বা-নেব বাহ্যাভ্যন্তরাঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিশেষান্ যথোক্তান্ লক্ষয়েচ্চ-ক্ষুষা।*

সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠিক্ আছে, বিষের দ্বারা মরণ হয় নাই, দীর্ঘকাল রোগ-ভোগে মরে নাই, অবর্ষশতিক অর্থাৎ দেহটী জরাপ্রভাবে জীর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই, এরূপ একটী মৃতদেহ আহরণ করিয়া উদ-রের অন্ত্র ও পুরীষ বাহির করিয়া ফেলিবে। বহমানা নহে অর্থাৎ স্রোত না থাকে এরূপ কোন এক নদীতে সেই শব বাঁধিয়া রাখিবে। জলে ফেলিবার পূর্ব্বে, শবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল মুঞ্জ নামক তৃণ, কি কুশ, অথবা শণ-বল্কল দ্বারা জড়াইয়া, পশ্চাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার নদীজলে বাঁধিয়া পচা-ইবে। এবম্প্রকারে পচানর নাম কোথন। এই কোথন-ক্রিয়াটী উত্তম ছায়াচ্ছাদিত অপ্রকাশ দেশেই করিবে। যখন দেখিবে, তাহা সম্যক্‌রূপে পচিয়াছে, তখন ৭ দিন অতীত না হয় অর্থাৎ সাত দিনের মধ্যেই তাহা উপরে তুলিবে। অনন্তর উশীর তৃণের কূচী (ব্রস্) অথবা অপক্ক বাঁশের ছালের কূচী প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা অল্পে অল্পে ঘর্ষণ করিবে, আর দেখিতে থাকিবে। এইরূপ করিলে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক বিশেষ বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্তই চক্ষে দেখিতে পাইবে।

পূর্ব্বকালের শব-চ্ছেদ-বিধি এইরূপ, ইহাই ক্রমে বিশদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরন্তু এই শব-চ্ছেদ-বিধি কোন্ সময়ে প্রবর্ত্তিত হয় এবং সুশ্রুত ও ধন্বন্তরি কোন্ সময়ে বর্ত্তমান দিলেন তাহা উত্তম রূপ নির্ণয় হইবার নহে। তবে সন্ধান করিলে এই মাত্র নির্ণীত হয় যে ধন্বন্তরি চতুঃসহস্রাধিক বৎসরেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। যে হেতু ব্যাসকৃত মহাভারত গ্রন্থে ইহাঁর জন্মবিবরণ এবং ইহাঁর চিকিৎসা-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণান্তরে সুশ্রুতেরও পরিচয় পাওয়া যায়; ইনি একজন ঋষিকুমার, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র। সুশ্রুত গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিত আছে যে, এই আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র প্রথমে ব্রহ্মা, প্রজাপতিকে অধ্যয়ন করান, প্রজাপতি অশ্বিনীকুমারদিগকে, পরে ইন্দ্রকে, আমি ইন্দ্রের নিকট শিক্ষা করিয়াছি, লোক-হিতের নিমিত্ত আমি আবার তোমাকে বলি-তেছি। এক্ষণে বিবেচনা কর যে সুশ্রুত কত পুরাতন ব্যক্তি। এক্ষণকার ইতিহাসবেত্তা-দের মত অবলম্বন করিলেও ইনি বহু প্রাচীন হইয়া দাঁড়ান। যথা—

আরবদেশীয় এক খানি ইতিহাস, যাহার নাম "আয়নুল্ অম্বা ফিতবকাতুল অম্বা"। এই গ্রন্থে লিখিত আছে যে, কঙ্ক নামক এক জন ভারতবাসী পণ্ডিত ৬৯৪ শকে অলমন্-সুর বাদশাহের সভায় উপস্থিত হইয়া-ছিলেন। ইনি ঔষধ ও রোগ নিরূপণ বিষয়ে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। ইহাঁর সঙ্গে যে সকল পুস্তক ছিল তন্মধ্যে এক পুস্তক "বিহৎ সিন্দ হিন্দ্," ইহা গণিত শাস্ত্রীয় পুস্তক। অপর এক পুস্তক ছিল, তাহার নাম "সস্রদ্"

বিহৎ সিন্দ হিন্দ এই গ্রন্থখানি সংস্কৃত ব্রহ্মসিদ্ধান্ত পুস্তক হওয়া অতীব সম্ভব এবং দ্বিতীয় পুস্তক খানি ঔষধ ও রোগ-নির্ণায়ক পুস্তক সুতরাং উহা সংস্কৃত সুশ্রুত গ্রন্থ হইবে।

উল্লিখিত গ্রন্থের অন্য এক স্থলে লিখিত আছে যে, ৭০৭।৮ শকে হারূন্ অন্‌রশীদ নামক বাদশাহের উৎকট পীড়া হওয়াতে তিনি ভারতবর্ষ হইতে মঙ্ক নামক একজন বিখ্যাত চিকিৎসককে লইয়া যান। ইহাঁর দ্বারাই তিনি রোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন। এই মঙ্ক আরবদেশে মহামহোপাধ্যায় রূপে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং আরবীক ও পারসীক ভাষাতে অনেক চিকিৎসা গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া দিয়া ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে যে সকল চিকিৎসা-পুস্তক ছিল, তন্মধ্যে "সরক" ও "সস্রদ্" এবং "নিদান" নামক পুস্তক ত্রয়ই প্রধান ছিল।

পাঠকগণ বিবেচনা করুন, সরক সস্রদ ও নিদান এই পুস্তকত্রয় চরক, সুশ্রুত ও নিদান গ্রন্থ হইবার অতীব সম্ভাবনা কি না? যদি তাহা হয়, তবে এই পুস্তকত্রয় ৬০০ শকের বহু পূর্ব্বে রচিত হইবে, সংশয় নাই।

এই সকল দেখিয়া অনুমান হয় যে,

* এই স্থানে "চক্ষুষা চোপায়েন" এই-রূপ পাঠও দৃষ্ট হয়। এপক্ষে চক্ষুষা উপা-য়েন চ লক্ষয়েৎ; অর্থাৎ চক্ষুর দ্বারা দেখিবে এবং তাহাতে উপায় প্রয়োগও করিবে, এইরূপ অর্থ হয়। ঐ পাঠ যদি যথার্থতঃ ধন্বন্তরির মুখ দিয়া নির্গত হইয়া থাকে, তবে, চক্ষুর সঙ্গে কি উপায় প্রয়োগ হইবে তাহা এক্ষণে আমরা বুঝি না। চক্ষুর শক্তি-বৃদ্ধির নিমিত্ত এক্ষণে যেমন কাচ-বিশেষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাই কি? না। না কি হাঁ,—কে বলিতে পারে। সুশ্রুত এক-স্থানে কাচের উল্লেখ করিয়াছেন। "কাচে মণিময়ে তথা।" মহর্ষি গৌতম স্বকৃত সূত্র গ্রন্থে কাচের উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, কাচ স্বচ্ছতা বিষয়ে চাক্ষুষ রশ্মির অনভিভাবক অথবা অপ্রতিবন্ধক। এতদ্ভিন্ন অনেক পুরাতন গ্রন্থে কাচের উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্তু কাচের ব্যবহার-ঘটিত কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। যাহাই হউক, শারীর-শাস্ত্রে যে সকল সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম শিরাতন্তুর বর্ণনা আছে তাহা প্রবল দৃষ্টি ব্যতীত সহজে দৃশ্য হইবার নহে। সুতরাং বুঝাইতেছে তাঁহারা চক্ষুর দৃষ্টি বর্দ্ধনের নিমিত্ত অবশ্য কোন উপায় পরি-জ্ঞাত ছিলেন।

চিকিৎসা-শাস্ত্রটী ভারতবর্ষ হইতে গ্রীসে আরবে যায়, তথা হইতে অন্যান্য দেশে গিয়া রূপান্তরে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে এবং সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ খানিই বর্ত্তমান সর্ব্ব-দেশীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের আদি বীজ।

অনেকের মনে উদিত হইতে পারে, যে চিকিৎসা-শাস্ত্রটী কেবল বৈদ্যজাতিরই হস্তে ছিল। বস্তুতঃ তাহা নহে। সুশ্রুত গ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ে লিখিত আছে যে—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানামন্যতমং অন্বয়-বয়ঃশীলশৌর্য্যশৌচাচারবিনয়শক্তিবলমেধা-ধৃতিস্মৃতিঅতিপ্রতিপত্তিযুক্তং তনুজিহ্বোষ্ঠ-দন্তাগ্রং ঋজুবক্ত্রাক্ষিনাসং প্রসন্নচিত্তবাক্-চেষ্টম্ ক্লেশসহঞ্চ ভিষক্‌শিষ্যমুপানয়েৎ অতো বিপরীতগুণং নোপনয়েৎ।"

যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য সদ্বংশোৎপন্ন হয়, বয়োধিক না হয়, শীল ও শৌর্য্য গুণ থাকে, সদাচারী ও বিনয়ী হয়, কার্য্যশক্তি ও দৈহিক বল থাকে, মেধা ও স্মরণ শক্তি থাকে, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব থাকে, জিহ্বা ওষ্ঠ মোটা না হয় অর্থাৎ তনু (পাতলা) হয়, বক্ত্র চক্ষু নাসিকা দন্ত বক্র না হয় অর্থাৎ যদি ঋজু হয়, যদি প্রসন্ন মন প্রসন্ন বাক্য ও প্রসন্ন চেষ্টা হয়, যদি ক্লেশসহিষ্ণু হয়, তবে ভিষক্ এইরূপ শিষ্যকে অবাধে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দীক্ষিত করিবেন, অন্যথা করিবেন না। ইহারই পরে লিখিত আছে যে, "উপনীয়স্তু ব্রাহ্মণঃ প্রশস্তেষু তিথিকরণমুহূর্ত্তনক্ষত্রেষু" এস্থলেও ব্রাহ্মণ-শিষ্যের উল্লেখ আছে। অতএব, পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরাই সর্ব্ব বিদ্যার আশ্রয় ছিলেন, কালক্রমে বৈদ্যনামক স্বতন্ত্র শ্রেণী বা জাতি হওয়াতে ব্রাহ্মণেরা চিকিৎসা-ব্যবসা পরিত্যাগ করেন এবং ব্যবস্থা প্রচার করিয়া দেন যে "ব্রাহ্মণং ভিষজং দৃষ্ট্বা সচেলং জলমাবিশেৎ।" ব্রাহ্মণ-চিকিৎসকের মুখ দেখিলে বস্ত্রসহ স্নান করিতে হয়। এই রহস্য দ্বারাও নির্ণয় হইতেছে যে, সুশ্রুত গ্রন্থ খানি এ দেশের অত্যন্ত পুরাতন। এমন কি মহাভারতাদি গ্রন্থ অপেক্ষাও পুরাতন।

কালীবর বেদান্তবাগীশ।

ছিন্ন মুকুল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মোহ-মুগ্ধ।

যুবকেরা বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন—কিন্তু অন্য দিনের ন্যায় সেদিন পরস্পরে কথোপকথন চলিল না। দুজনেই আপন মনে থাকিয়া নিস্তব্ধ ভাবেই প্রায় কাটাইল।

আশ্চর্য্য, পূর্ব্বদিনকার ঘটনার কথা লইয়া কোথা দুজনার গল্প থামিবে না—না দুজনেই আজ নিস্তব্ধ, দুজনেই চিন্তামগ্ন। কিন্তু কেহ মনোনিবেশ পূর্ব্বক উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে দেখিতে পাইতেন যে তাহাদের উভয়ের সেই নিস্তব্ধ মুখমণ্ডল পরস্পর কেমন ভিন্ন-ভাব-ব্যঞ্জক। প্রমোদ, গম্ভীর—প্রশান্ত—যেন বহির্জগতের সহিত তাঁর কোন সম্পর্ক নাই—চক্ষে যেন দৃষ্টি নাই—মুখে প্রফুল্লতা নাই; আর যামিনীনাথের অধীর ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাসে যেন অনল বহিতেছে—কখনো কখনো (কিসের ভাবে কে জানে) তাঁহার ওষ্ঠাধর আহ্লাদে কাঁপিয়া উঠিতেছে—আবার কখনো যেন কোন আশার নিষ্ফলতা ভাবিয়া ভ্রূযুগ কুঞ্চিত হইয়া পড়িতেছে। উভয়ের মনে-মনেই চিন্তা-স্রোত বহিয়া যাইতেছে—কিন্তু কেহই কাহারো নিকট আপন মনোভাব প্রকাশ করিতেছেন না। এক জন ভাব-প্রকাশ বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক, আর একজন ভাব-প্রকাশ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক।

এই রূপেই প্রায় সে দিনটি কাটিল। অল্প দুটি-একটি সামান্য কথা ছাড়া—তাঁদের কোন কথাই হইল না। দুজনের কেহই পূর্ব্বদিনকার কথা তুলিলেন না। প্রমোদের এক একবার সে কথার প্রসঙ্গ করিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হইতে লাগিল, তিনি সে বিষয়ের দুই একটি কথা তুলিলেন—কিন্তু তাহাতে যামিনীনাথকে নিরুত্তর দেখিয়া আপনা হইতেই আবার প্রমোদ থামিয়া গেলেন। ক্রমে সে দিনটি এক রূপে কাটিল। পরদিন তাঁহাদের কানপুর ছাড়িবার কথা ছিল—কিন্তু দুজনেই পরস্পর কি মনে ভাবিয়া সেদিনও যাওয়া বন্ধ করিয়া তাহার পরদিন যাওয়া স্থির করিলেন—কিন্তু সেই দিনও সেই নিস্তব্ধভাব তাঁহারদিগকে পরিত্যাগ করিল না। অপরাহ্নে প্রমোদ বন্ধুকে কিছু না বলিয়া, চিন্তাভারাক্রান্ত মনকে শান্তিদান করিতে, সুদৃশ্য ভাগীরথী-তীরে আগমন করিলেন। সেখানে আসিয়া দেখিলেন, পরপারেই সেই অরণ্য—সেই বনদেবীর বাসস্থান। অরণ্য দৃষ্টে প্রমোদ যেন কত কি ভাবে এক প্রকার অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ভাবিতে ভাবিতে তিনি যে সেতু পার হইয়া সেই অরণ্যের দিকে চলিতে লাগিলেন—তাহা তখন নিজেই বুঝিতে পারিলেন না। মন্ত্র-মুগ্ধ হরিণের মত তাড়িৎ-প্রভাবেই তিনি যেন পদে পদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অরণ্যে আসিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিল—কিন্তু তখন আর ফিরিয়া যাইতে পা উঠিল না—কি এক প্রবল ইচ্ছায় অভিভূত হইয়া সেই জঙ্গল মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা হইলে আবার যে পথহারা হইয়া বিপদে পড়িতে পারেন, তাহা ভুলিয়া গিয়া অনেক ক্ষণ একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাহাকে মনে মনে খুজিতে ছিলেন, তাহাকে পাইলেন না। রাত্রে যে পথ দিয়া কুটীরে গিয়াছিলেন, অনেক করিয়া সে পথে গিয়া দূর হইতে কুটীরটি দেখিতে পাইলেন—আবার মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় দূর হইতে তাহার পানে চাহিয়াই রহিলেন—কিন্তু তাহার নিকট যা-

ইতে সাহস হইল না। একটি কেমন লজ্জার ভাবে—একটি কেমন সঙ্কোচ ভাবে তাঁহার পদ আটকিয়া গেল। ক্রমে আবার সন্ধ্যা হইয়া আসিল—কিন্তু প্রমোদের সে জ্ঞান নাই, প্রমোদ কুটীর হইতে দৃষ্টি উঠাইতে অক্ষম, প্রতিক্ষণে তাঁহার মনে হইতে লাগিল এখনি একটি দেবী-প্রতিমা কুটীর হইতে নির্গত হইয়া তাঁহার চক্ষুকে কৃতার্থ করিবে, পাছে দৃষ্টি ফিরাইলে সেই অবকাশে সেই প্রতিমা কুটীর হইতে চলিয়া যায়—তিনি আর দেখিতে না পান, এই তাঁর ভয়। কিন্তু সময় কাহারো মনের ভাব বোঝে না—সময় কাহারো জন্য অপেক্ষা করে না—আজ প্রমোদের মনের ভাব বুঝিবে কেন? ক্রমে সন্ধ্যা আপন আঁধারময় আবরণে চারিদিক ঢাকিয়া ফেলিল—কুটীরখানি ক্রমে প্রমোদের দৃষ্টি হইতে অন্তর্ধ্যান হইল। তখন প্রমোদ হতাশ চিত্তে শূন্যমনে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সহসা পূর্ব্বদিনকার মত গীতধ্বনিতে আকাশ কাঁপিয়া উঠিল—প্রমোদের হৃদয়-তন্ত্রীও বাজিয়া উঠিল। প্রমোদ দেখিলেন—সেই বনদেবী দেখিতে দেখিতে তাঁহারি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন—আহ্লাদে প্রমোদের বাক্য রহিত হইল—নিস্পন্দভাবে প্রমোদ দাঁড়াইয়া রহিলেন। রমণী প্রমোদের নিকটস্থ একটি বৃক্ষতলে বসিবার মানসে আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল—কিন্তু আজও সেখানে প্রমোদকে দেখিয়া বলিল "একি, আজও যে এখানে?" প্রমোদ কি উত্তর দিবেন! আসিয়াছেন বলিয়া মনে মনে আপনা আপনি অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। নীরজা আবার বলিল "কালকের মত কি আজও পথ হারা হয়ে পড়েছ? কুটীর তো নিকটেই—এস তবে বিশ্রাম করিবে।" প্রমোদ লজ্জিত ভাবে বলিল "না, আজ আমার কোন পরিশ্রম হয় নাই—আমি বেড়াতে এসেছিলাম, এখনি গৃহে যাব।"

নী। "তা হোক না—কুটীরে আজ গেলে পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।" এই কথায় প্রমোদের মনের ভাব কি হইল—কি জানি—কিন্তু প্রমোদ বলিলেন "তোমাদের কুটীরে? না, না, আমি ফিরে যাই—তুমিও এই বেলা গৃহে যাও।"

নী। "কেন?"

প্র। "আঁধার হ'য়ে এসেছে—এই বিজন বনে একাকী ভয় পেলে বড় বিপদে পড়িতে পার। কিন্তু যে আঁধার হয়ে এসেছে—একাকী কি যেতে পারবে—আমি কি রাখিয়া আসিব?"

নী। "ভয় করিবে কেন। ছেলে বেলা হ'তে এই বনে আছি—এখানে আমার ভয় করে না—অমাবস্যার রাত্রেও একাকী আমি এই বনে বেড়াই। পিতা কুটীরে অনেক সময় শাস্ত্রপাঠে নিমগ্ন থাকেন—আর আমি কখনো—এই শিরীষ-তলায়—কখনো এই অশোক-তলায়, কখনো ঐ ঝুমকা-লতা-মণ্ডপে আপন মনে গান গাইয়া বেড়াই। পাঠ সমাপ্তে পিতা যখন ডাকেন তখন ফিরিয়া যাই। আমার ভয় করিবে কেন? এস, বরং তোমাকে আমার স্বহস্তরোপিত সব গাছ গুলি দেখাইয়া আনি।"

প্র। "তোমার পিতা ডাকিলে কি দূর হইতে শুনিতে পাইবে?"

নী। "আমি যেখানেই যাই—তা শুনিতে পাইব। এস, ঐ লতামণ্ডপ মধ্যে কেমন পাতার বিছানায় একটী বউ-কথাকওকে শুইয়া রাখিয়াছি—দেখিয়ে আনি।"

প্র। "বউকথাকওটি তোমার কি অত পোষা হইয়াছে?"

নী। "না—এটি পোষা নয়। আহা, আজ সকালে ঐ ছানাটি গাছ হ'তে উড়ে প'ড়ে গিয়াছিল—তাই তাকে অমন যত্নে রেখেছি।"

প্র। "চল, কিন্তু ভয় হয়—পাছে তোমার পিতা ডাকিলে শুনিতে না পাও।"

প্রমোদ তখন নীরজার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন—নীরজা সেই নিস্তব্ধ নৈশ-গগন চমকিত করিয়া গান গাইতে গাইতে পথ দেখাইয়া চলিল—

নিঃঝুম নিঃঝুম গম্ভীর রাতে,
কম্পিত পল্লব দক্ষিণবাতে,
পেখল'সজনি—সতিমির রজনী,
অম্বরে ন চন্দ্র তারকা ভাতে,
ঝিল্লি-ধ্বনি-কৃত, নিকুঞ্জ মোদিত,
কলয়ত জাহ্নবী মৃদুল প্রপাতে।

প্রমোদের শরীর হর্ষবিহ্বল লোমাঞ্চিত হইল—প্রমোদ ভাবিলেন "এই অরণ্যটিই কেন সমস্ত পৃথিবী হইল না? এই দুইটি জীবন বই আর পৃথিবীতে জীবন রহিল কেন?" সহসা পশ্চাৎ দিকে কাহার পদ-শব্দে তাঁহার সে চিন্তা ভঙ্গ হইল—তিনি মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন—একটী সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী নীরজার নিকট আসিলেন—নীরজার তখন গান বন্ধ হইল—সন্ন্যাসী ঈষৎ তীব্র স্বরে বলিলেন "তোমাকে এত ডাকিয়া ডাকিয়া আজ উত্তর পাইলাম না কেন? আজ এত অন্যমনস্ক কিসের জন্য? আমার আহারের সময় হইয়াছে, এস গৃহে এস—?" প্রমোদ লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িলেন—নীরজাও কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইল। কিন্তু নীরজা বনবালা, তাহার সে-ভাব অধিক ক্ষণ রহিল না—সরল ভাবে পিতাকে বলিল "কে জানে কেমন অন্যমনে ছিলাম—তোমার ডাক আজ শুনিতে পাই নাই—পিতঃ! তুমি কি অনেক ক্ষণ হইতে ডাকছ?" কন্যার কাতরভাবে সন্ন্যাসী স্বাভাবিক নরম স্বরে বলিলেন "না, আমি বেশীক্ষণ ডাকি নাই—ও যুবাটি কে?" নীরজা বলিল "সেই যে সেদিন পথহারা হইয়া দুজন পথিক এখানে আশ্রয় লইয়াছিলেন, যাঁহাদের কথা আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম—ইনি তাহারি মধ্যে একজন। প্রমোদকে আমি তোমার সহিত দেখা করাইতে কুটীরে লইয়া যাইতেছিলাম।"

তখন প্রমোদ বলিলেন "মহাশয়, ইনিই সে দিন বনদেবী হইয়া আমাদের আশ্রয় দিয়াছিলেন—নহিলে এই জঙ্গল মধ্যে সমস্ত রাত কাটাইতে হইত, ইহাঁর নিকট আমরা ঋণী।"

সন্ন্যাসী বলিলেন "নীরজা সন্ন্যাসী-কন্যা—অতিথি-সৎকারই উহার ধর্ম্ম। নী-

রজা কর্ত্তব্য কাজ করিয়াছে, সেজন্য তোমরা কেন ঋণী হইবে—সে যাহা হউক, আজও কি শীকার অভিপ্রায়ে আসিয়াছিলে?" প্রমোদ একটু লজ্জিত ভাবে ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "না, আজ বেড়াইতেই আসিয়াছি।"

স। "আজও যে রাত হইয়া পড়িয়াছে—কুটীরে থাকিলে হয় না?" এই কথায় নীরজা ব্যগ্রভাবে প্রমোদকে বলিল "চল, তবে কুটীরেই চল—এত রাত্রে কি করিয়া বাড়ী যাইবে?" কিন্তু প্রমোদ ইহাতে অসম্মত হইলেন, ভাবিলেন তাহা হইলে যামিনীনাথ বড়ই চিন্তিত হইবে—সমস্ত রাত তাঁহার অন্বেষণ করিবে। সন্ন্যাসী বলিলেন "কিন্তু এত রাত্রে তোমাকে কিছু না খাওয়াইয়া আমি যাইতে দিতে পারি না—তাহা হইলে আমার নিয়ম ভঙ্গ হয়—অতিথি-সৎকারই আমার ব্রত।" এই কথায় তখন আর প্রমোদ কিছু না বলিয়া সন্ন্যাসীর সহিত কুটীরাভিমুখে গমন করিলেন। নীরজা প্রফুল্লচিত্ত বিহঙ্গীর ন্যায় আগে আগে যাইতে যাইতে গান ধরিল—

"আয় আয় আয়, কে আছিস তোরা,
মরম ব্যথায় যার—
দিবস রজনী পড়িছে বিফলে,
নয়ন-সলিল-ধার॥
কাতর হৃদয়ে, কাঁদিছে যেজন,
হারায়ে বিভব মান—
হতাশ প্রেমের হুতাশে সদাই,
জ্বলিছে যাহার প্রাণ,
কাঁদিতে হবে না, যাতনা রবেনা,
রবেনা ভাবনা-ভার,
আয় আয় আয়, কে আছিস তোরা,
খোলা এ কুটীর দ্বার॥"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—বিদায়।

গান গাইতে গাইতে নীরজা সহসা থামিল। তাহার পার্শ্বস্থ একটি বটবৃক্ষ তল হইতে হঠাৎ কোন মনুষ্যের চঞ্চল পদ-নিক্ষেপ-শব্দ তাহার কর্ণে যাওয়াতে সে চমকিত হইয়া সেইখানে দাঁড়াইল—অমনি যেন বৃক্ষতল হইতে একটি মনুষ্যকে অপসারিত হইতে সে দেখিতে পাইল। হঠাৎ নীরজার ঐরূপ ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসান্তে সন্ন্যাসীরা কারণ শ্রবণে দুজনেই কিছুক্ষণ ধরিয়া বৃক্ষতল অন্বেষণ করিলেন—কিন্তু কিছুই না দেখিয়া নীরজার ভ্রম বুঝিয়া আবার কুটীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কুটীরে পঁহুছিয়া আহারান্তে সন্ন্যাসী প্রমোদকে তাহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সকল শুনিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—"কানপুরে কেন আসা হইল।"

প্র। "পূজার ছুটীতে বেড়াইতে আসিয়াছি।"

স। "কতদিন এখানে থাকা হইবে?" প্রমোদ একটু থামিয়া থামিয়া বলিলেন, "আর ৬। ৭ দিনের মধ্যে আমাদের কলেজ খুলিবে, কাজেই আর বেশীদিন এখানে থাকিতে পারিতেছি না। কালই নিশ্চয় আমাদের কানপুর ছাড়িতে হইবে। কলিকাতা যাইবার আগে আমায় আবার বাড়ী

গিয়া দুই চার দিন থাকিতেই হইবে—নহিলে—" এই সময় নীরজা বলিয়া উঠিল—"আমার বউকথাকওটি তোমাকে দেখান হইল না—তুমি কি আর আসিবে না?" প্রমোদ এই কথায় একটু হাসিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসীও সেই কথায় একটু হাসিলেন, কিন্তু কিছু পরেই আবার সে হাসি বিষাদরূপে পরিণত হইল, সন্ন্যাসীর মুখকান্তি গম্ভীর হইয়া পড়িল প্রমোদ বালিকার পানে চাহিয়া আপন মনে মনে কথা কহিতে কহিতে অজ্ঞাত ভাবে আস্তে আস্তে বলিলেন—"এমন সরলা আর একটীও দেখি নাই"—এই কথাটি যদিও প্রমোদ অতি আস্তে বলিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা সন্ন্যাসীর কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি বলিয়া উঠিলেন—"সত্য—এমন সরলা আর নাই—কিন্তু ইহার উপযুক্ত পাত্র কোথায়? যোগ্য পাত্রে অর্পণ করিয়া হরিদ্বারে যাওয়া কি আমার ঘটিবে?" শুনিয়া নীরজা বালা-ভাব ছাড়িয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—"পিতঃ, হরিদ্বারে আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে না? আমি সঙ্গে যাইব।—হরিদ্বার কতদূর?"

স। "অনেক দূর।" নীরজা এই কথায় ব্যাকুল ভাবে প্রমোদের দিকে চাহিয়া বলিল—"হরিদ্বার দূর হইলেও কি তুমি এইরূপ বেড়াইতে আসিতে?" সন্ন্যাসী এই কথায় নীরজার প্রতি চাহিলেন—কি ভাবে এই কথাটি তাহার অন্তরতল হইতে বাহির হইল—তিনি তাহা যেন জানিতে চেষ্টা করিলেন। যে একটা ভাবে সমস্ত পৃথিবী মুগ্ধ, সমস্ত দেবগণ মুগ্ধ, যে একটি ভাবে সমস্ত জগৎ সংসার চলিতেছে, সন্ন্যাসী দেখিতে চাহিলেন—নীরজার ঐ ব্যাকুলতা সেই ভাবের অঙ্কুর কি না? কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলেন না, নীরজার কথায় প্রমোদ বলিলেন "হরিদ্বার কতই বা দূর?"

নী। "না, না, ততদূর যাইতে তোমার কষ্ট হইত—না?" প্রমোদ একটু হাসি ছাড়া ইহার উত্তর করিলেন না—সন্ন্যাসী ও কথা বন্ধ করিবার জন্য বলিলেন "নীরজ, তোকে রেখে কি আর আমি হরিদ্বার যাইব? তোর আগে বিবাহ হউক। কিন্তু তাহা হইলেই কি যাইতে পারিব? উঃ মায়ার কি দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ—জানিতেছি কিছুই কিছু না—জানিতেছি চক্ষু বুজিলে সেই পরব্রহ্ম বই আর গতি নাই—জানিতেছি যে চক্ষু বুজিবার সময়ও অগ্রসর,

তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়াপ্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণঃ॥"

বলিয়া সন্ন্যাসী চক্ষু নিমীলিত করিলেন, দুই এক বিন্দু অশ্রুবারি তাঁহার গণ্ড বাহিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত হইবার পর—প্রমোদ গৃহে যাইবার নিমিত্ত বিদায় প্রার্থনা করিলেন। তখন সন্ন্যাসী প্রমোদের পথ চিনিয়া যাইতে কষ্ট হইতে পারে বলিয়া স্বয়ং পথপ্রদর্শক হইবার ইচ্ছায় উঠিলেন। নীরজাও সঙ্গে আসিতে চাহিল, কিন্তু সন্ন্যাসী নিষেধ করিয়া বলিলেন "কাল প্রাতে আমাকে নৈমিষারণ্যে যাইতে হইবে—তোমায় খুব রাত থাকিতে উঠিতে হইবে—শুইতে আর বিলম্ব করিও

না।” নীরজা ইহাতে কিছু ক্ষুণ্ণ হইল, কিন্তু পিতার কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া শয়ন করিতে গমন করিল।

সেই দিন রাত্রে প্রমোদ বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, যামিনীনাথ সেখানে নাই। ভৃত্যের নিকট শুনিলেন, অপরাহ্নে কলিকাতার এক পত্র পাইয়া বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ সেই রাত্রেই তাঁহাকে কলিকাতায় যাইতে হইয়াছে।

একাকী প্রমোদ সেখানে সে রাত্রি কাটাইয়া পরদিন তিনিও এলাহাবাদে বাটী যাত্রা করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—কনকলতা।

এইখানে আমরা কনকের কথা কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কনক এখন পঞ্চদশ বর্ষীয়া, কিন্তু তাহার এখনো বিবাহ হয় নাই। সুশীলা প্রমোদের, দুজনেরই বাল্যবিবাহে বিশেষ ঘৃণা ছিল বলিয়া কনকের এখনো তাঁহারা বিবাহ দেন নাই। কনক সেই বাল্যকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত ভালবাসা বই কিছুই জানে না, অপ্রকাশ্য ভাবে নীরবে চুপে চুপে হৃদয়ের নিভৃত বিজনে সুশীলা এবং ভাইটিকে লুকাইয়া লুকাইয়া ভালবাসে—তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানির সমস্তই ভালবাসায় পূর্ণ। তাঁহাদের পায়ে কাঁটা ফুটিলে সে বুক পাতিয়া দিতে ইচ্ছা করে। যতদিন প্রমোদ কলিকাতায় থাকিতেন, ততদিন অত্যন্ত কষ্টে কনকের দিন যাইত, কবে ছুটীতে তিনি বাড়ী আসিবেন সে তাহারি কেবল দিন গণিত। এবং ইহার মধ্যে ভ্রাতার জন্য মোজা, গলাবন্ধ কতই বুনিত। ভাইটি আসিলে কি করিয়া তাহাকে যত্ন ও আদর করিবে, সে বিষয়ে কতই যে কল্পনা করিত তাহার ঠিক নাই। কিন্তু সে বিষয়ে তাহার কল্পনা করাই সার হইত—কনক মুখ ফুটিয়া কোন কথা দ্বারা প্রমোদকে কখনো এ পর্য্যন্ত আদর করিতে সাহসী হয় নাই, হাজার ইচ্ছা করিলেও সে তাহা পারিত না। তবে কনকের সকল কার্য্যেই, কনকের একটি ক্ষুদ্র কথাতেও তাহার মনের প্রগাঢ় স্নেহভাব প্রকাশ পাইত। কনক সর্ব্বদাই প্রমোদকে পত্র লিখিত, কিন্তু সময়াভাবে প্রমোদ কনকের সকল পত্রের উত্তর দিতে পারিতেন না। আপনার দশ খানির উত্তরে কনক দু এক খানি যাহা পাইত, তাহাতেই তাহার আহ্লাদ ধরিত না। প্রমোদ ভগিনীর সেই নিঃস্বার্থ ভালবাসা কিছুই বুঝিতেন না। তবে সর্ব্ব প্রথমে যখন বাড়ী হইতে কালকাতায় পড়িতে আসেন, তখন প্রথম বিদেশে আসিয়া সে স্নেহের অভাব কিছু বুঝিয়াছিলেন। কলিকাতায় প্রথমে আসিয়া প্রমোদ দেখিলেন, এখানে আর তিনি খাইতে ভাল বাসেন বলিয়া কেহ যত্নে বাদাম কুড়াইয়া আনিয়া দেয় না, যত্নে তাঁহার পড়িবার বই গুলি কেহ গুছাইয়া রাখে না— তাঁহার বিষণ্ণ মুখ দেখিলে কেহ কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করে না, কেহ আর কাতর ভাবে তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া থাকে না—তাঁহার কষ্টে কেহ ভ্রুক্ষেপও করে না। প্রমোদ তখন

তাঁহার ভগিনীর স্নেহ বুঝিতে পারিলেন—স্নেহের অভাব কি ভয়ানক, বুঝিতে পারিলেন। আগে কত সময় কনককে কত মর্ম্মে আঘাত দিয়াছেন, বিষণ্ণ প্রমোদকে কনক কাতর ভাবে সান্ত্বনা করিতে আসিলে, প্রমোদ বিরক্ত ভাবে উঠিয়া গিয়া তাহাকে কত মর্ম্মপীড়া দিয়াছেন, আদর করিয়া খাওয়াইতে আসিলে কতবার হাত ছুড়িয়া ফেলিয়া কনককে কাঁদাইয়াছেন—তাহার ভালবাসার প্রতিদানে বিরক্তি ও তাচ্ছিল্য উপহার দিয়া তাহাকে কত কষ্ট দিয়াছেন—কাছে থাকিতে প্রমোদের তখন এ সকল কিছুই মনে হয় নাই—এখন সহসা অপরিচিতের মধ্যে আসিয়া স্নেহের অভাব বুঝিয়া প্রমোদের এই সকল বাল্য-কথা মনে পড়িল। প্রমোদের জন্য কনক কত সময় কত করিত, সেই সকল ঘটনা তখন কিছুই মনে হইত না—এখন প্রমোদের সে সকল ঘটনা অনেক মনে পড়িতে লাগিল। কি করিয়া ভ্রাতার দোষ ভ্রাতার অজ্ঞাতভাবে আপন স্কন্ধে লইয়া কনক প্রমোদকে সুশীলার নিকট নির্দ্দোষী করিত, কত সময় সেই জন্য কনক কত কষ্ট পাইত, প্রমোদের তাহা মনে পড়িল। তাঁহার মনে পড়িল এক দিন বৃষ্টির পর তাঁহারা ভ্রাতা ভগিনীতে সেই বৃষ্টির জলে উদ্যানে খেলা করিতেছিলেন, হঠাৎ বাতায়ন হইতে সুশীলা তাহা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ডাকিলেন, প্রমোদ তাঁহার নিকট যাইতে যাইতে আবার যাইতে অনিচ্ছুক হইয়া অন্য স্থানে পলাইয়া গেল, প্রমোদের পলায়নে কনক হৃষ্টচিত্তে একাকী সুশীলার নিকট গেল। কনকের সন্তুষ্টির কারণ তখন প্রমোদ বুঝিতে পারেন নাই—তাহার পর বুঝিলেন যে কনক এখন একাকী গেলে, তাহার উপর দিয়াই যাহা ঝড় বহিবার বহিয়াই ক্ষান্ত হইয়া যাইবে, প্রমোদের আর কোন কষ্ট পাইতে হইবে না—এই মনে করিয়াই কনক আহ্লাদপূর্ণ হইয়াছিল। আপন পৃষ্ঠে শাস্তি লইয়া ভ্রাতাকে বাঁচাইতে পারিল বলিয়া কনকের যে প্রচুর আহ্লাদ হইয়াছিল—তাহা প্রমোদের মনে পড়িল। এইরূপ কত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নেহময় ঘটনা তখন প্রমোদের মনে পড়িতে লাগিল। তখন কনকের ভালবাসা তাঁহার নিকট অমূল্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আপনার সমস্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার মনে পড়িয়া প্রমোদের অনুতাপ হইতে লাগিল। ভাবিলেন—এবার বাড়ী গিয়া আর কনককে কষ্ট দিবেন না। ক্রমে দিনকতক কলিকাতায় থাকিতে থাকিতে আবার যখন কলিকাতা সহিয়া গেল, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কনককেও ভুলিয়া গেলেন, কনকের স্নেহও ভুলিলেন—অনুতাপও ক্রমে অবসান হইল। কিন্তু কনক ভাইটিকে দেখিবার জন্য কতই ব্যাকুল হইত—সারা বৎসর তাহার জন্য কতই উৎসুক ভাবে অপেক্ষা করিয়া থাকিত, পরে ছুটীতে প্রমোদ বাড়ী আসিলে, তাহার আনন্দ ধরিত না। যে কদিন প্রমোদ বাড়ী থাকিতেন, কি সুখে সে দিন গুলি তাহার কাটিয়া যাইত তাহা বলিবার নহে। এবারও সারা বৎসর অপেক্ষা করিয়া করিয়া আশ্বিন মাস আসিল, কত ব্যগ্রভাবে

কনক প্রমোদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু অবশেষে এক দিন হতাশ হইয়া তাহার শুনিতে হইল যে প্রমোদ আপাততঃ কানপুরে বেড়াইতে যাইতেছেন, সেখান হইতে কিছুদিন পরে আসিবেন। কনক-বালিকার বড়ই কষ্ট হইল, কিন্তু কি করিবে, সহিষ্ণুতার সহিত আবার দিন গণিতে লাগিল। প্রমোদ যেদিন কানপুর হইতে বাড়ী আসিলেন, তাহার আর আহ্লাদ রাখিবার স্থান রহিল না, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টি অপরিমিত সুখে ভাসিতে লাগিল। বিশেষতঃ প্রমোদের ভাবভঙ্গী এবারে অন্যবার হইতে স্নেহ ও মমতাময়। প্রমোদের ঈষৎ হাসি-মুখখানি এবারে এমন এক নূতন অমায়িক উজ্জ্বল জ্যোৎস্নাময় ভাবে পরিপ্লুত, যে দেখিলে বোধ হয় তাঁহার হৃদয়ে একটি নূতন ভাবের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। কিন্তু সুখের দিন শীঘ্রই ফুরাইয়া আসে, কনকের সুখের দিনও ফুরাইয়া আসিল। ছুটী শেষ হইয়াছে, প্রমোদের আবার কলিকাতায় যাইবার দিন আসিয়া পড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—ভ্রাতা-ভগিনী।

প্রমোদ আজ সন্ধ্যাকালে কলিকাতায় যাইবেন, তাঁহার সঙ্গে লইবার সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী কনক গুছাইয়া দিল। কনক তাহার সঙ্গের ব্যাগে উদ্যানজাত কতকগুলি বাদাম পর্য্যন্ত লুকাইয়া পুরিয়া দিল, আপন হস্ত-নির্ম্মিত পশমের মোজা গলাবন্ধ ইত্যাদি কতকগুলি জিনিস তাহাতে রাখিল, শেষে গোছান, হইলে পাঠ-গৃহে আসিয়া কনক বসিল। পাঠে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া একখানি পাঠ্য পুস্তক লইয়া পড়িতে গেল, শীঘ্র শীঘ্র অনেক পাত উলটাইল বটে, কিন্তু পড়িয়া পড়িয়া তাহা উলটাইল কিম্বা অশ্রুসিক্ত হওয়াতে তাহা উলটাইতে বাধ্য হইল, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। কিছু পরে কনক বিরক্ত ভাবে বইখানি মুড়িয়া অঞ্চলে অশ্রু মুছিতে লাগিল, মুছিয়া মুছিয়া আবার কি ভাবে জানি না—সেই বইখানি খুলিয়া পড়িতে গেল, এই সময় প্রমোদ সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আস্তে আস্তে তাহার নিকট আসিয়া একখানি চৌকিতে স্থির ভাবে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি পড়িতেছ।"

ক। "ভারতবর্ষের ইতিহাস।" "কই দেখি" বলিয়া প্রমোদ বইখানি হাতে লইলেন, কিন্তু তাহাতে একবার চক্ষু বুলাইয়াই আবার সশব্দে তাহা টেবিলের উপর ফেলিয়া রাখিয়া বলিলেন "কনক——" কনক বলিয়াই প্রমোদ থামিলেন—কি বলিতে গিয়াছিলেন আর বলিলেন না, কনক তাহা বুঝিয়া বলিল "দাদা কি? কি বলিতে ছিলে বল না?"

প্র। "না, কিছু না—জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম তোর ইতিহাস বেশ মনে আছে? বল দেখি নূরজাহান কে?" তাঁহার জিজ্ঞাসায় কনক হাসিয়া বলিল "সের আফগানের স্ত্রী—পরে জাহাঙ্গীরের রাণী হয়।"

প্র। "জাহাঙ্গীর নূরজাহানকে চিনিল কি ক'রে?"

ক। "অল্পবয়স্কা নূরজাহান আকবরের অন্দরে প্রায়ই থাকিত—সেই সময় যুবরাজ জাহাঙ্গীর তাহাকে দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হন।"

প্র। "আচ্ছা, আচ্ছা, তার পর সের আফগানের সঙ্গে বিবাহ হোলেও আবার জাহাঙ্গীরের রাণী হোলো কি করে?"

ক। "জাহাঙ্গীরের আদেশে সের আফগান হত হইয়া—"কনকের কথাটি শেষ না হইতে প্রমোদ বলিলেন "ছিঃ ছিঃ—জাহাঙ্গীরের প্রেম প্রেমই নয়, সে প্রেমে আত্মবিসর্জ্জন কই?" বলিতে বলিতে প্রমোদের মনে কত ভাব বহিয়া গেল। মনে হইল নীরজা যে তাঁহার হইবে, ইহা তো তাঁহার দুরাশা—কিন্তু তাহা কি হইবে? এ দুরাশা কি সফল হইবে? যদি না হয়—যদি নীরজা অন্যের হয় তাহা হইলে তাঁহার কি হইবে? নীরজা তাহা হইলে পর হইয়া যাইবে, যদি কখনো তখন তাঁহার সহিত দেখা হয় সে তাহার কাছে হইতে লুকাইবে, আর হয়তো কখনই দেখিতেও পাইবেন না—উঃ কি কষ্ট, ভাবিতেও তাঁহার কষ্ট হইল, প্রমোদের ওষ্ঠাধর মৃদু মৃদু কাঁপিতে লাগিল—কিন্তু পরক্ষণেই তাহা মিলাইয়া গেল, তিনি চৌকি হইতে উঠিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন—"নূরজাহানের কখনো ছবি দেখেছিস্?"

ক। "দেখেছি। আমার ইচ্ছা হয় আমাদের অমনি একটি বেশ সুন্দর বৌ হয়। দাদা, তুমি বিয়ে করিবে না? তা হলে আমার বেশ একটী সঙ্গী হয়।" প্রমোদের প্রফুল্ল অমায়িকতায় আশ্বাসিত হইয়া কনক আজ মুক্তকণ্ঠ, তাহাকে ঈষৎ প্রগল্‌ভ বলিতেও আমাদের সঙ্কোচ হইতেছে না। প্রমোদ কনকের সেই সরল প্রশ্নে ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন—কি ভাবিতে ভাবিতে একটি সেল্‌ফের উপর, যেখানে কতকগুলি সজ্জিত পুস্তক ছিল সেইখানে আসিলেন—অন্য মনে তাহার মধ্য হইতে এক খানি বই তুলিয়া হাতে লইলেন। কনক বলিল—"দাদা তোমাকে অমন দেখছি কেন, তুমি আমাকে কি বলিতে গিয়াছিলে, কই বলিলে না?" প্রমোদ বলিলেন, "বলিতে গিয়াছিলাম সত্য কিন্তু কেন যে তোকে বলিতে গেলাম তাহা তো জানি না।" কনক মুখটি চুন করিয়া বলিল—"আমাকে বলিলে কি দোষ হয়।"

প্র। "তুই ছেলে মানুষ, তোর কাছে সে কথা বলিতে যাওয়াই পাগ্‌লামি?"

ক। "কখনো তো কিছু বলিতে এস নাই, তবে আজ যে বলিতে গেলে।"

প্র। "পাগলামি—মনের চঞ্চলতা। একাকী মনের মধ্যে রাখিয়া কেমন এক এক বার ফুটিতে ইচ্ছা হয়—কিন্তু লোক পাইনে।——কি আর বলিব——কিছুই না। ——তোকে আর এক দিন পড়া শুনা জিজ্ঞাসা করিব—এখন পড়।" কনক দেখিল প্রমোদের মুখে তাঁহার সেই স্বাভাবিক চপল ভাব নাই——তিনি ঈষৎ গম্ভীর, ঈষৎ বিষণ্ণ——চক্ষের ভাব ঈষৎ আবেশময়, কথা ধীর অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক। কথা কহিতে কহিতে প্রমোদ অন্য মনে সেই সেল্‌ফস্থিত

এক একখানি বই লইয়া টেবিলে ফেলিতে লাগিলেন, কনক অন্য মনস্ক বশতঃ তাহা দেখিল না। ভ্রাতার কথায় কনক বলিল "তুমি দাদা আমাকে কোন কথাই বলিতে পার না।" কনকের মুখখানি ম্লান হইল, চোখ দুটি ছল ছল করিয়া আসিল। প্রমোদ কনকের কথায় নিরুত্তর হইয়া রহিলেন, তাহার কথা শুনিতে পাইলেন কি না তাহাও বোঝা গেল না। ক্ষণেক মৌন ভাবে থাকিয়া থাকিয়া প্রমোদ সে গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। তাহাতে কনকের বড় দুঃখ হইল, কনকের কান্না আসিল—কাঁদিয়া কিছু হাল্‌কা হইলে গৃহান্তরে যাইবার জন্য উঠিল, উঠিয়া সেল্‌ফের বই গুলি টেবিলে স্তূপাকার দেখিয়া সহসা তাহার যেন চমক ভাঙ্গিল, ব্যস্ত হইয়া সে বইগুলি গুছাইয়া সেল্‌ফে তুলিতে গেল।

সে বই গুলি সুশীলার যত্নের বই, বাল্যকালে একদিন তাঁহার পিতা তাঁহাকে আদর করিয়া পড়িতে দিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর সুশীলা তাহা অতি যত্নে রাখিয়া ছিলেন। কেহ তাহাতে হাত দিলে তিনি অতিশয় বিরক্ত হইতেন, স্বহস্তে তিনি তাহা প্রত্যহ মুছিয়া রাখিতেন। একদিন কনক আপন পড়ার বই একখানি হারাইয়া সেই সেল্‌ফে তাহা খুজিতে গিয়াছিল—তাহাতে সুশীলা তাহাকে বকিয়া ছিলেন এবং ভবিষ্যতে সেই সেল্‌ফে হাত দিতে বিশেষ রূপে বারণ করিয়া ছিলেন। সেই অবধি আর কনক তাহাতে হাত দিত না। এখন কনক তাড়াতাড়ি বই গুছাইতে যাইতেছে—এই সময় সহসা সুশীলা এই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বালিকার অমনি মুখখানি আরো শুকাইয়া গেল—চোরের ন্যায় সে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই বইগুলির ঐরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া সুশীলা অতিশয় বিরক্ত হইলেন। সুশীলা স্বভাবতই কিঞ্চিৎ বাহুল্যরূপে কর্ত্তব্য-জ্ঞান-সম্পন্ন, এবং সেই অনুষ্ঠানে ত্রুটী হইলে অল্পতেই কিঞ্চিৎ কঠোর হইয়া পড়িতেন। সুতরাং তাঁহার বিশেষ বারণ সত্ত্বেও কনক উহাতে হাত দিয়াছে—তিনি ইহাতে ক্রুদ্ধও হইলেন। আপন আজ্ঞা পালিত না হইলে সুশীলা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইতেন। তিনি ভাবিলেন—"কি হইবে, সেদিন ঐরূপ করিতে গিয়াছিল—বারণ করিলাম, বিশেষ রূপে বারণ করিলাম—তবু শুনিল না। আমার কথা অবহেলা করিল—গুরুলোকের কথা অবহেলা করিল! কই, কনক ত আগে এরূপ ছিল না, এখন ইহার প্রতীকার কিরূপে করা যায়—প্রথম হইতে না শোধরাইলে ক্রমে এ স্বভাব বদ্ধমূল হইয়া যাইবে।"

সুশীলা পিতাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এবং মান্য করিতেন—তাঁহার দত্ত বই গুলিও সেই হেতু তিনি ভক্তিচক্ষে দেখিতেন। তিনি ভাবিলেন—কনক যদি সুশীলাকে তেমন ভক্তি করিত—তাহা হইলে তাঁহার কথা কখনই অগ্রাহ্য করিতে পারিত না। "মেয়ে ছেলের গুরুজনের প্রতি ভক্তি নাই—কি ভয়ানক কথা!" সুশীলা তাহার স্বভাব শোধরাইবার জন্য ভাবিত হইলেন—গম্ভীর

স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন উহাতে হাত দিতে আমার বারণ তাহা কি তুমি জান না। কেনই বা বারণ—ও বই গুলি কি—তাহাও আমি কি তোমাকে বলি নাই? তবুও তুমি উহাতে হাত দিলে?" কনক চুপ করিয়া রহিল—কি উত্তর দিবে। যদি বলে আমি ওরূপ করি নাই, তাহা হইলে সুশীলা আবার জিজ্ঞসা করিবেন কে তবে করিয়াছে—প্রাণ থাকিতে ভ্রাতার নাম বলিতে পারিবে না। কনক কোন উপায় না দেখিয়া চুপ করিয়া রহিল। সুশীলা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—তখনো কনক কথার উত্তর করিল না। একে দোষী, তাহাতে আবার এইরূপ ব্যবহার! কনকের স্বভাব শোধরাইবার পক্ষে সুশীলার সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। তিনি তাহাকে আর একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, উত্তর না পাইয়া হতাশ হইলেন। কিন্তু তবু যে হাল ছাড়া উচিত নহে—তবু যে চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে—দেখা যাক, যদি শাস্তি দিয়া স্বভাব শোধরাইতে পারেন—তিনি শাস্তি স্বরূপ বলিলেন—"আজ তোমায় একাকী খাইতে হইবে—আমাদের সহিত একত্রে খাইতে পাইবে না—এবং প্রমোদের সহিত আজ দেখা করিতে পাইবে না, সে আজ রাত্রে যাইবে—সে সময় তোমার সহিত দেখা হইবে না।" সুশীলা জানিতেন ঐ শাস্তিই তাহার শাস্তির পরাকাষ্ঠা হইবে। রাত্রে যাইবার সময় প্রমোদ সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিল "কনক আজ কোথায়? তাহাকে যে আজ অনেক ক্ষণ দেখি নাই, আমার আবার যাইবার সময় হইয়া আসিল—এখনো যে সে আসিল না।" সুশীলা বলিলেন—"সে আজ দোষ করিয়াছে—শাস্তি স্বরূপ তাহাকে বন্ধ রাখিয়াছি।" প্রমোদ শুনিয়া একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং বিমর্ষ ভাবে বাড়ী হইতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু গাড়ীতে গিয়াই আবার সকল ভুলিয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—জালে হরিণী।

সন্ন্যাসী নৈমিষারণ্যে গিয়াছেন। নীরজা কুটীর সন্নিধানস্থ একটি বকুল-তলে বসিয়া, ৩০।৩২ বয়স্ক একটি কৃষ্ণবর্ণ স্থূলকায় স্ত্রীলোকের সহিত গল্প করিতেছিল। তখন অস্ফুট জ্যোৎস্নায় বকুল-তলাটি ঈষৎ উজ্জ্বল হইয়াছিল, মৃদু মৃদু বাতাস বহিতেছিল, সেই বাতাসে একটি একটি করিয়া বকুল খসিয়া বৃক্ষতল ছাইয়া ফেলিয়াছিল।

নীরজা সেই ফুলরাশি মধ্য হইতে কতকগুলি ফুল হস্তে লইয়া খেলিতে খেলিতে তাহার গল্প শুনিতেছিল। স্ত্রীলোকটি তাহার ঘরকন্নার কথা—দুঃখধান্ধার কথা—তাহাদের ক্রীড়া-কর্ম্মের কথা—তাহাদের দাম্পত্য প্রণয়ের কথা—তাহার পুত্র-কন্যার কথা বলিতেছিল—নীরজা কৌতূহলের সহিত তাহা শুনিতে শুনিতে মাঝে মাঝে দুই একটি প্রশ্ন করিতেছিল। কাঠুরিয়া রমণীর নববিবাহিতা কন্যার কথা শুনিয়া নীরজা বলিল "বসু—আজ তাহাকে সঙ্গে আনিলে না কেন?" বসুমতী বলিল "সে শ্বশুর বাড়ী গেছে

মা।" এই কথায় নীরজা, ভূমিষ্ঠ হইতে এক অঞ্জলি বকুল কুড়াইয়া বসুর অঞ্চলে দিয়া বলিল "আহা, সে বলে ছিল তাহার স্বামী আসিলেই এবার সে এই বকুল ফুল তাহার জন্য লইয়া যাইবে—কই, সে ত আসে নাই, তুমি এই গুলি তাহাকে পাঠাইয়া দিও" বসু বলিল "মা—আমরা দুঃখ করে খাই—কে আবার কাল তার শ্বশুর বাড়ী ঐ ফুল দিতে যায় বল মা!" কথা কহিতে কহিতে সহসা পেচকের বিকট চীৎকারে তাহারা চমকিয়া উঠিল—নীরজা ত্রস্তে, একবার চারি দিক চাহিয়া দেখিল—বসু অমঙ্গলসূচক পেচক-শব্দে ভীত হইয়া "দূর দূর" করিয়া উঠিয়া বলিল "গাটা যেন চমকে উঠলো—সন্ন্যাসী মহাশয় নেই—সহজেই একাকী কেমন ভয় হয়।"

নী। "কই, আমার তো কখন ভয় হয় না—কিন্তু সহসা আমিও চমকে উঠেছি। যাক, তুমি তোমার মেয়ের গল্প কর—লহনা তার স্বামীকে খুব ভালবাসে—না?" আবার এই সময় পূর্ব্বের ন্যায় পেচক ডাকিয়া উঠিল—সেই অমঙ্গলসূচক কর্কশ স্বরে নীরজাদের গাত্র শিহরিয়া উঠিল, গল্প ছাড়িয়া নীরজা সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া পশ্চাৎ চাহিয়া দেখিল। সেই নির্ব্বাণোন্মুখ অস্ফুট চন্দ্রালোকে নীরজা দেখিতে পাইল, চারিজন লোক তাঁহাদের নিকটেই আসিতেছে—দেখিতে দেখিতে তাহারা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল. নীরজা অরণ্য-পালিত হইয়াও তাহাদের সেই ভীমমূর্ত্তি, সেই কঠোর কটাক্ষ দেখিয়া কেমন শিহরিয়া উঠিল—বসুও সভয়ে তাড়াতাড়ি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কে?" কিন্তু এই সময় চকিতের ন্যায় এক ব্যক্তি নীরজাকে শূন্যে তুলিয়া লইল এবং দুইজন বসুকে গিয়া ধরিল। তাঁহারা ইহাতে চমকিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন-কিন্তু সেই নির্জন বনে সে চীৎকার কে শুনিবে? দেখিতে দেখিতে আর এক ব্যক্তি বস্ত্রখণ্ড দ্বারা নীরজার মুখ বন্ধ করিয়া দিল, তখন নীরজাকে ক্রোড়ে লইয়া অপর, জন দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। নীরজা হস্ত পদ ছুঁড়িয়া বল প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু সেই বলবান ব্যক্তির হস্ত-পেষিত হইয়া তাহা করিবারও ক্রমে তাহার শক্তি রহিল না। নীরজাকে লইয়া একজন দস্যু পলায়ন করিল—আর তিন জন মিলিয়া সেই বলপ্রকাশকারী কাঠুরিয়া স্ত্রীলোককে রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল। পরে তাহারা চারিজন আবার মিলিত হইয়া, দ্রুতগতিতে জঙ্গল ছাড়াইয়া নদীতীরে উপস্থিত হইল। নদী-তীরে একখানি নৌকা প্রস্তুত ছিল, তাহাতে উঠিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল, নৌকা চলিতে লাগিল। তখন তাহারা বালিকার মুখ হইতে বন্ধন মোচন করিল, কিন্তু অনেক ক্ষণ বস্ত্র দ্বারা মুখ—নাসিকা আবদ্ধ থাকায়—বালিকা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল, বস্ত্র খুলিয়া তাহারা দেখিল—বালিকা অজ্ঞান। তখন মুখে জল সিঞ্চন করিতে করিতে কিছুক্ষণ পরে তাহার জ্ঞান উদ্রেক হইল। তখন নীরজা চারি দিক চাহিয়া

দেখিল—ব্যাকুল ভাবে তাহাদের সেই ক্ষুদ্র কুটীরটি দেখিবার জন্য চাহিয়া দেখিল—কিন্তু কোথায় সেই কুটীর; তাহার পরিবর্ত্তে দেখিল সে এক অপরিচিত স্থানে অপরিচিতের মধ্যে শুইয়া রহিয়াছে। তখন তাহার মনের ভাব কি হইল, বলিবার নহে। তাহার সমস্ত পূর্ব্বঘটনা নিমেষে স্মরণ হইল, বালিকা আবার চীৎকার করিয়া উঠিল, অমনি একজন হস্ত দ্বারা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "এখন চীৎকারে কোন ফল নাই, চীৎকার করিলেই মুখ বাঁধিয়া দিব, কিন্তু ভালয় ভালয় চলিলে কিছু বলিব না" নীরজা বুঝিল, তাহারা যাহা বলিতেছে তাহা সত্য, দেখিল, দস্যুরা তাহার উপর অত্যাচার করিলে কথা কহিবার লোক এখানে কেহই নাই, তাহারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারে—এরূপ স্থলে বলপ্রকাশ না করাই কর্ত্তব্য। নিরুপায় বালিকা তখন অগাধ সমুদ্রে পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। রাত্রি ক্রমে গাঢ়তর হইয়া আসিল—যাহারা দাঁড় টানিতেছিল তাহারা ছাড়া আর সকলে নিদ্রিত হইল—কেবল একজন মাত্র নীরজার প্রহরীরূপে নৌকার প্রকোষ্ঠ-দ্বারে রহিল, কিন্তু সেও অনেক ক্ষণ বসিয়া বসিয়া সেইখানে কাপড় পাতিয়া শুইল। কিছুক্ষণ হইলে তাহাকে নিদ্রাগত ভাবিয়া নীরজা আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিয়া নৌকার গবাক্ষে মুখ সংলগ্ন করিয়া নদীর দিকে চাহিয়া রহিল। হৃদয়ের তখন তাহার সেই ভয়ানক অবস্থা, কত যে প্রচণ্ড ঝটিকা তখন তাহার মনে বহিয়া যাইতেছিল, হৃদয়ে যে কি ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত, তাহা বর্ণনাতীত। কি প্রকারে এই দস্যু-হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে, একে একে কত উপায় ভাবিল, কিন্তু কোনটাই ফলপ্রদ হইবে মনে হইল না। ক্রমে ক্রমে দেখিল, তাঁহার আশা নাই, ভরসা নাই, নিকটে পিতা নাই, এই দস্যুদের হস্তে একাকী নিরুপায়। নীরজা শিহরিয়া উঠিল, নীরজার ভাবিতেও আর শক্তি রহিল না। নীরজা তখন সেই নৌকা-গবাক্ষ হইতে নদীতে ঝাঁপ দিবার সঙ্কল্প করিয়া, প্রথমে পরীক্ষার নিমিত্ত আস্তে আস্তে তাহার উপর উঠিয়া বসিয়া পদদ্বয় নির্গত করিয়া দিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রহরী তখনো ঘুমায় নাই—সে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সকল দেখিতেছিল, সে তাহার অভিসন্ধি বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গবাক্ষের নিকট হইতে নীরজাকে টানিয়া আনিল। দস্যু-হস্ত-স্পর্শে শিহরিয়া উঠিয়া ছিন্ন লতিকার ন্যায় নীরজা, সেই নৌকামধ্যে শুইয়া পড়িল। দারুণ কষ্টে অশ্রুরাশি উথলিয়া উঠিল—বালিকা অনেক ক্ষণ ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অবসন্ন দুর্ব্বল হইয়া সেই খানেই ঘুমাইয়া পড়িল।

নবম পরিচ্ছেদ—দূরে নৌকা।

শ্রান্ত ক্লান্ত, মানসিক কষ্টে অবসন্ন—বালিকা নিদ্রার ক্রোড়ে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম

লইতেছিল, সহসা সে নিদ্রা ভঙ্গ হইল,—কাহার কঠিন হস্ত-স্পর্শে বালিকা চমকিত হইয়া জাগিয়া উঠিল। চারি দিক চাহিয়া দেখিল সব অন্ধকারময়, ঘুমাইবার সময় নৌকায় যে আলো জ্বলিতেছিল তাহাও নিবিয়া গিয়াছে, নিস্তব্ধময় রজনীর ভয়ঙ্কর ভাব অনবরত দাঁড়ের ঝপ ঝপ শব্দে আরো বৃদ্ধি করিয়া তুলিতেছে, তাহা হইতেও ভয়ানক——তাঁহার শিয়রে বসিয়া একজন মনুষ্য তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিতেছে। অন্ধকারে সেই মনুষ্যের মূর্ত্তি নীরজা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইল না, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে সহসা শিয়রে মনুষ্য দেখিয়া সে চীৎকার করিবার উপক্রম করিল, কিন্তু তখনি দস্যুদিগের সেই নিষেধ-বাক্য মনে পড়িল, নীরজা অমনি থামিয়া গেল। যে ব্যক্তি তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়াছিল সে মৃদুস্বরে বলিল "ভয় নাই—আস্তে কথা কহিও, আমি তোমাকে ইহাদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিব ঠিক করিয়াছি।" যখনি নীরজা ভাবিতেছিল তাহার আশা-ভরসা কিছুই নাই—সে অকূল পাথারে ভাসিয়াছে, তখনি রক্ষার কথা শুনিয়া তাহার যেন কিছু আশ্বাস জন্মিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা দূর হইল, সে ব্যক্তির কথায় অবিশ্বাস হইল। নীরজা সন্দিগ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে? এখানে যে প্রহরী ছিল কোথায় গেল? তুমি আমাকে কি প্রকারে রক্ষা করিবে?" সে বলিল "আমিই সেই প্রহরীর কার্য্যে আসিয়াছি, আমি এ নৌকার একজন দাঁড়ি—তোমার দুর্দ্দশায় দয়া হইয়াছে। আমার কথামত কাজ করিলে তোমাকে ইহাদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারি।" নীরজা বলিল "আমি নিরুপায়, যদি তোমার প্রতারণার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলেও আমি মরিব, এখানে থাকিলেও আমি মরিব, এরূপ স্থলে তোমার কথাই শুনিব।—কি করিতে হইবে?" সে বলিল "এখন কিছুই করিতে হইবে না—তুমি কেবল পলায়নের চেষ্টা দেখিও না—পরে আমি কোন ভদ্রলোকের গোপনে সাহায্য লইয়া তোমাকে উদ্ধার করিব। কিন্তু যাহা বলি বিশ্বাস করিয়া কাজ করিও।" নীরজা সে কথায় সম্মত হইল, তখন দাঁড়ি সেখান হইতে গিয়া নৌকার দ্বারদেশে শুইয়া রহিল। ক্রমে দিন যাইতে লাগিল, প্রত্যহই নীরজা উদ্ধারের জন্য লালায়িত হইতে লাগিল। ক্রমে দুই তিন দিনের মধ্যে নৌকা এলাহাবাদ আসিতে লাগিল। যে দাঁড়ি নীরজাকে আশা দিয়াছিল, সে তীরে খাদ্য দ্রব্য কিনিতে নামিল, সুতরাং নৌকা তীরে লাগাইয়া অন্যেরা তাহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। মাঝি খাদ্য সামগ্রী লইয়া নৌকায় উঠিয়া নীরজাকে চুপে চুপে বলিল "আর ভয় নাই, কিছুক্ষণ মধ্যেই একখানি নৌকা তাহার উদ্ধারের জন্য আসিবে।" নীরজার আনন্দ ধরিল না—সে সেই আকাঙ্ক্ষিত সময়ের জন্য বড়ই অধীর হইয়া পড়িল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, একটু একটু মেঘ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, সেই আঁধার গবাক্ষ হইতে তাহার উদ্ধার জন্য নৌকা আসিতেছে কি না, নীরজা

দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রত্যেক নৌকাকেই সে এই নৌকার দিকে আসিতে দেখিল। দেখিতে দেখিতে সত্য সত্যই একখানি নৌকা তীর-বেগে নৌকার নিকট আসিয়া ইহার গতিরোধ করিল, ভয়ে মাঝিরা নৌকা থামাইল, অমনি একটি ভদ্র যুবা লম্ফে এ নৌকায় উঠিয়া আসিলেন। ঘন ঘন বন্দুকের শব্দে ভীত হইয়া এ নৌকার লোকেরা তাঁহার সহিত বিবাদ করিল না—কে কোথায় লুকাইল, কে কোথায় পালাইল তাহার ঠিকানা রহিল না। সুতরাং বিনা আয়াসে যুবা নৌকা-মধ্যে নীরজার নিকট আসিলেন। নৌকার দীপালোকে নীরজা সেই যুবাকে চিনিতে পারল, নীরজা দেখিল—যামিনীনাথই তাঁহার উদ্ধারকারী। যামিনীনাথও তাঁহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য ভাবে বলিলেন "তুমি নীরজ! এস আমার সঙ্গে এই বোটে শীঘ্র এস।" উদ্ধার হইয়া আহ্লাদে নীরজার কথা কহিবার শক্তি ছিল না—তিনি নিঃশব্দে যামিনীনাথের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া তাঁহার বোটে উঠিলেন। তখন সে বোট আবার ছাড়িয়া দিল।

আসাম ও উড়িষ্যা।

আসাম প্রদেশ ইংরাজ রাজ্যের প্রান্তসীমাতে অবস্থিত, উড়িষ্যা বঙ্গ সাগরের উপকূলবর্ত্তী। ইহার মধ্যে প্রকাণ্ড বাঙ্গলা প্রদেশ, কিন্তু উড়িষ্যার রীতি নীতি যে রঙ্গে অনুরঞ্জিত, আসামের রীতি নীতিও অনেক পরিমাণে তদনুরূপ বলিয়া বোধ হয়। কোন্ কোন্ বিষয়ে আসামের সঙ্গে উড়িষ্যার সাদৃশ্য আছে, তাহা প্রথমতঃ পর্য্যালোচনা করিব। কোন দেশের সহিত কোন দেশের তুলনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ ভাষা, সঙ্গীত ও দেশীয় আচার ব্যবহার এবং ধর্ম্মের বিষয় সমালোচনা করিলেই কোন্ কোন্ স্থানে ঐক্য আছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিব। আসামের ভাষা সংস্কৃত মূলক; উৎকল ভাষারও প্রকৃতি তাহাই, কিন্তু প্রায় ইহার প্রত্যেক দেশেই এমন কতকগুলি শব্দ ব্যবহৃত আছে যে, তাহার সহিত সংস্কৃত বা অপর কোন মূল ভাষার ঐক্য নাই। সেই সকল শব্দের সদৃশ শব্দ যদি অন্য কোন প্রদেশে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে কোন সময়ে যে এই প্রদেশ দ্বয়ের ঘনতর সম্বন্ধ ছিল এপ্রকার সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নহে। আসামের এবং উৎকলের কএকটি শব্দ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। পাঠকগণ ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন, উক্ত ভাষা দ্বয়ে কেমন সেই সাদৃশ্য আছে।

আসামীয়া	বাঙ্গালা,	উড়িয়া।
ঢরই	পত্নী	ঢরই
গাধোওয়া	স্নান	গাধোওয়া
বাট ১	পথ	বাট
ঔ (টঙ্গা)	টক্	ঔ
অমৃতা ২	পেঁপে	অমৃত ভাণ্ডার
দাদা	কাকা	দাদা
গছু	গাছ	গাছ
কানিয়া	আফিং খোর	কনিয়া
থির ৩	দাঁড়ান	ঠিয়া
নেউল ৪	বেজি	নেউল
ধুয়াপাত ৫	তামাক	ধুয়া পত্র
বেয়া	মন্দ	বয়া

১। উপরে প্রদর্শিত শব্দ দ্বারা দেখা যাইতেছে, আসামের প্রচলিত শব্দ সমূহের সহিত উড়িষ্যার শব্দনিচয়ের যত যোগ আছে, বাঙ্গালার তত নাই। এমন কি, বাট, ঔ, অমৃতা, মিয়া, ধুয়াপাত, দাদা, বেয়া প্রভৃতি শব্দের অর্থ বঙ্গদেশবাসী বাঙ্গালীরা বুঝিতে অক্ষম, কিন্তু ইহার কোন একটী শব্দ উড়িষ্যা বা আসামের একতর অধিবাসীরা বুঝিতে পারিবে এতৎভিন্ন সঙ্গীতেও বিশেষ ঐক্য দৃষ্ট হয়।

২। যাঁহারা উড়িয়াদিগের ভজনালয়ের সঙ্গীত একবারও শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা যদি আসামের নাম-ঘরে গমন করেন, তাহা হইলে দর্শক স্থিরসিদ্ধান্ত করিবেন, উড়িয়াদিগের ভজন-সঙ্গীত যে স্বরে যে ভাবে গীত হয়, আসামের নাম-ঘরেও তাহার অনুকৃতি আছে। আসামের প্রায় প্রত্যেক পল্লীতে যেমন একটী করিয়া নাম-ঘর আছে উড়িষ্যারও প্রায় প্রত্যেক পল্লীতে এক একটী ভাগবৎ-ঘর আছে। আসামের লোকেরা সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যার পর নাম-ঘরে গমন করে এবং নাম সংকীর্ত্তন আদি করিয়া থাকে; উৎকলের অধিবাসীরাও সন্ধ্যার পর ভাগবৎ ঘরে যাইয়া ভাগবৎ পাঠ ও নাম সংকীর্ত্তন করে।

ভাওনা। ইহা গীতাভিনয় বিশেষ। ইহা কি পরিচ্ছদ, কি রাগরাগিণী, এবং কি অঙ্গভঙ্গী সকল বিষয়েই উড়িয়া যাত্রার অনুরূপ। যিনি একবার উড়িয়া যাত্রা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি, যদ্যপি আসামের ভাওনা দর্শন করেন তাহা হইলে হঠাৎ এই ভাওনাকে উড়িয়া যাত্রা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেও করিতে পারেন। ভাওনার গীত ও পরস্পরের কথোপকথনের মধ্যে উড়িয়া ভাষার ক্রিয়াপদ এবং ছন্দের মিলন দৃষ্ট হয়।

৩য়। উড়িষ্যার প্রধান তীর্থ পুরুষোত্তম। আসামের প্রধান তীর্থ কামক্ষ্যা। এই উভয় তীর্থ স্থানের নামই নীলাচল, বোধ হয় পুরীর মন্দিরকে আদর্শ করিয়া কামক্ষ্যা, বড় পেটা এবং শিবসাগরের মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে। পুরীর মন্দিরের গঠন-প্রণালী যেরূপ, শিবসাগরের শিবমন্দির ও কামক্ষ্যা দেবীর মন্দিরের গঠন-প্রণালীও অবিকল সেইরূপ। পুরীর মন্দিরে যেরূপ কুরুচি-প্রসূত ছবি দৃষ্ট হয়, কামক্ষ্যা দেবীর মন্দিরেও তাহার অভাব নাই।

১।২।৩।৪।৫ চিহ্নিত কথাগুলি সুস্পষ্ট সংস্কৃত মূলক সুতরাং এই কথাগুলি দ্বারা লেখকের মত ঠিক সমর্থিত হইতেছে না। ভা স°।

৪র্থ। আসামে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ভিন্ন অপর জাতির মধ্যে বাল্যবিবাহ নাই। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যে বাল্যবিবাহ আছে সত্য কিন্তু তাহা নামমাত্র বিবাহ। রজোদর্শনের পূর্ব্বে নব-বিবাহিত দম্পতীর পরস্পর সাক্ষাৎ করিবার বিধি নাই। যদি কোন কারণ বশতঃ উভয়ের দেখা হয়, তাহা হইলে ঐ সন্দর্শনকে মহা পাপ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। উড়িষ্যাতেও তাহাই। আসামে ব্রাহ্মণ ও কলিতা অর্থাৎ কায়স্থ ভিন্ন ইতর জাতির মধ্যে বাল্যবিবাহ নাই; বিধবাবিবাহ আছে। উড়িষ্যাতে করণ—অর্থাৎ কায়স্থদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ নাই, এবং বিধবা বিবাহও নাই। কিন্তু ইতর জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে।

৫। আসামে জাতিভেদের বড় আঁটা আঁটি। যাঁহারা গোড়া হিন্দু তাঁহারা সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত স্ত্রীর অন্নও গ্রহণ করেন না। ভ্রাতা ভগিনী আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতির ত কথাই নাই; এবং পিতার অন্নও পরান্নের মধ্যে গণ্য। অনেক আসামস্থ গোড়া হিন্দুদিগকে স্বপাকে খাইয়াই মরিতে হয়। আবার, যাঁহারা ভক্ত, তাঁহাদের আহার আর অপর লোক দেখিতে পান না। ঘরের দ্বার আবদ্ধ করিয়া রন্ধন করা হয়, আর্দ্র বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক আহার করা হয়। উড়িষ্যার কোন কোন স্থলে গোড়া হিন্দুদিগেরও এইরূপ দুর্দ্দশা। এখন পাঠকগণ, বিবেচনা করুন, উড়িষ্যার রীতি নীতি ও ধর্ম্ম ভাবের সহিত আসামের রীতি নীতি ও ধর্ম্ম ভাবের কত দূর সৌসাদৃশ্য আছে।

১ম। বাঙ্গালার সহিত আসাম বা উড়িষ্যার রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারের ঘনিষ্ট যোগ নাই। কিন্তু উড়িষ্যা ও আসামের আচার, রীতি নীতি ও ব্যবহারে ঈদৃশ ঘনিষ্ট যোগ কেন? এখন ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম, আমি যে সকল কারণ নির্দ্ধারণ করিব, তাহার মূলে ইতিহাস অপেক্ষা অনুমানের প্রভুত্বই অধিকতর থাকিবে। যাহাদিগের ইতিহাস নাই অনুমানই তাহাদিগের ঐতিহাসিক তত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তা। মনুষ্যের ভ্রম পদে পদে। আমরা যে এই বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইব না, তাহা কে বলিতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় যুবকবৃন্দ যে প্রকার ইতিহাস-তত্ত্বানুসন্ধিৎসু তাহাতে আশা করা যায়, এই বিষয়ে যদি আমাদের ভ্রমও থাকে তাহা সংশোধিত হইবে এবং আসাম ও উড়িষ্যার মৌলিক সম্বন্ধ আবিস্কৃত হইতে পারিবে?

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে আসামে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব ছিল। তাহার পর ক্রমশঃ বৌদ্ধ ধর্ম্মের হ্রাস হইয়া শঙ্করদেবের সময়ে বিলুপ্ত হয়। যখন আসামে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত, তখন উড়িষ্যাতেও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্ম দ্বারা এই প্রদেশ দ্বয়ের যে একাত্মতা বন্ধন ছিল না তাহা কে বলিতে পারে?

২য়। চৈতন্য যখন পুরীতে বাস করেন তখন আসামের ধর্ম্মসংস্কারক শঙ্করদেবও পুরীতে বাস করিতেন। চৈতন্যের সহিত শঙ্করদেবের সখ্যতা ছিল। চৈতন্য প্রেমিক ভক্ত ছিলেন, শঙ্কর দেবও প্রেমিক ভক্ত

ছিলেন। চৈতন্যের শিষ্যেরা ভক্তির অনুগত ও সঙ্কীর্ত্তন-প্রিয়; শঙ্করদেবের শিষ্যেরাও ভক্তির অনুগত ও সঙ্কীর্ত্তন-প্রিয়। চৈতন্য জাতিভেদ মানিতেন না; শঙ্করদেবও জাতিভেদের সমাদর করিতেন না। চৈতন্যও কৃষ্ণ ও হরিনাম-প্রিয়; শঙ্করদেবও কৃষ্ণ ও হরিনাম-প্রিয়। বিচার করিতে হইলে, চৈতন্য ও শঙ্করদেবের মত ও ভাবেতে অনেক ঐক্য আছে। চৈতন্যের শিষ্যের নিকট চৈতন্য অবতার ও ভক্তি-শাস্ত্র-প্রকাশক। শঙ্করদেবের শিষ্যেরাও বলেন শঙ্করদেব অবতার ও ভক্তি-শাস্ত্র-প্রকাশক। কেহ কেহ বলেন শঙ্করদেব চৈতন্যের শিষ্য, কিন্তু তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। শঙ্করের গ্রান্থবলী বা চৈতন্য সম্প্রদায়ের গ্রন্থ সমূহের মধ্যে, শঙ্কর চৈতন্য-ভক্ত বা পরম ভক্ত বলিয়া উল্লেখ নাই। ভক্তমালা-গ্রন্থে নানা দেশীয় ভক্ত ও তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত আছে। কিন্তু ভক্তমালা গ্রন্থকার শঙ্করদেবের কোন উল্লেখ করেন নাই। যদি শঙ্করদেব চৈতন্যের শিষ্যই হইবেন তবে শঙ্করদেবের গ্রন্থেও চৈতন্যের নাম বা চৈতন্যের গ্রন্থেও শঙ্কর দেবের নাম উল্লিখিত থাকিবার সম্ভাবনা ছিল, তবে ইহাই হইতে পারে, উভয়েই সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক, সুতরাং ঈর্ষা * বশতঃ কেহ কাহারও প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই। কিন্তু শঙ্করদেব এবং চৈতন্যদেব যে সমকালবর্ত্তী ও শঙ্করদেব যে পুরুষোত্তম তীর্থে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন, তাহার সংশয় নাই। শঙ্করদেব উড়িষ্যা হইতে আসামে আগমন করিয়া তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। শঙ্করদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের নাম মহাপুরুষীয় ধর্ম্ম। আসামের অধিকাংশ অধিবাসীরাই এই ধর্ম্মাবলম্বী। বোধ হয়, শঙ্করদেবের সহিত উড়িষ্যা হইতে অনেক উড়িয়া শিষ্য আসিয়াছিল, কালক্রমে তাঁহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব বিলোপ পাইয়াছে, কিন্তু শঙ্করদেবের জন্মভূমি নওগাঁও জিলায় দুইটী গ্রাম উড়িয়া গাঁও নামে প্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ এই গ্রামদ্বয়ে শঙ্করদেবের উড়িয়া শিষ্যেরা বাস করিত। ইহা বলা বাহুল্য যে বৌদ্ধদিগের মধ্যেই শঙ্করদেব স্বীয় নূতন ধর্ম্ম প্রথমতঃ প্রচার করেন, সুতরাং তাঁহাকে কেবল ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে হয় নাই। যাহাতে ধর্ম্মের সহিত রীতি নীতি পরিবর্ত্তিত হয়, তাহারও চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখন এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিলে বোধ হয় অযৌক্তিক হইবে না যে, শঙ্করদেব তাঁহার সাধন-ভূমি আসাম প্রদেশের রীতি নীতি সংশোধন এবং ধর্ম্মসংস্কার উড়িষ্যার অনুকরণে করিয়াছিলেন। সুতরাং মহাপুরুষীয় ধর্ম্মের সহিত আসাম দেশবাসীদিগের যোগই, আসাম ও উড়িষ্যার রীতি নীতি ও ভাবের সহিত সংযোগের প্রধান কারণ।

চৈতন্যদেবের জীবনচরিত সকলেই জানেন, কিন্তু শঙ্করদেব সভ্য সমাজে অপরিচিত। তাহার জন্য শঙ্করদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়াই এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

* ইহা চৈতন্য ও শঙ্করের পক্ষে অযোগ্য বোধ হইল। ভাঃ সঃ

১৩৭১ শকে আসামস্থ নওগাঁও জিলার অন্তর্গত বড়দোয়া গ্রামে শঙ্করদেবের জন্ম হয়। তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কুসম্বর ভুঁয়া। শঙ্করদেব কন্দলী নামক গুরুর নিকট সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ও ভাগবতাদি পাঠ করেন। শঙ্করদেব প্রথমতঃ পুরুষোত্তম তীর্থে গমন করিয়া তথায় দীর্ঘকাল বাস করেন। পরে বৃন্দাবন দর্শন করিয়া স্বীয় মাতৃভূমি আসাম দেশে আগমন করেন এবং স্বীয় ধর্ম্মমত সাধারণের নিকট প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তিনি পুস্তক ও গীত রচনা, মৌখিক উপদেশ এবং পৌরাণিক বিবরণ-সম্বলিত নাটক অভিনয় দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। সেই নাটকাভিনয়কে এদেশীয়েরা ভাওনা বলে।

শঙ্করদেব একপ্রকার বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিতে হইবে। তাঁহার উপাস্য দেবতা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ বা হরি। কিন্তু জাতিভেদের প্রতি তাঁহার বড় দৃষ্টি ছিল না। গাড়ো, কাছারৎ, কলিতা প্রভৃতি সকলকেই স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। শঙ্করের রচিত ধর্ম্মপুস্তকে প্রায়ই উড়িষ্যা ভাষার ক্রিয়াপদ ও নানা প্রকার শব্দ ব্যবহার আছে। শঙ্করদেবের সহিত মাধব দেও নামক একজন শিষ্য তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচার করিতেন। ইঁহারা যে নিরাপদে ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা নহে। প্রথমতঃ ইঁহারা কাছারৎ ও বৌদ্ধদিগের কর্ত্তৃক উপদ্রুত হন, পরে কতিপয় ব্রাহ্মণেরা কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণের নিকট অভিযোগ করে, কিন্তু কিছুতেই শঙ্করদেবকে নিরস্ত করিতে পারে নাই। কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণ, শঙ্করদেবের ধর্ম্মভাব ও চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু শঙ্করদেব, অসচ্চরিত্র রাজাকে শিষ্য করিবেন না বলিয়া, নরনারায়ণকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। শঙ্করদেবের প্রচারিত ধর্ম্মে নামসাধন ও নামসংকীর্ত্তন ভিন্ন আর কোন অনুষ্ঠান নাই। শঙ্করদেব শ্রাদ্ধ প্রভৃতি বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন; আবার চৈতন্যেরও সেই মত। শঙ্কর শিষ্যদিগকে এই প্রকার উপদেশ দিতেন, যথা——

"দেবী দেউ ন করিবা সেউ;
গৃহেও না যাবা, প্রসাদ না খাবা, ভক্তির হব ব্যভিচার।
"এক দেউ, এক সেউ,
এক বিনা নাহি কেউ"।

দেব দেবীর সেবা করিবে না; দেব-গৃহে যাইবে না, দেবতাদিগের প্রসাদ ভক্ষণ করিবে না, ইহা করিলে ভক্তির ব্যভিচার হইবে।

এক দেবতা, সুতরাং এক দেবতাকেই সেবা কর, এক দেব ভিন্ন অন্য কিছুই নাই।

শঙ্করদেবের বংশ অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। মাধবদেবের বংশের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। ১৪৯০ শকে ১১৯ বৎসর বয়সে শঙ্করদেবের মৃত্যু হয়। রাঃ কুঃ ভঃ

কাতন্ত্র-জীবনী।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কাত্যায়ন।

(ভারতী, ২য় ভাগ ৪১২ পৃষ্ঠার পর)

ভুবন-বিখ্যাত বৈয়াকরণ কাত্যায়ন-বররুচিমুনি সম্বন্ধে, আমরা এই প্রকরণে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। সর্ব্ববর্ম্মা কাতন্ত্রের কৃৎ-সূত্র প্রণয়ন করেন নাই; বিবুদ্ধিদের হিতের জন্য কাত্যায়ন তাহা প্রণয়ন করিয়াছেন; (১) এতন্নিবন্ধনই কাতন্ত্রের সহিত কাত্যায়নের জীবন-গত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে।

সুপ্রসিদ্ধ মেদিনী-কোষ-প্রণেতা মেদিনীকর এবং কাতন্ত্র-পঞ্জিকা-প্রণেতা ত্রিলোচন দাস, কাত্যায়নের অপর নাম বররুচি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (২)। সুসেন কবিরাজ, রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি কাতন্ত্র-টীকাকার মহাত্মাগণের মতে কাত্যায়ন মুনি বররুচি-শরীর পরিগ্রহ করিয়া এই শাস্ত্র (ব্যাকরণ) প্রণয়ন করিয়াছেন। (৩)

উল্লিখিত বিভিন্ন মত গ্রহণ করিলে ইহা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে প্রতীতি হয় যে, যে কাত্যায়ন মুনির অপর নাম বররুচি। তিনিই কাতন্ত্র-কৃৎ-সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। এই কাত্যায়ন, কাত্যায়ন-বররুচি নামেই প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষে অনেক কাত্যায়ন আবির্ভূত হইয়াছিলেন (১) বোধ হয় এই বৈয়াকরণ কাত্যায়নকে অন্যান্য কাত্যায়ন হইতে বিশেষ করিবার জন্য লোকে ইহার দুইটী নাম একত্র সংযোগ করিয়া "কাত্যায়ন-বররুচি"

(১) বৃক্ষাদিবদমীরূঢ়াঃ কৃতিণা ন কৃতা কৃতঃ। কাত্যায়নেন তে সৃষ্টা বিবুদ্ধিপ্রতিবুদ্ধয়ে। দুর্গসিংহ।

(২) "কাত্যায়নো বররুচৌ বিশেষে চ মুনেঃ পুমান্।" মেদিনী, ন চতুষ্কম্, শ্লোঃ ১৭৭। তর্হি কেন কৃতা ইত্যাহ কাত্যায়নেন বররুচিনা ত্রিলোচন-কৃত "কাতন্ত্র পঞ্জিকা।"

(৩) "কাত্যায়ন মুনির্বররুচিশরীরং পরিগৃহ্য শাস্ত্রমিদং কৃতবান।" সুসেন কবিরাজ-কৃত "কলাপ-চন্দ্র" এবং রঘুনাথ শিরোমণি কৃত "কলাপ তত্ত্বার্ণব" দ্রষ্টব্য।

(১) দশরথ রাজারও কাত্যায়ন নামে এক মন্ত্রী ছিলেন;—"সুযজ্ঞ আর গৌতম, জাবালি কাত্যায়ন, মার্কণ্ডেয় দীর্ঘ আয়ুশালী মহর্ষি কাশ্যপ,—এই দ্বিজ ছয় জন ছিলেন রাজার মন্ত্রী বুদ্ধি বিচক্ষণ। শ্রীযুক্ত-রাজকৃষ্ণ রায় অনুবাদিত রামায়ণ বালকাণ্ড ১৮ পৃষ্ঠা। বুদ্ধদেবের এক শিষ্যের নাম কাত্যায়ন ছিল। আমাদের মতে পালী ভাষার ব্যাকরণ প্রণেতাও এক স্বতন্ত্র কাত্যায়ন। (২য় ভাগ ভারতীর ৪১১। ৪১২ পৃষ্ঠা।)

আখ্যা প্রদান করিয়াছে (১)। এই কাত্যায়ন, পাণিনি ঋষি প্রণীত ভুবনাদ্বিতীয় ব্যাকরণের বার্ত্তিক প্রণয়ন করিয়া এতাদৃশ দক্ষতা ও বিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন যে তাহা দেখিলে, এখনো পৃথিবীস্থ সকলকেই আশ্চর্য্য হইতে হয়। এক মাত্র পাণিনির বার্ত্তিক প্রণয়নেই ইহা নিঃসন্দেহ রূপে সপ্রমাণ হইতেছে যে কাত্যায়ন একজন অসাধারণ ব্যাকরণ-সমালোচক এবং অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ। ইনিই পাণিনির সর্ব্ব প্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান সমালোচক। ইহার পূর্ব্বে কেহই পাণিনি-সূত্রের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই (২)। আমাদের দুর্ভাগ্য বশত এই বৈয়াকরণ-প্রধান এবং মুনিপ্রধান কাত্যায়নের জীবনী সম্বন্ধে দুই একটী অবিশ্বাস্য ও অস্বাভাবিক উপাখ্যান ব্যতীত সকলি অতীত কালীয় ঘোরান্ধকারে পর্য্যুষিত হইয়াছে।

কথাসরিৎসাগর নামক গ্রন্থে (৩) কাত্যায়ন মুনি সম্বন্ধে এই উপন্যাস লিখিত আছে—পুষ্পদন্তক নামক একজন মহাদেবের অনুচর, পার্ব্বতীর অভিশাপে নরলোকে অবতীর্ণ হইয়া, বৎস্য-রাজধানী কৌশাম্বীতে সোমদত্ত নামক জনৈক ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম হওয়া মাত্রেই এই আকাশবাণী হয় "এই বালক শ্রুতিধর হইবে এবং বর্ষ (পণ্ডিত বিশেষ) হইতে নানা বিদ্যা শিক্ষা করিবে। ব্যাকরণ শাস্ত্রে লোকসমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। এবং শ্রেষ্ঠ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবে বলিয়া লোক সমাজে বররুচি নামে পরিচিত হইবে (২)।"

(১) অতি পূর্ব্বকাল হইতে এদেশে এ প্রথা বিলক্ষণ প্রচলিত আছে—যথা রাম বলরাম, কখন বংশের নাম যোজনা করিয়া ও তজ্জাতীয় নাম হইতে বিশেষ করা হইয়াছে—ভৃগুরাম। এইরূপ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, কৃষ্ণার্জ্জুন ইত্যাদি।

(২) বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত "পাণিনি" ১১৩ পৃষ্ঠা।

(৩) প্রথিত আছে, পূর্ব্বে কাত্যায়ন মুনি বৃহৎ কথা নামে সপ্তলক্ষ শ্লোকাত্মক গ্রন্থ রচনা করিয়া কাশভূতিকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন *। পরে সোমদেব ভট্ট খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে অনন্ত পত্নী সূর্য্যবতীর চিত্ত-বিনোদনার্থ উহার সারাংশ সংকলন করিয়া "কথা সরিৎ নাগর নামক আখ্যায়িকা প্রচারিত করেন। (বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত পাণিনি নামক প্রস্তাব ২২।২৩ পৃষ্ঠা)

(২) "একঃ শ্রুতিধরো জাতো বিদ্যাং বর্ষাদবাপ্স্যতি। কিঞ্চ ব্যাকরণং লোকে প্রতিষ্ঠাং প্রাপয়িষ্যতি॥ নাম্না বররুচির্লোকে যত্তদস্মৈ হি রোচতে। যদ্ যদ্ বরং ভবেৎ কিঞ্চিদিত্যুক্ত্বা বাগুপারমৎ॥"

* কেহ গুণাঢ্যকে বৃহৎ কথার রচয়িতা বলেন "বৃহৎকথা ভূতভাষাখ্যো গ্রন্থভেদঃ। ভূতভাষাপ্রণেতাসৌ গুণাঢ্যঃ কবিরুচ্যতে॥" (বাসবদত্তা টীকায় নরসিংহ বৈদ্যধৃত বাক্য) "ভূতভাষা কবিবৃষো গুণাঢ্যশ্চাপি কীর্ত্তিতঃ" উত্তরতন্ত্র।

উপন্যাস অনুসারে মলয়বান নামক পুষ্পদন্তের জনৈক বন্ধু শাপগ্রস্ত হইয়া মর্ত্ত্য লোকে প্রতিষ্ঠান নগরে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মিয়া গুণাঢ্য নামে অভিহিত হয়েন।

("উইলসন সাহেব কৃত" সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ১ম খণ্ড ১৬২ পৃষ্ঠা)

এই কাত্যায়ন বাল্যকাল হইতে অসাধারণ স্মৃতিশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। তিনি একদা কোন দৃশ্য-কাব্যের অভিনয় সন্দর্শন করিয়া তাঁহার মাতার নিকট আনুপূর্ব্বিক বলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ইঁহার উপনয়ন হওয়ার পূর্ব্বেই ব্যাড়ির মুখে কোন প্রাতিশাখ্য শুনিয়া তাহা সমুদয় কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। পরে বর্ষের নিকট নানা শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়া ছিলেন এবং পাণিনিকে ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় তর্কে পরাস্ত করিয়া ছিলেন কিন্তু মহাদেবের বিশেষ কৃপায় পাণিনিই পরে তর্কে বিজয়ী হয়েন। কাত্যায়ন মহাদেবের ক্রোধশান্তির জন্য পাণিনি ব্যাকরণ পাঠ করিয়া তাহার সংশোধন এবং অসম্পূর্ণতা বিদূরিত করেন। কাত্যায়ন পরিশেষে মগধরাজ নন্দের মন্ত্রী হইয়া ছিলেন। (১)

মতান্তরে কথাসরিৎ-সাগরের এই গল্পটী অন্যরূপে বিবৃত আছে। তাঁহাদের মতে কথাসরিৎ-সাগরের চতুর্থ অধ্যায়ে যেরূপ উপন্যাস লিখিত হইয়াছে তাহার সারাংশ এই—কাত্যায়ন-বররুচি কাণভূতির নিকট উপকোষার সহিত আপনার বিবাহের পরবর্ত্তী ঘটনা এইরূপ বিবৃত করিতেছেন,—"বর্ষের ছাত্রদের মধ্যে পাণিনি নামে একজন অতি স্থূলবুদ্ধি ব্রাহ্মণসন্তান ছিলেন। এই পাণিনি বিদ্যাশিক্ষায় অপারগ হওয়াতে স্বশ্রেণী হইতে দূরীকৃত হন। তাহাতে তিনি নিতান্ত অপমানিত হইয়া হিমালয়ে যাইয়া বিদ্যালাভের জন্য কঠোর তপস্যা করেন। পাণিনির কঠিন তপে তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাহাকে সমস্ত বিদ্যার নিঃশ্রেণী-স্বরূপ এক খানা ব্যাকরণ অর্পণ করেন। পাণিনি এইরূপে সফলমনোরথ হইয়া প্রকাশ্য বিচারে আমাদিগকে আহ্বান করেন, এক সপ্তাহ কাল তুমুল বিচার হয়, আট দিনের দিন একটী ভয়ানক শব্দ সমুত্থিত হইয়া আমাকে এবং আমার সহযোগীগণকে একেবারে হতবুদ্ধি ও বিচার্য্য বিষয়ে দিশাহারা করিয়া ফেলে, সুতরাং পাণিনি বিজয়ী হইলেন। এই সময় হইতে পাণিনি-ব্যাকরণ, আমার এবং ইন্দ্রদত্ত প্রভৃতির ব্যাকরণের গুণাতিক্রমী হইয়া উঠে এবং আমাদের বাধ্য হইয়া পাণিনির প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়।" (১)

উল্লিখিত উপাখ্যান অনুসারে কাত্যায়নকে মগধাধিপতি সুবিখ্যাত নন্দের মন্ত্রী দেখিয়া তাঁহাকে খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দির লোক বলিয়া বিবেচনা হইতে পারে।

(১) মোক্ষ মুলরের উদ্ধৃত কিম্বদন্তী।

(১) উইলসন সাহেবের "সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ" ১ম খণ্ড ১৬৯—১৭০ পৃষ্ঠা। ইহার সহিত গোল্ডষ্টুকরের আখ্যায়িকার কিঞ্চিৎ বৈসাদৃশ্য আছে। গোল্ডষ্টুকারের পাণিনি ৯৮৪। ৮৫ পৃষ্ঠা।

আমরা কাত্যায়ন সম্বন্ধীয় উপাখ্যান বাবু রজনীকান্ত গুপ্তের পাণিনি হইতে প্রায় উদ্ধৃত করিলাম। এই প্রস্তাবে তাঁহার "পাণিনি" নামক প্রস্তাব হইতে অনেক সাহায্য পাইব।

কেননা নন্দ সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রগুপ্তের অব্যবহিত পূর্ব্বে মগধ রাজ্যের সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন, ভারত ইতিহাস অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত খ্রীঃ পূঃ ৩১৫ অব্দে মগধ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই জন্যই মোক্ষমূলর কাত্যায়নকে খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দির পরার্দ্ধের লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন(১)। অধ্যাপক বোৎলিঙ্ক্ প্রায় উক্ত মতের অনুকরণ করিয়াছেন(২)। কিন্তু আমরা তাঁহাদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। এমন কি তাঁহারা যে "কথা সরিৎসাগরের" উপন্যাসের প্রতি বিশ্বাস করিয়া উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন সেই উপন্যাসই আমাদের নিকট নিতান্ত অবিশ্বাস্য বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। কেননা, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সর্ব্ববর্ম্মা শালিবাহনকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য কাতন্ত্র (সন্ধি, চতুষ্টয় ও আখ্যাত) খ্রীষ্টের জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রণয়ন করিয়াছেন। কাত্যায়ন কাতন্ত্রে কৃৎ প্রকরণে অভাব দেখিয়াই কৃৎসূত্র বিরচন করেন। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যখন কাতন্ত্র সাধারণ্যে কথঞ্চিৎ প্রচরদ্রূপ হইয়াছিল এবং তাহাতে কৃৎসূত্রের অভাব লক্ষিত হইয়াছিল তখনি কাত্যায়ন সেই অভাব দূরীকরণ জন্য কাতন্ত্রের কৃৎসূত্র প্রণয়ন করেন। যদি কাত্যায়ন সর্ব্ববর্ম্মার কাতন্ত্র প্রণয়নের ন্যূনকল্পে ১০।১৫ বৎসর পরেও কৃৎসূত্র প্রণয়ন করিয়া থাকেন তবে তিনি প্রায় খ্রীষ্টের জন্মের সমকালে যে কৃৎসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মনে কর, কাত্যায়ন নিতান্ত বৃদ্ধ বয়সে ৮০।৯০ কি ১০০ বৎসর বয়সে ও যদি কাতন্ত্রের কৃৎসূত্র প্রণয়ন করিয়া থাকেন তবে তিনি খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দি কিম্বা তদপেক্ষা ২০।৩০ বৎসরের পূর্ব্বের লোক কখনি হইতে পারেন না। সুতরাং আমরা মোক্ষমূলার অথবা বোৎলিঙ্কের যুক্তির উপর কি প্রকারে আস্থাবান হইব। এবং কথাসরিৎসাগরের উপন্যাসের উপর নির্ভর করিয়া প্রায় সার্দ্ধদ্বিশত বৎসরের পূর্ব্বকালীন মহারাজ নন্দের মন্ত্রী বলিয়াই তাঁহাকে কি প্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে? আমরা বেস্ বলিতে পারি কাত্যায়ন মুনি ছিলেন বলিয়াই প্রায় ৩৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী নন্দের মন্ত্রিত্ব পদে নিযুক্ত থাকিয়া পরে ৩৫০ বয়ঃক্রম সময়ে কাতন্ত্রের কৃৎসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন—একথা এখন কেহই সম্ভবপর বলিয়া জ্ঞান করিবেন না। এখন যদি আমরা কাত্যায়নের আবির্ভাব কাল খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দির প্রারম্ভ কিম্বা তাহা অপেক্ষা কয়েক বৎসর পূর্ব্ব সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করি, বোধ হয়, তাহা হইলে নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইব না।

অনেকে আপত্তি করিতে পারেন যে, যখন রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে "অভিমন্যু, চন্দ্র এবং অন্যান্য ব্যাকরণ প্রণেতা-

(১) মোক্ষমূলার কৃত "প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস" নামক গ্রন্থ ২৪২—২৪৩ পৃষ্ঠা।

(২) Vide Otto Boethlingk's Pánini p. xiv.-xviii.

গণকে পতঞ্জলির মহাভাষ্য স্বদেশে প্রবর্ত্তিত করিতে আদেশ করেন(১) তখন কাত্যায়ন কি প্রকারে খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দির লোক? কেননা বোৎলিঙ্কের মতে এই অভিমন্যু খ্রীষ্টের শত বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন(২)। পতঞ্জলীর মহাভাষ্য অবশ্য তাহারো পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছে এবং যখন কাত্যায়নের বার্ত্তিকের অনেক অংশ লইয়া পতঞ্জলি প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রদর্শন করিয়াছেন তখন কাত্যায়নের বার্ত্তিক যে আবার পতঞ্জলির মহাভাষ্যের পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। এমত হইলে কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি উভয়েই খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দিরও অনেক পূর্ব্বের লোক হইয়া পড়েন সুতরাং আমরা উপরে কাত্যায়নের আবির্ভাব কাল যেরূপ নির্ণয় করিয়াছি তাহাতে প্রমাদ লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু আমরা বোৎলিঙ্কের মত ছাড়িয়া অভিমন্যুর সময় নিরূপণ সম্বন্ধে মতান্তরের আশ্রয় লইলে আমাদের নির্দ্দিষ্ট কাল সম্বন্ধে আর কোন গোল থাকে না। বোৎলিঙ্কের মতে অভিমন্যু খ্রীঃ পূঃ ১০০ অব্দের পূর্ব্বে কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন কিন্তু শাস্ত্রপ্রবীণ লাসেন প্রাচীন মুদ্রা সকল পর্য্যালোচনা করিয়া অভিমন্যুর রাজত্বকাল ৪০ ও ৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী ভাগকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৩)। গোলডষ্টুকর এবং মোক্ষমূলার লাসেনের মতকেই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন(১)। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কাত্যায়ন খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দির প্রারম্ভে কিম্বা তাহা অপেক্ষা কএক বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হয়েন; এখন সে কথার এইরূপ সামঞ্জস্য হইতে পারে——বাল্যাবধি কাত্যায়নের যে প্রকার অসীম বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির বিষয়ে উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার পক্ষে ন্যূনাধিক ত্রিংশত বর্ষ বয়সে মহোদধিসম অগাধ বৈয়াকরণিক জ্ঞান লাভ করা একরূপ তুচ্ছ কথা। আমরা তাঁহার পঞ্চাশত বর্ষ বয়ঃক্রম কাল (খ্রীঃ পূঃ ৪০ কি ৫০ অব্দ) পর্য্যন্ত বার্ত্তিক প্রণয়ন সময় নির্দ্দেশ করিলাম(২)। তৎপর আর ত্রিশ বৎসর (খ্রীঃ পূঃ ৪০।৫০ হইতে ৬০।৭০ অব্দ) মধ্যে পতঞ্জলিকৃত পাণিনি—মহাভাষ্যের কাল নির্দ্দেশ করিলাম। পতঞ্জলির ন্যায় একজন জগৎবিখ্যাত মহর্ষির লেখনী হইতে যে মহাভাষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে সেই মহাগ্রন্থ খ্রীঃ পূঃ ৬০। ৭০ অব্দ হইতে ৫০ কি ৬০ অব্দ পর্য্যন্ত ১০০

(১) এবং (২) Vide Otto Boehtlingk's Pánini p. xiv-xviii.

(৩) Indian Antiquities, vol. ii. p. 413.

(১) গোলডষ্টুকরের "পাণিনি" ৮৫-৮৬পৃষ্ঠা। মোক্ষমূলার কৃত "প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ২৪৩ পৃষ্ঠা।

(২) মোক্ষমূলারের মতে কাত্যায়নের বার্ত্তিক খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দির প্রারম্ভে বিরচিত হয়। (Müller's An. San. Lit. p. 244:) কাতন্ত্রের সহিত যে কাত্যায়নের সম্পর্ক আছে ইহা জানিলে বোধ হয়, মোক্ষমূলার এ ভ্রম করিতেন না!

বৎসরে সমস্ত ভারতে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া কাশ্মীররাজ অভিমন্যুর দেশে আসিয়া তাঁহার আদেশে প্রচারিত হইবে আশ্চর্য্য কি? কৃৎসূত্র প্রণয়ন জন্য কাতন্ত্রের সহিত কাত্যায়নের যে জীবনগত সম্পর্ক আছে তাহা পর্য্যালোচনা করিলে কাত্যায়ন যে খ্রীষ্টের জন্ম সময়ে জীবিত ছিলেন তৎসম্বন্ধে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। সুতরাং অভিমন্যুর রাজত্বকাল নিরূপণ সম্বন্ধে যে বোৎলিঙ্ক বিষম ভ্রম করিয়াছেন তাহা একটুকু বিবেচনা করিলে সম্যক্ প্রতীতি হয়। কেননা যদি বোৎলিঙ্কের মতানুযায়ী অভিমন্যুর রাজত্বকাল খ্রীঃ পূঃ শতবৎসর পূর্ব্বে হয় তবে পতঞ্জলীর মহাভাষ্য ইহার অনেক পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে এবং কাত্যায়নের বার্ত্তিক ইহাপেক্ষাও পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছে, অতএব যখন কাত্যায়ন কাতন্ত্রের কৃৎসূত্র প্রণয়ন করেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ২০০ কি ২৫০ বৎসর হইয়াছিল, ইহা কি কেহ বিশ্বাস করিবেন?

গোল্ডষ্টুকারের মত গ্রহণ করিয়া কেহ কেহ কাত্যায়ন এবং মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিকে সমসাময়িক লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন(১) এবং কেহবা কাত্যায়নকে পতঞ্জলির আচার্য্য বলিয়া থাকেন (২) এ উভয় কথাই আমাদের নিকট নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না। আমরা উপরে বলিয়াছি কাতন্ত্রের কৃৎসূত্র প্রণয়ন জন্য কাতন্ত্রের সহিত কাত্যায়নের জীবনগত যে সম্বন্ধ আছে তাহাতে প্রমাণ হইতেছে, যে তিনি খ্রীষ্টের জন্মের সমকালে জীবিত ছিলেন। আবার কাতন্ত্রের সহিত তাঁহার জীবনগত সম্বন্ধ থাকাতে ইহাও বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে যে তিনি খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দির প্রারম্ভে অথবা তাহা অপেক্ষা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দির যে আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন তাহা একরূপ ঠিক হইল। যখন পতঞ্জলির মহাভাষ্য ৫০ কি ৬০ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীররাজ অভিমন্যুর আদেশে তদ্দেশে প্রচারিত হয় তখন অবশ্য ঐ মহাভাষ্য ভারতে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। আজ কাল মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে যদিচ কোন গ্রন্থের উৎকর্ষাপকর্ষ ৫বৎসরেই সমুদায় স্থানে নির্ব্বাচিত হইতে পারে কিন্তু পূর্ব্বকালে রত্নসম অমূল্য গ্রন্থও ৬০।৭০ বৎসরের ন্যূনে জনসমাজে সমালোচিত হইয়া তাহার উত্তমাধমতা সাধারণ্যে নির্ব্বাচিত হইত না; সুতরাং পতঞ্জলির মহাভাষ্য যে অভিমন্যুর সময় অপেক্ষা ন্যূন কল্পে ৮০।৯০ বৎসরের পূর্ব্বের গ্রন্থ তাহার সন্দেহ নাই। এবং মহাভাষ্য কাত্যায়নের বার্ত্তিকের পরকীয় গ্রন্থ হইলেও যে খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দির পরার্দ্ধে রচিত হইয়াছে তাহার কোন ভুল নাই(১) সুতরাং কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলি

(১) Chamber's Encyclopædia "Katyana" এবং ঐতিহাসিক রহস্যের বররুচিশীর্ষক প্রস্তাব।

(২) Chamber's Encyclopædia vol. vii. p. 232, "Panini."

(১) কাহারও কাহারও মতে পতঞ্জলি

যে খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দির অনেক সময় উভয়ে একত্র বর্ত্তমান ছিলেন তাহা স্পষ্টতঃ লক্ষিত হইতেছে।

যখন উভয়েই এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন তখন কাত্যায়ন পতঞ্জলির আচার্য্য হইবেন তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি? কিন্তু কেহ কেহ একথায় আপত্তি করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন "কাত্যায়ন পাণিনির এক জন মহা প্রতিদ্বন্দ্বী। অনেক স্থলে পাণিনির দোষ প্রদর্শনার্থই তদীয় বার্ত্তিক প্রণীত হইয়াছে। পক্ষান্তরে পতঞ্জলির ভাষ্য অন্যবিধ উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে। পতঞ্জলি অনেক স্থলে পাণিনিকে কাত্যায়নের প্রবল আক্রমণ হইতে বিমুক্ত করিতে যথা সাধ্য চেষ্টা পাইয়াছেন। বস্তুতঃ বার্ত্তিককৃত আক্রমণ নিবারণ জন্য পতঞ্জলির মহাভাষ্য একটী সুদৃঢ় দুর্গ স্বরূপ। কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিতে গুরুশিষ্য-ভাব নিবদ্ধ থাকিলে পতঞ্জলি কদাপি কাত্যায়নের মতবিরোধী হইয়া পাণিনির পোষকতা করিতেন না। অন্তেবাসী কখনও পূজ্যপাদ আচার্য্যকে সাধারণ্যে অপদস্থ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া ঈদৃশ বিচারমল্লতা প্রদর্শন করেন না(১)। কাত্যায়নকে পতঞ্জলি সাধারণ্যে কি অপদস্থ করিলেন তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রবেশ করিল না। কাত্যায়ন পাণিনির যে সকল ভ্রম ধরিয়াছেন পতঞ্জলি শুধু তাহা অভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছেন; ইহা ব্যতীত তিনি কাত্যায়নকে কোন স্থলে একটুকু নিন্দা অশ্রদ্ধা বা অমান্য করেন নাই। এমত হইতে পারে, কাত্যায়ন পাণিনির যে যে ভ্রম ধরিয়াছেন তাহাতে পতঞ্জলির সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে এবং তিনি মুনিপ্রধান পাণিনির মতকেই অধিক সারবান জ্ঞান করিয়া তাঁহার মতকেই বজায় রাখিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। গুরুর বাক্যে এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়াই বা অসম্ভব কি? মনে কর যদি তোমার আচার্য্য, মহর্ষি বেদব্যাস অথবা তৎতুল্য কোন এক জন জগৎবিখ্যাত মুনির একটী ভ্রম দেখাইয়া দেন সে ভ্রমটী প্রকৃত হইলেই তাহা তোমার নিকট ভ্রম বলিয়া বিশ্বাস হইবে? তোমার ইহা অবশ্য মনে হইবে যে মহর্ষি বেদব্যাসের কখনই ভ্রম হয় নাই—ইহা আমার আচার্য্যেরই বুঝিবার ভ্রম। যদি সেই বিষয়টী তোমার লোকসমাজে প্রকাশ করিতে হয় তবে তোমার নিজের বিশ্বাসই নানা যুক্তি দ্বারা বজায় রাখিতে যত্ন করিবে;——অন্যথা তুমি পর-মত-গ্রাহী। এমত স্থলে তোমার আচার্য্যের বাক্যে উ-

খ্রীঃ পূঃ ১৯৫-১৯২ অব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। (বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত "পাণিনি প্রস্তাব" ১৩৭ পৃষ্ঠা) অধ্যাপক রামকৃষ্ণ গোপাল ভণ্ডারকরের মতে মহাভাষ্যের কোন অংশের রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ১৪৪-১৪২ অব্দ। (ঐ) ইহাদের যুক্তি যে ততদূর ঠিক নহে তাহা উপরের কথাগুলি পাঠ করিলেই সম্যক প্রতীতি হইবে।

(১) বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত পাণিনি নামক প্রস্তাব ১১৫ পৃষ্ঠা।

পেক্ষা করিয়া তোমার নিজ বিশ্বাসকে লোকসমাজে প্রকাশ করিলে বলিয়াই কি আচার্য্যকে অপদস্থ করিলে? বিবেচকগণ ইহার উত্তরে অবশ্যই বলিবেন "না"। এখন মনে কর তুমি যে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তোমার আচার্য্যের বাক্যানুসারে ব্যাসদেবের কথাকে ভ্রম বলিয়া লোকসমাজে প্রকাশ করিতে সাহসী হও নাই——পতঞ্জলিরও পাণিনির উপর সেই (ব্যাসদেবের ন্যায়) বিশ্বাস ছিল সুতরাং তিনি তাঁহার আচার্য্যের (কাত্যায়নের) কথায় পাণিনির যুক্তি ভ্রম বলিয়া প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই কেননা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস পাণিনির বাক্য বেদবাক্য তুল্য; তাঁহার বাক্যে যাহার সন্দেহ হয় তাহারই বুঝিবার ভ্রম। কথিত আছে মহাত্মা শুকদেব, তদীয় জনক মহর্ষি বেদব্যাসের যুক্তিতে সন্দিহান হওয়াতে রাজর্ষি জনকের নিকট গমন করিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন (১)। তাই বলিয়াই কি তিনি ব্যাসকে সাধারণ্যে অপদস্থ করিয়াছিলেন? কখনি নহে। এরূপ উদাহরণ আরো অনেক দেখান যাইতে পারে বাহুল্য ভয়ে ক্ষান্ত থাকিলাম। "কাত্যায়ন-বাক্য-সন্দিগ্ধ—পতঞ্জলি ঋষিপ্রধান পাণিনির বাক্য সমর্থন করিয়া কাত্যায়নকে সাধারণ্যে অপদস্থ করিয়াছেন" এরূপ সন্দেহ করা বাস্তবিকই বিবেচক-বহির্ভূত কার্য্য। অতএব পতঞ্জলি অনেক স্থলে কাত্যায়নের বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া পাণিনির বাক্যের প্রতিবাদ করেন নাই, কেবল এই মাত্র কথাতেই তিনি (পতঞ্জলি) কাত্যায়নের শিষ্য নহেন ইহা বলা যাইতে পারে না। যখন কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি উভয়ে অনেক কাল একত্র বর্ত্তমান ছিলেন তখন "কাত্যায়ন পতঞ্জলির আচার্য্য ছিলেন" একথায় অসম্ভব কি?

কথা সরিৎ সাগরের উপন্যাস অনুসারে কাত্যায়ন এবং পাণিনি এক সময়ের লোক বোধ হয় এই জন্যই কোন কোন মহাত্মা কাত্যায়ন এবং পাণিনিকে সম-সাময়িক লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; (১) আমরা এ কথা লইয়া অধিক আন্দোলন করিব না—তাহাতে আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের (কাত্যায়নের জীবনীর) কোন অংশেরই কিছু পোষকতা করিবে না। আমরা যে উপরে কাত্যায়নের আবির্ভাব কাল খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দির প্রারম্ভ কিম্বা তাহা অপেক্ষা কিছু পূর্ব্বের সময় নির্দ্দেশ করিয়াছি; কোন মহাত্মাই এমন ভাল প্রমাণ দিতে পারেন

(১) যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ দ্রষ্টব্য।

(১) মোক্ষ মূলারকৃত "প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য" ১৩৮, ৩০৩ এবং ২৪৪ পৃষ্ঠা, তিনি অন্য স্থলে বলিয়াছেন "যদি কাত্যায়ন ও পাণিনির আবির্ভাবের সময় এক না হয়। ঐ ১৮৪ পৃষ্ঠা।

শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রকাশিত সিদ্ধান্তকৌমুদীর "পাণিনীয়াগমকালাদি নির্ণয়" প্রস্তাবে—তিনি বলেন ব্যাড়ি (ব্যালি) পাণিনি ও কাত্যায়ন এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

নাই যে তাহার বলে উহার ব্যতিক্রম করিতে সাহসী হইতে পারি। কাত্যায়নের সময় সম্বন্ধে কেহই তেমন অভ্রান্ত প্রমাণ দেন নাই; (১) প্রত্যুত যিনিই কাত্যায়ন লইয়া কিছু আন্দোলন করিয়াছেন কেবল স্বীয় অনুমানের আশ্রয় লইয়াই প্রায় তাহার পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস কাতন্ত্রের কৃৎ-সূত্র প্রণয়ন জন্য কাতন্ত্রের সহিত কাত্যায়নের জীবনগত সম্পর্ক থাকাতে তদীয় কালনিরূপণ সম্বন্ধে যেমন একটী প্রমাণ আবিস্কার হইয়াছে; আমরা যত দূর জানি; তাহাতে ইতি পূর্ব্বে ঈদৃশ কোন সটীক প্রমাণ আবিস্কৃত হয় নাই—অনেকেই কাত্যায়নের আবির্ভাব-কাল-নির্ণয় লইয়া বিশেষ সন্দিহান আছেন; (২) তবে আমাদের বিশ্বাস পাণিনি কাত্যায়ন হইতে অনেক পূর্ব্বের লোক; কেহ বলেন পাণিনি সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ৮০০ ও ৭০০ অব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন (১)। আমাদের বিবেচনায় পাণিনি ইহা অপেক্ষাও অনেক পূর্ব্বের লোক (২)।

(১) শ্রীযুক্ত মণিয়ারউ ইলিয়ম্‌স্ সাহেব বলেন "কাত্যায়ন সম্ভবতঃ পাণিনির এক শত বৎসর পরে বিশ্বসংসারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

Indian Wisdom, p. 176. রজনী বাবুও এই মত অধিক সঙ্গত বলিয়াছেন। "পাণিনি" নামক প্রস্তাব ১১৬ পৃষ্ঠা।

(২) শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত বলেন "যদিও কাত্যায়নের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন বিশ্বাস্য প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, তথাপি দৃঢ়তা সহকারে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, তিনি পাণিনির পরে ও পতঞ্জলির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।" পাণিনি নামক প্রস্তাব ১১৬ পৃষ্ঠা। মোক্ষমূলারও যে কাত্যায়নের আবির্ভাব সময় সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন তাহা তাঁহার এই কথাতেই বুঝা যাইবে "যদি কাত্যায়ন ও পাণিনির আবির্ভাবের সময় এক না হয়"। মোক্ষমূলারের "প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য" ১৮৪ পৃষ্ঠা।

(১) বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত পাণিনি নামক প্রস্তাব ৯১ পৃঃ।

(২) বাবু রামদাস সেন মহাশয়ের মতেও পাণিনি, রজনী বাবুর নির্দ্দিষ্ট কাল হইতে অনেক পূর্ব্বে আবির্ভাব হইয়াছিলেন; ৫ম ভাগ বান্ধব ৫ম সংখ্যা পাণিনি শীর্ষক প্রস্তাব দেখ।

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়, পাণিনি যে কাত্যায়ন হইতে অনেক পূর্ব্বের লোক-সে সম্বন্ধে যে যুক্তি দিয়াছেন তাহার সারাংশ এই—কাত্যায়ন পাণিনি প্রণীত ৩৯৯২ কিম্বা ৩৯৯৩ সূত্রের মধ্যে সার্দ্ধ সহস্র অপেক্ষা ও অধিক সূত্রে ভ্রম প্রদর্শন করিয়া স্বীয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। এতন্নিবন্ধন চারি সহস্র বার্ত্তিক বিরচিত হইয়াছে। এই চারি সহস্র বার্ত্তিকের মধ্যে আবার ন্যূনতঃ দশ সহস্র বিশেষ স্থল পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে পাণিনির গ্রন্থে এত দোষ বর্ত্তমান রহিয়াছে অথচ সেই পাণিনি পূর্ব্বকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ বলিয়া গণ্য; ইহার কারণ এই যে পাণিনি কাত্যায়ন হইতে বহু পূর্ব্বের লোক। পাণিনি এত পূর্ব্বের লোক যে, তাঁহার সময় যে সকল বৈয়াকরনিক নিয়মাদি শুদ্ধ রূপে পরিগণিত ছিল কালে কাত্যায়নের সময়ে তাহাই অপ্রচলিত ও অশুদ্ধ রূপে পরিণত হইয়াছিল। তিনি এতদুপলক্ষে গোল্‌ড্‌ষ্টুকরের নিম্নের চারিটি যুক্তি সমর্থন করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য সহকারে বিভিন্ন মত গ্রহণানন্তর স্বীয় মত আরো দৃঢ় করিয়াছেন।—

১ম। পাণিনির সময়ে যে সমস্ত বৈয়াকরণিক নিয়ম প্রচলিত ছিল তাহা কাত্যায়নের সময়ে অপ্রচলিত অথবা অবিশুদ্ধ হইয়া উঠে।

২য়। পাণিনির সময়ে শব্দ সমূহ যে যে অর্থদ্যোতক ছিল, তাহা কাত্যায়নের সময়ে অনেক রূপান্তরিত হইয়া যায়।

৩য়। পাণিনি-প্রযুক্ত শব্দার্থ সমূহ কাত্যায়নের সময়ে অপ্রচলিত ছিল।

৪র্থ। কাত্যায়নের সময়ে যে শব্দশাস্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহা পাণিনির সময়ে পরিজ্ঞাত ছিল না। বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত "পাণিনি" নামক প্রস্তাব ৩৪-৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১) বার্ত্তিকমিতি। সূত্রেঽনুক্ত-দুরুক্ত-চিন্তাকরত্বং বার্ত্তিকত্বম্। নাগোজীভট্ট কৃত কৈয়র্ট-টীকা।

(২) এই কয়খানি গ্রন্থ বৈয়াকরণ কাত্যায়ন বররুচি মুনি প্রণীত কিনা তৎসম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে।

কাত্যায়ন পাণিনির ব্যাকরণের বার্ত্তিক (১) ও সর্ব্ববর্ম্মাকৃত কাতন্ত্র ব্যাকরণের কৃৎ-সূত্র প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতার মাধ্যন্দিন প্রাতিশাখ্য, সর্ব্বানুক্রমণী ও বৈদিক কল্প-সূত্র কাত্যায়নের কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ (২)। ইহা ব্যতীত কাত্যায়ন-কৃত আর কি কি গ্রন্থ আছে জানা যায় নাই। আমরা বোধ করি কাত্যায়ন কাতন্ত্রের কৃৎ-সূত্রই সর্ব্বশেষে প্রণয়ন করেন।

মোক্ষমূলরের মতে কাত্যায়ন পাণিনির সম্পাদক এবং সমালোচক (১) তিনি বলেন পাণিনি-প্রণীত গ্রন্থ অপেক্ষাও বার্ত্তিকে (কাত্যায়নের) সংস্কৃত শাস্ত্রাভিজ্ঞতার উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে (২)। কাত্যায়নের কাতন্ত্র-কৃৎ-সূত্রের রচনা সম্বন্ধে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, সর্ব্ববর্ম্মার সূত্রের ন্যায় তাঁহার সূত্রগুলি তত সরল ভাষায় লিখিত হয় নাই। আর দুর্গসিংহ যদি বক্তব্য প্রণালীতে সূত্রের মধ্যে মধ্যে অতিরিক্ত সূত্র সংযোগ করিয়া না দিতেন তবে তাঁহার কৃতের মধ্যেও সর্ব্ববর্ম্মার অন্যান্য অংশের ন্যায় অনেক অভাব থাকিয়া যাইত।

কেহ এই কাত্যায়ন বররুচি ও "প্রাকৃত প্রকাশ" নামক প্রাকৃত-ব্যাকরণ-প্রণেতা বররুচিকে অভিন্ন লোক বলিয়া জ্ঞান করেন(৩)। আমাদের নিকট এই যুক্তি তাদৃশ প্রামাণ্য বলিয়া বোধ হয় না। পুরাতত্ত্বানুসারে "প্রাকৃত প্রকাশ" প্রণেতা বররুচি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতর রত্ন ছিলেন (৪)। নবরত্নের প্রতিষ্ঠাতা খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন এবং ইনি হর্ষ বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত(৫)।

(১) মোক্ষমূলারকৃত "প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য" ৩০৩ এবং ১৩৮ পৃষ্ঠা।

(২) ঐ গ্রন্থ ২৪১ পৃষ্ঠা।

(৩) মোক্ষমূলার কৃত "প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস" ১৭৬ পৃষ্ঠা।

(৪) সাহিত্য প্রবেশ (৯ম সংস্করণ)

(৫) "পাণিনি" নামক প্রস্তাব ১১৪ পৃষ্ঠা।

কিন্তু কাতন্ত্র-কৃৎসূ-ত্রপ্রণেতা কাত্যায়ন বররুচি প্রাকৃতপ্রকাশকার বররুচি হইতে অনেক পূর্ব্বের লোক সুতরাং এই দুই বররুচিকে অভিন্ন বররুচি বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

গোল্‌ডষ্টুকর এবং বেবের কাত্যায়নকে পূর্ব্বদেশবাসী বলিয়াছেন (১)। অধ্যাপক রামগোপাল ভণ্ডারকর মহাভাষ্যের একটী বাক্যের বলে কাত্যায়নকে দাক্ষিণাত্য-বাসী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছেন (১)। আমাদিগের নিকট পরবর্ত্তী মতই প্রামাণ্য বলিয়া বোধ হয়।

(শ্রী যাঃ——)

সাগর-সঙ্গমে।

(গাথা)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দামিনীর সেই যাতনা নেহারি,
রজনী গভীর হইলে পরে,
ধীরে ধীরে ধীরে সেই সে কুটীরে
শুইতে রোহিণী আসিল ঘরে।

শুয়ে শুয়ে ভাবে দামিনীর কথা,
বিজয়েরও কথা কোথায় যাবে,
ভূত ভবিষ্যত উলটি পালটি
এ কথা সে কথা কত কি ভাবে।

কোথায় বা তার প্রতাপ-কুমার
বিবাগী হইয়ে গিয়াছে চোলে,
কতই ভাবিছে—আপনি ভাবিছে—
আপনি ভাসিছে নয়ন-জলে।

ক্রমে ক্রমে হ'ল ঘুম আকর্ষণ,
ক্রমেতে নয়ন মুদিত হয়—
যেখানের হাত রহিল সেখানে,
মুখরা রোহিণী আর সে নয়।

(১) গোল্‌ডষ্টুকরের "পাণিনি ২০৫ পৃষ্ঠা।

(১) "যথা লৌকিক বৈদিকেষু" (যেমন লোকপ্রসিদ্ধ ও বেদপ্রসিদ্ধ বাক্য). পতঞ্জলি এই বার্ত্তিক লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন প্রিয়তদ্ধিতা হি দাক্ষিণাত্যাঃ। যথা লোকে বেদেচেতি প্রয়োক্তব্যে যথা লৌকিক বৈদিকেষ্বিতি প্রযুঞ্জতে (দাক্ষিণাত্যবাসীগণ তদ্ধিতপ্রিয়। লোকে এবং বেদে প্রয়োগের স্থলে ইহারা লৌকিক ও বৈদিক প্রয়োগ করিয়া থাকে) "পাণিনি" নামক প্রস্তাব ১১৭ পৃষ্ঠা। পতঞ্জলি কর্ত্তৃক কাত্যায়নের বার্ত্তিকের উপর এইরূপ পরিহাস দেখিয়া কাত্যায়ন যে দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে প্রতীতি হয়।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বিধবা রোহিণী
ভীষণ স্বপনে পেতেছে ত্রাস,
কণ্টকিত কায় ঘাম বোহে যায়,
আটকি পড়িছে অধীর শ্বাস।

দেখিল স্বপনে—বিকট শ্মশানে
কে যেন ধরিয়ে এনেছে তায়,
ঘোরা দ্বিপ্রহরা—অমার শর্ব্বরী,
প্রগাঢ় জলদে আকাশ ছায়।

ঘুমে ঘুমময় দিগন্ত ব্যাপিয়ে,
জমাট বেঁধেছে আঁধার হেন—
নিশ্বাস প্রশ্বাস টানিতে ফেলিতে,
পাঁজরের খীল আটকে যেন।

থেকে থেকে শুধু চপলা চমকে,
ঝলকে ঝলকে শ্মশান ভায়,
হেথায় জ্বলিছে চিতার আগুন,
হোথায় আলেয়া গড়ায়ে যায়।

হেথায় শিবার অশিব নিনাদ,
হোথায় গৃধিনী গরজে ঘোর,
আকাশের তলে তলে দলে দলে
উড়িছে শকুনী—তুলিছে শোর।

সুদূরে সেথায় মড়ার মাথায়
পিশাচের দল বসিয়া হাসে,
সে হাসি শবদে দিগন্ত বিদরে—
রোহিণী থমকি দাঁড়ায় ত্রাসে।

সহসা সমুখে শ্মশান-কালিকা—
—জলদ-প্রতিমা দিল যে দেখা,
ধ্বক ধ্বক জ্বলে নয়নে অনল,
লোল রসনা রুধির মাখা।

পলকে পলকে বিজলী দলকে
খরসান সেই কৃপাণ তাঁর,
তমো-তেজোময় মূরতি নেহারি
সভয়ে রোহিণী অসাড় প্রায়।

চিতার উপরে দাঁড়ায়ে কালিকা,
কহিতে লাগিলা গভীর রবে—
সপ্তসিন্ধু যেন প্রলয়ের দিনে
একত্রে গরজি উঠিল সবে—

নীরব হইল শকুনী গৃধিনী,
শৃগালের দল বিবরে পশে—
পুষ্কর-গর্জ্জনে নীরব শ্মশানে
কালিকা কহিতে লাগিল শেষে—

"তুই রে রোহিণী, মথুরা-বাসিনী,
ভাবিস কি আমি চিনি না তোরে ?
ভাবিস কি আমি জানি না শুনি না
বেড়াস তুই কি পাপের ঘোরে ?"

নীরব রোহিনী—নিষ্পন্দ রোহিনী—
বহে না হৃদয়ে রুধীর ধার,
কৃতজোড় করে কাঁপিছে রোহিনী—
যেন সে রোহিণী নহে রে আর।

পলক না যেতে, পিছন হইতে
প্রতাপের কেশ বাঁ হাতে ধ'রে—
শ্মশান-ঈশ্বরী রোহিণী-সমুখে
ধরিল তাহারে সরোষ-ভরে—

কহিলা—"এই না বিধবা রোহিণী—
এই না বিবাগী প্রতাপ তোর ?
পাপীয়সী ওরে, ইহারি না তরে
মজিলি আপনি পাপেতে ঘোর ?"

"হ্যাঁগো ওগো দেবী, নৃমুণ্ডমালিকে,
এই সে বিবাগী প্রতাপ মোর"—
কহিতে লাগিল বিধবা রোহিণী
বহিতে লাগিল নয়নে লোর।——

"এই যে বিবাগী প্রতাপ আমার,
ইহারি কারণে পাশরি সবে——
ভিখারিণী বেশে, ফিরি দেশে দেশে
সাগর-সঙ্গমে এসেছি এবে।

দাও মা গো দাও, শ্রীচরণে ধরি—
রোহিণীর দেবি মাথাটি খাও,
যুগান্তের পরে একবার ওরে
বিধবার কোলে ফেলিয়া দাও।"

যতই রোহিণী কহিতে লাগিল,
ততই কালিকা জ্বলিয়ে ওঠে,
লোল রসনা দোলে ঘন ঘন,
নয়নের কোণে আগুন ছোটে।

কহিলা—"রোহিণী, দেখেছিস্ তুই
খরসান অসি এই যে মোর—
হারি আঘাতে—একটি আঘাতে
দুখান করিব প্রতাপে তোর—

নিশাচরী ওরে, জানি আমি তোরে,
জানি তোর ওই কুটীল হৃদি—
এখনো বল্‌ছি বাঁচারে বিজয়ে—
নহিলে প্রতাপে এখনি বধি—

প্রতাপ, প্রতাপ! আমার সমুখে
বল্ দেখি তুই মনের কথা——
ভ্রমিছে বিজয় কাহার কারণে
মরমে পাইয়ে মরম ব্যথা ?

বিজয়-ভগিনী বিজয়া কুমারী—
রূপে গুণে যেন কমলা প্রায়—
তুই কি চাস্‌নে রূপেতে মজিয়ে
ঘোর অপমান করিতে তায় ?

তোরে কি তাহাতে বিজয় কুমার
বিশেষ শাসন করে নে শেষে—
মনের ঘৃণাতে মথুরা তেয়াগি
পশিলি প্রবাসে বিবাগী বেশে ?

জানি না কি আমি, রোহিণী রাক্ষসী—
বিজয়ার প্রতি করিয়ে রিশ——
বিজনে গোপনে সরলা বাছারে
আদরের ছলে খাওয়ালি বিষ ?

নির্দ্দোষী বালারে, পাপীয়সী ওরে!
কেমনে করালি গরল পান,—
আহা, সেই শোকে জননী তাহার
যমুনার জলে ত্যজিল প্রাণ!

জানি জানি আমি, বিজয় উপরে
প্রতিশোধ তোর লইতে শেষ—
বিজয়ের নামে কুরব রটনা
করিতে লাগিলি সকল দেশ।

এখনো কি তোর হয় নাই শেষ
দ্বেষ-ভরা সেই পিশাচ খেলা ?
নাশিতে বিজয়ে—দামিনী বালারে—
এসেছিস্ তাই সাগর—বেলা ?

দাঁড়া নিশাচরী—এর প্রতিশোধ
এখনই আমি দিব যে তোরে——
এই এ কৃপাণে বধিয়ে প্রতাপে
সঁপিব চিতার অনল ঘোরে!"

কহিতে কহিতে দেবীর নয়নে
জ্বলন্ত অনল-প্রবাহ ছোটে——
কৃপাণ আতসে বিজলি ঝলসে——
লোল রসনা দলকি ওঠে।

এলোকেশী-এলো-জটা-কেশ যেন
সরোষে বিছায় জলদ মত——
সরোষে ভীষণ চাহনী চাহিল
নৃমুণ্ড-মালার লোচন যত।

শুনিয়ে রোহিণী, দেখিয়ে রোহিণী—
পড়িল দেবীর চরণ তলে,
পাগলিনী প্রায়, অধীরে লুটায়,
ভাসায়ে চরণ নয়ন-জলে——

কহিতে লাগিল কাতর রোদনে—
"ঈশানি, কেন গো পাষাণী হেন—
বিধবা-তনয়ে বধিয়া, জননি,
বিধবার প্রাণ বধিবে কেন ?

কি করিতে হবে, কহ ত্রিলোচনে,
এখনি সাধিব সকল কাজ——
বহুদিন পরে প্রতাপে আমার
নয়ন মেলিয়া হেরিনু আজ।"

বলিতে বলিতে নয়নে তাহার
ঝরিতে লাগিল অযুত ধারা,
মুখরা রোহিণী শ্মশানে লুটায়,
অসহ শোকেতে হইয়ে সারা।

শুনিয়ে ঈশানী কহে ক্রোধ-বাণী——
"চাস্ যদি ফিরে প্রতাপে তোর——
যা—তবে—যা—এই বেলা যা—
এই এ রজনী না হ'তে ভোর——

মহামায়া কাছে প্রকাশিয়ে সব
বলিবি তাঁহার চরণ ধোরে——
কহিস্ বিজয়-অযশ রটনা
কোরেছিলি তুই দ্বেষেরি ভরে'—

যা—তবে—যা—এই বেলা যা—
দামিনী-বিজয়ে মিলায়ে দে,
হেথায় জ্বলিছে দামিনী রূপসী——
তাপস কুটীরে জ্বলিছে সে।"

শুনিয়া আদেশ পাইয়ে পরাণ—
থমকে রোহিণী দাঁড়ায় সোরে—
কৃতযোড় করে কাঁপে থর থর,
ঝরঝর ঘাম পড়িছে ঝোরে।

"যা—চলে যা—" বলিয়ে কালিকা
অদর্শন হ'ল প্রতাপে লোয়ে,
সহসা লুকালো জলদ প্রতিমা——
নেহারে রোহিণী অবাক হোয়ে।

সহসা যেন রে শত শত চিতা
একাকার হোয়ে জ্বলিয়ে ওঠে,
লহরে লহরে আকাশ পাতালে
দাবানল যেন মাতিয়ে ছোটে।

সহসা যেন রে সকলি নিভিল,
আবার শ্মশান আঁধারময়,
শকুণী গৃধিণী ডাকিয়া উঠিল,
গভীর গরজে শৃগাল চয়।

অট্ট অট্ট হাস হাসে দানাদল,
ভীম নাদে ব্যোম বিদার প্রায়,
আচম্বিতে ভাঙ্গে রোহিণীর ঘুম,
নয়ন মেলিয়ে রোহিণী চায়—

পুনঃ আঁখি মোদে, পুনঃ ফিরে চায়,
এখনো ভাঙ্গেনি ঘুমের ঘোর,
"ওই যে শ্মশান,—এই যে বিছানা,
ওই যে কালিকা কুটীর মোর—

এই যে পাপীয়া গাহিছে প্রভাতী—
তবুও কেন রে শকুনী-রব
অফুটো আভাসে পশিছে শ্রবণে—
আবার মিশায়ে যেতেছে সব।"

দুহাতে আবার রগড়ে নয়ন—
কট্‌মট্‌ ক'রে দুধারে চায়,
দুর্ব্বল, শিথিল, অবশ শরীরে
ঘামের শীতল লহরী ধায়।

সভয়ে রোহিণী করিল চীৎকার—
কে যেন তাহারে ফেলিল মেরে,
মহামায়া-দেবী দামিনীরে লোয়ে
আসিয়ে তাহারে যতনে ঘেরে।

উঠিল তখন জাগিয়ে রোহিনী,
থর থর থর কাঁপিছে কায়,
নীরস রসনা, স্খলিত বসনা—
ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ চোখে বিহ্বলা চায়।

"দেবী মহামায়া" কহিল রোহিণী—
"উঃ—কি স্বপন উঠিনু দেখে—
বাঁচাও বাঁচাও প্রতাপে আমার—
আনাও বিজয়ে হেথায় ডেকে।

কোন দোষ নাই সরল বাছার,
আমিই গভীর দ্বেষের ভরে
মিছামিছি তার কলঙ্ক রটিয়ে
খেদায়ে দিয়েছি তাপস-ঘরে।"

গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়ে রোহিণী
কহিল সকল আগের কথা,
শুনিতে শুনিতে মহাময়া দেবী
মরমে পাইল মরম ব্যথা!

উথলি উঠিতে লাগিল দামিনী,
বহিতে লাগিল হরষ ঢেউ——
"জানি জানি আমি বিজয়ের মত
আর কি জগতে আছে রে কি কেউ"।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হয়েছে প্রভাত ;—মৃদুল পবন
সাগরের সনে করিছে খেলা,
পথে ঘাটে আর নাহিক আঁধার,
আলোকিত এবে সাগর-বেলা।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা রাঙ্গা চিকন মেঘেতে
পূরব আকাশ হয়েছে লাল,
গগনে উড়িছে সাগর-কপোত,
বেলায় খেলায় হরিণী পাল।

হেথায় হোথায় বাঁধা ছিল তরী,
পাল তুলে তারা ছাড়িল সব,
মাঝিরা ধরিল সুখে সারী-গান,
বাতাসে উথলে সেই সে রব।

রোহিণীরে ডাকি মহামায়া কয়—
"যাও গো রোহিণী—হ'য়েছে ভোর,
যেথায় বিজয় তাপস-কুটীরে
ভাবিছে—কাঁদিছে যাতনে ঘোর—

আহা সে বিজয়—নিরাশ-হৃদয়,
কতই ফেলিছে নয়ন-বারি,
কতই না জানি অভিমান ভরে
ভাবিছে আমারে পিশাচী নারী—

আন' ডেকে তায়, দিব যে হেথায়
দামিনীর সনে বিবাহ তার,
চৌদ্দ বর্ষে হ'ল ব্রত উদ্‌যাপন,
সাগর-বেলায় না রব আর।"

শুনিয়া সকল—স্মরিয়ে সকল—
বিজয়ে ডাকিতে রোহিণী যায়,
এলো থেলো কেশ, পাগলিনী-বেশ,
সবেগে তাপস-কুটীরে ধায়।

এদিকে আসিয়ে দেবী মহামায়া
দামিনীরে কহে সোহাগ-ভরে,—
"আয় মা দামিনী, স্নেহের পুতলী—
আজিকে যতনে সাজাবো তোরে—

আজিকে আসিবে বিজয়-কুমার,
আজি আসিবে সে স্নেহের ধন,
আজি আমি তোরে বিজয়ের করে
সোহাগে সঁপিব ক'রেছি পণ।"

শুনিতে শুনিতে দামিনী-হৃদয়ে
রুধির-প্রবাহ মাতিয়ে ছোটে,
এ ভাব—ও ভাব—কত কি যে ভাব
একেবারে যেন উথলি ওঠে।

প্রকৃতে স্বপনে লাগিল সমর,
"সত্য কি বিজয় আসিবে ফিরে ?
চিরদুঃখিনীর এই দুই আঁখি
আবার বিজয়ে দেখিবে কি রে ?

সেই—সেই হাসি, মধুরিমা-রাশি,
সেই সে কেমন—কেমন ধারা,
সেই সে চপল নয়নের ছটা
হেরিব কি পুনঃ পাগল পারা ?"

ভাবিতে ভাবিতে অপাঙ্গ হইতে
মৃদুল চিকন বিজলী ছোটে,
অধরে লুকানো অস্ফুটো হাসিটি
থেকে থেকে যেন উজলি ওঠে।

কখনো আবার শরমের রাগে
ঈষৎ রাঙ্গিয়ে ওঠে সে মুখ,
চাপাচুপী, বালা, সাজে কি কখনো,
উথলি যখন উঠেছে বুক ?

সাজি সাজি আজ কুসুম ভূষণে,
দাঁড়ায় দামিনী সাগর বেলা,
বিজয়ে ডাকিতে গিয়েছে রোহিণী,
এখনো বিজয় করিছে হেলা !

"কতক্ষণ হ'ল জাগিয়ে উঠেছি—
কতক্ষণ হ'ল রোহিণী গেছে—
কতক্ষণ হ'ল এসেছি এখানে—
এখনো যে দেরী করিছে মিছে—

হোথা ছিল ভানু—দেখিতে দেখিতে
কত দূর ক্রমে উঠিল ওই—
ফুলের গহনা পড়িল শুখায়ে—
তবুও বিজয় আসিছে কই ?

কখন আসিবে?—ওই যে আবার
ঈষাণ কোণেতে উঠেছে মেঘ,
নিঃশ্বাস পড়ে না বাতাসের আর,
প্রশান্ত হয়েছে সাগর-বেগ।

ওড়ে না আকাশে সাগর-কপোত,
কোথায় কি জানি লুকালো সব,
বেলায় খেলায় হরিণী না আর,
থেমেছে মাঝীর গীতের রব।

এখনি উঠিবে নিদারুণ ঝড়,
ওই যে জলদ আকাশ ছায়,
থাকিয়ে থাকিয়ে ঘোর ডাকে মেঘ,
মাতিয়ে চপলা ছুটিয়ে যায়।"

* * *

* * *

দেখিতে দেখিতে ঘোর আচম্বিতে
উঠেছে ঝটিকা ভীষণ তোড়ে,
হুল স্থূল করি সাগরের ঢেউ
দাপটে বেলায় ঝাঁপায়ে পড়ে।

নিবিড় জলদে ডুবেছে তপন,
কে কোথায় যেন না জানে কেউ,
সব একাকার—জলধি-আকার,
দিগন্ত আলোড়ি ছুটিছে ঢেউ।

সাগরে অম্বরে বেঁধে গেছে রণ,
উঠিছে সাগর ভীষণ রেগে,
আকাশ হানিছে চপলার বাণ,
হুহুঙ্কারে মেঘ গরজে বেগে।

স্বনৈঃ স্বনৈঃ বহিছে বাতাস,
জলধির ফেণা আকাশে ছোটে,
হাঙ্গর মকর বেলায় পড়িয়ে
আছাড় পাছাড় খাইয়ে লোটে।

ওলট্ পালট্ হোতেছে সাগর,
উপরে উঠিছে তলার মাটি,
তলাতে ছুটিছে সাগরের ফেণা,
দাপটে ধরণী উঠিছে ফাটি।

এ ঘোর প্রলয়ে—দাঁড়ায়ে কে ওই ?—
হের, কল্পনা, হের গো ফিরে—
মথিত সাগর-উরস হইতে
আবার কমলা উঠিল কি রে ?

ওই যে দামিনী-নড়ে না চড়ে না,
চাহিয়ে তাপস-কুটীর-পানে,
ধরিয়ে একটি অশোকের ডাল,
তাকায়ে রোহেছে আপন মনে।

কে জানে কোথায় বহিছে ঝটিকা,
কে জানে কোথায় ছুটিছে জল,
কে জানে কোথায় ভাসিছে আঁচল—
ভাসিছে ফুলের গহনা-দল।

আসুক বিজয়—কহিব তাহারে
জানিয়াছি তার মমতা যত,
ওই মরমের নিভৃত বিজনে
কে জানিবে ঝড় বহিছে কত ?

দেখিতে দেখিতে, ঝাঁপায়ে জলধি
ছাড়িয়ে বালারে সবেগে ধায়,
ছাড়িয়ে সেই সে আশোকের মূল
গভীর গরজে উথলি যায়।

আবার গড়ায়ে সাগরের স্রোত
সাগরের পানে ছুটিয়া চলে,
চমকে দামিনী—সহসা কি যেন
ঠেকিল তাহার চরণ তলে !

আনত করিয়ে নলিনী-নয়ন,
আনত হইয়ে তাড়িত বলে—
দ্যাখে—বিজয়ের মৃত কলেবর
আটকি বালার চরণ তলে—

"ওই গো কি হলো"—বলিয়ে দামিনী
পড়িল মড়ার হৃদর পরে,
আবার ঝাঁপায়ে আসিয়ে জলধি
ভাসায়ে নে গেল উভয়ে পরে—

ভাসায়ে নে গেল উভয়েরে শেষে,
ভাসায়ে নে গেল কে জানে কোথা,
দামিনী-বিজয়, বিজয়-দামিনী—
রহিল কেবল কথার কথা।

আসি মহাময়া বিজন পুলিনে,
দেখিল সাগরে ভীষণ ঢেউ,
কোথায় দামিনী—কোথায় বিজয়—
কহিতে তাঁহারে নাহিক কেউ।

আপনার মনে বহিছে সাগর,
আপনার মনে স্বনিছে বায়,
দিগন্ত ব্যাপিয়ে জলে জলাকার—
মানুষের রেখা নাহিক তায়।

আপনার মনে গরজে জলদ,
চমকে চপলা আপন মনে—
ভ্রূক্ষেপ নাই—কি কোরে বিজয়
"মিলিল—মিশিল দামিনী সনে।"

পার্থিব প্রেম ও দেবভক্তি।

(জনৈক সন্ন্যাসী প্রেরিত।)

আমি কামাখ্যা, বারাণসী, প্রয়াগ প্রভৃতি সকল তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়া এখন হিমাচলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। হরিদ্বারে কিছুদিন অবস্থান করিয়া গোমুখী-তীর্থ দর্শনের অভিলাষে শিখরে আরোহণ করিতেছিলাম, কিন্তু শীতের দুর্দ্দান্ত প্রভাববশতঃ গোমুখীতীর্থ দর্শন করা অদ্যাপিও আমার অদৃষ্টে ঘটিল না। আমার মত আরও অনেক বিফলযত্ন সন্ন্যাসীরা এখানে অবস্থান করিতেছেন,—সুতরাং তাঁহাদের সহবাসে আমার মনের মর্ম্মান্তিক ক্ষোভ কিয়ৎ পরিমাণে উপশান্ত হইয়াছে।—নিশা অবসান না হইতে হইতেই আমরা সকলে মিলিয়া পুণ্য-সলিলা জাহ্নবী-তীরে যাইয়া এক সঙ্গে সমস্বরে সকলে ব্রহ্মাণ্ডময়ীর মহিমা কীর্ত্তন করি, তপ জপ সন্ধ্যা আহ্নিক সমাপন করিয়া দ্বিপ্রহরের সময়ে সকলে মিলিয়া ফিরিয়া আসি,—ভোজনাদি সমাপন করিয়া সকলে মিলিয়া শাস্ত্রালাপ করি,—সকলে মিলিয়া কখনো কখনো সংসারের শূন্য আড়ম্বর, বিষয়ী ব্যক্তির প্রকৃত মূর্খতা, মান গৌরবের অসার অলীকতা এবং ধর্ম্মের অনন্ত উদারতা লইয়া তর্ক বিতর্ক করি, আবার সন্ধ্যা না হইতে হইতেই গঙ্গাতীরে যাইয়া সকলে সমবেত হই।—রাত্রি গভীর হইয়া আসিলে আবার সকলে মিলিয়া কন্দর-বাস-ভূমিতে প্রত্যাগমন করি,—সেখানে অগ্নি জ্বালাইয়া তাহার চতুষ্পার্শে সকলে বসিয়া কোন দিন সমস্বরে গান গাহি; কোন দিন শাস্ত্রালাপ করিয়া, কোন দিন আরাধনা করিয়া যামিনীর অধিক ভাগই যাপন করিয়া থাকি।—শীতের ভীষণ প্রতাপ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলেই আমরা সকলে মিলিয়া গোমুখী যাত্রা করিব। আহা, সেই উল্লাসের দিনের জন্য আমি লালায়িত হইয়া রহিয়াছি।—কিন্তু সেই অসিদ্ধ-প্রয়াস সত্ত্বেও আমি যে কি স্বর্গীয় সুখে দিন যাপন করিতেছি তাহা তোমরা অনুভবও করিতে পারিবে না।—বোধ হয় তোমরা এখনো ভাবিতেছ যে আমি অকালে পিতৃ-মাতৃ-হীন হইয়া, বিষয়-বিভবে প্রতারিত হইয়া, জীবন-স্বরূপা ভার্য্যাকে অসময়ে হারাইয়া, হতাশ-প্রেমে মর্ম্মপীড়িত হইয়া অদ্যাপিও পার্থিব প্রভাবে পার্থিব অশ্রুজলে গণ্ডস্থল অভিষিক্ত করিতেছি। কিন্তু, হায়, তোমরা যদি বুঝিতে পারিতে যে প্রকৃত সৎসঙ্গে কি অনুপম স্বর্গসুখ ভোগ, তোমরা যদি জানিতে যে প্রকৃত দেবভক্তিতে এই হোম-ধূমের ন্যায় এই পার্থিব হৃদয় অবাধে হিমাচলের শিখর অতিক্রম করিয়া সপ্তম স্বর্গের শেষ সীমা পর্য্যন্ত উথলিয়া উঠে, তোমরা যদি জানিতে যে সকলে সমস্বরে বেদপাঠ করিবার সময় এই পার্থিব দেহকে বিস্মৃত হইয়া, এই অস্থিচর্ম্ম-সমষ্টিকে বিস্মৃত হইয়া আপনাকে কি এক জ্যোতির্ম্ময়—আত্মার উপচ্ছায়া বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে, তাহা হইলে তোমরা আমার এই সুখের—এই সমৃদ্ধির হিংসা করিতে। দেখ, মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত হৃদয় তাহার সহগামী। কিন্তু এই হৃদয় আমরণ পরাধীন। শৈশবকালে মৃত্তিকার পুত্তলিকা লইয়া, বাল্যকালে বাল্য-সখাতে অনুরক্ত হইয়া, যৌবনকালে প্রণয়ে উন্মত্ত হইয়া, প্রৌঢ়ে বিষয় বিভবের অধীনে মৃতকল্প হইয়া, বার্দ্ধক্যে দেবভক্তিতে পুনর্জ্জীবিত হইয়া, শেষে মৃত্যুর কোমল আলিঙ্গনে অবসন্ন হইয়া পড়ে।—এই রূপে জীবনের প্রত্যেক পরিচ্ছেদে, প্রত্যেক অঙ্কে মানুষ আপন বই অন্যের অধীন।—শৈশব ও বাল্য কালের কথা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ভাবিয়া ছাড়িয়া দিলেও, যৌবনের প্রেমের সঙ্গে বার্দ্ধক্যের দেবভক্তির সঙ্গে বিষম প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবার সম্ভাবনা। প্রৌঢ়াবস্থার বিষয়-লালসার কথা আমি এখন উল্লেখ করিব না, পরে সময় থাকিলে সে বিষয় বিবেচনা করিব।—এখন যৌবনের প্রেম ও বার্দ্ধক্যের দেবভক্তি—এই দুয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা-স্থলে কাহার বিজয়-গান আমি গাহিব? অবশ্য আমি প্রেমকে এক তাচ্ছিল্যের নিশ্বাসে উড়াইয়া দিব না—যে প্রেমের মোহে মুগ্ধ হইয়া দেবদেব মহাদেব পর্য্যন্ত এই হিমাচলের শিখরে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন, যে প্রেমের অমোঘ প্রভাবে স্বয়ং মহামায়া কিশোর কোমল অঙ্গে বল্কল ধারণ করিয়াছিলেন, যে প্রেমের সর্ব্বজয়ী প্রতাপে পাষাণ-হৃদয় যম পর্য্যন্ত পরাস্ত হইয়া সাবিত্রীর স্বর্গীয় আলিঙ্গনে মৃত সত্যবানকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন, আমি আজ সন্ন্যাসী হইয়াছি বলিয়া সে প্রেমকে দুর্ব্বল হৃদয়ের আমোদ-লালসা মাত্র বলিতে প্রস্তুত নহি। যে কবি বলিয়াছেন যে প্রেমের একটিমাত্র অশ্রুবিন্দুতে মহাসাগর তরঙ্গিত হইতে থাকে—একটিমাত্র দীর্ঘ শ্বাসে প্রবল ঘূর্ণ-ঝটিকা বহিতে থাকে—একটিমাত্র কটাক্ষে সপ্তম স্বর্গ পর্য্যন্ত বিভাসিত হয়—সামান্য একটি স্পর্শ-মাত্রে বিদ্যুতাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে—আমি সে কবির বেদ-বাক্য শিরোধার্য্য করি। যে কবি বলিয়াছেন যে এই সমস্ত মানবমণ্ডলী নিস্তেজ জড়পিণ্ডের মতই অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিত, যদি ঈশ্বর আপনার সারাংশ-স্বরূপ প্রেমের অগ্নি মানব-হৃদয়ে জ্বালাইয়া না দিতেন—যদি ভালবাসিতে এবং ভালবাসিবার প্রতিদান পাইতে মানুষকে এতদূর লালায়িত করিয়া না দিতেন—আমি সে কবির বেদ-বাক্য শিরোধার্য্য করি। আমি এ কথাও স্বীকার করি যে যৌবনের পার্থিব প্রেম বার্দ্ধক্যের দেবভক্তির এক প্রকার মহলামাত্র। যৌবনে যাঁহার হৃদয় প্রেমের উত্তপ্ত তরঙ্গে তরঙ্গিত হয় যৌবনে যিনি প্রেমের সামগ্রীর সহবাসে নাই স্বর্গসুখ উপভোগ করিতে এবং বিচ্ছেদে দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে শিখেন নাই,

তিনি জীবনের কোন অবস্থাতেই দেবভক্তির চূড়ান্ত গরিমা কখনই অনুভব করিতে পারেন না। পার্থিব প্রেম এবং দেবভক্তি এক উৎস হইতেই উৎসারিত হইয়াছে। সেই যে অন্য একটী স্বতন্ত্র পদার্থে সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া যাইতে বাসনা,—অন্য পদার্থের আদরে বা অনাদরে আপনাকে চরিতার্থ বা অভিসন্তপ্ত জ্ঞান করা, সেই যে সমস্ত জগৎ সংসারে সহস্র সহস্র সামগ্রী থাকিতেও সেই একটী পদার্থের জন্য হৃদয়ের ব্যাকুলতা ও লালায়িত ভাব—এ সকলই পার্থিব প্রেম ও দেব-ভক্তির সাধারণ উপাদান। কিন্তু আমরা যদি হৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ শিক্ষা-প্রণালী উপলব্ধি করিয়া দেখি, তবে দেখিতে পাইব যে অগ্রে সুন্দর—সুন্দরতর—সুন্দরতম পদার্থের প্রতি আমাদের ভালবাসা প্রধাবিত হয়—এবং তাহাতে ক্রমশ উন্নতির সোপানে অগ্রসর হইতে হইতে আমরা শেষে মহান পদার্থের ভাবে লোমাঞ্চকায় হইতে পারি। শৈশবকালে আমরা একটি গোলাপ ফুল দেখিয়া প্রমোদিত হইয়া থাকি, কিন্তু অভ্রভেদী পর্ব্বত-শ্রেণীর মহান্ ভাবে কখনই অভিভূত হইতে পারি না। বাল্যকালে আমরা কুমুদ-কহ্লারময় একটি প্রশান্ত সরোবর দেখিয়া যত দূর বিমোহিত হইতে পারিব, একটী তরঙ্গময় সমুদ্র দেখিয়া আমরা কখনই ততদূর বিমোহিত হইতে পারিব না। কিন্তু যে হৃদয় সেই বাল্যকালে সেই সরোবরের শোভা উপলব্ধি করিতে পারে নাই, সে হৃদয় কোন কালেই সেই সমুদ্রের তর্জ্জন গর্জ্জনে উচ্ছ্বসিত হইতে পারিবে না—যে হৃদয় যৌবনে ভালবাসাতে মুগ্ধ হয় নাই, সে হৃদয় বার্দ্ধক্যে দেব-ভক্তিতেও অভিভূত হইতে পারিবে না—আবার, আমরা প্রথমে প্রত্যক্ষ পদার্থে-তাহার পর প্রত্যক্ষবৎ পদার্থে-পরিশেষে আধ্যাত্মিক পদার্থে হৃদয় সন্নিবেশিত করিতে শিখিয়া থাকি। সুতরাং যিনি পার্থিব প্রেমে আপনাকে কখনো চরিতার্থ জ্ঞান করিতে পারেন নাই, তিনি কখনই দেব-ভক্তিতে হৃদয়োচ্ছ্বাস অনুভব করিতে পারেন না। এই সকল কারণেই আমি অগ্রে অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছি যে, যৌবনের পার্থিব প্রেম বার্দ্ধক্যে দেব-ভক্তির মহলা মাত্র—কিন্তু এই উচ্চ পদবীতে একবার উঠিতে পারিলে, দেব-ভক্তির অসীম আমোদ একবার উপভোগ করিতে পারিলে, পার্থিব প্রেমকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। দেব-ভক্তির এই স্নিগ্ধকর অথচ উচ্ছ্বসিত—এই প্রগাঢ় অথচ অনন্ত-প্রসারিত আনন্দ-ভাবের সহিত পার্থিব প্রেমের উত্তপ্ত উন্মাদকর উল্লাসের তুলনা করিয়া দেখিলে বৃদ্ধ যযাতি রাজাকে মূর্খের অগ্রগণ্য বলিয়া মনে হয়। তাহা ব্যতীত, যখন ভাবিয়া দেখি যে পার্থিব প্রেম সম্যক রূপে পরিতৃপ্ত হইলেই প্রকৃতির নিয়মানুসারে ক্রমশই হ্রাস পাইতে থাকে, কিন্তু দেব-ভক্তির কখনই সম্যক পরিতৃপ্তির সম্ভাবনা নাই,যখন ভাবিয়া দেখি যে পার্থিব প্রেমের পদার্থ আমার যথেষ্ট হিতাকাঙ্ক্ষী হইলেও আমাকে সকল অবস্থায় সম্যক প্রকারে রক্ষা করিতে অসমর্থ, কিন্তু আমার ইষ্ট-দেবতার কোমল অঙ্কে মস্তক রাখিয়া কোন কারণে কোন ভয়ে কখনই ভীত হইতে হইবে না, যখন ভাবিয়া দেখি যে পার্থিব প্রেমের পদার্থ হইতে আমি অকালে বিচ্যুত হইয়া আমরণ ভগ্ন-হৃদয়ে সন্তবত কাঁদিতেও পারি, কিন্তু আমার ইষ্ট-দেবতার সঙ্গে আমি অনন্তকাল ক্রমশই ঘোর-ঘোরতর ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্মিলিত হইতেই পারিব, তখন কুমারিকা-ব্রত-দীক্ষিত ইলাইসার মত আমাকেও এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে হয় যে কি অকিঞ্চিৎকর ধূলি-সমষ্টির উপর আমি ভালবাসা স্থাপনা করিয়াছিলাম, যখন এই মর্ত্ত্যলোকের একটি মানুষকে আমি ভালবাসিতে পারিয়া ছিলাম।

শ্রীদাঃ—

ছিন্ন মুকুল।

দশম পরিচ্ছেদ—অবিশ্বাস।

পটলডাঙ্গার কালেজের নিকটে একটি বাড়ী আছে, সেই বাড়ীর একটি কক্ষে একাকী বসিয়া প্রমোদ অধ্যয়নে নিযুক্ত ছিলেন। প্রমোদ যে চৌকিতে বসিয়াছিলেন, তাহারি সম্মুখে একটি টেবিল, টেবিলের মধ্যভাগে একটি বাতি জ্বলতে ছিল এবং তাহার আশপাশ পুস্তকরাশিতে পূর্ণ হইয়া ছিল। কিন্তু একি জ্বালা? বই লইয়া পড়িতে বসিলেই মনে এত নানা প্রকার ভাবনা আসিয়া পড়ে যে, চমকিয়া ক্ষণেক পরে দেখিতে হয় যে খোলাপাতটি তেমনিই খোলা আছে, তাহার একটুও পড়িয়া উঠিতে পারেন নাই। এদিকে নিকটেই তাঁহার বি-এ পরীক্ষা; পড়িতে না মন লাগিলেই বা চলিবে কেন? পড়া হোক না হোক, সম্মুখে বই না রাখিলেও আবার মন বোঝে না। অনেক ক্ষণ হইতে একখানি বিজ্ঞান-পুস্তক লইয়া তাহাতে মাথা ঘোরাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন—কিন্তু অবশেষে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তিনি বই খানি মুড়িয়া দূরে ফেলিলেন। হাতের কাছেই একখানি কোল্‌রিজ পড়িয়াছিল, ভাবিতে ভাবিতে সেই খানি হাতে লইলেন, ভাবিতে ভাবিতে সেই খানি খুলিলেন, প্রথমেই যে কবিতাছত্রে তাঁহার চক্ষু পড়িল—সেই ছত্র গুলি তাঁহার মনের যেন প্রতিধ্বনি বলিয়া বোধ হইল—সেই কথা গুলি তাঁহার হৃদয়ে যেন মিশিয়া গেল, তিনি পড়িলেন "Oft in my waking dreams do I live o'er again that happy day"—তাঁহার আর পড়া হইল না। এই সময়ে এক জন ভৃত্য আসিয়া তাঁহার পড়ায় বাধা দিয়া বলিল "আপনার কাছে এক্ জন সন্ন্যাসী এসেছেন, তিনি আপনার সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ দেখা করিতে চান।" সন্ন্যাসীর নাম শুনিয়া প্রমোদ চমকিত হইলেন, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ উপরে আনিতে ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, ভৃত্য বলিল "তিনি আসিবেন না, বসিবেন না, পথেই দাঁড়িয়ে আছেন, পথেই আপনার সঙ্গে কি কথা কহিয়া চলিয়া যাইবেন।" প্রমোদ কিছু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন 'তবে চল।' এই বলিয়া ভৃত্যের সহিত প্রমোদ সন্ন্যাসীর নিকট আসিলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া প্রমোদ চিনিতে পারিলেন এবং আহ্লাদের সহিত প্রণাম করিয়া বলিলেন "যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে মনেই করিলেন, তবে একবার ভিতরে এসে বসুন" সন্ন্যাসী মৃদুগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "না তুমি আমার সঙ্গে একটু বিরলে এস, বিশেষ প্রয়োজন আছে" বলিয়া সন্ন্যাসী অগ্রে অগ্রে

গমন করিলেন, প্রমোদ তাঁহার অনুসরণ করিয়া গোল-দিঘীর এক নিভৃত প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। আকাশের ক্ষীণ চন্দ্র ক্ষীণালোকে এতক্ষণ পর্য্যন্ত পৃথিবীকে যে অল্প পরিমাণে ঈষৎ উজ্জ্বল করিতেছিল, ক্রমে তাহাও আকাশের কোলে ডুবিয়া গিয়াছে। রজনী অন্ধকার, কিন্তু অসংখ্য অসংখ্য খদ্যোতমালা এই অন্ধকার মধ্যে নিভিয়া নিভিয়া জ্বলিতেছিল, এবং সহরের দীপমালা শ্রেণীবদ্ধ তারকারাজির মত দূরে শোভা পাইতেছিল। এই নিস্তব্ধ বিজনে আসিয়া, এই নিশার গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রমোদ কহিলেন—

"কি কথার জন্য আপনি এখানে আনিলেন।"

সন্ন্যাসী তখন মেঘনির্ঘোষবৎ গম্ভীরস্বরে বলিলেন "প্রমোদ, তোমার একি আচরণ?"

সন্ন্যাসীর স্বরে—সন্ন্যাসীর কথায় প্রমোদ আশ্চর্য্য ভাবে বলিলেন "আমার কি আচরণ?" সন্ন্যাসী আবার আরো গম্ভীর স্বরে—আরো ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন "পাষণ্ড! নরাধম! আমার নীরজা কোথায়?"

নীরজা—কোথায়! সে কি কথা!! তখন বজ্র পড়িলেও প্রমোদ অধিকতর স্তম্ভিত হইতেন না। সন্ন্যাসী অধীর চিত্তে গর্জ্জন করিয়া আবার বলিলেন "আমার নীরজা কোথায়?" প্রমোদ তখন ধীরে ধীরে বিকম্পিত স্বরে প্রতিধ্বনির মত জিজ্ঞাসা করিলেন 'নীরজা কোথায়!' সন্ন্যাসী আর সহিতে পারিলেন না—এই কথায় তাঁহার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল, বিশাল নয়নে যেন বিজলী ঝলসিতে লাগিল, সরোষে প্রমোদের কণ্ঠদেশ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া কহিলেন "পামর! তুমি কি কিছুই জান না! বিশ্বাসঘাতক, আমার নীরজাকে হরণ করিয়া কোথায় রাখিয়াছিস দে, নহিলে এই দণ্ডেই তোর প্রাণনাশ করিব।" প্রমোদ কষ্টে সন্ন্যাসীর হাত ছাড়াইয়া বলিলেন "মহাশয়! আপনি কি বলিতেছেন? বাস্তবিক কি নীরজাকে তবে কেহ হরণ করিয়াছে—নীরজা—নীরজা অপহৃত?' প্রমোদের আর বাক্য সরিল না, নীরজা অপহৃত হইয়াছে এই কথাটি তাঁহার মনে এতই লাগিল যে, প্রমোদ আর আপনাকে আপনি শামলাইতে পারিলেন না, চারিদিক অন্ধকার দেখিতে দেখিতে প্রমোদ মাথা ধরিয়া সেই খানেই বসিয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসীর ইহাতে আরো সন্দেহ বাড়িল, ভাবিলেন প্রমোদের দোষ প্রকাশ পাইয়াছে এই ভাবিয়া প্রমোদের ভয়ে সহসা মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। প্রমোদের দোষের সন্ন্যাসী এই আর একটি গুরুতর প্রমাণ পাইলেন। আগে হইতেই সন্ন্যাসীর মনে প্রমোদের দোষের প্রমাণের অভাব ছিল না, প্রমোদের বিপক্ষে তিনি রাশি রাশি প্রমাণ পাইয়াছিলেন। প্রথমতঃ সে দিনকার কথাবার্ত্তায় নীরজার প্রতি প্রমোদকে অনুরক্ত বোধ হইয়াছিল, দ্বিতীয়তঃ সন্ন্যাসী প্রমোদের প্রতি নীরজারও অনুরাগ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এমন কি, প্রমোদ চলিয়া যাইবার পরেও নীরজা পিতার

নিকট প্রায়ই তাঁহার গল্প করিত—তার পর তৃতীয় প্রমাণ, সন্ন্যাসীর নৈমিষারণ্যে যাইবার কথা প্রমোদ বই আর কেহই জানিতেন না—প্রমোদই জানিয়াছিলেন সে সময়ে নীরজা প্রায়ই একাকী একরূপ অরক্ষিতাবস্থায় থাকে—এই সব যুক্তিপরম্পরা দ্বারা সন্ন্যাসী প্রমোদকেই একরূপ দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। তাহার পরে, আবার আজ প্রমোদকে অর্দ্ধমূর্চ্ছিত হইতে দেখিয়া সন্ন্যাসীর প্রমাণসংখ্যা বাড়িল, সোনায় সোহাগা হইল, রাশি রাশি প্রমাণ মধ্যে এই একটি তিনি বিশেষ প্রমাণ পাইলেন, সুতরাং প্রমোদের দোষের বিষয়ে আর তাঁহার সন্দেহ রহিল না। তিনি উগ্রভাবে বলিলেন "নীরজাকে কোথায় রাখিয়াছ। ভালয় ভালয় ফিরাইয়া দিলে আমি সমস্ত দোষ ক্ষমা করিব, নহিলে তোমার নিস্তার নাই।" প্রমোদ কিছু শামলাইয়া উঠিয়া বলিলেন 'আপনি বিশ্বাস করিবেন না—কিন্তু নীরজা-হরণ শুনিয়া আপনার কি আমার—কাহার বেশী লাগিয়াছে জানি না।" এই কথা, এই ভণ্ডামী, সন্ন্যাসীর অসহ্য হইল, তিনি বলিলেন—"আর কেন,যথেষ্ট হইয়াছে, এখন নীরজা কোথা!"

প্র। "মহাশয়—বাস্তবিক নীরজা কোথা আমি জানিনা। আমি নিরপরাধী। আপনি তো জানেন যে আপনাদের অরণ্যে শেষ দিন যেদিন যাই, তাহার পর দিনই আমার এলাহাবাদ আসিবার কথা ছিল, আমি পরদিনই কানপুর ছাড়িয়াছিলাম, আপনার অরণ্যের সংবাদ আমি সেই অবধি আর কিছুই জানি না।"

স। অরণ্যের সংবাদ না জানিতে পার—কিন্তু নীরজা কোথায়?" প্রমোদ দেখিলেন, সন্ন্যাসীর সেই অটল সন্দেহ ভঞ্জন করা সহজ নহে। তিনি আপন নির্দ্দোষিতার পক্ষে যতদূর বলিতে পারেন তাহার কিছুই ত্রুটি করিলেন না, কিন্তু তাহাতে সন্ন্যাসী তাঁহার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ না পাইয়া বরং সেই অস্বীকার-বাক্যে তাঁহার ঘোর ভণ্ডামী দ্বিগুণরূপে দেখিতে লাগিলেন—প্রমোদের প্রত্যেক কথায় উত্তরোত্তর আরো ক্রুদ্ধ হইতে লাগিলেন। কোন উপায় না দেখিয়া প্রমোদ বলিলেন, "তবে যদি আমিই নীরজাকে আনিয়া থাকি, তাহা হইলে তো আমার বাড়ীতেই থাকিবে, আপনি বরং আমার বাড়ী খুঁজিয়া দেখুন।"

স। "সে খবর আমি না লইয়া তোমার কাছে আসি নাই, তোমার এ বাটীতে তাহাকে তুমি রাখ নাই, তাহা হইলে যে শীঘ্র ধরা পড়িবে, আর কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছ বল?' প্রমোদ ইহার কি উত্তর দিবেন? রাগে, কষ্টে, হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অন্য কেহ হইলে প্রমোদের অপরিসীম রাগ হইত, রাগে কি করিতেন ঠিক নাই, কিন্তু সন্ন্যাসী বলিয়া, নীরজার পিতা বলিয়া, রাগ হইতে কষ্টের ভাগ অধিকতর হইল। তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন "তুমি যদি ভালয় ভালয় তাহাকে ফিরাইয়া দেও তো আমি তোমার সকল দোষ মার্জ্জনা করিব, নহিলে—নহিলে———" প্রমোদ আর মৌন হইয়া থাকিতে না পারিয়া ঈষৎ ক্রুদ্ধগর্ব্বিত

স্বরে বলিলেন "মহাশয়, নীরজা কোথায় আমি জানি না, আমি শপথ করিয়া ঈশ্বর-সম্মুখে আপনাকে ইহা বলিতেছি, ইহাতেও যদি আপনি বিশ্বাস না করেন তো আপনার যাহা ইচ্ছা——"

সন্ন্যাসী সহিষ্ণু ভাবে প্রমোদের বাক্য শেষ পর্য্যন্ত আর শুনিতে পারিলেন না। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে দিগন্তভেদী গম্ভীর স্বরে বলিলেন "চুপ্—আর কথা কহিও না, তোমার প্রত্যেক কথায় আমার হৃদয় হইতে শোণিত-স্ফুলিঙ্গ ছুটিতেছে, নরাধম! পাষণ্ড! আজ দেখিতেছি এ হস্ত তোর রক্তে প্লাবিত হইবে, আজ দেখিতেছি নরহত্যায় এ হস্ত কলুষিত হইবে'—বলিয়া ক্রোধে অজ্ঞানবৎ প্রমোদের দিকে দুই এক পদ অগ্রসর হইলেন, কিন্তু দুই এক পদ চলিয়াই আবার যেন জ্ঞান হইল, তিনি সহসা থমকিয়া দাঁড়াইলেন, একবার সেই অন্ধকার আকাশ পানে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে, একবার আপনার চারি দিকে সেই আঁধারময় প্রকৃতির আঁধার মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে, মুহূর্ত্তমাত্র সময় লইয়া সেই আঁধার নৈশ-গগন কাঁপাইয়া প্রমোদকে চমকিত করিয়া বলিলেন "না নরাধম, আমি তোর অপবিত্র রক্তে হস্ত কলঙ্কিত করিব না, আমি তোকে মারিব না, তোকে মারিলে নীরজাকে পাইব না, তুই মরিলে নীরজা কোথায় কে বলিবে? না, তোকে মারিব না, মৃত্যুতে তোর মত লোকের শাস্তি হইবে না—তোকে মারিলে আমারি কলঙ্ক। আমি বিচারালয়ে লইয়া তোকে শাস্তি দিব,—পৃথিবীর এক সীমা হইতে আর এক সীমা পর্য্যন্ত তোর নাম—তোর দুর্নাম, তোর জঘন্য বিশ্বাস-ঘাতকতা ঘোষণা করিব, পৃথিবীর সকলে তোকে দেখিবামাত্র সর্পের ন্যায় ঘৃণা করিয়া সরিয়া দাঁড়াইবে! তোকে মারিব না, মারিলে তোর পাপের শাস্তি হইবে না" বলিয়া সন্ন্যাসী আর মুহূর্ত্তমাত্র না দাঁড়াইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। সেই নিস্তব্ধ আঁধারময় রজনীকে কাঁপাইয়া, সেই কথা গুলি বজ্রের মত প্রমোদের কর্ণে প্রবেশ করিল। সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন, প্রমোদ অনেক ক্ষণ ধরিয়া বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধভাবে সেই খানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যখন তাঁহার চিন্তা করিবার শক্তি জন্মিল, তখন সন্ন্যাসীর সহিত যত কথা হইয়াছিল, পূর্ব্বাপর ক্রমে মনে পড়িতে লাগিল। কি করিয়া তিনি এবিপদ হইতে উদ্ধার পাইবেন তখন ভাবিতে লাগিলেন। মন এমনি চঞ্চল, তখনি কাহারো সহিত ঐ বিষয়ে পরামর্শ করিতে ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু ও সকল কথা কাহাকে বলেন? সকলের নিকট আবার বলিতেও ইচ্ছা করে না। তিনি খুঁজিতে খুঁজিতে যামিনীনাথকে ছাড়া আর পরামর্শ করিবার লোক পাইলেন না। প্রথমতঃ যামিনীনাথ তাঁহার হৃদয়-বন্ধু, দ্বিতীয়তঃ যামিনীনাথও সেই অরণ্যে গিয়াছিলেন, তিনিও নীরজাকে দেখিয়াছেন, তিনি সকলই জানেন, সেই জন্য ও সম্বন্ধে তিনি যেমন ভাল পরামর্শ দিতে পারিবেন তেমন অন্য কেহ পারিবে না। প্রমোদ এই সকল ভাবিয়া সেই রাত্রেই ব্যাকুল ভাবে যামিনীনাথের বাড়ী যাত্রা করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ—বিস্ময়।

যামিনীনাথ ভবানীপুরের এক জন ধনশালী যুবা। তিনি চতুর্ব্বিংশ বর্ষীয়। শরীর কিছু কৃশ, মুখাবয়ব ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নহে, কিন্তু বর্ণ গৌর এবং দেখিতে কুরূপ নহেন। ললাট প্রশস্ত না হউক—নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, চক্ষু আয়ত, কিন্তু দৃষ্টি তত সরল নহে বলিয়া চক্ষুর তেমন সৌন্দর্য্য নাই। নাসিকা সুবঙ্কিম, তাহা কার্য্যতৎপরতার চিহ্ন।

মাতা ও এক বৃদ্ধা জ্যেষ্ঠতাতপত্নী এবং একটি ভগিনী ছাড়া আর যামিনীনাথের কেহই ছিল না। যামিনীর অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। এই অল্প বয়সে সমস্ত বিভবের অধিপতি হইয়া তাঁহার মস্তক কিছু ঘুরিয়া গিয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পরেই তিনি স্কুল ছাড়িয়া দিলেন। সেই অবধি পুস্তকের সহিত তাঁহার সম্পর্ক রহিত হইল। যেমন হইয়া থাকে, কতকগুলি চাটুকার লইয়া, কতকগুলি সঙ্গী বন্ধুবান্ধব লইয়া তিনি সময় কাটাইতে লাগিলেন। তিনি ন্যায় অন্যায় যে কাজই করুন, তাহাতে কথা কহিবার কেহই নাই, তিনি যাহা ই করুন চাটুকারগণ তাহাতেই তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে থাকে। যামিনীনাথ যে তাহাদের অন্যায় প্রশংসা বোঝেন না তাহা নহে, তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান, কিন্তু বুঝি য়াও তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হন না। যামিনীর হাত বিলক্ষণ দরাজ। প্রশংসা পাইবার নিমিত্ত চাটুকারদিগকে তুষ্ট করিতে, মানের জন্য বন্ধুদের কথা রাখিতে, নাম কিনিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে দান করিতে, তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। একে পিতার অনেক ধন, তাহাতে যামিনীনাথের জ্যেষ্ঠতাতপত্নী তাঁহার পিতার পাঁচলক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন। তাঁহার আর কেহ না থাকায় যামিনী সে টাকারও ভবিষ্যৎ অধিপতি হইবেন আশা ছিল। সুতরাং ব্যয় করিতে প্রথম প্রথম তিনি কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু এই রূপে দুই চারি বৎসরেই তিনি পিতৃসঞ্চিত ধনের অর্দ্ধেক খোয়াইয়া ফেলিলেন। কিছু দিন পরে তাঁহার সে বিষয়ে চৈতন্য হইল। তিনি দরাজ হাত ক্রমে গুটাইয়া আনিলেন, দানের মাত্রা সকলি প্রায় কমাইয়া ফেলিলেন। এখন তিনি সুবিধা পাইলে নিজে কোন বন্ধুর ঘাড় ভাঙ্গিতে পারিলেও ছাড়িতেন না।

তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে, পিতার মৃত্যুর আগে যখন যামিনীনাথ কলেজে পড়িতেন তখন প্রমোদের সহিত তাহার আলাপ হয়। তাহার পর কলেজ ছাড়িয়াও যামিনী প্রমোদকে সর্ব্বদা নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ করিতেন, সর্ব্বদাই প্রমোদের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন। আসল কথা প্রমোদ, ধনবান তারাকান্তের বিষয়ের ভবিষ্যৎ মালিক, সুতরাং এখন হইতেই যামিনীনাথ তাঁহাকে আপন দলে মেশাইবার অভিপ্রায়ে ছিলেন। কিন্তু নীরজা যামিনীনাথের সহিত তাঁহার বাড়ী আসা অবধি আর প্রমোদের সহিত যামিনীর দেখা শুনা হয় নাই। যামিনীর সেই অবধি আর প্রমোদকে নিমন্ত্রণ করা, প্রমোদের বাটী

যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। প্রমোদও অবকাশ অভাবে এখানে আসিতে পারেন নাই। যদিও যামিনীর সহিত প্রমোদের নানা মতের বিভিন্নতা ছিল তথাপি তাঁহাদের কারণ ছাড়াও, দুজনের বিশেষ বন্ধুতা ছিল। সুতরাং অন্য আজ প্রমোদের এত রাত্রে এখানে পরামর্শ করিতে আসিবার ইহাও একটি কারণ। কিন্তু প্রমোদ এখানে আসিয়া শুনিলেন যামিনীনাথ বাড়ী নাই, কোথায় গিয়াছেন। তথাপি শীঘ্র আসিবেন শুনিয়া প্রমোদ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া যামিনীর বসিবার গৃহে আসিয়া বসিলেন।

যামিনীনাথের পরিচয় আর একটু বিশেষরূপ দিবার নিমিত্ত এইস্থলে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। যামিনীনাথ বড় বিদেশীয় রাজনীতি আচারব্যবহারের বিদ্বেষী ছিলেন। ভালই হোক মন্দই হোক তাঁহার তাহার প্রতি বড় ঘৃণা ছিল। এমন কি, বিদেশীয় ভাষা আর শিখিবেন না বলিয়া তিনি স্কুল ত্যাগ করিয়া আসেন। কিন্তু যে ঘরটিতে প্রমোদ আসিয়া বসিলেন সেটি সম্পূর্ণ ইংরাজি প্রথায় সজ্জিত। মধ্যে টেবিল, চতুষ্পার্শে চৌকি কৌচ, তাহাতেই সর্ব্বদা যামিনী বন্ধুবান্ধব লইয়া বসিতেন। বোধ করি নীচের বিছানায় বসিলে পৃষ্ঠ-বেদনা করিত সেইহেতু সুবিধার অনুরোধে স্বদেশানুরাগী যামিনীনাথের অগত্যা কষ্টে বিদেশীয় অনুকরণ করিতে হইয়াছিল। গৃহের একটি প্রান্তে একটি লম্বা শ্বেতপ্রস্তরের টেবিল, তাহার মধ্যে একটি ফুলদানি, ফুলদানির দুই পার্শ্বে দুই খানি অ্যালবম্। প্রমোদ একাকী বসিয়া কি করেন—সেই টেবিলের নিকট একখানি চৌকিতে বসিয়া অ্যালবম্ হইতে ছবি দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন তাহাতে ইয়োরোপের সমস্ত রাজা রাণীদের ছবি আছে, সমস্ত বড় লোকের ছবি আছে। সে দেশীয় অনেক সুন্দরীগণের ছবিও তাহাতে দেখিতে পাইলেন। অ্যালবমের প্রথম তিন চারিটি পাতে ইয়োরোপীয় প্রধান প্রধান রাজাদের ছবি দেখিলেন। তাহার পরে, রাণী ভিকটোরিয়ার পর, প্রসিদ্ধা সুন্দরী ফ্রান্সের রাজ্ঞী ইয়োজিনী এবং যুবরাজপত্নী আলেকজেণ্ড্রিয়ার চিত্র দেখিয়া তিনি মনে মনে তাহাদের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মুখের প্রত্যেক অবয়ব গুলি বিশেষ মনোযোগ দিয়া দেখিলেন তাহার কিছুই নিন্দনীয় নাই, দেখিলেন নাসিকা চক্ষু সকলি বাস্তবিক সুগঠন। কিন্তু তবে? তবে একটির মাত্র অভাব। মুখে যে একটি সুন্দর ভাব থাকিলে সমস্ত মুখটিতে সৌন্দর্য্য আপ্লুত করে সেই ভাবটির মাত্র অভাব। কই, সে ভাবটি এ সকল চিত্রে কই? যে ভাবটি দেখিবামাত্র শরীর লোমাঞ্চিত হয়, হৃদয়ে সহসা একটি স্বপ্নময় আমোদ জন্মে, কই, সে ভাবটি ইহাদের মুখে কই? কিন্তু প্রমোদের মনের কথা প্রমোদ মনে মনেই চাপিয়া লইলেন। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোত্তম দেশের প্রসিদ্ধ সুন্দরী বলিয়া যাঁরা বিখ্যাত, প্রমোদ কেমন করিয়া আজ স্পষ্ট করিয়া বলেন তিনি তাঁহাদের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে অক্ষম। তাঁহার কথা শুনিলে কে না সে

কথায় হাসিবে, তাঁহাকে রুচি-হীন বলিয়া কে তাঁহাকে রুচির উৎকর্ষ সাধনে পরামর্শ না দিবে? অন্যের কথা দূরে থাকুক, সেই চিত্রের সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায় নিজেই লজ্জিত হইয়া প্রমোদ সে ভাবটি আপনার কাছেও চাপিয়া লইতে চেষ্টা করিয়া সে পাতটি উলটাইয়া ফেলিলেন। পর পাতে আরো দুই একটি সুন্দরীর চিত্র দেখিলেন, কিন্তু কাহারো মুখে প্রমোদ সেই একটি কেমন কেমন সৌন্দর্য্যের ভাব দেখিতে পাইলেন না—তাঁহার মনের মত সৌন্দর্য্য কোন ছবিতেই মিলিল না। একটি মাত্র জীবন্ত প্রতিমাতে তিনি সেইরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন মাত্র, কিন্তু আর সে সৌন্দর্য্য তিনি ইয়োরোপের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সুন্দরীতেও দেখিতে পাইলেন না। প্রমোদ তখন সুপ্রসিদ্ধা সুন্দরী স্কটেদের রাণী মেরিকে দেখিবার জন্য পাত উলটাইতে লাগিলেন—সে অ্যালবমে তাহা পাইলেন না। সে খানি রাখিয়া আর একখানি খুলিয়াই তিনি মেরির ছবি পাইলেন। যে রূপে কত রাজ্যবিপ্লব ঘটিয়াছিল, যে রূপের জ্যোৎস্নাময় তরল তরঙ্গে কত উচ্চপদবীগত লোক উৎসন্ন গিয়াছিল, যে রূপের প্রশংসায় আজ পর্য্যন্ত দিক আমোদিত, সেই রূপের মোহিনী শক্তি তাহার মুখের কোন স্থলে বিদ্যমান তাহা প্রমোদ মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিতে লাগিলেন। সহসা আর দেখা হইল না—বীণাধ্বনিবৎ সহসা তাহার কর্ণে এই কথাটি বাজিয়া উঠিল "যামিনী বাবু"—সে স্বর প্রমোদ চিনিতে পারিলেন, সে স্বরে প্রমোদ লোমাঞ্চিত কায়ে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন তাঁহার পশ্চাতে নীরজা। সাধক তাহার আকাঙ্ক্ষিত বর পাইলে যত আহ্লাদিত না হইত, নীরজাকে দেখিয়া প্রমোদের তাহা হইল। প্রমোদের মুখ দেখিতে না পাইয়া যামিনী বোধে প্রথমে নীরজা ডাকিয়াছিল। সহসা প্রমোদকে দেখিয়া তাহার মুখেও আনন্দ বিভাসিত হইল। সেই বৃহৎ কক্ষে, একটি দীপালোক-বিভাসিত কক্ষে, দুই প্রান্তে দুইজনে নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন—উভয়ের নয়নে নয়নে স্থির দৃষ্টি সংলগ্ন হইল, উভয়ে মনে মনে মন হারাইয়া চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেকে চমক ভাঙ্গিলে নীরজা বলিয়া উঠিল "একি, এত রাত্রে তুমি এখানে?" প্রমোদ অমনি এক সময়েই প্রায় বলিয়া উঠিলেন "নীরজা, তুমি এখানে!" হঠাৎ বিস্ময় ও আনন্দ জনিত মনের বিশৃঙ্খল ভাব কিছু গোছাইয়া লইয়া কিছু পরে নীরজা তাহার দুঃখের কাহিনী আনুপূর্ব্বিক বলিল। শুনিয়া এখন প্রমোদ সন্ন্যাসীর কথা বুঝিতে পারিলেন। প্রমোদ বলিলেন "যামিনী তোমাকে বাঁচাইয়াছেন, কি সৌভাগ্য! নহিলে কি হইত কে জানে?" আমি কেন যামিনীর মত সৌভাগ্যবান হইলাম না—আমি কেন তোমাকে উদ্ধার করিতে পারিলাম না।" বলিয়াই মনে মনে যেন কি ভাবের আধিক্য বশতঃ প্রমোদের কথা বন্ধ হইল—নীরজাও ইহার কোন উত্তর করিল না। কথা কহিতে কহিতে ধীরে ধীরে আপনা হইতে

প্রমোদের একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল, তাহাতে প্রমোদ আপনি চমকিয়া উঠিয়া আবার বলিলেন "তুমি এখানে আছ যদি কিছু আগে আমি জানিতাম! কিছু আগে যদি যামিনীর সহিত দেখা হইত, তাহা হইলেই আজ যখন তোমার—" এই সময় যামিনীনাথ তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, প্রমোদের মুখ অমনি রুদ্ধ হইয়া গেল, সে কথাটি আর শেষ হইল না। প্রমোদের সহিত নীরজাকে দেখিয়া যামিনীনাথ বিস্মিত হইয়া ঈষৎ ক্রুদ্ধ ভাবে নীরজকে বলিলেন "একি তুমি এখানে!' নীরজা বলিল "বাবার শেষ চিঠির উত্তর আসিল কি না জানিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইয়াছি। অনেক ক্ষণ তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়া করিয়া তুমি এত রাত্রেও খবর দিতে অন্তঃপুরে এলে না দেখে আমি এই খানেই তোমাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে না আসিয়া থাকিতে পারিলাম না। এখানে আসিয়া প্রমোদের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে গল্প করিতেছি" যামিনী একটু বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন "বাইরে কখন কে আসে—এখানে আসিবার আবশ্যক? আমি চিঠি পাইলেই তো তোমাকে বলিতে যাইতাম।" এই কথায় নীরজাও একটু বিরক্ত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—দেশানুরাগ।

নীরজা চলিয়া গেল—তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার কথা আর তাহাকে প্রমোদের বলা হইল না। যামিনীনাথকে বলিলেন, "ভাই, অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা করিতে পারি নাই। আজ এত রাত্রে দেখিয়া বিস্মিত হইও না—বড় বিপদে পড়িয়া পরামর্শ লইতে আসিয়াছি।" যামিনী ব্যগ্রতা দেখিয়া বলিলেন, "কি কি—বিপদটা কি।"

প্র। "আজ হঠাৎ নীরজার পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইলে——"

যামিনী এই কথায় ব্যগ্র হইয়া আবার বলিলেন, "নীরজার পিতা! তিনি এখানে এসেছেন।"

প্র। "হাঁ—কিন্তু নীরজা এখানে আছেন, না জানার দরুন বড় ভাই আমার ক্ষতি হয়েছে—" নীরজাকে প্রমোদ দেখিতে পাইয়াছেন দেখিয়া যামিনীনাথ হাসিয়া এই কথার মধ্যে বলিলেন,"দেখ ভাই প্রমোদ—নীরজাকে নিয়ে মহা ব্যাপার হয়েছিল—সে অনেক কথা। সে সব তোমাকে বলবার জন্য তোমার এলাহাবাদ থেকে আসার খবর পেয়ে আমি অতিশয় ব্যাকুল ছিলাম। কবে এসেছ তা কি সংবাদও দিতে নেই।"

প্র। "হাঁ—কেমন তা ঘটিয়া উঠে নাই—অন্যায় হয়েছে স্বীকার করি। আমি নীরজার মুখে সে সব ব্যাপার এখনি শুনেছি—কি ভয়ানক! যামিনী ভাগ্যে তুমি বাঁচালে!"

যা। 'আমি না থাকলে নীরজার কি দুর্দ্দশা হোত মনে করতে আমারো বড় কষ্ট হয়।—সে যাক এখন তাহার ভালয় ভালয় তার বাপের হাতে তাকে দিতে পারলে হয়। এখানে যে সন্ন্যাসী এসেছেন ভালই হয়েছে। আমি যে কত পত্রই তাঁকে লিখেছি ঠিক নাই, কাজে ব্যস্ত না থাকলে—আমি এতদিন নীরজাকে তার বাপের কাছে রেখে পর্য্যন্ত আসতেম। যাক—তার পর সন্ন্যাসী তোমাকে কি বল্লেন?" প্রমোদের সহিত সন্ন্যাসীর যে কথা হইয়াছিল তখন প্রমোদ সংক্ষেপে সবিশেষ বলিয়া বলিলেন "সন্ন্যাসী আমাকে কোন মতে বিশ্বাস করিলেন না—ইহার উপায়।" যামিনীনাথ গম্ভীর ভাবে সমস্ত শুনিয়া অবশেষে হাসিয়া বলিলেন "তুমি নির্দ্দোষী, তোমার ভয় কি—আমি আছি, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

যামিনীনাথের কথায় প্রমোদ বলিলেন "বিচারে যে আমি নির্দ্দোষ হইব সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই—তাহার জন্য ভাবি না। কিন্তু সন্ন্যাসী আমাকে মিথ্যা দোষী করিতেছেন—বিচারে নির্দ্দোষ হইলেও তাঁহার চক্ষে পাছে অপরাধী থাকি—এই ভাবনাই আমাকে কষ্ট দিতেছে। নীরজার সমস্ত ব্যাপার তাঁকে বলিলেও কি তুমি মনে কর আমাকে দোষী করিবেন? কিন্তু তাই বা তাঁহাকে এখন কি করিয়া বলিব—তিনি কোথায় থাকেন কিছুই জানি না।" যামিনী বলিলেন "তোমার কিছুমাত্র ভাবনা নাই—ইহার প্রতীকার যাহা আবশ্যক আমি সকলি করিব। তুমি কিছুই ভাবিও না। কি আশ্চর্য্য—কি ছেলেমানুষ! এই জন্য তোমার ভাবনা! আজ কত দিন পরে দেখা—কোথায়, আমরা একটু আমোদ

প্রমোদ গল্প সল্প করিব—না তোমার ভাই ঐ মিথ্যা ভাবনা! তা হবে না ভাই—আমোদ ক'রে চল আজ থিয়েটারে যাওয়া যাক।" আজ থিয়েটারে পদ্মাবতী অভিনয় হবে জান—

প্রমোদ প্রথমে অনেক আপত্তি করিয়া শেষে বলিলেন "এত রাত্রে থিয়েটারে যাব। সে যে অনেক দূর?"

যা। "না, না, এই ভবানীপুরেই আজ একটা দলে থিয়েটার করছে—চল যাওয়া যাক, সেতো কাছেই। তুমি কিছু যদি না খেয়ে থাক তো এই খানেই এস এক সঙ্গে খাই।" প্রমোদ তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন "তিনি খাইয়া আসিয়াছেন।" যামিনী তখন বলিলেন "তবে আমি খাইয়া আসি—তুমি বস, আসিয়া একত্রে থিয়েটার যাইব।", প্রমোদের থিয়েটার যাইতে বড় একটা ইচ্ছা ছিল না, সেই জন্য আরো দুই একবার ওজর করিলেন, কিন্তু যামিনী তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন "তাকি হয়—চল যাওয়া যাক, আমি শীঘ্র খাইয়া আসি"—কি করেন, প্রমোদ আর কথা কাটাইতে না পারিয়া অগত্যা সম্মত হইলেন। আসল কথা, এখন থিয়েটারে যাইবার মত প্রমোদের প্রথমতঃ মনের অবস্থাই ছিল না, তাহার পর, আবার কিছু দিন পূর্ব্বে কয়েক মাস যামিনীর সহিত থিয়েটার সারকাস ইত্যাদি দেখিতে গিয়া তাঁহার ন্যায্য খরচের টাকা পর্য্যন্ত ভাঙ্গিতে হইয়াছিল—এখন আপাততঃ হাতে যে টাকা আছে তাহাতে সমস্ত মাস চলিবে কি না সন্দেহ—সুতরাং কোন দিক হইতেই প্রমোদের

থিয়েটার যাইতে ইচ্ছা ছিল না।—কিন্তু যামিনীর কথায় অগত্যা স্বীকৃত হইতে হইল। যামিনী খাইয়া আসিবার পর তাহারা দুজনে থিয়েটার দেখিতে চলিলেন—যাইতে যাইতে যামিনীনাথ কিছু পিছাইয়া পড়িলেন, প্রমোদ কিছু অগ্রগামী হইয়া থিয়েটারগৃহে গিয়া বসিলেন। এদিকে যাইতে যাইতে গৃহে প্রবেশ করিবার সময় একজন কনষ্টেবলের গাত্রে যামিনীনাথের গাত্র ঠেকিল, যামিনীর মাথা তখন বড় একটা ঠিক ছিল না—বাড়ী হইতে দুই এক পাত্র তরল উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া আসিয়াছিলেন, কনষ্টেবলের গাত্রে গাত্র ঠেকিবামাত্র তাঁহার অপমান বোধ হইল, তিনি নির্দ্দোষী কনষ্টেবলকে এক ঘুসি বসাইয়া দিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যামিনীনাথ বড় দেশানুরাগী, ভালই হৌক মন্দই হৌক বিদেশীয় অনুকরণের নামমাত্রেই তিনি জ্বলিয়া উঠিতেন, অথচ সুবিধার অনুরোধে ইংরাজী প্রথায় গৃহ সাজাইতে, বিলাসের অনুরোধে ইংরাজী বুট ট্রাউজার এবং মুসলমানি চাপকান পরিতে, সভ্যতার অনুরোধে হাতের পরিবর্ত্তে কাঁটা চামচ ব্যবহার করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। শরীরের অনুরোধে মা ভগবতীর প্রতিও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, এবং বন্ধুদের অনুরোধে বিলাতি মদ্যের প্রতিও তাঁহার ঘৃণা ছাড়িতে হইয়াছিল।

বিদেশীর অনুকরণের প্রতি তাঁহার যেমন ঘৃণা ছিল—ভারতগৌরবলোপকারী বিদেশীয়গণের প্রতিও তিনি তেমনি জাতক্রোধ ছিলেন—ভারতের অস্তমিত গৌরবের দিনের জন্য তিনি প্রাণপণ করিয়াছিলেন, এমন কি, অনেক সময় স্কুলের ছাত্রদিগকে সমবেত করিয়া আর্য্য-পরিমার পুনরুদ্দীপন বিষয়ে বক্তৃতাও দিতেন, গবর্ণমেণ্টকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি তাহাদের গালি দিয়া সংবাদপত্রে কয়েক বার লিখিয়াও ছিলেন—কিন্তু সেই গালি পড়িলে সহসা অনেকেরই তাহা প্রশংসা বলিয়া ভ্রম হইত। যাহা হৌক, স্কুলের ছাত্রগণের প্রায় সকলেরই মনে তাহার প্রতি অটল বিশ্বাস ছিল—দেশানুরাগী বলিয়া অনেকের নিকট তাঁহার বিলক্ষণ মান ছিল। প্রমোদও যামিনীকে অত্যন্ত সৎলোক বলিয়া মনে করিতেন। তবে যামিনীর পান-দোষটি তাঁহার ভাল না ঠেকায় তিনি ঐ সম্বন্ধে যামিনীকে একদিন বলিয়া ছিলেন। যামিনীনাথ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি তো নিয়মিত প্রত্যহ পান করেন না, উহাতে তো তাঁহার তেমন অনুরাগ নাই, তবে বন্ধু-বান্ধব মিলিয়া কখনো কখনো কদাচ পান করিতে দোষ কি? প্রমোদ তাঁহার কথায় জল বুঝিয়া গেলেন। যামিনী বড় বুদ্ধিমান—কার কাছে কিরূপ বলিলে খাটিবে; কার কাছে কিরূপ করিয়া চলিতে হইবে, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন। প্রমোদের মদ্যে ঘৃণা ছিল—সুতরাং তাঁহার নিকট তিনি বড় একটা মদ খাইতেন না। প্রমোদ থাকিলে, নিতান্ত ইচ্ছা হইলেও দুই একবার লুকাইয়া লুকাইয়া সরিয়া গিয়া খাইয়া আসিতেন—কিম্বা যখন অন্য পাঁচ জন বন্ধু থাকিত, তখন এমনি কৌশল করিতেন যেন

নিতান্ত দায়ে পড়িয়া বন্ধুদের অনুরোধেই তাঁহাকে খাইতে হইতেছে। যাহা হৌক, আজ দেশানুরাগের আতিশয্যবশতঃ যবনগাত্রে গাত্র স্পর্শ হইবা মাত্র তাঁহার অত্যন্ত অপমান বোধ হইল, তাঁহার দেশানুরাগ দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল, সেই দুরাচার যবনদিগের কথা স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে তাঁহার আর্য্যরক্ত ফেনিত হইয়া উঠিল, তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাকে আজ মারিয়া মরিতে হয় সেও স্বীকার, আজ তাহাকে মারিবেন, আজ তাহাকে মারিয়া ভারতবর্ষের শত সহস্র লোককে দৃষ্টান্ত দেখাইবেন, ভারতের পূর্ব্বদিন আজ তিনিই ফিরাইয়া আনিবেন মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া তিনি তাহাকে এক ঘুসী বসাইয়া দিলেন। কনষ্টেবলটিও ছেড়ে কথা কহিল না, যামিনীনাথের ঘুসী গুদ-সুদ্ধ সে ফিরাইয়া দিল। ক্রমে সেই কোলাহলে সেখানে লোক জমিতে লাগিল, প্রমোদও গোল শুনিয়া বাহিরে আসিলেন, বন্ধুর দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রমোদ সক্রোধে কনষ্টেবলের উপর পড়িলেন। মার খাইয়া যামিনীরও নেশা ছুটিয়াছিল, এখন সাহায্য পাইয়া তিনিও ছাড়িলেন না, বিস্তর ইংরাজি কথা বলিতে বলিতে কনষ্টেবলকে বিশিষ্ট রূপে আহত করিয়া দুই বন্ধুতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। কনষ্টেবল তাঁহাদের চিনিত, পরদিন সে তাঁহাদের নামে অভিযোগ করিল। নালিস শুনিয়া প্রমোদ বড় একটা দমিয়া গেলেন না, কেবল কনষ্টেবলের উপর আরো একটু বেশী মাত্রায় চটিলেন। ভাবিলেন, সে নালিস না করিয়া যদি পুরস্কার প্রার্থনা করিত তো তাহার পক্ষে ভাল হইত, কিছু পাইয়া যাইত, নালিশ করিয়া আর একবার মার খাইবার সূত্রপাত করিল মাত্র। প্রমোদের কেবল একটি বিষয়ে একটু মুস্কিল লাগিল। নকদ্দামাতে তো উকীল বেরিষ্টার দিতে হইবে, এবং তাহা ছাড়া অন্যান্য খরচও তো আছে, তাহার টাকা কোথা হইতে পাওয়া যায়? কিম্বা যদি কি জানি মন্দটাই হয়, যদি কিছু দণ্ডই লাগে, তবে তো আগে হইতে তাহার জোগাড় করা চাই। তৎক্ষণাৎ দণ্ড দিতে না পারিলে তো জেলে যাইতে হইবে, এই জন্য ইহার অবশ্য আগে হইতে উপায় করা আবশ্যক। কিন্তু দণ্ড দিতে হইলেও ১০। ১২ টাকার অধিক তো আর কোন মতেই দণ্ড লাগিবার সম্ভাবনা নাই। দণ্ডের টাকার জন্য তবে ভাবনার প্রয়োজন কি, এখন উকীল বেরিষ্টারদের টাকাটা জোগাড় করিতে পারিলেই হয়, তাহা আবার আগেই দিতে হইবে, সে কিছু ২০০ শত টাকার কম কোন মতেই হইবে না। কিন্তু অত টাকা এখন প্রমোদ কোথায় পান? ইহাতেই প্রমোদ একটু চিন্তিত হইলেন, কিন্তু শেষ কোন উপায়ই না পাইয়া কনকের কাছে অগত্যা তাহা চাহিয়া পাঠাইলেন। যামিনীর নিকট ধার চাহিতে তিনি লজ্জায় কোন মতে পারিয়া উঠিলেন না। আর ধার করিলেও তো তাহার টাকা শীঘ্র শোধ দিতে হইবে, সেই তো কনকের নিকট চাহিতে হইবেই, তাহা অপেক্ষা এখন চাহোয়াই যুক্তিসিদ্ধ

ভাবিয়া প্রমোদ কনককে টাকা পাঠাইতে লিখিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—স্নেহের পুরস্কার।

কলিকাতা আসিয়া অবধি প্রমোদ মাঝে মাঝে কনকের নিকট ১০।২০ টাকা করিয়া চাহিয়া পাঠাইতেন। যামিনীনাথ তাঁহাকে যেরূপ পাইয়া বসিয়াছিলেন তাহাতে প্রমোদের আপন ব্যয়েরই অর্থ কুলাইয়া ওঠা ভার হইত। ধনশালী বলিয়া প্রমোদের খ্যাতি আছে, সুতরাং তাঁহার ঘাড় ভাঙ্গিবার ইচ্ছায় যামিনীনাথ আজ থিয়াটারে চল, আজ হোটেলে খানা দেও, আজ সারকস দেখিয়া আসি, এইরূপ ধরিয়া পড়িতেন, প্রমোদেরও ধনশালী বলিয়া মনে মনে একটু অহঙ্কার আছে, তিনিও সহজে সে নামটি খোয়াইতে চাহিতেন না। লজ্জার খাতিরে যামিনী বাবুর কথাগুলি কাজেই রাখিতে হইত। সুশীলার নিকট হইতে প্রমোদ কলিকাতায় থাকিবার যে খরচ পাইতেন এইরূপ ব্যয়ে তাঁহার সে অর্থে কুলাইয়া ওঠা ভার হইত। আজ হাতে টাকা নাই অথচ যামিনী আসিয়া বলিলেন থিয়েটার যাইতে হইবে—আত্মাভিমানীদের 'না' বলিতে অপমান বোধ হয়—প্রমোদ আত্মাভিমানী, হাতে যে টাকা আছে লজ্জার অনুরোধে তাহাতে সেই দিনকার থিয়েটার দেখা চলে, কিন্তু পরে কলেজের মাহিনে চাই, অন্যান্য আবশ্যক খরচ চাই, সুশীলার নিকট চাহিলে আর অধিক টাকা পাইবার আশা নাই, কারণ সুশীলার বিশ্বাস ছিল, বেশী টাকা হাতে পাইলেই ছেলেদের স্বভাব বিগড়িয়া যায়, সুতরাং তাঁহার নিকট প্রমোদ চাহিতে পারেন না, চাহিলে টাকা দেওয়া দূরে থাকুক বরং সুশীলা প্রমোদের স্বভাবের প্রতি সন্দেহ করিয়া তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন। কি করেন, প্রমোদ আবশ্যক হইলেই চুপে চুপে অগত্যা কনককে পত্র লিখিতেন, কনক কষ্টে সৃষ্টে যে কোন প্রকারেই হউক প্রমোদকে টাকা পাঠাইত। কিন্তু সে টাকার জোগাড় করিতে কনকের যে কিরূপ মাথা কাটা কুটি করিতে হইত, জানিলে হয়তো প্রমোদেরও মায়া হইত, আপন খরচ বিষয়ে হয়তো তিনি সাবধান হইতেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত কনক কখনো সে কষ্টের কথা প্রমোদকে বলে নাই। কনক মাসে যে ১৫ টাকা করিয়া সুশীলার নিকট হইতে জলপানী পাইত, সেই টাকাগুলি, না খাইয়া না কিছু কিনিয়া যত্নে জমাইয়া ভ্রাতার জন্য পাঠাইত, এবং তাহা ছাড়া রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া সেলাই করতঃ তাহা গোপনে বিক্রয় পূর্ব্বক টাকা গুলি ভ্রাতাকে পাঠাইত!

২০।২৫ টাকা বলিয়া যেন কনক কষ্টে সৃষ্টে ভাইকে তাহা জোগাইত, কিন্তু এবার যে প্রমোদ হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হইয়া একেবারে ২০০ শত টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন, ইহা এখন কনক কোথা হইতে কেমন করিয়া দিবে? অথচ না দিলেই নয়, প্রমোদ লিখিয়াছেন টাকা না পাইলে তাঁহাকে জেলে

ও যাইতে হইবে—কি ভয়ানক! বালিকা বেচারী তো ভাবিয়া ভাবিয়া আকুল হইল। সুশীলার নিকটেও কিছু সে টাকা চাহিবার যো নাই, তাহা আবার প্রমোদের নিষেধ। প্রমোদ জানিতেন কনকের কাছে টাকা চাহিলেই পাইবেন, এমন স্থলে আপনার মার-পিঠ এবং সেই হেতু মকদ্দমা হেঙ্গামের কথা যদি না জানাইয়াই চলিয়া যায় তো প্রমোদ তাহা আর সুশীলাকে জানাইবার ইচ্ছা করিবেন কেন? কিন্তু কনক যে কত কষ্ট করিয়া টাকা পাঠায় তাহা প্রমোদ জানিতেন না। টাকা চাহিলেই তিনি পান—তিনি কেবল এই মাত্র জানিতেন। তাহা যে কনক কোথা হইতে কেমন করিয়া কত কষ্টে জোগায় প্রমোদের তাহা ভাবিবার আবশ্যকও বোধ হইত না। তবে এক একবার কখনো দৈবাৎ যদি ঐ কথাটি মনে আসিত, যখন মনে হইত বিনা কষ্টে কনকের টাকা পাঠানোর সম্ভাবনা নাই, তখন প্রমোদ মনে করিতেন ভবিষ্যতে তিনি আর টাকা চাহিবেন না, এবার হইতে মিতব্যয়ী হইবেন, কিন্তু কিছু পরেই আবার সে কথা ভুলিয়া যাইতেন। অন্যবারের ন্যায় এবারেও প্রমোদ চাহিবার সময় ভাবিলেন এবার ছাড়া আর তিনি কনকের নিকট টাকা চাহিবেন না।

এদিকে বালিকা-কনকের আর দুঃখের সীমা নাই। কি উপায়ে সে এবার ভ্রাতাকে রক্ষা করিবে?

রাত্রি দ্বিপ্রহর, নিস্তব্ধ অন্ধকারময় পৃথিবী খদ্যোতিকা-মালায় রঞ্জিত, আর উপরে নীল অনন্ত আকাশ তারকামালায় খচিত। সেই তারা-খচিত আকাশের পানে চাহিয়া বালিকা-কনক কাঁদিতেছিল, তাহার দুঃখ সেই জানে, সে দুঃখ কাহারো কাছে বলিবার নয়, কাহারো কাছে উপদেশ জিজ্ঞাসা করিবার যো নাই, তাহার বিপদ সেই জানে। কাহারো কাছে মনের দুঃখ প্রকাশ করিতে না পারিয়া বালিকা নির্ব্বাক তারাদলের নিকট হৃদয় খুলিয়া কাঁদিতেছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বালিকা উঠিল, আবার গৃহে প্রবেশ করিল, একটী দীপের নিকট আসিয়া হস্তস্থিত একখানি পত্র লইয়া আবার পড়িতে লাগিল, পড়িল—

"ভাই কনক"

অতিশয় বিপদে পড়িয়াছি, তুমি বই আমার আর উপায় নাই। ২০০ শত টাকা কাল নিশ্চয়ই পাঠাইবে, তা না হইলে হয়তো জেলে যাইতে হইবে। কনক, এইবার ভাই তুমি আমাকে রক্ষা কর—এইবার ভাই আর একবার স্নেহময়ী ভগিনীর কাজ কর—

এইবার শেষবার—আর তোমাকে এরূপ কথা বলিব না। আর সকল কথা পরে লিখিব। তোমার স্নেহময় প্রমোদ।—

পুঃ

দেখ ভাই মাকে এ সকল কথা কিছু বলিওনা।"

প্রমোদ।

কনক কতবার চিটিখানি পড়িল, কতবার অশ্রুজল মুছিল। কি উপায়ে সে

২০০ শত টাকা প্রমোদকে পাঠাইতে পারে, কি করিয়া প্রমোদকে বাঁচাইবে,তাহার কতই উপায় খুজিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল, নিরুপায় বালিকা অতি প্রত্যূষে উঠিয়াই গোপনে আপনার সেলাইগুলি, এবং আপনার রেশমী ও জরীর দামী সাড়ি কয়েক খানি লইয়া, তাহার একজন বিশ্বাসী দাসীকে উঠাইয়া তাহাকে গোপনে সেইগুলি বিক্রয়ের জন্য দিল। কিন্তু বিক্রয় করে হইবে, মনে করিলেই কিছু বিক্রয় হয় না—এদিকে আজই টাকা না পাঠাইলে নয়, তবে আপাততঃ কি করিয়া টাকা পাওয়া যায়? বালিকা ভাবিতে ভাবিতে গৃহ-বহিষ্কৃত হইয়া উদ্যানে আসিয়া হতাশ চিত্তে একটি বৃক্ষতলে আসিয়া বসিল। সহসা তাহার মুখকান্তি যেন জ্বলিয়া উঠিল! সহসা তাহার হৃদয়ে যেন আশার উদয় হইল। সেই বৃক্ষ তলে সে একখানি নোটের মত কাগজ দেখিতে পাইল। কাগজ খানি হস্তে তুলিয়া দেখিল—উহা এক শত টাকার একখানি নোট। হর্ষোচ্ছ্বাসে বালিকার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল, সে ভাবিল উহা ঈশ্বর-প্রেরিত, কনকের দুঃখ নিবারণ করিতেই ঈশ্বর তাহাকে তাহা দিলেন। ইহা ভাবিয়া তাহা লওয়া ন্যায়সঙ্গত কি অন্যায় তাহা আর এই সময় তাহার মনেও আসিল না। ঐ নোট লইয়া পরে সে কত বিপদে পড়িতে পারে—এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহা ভাবিল না। ঈশ্বর-প্রেরিত জ্ঞানে সে সেই নোট খানি লইয়া এবং আপন দ্রব্যসামগ্রী অর্দ্ধদামে বিক্রয় করিয়া জোড়ে তাড়ে দুই শত টাকা করিয়া সেই দিনই প্রমোদকে পাঠাইল। পাঠান হইলে তখন তাহার মনে হইল যে যদি নোটখানি আর কাহারো হয়, যদি আমাদের বাগানে কেহ হারাইয়া গিয়া থাকে? কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবিল তাহার এখনোতো অন্যান্য দামী সাড়ি সকল বিক্রয় হয় নাই। তাহা বিক্রয় হইলেই সে এই নোট কুড়াইয়া পাইবার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবে, এবং যাহার নোট তাহাকে একশত টাকা দিবে। এদিকে সেই দিনেই সেই নোট খানির খোঁজ পড়িল। সুশীলা পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে উদ্যানে বেড়াইতে গিয়া সেই নোট খানি হারাইয়া আসিয়াছিলেন। অঞ্চলে তখন ঐ নোট বাঁধা ছিল। উত্তমরূপে বাঁধা ছিল না বলিয়াই হৌক কিম্বা যে কারণেই হৌক, তাহা অঞ্চল হইতে খসিয়া উদ্যানে পড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু নোটের কথা সুশীলা একেবারেই সে দিন ভুলিয়া গিয়া ছিলেন। হঠাৎ পরদিন কাপড় ছাড়িবার সময় সে কথা তাঁহার মনে পড়িল। তখন বাড়ীর সমস্ত দাস দাসীদিগকে লইয়া বিলক্ষণ পিড়াপিড়ি চলিতে লাগিল। বেচারিদিগের ভয়ে প্রাণ শুকাইয়া গেল, তাহাদের ভয় যে বিনা দোষে আজ না জানি কাহাকে চোর বলিয়া ধরা হয়। এরূপ অবস্থায় যেরূপ হইয়া থাকে, সুশীলা একজন নির্দ্দোষী দাসকে তন্ত্রমন্ত্র ও ন্যায় শাস্ত্র খাটাইয়া নিশ্চয়ই দোষী বলিয়া স্থির করিলেন। সুশীলার প্রশ্নে সে ঠিক নির্ভয়ে উত্তর দিতে পারে নাই—অনেক

বার তাহার কথা বাধিয়া গিয়াছে, কথার অনেক ব্যতিক্রম করিয়াছে, সকল অপেক্ষা তাহার মুখ অধিক শুকাইয়া গিয়াছে, ইহা সকলি ত চোরের লক্ষণ—ইহা হইতে অধিক প্রমাণের কি আবশ্যক? তিনি সেই ভৃত্যকে পুলিসে পাঠাইতে সঙ্কল্প করিলেন। এ দিকে এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কনকের তো প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল, সে কি বলিয়া আপনার দোষ এখন স্বীকার করে, তাহাই ভাবিতেছিল—তাহার জন্য আর একজন নির্দ্দোষীর শাস্তি হইতেছে দেখিয়া সেএখন কি প্রকারে মৌন থাকিবে। কনক ভয়ে ভয়ে সুশীলার নিকটে আসিয়া মুক্ত কণ্ঠে আপনার দোষ স্বীকার করিল। সুশীলা তাহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি নোট লইয়া কি করিলে? আর একথা তবে এতক্ষণ বল নাই কেন?" বালিকা বলিল "আমি তাহা খরচ করিয়াছি, তাই ভয়ে বলিতে পারি নাই। কিন্তু আমি স্থির করিয়াছিলাম শোধ দেবার মত হাতে টাকা হইলেই আমি একথা বলিব এবং যাহার টাকা তাহাকে দিব।" নোট খানি কনক খরচ করিয়াছে শুনিয়া সুশীলা আরো আশ্চর্য্য হইলেন। কনক তাহার ইচ্ছামত খরচ করিবার জন্য মাসিক যে ১৫ টাকা করিয়া পাইত তাহার পক্ষে তাহাই যে যথেষ্ট, কনক ত আপনিই পূর্ব্বে সুশীলাকে বলিয়াছিল যে সে যে টাকা পায় তাহা হইতে তাহার অনেক জমে,অথচ কনক এক শত টাকা তবে কি সে খরচ করিল? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "এক শত টাকা কিসে খরচ করিলে?" ইহার উত্তর কনক কি দিবে? তাহাকে মৌন দেখিয়া সুশীলা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কি সে খরচ করিলে?" কনক ভাবিল পায়ে ধরিয়া বলি 'আর এরূপ কর্ম্ম কখনো করিব না কিন্তু কারণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না'—সে ধীরে ধীরে সজল-নেত্রে কম্পিত হস্তে সুশীলার পাদস্পর্শ করিল। ধীরে ধীরে অস্ফুট স্বরে "আর করিব না" এইটুক পর্য্যন্ত বলিয়াই চুপ করিল। ভয়ে লজ্জায় আর মুখ হইতে কথা বাহির হইল না। বিরক্ত ভাবে চরণ সরাইয়া লইয়া সুশীলা আরো দুই একবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু কনক সেইরূপ নিষ্পন্দ নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল মাত্র। সুশীলা ভাবিলেন 'কি না জানি নিন্দনীয় কর্ম্মে কনক এই টাকা ব্যয় করিয়াছে, তাই ভয়ে সে কথা বলিতে পারিতেছে না।' তিনি কনকের সমস্ত ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যথিত ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। প্রথমতঃ নোট কুড়াইয়া পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে না বলাই যে যথেষ্ট দোষ হইয়াছিল—তাহার পর আবার সেই নোট খরচ করিয়াছে—আবার তাহা অন্যায় কার্য্যে খরচ করিয়াছে, অন্যায় স্বীকার করিলে তবু হইত, তাহাও কনক করিল না, এত জিজ্ঞাসাতেও তাহা বলিল না! কনক কি গুরুতর অপরাধে অপরাধী! কয় মাস পূর্ব্বে কনক যে দোষ করিয়াছিল, এবার তাহা হইতে সহস্র গুণে গুরুতর দোষে দোষী। এবং ইহার মধ্যে আরো কত দোষ করিয়াছে কে জানে। দুইবার ধরা

পড়িল মাত্র। ধরা না পড়িলে কনক তো তাহার দোষ লুকাইয়া রাখিত! সুশীলা কনককে অসচ্চরিত্র বলিয়া জ্ঞান করিলেন। সুশীলা ভাবিলেন "কনক চোর, কনক মিথ্যাবাদী, কনকের গুরুভক্তি নাই, কনকের ঈশ্বরে ভক্তি নাই, কনক ঘোর পামর, ঈশ্বরে ভক্তির অভাবই কনকের যত দোষের মূল। ঈশ্বরে মন থাকিলে কখনই কনক অন্যায় কার্য্য করিতে পারিত না।" তাহার স্বভাব কি করিয়া ভাল করিবেন সেই বিষয়ে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। কনকের মূর্ত্তি পর্য্যন্ত এখন তাঁহার চক্ষে কুটিল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাহার নম্র বিষাদময় মূর্ত্তি তিনি চক্রান্ত-ভাব-পূর্ণ দেখিলেন। কনকের আন্তরিক ভাব তাহার মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায় না---ইহাতে তাহাকে আরো গভীরতর মন্দ লোক বলিয়া স্থির করিলেন। তিনি বুঝিলেন, কনকের মাতা কনকের গুণেই তাহাকে ভাল বাসিতেন না। তাঁহার কিছুমাত্র দোষ নাই। কনককে মায়া করা সুশীলার অন্যায় হইয়াছিল। কনক 'মিট মিটে ডাইন।'

কনকের দোষের নিমিত্ত তাহাকে কি শাস্তি দিবেন তাহা স্থির করিতেও সুশীলার মুস্কিল লাগিল। অবশেষে এই আজ্ঞা করিলেন, ক্রমাগত বার দিন ধরিয়া, একাকী একটি গৃহে তাহার পাপের মার্জ্জনা চাহিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে। বার দিন সে কাহারো সহিত কথা কহিতে পারিবে না, আহারের সময় দাস দাসীরা সেই গৃহে আহার দিয়া আসিবে, রাত্রেও তাহার গৃহে আলো জ্বলিবে না। এই নিয়মে কনক সেই দিন হইতে বার দিনের জন্য কারারুদ্ধ হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ—এই সে।

এ দিকে নালিসের বিচারের দিন উপস্থিত হইল। প্রমোদ ও যামিনীনাথ অন্য দুই একজন বন্ধুর সহিত আলিপুরের বিচারালয়ে যাত্রা করিলেন। আলিপুরে একজন বাঙ্গালী ডিপুটী মেজিষ্ট্রেটের নিকট বিচার হইবে। বিচার আরম্ভ হইল, আসামী ফরিয়াদী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। উভয়ের পক্ষের লোকে উভয়ের পক্ষে যাহা বলিবার বলিতে লাগিল।

কিন্তু প্রমোদ এখন স্থিরচক্ষু, চিন্তামগ্ন, প্রমোদের কানে সে সকল কথা তখন কিছুই প্রবেশ করিতেছিল না, প্রমোদ বড় অন্যমনস্ক। প্রমোদ বদ্ধদৃষ্টি হইয়া বিচারকের পানেই চাহিয়াছিলেন, যেন বিচারককে তিনি আগে কোথায় দেখিয়াছেন, যেন সে মুখ তাঁহার পরিচিত অথচ তাহাকে চিনিতে পারিতেছেন না। তিনি তখন পার্শ্বস্থ যামিনীনাথকে বিচারকের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন তাহার নাম হিরণকুমার। অমনি সহসা তিনি বিচারককে চিনিতে পারিলেন, চিনিলেন বিচারক তাঁহার সেই পূর্ব্বপরিচিত হিরণকুমার। সেই ছেলেবেলা যাহার কাছে প্রমোদ অপমানিত হইয়াছিলেন, যে ঘটনাটি তখন তাঁহার শিরায় শিরায় বিঁধিয়াছিল, প্রমোদ

ছেলেবেলা আর কখনো ওরূপ স্থলে কাঁদেন নাই, যে হিরণকুমার তাঁহাকে কাঁদাইয়াছিল—এই সেই হিরণকুমার। প্রমোদ সেই দিন কারসেই বাল্য ঘটনাটি মনের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, চিন্তাস্রোতে তখন তাঁহার হৃদয় তরঙ্গিত হইতে লাগিল, তাঁহার কর্ণে তখন কেমন করিয়া অন্য কথা প্রবেশ করিবে; প্রমোদ কিছু সেরূপ হিংসা-স্বভাবাপন্ন নহেন, সেই ঘটনাটি মনে রাখিয়া যে প্রমোদ হিরণের প্রতি চিরশত্রুতা পণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু প্রমোদ সেই প্রথম বার হিরণকে দেখিয়ামাত্র কেমন তাহাকে আর দেখিতে পারিতেন না। এক একজনকে প্রথম দেখিবামাত্র যেমন অকারণে ঘৃণা জন্মে, প্রমোদেরও হিরণের প্রতি সেই দিনকার সেই ক্ষুদ্র ঘটনাটি হইতে তাহাই হইয়াছিল। বিচারপতিকে চিনিতে পারিয়াই কেমন প্রমোদ কিছু দমিয়া গেলেন, তাঁহার সেই পূর্ব্বের স্ফূর্ত্তিভাব তেমন আর রহিল না। কে জানে কেন তাঁহার নিশ্চয় মনে হইল তিনি মকদ্দামায় হারিবেন, তাহার কোন দোষ সপ্রমাণ না হইলেও হিরণ তাহাকে হারাইয়া দিবেন। বাস্তবিক বিচারে যামিনীর সহিত প্রমোদেরও দোষ সপ্রমাণ হইল। হিরণকুমার যামিনীর একশত এবং প্রমোদের ৫০ টাকা দণ্ড দিবার আদেশ করিলেন। এদিকে প্রমোদ তাঁহার যে দোষ সপ্রমাণ হইবে তাহাই মনে করেন নাই, তবে নিতান্তই যদি হয় তাহা হইলেও ১০।১৫ টাকার অধিক যে দণ্ড লাগিবে ইহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, সুতরাং তাঁহার নিকট এখন ২০ টাকার একখানি নোট ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এখন একেবারে ৫০ টাকা শুনিয়া তিনি যেমন বিপদে পড়িলেন তেমনি হিরণের নিতান্ত অবিচার-জ্ঞানে মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধও হইলেন। তিনি ভাবিলেন হিরণ কুমার তাঁহাকে চিনিয়াই এইরূপ অবিচার করিলেন। কিন্তু বাস্তবিক হিরণ তাঁহাকে চিনিতেও পারেন নাই। যখন হিরণ তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন তখন প্রমোদ দশম বর্ষীয় বালকমাত্র, এখন এই যৌবনাবস্থায় তাঁহাকে চেনা দুষ্কর, এখন প্রমোদ তাহা হইতে কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন। যাহা হউক তখনি তো দণ্ডের টাকা দিতেই হইবে, নহিলে তো আর উপায় নাই, অগত্যা তাহা যামিনীর নিকট ধার করিয়া প্রমোদের দিতে হইল। কিন্তু তাহাতে প্রমোদ অত্যন্ত অপমানিত মনে করিলেন, মনে মনে হিরণের প্রতি বদ্ধমূল ঘৃণা জন্মিল। ক্রুদ্ধ অপমানিত চিত্তে মনে মনে হিরণকুমারের শ্রাদ্ধ করিতে করিতে প্রমোদ যামিনীর সহিত যামিনীর বাটী আসিলেন, সেখানে অনেক ক্ষণ বসিয়া, তাহার নিকট হিরণের প্রতি অনেক ক্রোধ মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিবার পর সে ক্রোধ যেন কিছু নিবৃত্তি হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ—নূতন সন্দেহ।

সেখান হইতে অপরাহ্ণে প্রমোদ পদব্রজে আপন বাসস্থানাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সচরাচর ধনাঢ্য-সন্তানেরা

পদব্রজে চলিতে যেরূপ অপমান মনে করেন, প্রমোদ তাহা করিতেন না। রৌদ্র বৃষ্টিবশতঃ বিশেষ প্রয়োজন না হইলে, সকালে বিকালে কোথাও যাইতে হইলে প্রমোদ সচরাচর প্রায়ই পদব্রজে গমন করিতেন, হাঁটিয়া যাইতে তাঁহার বিশেষ আমোদ বোধ হইত। এবিষয়ে তিনি কলিকাতার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করেন নাই।

এতক্ষণে যদিও হিরণের অবিচার-জনিত প্রমোদের ক্রোধ অনেক কমিয়া আসিয়াছিল তথাপি এখনো প্রমোদের সদা স্ফূর্ত্তিময় মুখ কিছু ম্লান, কিছু চিন্তাযুক্ত। বিচারের ফলাফল জানিতে সমস্ত দিন ঔৎসুক্যে থাকা প্রযুক্ত শেষে পরাজিত হইয়া এখন যেন প্রমোদ কিছু অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, মূর্ত্তি যেন জড়তাময়, বিচারের কথা প্রমোদের মন হইতে এখনো অন্তর্হিত হয় নাই। প্রমোদ একাকী একমনে কত কি ভাবিতে ভাবিতে চলিতেছিলেন। অন্যান্য সকল ভাবনার মধ্যে মধ্যে এক একবার সেই বন—বনমালা-মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে চমকিয়া যাইতেছিল, প্রত্যেক চিন্তার সঙ্গেই সে মূর্ত্তি কোন না কোন প্রকারে যেন বিজড়িত। ভাবিতে ভাবিতে সন্ন্যাসীর সহিত সেই দিনকার রাত্রের কথোপকথনই তাঁহার অধিক মনে পড়িতে লাগিল। কি অন্যায় দোষেই সন্ন্যাসী তাঁহাকে দোষী করিতেছেন, কি করিয়া তিনি তাহার সে সন্দেহ হইতে মুক্ত হইবেন, নীরজার পিতার চক্ষে দোষী হইতে প্রমোদের অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে একবার মনে হইল "সন্ন্যাসী বলিলেন আমার নামে মকদ্দমা আনিবেন, যদি সত্যই আনেন আর যদি হিরণকুমারের নিকট তাহার বিচার হয়। কি সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে নিশ্চয়ই হিরণ আমাকে বিনা দোষে দোষী করিবে।" আবার ভাবিলেন, "কিন্তু এ ভয় বৃথা, মকদ্দমা হইলেও আলিপুরে ইহা কেন হইবে।" এইরূপ কত কি এদিক ওদিক ভাবিতে ভাবিতে প্রমোদ চৌরঙ্গির রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। দেখিলেন শ্যামল-দুর্ব্বাদল-পূর্ণ মাঠে সুন্দর সুন্দর বালক বালিকারা খেলিতেছে, অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্য একেবারে পশ্চিম প্রান্তে ঢলিয়া পড়িয়াছে। প্রমোদ একবার সেই বালক বালিকাদের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, একবার সেই অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। প্রমোদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কত কথাই ইহা হইতে মনে চলিয়া গেল, কত ভাবনাই উদয় হইতে লাগিল। আবার তিনি যখন আর একবার সেই মাঠপানে চাহিলেন, দেখিলেন অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের হেমাভ রশ্মি সেই শ্যামক্ষেত্র প্রান্তরে জ্বলিতেছে, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা-চূড়ায় জ্বলিতেছে, সেই মাঠ—প্রান্তগামী একজন স্বশ্রুজটাধারী ব্যক্তির মুখে পড়িয়াছে। প্রমোদ তাহাকে দেখিয়া নীরজার পিতা বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তাহাকে দেখিয়া প্রমোদের মুখ যেন কিছু হর্ষোৎফুল্ল হইল। তিনি সন্ন্যাসীর নিকট সেই মাঠে আসিলেন। হঠাৎ প্রমোদকে দেখিয়া সন্ন্যাসীও কিছু আশ্চর্য্য হইলেন। কিন্তু প্রমোদ বলিলেন "মহাশয়, আপনার সহিত একটু বিশেষ কথা আছে, একটু দূরে চলুন।" নীরজার সম্বন্ধে কিছু হইতে পারে ভাবিয়া সন্ন্যাসী তাঁহার সহিত মাঠের একটি নির্জ্জন প্রান্তে আসিলেন। তখন প্রমোদ বলিলেন "মহাশয়, আপনাকে আমি খুজিতেছিলাম। দেখা পাইয়া যে আমি কত সুখী হইলাম কি বলিব!" সন্ন্যাসী অধীর গম্ভীর ভাবে বলিলেন "আমার সহিত তোমার আবার কি কথা আছে? নীরজাকে আমায় দিতে কি তবে মনস্থ করিয়াছ।"

প্র। "আপনি আর ঐ অবিশ্বাসের কথা বলিয়া আমাকে কষ্ট দিবেন না। আপনি জানেন না যে আমাকে দোষী ভাবিয়া আমার মনে কি কষ্ট দিতেছেন। কিন্তু আজ আমি সেই কষ্টের শান্তি করিব, নীরজার বিষয়ে আমি যাহা জানিয়াছি তাহা আপনাকে বলিব, তাহা আপনি শুনিলে আমাকে নিশ্চয়ই নির্দ্দোষী বিশ্বাস করিবেন।" সন্ন্যাসী উৎসুক ভাবে তাহা কি জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রমোদ বলিলেন "সেদিন হঠাৎ আমি জানিয়াছি নীরজা কোথা। এবার আপনি আপনার কন্যা পাইবেন।" সন্ন্যাসী উৎসুক ভাবে বলিলেন "কোথা আছে।" প্রমোদ তখন নীরজার রক্ষার বিষয় সংক্ষেপে বলিয়া যামিনীর নাম ধাম বলিয়া বলিলেন "আমি শুনিলাম নীরজার বিষয়ে যামিনীনাথ আপনাকে অনেক বার পত্র লিখিয়াছেন। আপনি তাহা না পাওয়াতেই দেখিতেছি যত গোল ঘটিয়াছে। যামিনীনাথের কাছে গেলেই আপনি সে সকল বৃত্তান্ত সমুদয় বিশেষরূপে শুনিতে পাইবেন।"

সন্ন্যাসী বিস্ময় সহকারে বলিলেন "যামিনীনাথ! যে ব্যক্তি তোমার সহিত আমাদের অরণ্যে গিয়াছিল, যাহাকে তোমার সঙ্গে নীরজা একরাত্রি আশ্রয় দিয়াছিল, তাহার নামই না যামিনীনাথ! সে বলিতেছে নীরজাকে রক্ষা করিয়াছে? রক্ষা করিলে কি সে তাহাকে তাহার পিতাকে তখনি ফিরাইয়া দিত না? সংবাদ পর্য্যন্ত কি দিত না?

প্রমোদ বলিলেন 'মহাশয় তাঁহাকে সন্দেহ করিবেন না, তিনি আপনাকে সংবাদ দিতে ত্রুটি করেন নাই, আপনি পান নাই।'

সন্ন্যাসী প্রমোদের কথায় কোন উত্তর করিলেন না। যামিনীনাথের পরিচয় শুনিয়া তিনি চিন্তামগ্ন হইয়াছিলেন। অনেক পরে প্রমোদের কথার উত্তর স্বরূপ বলিলেন "সংবাদ দিলে আমি পাইতাম না ইহা অসম্ভব।"

প্র। 'না মহাশয়, আপনি আবার আর একজনকে অন্যায় দোষে দোষী করিতেছেন। যামিনীনাথই নীরজার উদ্ধারকর্ত্তা।' সন্ন্যাসী সে কথা না শুনিয়া আপন মনে প্রমোদকে বলিলেন "নীরজা কোথা, এত দিন তুমি তাহা জানিতে না?"

প্রমোদ বলিলেন 'না"

স। "অথচ যামিনী তোমার পরম বন্ধু?' "প্রমোদ একটু বিপদে পড়িয়া বলিলেন "মহাশয়, বন্ধু বটে, কিন্তু আমার সহিত তাঁর"—সন্ন্যাসী—প্রমোদের কথা ফুরাইতে না দিয়া বলিলেন "তোমার ও কথায় আর কিছুই বলিবার আবশ্যক নাই।

যামিনীর বাড়ী আমি এখনি চলিলাম। তাহার ও নীরজার কথা না শুনিয়া আমি নিশ্চয় একটা স্থির বুঝিতে এখন অক্ষম” বলিয়া সন্ন্যাসী যামিনীনাথের বাড়ী যাত্রা করিলেন। সন্ন্যাসী ভবানীপুরে একজন আত্মীয় ব্যক্তির সহিত নীরজার সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু নীরজার সন্ধান পাইয়া, আর সেখানে না গিয়া, যামিনীনাথের বাড়ীই যাত্রা করিলেন।

সামুদ্রানুমিতি বিদ্যা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

“প্রায়ঃ শারীরকান্তুবর্ত্তিনোহি
গুণাশ্চ দোষাশ্চ ভবন্তি।”

সামুদ্র বিদ্যার মত এই যে, মনুষ্যের গুণ দোষ সকল প্রায় শরীরের গঠন-ভঙ্গীর অনুরূপই হইয়া থাকে অতএব গঠন-ভঙ্গী দেখিয়া মনুষ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী অপ্রত্যক্ষ চরিত্র সকল অনুমান দ্বারা নিশ্চয় করা যাইতে পারে। পরন্তু তাহা সহজ-সাধ্য নহে, কিছু নৈপুণ্য অপেক্ষা করে। বাল্য কালে আমরা যত “গোরা” দেখিতাম, জ্ঞান হইত সব গোরা এক রকম, কিন্তু এখন দেখি, বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। অতএব, জ্ঞানের উন্নতি ও বহু পরিচয় ব্যতীত ব্যক্তিপুঞ্জের অঙ্গ-বৈলক্ষণ্য বা গঠন-ভঙ্গীর তারতম্য বিষয়ে উত্তমরূপ শিক্ষা লাভ করা যায় না; সুতরাং সামুদ্র বিদ্যায়ও পারদর্শী হওয়া যায় না।

ভাদ্র মাস ২ভাগ ৫সংখ্যক ভারতীতে এতৎ বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহা স্মরণ করুন, দেখিতে পাইবেন, তাহাতে মাত্র প্রকৃতি-অনুমানের বিষয় লিখিত হইয়াছিল। বাহ্য আকার প্রকার ও প্রবৃত্তি দর্শনে যেমন মানবকুলের প্রকৃতি নির্ণয় হইতে পারে, সেইরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন-প্রণালী অনুসারে স্বভাব চরিত্রাদিও অনুমিত হইতে পারে। এ প্রস্তাবে তাহাই প্রদর্শিত হইবে।

অঙ্গের মধ্যে প্রধান অঙ্গ মস্তক; এই নিমিত্ত ইহাকে উত্তমাঙ্গ বলিয়া থাকে। সামুদ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই উত্তমাঙ্গ মাত্র দেখিয়াই সে কি চরিত্রের লোক, তাহা বলিয়া দিতে পারেন। তাঁহাদের মত এই যে, চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে মুখের গঠন সমাপ্ত হয়, ও ভঙ্গী-বিশেষ নিষ্পন্ন হয় সুতরাং সেই জন্যই মুখ দেখিয়া, যে যে চরিত্রের লোক তাহা জানা যায় ও বলিতে পারা যায়।

মুখের প্রথম দৃশ্য ললাট। ললাটের গঠন সম্বন্ধে সামুদ্রজ্ঞদিগের এইরূপ উক্তি আছে। যথা—

“নিম্নললাটা বধবন্ধভাগিনঃ ক্রূরকর্ম্ম নিরতাশ্চ।

অভ্যুন্নতৈশ্চ ভূপাঃ কৃপণাঃ স্যুঃ সঙ্কটললাটাঃ।’

ললাটের গঠন সকলকার সমান নহে। ব্যক্তি মাত্রেরই ভিন্ন ভিন্ন আকারের ললাট হইলেও ললাটের গঠন সম্বন্ধে স্থূলতঃ ছয় শ্রেণী করা সামুদ্র বিদ্যার অভিপ্রেত। “নিম্নললাট” “অভ্যুন্নতললাট” “সঙ্কটললাট’ ‘বিষমললাট’ “অর্দ্ধেন্দুললাট” ‘শুক্তিবিশাল।’ এতদ্ভিন্ন “বিশাল’ “অর্দ্ধেন্দুবিশাল’ “শিরাসন্তত” “উন্নতশিরাসন্তত’ স্বস্তিকসংস্থ শিরাসন্তত’ প্রভৃতি অনেক প্রকার অবান্তর প্রভেদ আছে, কিন্তু সে সমস্ত সহজে পরিচিত হইবার নহে। এক্ষণে উল্লিখিত কএক প্রকার বিস্পষ্ট-বোধ্য ললাটের বিষয় বিবৃত করা যাইতেছে।

নিম্নললাট—যাহাদের ললাট নিম্ন, তাহারা বধবন্ধনভাগী। যেহেতু তাহাদের মতিগতি ক্রূর কর্ম্মে রত। তাৎপর্য্য এই যে নিম্নললাট শ্রেণীর লোকের প্রবৃত্তি প্রায়শঃই কু দিকে যায়, সুতরাং হয় বধ না হয় বন্ধন ঘটনা হয়। “গ্রীবা চ হ্রস্বস্তথা ললাটঃ’ হ্রস্ব বা নিম্নললাটের সঙ্গে যদি ঘাড় খাঁট হয়, তাহা হইলেত কথাই নাই। দুইটীই দুষ্টামির লক্ষণ।

“কোতা গরদান তাংপিছানি
মোনেজি বজ্জাত্ কি নিশানী।”

অভ্যুন্নত—‘অভ্যুন্নতাশ্চ ভূপাঃ’ যাহাদের ললাট সম্মুখ ভাগে উচ্চ বিশাল তাহারা রাজা। রাজা হউক বা না হউক, তাহাদের অন্তঃকরণটা রাজার ন্যায় বটে। তাৎপর্য্য এই যে, অভ্যুন্নতললাট ব্যক্তিদের অন্তঃকরণ প্রায় মহত্ত্ব গুণে পরিপূরিত থাকে।

সঙ্কট—“কৃপণাঃ স্যুঃ সঙ্কটললাটাঃ।’ “সঙ্কট শব্দের অর্থ এস্থলে সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ ছোট, কিংবা বন্ধুর ভূমির ন্যায় উচ্চ নীচ দোষাক্রান্ত। এই সঙ্কটললাট মনুষ্যেরা প্রায় কৃপণ হয়। কেবল টাকার কৃপণ নহে, জ্ঞান, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, উদারতা, সকল বিষয়েই কৃপণ। তাৎপর্য্য এই যে সঙ্কটললাট ব্যক্তিদের আশয় অতি ক্ষুদ্র।

বিষম—“বিষমললাটা বিধনাঃ’। “বিষম’ শব্দের অর্থ এস্থলে অসম অর্থাৎ বাঁকা অথবা একদেশে গোছের উচ্চ নীচ। যাহাদের ললাটদেশটী বিষম তাহারা ধনবর্জ্জিত। বিশালতা থাকিলেও বৈষম্যদোষে তাহারা ধনবর্জ্জিত হইবে; অর্থাৎ ধন যে কি কৌশলে উপার্জ্জিত হয় তাহা তাহারা বোধগম্য করিতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, বিষমললাট মনুষ্যের বুদ্ধি ধনাগমের দিকে খেলে না।

অর্দ্ধেন্দু—“ধনবন্তোঽর্দ্ধেন্দুসদৃশেন’ যাহাদের ললাটের গঠন অর্দ্ধচন্দ্রবৎ বৃত্তচ্ছেদবিশিষ্ট, তাহারা ধনবন্ত। নিশ্চয় তাহাদের ধন আছে। কি সে ধন হয় তাহা এই শ্রেণীর লোকেরাই বুঝে। তাৎপর্য্য এই যে, অর্দ্ধেন্দুললাট মনুষ্যের বুদ্ধি ধনাগম পক্ষে বড় চতুর।

শুক্তিবিশাল—“শুক্তিবিশালৈরাচার্য্যতা’ শুক্তি অর্থাৎ ঝিনুকের মধ্যভাগটা যেমন উন্নত ও দুই পার্শ ক্রমনিম্ন, এতদাকারের

ললাটবিশিষ্ট গুরুষেরা প্রায়ই আচার্য্য অর্থাৎ বিদ্বান্, বাগ্মী, প্রতিভাশালী ও মেধাবী হন। তাৎপর্য্য এই যে, যাহাদের ললাটের গঠন শুক্তিসাদৃশ্যে উন্নত অথবা বিস্তীর্ণ তাঁহারা ধনী না হইতেও পারেন, কিন্তু তাঁহাদের পণ্ডিত্য-সম্ভাব পক্ষে কোন সংশয় নাই।

বিশাল—"বিশালাশ্চ বুদ্ধিমন্তঃ।' ঔন্নত্যবর্জ্জিত বিস্তীর্ণতাযুক্ত ললাট হইলে তাহার বুদ্ধিযোগ থাকে মাত্র, আচার্য্য হইবার ক্ষমতা থাকে না।

শিরাসন্তত—"শিরাসন্ততৈরধর্ম্মরতাঃ।" যাহাদের ললাট শিরাজড়িত, তাহারা অধর্ম্মরুচি লোক। তাৎপর্য্য এই যে, শিরাব্যাপ্ত ললাটীদিগের প্রবৃত্তি অধর্ম্মের দিকেই ধাবিত হয় এবং অধর্ম্ম করিতেই তাহারা ভাল বাসে।

উন্নতশিরা—'উন্নতশিরাভিরাঢ্যা স্বস্তিকসংস্থিতিশ্চ' ললাটের শিরাজাল যদি উন্নত ও স্বস্তিকতুল্য আকারের প্রতান বিশিষ্ট হয় তবে তাঁহারা আঢ্য অর্থাৎ ধনী। তাঁহাদের হৃদয়-ভাণ্ডার কোন না কোন প্রকার ধনে পূর্ণ আছে। (স্বস্তিক—বিবাহাদি মঙ্গল কার্য্যে ব্যবহার হইয়া থাকে)

ভ্রূ।

ললাটের পর ভ্রূদেশের গঠন-প্রণালী দেখিতে হইবেক। ভ্রূস্থানের গঠন-প্রণালী বহু আকারের হইলেও সামুদ্র বিদ্যা সংক্ষেপতঃ ইহাকে সাত শ্রেণী করিয়া তদ্দ্বারা বিশেষ বিশেষ ফলের অনুমান করিয়া থাকেন।

অভ্যুন্নত ভ্রূ, বিশালোন্নত ভ্রূ, বিষম ভ্রূ বালেন্দুনত ভ্রূ, দীর্ঘাসংসক্ত ভ্রূ, খণ্ডিত ভ্রূ, ও মধ্যবিনত ভ্রূ। এই কএকটী শ্রেণীকল্পনা ভ্রূরোমের রচনা-পরিপাটী অনুসারেই হইয়াছে; পরন্তু ভ্রূপ্রদেশটীর গঠনগুলি "পশ্বাদিতশ্চ বোদ্ধব্যাঃ' সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশুদিগের ভ্রূস্থান দেখিয়া তদনুযায়ী কতিপয় শ্রেণী কল্পনা করিবেক এবং তদ্দ্বারা সত্ত্ব ও উৎসাহাদি গুণের অনুমান করিবেক। পরন্তু সামুদ্র শাস্ত্রে সত্ত্ব ও উৎসাহাদি গুণের অনুমান সম্বন্ধে অন্য প্রণালী অবলম্বিত আছে বলিয়া এই অংশে "পশ্বাদিতশ্চ বোদ্ধব্যাঃ' ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ উক্তি নাই; সুতরাং কেবল মাত্র ভ্রূরোমের রচনা-পরিপাটী দেখিয়া যাহা যাহা অনুমিত হয় এস্থলে কেবল তাহাই ব্যক্ত করা যাইবেক।

অভ্যুন্নত—"অভ্যুন্নতাভিরল্পায়ুষঃ" যাহাদের ভ্রূদেশ অভ্যুন্নত, ঠিক্ সম্মুখ ভাগটা উচ্চ, তাহারা অল্পায়ুঃ। তাৎপর্য্য এই যে, তাদৃশ ব্যক্তিরা অদীর্ঘজীবী সুতরাং বুদ্ধি বিদ্যা অনুমান করা অনাবশ্যক।

বিশালোন্নত—"বিশালোন্নতাভিরতিসুখিনঃ।" যাহাদের ভ্রূদেশ বিশাল অথচ উন্নত, তাহারা অত্যন্ত সুখী হয়। সুখের বাহ্য উপকরণ থাকুক, বা না থাকুক, তাহাদের মন সুখসাগরে নিমগ্ন থাকে।

বিষম—"বিষমভ্রুবোদরিদ্রাঃ।" যাহাদের ভ্রূ বিষম অর্থাৎ অসমান (অসমান নানারূপ হইতে পারে পরন্তু কি প্রকারের অসমান তাহা জানি না) তাহারা দরিদ্র। ধন থাকিলেও দরিদ্র। অর্থাৎ তাহাদের ধনতৃষ্ণা অতি প্রবল।

বালেন্দুনত—"বালেন্দুনতভ্রুবঃ সধনাঃ।" যাহাদের ভ্রূযুগল বালেন্দুতুল্য নত (বাঁকা), নিশ্চয় তাহাদের ধন আছে। উপার্জ্জনবর্জ্জিত হইলেও অন্ততঃ পৈতৃক ধন আছে।

দীর্ঘাসংসক্ত—'দীর্ঘাঽসংসক্তাভির্ধনিনঃ।" দীর্ঘ অথচ অসংসক্ত (যোগ না থাকা) ভ্রূতে ধনসত্তা অনুমিত হইয়া থাকে।

খণ্ড—'খণ্ডাভিরর্থপরিহীনাঃ।' খণ্ড ভ্রূ ব্যক্তি অর্থহীন হয়। অর্থ শব্দে কেবলমাত্র ধন নহে। খণ্ডভ্রূ ব্যক্তিরা প্রয়োজন সিদ্ধি ও ইচ্ছাপূর্ত্তি করিতেও অসমর্থ।

মধ্যবিনত—"মধ্যবিনতভ্রুবো যে তে সক্তাঃ স্ত্রীষ্বগম্যাসু।" যাহাদের ভ্রূদেশ মধ্যবিনত অর্থাৎ মাঝখানটা বাঁকা, তাহারা এত কামুক যে তাহারা অগমনীয় স্ত্রীতেও গমন করিতে প্রস্তুত থাকে।

শঙ্খ।

অতঃপর শঙ্খস্থান অর্থাৎ ভ্রূ ও কর্ণের মধ্যভাগটী (রগ) পরীক্ষা করিবেক। ইহার অধিক প্রভেদ নাই; উন্নতবিপুল ও নিম্ন এই দুই প্রকার মাত্র। 'উন্নতবিপুলৈঃ শঙ্খৈঃ ধন্যাঃ' যাহাদের শঙ্খপ্রদেশ উন্নত ও বিপুল তাঁহারা ধন্য। 'ধন্য' এই কথাটী সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, অতএব বুঝিতে হইবে যে যাঁহাদের শঙ্খস্থান (রগ দুইটী) পরিপূর্ণ, তাঁহারা ধনী হইতে পারেন, মানী হইতে পারেন, জ্ঞানী অথবা সুখীও হইতে পারেন। আর যাঁহাদের শঙ্খপ্রদেশ নিম্ন (রগ খালা), তাঁহারা 'নিম্নৈঃ সুভার্থসন্ত্যক্তাঃ। পুত্র ও অর্থহীন ইহাতে সংশয় নাই। অপুত্রক না হইলেও অপুত্রকের দুঃখভাগী, ধন থাকিলেও নির্ধনের দুঃখভাগী হন।

এতৎ পরে চক্ষুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবেক। কেন না চক্ষুর গঠন ও দৃষ্টি অর্থাৎ চাউনির ভঙ্গী অনুসারে অনেক প্রকার বিশেষ বিশেষ অন্তর্গত ভাব অনুমিত হইয়া থাকে।

শ্রী কালীবর বেদান্তবাগীশ।

নর্ম্ম্যান্ জাতি ও আঙ্গ্লো-নর্ম্ম্যান্ সাহিত্য।

টিউটনিক জাতিরা রোমান রাজ্য অধিকার করুক্ কিন্তু রোমান্ জাতিদিগের সহিত না মিশিয়া থাকিতে পারে নাই। বিজিত জাতিদিগের সহিত তাহাদের আচার ব্যবহার ভাষা ধর্ম্ম সমস্ত মিশিয়া গিয়াছিল। তাহারা রোমান্ রাজ্য শাসন করিত, কিন্তু রোমান্ শাসন-প্রণালী অনুসারে শাসন করিত। রোমান্ রাজ্যে তাহাদের আধিপত্য বিস্তার

হইয়াছিল কিন্তু রোমান স্বভাব রোমান প্রথা তাহাদের জাতীয় স্বভাব, জাতীয় প্রথার উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছিল। সেই টিউটনিক জাতি কেবল ইংলণ্ডে আপনাদের জাতিত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। যে কেল্টিক জাতিকে তাহারা প্রায় ধ্বংশ করিয়াছিল, তাহারা টিউটন অর্থাৎ স্যাক্সন জাতিদিগের অপেক্ষা সভ্য ছিল সন্দেহ নাই, সভ্য রোমানদের শাসনে থাকিয়া তাহারা ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

আবার দেখ, নর্ম্মানেরা যখন স্যাক্সন-অধিকৃত ইংলণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করিল, তখন তাহারা আর আপনাদের জাতিত্ব রক্ষা করিতে পারিল না—অল্প দিনেই স্যাক্সনদিগের সহিত মিশিয়া গেল, কিন্তু ইহার প্রচুর কারণ বিদ্যমান আছে। প্রথমতঃ যখন স্যাক্সনেরা ব্রিটন অধিকার করিতে আইসে, তখন তাহাদের অবস্থা পশুদের অপেক্ষা অল্পই উন্নত ছিল মাত্র, তখন তাহারা স্বার্থের জন্য নহে, রক্ত-পিপাসা-শান্তির জন্যই রক্তপাত করিত, ধ্বংস কার্য্যই তাহাদের দুর্দ্দমনীয় উদ্যমের ক্রীড়া ছিল। রোমানদিগের অন্তঃস্ফয়কর শাসন-ভারে দুর্ব্বল হতভাগ্য কেল্টজাতি যে তাহাদের ধ্বংস-প্রবৃত্তির সম্মুখে পড়িয়া বিনষ্ট হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য নাই। কিন্তু সভ্যতর নর্ম্মান জাতিরা যখন ব্রিটনে পদার্পণ করিল তখন অকারণে রক্তপাত করা তাহাদের ব্যবসায় ছিল না, তখন তাহারা খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে, ও অন্যায় কার্য্য করিতে হইলেও ন্যায়ের নামে করা তাহাদের প্রথা হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ স্যাক্সন জাতিরা অপনাদের অনুর্ব্বর দেশ পরিত্যাগ করিয়া বাস করিবার নিমিত্ত দলে দলে ব্রিটনে ঝাঁকিয়া পড়িল, কেল্টদিগের উপর আধিপত্য করা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, দেশের অধিবাসী হওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, এরূপ অবস্থায় দেশের প্রাচীন অধিবাসীদিগকে বিনষ্ট করিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করাই তাহাদের স্বার্থ ছিল। কিন্তু নর্ম্মানেরা ব্রিটন শাসন করিতে আসিয়াছিল, ব্রিটনের অধিবাসী হওয়া তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, ব্রিটনের অধিপতি হওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তৃতীয়তঃ কেল্টদিগের সহিত স্যাক্সনদিগের ধর্ম্ম আচার ব্যবহার নীতি স্বভাব কোন বিষয়েই ঐক্য ছিল না, কিন্তু স্যাক্সন ও নর্ম্মানদের মধ্যে অনেক ঐক্যস্থল ছিল। ভারতবর্ষ শাসন করিবার জন্য ও এখানে বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত যে সকল অল্প সংখ্যক ইংরাজ বাস করে তাহারা নিয়মিত সময় উত্তীর্ণ হইলেই আবার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে, আবার নূতন দল এদেশে আগমন করে, কিন্তু এরূপ না হইয়া যদি অল্প সংখ্যক শাসয়িতৃদল এদেশে চিরকাল বাস করিত, তাহা হইলে সেই ক্ষুদ্র দল বিশেষ প্রতিবন্ধক না পাইলে খুব সম্ভবতঃ ভারতবর্ষীয়দের সহিত মিশিয়া যাইত। নর্ম্মানদের সেই অবস্থা হইয়াছিল, নর্ম্ম্যাণ্ডি হইতে এক দল নর্ম্ম্যান ব্রিটশদিগকে অধীনে রাখিবার নিমিত্ত ব্রিটনে গিয়াছিল, কিন্তু তাহারা আর স্বদেশে ফিরিল না। ব্রিটন

বিজেতা যখন স্বয়ং ব্রিটনে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন তখন জেতা ও জিতদিগের মধ্যে মিলন না হওয়াই আশ্চর্য্য। হিন্দু-জাতি যদি নিতান্ত সাতন্ত্র-প্রিয় না হইত, তাহা হইলে মুসলমান বিজেতাদিগের সহিত হয়ত মিলিয়া যাইত।

দূর পর্য্যন্ত দেখিতে গেলে যে জাতিই ইংলণ্ড জয় করিয়াছে সকলেই টিউটনিক বংশভূত। স্যাক্সন, ডেনিষ ও নর্ম্মান সকলেই এক জাতীয় লোক। টিউটনিক জাতিদিগের জাতিগত স্বভাব অনুসারে নর্ম্ম্যান অর্থাৎ Northmanগণ দলে দলে তাহাদের জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া দেশে দেশে দস্যুতা করিয়া ফিরিত। এই মহা দুর্দ্দান্ত সামুদ্রিক দস্যুগণের তরণী দূর হইতে দেখিলে সমস্ত য়ুরোপ কম্পিত হইত, ভূমধ্যস্থ সাগরে এই নর্ম্ম্যান দস্যুদের জাহাজ দেখিয়া মহাবীর ষার্লমেন এক দিন অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহারা অসাধারণ সামুদ্রিক ছিল, ইহাদের রক্তে Blake এবং Nilson সৃষ্ট হইয়াছিল, ইহাদেরি নিকট হইতে ইংরাজেরা স্থনাবিকতার বীজ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সত্য মিথ্যা জানি না, প্রবাদ আছে, ইহারা কলম্বসের বহুপূর্ব্বে আটলাণ্টিক পার হইয়াছে। পূর্ব্বকালে ফিনিসীয়গণ সামুদ্রিক ছিল কিন্তু তাহারা বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিত, অর্থ উপার্জ্জিত হইলে স্বদেশে ফিরিয়া যাইত, কিন্তু নর্ম্মানগণ আপনাদের কুজ্ঝটিকাময় অন্ধকার অনুর্ব্বর দেশ পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল, ধনধান্যশালী ইটালি ফ্রান্স ও ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে চির আশ্রয় গ্রহণ করে। আশ্চর্য্য এই যে যেখানেই গিয়াছে সেই খানেই তাহাদের জাতিত্ব লোপ পাইয়াছে, এখন আর নর্ম্ম্যান বলিয়া একটি জাতি নাই। যদিও নর্ম্ম্যান জাতি স্যাক্সনদের সঙ্গে মিশিয়া গেল তথাপি ইংরাজ-ইতিহাসে তাহারা ঘোরতর পরিবর্ত্তন বাধাইয়াছিল। নর্ম্মানেরা না মিশিলে ইংরাজেরা এ ইংরাজ হইত কি না সন্দেহস্থল। আমরা ফ্রান্সে নর্ম্মানদের উপনিবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ইংলণ্ড পর্য্যন্ত তাহাদের অনুগমন করিব।

ফ্রান্সে এখন ক্লোভিস্ (Clovis) বংশোদ্ভব রাজগণ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন, ও ষার্লমেন-বংশীয় রাজগণের রাজপ্রভাব জীর্ণ প্রায় হইয়াছে, এমন সময়ে উত্তর দেশীয় ক্ষুধিত পশুপাল ফ্রান্সের উর্ব্বর ক্ষেত্রে ঝাঁকিয়া পড়িল। প্যারিস তখন ফ্রান্সের রাজধানী ছিল না। নর্ম্ম্যানদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ফ্রান্সের দুর্ব্বল অধিপতি, Charles রবর্টকে (Roborts the Strong) এক বৃহৎ জায়গীর দিয়া সীমান্ত রাজ্যে অধিষ্ঠিত করেন। রবর্টের পুত্র ওডোর সময়ে প্যারিস্ সেই রাজ্যের প্রধান নগরী হয়। ফরাসীরাজ তখন হয়ত সন্দেহ মাত্র করেন নাই যে তিনি বহিঃশত্রু হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য গৃহের মধ্যে শত্রু পোষণ করিতেছেন। যখন ফ্রান্স-অধিপতির রাজকীয় উপাধি ভিন্ন অন্য বড় একটা কিছু অবশিষ্ট ছিল না তখন বলীয়ান্ প্যারিসের জায়গীরপতি

তাঁহার সিংহাসনের প্রতি এক একবার কটাক্ষপাত করিতেছিলেন, এমন সময়ে নর্ম্ম্যানগণ প্রকৃত প্রস্তাবে ফ্রান্সের রঙ্গ-ভূমিতে অবতীর্ণ হইল। তখন ফ্রান্সের বড় দুরবস্থা। বলিতে গেলে, তখন বর্ত্তমান ফ্রান্স গঠিত হয় নাই, তখন পুরাতন ফ্রান্স জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল। ফ্রান্স তখন খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল। ভিন্ন লোক তোমার শত্রু না হইতে পারে, কিন্তু আপনার লোক ভিন্ন হইয়া গেলে সে তোমার শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। ফ্রিমেন সাহেব অতি যথার্থ কথা বলিয়াছেন যে, ফ্রান্সের প্রতি বিভিন্ন খণ্ড যদি বিভিন্ন দেশ হইয়া যাইত, তাহাদের মধ্যে যদি কোন যোগ না থাকিত, তবে সে বিভাগে ভয়ের কারণ থাকিত না। প্রত্যেক ক্ষুদ্র অধিরাজ্য-স্বামীর ইচ্ছা তাঁহার সীমা বাড়াইয়া লন—বাহিরের শত্রু আক্রমণ করিলে জাতীয় ভাবে সকলে একত্রে মিলিত হইয়া তাহাকে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, সকলেই ভয় করিতে থাকে, পাছে তাহাদের মধ্যে আর কেহ শত্রুর সাহায্য লইয়া তাহার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, অতএব তাহা সহজেই মনে হইতে পারে যে, আগে হইতে আমিই যে কেন শত্রু-সাহায্যের সুবিধা ভোগ না করিয়া লই!"

তখন য়ুরোপের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। চারি দিক হইতে মুমূর্ষু অথবা মৃত রোমীয় প্রভাবের উপর শকুনি ও গৃধিনীদল ঝাঁকিয়া পড়িতেছিল। তখন দারুণ অরাজকতার কাল। সারাসীনগণ সার্ডিনিয়া ও সিসিলি অধিকার করিয়া গ্রীস্, ইটালি, ও নিকটবর্ত্তী দেশ সমূহে উপদ্রব করিতেছিল। দুর্দ্দান্ত স্ক্ল্যাভোনীয়গণ (Sclavonians) জর্ম্মনীর অধিকার হইতে বোহেমিয়া, পোল্যাণ্ড, এবং প্যানোনিয়া (আধুনিক অষ্ট্রিয়া) কাড়িয়া লইয়াছিল। তাতার জাতীয় দস্যুদল নিদারুণ উপপ্লবে সমস্ত ইটালী, জর্ম্মানী ও দক্ষিণ ফ্রান্স কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা এই উত্তর দেশীয় সামুদ্রিক দস্যুগণ এই নর্ম্মম্যান নরশোণিত-পিপাসুগণ প্রচণ্ড ছিল। উপর্য্যুপরি ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স তাহারা বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা যখন ইংলণ্ড আক্রমণ করিত, তখন ফ্রান্স বিশ্রাম করিত, যখন ফ্রান্স অক্রমণ করিত তখন ইংলণ্ড বিশ্রাম করিত। Charles the Baldর রাজত্বকালে ইহারা ফ্রান্সের অন্তঃপ্রদেশে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল। তখন চার্লস ও তাঁহার পরিবারের মধ্যে গৃহ-বিবাদ ঘটিয়া রক্তপাতে ফ্রান্স দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ক্ষুদ্র প্রাদেশিক রাজগণ অবাধ হইয়া উঠিয়াছিল।

নর্থম্যান্ দস্যুদল ফ্রান্সে এবং ইংলণ্ডে নূতন প্রকার যুদ্ধের প্রথা অবলম্বন করিয়াছিল। নদী বাহিয়া তাহারা যে দ্বীপ পাইত, সেই খানেই দুর্গ নির্ম্মাণ করিত। এই দুর্গ সকল তাহাদের লোপ্ত্র দ্রব্যের ভাণ্ডার ছিল, তৎসমুদায় তাহাদের রমণী ও শিশুদিগের নিবাস-ভূমি ছিল ও পরাজয়কালে আশ্রয়-স্থান ছিল। দুর্ব্বল ফ্রান্স-অধিপতি অস্ত্রের বলে তাহাদের বাধা দিতে অক্ষম ছিলেন, সুতরাং অর্থ দিয়া তাহাদের অত্যাচার

নিবারণ করিতে হইত, কিন্তু ইহাতে তাহাদের অর্থতৃষ্ণা বৃদ্ধি করা হইত মাত্র। অবশেষে Charles the Simple নর্ম্ম্যাণ্ডি দেশ দান করিয়া তাহাদের নিকট শান্তি ক্রয় করিলেন। তাহাতে হানি হইল না, নর্ম্ম্যাণ্ডি ফ্রান্স হইতে বিচ্ছিন্ন হইল না। নর্ম্ম্যানদের ভাষা ফরাসী হইল, নর্ম্মানদের আচার ব্যবহার ফরাসী হইল, নর্ম্মান জাতি ফরাসীস্ হইয়া দাঁড়াইল, নর্ম্ম্যানদিগের অধিপতি রলফ (Hrolf) নর্ম্ম্যাণ্ডির রাজা হইলেন।

ইহার এক শতাব্দী পরে নর্ম্ম্যাণ্ডির রাজা উইলিয়ম ইংলণ্ড আক্রমণ করিলেন। এক শতাব্দী পূর্ব্বে যে জাতি অকারণে ও অন্যায় রূপে ফ্রান্সে পদার্পণ করিয়াছিল আজ তাহারাই পররাষ্ট্র ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে চলিল। কিন্তু ইতিমধ্যে সেই ডেনিষ দস্যুদলের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অন্যায় কার্য্যের উপর একটা ন্যায়ের আবরণ না পরাইতে পারিলে তাহাদের লজ্জা বোধ হয়। ন্যায্য রূপে ইংলণ্ডের সিংহাসন তাঁহার প্রাপ্য বলিয়া উইলিয়ম ইংলণ্ডের দ্বারে গিয়া আঘাত দিলেন। ন্যায়কে বল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করাই যেন তাঁহার উদ্দেশ্য, এমনি একটা ভান করিলেন ইংলণ্ড-জয়ের কাহিনী আজ আর নূতন করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে না সকলেই তাহা জানেন।

শতাব্দী পূর্ব্বে নর্ম্ম্যানরা যখন ফ্রান্সে দস্যুতা করিত তখন লোকে তাহাদের দস্যু বলিত, শতাব্দী পরে যখন তাহারা ইংলণ্ডে দস্যুতা করিল, তখন লোকে তাহাদের বিজয়ী কহিল। কিন্তু এই এক শতাব্দীর মধ্যে নর্ম্ম্যান জাতির কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে আলোচনা করিয়া দেখ, দেখিবে, তাহারা সেই দুর্দ্দান্ত, বিপদ-অন্বেষী দস্যুই রহিয়াছে, কেবল ফরাসী কথা কহিতে ও ফরাসী জাতির আচার ব্যবহার অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে। যদিও তাহারা ফরাসীদের অন্তর্ভূত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি নর্ম্ম্যান জাতি বলিয়া তাহাদের একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল। সভ্য জাতির উপযোগী শিল্পে তাহাদের সুরুচি জন্মিয়াছে; নর্ম্ম্যান অধিকারের পর হইতে শিল্প-সমাগম-শূন্য ইংলণ্ডে শত শত সুশোভন গির্জ্জা ও প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল। এক শতাব্দীর মধ্যে এই অসভ্য দস্যুদিগের হৃদয়ে সৌন্দর্য্য-জ্ঞান উদ্বোধিত হইল। নর্ম্ম্যাণ্ডির সমাজে বিদ্যা যথোচিত সমাদর প্রাপ্ত হইল। ল্যান্ফ্রেঙ্কের (Lanfrenc) প্রতিষ্ঠিত বেকের বিদ্যালয় (School of Bec) তখনকার প্রধানতম বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে গণ্য হইল। বিজেতা উইলিয়মের পুত্র হেন্‌রির বিদ্বান বলিয়া খ্যাতি ছিল, তাঁহার উপাধি ছিল সুপণ্ডিত, (Beanclirk) অল্প দিনের মধ্যেই ইহাদের ফরাসী ভাষায় এমন ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল যে, এই হঠাৎ-সভ্য দস্যুরা ফরাসীদের মতই কবিতা ও গদ্য লিখিতে পারিত। কিন্তু তথাপি তাহাদের অন্তরে অন্তরে সেই টিউটানিক ভাব জাজ্বল্যমান ছিল। সভ্যতার মূল তাহাদের হৃদয়ে গাঢ় ভাবে নিহিত হইতে পারে নাই। তাহাদের নিষ্ঠুরতার কাহিনী যদি পাঠ কর

তবে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে। বিজিত ইংলণ্ডে তাহারা লোকদের পা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিত, ও সেই নিম্নশির ব্যক্তিদের ধূম সেবন করাইয়া যন্ত্রণা দিত। কখনো বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কখনো বা মুণ্ড বাঁধিয়া হতভাগ্যদের ঝুলাইয়া দিত, ও তাহাদের পায়ে জ্বলন্ত বস্ত্র বাঁধিয়া দেওয়া হইত। মাথায় দড়ি বাঁধিয়া যতক্ষণ না তাহা মস্তিষ্ক ভেদ করিত, ততক্ষণ আকর্ষণ করিত। ভেক ও সরীসৃপসঙ্কুল কারাগারে লোকদের কারাবদ্ধ করিত। ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ, অগভীর ও তীক্ষ্ণ-প্রস্তর-পূর্ণ সিন্দুকে জোর করিয়া মানুষ পূরিত, এবং এইরূপে তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চূর্ণ করিত। অনেক ব্যারণদিগের দুর্গে rachetege নামে অতি ঘৃণ্য ও ভয়ঙ্কর দ্রব্য থাকিত, সেই যন্ত্রণার যন্ত্র কড়িকাঠ হইতে ঝুলানো থাকিত, উহা কারারুদ্ধ ব্যক্তির স্কন্ধের উপর স্থাপিত হইত, তাহার চারি দিকে তীক্ষ্ণধার লৌহ, সুতরাং সেই হতভাগ্য ব্যক্তি বসিতে, শুইতে, ঘুমাইতে পারিত না, সর্ব্বক্ষণ তাহাকে লৌহ-ভার বহন করিতে হইত। শত শত লোককে তাহারা অনাহারে যন্ত্রণা দিত। কেবল মাত্র মৃগয়া করিবার সুবিধার জন্য বিজেতা উইলিয়ম সমস্ত হ্যাম্পষিয়র অরণ্য করিয়া দিলেন, প্রতিহিংসা তুলিবার আশয়ে সমস্ত নর্থহাম্বারল্যাণ্ড জনশূন্য করিয়া দিলেন। টাইন্ ও হাম্বারের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে নয় বৎসর ধরিয়া একটি গ্রাম বা একটি জন প্রাণী মাত্র ছিল না। নর্ম্ম্যান অত্যাচারে দেশ কত খানি জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা নর্ম্ম্যান অধিকারের পূর্ব্বে ও পরের অধিবাসী সংখ্যা তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে। পূর্ব্বে ইয়র্কে ১৬০৭ গৃহ ছিল, উইলিয়মের রাজত্ব কালে ৯৬৭ অবশিষ্ট থাকে, অক্সফোর্ডে ৭২১ গৃহ ছিল, তাহার ২৪৩ মাত্র অবশিষ্ট থাকে, ডচেষ্টরে ১৭২ গৃহের ৭২ মাত্র অবশিষ্ট থাকে, ডর্ব্বিতে ২৪৩ গৃহের ১৪০ ধ্বংশ হইয়া যায়. এমন আর কত কহিব? ইংলণ্ডের নর্ম্ম্যান রাজগণ, নিজে পাত্র নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়া তাঁহাদের অধীনস্থ ব্যক্তিদিগের দুহিতাদের বল পূর্ব্বক বিবাহ দিয়া দিতেন। মনোমত বিবাহ করিতে হইলে অর্থদণ্ড দিতে হইত। কাউণ্টেস অফ্ অ্যাল্বেমাল্‌কে Countess of Albimarle একটি কোমরবন্ধ দিবার কথা মনে করাইয়া না দেওয়াতে রাজা জন্ উইঞ্চেষ্টরের বিষপকে ১ টন্ মদিরা দণ্ড দিতে বাধ্য করান্। এমন কত সামান্য সামান্য বিষয়ে দণ্ড দিতে হইত। বিশেষ ব্যক্তির নামে নালিষ করিতে বা বিশেষ আদালতে মকদ্দমা উত্থাপন করিতে বা বিচারে ন্যাষ্য ভূমিখণ্ড পাইলে তাহা দখল করিতে, টাকা দিতে হইত। পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখিলে প্রত্যর্থী বিচারের বিলম্ব করাইতে, কখনো বা অন্যায় বিচারের সাহায্য করিতে রাজাকে টাকা দিত। সুবিচার ও শীঘ্র বিচার পাইবার জন্য ন্যায্য বিচারাকাঙ্ক্ষী অর্থীকে আবার অর্থ দিতে হইত। স্যাক্সন্ ক্রনিকল লেখক বিলাপ করিয়া বলিতেছেন " ঈশ্বর জানেন, এই হতভাগা ব্যক্তিগণ কি অন্যায় রূপে পীড়িত হইতেছে। প্রথমে তাহাদের ধন সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া হয় পরে তাহাদিগকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করে। এবৎসরে (১১২৪) অতি দুষ্কাল পড়িয়াছে। গুরুভার করে ও অন্যায় ডিক্রিতে সকলেই আপনার আপনার সম্পত্তি খোয়াইতেছে। " " তাহারা (নর্ম্ম্যানরা) করে করে গ্রামের সমস্ত ধন সম্পত্তি শোষণ করিয়া লইয়া অগ্নি লাগাইয়া দেয়। ভ্রমণ করিতে বাহির হইলে দেখিতে পাইবে গ্রামে একটি লোক নাই, ভূমি আকৃষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে। যদি দেখা যায় দুই তিনটি মাত্র ব্যক্তি অশ্বারোহণে একত্রে চলিতেছে, অমনি গ্রাম শুদ্ধ লোক তাহাদিগকে লুণ্ঠনকারী মনে করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যায়। লোকে প্রকাশ্য ভাবে বলিত যে, ক্রাইষ্ট ও তাঁহার Saintগণ ঘুমাইয়া আছেন। " টিউটনিক স্যাক্সন বিজেতাগণ পরাজিত শেল্টদিগকে যেরূপ নিষ্পীড়িত করিয়াছিল, এই ফরাসীচাক্‌চিক্য-প্রাপ্ত টিউটনিক জাতিও কি পরাজিত জাতির প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিল না? বিজিতদের দেশে বিজেতার এরূপ অত্যাচার এরূপ অসভ্য ব্যবহার অনেক পরিমাণে স্বাভাবিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের নিজ দেশে, যেখানে চারিদিক হইতে খৃষ্টধর্ম্ম-দীক্ষিত সভ্য জাতির নেত্র পড়িয়া আছে, সেখানে তাহাদের কিরূপ ব্যবহার? বালক উইলিয়ম যখন নর্ম্ম্যাণ্ডির সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন বালক-হস্ত-স্থিত রাজদণ্ডের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত নর্ম্ম্যান জাতির অন্তর্গত পশুত্ব কিরূপ প্রকাশ পাইয়া উঠিল একবার আলোচনা করিয়া দেখ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামীগণের মধ্যে প্রকাশ্য যুদ্ধ বিগ্রহের ত কথাই ছিল না, কিন্তু প্রকাশ্য যুদ্ধ বিগ্রহ যতই অন্যায় হউক্ না সচরাচর তাহা বীরত্বের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে, সুতরাং সে বিষয়ে আমরা কিছু বলিব না; কিন্তু গুপ্তহত্যা তখন এমন মুহুর্মুহু অনুষ্ঠিত হইত, যে লোকের চক্ষে তাহার ভীষণত্ব হ্রাস হইয়া গিয়াছিল। তখন ছুরিকা ও ও বিষ, রোগ বিপত্তি প্রভৃতি পৃথিবীর অনিবার্য্য আপদের মধ্যে গণ্য হইয়া গিয়াছিল। অনেক সময়ে অজ্ঞাত কারণে অসন্দিগ্ধ-চিত্ত নিরস্ত্র অতিথিকে ভোজের স্থলে হত্যা করা হইত। বেলেমের (Belesme) অধিস্বামী উইলিয়ম ট্যালভ্যাস তাঁহার স্ত্রীর ধর্ম্মিষ্ঠতা ও সচ্চরিত্রতা হেতু বিরক্ত হইয়া গোপনে হত্যাকারী রাখিয়া গির্জ্জায় যাইবার পথে তাহাকে বিনাশ করেন; বিনাশ করিবার এমন দারুণ কারণ শুনি নাই, এমন দারুণ সময় দেখি নাই! এই দুর্ব্বৃত্ত তাহার দ্বিতীয়বার বিবাহকালে বিবাহ-সভাস্থ এক অসংশয়-চিত্ত অতিথির চক্ষু উৎপাটিত ও নাসা কর্ণ ছেদন করে। এইরূপ নীতির ঘোরতর ব্যভিচার দেখিয়া ধর্ম্মযাজকগণ, নীতির সংস্কারের প্রতি মনোযোগ দিলেন। গুপ্ত যুদ্ধ বিগ্রহ, অন্যায় মনুষ্যহত্যা নিবারণের জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইল না। অবশেষে হতাশ হইয়া তাঁহাদের সংস্কারের সীমা সঙ্কীর্ণ করিলেন। কতকগুলি বিশেষ

গুরুতর পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান নিষেধ করিলেন, কতকগুলি বিশেষ ব্যক্তিদিগকে সম্মান করার নিয়ম করিলেন, এবং কতকগুলি বিশেষ পুণ্য মাসে বা সময়ে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ রাখার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু নর্ম্ম্যাণ্ডিতে এ চেষ্টা সফল হইল না। যাজকগণ বুধবার সন্ধ্যা হইতে সোমবার প্রভাত পর্য্যন্ত সকল প্রকার ভীষণ কার্য্যের অনুষ্ঠান রহিত করিতে আদেশ দিলেন; কিন্তু নর্ম্ম্যাণ্ডিতে ছুরিকা এতক্ষণ বিশ্রাম করিতে পারিত না, নর্ম্ম্যান্ হৃদয়ে নরকের জাগ্রত উপদেবতা এতকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে আপনাকে দংশন করিতে থাকিত, সুতরাং ইহাও অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে ক্যাম্ব্রের বিষপ জেরাড এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ভূপালদিগের কার্য্য রক্তপাত করা ও যাজকদিগের কার্য্য প্রার্থনা করা। এক দল পাপ করিবে, আর এক দল তাহাদের হইয়া দেবতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে! জেরাড অন্যান্য বিষপদিগকে ক্ষান্ত হইতে পরামর্শ দিলেন, তাহাদের কার্য্য প্রার্থনা করা, তাহাদের অনধিকার চর্চ্চা করিবার আবশ্যক কি? তিনি কহিলেন, সংস্কারের নিয়ম প্রচারিত করিলে লোকের মধ্যে কপটতা প্রশ্রয় পাইবে মাত্র। কাটাকাটির মুখ হইতে নর্ম্ম্যাণদিগকে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করা নিতান্ত দুরাশা। নিদারুণ কার্য্য নহিলে তাহারা আমোদ পাইত না। সিংহ-হৃদয় রিচাডকে নর্ম্ম্যান কবি কহিতেছেন, ইহা অপেক্ষা উত্তম নৃপতির কথা কখনো কাব্যে গীত হয় নাই! এই নৃপতি ক্রুসেড যুদ্ধকালে একবার শূকর-মাংস খাইবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। পাচক শূকর না পাওয়াতে একজন স্যারাসীন্‌কে কাটিয়া তাহার তাজা ও কোমল মাংস রন্ধন করিয়া দিল। সে মাংস রাজার বড়ই ভাল লাগিল, তিনি শূকরের মুণ্ড দেখিতে চাহিলেন। ভীত-হৃদয় পাচক সভয়ে নরমুণ্ড আনিয়া উপস্থিত করিল। রিচাডের বড়ই আমোদ বোধ হইল, তিনি হাসিয়া উঠিলেন কহিলেন "খাদ্যের এমন সুবিধা থাকিলে দুর্ভিক্ষের ভয় থাকিবে না।' জেরুজিলাম বিজিত হইলে সত্তর হাজার ৭০০০০ অধিবাসী হত হয়। দ্বিতীয় হেনরী একবার ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বালক ভৃত্যের চক্ষু ছিঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। রিচার্ড নগর অধিকার করিলে পর স্যারাসীন্-রাজ স্যারাসীন্ বন্দীদের মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। রিচার্ড ত্রিশ জন স্যারাসীন্ বন্দীর মাথা কাটিয়া প্রত্যেক মাথায় হত ব্যক্তির নাম লিখিয়া, বন্ধন করিয়া প্রত্যেক দূতের সম্মুখে আহারার্থে রাখিতে অনুমতি দিলেন। ও তাঁহার নিজের পাত্রে যে মুণ্ড ছিল তাহা অতি উপভোগ্য পদার্থের ন্যায় খাইতে লাগিলেন। ষাট হাজার বন্দী ক্ষেত্রে আনীত হইলে নর্ম্ম্যান কবি কহিতেছেন—

ক্ষেত্র পূরি দাঁড়াইল বন্দীগণ সবে,
দেবতারা স্বর্গ হোতে কহিলেন তবে।
" মারো মারো কাহারেও ছেড়না, ছেড়না
কাটো মুণ্ড, এক জনে করো না মার্জ্জনা।"

শুনিলা রিচার্ড রাজা বাণী দেবতার,
ঈশে ও পবিত্র ক্রসে কৈলা নমস্কার।

এমন নিদারুণ আদেশ নর্ম্ম্যানদের দেবতাদের মুখেই সাজে। এ ঘটনা সত্য না হইতেও পারে, কিন্তু নর্ম্ম্যান কবি রিচার্ডের গৌরব-প্রচার-মানসেই ইহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহাতে কি তখনকার লোকের মনোভাব প্রকাশ পাইতেছে না? কিরূপ ঘটনায় তখনকার লোকের হৃদয়ে ভক্তি-মিশ্রিত বিস্ময় ও বিস্ময়-মিশ্রিত আনন্দের উদয় হইবে তখনকার কবি তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন। রিচার্ড কোন নগর অধিকার করিলে সেখানকার শিশু ও অবলাদের পর্য্যন্ত হত্যা করিতেন। এই রিচার্ডই তখনকার লোকদের নিকট দেবতার স্বরূপ, কবিদের নিকট আদর্শ বীরের স্বরূপ বিখ্যাত ছিলেন। এমন কি এই "ঊনবিংশ শতাব্দীর" ইংরাজি ঐতিহাসিকেরাও হয় ত তাঁহাকে তৈমুর বা জঙ্গিস্ খাঁর সহিত গণ্য করিতে সঙ্কোচ বোধ করিবেন। সেনল্যাকের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ইংরাজ-সৈন্যের পরাজয়ের পর সেখানে বাণ-বিদ্ধ হ্যারল্ড ভূপতিত হন, সেই খানে বসিয়া উইলিয়ম মৃত দেহরাশির মধ্যে পান ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

নর্ম্ম্যানেরা যখন ইংলণ্ড বিজয় করিতে আইসে, তখন তাহাদের এইরূপ অবস্থা। স্যাক্সনেরা তখন কি করিতেছে? " স্যাক্সনেরা পরস্পর জেদাজেদি করিয়া সর্ব্বদা মদ্যপানে রত আছে; দিবারাত্রি পান ভোজনেই তাহারা অর্থ ব্যয় করিতেছে, অথচ তাহাদের বাসস্থান অতিহীন! কিন্তু ফরাসী ও নর্ম্ম্যানগণ অতি অল্প ব্যয়ে জীবন যাপন করে, অথচ দিব্য বৃহৎ গৃহে বাস করে, তাহাদের আহার্য্য উত্তম, বস্ত্র অতিশয় পরিপাটী" অর্থাৎ স্যাক্সনদের এখনো শিল্পে রুচি জন্মে নাই, উত্তেজনাময় হীন আমোদেই তাহাদের জীবন কাটিতেছে। যে দিন নর্ম্ম্যানদের সহিত যুদ্ধ হইবে তাহার পূর্ব্বরাত্রে "তাহারা সমস্ত রাত পান ভোজনে মত্ত আছে। তুমি দেখিতে পাইবে তাহারা মহা যুঝাযুঝি লাফা লাফি, অট্টহাস্য ও গান বাজনায় রত হইয়াছে।" তখন স্যাক্সনরা এমন মূর্খ, অনক্ষর অসভ্য ছিল যে, নর্ম্ম্যানেরা মূর্খ স্যাক্সন যাজকদিগকে ধর্ম্মমঠ হইতে দূর করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। স্যাক্সনদের এইরূপ অতি হীন অবস্থার সময় অপেক্ষাকৃত সুরুচি ও সুসভ্য নর্ম্ম্যানগণ ইংলণ্ডে পদার্পণ করিল। এই উপলক্ষ্যে ইংলণ্ডে শুদ্ধ যে কেবল সুশোভন প্রাসাদ উত্থিত ও বিদ্যাধ্যাপনশীল যাজকগণের সমাগম হইল তাহা নহে, নর্ম্ম্যানদের প্রবল প্রতাপে ডেন্মার্ক ও নরোয়েবাসী দস্যুদের হস্ত হইতে ইংলণ্ড পরিত্রাণ পাইল। নর্ম্ম্যানদের আগমনে ইংলণ্ডের আরো অনেক অলক্ষিত উপকার হইয়াছিল, কিন্তু বিজিত জাতি বিজেতাদের হস্ত হইতে ন্যায় ও সুবিচারের আশা করিতে পারে না, বিশেষতঃ বিজিত জাতি যখন বিজেতাদের অপেক্ষা সভ্যতায় হীন, তখন ন্যায়ের আশা হতভাগ্যদের পক্ষে দুরাশা! সম-

যোগ্য ব্যক্তির প্রতিই ন্যায়াচরণ করাই প্রায় পৃথিবীর নিয়ম, নিকৃষ্টতরদিগকে পশুবৎ ব্যবহার করিতে লোকে অন্যায় মনে করে না; যদি তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করে তবে তাহা অনুগ্রহ মাত্র। পৃথিবীতে ন্যায়ের সীমাও এমন সঙ্কীর্ণ। স্যাক্সনদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হইল। যদি কোন্ জেলায় একজন নর্ম্ম্যান হত হইত, তাহা হইলে গ্রামবাসীদের হয় হত্যাকারীকে ধরাইয়া দিতে নয় প্রত্যেককে অর্থ দণ্ড দিতে হইত, কিন্তু একজন স্যাক্সন হত হইলে বড় একটা গোলযোগ হইত না। নর্ম্ম্যান ধর্ম্মাচার্য্যগণ আসিয়া স্যাক্সন-রাজা ও তপস্বীদের কবরস্থ অস্থিরাশি অমান্যের সহিত উৎখাত করিয়া ফেলিতেন Ivo Taille-bois নিকট তাঁহার প্রজারা যথানির্দ্দিষ্ট বিনতি দেখাইতে প্রাণপণ করিত। এক হাঁটু গাড়িয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিত। তাঁহাকে যত খানি মান্য ও কর দিবার কথা, তদপেক্ষা অধিক দিয়াও বেচারীরা নিষ্কৃতি পাইত না। তিনি তাহাদিগকে যন্ত্রণা দিতেন, কয়েদ করিতেন, তাহাদের পশুপালের পশ্চাতে কুক্কুর লাগাইয়া দিতেন, তাহাদের বাহনদিগের মেরুদণ্ড ও পা ভাঙ্গিয়া দিতেন। এইত অত্যাচারী, উদ্ধত, গর্ব্বিত, সভ্যতাভিমানী, বিজেতা নর্ম্ম্যান জাতি।

আমরা অ্যাঙ্গ্লো নর্ম্ম্যান সাহিত্য আলোচনা করিবার পূর্ব্বে নর্ম্ম্যান জাতি-চরিত্র ও তাহাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লইয়া আন্দোলন করিলাম। কিন্তু ইহা যেন কেহ অনর্থক মনে না করেন। সাহিত্য মনুষ্য হৃদয়ের ছায়া মাত্র; যে জাতির সাহিত্য আলোচনা করিবে তাহাদের চরিত্র আলোচনা যদি না কর তবে তাহা দারুণ অঙ্গহীন হইবে। এই খানে বলা কর্ত্তব্য, আমরা যে, অ্যাঙ্গ্লো নর্ম্ম্যান সাহিত্য আলোচনা করিতে বসিয়াছি, তাহার কারণ এমন নয় যে, অ্যাঙ্গ্লো নর্ম্ম্যান সাহিত্য অতি বিপুল, অ্যাঙ্গ্লো নর্ম্ম্যান সাহিত্য-ভাণ্ডার বহু মূল্য উজ্জ্বল মণিময়। কিরূপে ইংরাজি সাহিত্য গঠিত হইল তাহা জানিতে কাহার না ইচ্ছা হইবে? ইংরাজি সাহিত্যে ও ইংরাজি চরিত্রে নর্ম্ম্যান প্রভাব স্পষ্ট লক্ষিত হয়—ইংরাজি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত জানিবার নিমিত্তই আমরা নর্ম্ম্যান সাহিত্য আলোচনা করিতেছি।

প্রথম প্রস্তাব সমাপ্ত।

অপ্সরা-প্রেম।

(গাথা)

রজনীর পরে আসিছে দিবস,
দিবসের পর রাতি।
প্রতিপদ হোতে হ'ল পূরণিমা,
দিনে দিনে দিনে বাড়িল চাঁদিমা,
দিনে দিনে দিনে, ধীরে ধীরে ধীরে,
ক্ষয় হয়ে পুনঃ আসিল সে ফিরে
ফুরালো জোছানা ভাতি॥

উঠিল তপন উদয় শিখরে,
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া সারা দিন ধোরে,
ধীর পদ-ক্ষেপে অবসন্ন দেহে,
গেল গো চলিয়া বিশ্রামের গেহে
মলিন বিষণ্ণ অতি!
উদিছে তারকা আকাশের তলে,
আসিছে নিশীথ প্রতি পলে পলে,
পল পল করি যায় বিভাবরী,
নিভিছে তারকা এক এক করি,
হাসিতেছে উষা সতী॥

এস গো সখা এস গো—
কত দিন ধোরে বাতায়ন পাশে,
একেলা বসিয়া সখা তব আশে,
দেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই
পথ পানে চেয়ে রোয়েছি সদাই—
এস গো সখা এস গো!—

সুমুখে তটিনী যেতেছে বহিয়া,
নিশ্বসিছে বায়ু রহিয়া রহিয়া,
লহরীর পর উঠিছে লহরী,
গণিতেছি বসি এক এক করি—
নাই রাতি নাই দিন!
ওই তৃণগুলি হরিত প্রান্তরে
নোয়াইছে মাথা মৃদু বায়ু ভরে,
সারা দিন যায়—সারা রাত রায়
শূন্য আঁখি মেলি চেয়ে আছি হায়—
নয়ন পলক হীন!

ওই—বরষে বাদল, গরজে অশনি,
পলকে পলকে চমকে দামনী,
পাগলের মত হেথায় হোথায়
আঁধার আকাশে বহিতেছে বায়,
অবিরাম সারারাতি।
বহিতেছে বায়ু পাদপের পরে,
বহিছে আঁধার-প্রাসাদ-শিখরে,

ভগ্ন দেবালয়ে বহে হুহু করি,
জাগিয়া উঠিছে তটিনী-লহরী
তটিনী উঠিছে মাতি !

কোথায় গো সখা কোথা গো !
একাকী হেথায় বাতায়ন পাশে
রোয়েছি বসিয়া সখা তব আশে,
দেহে বল নাই চোখে ঘুম নাই,
পথ পানে চেয়ে রোয়েছি সদাই,
কোথায় গো সখা কোথা গো !

যাহারা যাহারা গিয়েছিল রণে,
সবাই ফিরিয়া এসেছে ভবনে,
প্রিয় আলিঙ্গনে প্রণয়িনীগণ
সকলেই আজ সুখে নিমগন
কোন জ্বালা নাহি জানে !
আমিই কেবল একা আছি পোড়ে
পরিশ্রান্ত অতি—আশা কোরে কোরে—
নিরাশ পরাণ আরত রহে না
আরত পারি না, আরত সহে না
আরত সহেনা প্রাণে ॥
এস গো সখা এস গো !

একাকী হেথায় বাতায়ন পাশে,
একেলা বসিয়া সখা তব আশে,
দেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই,
পথ পানে চেয়ে রোয়েছি সদাই
এস গো সখা এস গো !—

আসে সন্ধ্যা হোয়ে আঁধার আলয়ে—
একেলা রয়েছি বসি,
শ্রম হোতে সবে আসিয়াছে ফিরে,
জ্বলিল প্রদীপ কুটীরে কুটীরে,
শ্রান্ত মাথা রাখি বাতায়ন দ্বারে
নীরব প্রান্তরে চেয়ে আছি হা রে—
আকাশে উঠিছে শশি !
কত দিন আর রহিব এমন
মরণ হইলে বাঁচি রে এখন !
অবশ হৃদয়, দেহ দুরবল,
শুকায়ে গিয়াছে নয়নের জল,
যেতেছে দিবস নিশি !

কোথায় গো সখা কোথা গো !
কত দিন ঘোরে সখা তব আশে,
একেলা বসিয়া বাতায়ন পাশে,
দেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই,
পথ পানে চেয়ে রয়েছি সদাই
কোথা গো সখা কোথা গো !—

(অপ্সরার উক্তি)

অদিতি-ভবন হইতে যখন
আসিতে ছিলাম অলকা-পুরে,—
মাথার উপরে সাঁঝের গগন—
শারদ তটিনী বহিছে দূরে !
সাঁঝের কনক-বরণ সাগর
অলস ভাবে সে ঘুমায়ে আছে,
দেখিনু দারুণ বাধিয়াছে রণ
গউরী-শিখর গিরির কাছে !
দেখিনু সহসা বীর একজন
সমর-সাগরে গিরির মতন
পদতলে আসি আঘাতে লহরী
তবুও অটল পারা !
বিশাল ললাটে ভ্রূভঙ্গীটি নাই,
শান্ত ভাব জাগে নয়নে সদাই—
উরস বরমে বরষার মত
বরিষে বাণের ধারা !

অশনি-ধ্বনিত ঝটিকার মেঘে
দেখেছি ত্রিদশপতি,
চারি দিকে সব ছুটিছে ভাঙ্গিছে,
তিনি সে মহান্ অতি !
এমন উদার শান্ত মুখ ভাব
দেখি নি তাঁহারো কভু ;
পৃথ্বী মত হয় যাঁহার অসিতে,
স্বরগ যে জনে পারেন শাসিতে,
দুরবল এই নারী-হৃদয়ের
করিনু তাঁহারে প্রভু !

দিলাম বিছায়ে দিব্য পাখা-ছায়া
মাথার উপরে তাঁর,
মায়া দিয়া তাঁরে রাখিনু আবরি
নাশিতে বাণের ধার !

প্রতি পদে পদে গেনু সাথে সাথে
দেখিনু সমর ঘোর—
শোণিত হেরিয়া শিহরি উঠিতে
লাগিল হৃদয় মোর !

থামিল সমর জয়ী বীর মোর
উঠিলা তরণী পরে,
বহিল মৃদুল পবন, তরণী
চলিল গরব ভরে !

গেল কত দিন, পূরব-গগনে
উঠিল জলদ রেখা !
মৃদু ঝলকিয়া অবশ দামিনী
দূর হোতে দিল দেখা !

ক্রমশঃ জলদ ছাইল আকাশ
অশনি সরোষে জ্বলি,
মাথার উপর দিয়া তরণীর
অভিশাপ গেল বলি!

নাবিকেরা এবে বিধাতারে তবে
ডাকিল কাতর স্বরে,
তরণী হইতে কোলাহল ধ্বনি
উঠিল আকাশ পরে!

একটি লহরী উঠেনি সাগরে
একটু বহেনি বায়—
তড়িত-চরণে অশনি কেবল
দিক হোতে দিকে ধায়!

সহসা ভ্রুকুটী উঠিল সাগর
পবন উঠিল জাগি,
শতেক উরমি মাতিয়া উঠিল,
সহসা কিসের লাগি!

সাগরের অতি দুরন্ত শিশুরা
কহিয়া অস্ফুট বাণী,
উলটি পালটি খেলিতে লাগিল
লইয়া তরণী খানি!

দারুণ উল্লাসে সফেন সাগর
অধীর হইল হেন—
ভাঙ্গে-বিভোলা মহেশের মত
নাচিতে লাগিল যেন?

তরণীর পরে একেলা অটল
দাঁড়ায়ে বীর আমার,
শুনি ঝটিকার প্রলয়ের গীত
বাজিছে হৃদয় তাঁর।

দেখিতে দেখিতে ডুবিল তরণী
ডুবিল নাবিক যারা—
যুঝি যুঝি বীর সাগরের সাথে
হইল চেতন হারা!

আকাশ হইতে নামিয়া, ছুঁইনু
অধীর জলধি জল,
পদ তলে আসি করিতে লাগিল
উরমিরা কোলাহল!

অধীর পবনে ছড়ায়ে পড়িল
কেশ পাশ চারি ধার—
সাগরের কানে ঢালিতে তখন
লাগিনু গীতের ধার!

গীত।

কেন গো সাগর এমন চপল,
এমন অধীর-প্রাণ,
তবে শুন গো আমার গান
তবে শুন গো আমার গান!

পূরনিমা-নিশি আসিবে যখন
আসিবে যখন ফিরে—
তার মেঘের ঘোমটা সরায়ে দিব গো
খুলিয়ে দিবগো ধীরে!

প্রতি হাসি তার পড়িবে তোমার
বিশাল হৃদয় পরে,
কত আনন্দে উরমি জাগিবে তখন
নাচিবে পুলক ভরে!

তবে থামগো সাগর থামগো,
কেন হোয়েছ অধীর-প্রাণ?
দেখ তটিনী সবাই পরমাদ গণি,
মাগিছে অভয় দান—

তারা গাহিবে প্রেমের গান,
তারা কানন হইতে এনেছে কুসুম
করিতে তোমারে দান—
তারা হৃদয় হইতে শত প্রেম-ধারা
করাবে তোমারে পান!

তবে থাম গো সাগর—থাম গো,
কেন হোয়েছ অধীর-প্রাণ?

যদি উরমি-শিশুরা নীরব-নিশীথে
ঘুমাতে নাহিক চায়,
তবে জানিও সাগর বোলে দিব আমি
আসিবে মৃদুল বায়—

কানন হইতে করিয়া তাহারা
ফুলের সুরভি পান,
কানে কানে ধীরে গাহিয়া যাইবে
ঘুম পাড়াবার গান!

অমনি তাহারা ঘুমায়ে পড়িবে
তোমার বিশাল বুকে,
প্রতি উরমিরা দেখিবে তখন
চাঁদের স্বপন সুখে!

যদি কভু হয় খেলাবার সাধ,
আমারে কহিও তবে—
শতেক পবন আসিবে অমনি
হরষ আকুল রবে—

সাগর-অচলে ঘেরিয়া ঘেরিয়া
হাসিয়া সফেন হাসি

মাথার উপরে ঢালিও তাহার
প্রবাল মুকুতা-রাশি!

তবে রাখগো আমার কথা,
তবে শুনগো আমার গান,
তবে থামগো সাগর, থামগো
কেন হোয়েছ অধীর-প্রাণ?

দেখ প্রবাল-আলয়ে সাগর-বালা
গাঁথিতেছিল গো মুকুতা-মালা,
গাহিতেছিল গো গান,
আঁধার-অলক কপোলের শোভা
করিতেছিল গো পান!

কেহবা হরষে নাচিতেছিল গো
হরষে পাগল-পারা,
কেশ-পাশ হোতে ঝরিতে ছিল গো
নিটোল মুকুতা-ধারা!

কেহ মণিময় গুহায় বসিয়া
মৃদু অভিমান ভরে,
সাধাসাধি করে প্রণয়ী আসিয়া
একটি কথার তরে।

এমন সময়ে শতেক ঊরমি
সহসা মাতিয়ে উঠেছে সুখে,
সহসা এমন লেগেছে আঘাত
বালিকাদিগের কোমল-বুকে!

ওই দেখ দেখ—আঁচল হইতে
ঝরিয়া পড়িল মুকুতা রাশি—
ওই দেখ দেখ—হাসিতে হাসিতে
চমক লাগিয়া ঘুচিল হাসি?

ওই দেখ দেখ—নাচিতে নাচিতে
থমকি দাঁড়ায় মলিন মুখে—
ওই দেখ বালা অভিমান ত্যজি
ঝাঁপায়ে পড়িল প্রণয়ী-বুকে!

থামগো সাগর, থামগো—থামগো
হোয়োনা অমন পাগল পারা—
আহা, দেখ দেখি সাগর-ললনা
ভয়ে একেবারে হোয়েছে সারা!

বিবরণ হোয়ে গিয়েছে কপোল
মলিন হইয়ে গিয়েছে মুখ,
সভয়ে মুদিয়া আসিছে নয়ন
থর থর করি কাঁপিছে বুক—

আহা থাম তুমি থামগো—
হোয়োনা অধীর প্রাণ,
রাখগো আমার কথা
শুনগো আমার গান!!

জীবরহস্য।

উপক্রমণিকা।

আমরা এই অসীম বিশ্বের বিষয় যতই আলোচনা করি, ততই আমাদের মনে কৌতূহল ও বিস্ময় রসের আবির্ভাব হয়। পৃথিবী কিরূপে স্বস্থানে উপনীত হইল, ইহার উপাদানই বা কি এবং কত কালই বা ইহা এই ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, এই সকল বিষয় নির্ণয় করা অতি দুরূহ।

কোন যন্ত্র আপনাপনি চলিতেছে দেখিলে আমরা প্রথমেই উহার গতির কারণ অনুসন্ধান করি এবং সুবিধা হইলে ঐ যন্ত্রের এক একটি অংশ পৃথক্ করিয়া না দেখিয়া ক্ষান্ত হই না। কিন্তু পৃথিবীর সমুদায় অংশ এই রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। পৃথিবীর বিষয় জানিতে হইলে উহার অভ্যন্তরে ও উপরিভাগে যে সকল পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় তৎসমুদয়, এবং আমাদিগের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর জগতের প্রকৃতি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে হয়। এইরূপ অনুসন্ধান দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তদ্দ্বারা পৃথিবীর অনেক নিগূঢ় বিষয় জানা যাইতে পারে।

পৃথিবী কিরূপে এখানে উপস্থিত হইল, একথা জিজ্ঞাসা করা কখনই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ—প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের এই পৃথিবী মুহূর্ত্তমাত্রও এক স্থানে স্থির নহে। প্রত্যুত চিরকালই উহা মণ্ডলাকারে সূর্য্যের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিতেছে। এমন কি উহার গতির বেগ ঘণ্টায় ৩০,০০০ ক্রোশ অপেক্ষাও অধিক। এই অত্যাশ্চর্য্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জগৎ বৃহত্তর জগৎকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। আমরা এই মাত্র জানি যে চন্দ্র প্রায় এক-মাসে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। কিন্তু সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে উহাদের উভয়ের (চন্দ্র ও পৃথিবীর) একবৎসর কাল অতীত হয়। কোন কোন গ্রহ আবার স্বীয় উপ-গ্রহের সহিত সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার সময় পৃথিবী অপেক্ষা বৃহত্তর কক্ষে ভ্রমণ করিয়া থাকে। সুতরাং ঐ কক্ষে পরিভ্রমণ করিতে, উহাদের অনেক কাল অতিবাহিত হয়। যথা—বৃহস্পতি গ্রহ (Jupiter)। এদিকে শুক্র গ্রহ (Venus) পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্যের অধিকতর সন্নিহিত বলিয়া ক্ষুদ্রতর কক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক, অপেক্ষাকৃত অল্পকাল মধ্যে সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পৃথিবী ঈদৃশ ভয়ানক বেগে সূর্য্যের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিতেছে জানিয়াও আমরা উহার গতি অনুভব করিতে পারি না। বরং আমাদের চক্ষে উহা স্থির ও অচল বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বাস্তবিক পৃথিবী যে ঘণ্টায় ৩০,০০০ ক্রোশ করিয়া চলিতেছে তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয়

নাই। উল্লিখিত গতি প্রতীত না হইবার কারণ এই যে আমরা ভূ-পৃষ্ঠে যাহা কিছু দেখিতে পাই, সকলই পৃথিবীর সহিত সমান বেগে ধাবিত হয়, সুতরাং ঐ গতি আমাদের উপলব্ধি হয় না।

পৃথিবী কিরূপে সৃষ্ট হইল ইহা জিজ্ঞাসা করিলে অধুনাতন জ্যোতির্ব্বেত্তারা এই কথা বলিয়া থাকেন যে উহা একদিন সূর্য্যের অংশভূত ও উহার ন্যায় উত্তপ্ত ছিল, কিন্তু কাল সহকারে তথা হইতে পৃথক্ হইয়া ক্রমশঃ শীতল ও জীবজন্তুর বাসোপযোগী হইয়াছে। তাঁহাদের মুখে ইহাও শুনা যায় যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া নিরীক্ষণ করিলে চন্দ্রে পর্ব্বত ও উপত্যকার অবস্থান এবং মঙ্গল গ্রহে (mars) সমুদ্র, তুষার ও মেঘরাশি পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। পৃথিবীর ন্যায় সৌর জগতের অন্যান্য গ্রহও সূর্য্য অথবা তাদৃশ প্রকাণ্ড কোন জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে এবং উহা হইতেই তাপও অনেক প্রাপ্ত হয়।

অতঃপর পৃথিবী কিরূপ উপাদানে নির্ম্মিত এবং উহাতে মৃত্তিকা ভিন্ন অপর কোন পদার্থ আছে কি না তাহা দেখা যাউক। বস্তুত সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কি কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বকালে উহার উপর কীদৃশ জীবজন্তু ও বৃক্ষলতাদি সমুৎপন্ন হইয়াছিল এবং পৃথিবী যে অতি প্রাচীন তাহারই বা প্রমাণ কি, এই সকল বিষয় আলোচনা করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য।

পৃথিবী সৃষ্টি হইতে কতকাল পর্য্যন্ত এই ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, ত্রিশ কি চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কেহই তাহা জানিতেন না। এমন কি তৎকালে অনেকের এই বিশ্বাস ছিল যে মানবজাতি পৃথিবীর নিতান্ত প্রাচীন অধিবাসী নহে। অনেকে আবার ইহাও জানিতেন যে মনুষ্য জন্মিবার বহুকাল পূর্ব্বে পৃথিবীতে কতকগুলি বৃহদাকার জীব সমুৎপন্ন হয়। ঐ সকল জীবের মৃত্তিকা-নিহিত অস্থিই তাহার প্রমাণ স্বরূপ। এতদ্ভিন্ন ঐ সকল মহাত্মারা ইহাও বলিয়া গিয়াছেন যে পৃথিবীতে মানবজাতির আদি পুরুষ বা আদি বংশ সৃষ্ট হইবার অনেক পূর্ব্বে তথায় মৎস্য, কর্কট ও পতঙ্গ প্রভৃতি নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের অবস্থান-চিহ্ন লক্ষিত হইত। জীব-রহস্য মধ্যে ক্রমশঃ এই সকল প্রাণি ও মানবজাতির অদ্ভুত জীবনবৃত্তান্ত বিবৃত করা যাইবে। কি প্রমাণানুসারে অধুনাতন পণ্ডিতেরা মনুষ্যকে পৃথিবীর অতি প্রাচীন অধিবাসী বলিয়া থাকেন এবং কি রূপেই বা তাঁহারা ঐ সকল বিষয় জানিতে পারিয়াছেন, তাহাও আমরা প্রকাশ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইব।

পূর্ব্বোক্ত জীবিত-ইতিহাস গুলি এক স্থান হইতে সংগ্রহীত হয় নাই। পণ্ডিতগণ নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া উহার পৃথক পৃথক অংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ঈদৃশ যত্ন ও অধ্যবসায় সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত ভূতত্ত্ববেত্তা উহার সমুদায় অংশ প্রকাশ করিতে পারেন নাই, সুতরাং যতদূর আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাই আমরা প্রকাশ করিতেছি।

জীবরহস্যের কতক অংশ ভূপৃষ্ঠে, কতক ভূগর্ভে, কতক বা পর্ব্বতগহ্বরে এবং অপর কতকগুলি নদী অথবা সমুদ্রগর্ভে দৃষ্ট হইয়া থাকে। নদীর নিম্নভাগ কিম্বা পর্ব্বতের মধ্য দিয়া রেলের রাস্তা প্রস্তুত করিবার সময়ও ভূগর্ভের অনেক জীবরহস্য প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল তলবর্ত্ম এতই দীর্ঘ ও গভীর যে তন্মধ্যে সমুচ্চ মন্দির সংস্থাপন করিলেও তাহার অগ্রভাগ দৃষ্ট হয় না। ফলতঃ ঐ সকল স্থান খনন করিবার সময় কর্ম্মকারকেরা যে সকল পশুপক্ষির অস্থি এবং মৎস্য, কচ্ছপ, শম্বুক ও অপর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গের দেহাবশেষ প্রাপ্ত হয়, তদ্দ্বারা জীবরহস্যের অনেক বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। জীবের দেহাবশেষগুলি ভূগর্ভের এতদূর নিম্নে অবস্থিত যে তাদৃশ অপরিচিত স্থানে কোন ব্যক্তি কৌতূহল পরতন্ত্র হইয়া ঐ সকল বস্তু রাখিয়া দিবে, ইহা কখনই সম্ভব নহে। বরং পুরাকালে পৃথিবীতে যে ঐ সকল জীব বর্ত্তমান ছিল, তাদৃশ নিম্ন প্রদেশে উহাদের অবস্থানই তাহার প্রমাণ। উল্লিখিত দেহাবশেষ ব্যতীত ভূপৃষ্ঠের অনতি নিম্নে, ধাতু, অস্থি ও প্রস্তরনির্ম্মিত নানাবিধ অস্ত্র ও শিল্পযন্ত্র এবং মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী বিবিধ অলঙ্কার ও মৃণ্ময় পাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে ঐ সকল দ্রব্য কোননা কোন সময়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত ও ব্যবহৃত হইত। এই জন্যই খাত খনন করিবার সময় ও কোন কোন পর্ব্বত-গুহামধ্যে ঐ সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে। সেই রূপ মৃদঙ্গার-খণিতেও ভূগর্ভস্থ নানা প্রকার পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সকল খনির মধ্যে কোন কোনটা আবার এতই গভীর যে তিন চারি খানি বাঁশ উপর্য্যুপরি বাঁধিয়া তন্মধ্যে নামাইয়া দিলেও উহার তলদেশ স্পৃষ্ট হয় না। সুতরাং ঈদৃশ গভীরতম প্রদেশে উপনীত হইতে হইলে, কর্ম্মচারীদিগকে অনেক দূর পর্য্যন্ত মৃত্তিকারাশি ভেদ করিয়া যাইতে হয়। তখন এই মৃত্তিকারাশি স্তরে স্তরে সজ্জীভূত বলিয়া প্রতীত হয়। বস্তুত একখানি লোহিত ইষ্টকের উপর অপর একখানি কৃষ্ণবর্ণের ইষ্টক এবং তদুপরি আর একখানি শ্বেতবর্ণের ইষ্টক এই রূপে পর্য্যায়ক্রমে রাখিয়া দিলে যে রূপ দেখায় পূর্ব্বোক্ত মৃত্তিকারাশির দৃশ্যও সেই রূপ। এই স্তরগুলি কোথাও কঠিন মৃত্তিকার ন্যায়, কোথাও বালুকাময়, কোথাও কর্দ্দমসদৃশ এবং কোথাও বা কর্করবৎ আকার ধারণ করে। এদেশে কূপ খনন করিবার সময় মৃত্তিকামধ্যে এরূপ স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ প্রভৃতি ধাতুর খণিতেও পূর্ব্বোক্ত স্তর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সেইরূপ যে সকল পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ হইতে খড়িমাটি ও মার্ব্বল নামক প্রস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সকল স্থান খনন করিতে করিতেও জীবরহস্যের অনেক বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক স্থলে আবার প্রকৃতি এ বিষয়ে আমাদিগের পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সমুদ্র ও নদীতীরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরি-

শ্রেণীর উপর নিয়ত জলের প্রতিঘাত হওয়াতে তন্মধ্যে যে সকল গহ্বর নির্ম্মিত হয় সেই সকল গহ্বর ও উহাদের পার্শ্বদেশ হইতেও নানাবিধ জীবের অস্থি ও অপরাপর কঠিন আবরণ (Shells) প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং হিমালয় প্রভৃতি বৃহদাকার পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যেও কোন কোন স্থলে চিড় থাকাতে যে সকল স্তর দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাতেও বহুবিধ জীবের দেহাবশেষ লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল নদী প্রবাহিত হইবার সময় স্থল বিশেষে গভীর খাত খনন করে, তদ্দ্বারা জীবরহস্যের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ এসম্বন্ধে প্রকৃতির শক্তি, মনুষ্যশক্তি অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক।

জীবরহস্যের এই সকল অত্যাশ্চর্য্য বিষয়গুলি প্রথমতঃ পাঠকগণের বোধগম্য না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু যতই তাঁহারা এই সকল বিষয়ের আলোচনায় ও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন ততই তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে। আমরা যে ভূমির উপর সতত বিচরণ করি, তাহার গর্ভে যে ঈদৃশ অসংখ্য জীবের দেহাবশেষ প্রোথিত আছে, ইহা সহসা কাহারও মনে উদয় হয় না। অথচ এই ভূগর্ভে যে জীবরহস্যের অধিকাংশ বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে আর সংশয় নাই। বলিতে কি, রামায়ণ ও মহাভারতে যে সকল অপরূপ মনুষ্য ও পশু পক্ষী বিষয়ক রচিত গল্প শুনা যায়, ভূগর্ভে তদপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়কর জীব অস্থির চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। বস্তুতঃ পৃথিবীর পুরাকালীন অধিবাসিগণের দেহাবশেষ মধ্যে এমন অনেক জীবের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে যাহাদের আকার প্রকার দেখিলে রামায়ণ প্রভৃতি উপন্যাস-চরিতার কল্পনাশক্তিকেও হীনপ্রভ বলিয়া বোধ হয়। এমন কি তৎকালে সত্য বিষয়ও আমাদের মিথ্যা ও কল্পিত বলিয়া ভ্রম জন্মে। আমরা এক্ষণে উড্ডীয়মান সর্প, বা হস্তিপ্রমাণ বৃহদাকার পক্ষী (Roc), গগনস্পর্শী লতিকা, অথবা হোয়েল মৎস্যের ন্যায় গৃহগোধিকা, গণ্ডার বা সিন্ধুঘোটক সদৃশ জড় (Sloth), কিংবা ওকবৃক্ষের ন্যায় সমঙ্গা জাতীয় উদ্ভিদ্ ও শিয়াকুলের বনের ন্যায় শৈবাল প্রভৃতি বস্তু আর কিছুই দেখিতে পাই না, তথাপি এই সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ্ যে পৃথিবীতে একদিন জীবিত ছিল ও অপেক্ষাকৃত অল্প সময় মধ্যে বর্দ্ধিত হইত, অনুসন্ধান করিলে এখনও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুত ভূগর্ভের অধিকাংশ স্থান ইহাদেরই দেহাবশেষে পরিপূর্ণ। একথা অনেকে কল্পিত মনে করিয়া আমাদিগকে উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু প্যারিস্ বা লণ্ডনের কৌতুকাগারে (Meusium) প্রবেশ করিয়া দেখিলেই সে উপহাস বিস্ময়ে পরিণত হইবে। এই সকল স্থানে অনেক অত্যাশ্চর্য্য জীবের অস্থি এবং সমঙ্গা নামক উদ্ভিদের বৃহদাকার পত্র ও বৃন্ত এখন পর্য্যন্ত বিরাজমান রহিয়াছে, যাহা দেখিলে উহাদের জীবিত অবস্থার আকার প্রকারের বিশালতা এখনও কিয়ৎ পরিমাণে বুঝা যাইতে পারে।

জীবরহস্যের অংশগুলিকে 'খনিত' বলে। মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে ঐ সকল অংশ প্রাপ্ত হওয়াতে ভূতত্ত্ববেত্তারা উহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই সকল খনিতের মধ্যে কেবল জীবের অস্থি, মৎস্যের কাঁটা, পতঙ্গের চর্ম্ম খোলা, ও পক্ষ, এবং বৃক্ষ লতাদির প্রস্তরীভূত পত্র ও বৃন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। বহুকাল মৃত্তিকাগর্ভে নিহিত থাকিলেও ইহাদের পূর্ব্বের আকার প্রকার বিনষ্ট হয় না, বরং দেখিবা মাত্র ইহাই মনে হয় যেন উহারা এককালে কোন না কোন সজীব উদ্ভিদ বা প্রাণীর অংশ ছিল।

সমুদ্রতীরস্থ বালুকা ও খড়ি মাটির মধ্যে অনুসন্ধান করিলে ঐরূপ খনিত প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন সমুদ্রতীরবর্ত্তী পর্ব্বতপার্শ্বেও ঐ সকল খনিতের অভাব নাই। বস্তুতঃ যদি কেহ ঐ সকল স্থানের খনিত লইয়া নিকটস্থ পর্ব্বতগুহার লবণাক্ত জলের কীট পতঙ্গের সহিত তুলনা করিয়া দেখেন তাহা হইলে খনিত মধ্যস্থ পূর্ব্বতন জীবের দেহাবশেষে এক্ষণকার সেই সেই জীবের সহিত কতদূর সৌসাদৃশ্য তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। খনিত মধ্যে কেবল জীবের বর্ণ ও মাংস লক্ষিত হয় না, কারণ জীবের মরণোত্তর ঐ দুই পদার্থের এককালে লোপ হইয়া থাকে। কিন্তু উহাদের কঠিন অংশগুলি, অর্থাৎ অস্থি ও খোলা ধ্বংশ হয় না প্রত্যুত অক্ষত ভাবে পর্ব্বত মধ্যে বর্ত্তমান থাকে ও পর্ব্বত-শরীর পোষণ করে। উদ্ভিজ্জ-খনিতের ভাবও সেইরূপ। এখানে বৃক্ষ লতাদির আকার প্রকার ও কাষ্ঠতন্তু প্রায় সমভাবে বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু পত্র ও বল্কলের সবুজ রং কিছু মাত্র লক্ষিত হয় না। তথাপি দেখিলেই বোধ হয় যেন কোন চিত্রকর প্রস্তরের মধ্যে উহাদিগের জীবিতাবস্থার প্রতিমা চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে।

এক্ষণে খনিত কি এবং ঐ সকল খনিত কোথায় পাওয়া যায় তাহা বুঝা গেল। এবং এই গুলি যে জীবরহস্যের প্রধান অংশ তাহাও ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহারা পৃথিবীর নানা স্থানে নানা আকারে অবস্থিত। কখন গভীর নৃদঙ্গার খণিতে, কখন গিরিশৃঙ্গে, কখন সুগভীর পর্ব্বত কন্দরে, এবং কখন বা নদী অথবা সমুদ্রের নিম্ন প্রদেশে বিক্ষিপ্ত থাকে। তীক্ষ্ণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিজ নিজ ধৈর্য্য ও পরিশ্রম সহকারে এই সকল স্থান অনুসন্ধান করিয়া যাহা কিছু প্রাপ্ত হইয়াছেন, তৎসমুদয়ই আমাদের শিক্ষার্থে যথাক্রমে কৌতুকাগারে (Meusium) বিন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ সকল পদার্থের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে আরব্য উপন্যাসের অদ্ভুত গল্প অপেক্ষাও অধিকতর বিস্ময়কর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আরব্য উপন্যাসের ন্যায় উল্লিখিত ইতিবৃত্তে কোন ঐন্দ্রজালিক অঙ্গুরীয় বা অলৌকিক প্রদীপের গল্প অথবা উহার আনুষঙ্গিক দৈত্যের বিষয় লিখিত নাই, তথাপি ঐ সকল ইতিবৃত্ত সত্য বলিয়া বিজ্ঞানসমাজের বিশেষ আদরণীয় হইয়াছে। প্রকৃতি স্বয়ং

ইহাদের নিয়ন্তা। এই প্রকৃতির নিয়মানুসারে কোথাও প্রকাণ্ড পর্ব্বত সকল শির উন্নত করিয়া গগন-প্রাঙ্গণ ভেদ করিতেছে, কোথাও উপত্যকার সৃষ্টি হইতেছে, কোথাও বেগবতী নদী প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিতেছে, কোথাও খড়িমাটি ও বালুকা দ্বারা সাগরগর্ভ পরিপূর্ণ হইতেছে এবং কোথাও বা প্রাচীন গহন কানন বা সুবিস্তৃত রাজ্য ভূগর্ভে অথবা সাগরতলে প্রোথিত হইতেছে। প্রাকৃতিক ব্যাপারে অগ্নি, জল ও বায়ু এই তিনটি পদার্থই দৈত্যের ন্যায় কার্য্য করে। ইহারাই প্রকৃতির প্রধান সহায়। এবং ইহাদেরই অপ্রতিহত শক্তি প্রভাবে বহুবিধ পরিবর্ত্তনের পর পৃথিবী ক্রমে ক্রমে এই রূপ রমণীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবী যতই রমণীয় হউক না কেন ইহাতে নিত্য নূতন বিষয় আবিষ্কৃত না হইলে হয় ত ইহার প্রতি আমরা তাদৃশ মনোনিবেশ করিতে পারিতাম না। পৃথিবী যে বহুকাল পূর্ব্বে আমাদের বাসোপযুক্ত হইয়াছে ইহা এক্ষণে কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু এই বিষয়টি জানিয়াই পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য দূর হয় না। প্রত্যুত কি রূপ নিয়ম অবলম্বন করিয়া জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে সাধ্যানুসারে আমরা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। এই রূপ অনুসন্ধান দ্বারা জগতের অনেক নূতন ও অপরিচিত বিষয় ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। জ্ঞানিগণ ইহাও স্থির করিয়াছেন যে পৃথিবীতে সচরাচর যে সকল মৃত জীবের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্ভিন্ন এমন অনেক জীব-দেহের চিহ্ন আছে যাহা আমাদের দৃষ্টি-পথে পতিত হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে পৃথিবী একটি মৃত দেহের বৃহৎ সমাধি ক্ষেত্রস্বরূপ। প্রতি পদক্ষেপে আমরা ঐ সকল মৃতদেহ বা খনিতের উপর বিচরণ করিয়া থাকি। ইহারা গৃহনির্ম্মাণের একটি প্রধান উপাদান। নগরের পথ ঘাট পরিভ্রমণ কালেও চতুর্দ্দিকে ঐ রূপ লক্ষ লক্ষ খনিত পতিত দেখিতে পাওয়া যায়। কর্করময় পথের উপর দিয়া চলিবার সময় যে সকল গোলাকৃতি চিহ্ন পথের আমাদের পদতলে দলিত হয় ঐ সকল প্রস্তরখণ্ড যে স্পঞ্জের ন্যায় এক প্রকার সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ মাত্র, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। এই সকল কর্কর পদার্থ প্রথমতঃ খড়িমাটির খণি হইতে স্খলিত হইয়া নদী ও সমুদ্রপ্রবাহে আলোড়িত হয় ও ক্রমে ক্রমে কর্করের ন্যায় কঠিন ও মসৃণ ভাব ধারণ করে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী বালুকার উপর ভ্রমণ করিতে হইলেও রাশীকৃত ঐ রূপ কর্করের চূর্ণ আমাদের নয়নপথে পতিত হয়। এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে স্পঞ্জ নামক সামুদ্রিক জীবও পৃথিবীনির্ম্মাণের একটি উপাদান। বালকেরা যে খড়ি লইয়া পাঠদ্দশায় অঙ্কপাত করে তাহাও সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ মাত্র। সেই রূপ প্রথম শিক্ষার সময় বালকগণ যে স্লেট্ ও স্লেট্ পেন্‌শিল ব্যবহার করে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তন্মধ্যেও জীবের দেহাবশেষ লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ ঐ সকল স্লেট ও স্লেটপেন্‌শিল যে পুরাতন কোন সমুদ্রিক মৃতদেহময় কর্দ্দম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই।

এতদ্ভিন্ন সচরাচর ব্যবহারোপযোগী অনেক বস্তুর মধ্যে ঐ রূপ জীব বা উদ্ভিদের চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে। আমরা এক্ষণে যে মৃদঙ্গার সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি উহা যে নিষ্পীড়িত উদ্ভিজ্জ পদার্থ মাত্র, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। ফলতঃ মৃদঙ্গার মধ্যে পূর্ব্বতন বৃক্ষলতাদির দেহাবশেষ ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হয় না। কিন্তু এস্থলে আমরা ইহার বিষয় অধিক আর কিছুই বলিতে চাহি না। যথা সময়ে ইহার পুনরুল্লেখ করা যাইবে।

এক্ষণে জীবরহস্যের উপক্রমণিকা ভাগ শেষ হইল। ইহার একটি অংশ কিরূপে সংস্থিত হইয়াছে, যথানিয়মে পর পরিচ্ছেদের মধ্যে তাহা ক্রমশঃ বিবৃত হইবে। পাঠকগণ দেখিবেন যে ঐ সকল পরিচ্ছেদ মধ্যে কোথায় জীবের অস্থিময় দেহাবশেষ, এবং কোথাও জীবের—বা কচ্ছপ, ঝিনুক ও শামুক প্রভৃতি কঠোরপৃষ্ঠ জীবের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। অবশেষে মানবজাতির প্রবন্ধে—যদিও পাঠকগণ উহাদের উপলক্ষ্যে বিশেষ কোন লিখিত ইতিবৃত্ত দেখিতে পাইবেন না, তথাপি উহাদের পূর্ব্বতন সমাধি ও বাসস্থল মধ্যে প্রাপ্ত অস্ত্র শস্ত্র ও অপরাপর দ্রব্যাদির বিষয় জানিতে পারিলে, ঐ সকল ব্যক্তি যে পৃথিবীর আদিমনিবাসী ছিলেন তাহাতে আর কোন সংশয় থাকিবে না। এই সকল বিষয় অবগত হইলেই পৃথিবীর মধ্যে জীবলোকের প্রায় অধিকাংশ ইতিবৃত্ত বুঝা যাইতে পারে।

শ্রীঃ যঃ নঃ মঃ.

কাতন্ত্র-জীবনী।

তৃতীয় অধ্যায়।

দুর্গসিংহ।

এখন আমরা কাতন্ত্র-বৃত্তি-প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় দুর্গসিংহের জীবনীতে উপনীত হইলাম। বৈয়াকরণ-শ্রেষ্ঠ দুর্গসিংহ, ভারতীয় সাহিত্য আকরের একটী অত্যুজ্জ্বল এবং অমূল্য রত্ন হইলেও তাঁহার জীবনী প্রায় অতীত কালীন বহুস্তরাবরণান্তরালে

সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে। বস্ত্বাবরণভেদী অস্ত্র বীক্ষণ যন্ত্র প্রভাবেও এ পর্য্যন্ত কোন দূর-দর্শী সেই সকল আচ্ছাদন উল্লঙ্ঘন করিয়া দুর্গসিংহের জীবনী-সীমা সন্দর্শন করিতে সক্ষম হয়েন নাই সুতরাং আমাদের সেই বুধজনাদৃশ্য জীবনী, সমীচীন রূপে পর্য্যা-লোচনা করা একরূপ অসম্ভব; তথাপি যথা-লভ্য প্রমাণাদির বলে সাধারণ ভাবে তজ্জীবন-বৃত্তান্ত-ঘটিত দুই একটী কথা বিবৃত করিতেছি।

কথিত আছে সুপ্রসিদ্ধ দুর্গসিংহ এক এক বিষয়ক গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া এক একটী স্বতন্ত্র নাম ধারণ করিয়াছেন; এদেশে জন-শ্রুতি এই যে নামলিঙ্গানুশাসন-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ অমরসিংহ এবং দুর্গসিংহ অভিন্ন ব্যক্তি। পুরাকালে গুণ বংশ কার্য্য প্রভৃতি কারণে মনুজগণ বহু নামে অভিহিত হই-তেন এই জন্যই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কার্ত্তিক গণেশ ব্যাস বাসুদেব অর্জ্জুন সরস্বতী লক্ষ্মী পার্ব্বতী প্রভৃতি প্রকৃত ও কাল্পনিক ব্যক্তি-গণের বহু নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতো গেল প্রাচীন কথা—অপেক্ষাকৃত আধুনিক লোকদেরও এবম্প্রকার বহু নাম দেখা যায়। সুবিখ্যাত চাণক্য পণ্ডিতের হেমচন্দ্র-প্রণীত অভিধানচিন্তামণিতে বাৎসায়ন, মল্লনাগ কৌটিল্য, চাণক্য, দ্রামিল, পক্ষিলস্বামী, বিষ্ণুগুপ্ত, অঙ্গুল এই আটটী নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে (১) চাণক্য ন্যায়শাস্ত্রে বাৎসায়ন ও পক্ষিলস্বামী এবং অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য নামে পরিচিত (২)। এতদ্দেশে এক ব্যক্তির বহু নামের প্রথা, বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে সুতরাং দুর্গসিংহ গুণ ও কার্য্য বি-শেষে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম ধারণ করিয়া ছি-লেন, একথায় আমরা আশ্চর্য্য হইতে পারি না। প্রত্যুত অনেক কারণে সম্ভবপর ব-লিয়া বোধ হয়।

দুর্গসিংহের বহুনাম সম্বন্ধে যে কেবল জনশ্রুতি শুনা যায়, তাহা নহে; তৎসম্বন্ধে ভিন্ন স্থলে দুই একটী প্রমাণও দেখা যায়। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহাত্মা দুর্গসিংহ, ব্যাকরণ শাস্ত্রে দুর্গ, নাটকে ভবভূতি (৩) আগমে নাগভট্ট এবং তর্কশাস্ত্রে কুসুমাঞ্জলি নাম ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন—

ব্যাকরণে ভবেদ্দুর্গো
ভবভূতিশ্চ নাটকে।
আগমে নাগভট্টোঽহং
তর্কেষু কুসুমাঞ্জলিঃ ॥ দুর্গসিংহ। (৪)

(১) বাৎসায়নো মল্লনাগঃ
কৌটিলশ্চণকাত্মজঃ।

দ্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী
বিষ্ণুগুপ্তোঽঙ্গুলশ্চ সঃ ॥
(অভিধানচিন্তামণি—মর্ত্ত্যকাণ্ড)

(২) বান্ধব ৪র্থ খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা ১৫৫ পৃষ্ঠা। ন্যায় শাস্ত্রে পক্ষিলস্বামীর একটী স্বতন্ত্র মত আছে। (ঐ ১৫৪ পৃষ্ঠা)

(৩) আমরা কাসীপ্রবাসী জনৈক সং-স্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট শুনিয়াছি যে দুর্গ-সিংহ এবং ভবভূতি যে অভিন্ন ব্যক্তি ইহা কাশী অঞ্চলের অনেক লোকের মধ্যে জন-শ্রুতি আছে। কতদূর সত্য জানিনা।

(৪) আগমে নাগভট্টোঽহং তর্কেষু কু-

মহামতি অমরসিংহ প্রণীত "নামলিঙ্গানু-শাসন" (অমরকোষ) নামক সুপ্রসিদ্ধ অভিধানের " শ্রীকণ্ঠ " নামক টীকা বিশেষে দুর্গসিংহ এবং অমরসিংহকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তিনি বলেন—"দুর্গসিংহ নামলিঙ্গানুশাসন প্রচা-রান্তে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের দ্বারা "অমর" উপাধি লাভ করেন। বিদ্যা সম্ব-ন্ধীয় কীর্ত্তির প্রভাবেই লোকে অমরত্ব লাভ করে নবরত্নের সেই রত্ন (দুর্গসিংহ) তদ্‌গুণে সুশোভিত ছিলেন :—

" দুর্গসিংহঃ প্রচারান্তে
নামলিঙ্গানুশাসনম্।
লভতে হ্যমরোপাধিং
রাজেন্দ্রবিক্রমেণ চ।
বিদ্যাকীর্ত্তিপ্রভাবে চা—
—হ মরত্বংলভতে নরঃ।
স রত্নো নবরত্নস্য
তদ্‌গুণেন সুশোভিতঃ "। শ্রীকণ্ঠ (৫)

বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী প্রণেতার মতে দুর্গ-সিংহ কাশিকাতে কাশিকেশ নামে পরি-চিত ছিলেন। তিনি বলেন " আলাপেতে কালাপক (আলাপচ্ছলে কলাপ ব্যাকরণ বলিতে পারে যে) দুর্গ সিংহ, যিনি কাশি-কাতে কাশিকেশ; যিনি শেষ অবতারের (কল্কি অবতারের) পূর্ব্বকীর্ত্তি স্বরূপ; তিনিই বৈয়াকরণ রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন :—

আলাপকালাপক দুর্গসিংহঃ
যঃ কাশিকায়ামপি কাশিকেশ।
শেষাবতারঃ শ্রুতপূর্ব্বকীর্ত্তিঃ
স এব বৈয়াকরণো হ ভূপৈতিঃ। "
(বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী)।

সুমাঞ্জলিঃ" পূর্ব্ব বাঙ্গালার পণ্ডিতগণের মধ্যে এই অংশটুকু প্রায় সকলেই জানেন; পূর্ব্বের পাদদ্বয় পূর্ব্ব-বঙ্গে কেহ জানেন না কিন্তু এ শ্লোকটী যে দুর্গসিংহের বিভিন্ন-নাম বিষয়ক তাহা, তাঁহারা জানেন। সংপ্রতি পূর্ব্ব পাদ দ্বয় কাশী অঞ্চলের পণ্ডিতদিগের নিকট পাওয়া গিয়াছে; তাঁহাদের কেহ বলেন এ শ্লোকটী দুর্গ সিংহ স্বপ্রণীত কাতন্ত্রটীকাতে উল্লেখ করিয়া-ছেন। দুর্গসিংহকৃত কাতন্ত্রটীকা অতি বিস্তীর্ণ। সুসম্পূর্ণ ও পরিশুদ্ধ টীকা প্রায় এমন দেখা যায় না। এখন অনেকেই আবশ্যক স্থলের স্থূল স্থূল অংশ লিখিয়া রাখেন। আমরা দুর্গবোধের (দুর্গ সিংহ টীকায়) যে যে অংশ দেখিয়াছি তাহাতে আমাদের চক্ষে ঐ শ্লোকটী পড়ে নাই। কিন্তু দুর্গ সিংহের বিভিন্ন নাম সম্বন্ধে যখন সর্ব্বত্রই কিংবদন্তী শুনা যায় এবং পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটী অংশতঃ ও সম্পূর্ণ রূপে অনেকের নিকট শুনা যায় তখন আমরা শ্লোকটীর আদ্যন্ত সম্বন্ধে অণুমাত্রও সন্দিহান হই না। কেহ বলেন এশ্লোকটী কাতন্ত্র-পরি-শিষ্ট টীকা " গোপীনাথ " নামক গ্রন্থে নিবেশিত আছে। কেহ বলেন শ্লোকটীর আরো কয়েকটী পাদ আছে তাহাতে দুর্গ-সিংহের অমরসিংহ প্রভৃতি আরো কয়েকটী নামের উল্লেখ আছে।

(৫) অমরকোষের প্রায় ৪০।৫০ খানা টীকা আছে; অন্য কোন টীকায় এই শ্লোকটী আছে কিনা জানি না; সমুদায় টীকা একজনে পাঠ করিতে পারে না। এবং কোন টীকা এক স্থানে পাওয়াও যায় না; আমাদের বোধ হয় শ্রীকণ্ঠ অতি প্রাচীন টীকা অন্যথা তিনি অমরসিংহের বিষয় এত পরিজ্ঞাত থাকিতেন না।

এই শ্লোকের "কাশিকা" শব্দকে কেহ কাশী (বারাণশী) এবং কেহ কাশিকা (৬) নামক গ্রন্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

উপরে দুর্গ সিংহের বিভিন্ন মতের যত গুলি নামের উল্লেখ করা হইল তাহার প্রত্যেক নামের সময়াদির সামঞ্জস্য করিয়া যে এই প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিয়া উঠিতে পারি এমত সাধ্য আমাদের নাই; কেননা, নাগভট্ট, কুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি নামে দুর্গসিংহ কি কি গ্রন্থ কোন্ সময়ে প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা আমরা জানি না এবং বহু যত্ন করিয়াও জানিতে পারি নাই।

দুর্গসিংহকে, ভবভূতি এবং অমরসিংহ প্রভৃতি নামে পরিচিত দেখিয়া হয় তো অনেকে বিশেষ বিস্ময়াপন্ন হইবেন এবং অনেকে হাস্য সংবরণ করিতে পারিবেন না——আমরা যে বিস্মিত না হইয়াছি তাহা নহে, কিন্তু দুর্গ সিংহ "ভবভূতি এবং অমর সিংহ প্রভৃতি হইতে অভিন্ন ব্যক্তি" যখন এ সম্বন্ধে ও কোন অকাট্য প্রমাণ পাই নাই তখন উল্লিখিত বিভিন্ন যুক্তির উপর পদাঘাত করিতেও ভীত হই। সুতরাং ন্যায়ের বাধ্য হইয়া আমরা উল্লিখিত বিভিন্ন যুক্তির অনুসরণ করিয়াই মহাত্মা দুর্গ সিংহের সংক্ষিপ্ত জীবনীর কথঞ্চিত আলোচনা করিব।

ভুবন বিখ্যাত নামলিঙ্গানুশাসন প্রণেতা অমরসিংহ (অমরোপাধিক দুর্গসিংহ) মহারাজ হর্ষ-বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতর রত্ন ছিলেন (৭)। উল্লিখিত শ্রীকণ্ঠোদ্ধৃত প্রমাণ দ্বারাও এ কথার সামঞ্জস্য হইতেছে। নবরত্নপ্রতিষ্ঠাতা খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিশ্বসংসারে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন সুতরাং দুর্গসিংহ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে কি পঞ্চম শতাব্দীর পরার্দ্ধে ভারতে অবতীর্ণ হয়েন। কেন না শ্রীকণ্ঠের বচনানুসারে ইহা স্পষ্টতঃ দেখা যায় যে বিক্রমাদিত্য দুর্গসিংহকে অমর উপাধি প্রদান করেন অতএব দুর্গসিংহই যে অমরসিংহের পূর্ব্বের নাম তাহার ভুল নাই; অন্যথা বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক অমরোপাধি প্রদান কালে দুর্গসিংহ যে নামে পরিচিত ছিলেন শ্রীকণ্ঠের সেই নামের পরিচয় দেওয়া স্বভাবসিদ্ধ নহে। এই সকল কারণেই বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে দুর্গসিংহকৃত কাতন্ত্রবৃত্তি ও দুর্গবোধ নামক কাতন্ত্রটীকা, অমরকোষের পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছে; কেননা উপরোক্ত উভয় গ্রন্থ দুর্গসিংহের নামে প্রকাশিত হইয়াছে। যে সময়ে তিনি কাতন্ত্রটীকা বিচরণ করেন তখন তিনি ব্যাকরণ শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ

(৬) পাণিনি সংস্থষ্ঠ "কাশিকা বৃত্তি" নামক গ্রন্থ প্রণেতা জয়াদিত্য বলিয়া বিখ্যাত। দুর্গ সিংহ কৃত অন্য কোন কাশিকা আছে কি না জানি না।

(৭) ধন্বন্তরি ক্ষপনকামরসিংহ শঙ্কু
বেতালভট্টঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥

কাতন্ত্র-জীবনী।

তৃতীয় অধ্যায়।

(ভারতীর দ্বিতীয় ভাগ ১১ সংখ্যা ৫২৮ পৃষ্ঠার পর)

দুর্গসিংহ।

সর্ব্ববর্ম্মা এবং কাত্যায়ণ-প্রণীত সূত্রগুলির অনেক স্থলে অভাব ও ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে, দুর্গসিংহ বিশেষ পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্য সহকারে তাহাতে বক্তব্য-প্রণালীতে অতিরিক্ত সূত্রাবলী, ব্যাবৃত্তি ও অন্যান্য বিষয় সংযোগ করিয়া সম্পূর্ণ রূপে সংশোধন করিয়াছেন। তাঁহার কৃত বৃত্তিগুলি অতি সরল অথচ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। যিনিই দুর্গসিংহের বৈয়াকরণিক সুকৌশল সন্দর্শন করিয়াছেন তিনিই আশ্চর্য্য হইয়াছেন——তিনিই তাঁহাকে ব্যাকরণ-জগতের অপার্থিব দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন। দুর্গসিংহের ন্যায় প্রমাদরহিত সৌভাগ্যশালী বৈয়াকরণ ইদানীং ভারতে আর জন্ম গ্রহণ করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী-প্রণেতা চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য দুর্গসিংহকে "শেষ অবতারের পূর্ব্বকীর্ত্তি স্বরূপ" বর্ণনা করিয়া বাস্তবিকই স্বীয় উদারতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন; এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া দুর্গসিংহকে অতিরঞ্জিত করা হয় নাই। আমাদের বিবেচনায় ভুবনাদ্বিতীয় বৈয়াকরণ কাত্যায়ণ বররুচি পাণিনি ঋষি-কৃত ব্যাকরণের ভ্রম এবং অসম্পূর্ণতা বিদূরিত করিয়া পাণিনি ব্যাকরণকে যেমন একটী জগদ্দুর্লভ অমূল্য রত্নে পরিণত করিয়াছেন, দুর্গসিংহ কাতন্ত্র সম্বন্ধে তদপেক্ষা বড় অকৃতকার্য্য হয়েন নাই। দুর্গসিংহ বৈয়াকরণিক ক্ষমতায় কাত্যায়ণের সমকক্ষতা লাভ না করিতে পারেন কিন্তু কাত্যায়ণের অব্যবহিত নিম্নের আসন দুর্গসিংহ ব্যতীত যে আর কেহ লাভ করিতে পারিবেন না তাহা একরূপ দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে। এখন কথা এই যে দুর্গসিংহ কাতন্ত্রবৃত্তি এবং কাতন্ত্রটীকা বিরচনে পৃথিবীর বিস্ময় ও প্রশংসার স্থল হইয়া রহিয়াছেন। তিনি নিতান্ত অপরিণত বয়সে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে কখনি এতাদৃশ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না, সুতরাং আমরা যদিও ন্যূনকল্পে ৫০।৬০ বৎসর বয়ঃক্রমকাল পর্য্যন্ত দুর্গসিংহের কাতন্ত্রবিরচনে অতিবাহিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করি তবে বোধ হয় নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইব না। অমর উপাধি প্রাপ্ত হইয়া দুর্গসিংহ ৬ষ্ঠ শতাব্দির কোন্ ভাগে বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতর রত্ন ছিলেন তাহা এখনও কেহ ভাল করিয়া ঠিক করিতে পারেন নাই। তিনি খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দির মধ্য ভাগেও যদি বিক্রমাদিত্যের সভায় নিয়োজিত ছিলেন ব-

লিয়া মনে করা যায় তবে তিনি যে খৃীঃ পঞ্চম শতাব্দির পরার্দ্ধ ভাগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

জনৈক বিচক্ষণ প্রাচ্য মহোদয় বিশেষ বিজ্ঞতা সহকারে অনেক তর্ক বিতর্কের পর, ভবভূতিকে অমরসিংহের পূর্ব্বে ও মহাকবি কালিদাসের পরে পঞ্চম খৃীষ্টাব্দে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৮) তাঁহার এই মীমাংসা অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতকে খণ্ডাইয়া অধিক সারবান হইয়াছে। ভবভূতি নাম ধারণ করিয়া দুর্গসিংহ কোন্ সময়ে নাটকাদি প্রণয়ন করেন তাহা অবধারিত করা সহজ ব্যাপার নহে। আমাদের বোধ হয় ভবভূতি নামই তাহার সর্ব্বপ্রথম নাম; কেননা দুর্গসিংহ নাম ধারণ করিয়া তিনি কেবল কাতন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। কথিত আছে কাতন্ত্রের দুর্গম ব্যাখা, দুর্গসিংহের দ্বারা সিংহের ন্যায় সৃষ্ট হইয়া তিনি দুর্গসিংহ নাম লাভ করেন (৯)। কোন কোন টীকাকার দুর্গসিংহ নামের যে রূপ ব্যুৎপত্তির উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও এ কথার পোষকতা করিতেছে (১০) সুতরাং দুর্গসিংহ নাম যে তাঁহার পিতৃ মাতৃদত্ত প্রথম নাম নহে তাহা একরূপ ঠিক হইল। ভবভূতি নামই তাঁহার প্রথম নাম হইবার এই একটী বিশেষ কারণ দেখা যায় যে ব্যাকরণ স্বরূপ তর্কবিজ্ঞানে জড়িত হইলে তাঁহার অন্তরে কাব্যের সুকোমল মনোমোহন মাধুর্য্যতার স্থান পায় না। অভ্যাস করিলে সুকোমল কুসুমকল্পনা, তীব্র কূটকল্পনা মার্গে সহজেই প্রধাবিত হয়। কিন্তু তীব্র কূটানুসন্ধিৎসু বৈয়াকরণিক কল্পনাকে কুসুম-

(৮) বাবু আনন্দরাম বড়ুয়া-কৃত "ভবভূতি" নামক প্রস্তাব দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্রদর্শী উইলসন সাহেব বলেন:—"ভোজপ্রবন্ধ গ্রন্থে ভবভূতির নাম উল্লেখ আছে। তাহাতে লেখা আছে যে ভবভূতি ভোজরাজার একজন সভাসদ ছিলেন। কিন্তু ভোজপ্রবন্ধের লিখিত বিষয় সমুদয় কাল্পনিক বলিয়া বোধ হয় তথাচ ইহা দ্বারা এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে ভবভূতি ভোজপ্রবন্ধ-প্রণেতার পূর্ব্বকালীন লোক। দশরূপক নামক গ্রন্থে মালতীমাধবের নাম স্পষ্ট রূপে উল্লেখ আছে এবং তাহাতে ভবভূতি, মুঞ্জ (ভোজরাজা যাঁহার উত্তরাধিকারী) নামক নৃপতির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, এরূপ লেখা আছে। ইহাতে বোধ হয় ভবভূতি খৃঃ একাদশ শতাব্দির পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। তিনি একাদশ শতাব্দির কতপূর্ব্বে জীবিত ছিলেন তাহাও আমরা নিশ্চয় রূপে নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ। কেননা রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরের ইতিহাসে জানা যায় যে ভবভূতি কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্ম্মা (যিনি খৃীঃ ৭২০ অব্দে রাজত্ব করেন) নামক নৃপতির সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইহাতে বোধ হয় ভবভূতি খৃীঃ অষ্টম শতাব্দির লোক।

উইলসন কৃত "হিন্দু থিয়েটার"

(৯) কাতন্ত্র দুর্গমব্যাখ্যা দুর্গসিংহেন সূরিণা।
সিংহেব সত্বরং সৃষ্টা দুর্গ সিংহো ভবেৎ সচ॥

(১০) দুর্গে বিষমে পদে সিংহেব সিংহঃ (দুর্গ সিংহঃ) কলাপ চন্দ্র ইত্যাদি।

সঙ্কাশ কোমল কাব্যকল্পনায় পরিণত করা অসম্ভব; এ কথায় ভট্টীকাব্য-প্রণেতাই আমাদের প্রধান দৃষ্টান্তের স্থল। যদি দুর্গসিংহ নাম ধারণ করিয়া কাতন্ত্রবৃত্তি ও টীকাপ্রণয়নের পর ভবভূতি নামে নাটকাদি প্রণয়ন করিতেন তবে তাঁহার ভদ্রোচিত হৃদয়গ্রাহী নাটকাবলী ভারতীয় কাব্যের শীর্ষস্থানে স্থান লাভ করিতে পারিত না। তিনি ভুবনবিখ্যাত কবিপদ লাভান্তে ভুবনবিখ্যাত বৈয়াকরণ পদ লাভ করিয়াছেন একথা অসম্ভব নহে। বাস্তবিক তিনি ভবভূতি নামে নাটকাদি প্রণয়নের পরই যে, কাতন্ত্রবৃত্তি ও কাতন্ত্রটীকা প্রণয়ন করিয়াছেন—এই কথাই আমাদের নিকট অধিক সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ যদি তাঁহার ভবভূতি নামের পূর্ব্বে অন্য কোন নাম থাকিত তিনি সে নাম অবশ্য মহাবীরচরিত ও মালতীমাধবের প্রস্তাবনাস্থলে সূত্রধারের মুখে উল্লেখ করিতেন। দুর্গসিংহ যদি জীবনের প্রথম ভাগে ভবভূতি নামে নাটক প্রণয়ন করিয়া পরে দুর্গসিংহ প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে উল্লিখিত প্রাচ্য মহাত্মা যে ভবভূতিকে খৃীষ্টীয় ৫ম শতাব্দির লোক বলিয়াছেন তাহা সর্ব্বাংশে অনুমোদনীয়। কিন্তু তাই বলিয়াই তিনি খৃীষ্টীয় ৫ম শতাব্দির পরার্দ্ধের উপরের লোক নহেন। দুর্গসিংহ এবং ভবভূতি যখন অভিন্ন ব্যক্তি—সুতরাং বৈয়াকরণশ্রেষ্ঠ দুর্গসিংহ খৃীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দির পরার্দ্ধে বিশ্বসংসারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

আমরা উপরের গণনায় যদি পদস্খলিত না হইয়া থাকি তবে সর্ব্ববর্ম্মা কর্ত্তৃক কাতন্ত্রসূত্র বিনির্ম্মিত হওয়ার প্রায় কিঞ্চিদধিক ৪৫০ বৎসর পরে মহাত্মা দুর্গসিংহ কাতন্ত্রের বৃত্তি ও কাতন্ত্রটীকা প্রণয়ন করেন।

আমাদের দুর্গসিংহের নিবাস ও বংশপরিচয়াদি সংগ্রহ করিতে তত কষ্ট হইবে না। ভবভূতি এবং অমরসিংহ যখন দুর্গসিংহের উপনাম মাত্র, তখন তত্তৎ নামের পরিচয়াদি সংগ্রহ করিলেই দুর্গসিংহের পরিচয়াদি সংগ্রহ করা হইল।

ভবভূতি (দুর্গসিংহ) তৎপ্রণীত 'মালতীমাধব' নামক সুপ্রসিদ্ধ নাটকের প্রস্তাবনাতে সূত্রধারের মুখে এইরূপ নিজ পরিচয় দিয়াছেন;—দক্ষিণদেশে বিদর্ভের অন্তর্গত পদ্মনগর নামে এক নগর আছে। যেখানে মহোৎসবের অগ্রগামী, পঞ্চ অগ্নির রক্ষাকর্ত্তা ধৃতব্রত, সোমরসপায়ী ব্রহ্মবাদী, চরণগুরুদিগের মতাবলম্বী, বেদের তৈত্তিরীয় অংশের উপাসক (প্রভৃতিগুণবিশিষ্ট) কাশ্যপ বংশীয় ব্রাহ্মণেরা বাস করিতেন। এই পরিবারের মধ্যে গোপালভট্ট (১১) নামক এক জন বিখ্যাত লোকের পৌত্র, এবং পবিত্রকীর্ত্তি নীলকণ্ঠের পুত্র, শ্রীকণ্ঠোপাধিরঞ্জিত ভবভূতি ছিলেন। ইহাঁর মাতার নাম জাতুকর্ণী। এই কবির নাটকা-

১১ ভবভূতির (দুর্গসিংহের) অপর নাম "নাগভট্টের" সহিত তাঁহার পিতামহের নামের সাদৃশ্য আছে।

ভিনেতৃবর্গের সহিত আজীবন সৌহার্দ্দ ছিল। (১২)

কেহ বলেন "প্রাচীন কালে বিদর্ভদেশ ভাল ভাল পণ্ডিতদিগের জন্য বিখ্যাত ছিল। ভবভূতি তদ্দেশীয় একজন অত্যুৎকৃষ্ট পণ্ডিতের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়া ছিলেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় সমুদায় শাখাই অধ্যয়ন করিতে আলস্য প্রকাশ করেন নাই। তিনি অতি আশ্চর্য্য স্মরণ শক্তি ও সাহিত্য বিষয়ক অগাধ বিদ্যোপার্জ্জন জন্য শ্রীকণ্ঠ (Minarva throated) উপাধি পাইয়াছিলেন। যতদূর জানা যায়, তাহাতে বোধ হয় এ উপাধি ভারতবর্ষীয় অন্য কোন পণ্ডিত প্রাপ্ত হন নাই। এ উপাধি লাভের পর ভবভূতি উজ্জয়িনীর রাজসভায় পণ্ডিতসমাজে গৃহীত হইয়া ছিলেন। তথায় মহাকাল দেবতার নিকট তাঁহার নাটক কএক খানির অভিনয় হইয়াছিল। (১৩)

কেহ ভব ভূতির নিবাস বিদর্ভকে আধুনিক বেরার রাজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ১৪ কিন্তু ভোজ প্রবন্ধের লিখনানুসারে ভবভূতিকে বারাণসীনিবাসী বলিয়া বোধ হয় (১৫)। ভোজপ্রবন্ধপ্রণেতার বল্লালের কালাদি সম্বন্ধে ভ্রম দৃষ্ট হইলেও যে আধুনিক লিখকগণ অপেক্ষা দেশাদির প্রাচীন নাম অধিক পরিজ্ঞাত ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। বিশেষতঃ তিনি যে মালতীমাধব এবং মহাবীরচরিতের প্রস্তাবনাতে ভবভূতির নিবাস বিদর্ভের কথা পাঠ করেন নাই ইহাও সম্ভাব্য নহে। সুতরাং তিনিই যখন ভবভূতিকে বারাণসী দেশাগত বলিয়া গিয়াছেন তখন আমাদের বোধ হয় যে ভবভূতির নিবাস বিদর্ভ এবং পদ্মনগর বারাণসী অঞ্চলের কোন স্থান। কাহারও নিকট শুনা যায় ভুর্গসিংহ বারাণসীনিবাসী ছিলেন। বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীর "কাশিকা" যে বারাণসী নহে তাহাও একেবারে অস্বীকার করিবার যো নাই। ভুর্গসিংহ এবং ভবভূতি যখন অভিন্ন ব্যক্তি এবং তাঁহার উভয় অবতারের নিবাসভূমিই যখন বারাণসী বলিয়া আভাস পাওয়া যায় তখন ভোজপ্রবন্ধের প্রমাণকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না, তবে ভুর্গসিংহ বারাণসী নিবাসী না হইয়া প্রবাসীও হইতে পারেন।

ভুর্গসিংহ, ভবভূতিজীবনে নাটকাদি প্রণয়নকালে যেমন আত্মপ্রশংসাস্পর্দ্ধী ছিলেন ১৬ ভুর্গসিংহ নাম ধারণ করিয়াও সেইরূপ আস্পর্দ্ধা করিতে ত্রুটী করেন নাই। ইহা তাঁহার ন্যায় দেবতুল্য ব্যক্তির পক্ষে অতিরঞ্জিত না হইলেও তিনি যে আত্মগর্ব্বরূপ কলঙ্কে কলঙ্কিত তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমাদের তাঁহার জীবনের বিভিন্ন ভাগে, শুভ্র বসনে মসীবিন্দুবৎ একটী ক্ষুদ্র চিহ্ন অঙ্কিত দেখিয়া ভুর্গসিংহ এবং ভবভূতি যে অভিন্ন ব্যক্তি তৎসম্বন্ধে আরো প্রত্যয় জন্মিতেছে। ভুর্গসিংহ তদীয় কাতন্ত্র টীকায় একস্থলে সগর্ব্বে বলিয়াছেন—কুশাগ্রের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ জ্ঞান বিশিষ্ট আমি এবং ভাষ্যকার যখন শব্দরূপ সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিতে পারিলাম না; তখন অন্য জড়বুদ্ধিগণ কে ১৭ অর্থাৎ ভুর্গসিংহ, তাঁহার নিজের এবং ভাষ্যকারের নিকট পৃথিবীস্থ সকল লোককেই জড়বুদ্ধি বলিয়া জ্ঞান করিতেন !!! তাহার নির্দ্দেশিত ভাষ্যকার কে ? জানি না। বোধ হয় পাণিনি ব্যাকরণের মহাভাষ্যরচয়িতা পতঞ্জলি কি বেদভাষ্যকার শঙ্করদেব হইবেন।

ভুর্গসিংহ সম্বন্ধে আর একটী কিংবদন্তী এই—একদা বরাহমিহির প্রভৃতি বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিতদের বিপক্ষে, ভুর্গসিংহ একাকী কোন বিষয় লইয়া তুমুল তর্কবিতর্ক করেন। অবশেষে ভুর্গসিংহ বিচারে সকলকে পরাস্ত করিয়া সভাস্থ সভ্যমণ্ডলীর নিকট সগর্ব্বে বলিয়া উঠেন "বাহু উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছি, আমি ভুর্গসিংহ বাদী হইলে মহেশ্বরও এক অক্ষর জানেন না ১৮।

ভুর্গসিংহের মুখ হইতে এই বাক্য বাহির হওয়া মাত্র তাহার বাহু ঊর্দ্ধমুখী হইয়া রহিল, ইহা শঙ্করের কোপের কারণ জানিয়া তদীয় ক্রোধ শান্তির জন্য ভুর্গসিংহ তন্মুহূর্ত্তে এক অলোকসামান্য স্তব দ্বারা শঙ্করকে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। শঙ্কর তখন তৎসমীপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার বাহু নামাইয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভুর্গসিংহ! বিদ্যাসম্বন্ধে আমি তোমার

---

১২ অস্তি দক্ষিণাপথে বিদর্ভেষু পদ্মা নগরং নাম নগরং। তত্র কেচিত্তৈত্তিরীয়িণঃ কাশ্যপাশ্চরণগুরবঃ পংক্তিপাবনাঃ পঞ্চাগ্নয়ো ধৃতব্রতাঃ সোমপীথিনো ব্রাহ্মণা ব্রহ্ম বাদিনঃ প্রতিবসন্তিস্ম। * * * তদামুষ্যায়ণস্য তত্রভবতঃ সুগৃহীতনাম্নো ভট্টগোপালস্য পৌত্রঃ পবিত্রকীর্ত্তের্নীলকণ্ঠ স্যাত্মসম্ভবো ভট্টঃ শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছনো ভবভূমি নামা জাতুকর্ণীপুত্রঃ কবিনিসর্গসৌহৃদেন ভরতেষু স্বকৃতিমেবংপ্রায়গুণভূয়সী মস্মাকং অর্পিতবান্ যত্র খলিয়ং বাচোযুক্তিঃ (মালতী মাধব প্রস্তাবনা)

১৩ বাবু আনন্দ রাম বড়ুয়া কৃত 'ভবভূতি" নামক প্রস্তাব ২৮ পৃষ্ঠা ও তৎ সম্পাদিত বীরচরিতের ভূমিকা।

১৪ "তিনি বিদর্ভের (বেরারের) অন্তর্গত পদ্মপুর নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন।" বড়ুয়াকৃত 'ভবভূতি' এবং বাবু রাজকৃষ্ণ রায় অনুবাদিত "রামায়ণ" অযোধ্যাকাণ্ড, ২৪০ পৃষ্ঠা।

১৫ ততঃ কদাচিৎ সিংহাসনমলঙ্কুর্ব্বাণে শ্রীভোজে দ্বারপাল আগত্য প্রাহ, দেব! বারাণসী দেশাদাগতঃ কোঽপি ভবভূতি নাম কবিঃ দ্বারি তিষ্ঠতীতি। রাজা প্রাহ, প্রবেশয়েতি, তত প্রবিষ্টঃ সোঽপি সভামগাৎ। "ভোজ প্রবন্ধ" ৮৭ পৃষ্ঠা। সংবাদ জ্ঞানাকর যন্ত্রে মুদ্রিত)

১৬ যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং,
জানান্ত তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা,
কালোঽয়ং নিরবধি র্বিপুলাচ পৃথ্বী ॥
(মালতী মাধব)

১৭ অহঞ্চ ভাষ্যকারশ্চ কুশাগ্রীয়ধিয়াবুভৌ।
নৈব শব্দাম্বুধেঃ পারং কিমন্যে জড়বুদ্ধয়ঃ।
(ভুর্গসিংহকৃত কাতন্ত্রটীকা)

১৮ উদ্ধৃত্য বাহু পরিরারটীমি
যস্যাস্তি শক্তিঃ সতু বাবদীতু।
ময়ি স্থিতে বাদিনি ভুর্গসিংহে
নৈকাক্ষরং বেত্তি মহেশ্বরোপি।

নিকট একটী অক্ষরও জানি না, ইহা সত্য কিন্তু তাই বলিয়াই সভাস্থ ব্যক্তিদের নিকট আমাকে অপমানিত করা তোমার উচিত হয় নাই।"

দুর্গসিংহকে লোকসমাজে অলৌকিক বিদ্বান প্রতিপন্ন করিবার জন্যই যে উল্লিখিত কিংবদন্তীটি বিনির্ম্মিত হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ।

বোধ হয় বোপদেব গোস্বামীও দুর্গসিংহ এবং অমরসিংহকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া জানিতেন। তিনি কবিকল্পদ্রুম নামক ধাতুপাঠে আটজন শাব্দিকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

ইন্দ্রশ্চন্দ্রকাশকৃৎস্না।
পিশলী শাকটায়নঃ।
পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রা
জয়ন্ত্যষ্টাদি শাব্দিকাঃ।
(বোপদেবকৃত কবিকল্পদ্রুম।

আমরা এই শ্লোকোক্ত যে ৫। ৬ জন মহাত্মাকে চিনিতে পারিলাম তাঁহারা সকলেই বৈয়াকরণ; তাঁহাদের কোষাদি গ্রন্থ নাই। বোধ হয় এস্থলে "শাব্দিক" অর্থে কেবল বৈয়াকরণগণকেই বুঝাইবে। যদি দুর্গসিংহ এবং অমরসিংহকে বোপদেব অভিন্ন ব্যক্তি না জানিতেন তবে তিনি অমর নাম কখনি এ শ্লোকে বিনিবেশিত করিতেন না, কেননা দুর্গসিংহ অমরসিংহ নাম ধারণ করিয়া কোন ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন নাই। সুতরাং এস্থলে দুর্গসিংহ অর্থেই যে দুর্গ সিংহের উপনাম অমর শব্দকে স্থান দেওয়া হইয়াছে, ইহা আমাদের বিশেষ উপলব্ধি হইতেছে।

শব্দকল্পদ্রুমীয় পরিশিষ্টের অমর শব্দে লিখিত আছে, "তিনি (অমরসিংহ) কাহারও কাহারও মতে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী।" আমরাও এইরূপ একটী অমূলক কিংবদন্তী জানি। অনেকে বলিয়া থাকেন যে অমরসিংহ তৎপ্রণীত নামলিঙ্গানুশাসনে সমুদয় দেবতার শীর্ষস্থানে বুদ্ধদেবের নামাবলী নিবেশিত করিয়াছেন সুতরাং অমরসিংহ বুদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। বোধ হয় শব্দকল্পদ্রুমও ঐ জনশ্রুতির অনুসরণ করিয়াছেন কিন্তু আমরা এ কথায় সায় দিতে পারিলাম না; কেননা অমরসিংহ বুদ্ধমতাবলম্বী হইলে তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগে হিন্দু-বলিয়া পরিচয় দিতেন না (১৯)।

কেহ আপত্তি করিতে পারেন দুর্গসিংহ যদি বাস্তবিকই অমরসিংহ হয়েন তবে নামলিঙ্গানুশাসনের লিঙ্গাদিসংগ্রহ বর্গে অমরোপাধিক দুর্গসিংহ কাতন্ত্রসম্মত প্রত্যয়াদি ব্যবহার না করিয়া কেন পাণিনিঅনুযায়ী প্রত্যয়াদি ব্যবহার করিয়াছেন? একথায় বোধ হয় এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে দুর্গসিংহ কাতন্ত্রে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে, কাতন্ত্র সমাজে তাদৃশ আদৃত হইয়া ছিল না। দুর্গসিংহই কাতন্ত্রে অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি দোষ বিদূরিত

(১৯) তিনি কাতন্ত্রের সর্ব্বপ্রথম শ্লোকেই মহাদেবকে প্রণাম করিয়াছেন। মালতীমাধবের প্রস্তাবনায়ও একরূপ হিন্দু বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন।

করিয়া কাতন্ত্রের সম্মান বৃদ্ধি করেন। এক খানি গ্রন্থ ৫০।৬০ বৎসরের ন্যূনে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ ও সর্ব্ববাদীসম্মত হইতে পারে না সুতরাং দুর্গসিংহের অমর উপাধি লাভের সমকালে যে কাতন্ত্রের নাম সকলে জানিত বোধ হয় না। কিন্তু তখন পাণিনি ঋষি প্রণীত ব্যাকরণ বিদ্যার্থীগণ সকলেই পাঠ করিতেন এবং পাণিনিসম্মত বৈয়াকরণিক নিয়ম ভারতে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল—পাণিনিঅনুযায়ী প্রত্যয়াদি প্রয়োগ করিলে সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবে—দুর্গসিংহ, পাঠকদিগের সৌকর্য্যার্থেই যে নামলিঙ্গানুশাসনে পাণিনিসম্মত প্রত্যয়াদি ব্যবহার করিয়াছেন তাহার ভুল নাই। সুতরাং এই এক মাত্র কারণেই দুর্গসিংহ এবং অমরসিংহ অভিন্ন ব্যক্তি নন, একথা বিশ্বাস করা যায় না।

দুর্গসিংহ নিজ নামে এবং ভবভূতি ও অমরসিংহ নাম ধারণ করিয়া কি কি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন বোধ হয় তাহা অনেকেই জানেন। তিনি দুর্গসিংহ নামে কাতন্ত্র বৃত্তি ও "দুর্গবোধ" নামক কাতন্ত্র টীকা, ভবভূতি নামে—উত্তররামচরিত—মহাবীরচরিত ও মালতী-মাধব এই নাটকত্রয়, এবং অমরসিংহ নামে সুপ্রসিদ্ধ নামলিঙ্গানুশাসন (অমরকোষ) প্রণয়ন করেন। গুণরত্ন নামক একটী ক্ষুদ্র কবিতাপ্রবন্ধ ভবভূতিকৃত বলিয়া বিখ্যাত। অনেকে বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীর লিখনভঙ্গীতে "কাশিকা বৃত্তি" নামক পাণিনি সহযোগী গ্রন্থকে দুর্গসিংহ (কাশিকেশ) কৃত বলিয়া মনে করিতে পারেন—বাস্তবিক তাহা নহে। কাশিকাবৃত্তিপ্রণেতা জয়াদিত্য বলিয়া বিখ্যাত। তর্কশাস্ত্রে কুসুমাঞ্জলি ও আগমে নাগভট্ট * নাম গ্রহণ করিয়া দুর্গসিংহ কি কি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন জানি না। কেহ বলেন সুপ্রসিদ্ধ উদয়নাচার্য্যের কুসুমাঞ্জলি ব্যতীত তর্কশাস্ত্রে আরও ২। ৩ মতের কুসুমাঞ্জলি আছে; উহার মধ্যে দুর্গসিংহেরও একখানা কুসুমাঞ্জলি আছে। আবার কেহ বলেন ন্যায়শাস্ত্রে দুর্গসিংহের (কুসুমাঞ্জলির) একটী স্বতন্ত্র মত আছে। কিন্তু দুর্গসিংহকৃত কোন কুসুমাঞ্জলির সহিত কিম্বা কুসুমাঞ্জলি (দুর্গসিংহ) কৃত কোন ন্যায়গ্রন্থের সহিত আমাদের এ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ হয় নাই এবং তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কেহ কৈয়টের (কৈয়ট) টীকাপ্রণেতা নাগোজীভট্টকে দুর্গসিংহ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারেন, কেননা দুর্গসিংহের অপর নাম নাগভট্ট; কিন্তু এ কল্পনা আমাদের নিকট তত সমীচীন বোধ হয় না; কারণ নাগোজী ভট্ট, ভট্টোজীদীক্ষিত প্রভৃতি নামকে আধুনিক হিন্দুস্থানী লোকের নাম বলিয়া জ্ঞান হয়। কৈয়টটীকাপ্রণেতাকে দুর্গসিংহের অনেক পরকীয় লোক বলিয়া

* কেহ নিরুক্তব্যাখ্যাপ্রণেতা দুর্গাচার্য্যকেও আচার্য্য দুর্গসিংহ বলিয়া অনুমান করেন আমরা একথার মূল জানি না; কিন্তু নিরুক্তকে আগমের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে।

বোধ হয়। আশা করি কোন বহুদর্শী পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত দুর্গসিংহের অপর নাম নাগভট্ট এবং কুসুমাঞ্জলি সম্বন্ধে সত্য আবিস্কার এবং দুর্গসিংহ জীবনের ঐ অংশ দ্বয়ের প্রগাঢ় তিমিরে একটী দীপ প্রজ্বলন করিয়া দিবেন।

যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা নামক সেতার শিক্ষা বিধায়ক গ্রন্থের একটী স্থল দেখিয়া বোধ হয় যে দুর্গসিংহ কৃত "কালাপীয় পরিশিষ্ট" নামক একখানি গ্রন্থ আছে। যন্ত্রক্ষেত্র-দীপিকায় দুর্গসিংহকৃত একটী অতিরিক্ত সূত্র উদ্ধৃত করিয়া, উহা দুর্গসিংহ-কৃত কালাপীয় পরিশিষ্ট হইতে উদ্ধৃত বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে (২০)। আমরা যত-দূর জানি তাহাতে এ কথাটী সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না, কেননা শ্রীপতিদত্ত কৃত "কাতন্ত্র পরিশিষ্ট" ব্যতীত যে দুর্গ সিংহ কৃত পরিশিষ্ট আছে তাহা এই নূতন শুনিলাম। দুর্গসিংহ কাতন্ত্রকে কোথাও "কলাপ" বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। উক্ত গ্রন্থে যে সূত্রটী উদ্ধৃত হই-য়াছে উহা দুর্গসিংহকৃত কাতন্ত্রটীকাতে অতিরিক্ত সূত্র রূপে বিনিবেশিত আছে।

(২০) "হ্রস্বাদ্বাদৌতদ্ধিতে নায়ঃ। হ্রস্বাৎ পরস্য সস্য ত্বাদৌ তদ্ধিতে নাল্লো বিহিতঃ সঃ যো ভবতি। বপুস্ ছিল ত্বং বপুষ্টং ইত্যাদি। হ্রস্বাদিতি কিং গীস্ত্বং ইত্যাদি। ইতি দুর্গসিংহকৃত কালাপীয় পরিশিষ্টে।"

রাজ শ্রী শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রণীত "যন্ত্রক্ষেত্র দীপিকা" ১৭৯ পৃষ্ঠার টীকা।

বোধ হয়, যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা-প্রণেতা ঐ সূত্রটী কাতন্ত্রের অতিরিক্ত সূত্র জানিয়াই কালাপী পরিশিষ্টোদ্ধৃত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বাস্তবিক দুর্গসিংহ-কৃত যদি স্বতন্ত্র কালাপীয় পরিশিষ্ট থাকিত তবে তাহা কলাপব্যবসায়ীগণ অবশ্য জানি-তেন এবং অন্যান্য টীকাকারগণও উল্লেখ করিতেন।

শুনা যায় দুর্গ সিংহ জ্যোতিষ শাস্ত্রেও এক জন অসামান্য পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার কৃত জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থাদিও আছে কিন্তু এ সম্বন্ধেও কোন ভাল প্রমাণ জানা যায় নাই। (২১)

দুর্গ সিংহের ন্যায় নানা শাস্ত্রে অলোক সামান্য পণ্ডিত সর্ব্ব বিষয়ে জগৎ বিখ্যাত এবং অতুলসৌভাগ্যশালী গ্রন্থকার এ

(২১) পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত "গণিত ও জ্যোতিষ বিদ্যার আবিস্কার কাল" শীর্ষক প্রস্তাবের একস্থলে লিখিত আছে:— * * * আর্য্যভয় অবশ্যই আর্য্যভট্ট। প্রধান পুরা-তন জ্যোতির্বেত্তা ব্রহ্মগুপ্ত ৫৫০ শকে এবং বরাহ মিহির ৫২৭ শকে জীবিত। ইহাদের পূর্ব্বকালিক বিষ্ণুচন্দ্র, ত্রাসেন, দুর্গ সিংহ। ইঁহারা সকলেই স্ব স্ব গ্রন্থে আর্য্যভট্টের নাম উল্লেখ করাতে প্রমাণ হইতেছে যে আর্য্যভট্ট চতুর্দ্দশ শত বৎ-সরেরও পূর্ব্বের লোক। (ভারতী দ্বিতীয় ভাগ, ২৮৩ পৃষ্ঠার টীকা) দুর্গ সিংহ যে বরাহ মিহিরের পূর্ব্বের লোক তাহার প্রমাণ কি? তাহার কৃত (দুর্গসিংহের) ব্যাকরণ সম্ব-ন্ধীয় গ্রন্থে কি জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় গ্রন্থে আর্য্য ভট্টের নাম উল্লেখ আছে?

জঘন্য যুগে ভারতে আর কেহ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ কিন্তু এই দেব-তুল্য মহোদয়কেও কোন কোন শফরী-প্রকৃতি লোক নিন্দা করিতে ত্রুটী করেন নাই। হলায়ুধ নামক লক্ষ্মণসেনের জনৈক প্রিয় মন্ত্রী কাতন্ত্রগণের (ধাতুপাঠের) এক খানা টীকা প্রণয়ন করেন। তিনি ঐ গণ-টীকার এক স্থলে দুর্গসিংহ, সর্ব্ববর্ম্মা এবং কাতন্ত্রের প্রায় সকল টীকাকারকেই নিন্দা করিয়াছেন। দুর্গসিংহ সম্বন্ধে বলি-য়াছেন "আচার্য্য দুর্গসিংহ সততই প্রলাপ বাক্য বলিয়াছেন (২২)।" হলায়ুধের ন্যায় একজন প্রসিদ্ধ মহাত্মাও যে নীচ প্রবৃত্তির আয়ত্ত হইতে অব্যাহতি পাই-লেন না ইহা অতীব আশ্চর্য্য। আমরা জানি যে হলায়ুধ সংস্কৃত সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত ও তিনি একজন সুপণ্ডিত— বলিতে পারি না কেন তাঁহার এবম্প্রকার মতিচ্ছন্ন হইয়া ছিল। তবে কথা এই তিনি আজীবনই প্রায় গৌড়াধিপতি লক্ষণ-সেনের অতি প্রিয় পাত্র মন্ত্রী ছিলেন ব-লিয়া লোকসমাজে অতিশয় সম্মানিত ছিলেন। লোকে তাঁহাকে প্রায় দেব-তাবৎ জ্ঞান করিত (২৩)। বোধ হয় এই জন্যই তিনি আপনাকে হিমালয় হইতেও উচ্চতর জ্ঞান করিতেন, পৃথি-বীর অন্যান্য সকল লোকই তাঁহার নিকট তুচ্ছ ছিল সুতরাং তিনি দুর্গসিংহ প্রভৃ-তিকে যে অপদার্থ জ্ঞান করিবেন তাহা ও বিস্ময়কর নহে। কিন্তু তাই বলিয়াই তাঁহার কথাকে বেদবাক্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। আমাদের বিবেচনায় মহাসাগরের সহিত যেমন চঞ্চলপ্রকৃতি ক্ষুদ্র স্রোতঃস্বতীর তুলনা হইতে পারে না, সেইরূপ বিদ্যা বিষয়ে দুর্গসিংহের সহিতও হলায়ুধের তুলনা হইতে পারে না। এমন কি হলায়ুধ কাতন্ত্র সম্বন্ধীয় যে যে গ্রন্থকা-রকে উপহাস করিয়াছেন তাঁহারা কেহও তাঁহা অপেক্ষা বিদ্যা বুদ্ধিতে বড় নিকৃষ্ট হইবেন না। সুতরাং হলায়ুধ তাঁহাদিগকে অযথা নিন্দা করিয়া কেবল জনসমাজে আপনাকেই হাস্যাস্পদ ও পরনিন্দারূপ দোষে কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

কাহারও কাহারও মতে কাতন্ত্রপরিশিষ্ট-প্রণেতা শ্রীপতিদত্ত "গুরু দ্বারা যদুক্ত হই-য়াছে" (গুরুণা যদুক্তং) ইত্যাদি বচন দ্বারা দুর্গসিংহের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি কোন্ স্থলে একথা বলিয়াছেন তাহা আমরা এপর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া না পা-ইলেও একথায় সর্ব্বাংশে সন্দিহান হইতে পারি; কেন না তাঁহার লিখাতে এমন কোন প্রমাণ পাই নাই যদ্দ্বারা তাঁহাকে দুর্গসিংহের সমসাময়িক লোক বলিয়া স্বীকার করা যায়। প্রত্যুত তিনি মাঘ, ভারবি প্রভৃতি দুর্গসিংহের পরবর্ত্তীয় মহাত্মা

(২২) আচার্য্যো দুর্গসিংহঃ প্রলপতি সততং বুদ্ধিহীনস্ত্রিনেত্রঃ।
(হলায়ুধ)।

(২৩) গুরোর্ব্বচঃ সত্যমসত্যমন্যদ্
গঙ্গাজলং পেয়মপেয়মন্যৎ।
শম্ভোঃ পদং সেব্যমসেব্যমন্যৎ
হলায়ুধঃ পাত্রমপাত্রমন্যৎ।

গণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল কারণে আমাদের শ্রীপতিদত্তকে দুর্গসিংহের শিষ্য বলিয়া প্রত্যয় জন্মিতেছে না।

কেহ কেহ বলেন বিশ্বেশ্বর বা বিল্লেশ্বর নামক কাতন্ত্রটীকাকার দুর্গসিংহের পুত্র ছিলেন এবং বিদ্যাসাগর নামক টীকাকারও দুর্গসিংহের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু এসম্বন্ধে আমরা কোন ভাল প্রমাণ পাই নাই।

কেহ আবার কাতন্ত্রপঞ্জিকা-প্রণেতা ত্রিলোচনদাসকেও দুর্গসিংহের শিষ্য বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন ত্রিলোচন দুর্গসিংহের শিষ্য ছিলেন বলিয়াই তাহার টীকা দুর্গসিংহের বৃত্তির উপর উদ্ধৃত করিবার রীতি নাই, কেন না তাহাতে দুর্গসিংহকে অপমান করা হয়। আমাদের নিকট এযুক্তি নিতান্তই কাল্পনিক ও অমূলক বলিয়া বোধ হয়। ত্রিলোচন তাঁহার গ্রন্থে দুর্গসিংহ অপেক্ষা অনেক আধুনিক কাদম্বরী (বাণভট্ট কৃত) জয়দেব প্রভৃতির নামও উল্লেখ করিয়াছেন ২৪। জয়দেব চৈতন্যের প্রধান শিষ্য সনাতন গোস্বামীর মতে বঙ্গাধিপতি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক (অর্থাৎ ১১০১ হইতে ১১২১ খীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের সভামণ্ডপের দ্বারদেশে যে শ্লোকটী খোদিত ছিল তাহাতেও একথার সামঞ্জস্য হইতেছে ২৫। কোন ইতিহাসবেত্তা জয়দেবকে খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দির লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (২৬)। সুতরাং দুর্গসিংহ অপেক্ষা ত্রিলোচন দাস প্রায় ৬৫০ কি ৭০০ বৎসরেরও পরকীয়

(২৪) গ্রন্থারম্ভে বিঘ্নশান্তি জন্য দেবতাগণকে নমস্কার করা সম্বন্ধে বলিয়াছেন " তথাহি কাদম্বর্য্যাদৌ সকল দেবতা নমস্কার সম্ভবেপ্যভিপ্রেতস্যাসিদ্ধিরুপলভ্যতে। ক্বচিত্তু শিশুপালবধাদৌ নমস্কারমন্তরেণাপি সাধ্যসিদ্ধিরুপলব্ধেতি"।

(ত্রিলোচন)

ত্রিলোচন অন্য স্থলে কাতন্ত্র শব্দ ব্যাখ্যা উপলক্ষে জয়দেবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন ঃ——" তেন হি সূত্রব্যাখ্যায়তে নম্বীবত্তন্ত্রং জয়দেবাদিপ্রোক্তমস্তীতি আহ সার্ব্ববর্ম্মিক মিতি "।

(ত্রিলোচন দাস)

(২৫) আবুল ফজেলের মতে, লক্ষ্মণসেন খ্রীঃ ১১১৬ অব্দে বাঙ্গালার রাজা ছিলে। জয়দেবচরিতপ্রণেতা আবুল ফজেলের কথায় সন্তুষ্ট না হইয়া অনেক তর্ক বিতর্কের পর খ্রীঃ ১১২১ অব্দকে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের চরম সীমা বলিয়া অনুমান করেন ("জয়দেব চরিত" ৮ পৃষ্ঠা)। কোন কোন পুরাতত্বসন্ধায়ীও আবুলফজেলের মতে সন্তুষ্ট না হইয়া ১১০১ হইতে ১১২১ খীষ্টাব্দ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (Journ. A. S. B. Part I. No 111. P. 139.

লক্ষ্মণসেনের সভামণ্ডপের দ্বারস্থ প্রস্তর-ফলক-খোদিত শ্লোকটীতে জানা যায় জয়দেব উক্ত রাজার পঞ্চরত্ন সভায় অন্যতম রত্ন ছিলেন। শ্লোকটী এইঃ——

গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ॥"

(২৬) Hon. Montstuart Elphinstion's "History of India" Book III. chap: VI. P, 17.

লোক। এই সকল কারণেই আমরা ত্রিলোচন দুর্গসিংহের শিষ্য একথা একটুকু বিশ্বাস করিতে পারি না।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি—এতদ্দেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের মধ্যে একটি অস্বাভাবিক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে সর্ব্ববর্ম্মা ও বোপদেব ভিন্ন ব্যক্তি। এ কথাটী যে নিতান্ত অমূলক তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। অনেকে ইহাও বলিয়া থাকেন যে "দুর্গসিংহ ও বোপদেব অভিন্ন ব্যক্তি"। দুর্গসিংহ বৃদ্ধ বয়সে যখন বাণপ্রস্থ ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া তপস্যা উপার্জ্জন জন্য অরণ্যে গমন করেন তখন তাঁহার কতিপয় শিষ্য তাঁহাকে বলিলেন "প্রভো! আপনি যে কলাপ ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা অতি বিস্তীর্ণ সুতরাং লোকের হিতের জন্য সংক্ষিপ্ত করিয়া একখানি ব্যাকরণ প্রস্তুত করুন; দুর্গসিংহ তাঁহাদের বাক্যে সম্মত হইলেন এবং বোপদেব নাম গ্রহণ করিয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রণয়ন করিলেন। দুর্গসিংহ সেই সময়ে সতত ঈশ্বরের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন বলিয়া মুগ্ধবোধের উদাহরণ-স্থলে ঈশ্বরের নামাবলী প্রয়োগ করিয়াছেন। আমরা আর এই অমূলক কিংবদন্তীটী লইয়া অধিক আন্দোলন করিতে ইচ্ছা করি না। সর্ব্ববর্ম্মার জীবনীতে যে যে যুক্তির বলে ইহার অমূলকত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছি অধুনাও আমাদের প্রায় তাহাই বক্তব্য। বোধ হয় এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দুর্গসিংহ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দির পরার্দ্ধে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বোপদেব তাঁহাপেক্ষা প্রায় ৭০০।৮০০ বৎসরের পরকীয় লোক। সুতরাং দুর্গসিংহ ও বোপদেব কখনি অভিন্ন লোক নহেন।

সুপ্রসিদ্ধ দণ্ডীকে, ভোজপ্রবন্ধের লিখানুসারে ভোজরাজের সভাতে আসীন দেখিয়া অনেকে দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের লোক বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন (২৭) এবং অনেকের বিশ্বাস দণ্ডী নিতান্ত আধুনিক লোক। কিন্তু আমরা দুর্গসিংহের জীবনীর সংস্রবে দণ্ডীর আবির্ভাব সময়ের একটি চরম সীমা পাইয়াছি। দুর্গসিংহ কাতন্ত্রের বৃহৎ বৃত্তির তৃতীয় পাদের একটি সূত্রের উদাহরণে দণ্ডীকৃত কাব্যাদর্শের একটী শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন (২৮) ঐ শ্লোকটী কাব্যাদর্শের প্রথম পৃষ্ঠাতেই সুস্পষ্ট রূপে উল্লেখ আছে (২৯)। ইহাতে বোধ হয় দণ্ডী খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দির পূর্ব্বের লোক। কিন্তু পঞ্চম শতাব্দির কত পূর্ব্বের লোক তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজ কথা নহে। কাল্পনিক ভোজপ্রবন্ধের কথার উপর বিশ্বাস করিয়া অনেকেই বিষম ভ্রমে

(২৭) " জ্ঞানাঙ্কুর " প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

(২৮) কাত্যায়ণ সূত্রঃ—দুহঃ কোষশ্চ। দুর্গসিংহ বৃত্তিঃ—কর্ম্মণ্যুপপদে দুহঃ কো ভবতি ঘশ্চান্ত্যাদেশঃ ব্রহ্মদুঘা গৌঃ। " গৌর্গৌঃ কামদুঘা সম্যক্ প্রযুক্তা স্ম-র্য্যতে বুধৈঃ।

(২৯) গৌর্গৌঃ কামদুঘা সম্যক প্রযুক্তা স্মর্য্যতে বুধৈঃ। দুষ্প্রযুক্তা পুন গোঁত্বং প্রযোক্তুঃ সেব শংসতি।

(আচার্য্য দণ্ডীকৃত "কাব্যাদর্শ" ১ পৃষ্ঠা)।

পতিত হইয়া থাকেন। ভোজপ্রবন্ধের ঐতিহাসিক সত্যের উপর লক্ষ্য করা নিরবচ্ছিন্ন অহম্মুখতার পরিচায়ক।

আমরা এই স্থলে বৈয়াকরণশ্রেষ্ঠ দুর্গসিংহের জীবনী পরিসমাপ্তি করিলাম নানা শাস্ত্রবিশারদ দুর্গসিংহকেও হিন্দুজাতির প্রধান গৌরবের স্থল বলিতে হইবে। দুঃখের বিষয় তাঁহার জীবন বৃত্তান্তের প্রায় সকলই বিলোপ হইয়াছে। আশা করি সহৃদয় পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ এই মহাত্মার জীবনী আবিষ্কার করিয়া জাতীয় গৌরব বর্দ্ধন করিতে সযত্ন হইবেন।

(শ্রী যাঃ)

প্রকৃতি এবং তাহার মূল-নিয়ম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উন্নতির নিয়ম।

ভারতীর ২ ভাগ ১০ সংখ্যা ৪৩৬ পৃষ্ঠার পর।

ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে স্বার্থজ্ঞান উন্নতির প্রথম সোপান। স্বার্থজ্ঞ মনুষ্য, বিষয়ের উত্তেজনায় নহে, কিন্তু আপনার প্রয়োজন-অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। বিষয়-বিষয়ীর মধ্যে যে একটি প্রভেদ আছে, সর্ব্ব প্রথমে তাহা স্বার্থজ্ঞানের নিকটেই ধরা পড়ে; আমি যখন আপনার প্রয়োজন বুঝিয়া কার্য্য করি তখন সে-কার্য্যের মূলপ্রবর্ত্তকও আমি আপনি, চরম লক্ষ্যও আমি আপনি; পরন্তু আমি যখন বিষয়ের উত্তেজনা অনুসারে কার্য্য করি তখন তাহার প্রবর্ত্তক বহির্বিষয় এবং লক্ষ্য ক্ষণস্থায়ী মানসিক বিষয়,—কি? না বিষয়সুখ। আপনার প্রতি আপনার যে একটি প্রেম তাহা প্রথমাবস্থায় বিষয়সুখের সহিত জড়িত থাকে; পরে স্বার্থজ্ঞান ও বিষয়বুদ্ধি উদিত হইয়া বিষয়-শৃঙ্খল হইতে কতক অংশে আত্মার মুক্তিসাধন করে। বিষয় সকলের দোষ-গুণ পরীক্ষা করিয়া আপনার উপকারার্থে তাহাদিগকে ব্যবহার করা এ যে একটি ব্যাপার, ইহাও কতকটা আত্মার মুক্তি-সাপেক্ষ, বিষয়-মোহে একান্ত মুগ্ধ থাকিলে উহাও মনুষ্যের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বিষয়-প্রত্যক্ষ এমন যে সহজ ব্যাপার ইহাও কতকটা আত্মার মুক্তি-সাপেক্ষ, কেননা বিষয় হইতে আপনাকে ভিন্ন করিয়া না জানিলে, বিষয়কে আপনা হইতে ভিন্ন করিয়া জানা সম্ভবে না—বিষয়-প্রত্যক্ষ সম্ভবে না। এইরূপ যখন আত্মা আপনাকে বিষয় হইতে ভিন্ন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করে তখন আপনার প্রতি তাহার যে একটি স্বভাবসিদ্ধ প্রেম আছে তাহার বশবর্ত্তী হইয়া বিষয়ের উপর আপনার কর্ত্তৃত্ব বলবৎ করিতে সচেষ্ট হয় এবং তাহাতে যে পরিমাণে সিদ্ধি লাভ করে সেই পরিমাণে মুক্তির আনন্দ অনুভব

করে। মুক্ত ভাব, অশরীরী ভাব, অমায়িক ভাব, সদানন্দ ভাব, ইহারই প্রতি আত্মার লক্ষ্য, কিন্তু সে লক্ষ্য সাধন করা এক দিনের কার্য্য নহে, এক এক ধাপ করিয়া তাহার দিকে ক্রমশ অগ্রসর হইতে হয়। স্বার্থজ্ঞান মুক্তি-সোপানের প্রথম ধাপ তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি; কিন্তু সেই প্রথম ধাপের মুক্তি টুকুতেই আত্মা কখনই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। সেই প্রথম ধাপে আত্মা যে একটু অশরীরী ভাব লাভ করে তাহা আরো বিস্তার করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। দম্পতি-প্রেমে যখন দুই আত্মা একাত্মা হয়, তখন আত্মার সেই অশরীরী ভাব আর এক ধাপ উচ্চে উঠে এবং পূর্ব্বে যে খানে স্বার্থ অধিষ্ঠান করিতেছিল এখন সেখানে ধর্ম্ম সিংহাসন প্রাপ্ত হয়। তোমার সম্পত্তিও যা, আমার সম্পত্তিও তা, তোমার শরীরও যা, আমার শরীরও তা, তোমার হৃদয়ও যা, আমার হৃদয়ও তা, উভয়ের মধ্যে এই যে, বিষয়-নির্ব্বিশেষ, শরীর-নির্বিশেষ, হৃদয়-নির্ব্বিশেষ প্রেমের ভাব তাহা বিষয়-সুখ অপেক্ষা উচ্চতর ভাব। কিন্তু সেই দম্পতি-প্রেম ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা নিয়মিত হইলে তবেই তাহা সাংসারিক সকল প্রকার মঙ্গলের উৎসস্বরূপ হয়—নচেৎ তাহাতে ব্যাঘাত জন্মে। নিজের স্থায়ী সুখোদ্দেশে মনকে সংযত করিয়া চালানো, স্বার্থজ্ঞান অথবা বিষয়-বুদ্ধি দ্বারাই নির্ব্বাহ হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের ব্যবহার-কালে, প্রখর তীব্র ব্যবহার এবং বিরস মন্দ ব্যবহার উভয় দিক্ হইতে মনকে সংযত করিয়া তাহাকে সাম্যভাবে আনয়ন করা, বাক্য মনকে সাম্য ভাবে আনয়ন করা, ভিতর বাহিরকে সাম্যভাবে আনয়ন করা, আপনার হৃদয়কে অন্যের হৃদয়ের সহিত সাম্যভাবে আনয়ন করা, এসকল কার্য্য বিষয়-বুদ্ধির অধিকারাতীত, উহা ধর্ম্মবুদ্ধিকে অপেক্ষা করে।

এই ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা দম্পতিপ্রেম নিয়মিত হইলে তাহা অশেষ কল্যাণের আকর হয়। দম্পতিপ্রেম যেমন দুই শরীরকে এক শরীর করে, দুই হৃদয়কে এক হৃদয় করে, ধর্ম্ম সেইরূপ দুই আত্মাকে একাত্মা করে। দম্পতীর একাত্ম ভাব কাল ক্রমে পরিস্ফুট হইলে উভয়ই অনাসক্ত চিত্তে সংসার-ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হন। প্রকৃত-পক্ষে আত্মা অশরীরী, কেবল প্রাণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকাতেই আপনাকে শরীরী মনে না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না; বিষয় হইতে আত্মা যতই মুক্ত হয়, এবং আত্মার সহিত আত্মা যতই যুক্ত হয় ততই সে আপনার অশরীরীভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়। এক দিকে যেমন বিষয়াতীত অশরীরী ভাবের প্রতি, মুক্তির প্রতি, আত্মার লক্ষ্য, অন্যদিকে সেইরূপ আত্মার সহিত আত্মার যে যোগ সেই অধ্যাত্ম-যোগের প্রতি আত্মার লক্ষ্য; অধ্যাত্ম-যোগের প্রথম সোপান ধর্ম্ম। সংসারের মুখ্য উদ্দেশ্য ক্ষণিক সুখ-ভোগ নহে, ধর্ম্মসাধন এবং তজ্জনিত স্থায়ী

অধ্যাত্ম সুখই সংসারের মুখ্য উদ্দেশ্য; এই জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে সংসার আশ্রম-বিশেষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং স্ত্রীর আর এক নাম সহধর্ম্মিণী হইয়াছে; দম্পতিপ্রেমকে ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা নিয়মিত করিলে তবেই সে নামের সার্থকতা হয়, নচেৎ গৃহবিচ্ছেদ প্রভৃতি নানা প্রকার অমঙ্গল প্রবেশ করিয়া সুখের সংসারকে অশান্তির আলয় করিয়া তোলে। কেহ মনে করিতে পারেন সৌন্দর্য্যই দম্পতি-প্রেমের নিয়ামক কিন্তু তাহা ঠিক নহে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রণয়-সঞ্চার যদিও কতক অংশে সৌন্দর্য্যকে অপেক্ষা করে কিন্তু সৌন্দর্য্য যেখানে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলে ঠিক হয়, সে স্থান এ নহে; সুন্দর স্ত্রীপুরুষ অনেক আছে তন্মধ্যে সকলের সহিত সকলের দাম্পত্য প্রেম স্থায়ী হইতে পারে না; যাহাদের মধ্যে দম্পতি-প্রেম ধর্ম্মানুমোদিত স্থায়িত্বলাভে সমর্থ হয়, তাহাদের মধ্যেই বিবাহ বন্ধন হওয়া কর্ত্তব্য। স্বার্থ যেমন বিষয়-সুখের স্থায়িত্ব সম্পাদন করে, ধর্ম্ম সেইরূপ দম্পতি-প্রেমের স্থায়িত্ব সম্পাদন করে; কিন্তু সৌন্দর্য্য যদি দুই বিভিন্নপ্রকৃতির হৃদয়কে ক্ষণিক দাম্পত্য প্রেমের প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ করে, তবে সে বিবাহ সমাজ-বিরুদ্ধ না হইতে পারে কিন্তু ধর্ম্মবিরুদ্ধ তাহাতে আর সংশয় নাই। অতএব ধর্ম্মই দম্পতি-প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সৌন্দর্য্য নহে।

পুত্র কন্যাগণের প্রতি পিতা মাতার যে আন্তরিক স্নেহ তাহা দম্পতিপ্রেমের ফল স্বরূপ, এবং তাহাদের উপরে পিতা মাতার যে কর্ত্তৃত্ব ভাব তাহা সংসার-ধর্ম্মের ফল স্বরূপ। সে যে কর্ত্তৃত্ব ভাব তাহা শারীরিক বল-মূলক নহে তাহা আধ্যাত্মিক শক্তিমূলক। আধ্যাত্মিক শক্তি কাহাকে বলে তাহা জানিতে হইলে শুদ্ধ কেবল এইটী দেখিলেই হয় যে, পুত্র কন্যার উপরে পিতা মাতার কর্ত্তৃত্ব ভাবটি কিরূপ, তাহাই আধ্যাত্মিক শক্তির আদর্শ স্বরূপ। রাজার কর্ত্তৃত্ব যদি পিতার কর্ত্তৃত্বের ন্যায় হয় তবেই বলিতে পারা যায় যে, বাহুবল দ্বারা নহে আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা তিনি রাজ্য শাসন করিতেছেন।

পুত্র কন্যাগণকে সুনিয়মে চালানো শুদ্ধ কেবল তাড়না অথবা লালনার কর্ম্ম নহে; তাহা আধ্যাত্মিক শক্তিকে অপেক্ষা করে। ঈশ্বরের মঙ্গলভাবের ন্যায় পিতামাতার অধ্যাত্ম শক্তি এমনি অলক্ষিত ভাবে সন্তানগণের উপর কার্য্য করে, যে তাহারা তাহার বশে থাকে অথচ জানিতে পারে না যে বশে আছে। আজিকার কালে অধিকাংশ বালক এইরূপে শিক্ষিত হয় যেন বলই সর্ব্বস্ব,—তাহারা যেরূপ বল দ্বারা চালিত হয়, বলদ্বারা শিক্ষিত হয়, বল দ্বারা গঠিত হয়, তাহাতে করিয়া বলই কালক্রমে তাহাদের উপাস্য দেবতা হইয়া উঠে; তাহারা জগৎ সংসারে কেবল বলেরই মাহাত্ম্য অবলোকন করে, আত্মার মাহাত্ম্যের প্রতি অন্ধ থাকে, যাহার বল তাহার দিকেই গোড় দেয়, দুর্ব্বলদিগকে বল পূর্ব্বক চালনা করে এইরূপ এক আসুরিক ভাব তাহাদের মনকে অধিকার করিয়া বসে। জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল্, শুনিয়াছি, অতীব শৈশব কাল হইতে প্রভূত বল পূর্ব্বক শিক্ষিত হইয়াছিলেন, হয়ত তাহারই গুণে ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের প্রতি কঠোর অবিশ্বাস যাবজ্জীবন তাঁহার মনকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া রহিয়া ছিল—তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। পুত্র কন্যাগণের প্রতি উপযুক্ত শক্তি-চালনা করিতে শৈথিল্য করিলে আর এক দিকে তাহাদের অনিষ্ট করা হয়; তাহা হইলে, স্বভাবগুণে সকল কার্য্য হইতেছে, আত্মচেষ্টা আত্মকর্ত্তৃত্ব নিষ্ফল, এইরূপ একটি নিষ্কর্ম্মণ্য-ভাব কালক্রমে তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া তাহারা এক রূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। পরন্তু বালকেরা আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা লালিত পালিত এবং শিক্ষিত হইলে কালক্রমে তাহারা আত্মার মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়, বাহুবল অপেক্ষা অধ্যাত্ম শক্তি দ্বারা কার্য্য করিতে ভালবাসে, প্রকৃতি অপেক্ষা পরমাত্মার মহিমা অসীম বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করে। অতএব বাৎসল্য ভাবকে অধ্যাত্মশক্তি দ্বারা নিয়মিত করাই সর্ব্ব প্রকারে কর্ত্তব্য। আত্মার স্বকীয় শক্তি পরিস্ফুটতা প্রাপ্ত হইলে তাহা মুক্তি-পথে আর এক ধাপ অগ্রসর হয়।

প্রথমে মনুষ্য স্বার্থসাধন মানসে অর্থ উপার্জন করিয়া ধর্ম্মসাধনের জন্য প্রস্তুত হয়, পরে ধর্ম্ম উপার্জন করিয়া সংসারের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। অর্থ, ধর্ম্ম এবং কর্ত্তৃত্ব, উন্নতি সোপানের প্রথম এই তিনটি ধাপ অতিক্রম করিলে পর তবে সৌন্দর্য্য মঙ্গল এবং সামঞ্জস্য অথবা শান্তির প্রতি আত্মার লক্ষ্য যায়; ধর্ম্মসাধনের জন্য অর্থ উপার্জ্জন, এবং আত্মার শক্তিসাধনের জন্য ধর্ম্ম উপার্জ্জন যেমন আবশ্যক তেমনি আবার আত্মার সৌন্দর্য্যসাধনের জন্য, আত্মার শক্তি উপার্জ্জন আবশ্যক। ধর্ম্ম দ্বারা আত্মা পবিত্র হইলে, এবং কর্ত্তৃত্ব-সাধন দ্বারা আত্মা বলশালী হইলে তবেই তাহার অভ্যন্তর হইতে সৌন্দর্য্যের উৎস উৎসারিত হইবার পথ পায়। যাহারা ইন্দ্রিয়-সুখের দাস প্রকৃতির সৌন্দর্য্য তাহাদের জন্য নহে এবং যাহাদের আধ্যাত্মিক বল নাই আত্মা হইতে সৌন্দর্য্য উদ্গীরণ করা তাহাদের কর্ম্ম নহে,—যাঁহারা সুন্দর গীত সুন্দর কাব্য সুন্দর চিত্র রচনা করিয়া পৃথিবী শুদ্ধ লোকের মন আবহমান কাল কিনিয়া রাখিয়াছেন তাঁহাদের অধ্যাত্মশক্তি কত শত ধন্যবাদের যোগ্য। উন্নতিসোপানের চরম তিনটি যে ধাপ তাহার সহিত প্রথম তিনটি ধাপের এক প্রকার প্রতিযোগিতা লক্ষিত হয়, যথা, স্বার্থের প্রতিযোগী সৌন্দর্য্য, ধর্ম্মের প্রতিযোগী মঙ্গল, কর্ত্তৃত্বের প্রতিযোগী শান্তি। প্রতিযোগিতা শব্দের অর্থ এখানে প্রতিপক্ষ ভাব নহে শুদ্ধ কেবল সাম্মুখ্য ভাব মাত্র; আমি, তুমি, এ দুয়ের মধ্যে যেরূপ সাম্মুখ্য ভাব দৃষ্ট হয়, সেই ভাবটিকেই প্রতিযোগিতা শব্দে উল্লেখ করা যাইতেছে। পরার্থই

স্বার্থের প্রতিযোগী, প্রতিযোগী বটে কিন্তু তাহা বলিয়া হন্তারক নহে, পরের স্বার্থই পরার্থ সুতরাং পরার্থ স্বার্থেরই বন্ধন-মুক্ত ভাব; সৌন্দর্য্য স্বার্থ হইতে আমাদের মনকে উঠাইয়া পরার্থে লইয়া গিয়া ফেলে। আপনার প্রতি আত্মার যে একটি ভালবাসা তাহা অন্যের প্রতি যাওয়া চাই, তাহার পথপ্রদর্শক সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্য আত্মার দর্পণ-স্বরূপ, সেই দর্পণে আত্মা আপনার ভাব প্রতিবিম্বিত দেখে বলিয়াই তাহাতে প্রেম সমর্পণ না করিয়া থাকিতে পারে না। অর্থের ভাব ধর্ম্মের ভাব এবং শক্তির ভাব আত্মার এই যে তিনটি আন্তরিক ভাব, এক সৌন্দর্য্যের মধ্যেই আত্মা তৎসমস্তই প্রতিবিম্বিত দেখিয়া চমৎকৃত হয়—আমার আপনার মনোগত ভাব বাহিরে মূর্ত্তিমান দেখিতেছি—কি চমৎকার! এই সে চমৎকারিতা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, উন্নতি-সোপানের কোন এক ধাপের ভাব তাহার পরের ধাপে বিলুপ্ত হয় না পরন্তু নবতর উন্নতর আকারে বর্ত্তমান থাকে; অতএব সৌন্দর্য্যের মধ্যে অর্থ ধর্ম্ম এবং শক্তি তিনেরই ভাব প্রকারান্তরে বর্ত্তমান আছে ইহা বলা পুনরুক্তি মাত্র। পূর্ব্বকার ঐ তিনটি ধাপ অনুসারে সৌন্দর্য্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, অর্থ-প্রধান, ধর্ম্ম-প্রধান এবং শক্তি-প্রধান; প্রয়োজনসাধনোপযোগিতার যে একটি সৌন্দর্য্য তাহাই অর্থপ্রধান বলিয়া উক্ত হইল, একটি সুন্দর ঘটিকা-যন্ত্র ইহার দৃষ্টান্তস্থল; শান্তি মাধুর্য্য প্রসন্নতা প্রভৃতি ধর্ম্ম ভাবের উদ্দীপক যে সৌন্দর্য্য তাহা ধর্ম্ম-প্রধান বলিয়া উক্ত হইল, একটি সুন্দর পুষ্প ইহার দৃষ্টান্তস্থল; অটল ধৈর্য্যের ভাব, প্রভূত উদ্যমের ভাব বিশ্ববিজয়ী প্রতাপের ভাব, এসকলের যে সৌন্দর্য্য তাহা শক্তি-প্রধান বলিয়া উক্ত হইল; ঝঞ্ঝাকর্ত্তৃক রণাহূত সমুদ্র এবং গগনস্পর্দ্ধী অটল ভূধর ইহার দৃষ্টান্তস্থল। অর্থপ্রধান সৌন্দর্য্যে কার্য্যোপযোগী নৈপুণ্য এবং পারিপাট্যই বিশেষরূপে লক্ষিত হয়, ধর্ম্মপ্রধান সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যগুণ এবং প্রসাদগুণ বিশেষ রূপে লক্ষিত হয়, এবং শক্তিপ্রধান সৌন্দর্য্যে ওজোগুণ বিশেষ রূপে লক্ষিত হয়; কিন্তু উক্ত তিন ভাবের যে ভাবেরই প্রাধান্য হউক না কেন সৌন্দর্য্য তাহাদের একটিকেও সমূলে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না; পুষ্প একটিকে দেখ, তাহার রূপ লাবণ্য, গন্ধমাধুর্য্য এবং স্পর্শলালিত্য আমাদের ইন্দ্রিয়-সুখরূপ প্রয়োজন সাধনের কেমন উপযোগী; তাহার রূপের বিশদ বিমল ভাব, সৌরভের স্নিগ্ধভাব, তাহার সুললিত স্পর্শের নম্র ভাব, প্রখর তীব্র ভাবও নহে নিস্তেজ মন্দ ভাবও নহে, পরন্তু উভয়ের মধ্যবর্ত্তী শান্ত সংযত ভাব, এগুলি ধর্ম্মভাবের কেমন উদ্দীপক, আবার তাহা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মুকুলাবস্থা হইতে যেরূপে পরিস্ফুটতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার সেই গঠন-প্রণালী আধ্যাত্মিক শক্তির কেমন পরিচয় দেয়।

আমরা যে অন্যের সহিত বন্ধুতায় প্রবৃত্ত

হই, সৌন্দর্য্যই তাহার নিয়ামক। আমাদের আপনার মনোগত ভাব আমরা বাহিরে পরিস্ফুট দেখিতে চাই বলিয়া আমরা অন্যের সহিত বন্ধুতায় প্রবৃত্ত হই; কোন এক ব্যক্তি কোন একটি সামান্য কার্য্যেও যদি নিপুণতা প্রদর্শন করে তবে তাহার মধ্যেই আমরা আমাদের আন্তরিক অর্থসাধনের ভাব দেখিতে পাই, কোন ব্যক্তি যদি সামান্য আচার ব্যবহারেও শান্ত সংযত সুপ্রসন্ন ভাব প্রদর্শন করে তবে তাহার মধ্যেই আমরা আমাদের আন্তরিক ধর্ম্মের ভাব দেখিতে পাই এবং কোন ব্যক্তি যদি সামান্য কার্য্যেতেও আত্মার অটল ধৈর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন করে তবে তাহার মধ্যেই আমরা আমাদের আন্তরিক শক্তির ভাব দেখিতে পাই;—তাই তাহা আমাদের নিকট সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। বন্ধুগণের সংসর্গ যদি সৌন্দর্য্য দ্বারা নিয়মিত হয়, তাহা হইলে তাহা উন্নতির একটি প্রধান সোপান হয়। আমি যাহা করিয়াছি, করিতেছি, করিব, আমার সেই সাধনের বিষয়, আমি যদি অন্যেতে সুন্দররূপে ফলিত দেখি, তবে সেই বহিরাদর্শ আমার সাধনের পক্ষে বিশেষ সহায় হয়; এতদুপলক্ষে একটি সামান্য বিষয়কে সাক্ষী মান্য করি—মনে কর আমি সেতার বাজানো শিক্ষা করিতেছি, এবং পুস্তক দেখিয়া তাহার অনেক গুলি সন্ধান লাভ করিয়া তদনুসারে কতক দূর শিখিতে পারিয়াছি কিন্তু তথাপি আমি যে প্রকার সুন্দররূপে বাজাইতে ইচ্ছা করি ততদূর পারিয়া উঠিতেছি না; এ অবস্থায় মনে কর, কোন সুনিপুণ সেতার বাদক আমার সম্মুখে সেতার বাজাইতেছে; সে যেরূপ শান্ত সংযত ভাবে তাল মান লয় সুর সমস্তই ঠিকঠাক বাহির করিতেছে তাহাতে তাহার সৌন্দর্য্য আমার মনে নিবিষ্ট হইয়া যাইতেছে; তাহার প্রত্যেক অঙ্গুলিক্ষেপে আমি যেন আমার মনোগত অভিপ্রায়টি মূর্ত্তিমান দেখিতেছি সুতরাং তাহাকে আমি সাধনের আদর্শরূপে গ্রহণ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না। এ যেমন দেখা গেল এমনি সাধু-সঙ্গের সৌন্দর্য্যে আমাদের মন আকৃষ্ট হইলে মহৎমহৎ সাধনেরও সাহায্য লাভ করিয়া আমরা বিশেষ উপকৃত হইতে পারি।

সৌন্দর্য্যই বন্ধুতার নিয়ামক। ব্যক্তি বিশেষের সৌন্দর্য্য বলিবা মাত্র প্রথমেই শারীরিক সৌন্দর্য্য মনে উদয় হয়; এরূপ যে হয় তাহার কারণ আছে; আত্মার ভিতরের ভাব বাহিরে প্রতিবিম্বিত হইলে, তাহাই সৌন্দর্য্য বলিয়া আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়; আত্মার ভাব শরীরে যেমন স্থিররূপে প্রতিবিম্বিত হয় অন্য কুত্রাপি তেমন হয় না। আত্মার কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ লক্ষণ আছে, যেমন, আনন্দ; মুখের প্রসন্নতাই সেই আনন্দের প্রতিবিম্ব স্বরূপ; যেমন, চাঞ্চল্যরহিত স্থায়ী সত্যভাব; মুখের প্রশান্তিই তাহার প্রতিবিম্ব স্বরূপ; যেমন মনোবৃত্তি সকলের সামঞ্জস্য ভাব; মুখের আকার সামঞ্জস্যই তাহার প্রতিবিম্ব স্বরূপ। কিন্তু শুদ্ধ কেবল শরীরের আকার মাত্রেই নহে, কথা-বার্ত্তায় আচার-ব্যবহারে কার্য্য

যাহাতেই আত্মার ভাব প্রতিস্বিত হয় তাহাই সুন্দর বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়; কাহারো শরীরের এরূপ বিকৃত গঠন হইতে পারে যে, তাহাতে আত্মার ভাব প্রতিবিম্বিত হইবার অতি অল্পই সম্ভাবনা; কিন্তু তাহা বলিয়া আত্মা যে সৌন্দর্য্য-বিকিরণে ক্ষান্ত হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই; অন্ধ ব্যক্তি যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অভাব অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সমবেত চেষ্টা-দ্বারা পূরণ করিয়া লয়, সে ব্যক্তিও সেইরূপ না করিবে কেন? তাহার আচার-ব্যবহারে কার্য্যে আত্মার ভাব প্রতিবিম্বিত হইলেই সে-তাহার সৌন্দর্য্যের নিকট শারীরিক সৌন্দর্য্য অতীব লঘু সামগ্রী হইয়া পড়ে, কেন না শারীরিক সৌন্দর্য্য নশ্বর, মানসিক সৌন্দর্য্য চিরস্থায়ী, শারীরিক সৌন্দর্য্যের উপর আমাদের কোন কর্ত্তৃত্ব খাটে না, মানসিক সৌন্দর্য্য আমাদের সাধনসাপেক্ষ, ইত্যাদি নানা কারণে শারীরিক সৌন্দর্য্য অপেক্ষা মানসিক সৌন্দর্য্যের মূল্য অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ পরস্পরের আত্মার ভাব পরস্পরের নিকট প্রতিবিম্বিত হইলে, আত্মাসমূহের মধ্যে আবরণ ঘুচিয়া যায়, এবং অনেক আত্মা সৌহার্দ্দ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া একাত্মার ন্যায় হয়; সৌন্দর্য্যই কেবল আত্মার ভিতরকার মর্ম্ম বাহিরে উদ্গীরণ করিয়া আত্মাকে আত্মার নিকট অনাবৃত করে; আপনিটি এবং আপনারটিতে বদ্ধ না থাকিয়া আমরা যে বাহিরে প্রীতি বিস্তার করি সৌন্দর্য্যই তাহার পথ-প্রদর্শক। সৌন্দর্য্যের সাংকেতিক নিমন্ত্রণে আত্মায় আত্মায় দেখা সাক্ষাৎ হইয়া উভয়ের একাত্ম ভাব পরিস্ফুট হইলে আত্মার অশরীরী মুক্তভাব আর একধাপ উচ্চে উত্থিত হয়।

সৌন্দর্য্য যে কিরূপ ভাব তাহার প্রতি আর একটু প্রণিধান করিয়া দেখা যাউক্। কোন কার্য্য-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া সচরাচর আমরা বলিয়া থাকি যে, একার্য্যের অর্থ কি? এখানে অর্থ-শব্দে অভিপ্রায় তাৎপর্য্য মর্ম্ম অভিসন্ধি ইত্যাদি বুঝায়; মনুষ্য শুদ্ধ যদি কেবল ক্ষণিক বিষয়-সুখের উত্তেজনায় কার্য্য করে তবে তাহার অর্থ অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয় কিন্তু যখন কোন স্থায়ী সুখের উদ্দেশে কার্য্য করে তখন তাহার অর্থ তদপেক্ষা গুরুতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, পূর্ব্বোক্ত কার্য্য অনর্থক কার্য্য এবং শেষোক্ত কার্য্য সার্থক কার্য্য বলিয়া অনুভূত হয়। এই অর্থের ভাব অর্থাৎ কার্য্য করিবার মর্ম্ম অভিসন্ধি ও তাৎপর্য্যের ভাব যতক্ষণ আমাদের আপনার ভিতরে থাকে ততক্ষণ তাহার মন্তব্য অনুসারে আমরা চলি বটে কিন্তু তাহার মূর্ত্তিটি আমরা সম্মুখে দেখিতে পাই না; আপনার ভিতরকার সেই যে অর্থের ভাব, যাহা অমূর্ত্ত, তাহাকে যখন বাহিরের কোন কিছুতে মূর্ত্তিমান দেখিতে পাই, তখন তাহাই সৌন্দর্য্যরূপে আমাদের নিকট প্রকাশ পায়; অল্প কথায়, ভিতরকার অর্থ বা মর্ম্ম সম্মুখে মূর্ত্তিমান হইলেই তাহা সৌন্দর্য্যরূপ ধারণ করে; কোন বস্তুতে একজন যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় আর একজন তাহা পায় না কেন? ইহার

কারণ কেবল এইমাত্র যে এক জন তাহার অর্থজ্ঞ, মর্ম্মজ্ঞ, আর এক জন তাহার মর্ম্ম জানে না। মনে কর এক জন স্থূলদর্শী কৃষক এবং এক জন সূক্ষ্মদর্শী কবি উভয়েই তৃষ্ণা নিবারণার্থে কোন সরোবর-কূলে উপস্থিত হইয়াছে; কৃষক জলের অর্থ—এই শুধু জানে যে, তাহাতে তৃষ্ণা নিবারণ হয়,—এই পর্য্যন্ত, কিন্তু কবি জল পান করিয়া তত তৃপ্তি অনুভব করে না, যত তৃপ্তি সেই জলের ভিতরকার মর্ম্মটিতে প্রবেশ করিয়া অনুভব করে; জলের ভিতরকার যে একটি মর্ম্মরস তাহাই জলের সৌন্দর্য্য, এবং তাহাই পান করিয়া কবি পরিতৃপ্ত হয়। জলের তরলতা, স্নিগ্ধতা, দ্রবকারিতা, ইত্যাদি নানা প্রকার গুণ যে একটি মূল মর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে, সেটি কবির চক্ষেই অনাবৃত হয়। জলের সেই যে মর্ম্ম তাহা স্থলে নাই বায়ুতে নাই আকাশে নাই, তাহা কেবল জলেতেই আছে; কিন্তু জল তাহা জানে না, কবিই তাহা জানিতেছে;—ইহার অর্থ কি? অর্থ তাৎপর্য্য এবং মর্ম্মের ভাব কবির নিজের নাকি মনোগত ভাব, তাই সে ভাবকে কোন প্রকারে বাহিরে প্রতিবিম্বিত দেখিলে আপনার অমূর্ত্ত ভাবের মূর্ত্তিমান ভাব দেখিলে, কাজেই সে তাহার একটি আকর্ষণ অনুভব করে। জলের তরলতাতে মনের নির্দ্দিরোধী ভাব, জলের স্নিগ্ধতাতে মনের সন্তাপনিবারক প্রশান্তভাব, জলের দ্রবকারিতাতে অন্যকে আপনার করিয়া লইবার ভাব কবির চক্ষে প্রতিভাত হয়। রাজার প্রজাপালনের ভাব কালিদাস অচেতন বৃক্ষেতেও মূর্ত্তিমান দেখিয়া রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছেন "স্বসুখনিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ প্রতিদিনমথবা তে সৃষ্টিরেবংবিধৈব। অনুভবতি হি মূর্দ্ধ্না পাদপস্তীব্রমুষ্ণং শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাং।" ইহার অর্থ এই —আপনার সুখে নিরভিলাষ হইয়া তুমি লোকের জন্য প্রতিদিন ক্লান্তি ভোগ কর, তা তোমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ঐরূপ; বৃক্ষ যে সে আপনার মস্তক দ্বারা তীব্র উত্তাপ অনুভব করে, কিন্তু ছায়া দ্বারা আশ্রিত জনের পরিতাপ শান্তি করে। এইরূপ আত্মার ভিতরকার কোন নিগূঢ় অর্থ বা অভিসন্ধি, যাহা ভাল বই মন্দ হইতে পারে না, তাহা বাহিরে মূর্ত্তিমান ভাবে প্রতিভাত হইলেই সৌন্দর্য্য শব্দের বাচ্য হয়। সৌন্দর্য্য যেমন মর্ম্মের মূর্ত্তিমান ভাব, মঙ্গল সেইরূপ ধর্ম্মের মূর্ত্তিমান ভাব।

ধর্ম্ম আমাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের জন্য এবং ধর্ম্মসাধন আমাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের কার্য্য। একঃ প্রজায়তে জন্তুরেকএব প্রলীয়তে একোঽনুভুংক্তে সুকৃতং এক এবতু দুষ্কৃতং॥ একাই মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করে, একাই মৃত হয়, এবং সুকৃতই হউক্ আর দুষ্কৃতই হউক একাই তাহার ফলভোগ করে। অন্তরের সেই ধর্ম্মভাবকে আমরা বাহিরে যেখানে মূর্ত্তিমান দেখি তাহাই আমরা মঙ্গল বলিয়া

হৃদয়ঙ্গম কার। ভিতরের ধর্ম্ম হইতে বাহিরের অর্থ কর্ত্তৃত্ব এবং সৌন্দর্য্য ফলিত হইলে, ধর্ম্মের সেই ফলেতে ধর্ম্মকে প্রতিফলিত দেখিতে পাই, তাহাই আমরা মঙ্গল বলিয়া উপলব্ধি করি। মনুষ্যসমাজ যতই উন্নত হয় ততই তাহাতে মঙ্গলের ভাব মূর্ত্তিমান দেখিতে পাওয়া যায়; কেননা ততই উপযুক্ত লোক উপযুক্ত পদে স্থাপিত হয়, এবং লোকে যাহাতে উপযুক্ত হইতে পারে তাহার নানা দ্বার উন্মুক্ত হয়। সন্তানেরা পিতা মাতাতে মঙ্গলের আদর্শ যেমন মূর্ত্তিমান দেখিতে পায়, এমন আর কুত্রাপি নহে; তাহার কারণ এই যে, যিনি তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার উপযুক্ত তাঁহারই হস্তে কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে, এইটি তাহারা হৃদয়ঙ্গম করে; সন্তানের যাহাতে মঙ্গল হয় তাহা যেমন পিতা মাতার মনোগত ইচ্ছা এবং প্রাণগত চেষ্টা অন্যের সেরূপ নহে, এজন্য পিতা মাতা যেমন কর্ত্তৃত্ব করিবার উপযুক্ত অন্য কেহ সেরূপ নহে। সন্তানেরা পিতা মাতার বাহিরের কার্য্যে ভিতরের সাধু ভাব মূর্ত্তিমান দেখে বলিয়া পিতা মাতাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে না। মঙ্গল দ্বারা ভক্তি নিয়মিত হইলেই ভক্তির যথার্থ মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। ভক্তি যদি শুদ্ধ কেবল বলের ভয় কিম্বা মায়ার প্রলোভন দ্বারা নিয়মিত হয় তবে তাহা নানা অনর্থের মূল হয়, পরন্তু মঙ্গলের অধ্যাত্ম শক্তি দ্বারা ভক্তি নিয়মিত হইলেই মুক্তি এবং অধ্যাত্ম যোগের আর এক ধাপ উচ্চ পদবী আমাদের অধিকারায়ত্ত হয়। এক মঙ্গলের মধ্যে অর্থ ধর্ম্ম শক্তি সৌন্দর্য্য সকলি কেন্দ্রীভূত হইয়া উন্নত আকার ধারণ করে, স্বার্থ অর্থ-মাত্র কিন্তু মঙ্গল পরমার্থ, ন্যায় ধর্ম্মমাত্র কিন্তু মঙ্গল পরম ধর্ম্ম, শক্তি ঐশ্বর্য্য মাত্র কিন্তু মঙ্গল পরম ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য দেখিতে ভাল, মঙ্গল বস্তুতই ভাল।

সৌন্দর্য্য যেমন অর্থের প্রতিযোগী, মঙ্গল যেমন ধর্ম্মের প্রতিযোগী, শান্তি সেই রূপ কর্ত্তৃত্বের প্রতিযোগী;—দেবপ্রসাদ আত্মপ্রভাবের প্রতিযোগী। মুক্তির জন্য অগ্রে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া চাই, জয় লাভ করিলে তবেই সামঞ্জস্য এবং শান্তির সহিত সাক্ষাৎকার হইতে পারে। কর্ত্তৃত্ব শক্তি কার্য্যে পরিপক্কতা লাভ করিলে তাহা অটল প্রশান্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করে। সমস্তের মধ্যে যে একটি শান্ত সমাহিত একতান যোগের ভাব নিগূঢ়রূপে অবস্থিতি করিতেছে, তাহা যখন আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে জাগরূক হয় তখন তাহাতে আমরা সর্ব্ব জগতের চালক অধ্যাত্ম শক্তিকে মূর্ত্তিমান দেখিতে পাই। আমাদের শক্তি পদে পদে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়, কিন্তু পরমাত্মার ঐশী শক্তির কোন প্রকার প্রতিবন্ধক নাই; তাঁহার আদেশে জগতের সমস্ত কার্য্য চলিতেছে ইহা বলিলেও তাঁহাতে বাক্য কল্পনা করা হয়,—তাঁহার নিস্তব্ধ প্রশান্ত ভাব-প্রভাবে সকলি স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে ইহাই বলা উচিত।

আমাদের সকল মনোবৃত্তির মধ্যে সাম-

ঞ্জস্য সংস্থাপিত হইলে মন নিষ্কাম প্রশান্ত হইলে, তবেই আমাদের প্রেম শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া সর্ব্বময় এবং সর্ব্বাতীত পরমাত্মার প্রতি সমুত্থিত হয়। পরমাত্মার প্রশান্ত গম্ভীর অলক্ষিতগতি ঐশী শক্তির প্রভাবে অনর্থ অর্থে পরিণত হইতেছে, অধর্ম্ম ধর্ম্মে পরিণত হইতেছে, অশক্তি শক্তিতে পরিণত হইতেছে, কদর্য্য সৌন্দর্য্যে পরিণত হইতেছে, অমঙ্গল মঙ্গলে পরিণত হইতেছে, এই ভাবটি যখন আমাদের হৃদয়ে জাগরূক হয় তখন, আমরা অনর্থের মধ্যেও অর্থ, অধর্ম্মের মধ্যেও ধর্ম্ম, অশক্তির মধ্যেও শক্তি, কদর্য্যের মধ্যেও সৌন্দর্য্য এবং অমঙ্গলের মধ্যেও মঙ্গল প্রচ্ছন্ন দেখিয়া কোথাও আর প্রেম বিতরণে কাতর হই না; তখনকার সে প্রেম কোন বিশেষ পরিমিত কারণকে অপেক্ষা করে না বলিয়া শাস্ত্রে তাহা অহেতুক বলিয়া উক্ত হয়; শান্তির ভাব, সামঞ্জস্যের ভাব, সত্যের ভাব, এই রূপ অমায়িক, এবং অহেতুক প্রেমের নিয়ামক; এইরূপে প্রেমই প্রকৃতরূপ আনন্দ শব্দের বাচ্য। মঙ্গল অমঙ্গল সুন্দর কুৎসিত প্রভৃতি যত কিছু বিরোধী পক্ষ আছে, সকলই এক সত্যের অভ্যন্তরে নির্ব্বিবাদে অবস্থিতি করিতেছে; সত্য সকলেরই সন্ধিস্থল এজন্য সকলের মধ্যে সন্ধিস্থাপন সত্যের উপরেই নির্ভর করে; জ্ঞান বিষয় অপেক্ষা কত উচ্চ, তথাপি বিষয়ের সহিত জ্ঞানের মিল হইলেই সেই জ্ঞান সত্য বলিয়া গৃহীত হয়; যদি বিষয় একরূপ, জ্ঞান অন্যরূপ হয়, তবে তাহাই মিথ্যা বলিয়া গণ্য হয়। সকলের সহিত সকলের কোন না কোন সূত্রে মিল আছে, সেই মিলের ভাবেতেই সামঞ্জস্যের ভাবেতেই অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের লক্ষণ লক্ষিত হয়। সামঞ্জস্যের ভাব, শান্তির ভাব এবং সত্যের ভাব একই ভাব; পরমাত্মার প্রতি আত্মার যে নিষ্কাম এবং অহেতুক প্রেম, আত্মা পরমাত্মার মধ্যে আবরণ মুক্ত ভাবের যে প্রশান্ত গম্ভীর অপার আনন্দ, প্রশান্ত ধ্রুব সত্যের ভাবই তাহার নিয়ামক। এক এই ধ্রুব সত্যের ভিতর অর্থ ধর্ম্ম শক্তি সৌন্দর্য্য মঙ্গল সমস্ত ভাবই অন্তর্ভূত রহিয়াছে। সত্যের অপরাজিত বল ও সহায় দ্বারাই আত্মা পরমাত্মার সহিত অধ্যাত্ম যোগে সমর্থ হয়।

ছিন্নমুকুল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

হাসি মুখে বিষাদ।

সেই অপরাহ্ণে যামিনীনাথের বাটীর অন্তঃপুরস্থ উদ্যানের বৃক্ষলতাসমাকুল একটি নিভৃত প্রান্ত হইতে নীরজা বাহির হইল। নীরজার হস্তে একটি কাকাতুয়া, তাহার

সহিত কথা কহিতে কহিতে নীরজা উদ্যানস্থ সরসীতে নামিয়া কতকগুলি পদ্ম এবং তাহার পাতা তুলিতে লাগিল। তখন সুনীল সরসীবারি মৃদু সমীর পরশে, তলতল ঢলঢল করিয়া কাঁপিতেছিল। কাঁপিয়া কমলদল কাঁপাইয়া মৃদু মৃদু তট চুম্বন করিয়া মৃদু মৃদু শব্দ করিতেছিল। তীরস্থিত একটি কামিনী বৃক্ষের অসংখ্য ফুলরাশি হইতে কখনো দুই একটি পুষ্প বায়ুস্খলিত হইয়া, চৌদিকে বাস বিকীর্ণ করিয়া সরোবরে পড়িতেছিল, নীরজা ফুল তুলিতে তুলিতে মস্তক তুলিয়া এক এক বার সেই স্খলিত কুসুমের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিল, এক একবার কাকাতুয়ার সঙ্গে গান গাহিয়া গাহিয়া কথা কহিতেছিল। গাহিতেছিল

"চললো কাননে, যাইব দুজনে,
জুড়াতে হৃদয় জ্বালা।
সজনিলো আজি, ফুলে ফুলে সাজি,
কাটাব সারাটা বেলা
তরু মূলে মূলে, ফুল তুলে তুলে,
কহিব মরম কথা
গাহিব লো গান, খুলিয়ে পরাণ,
ভুলিব সকল ব্যথা
তুলিয়ে বকুলে পরাইব চুলে,
বেলায় করিব দুল
উড়ায়ে ভ্রমরে, বোঁটা ধরে ধরে
তুলিব গোলাপ ফুল
কিসের বেদনা, কিসের যাতনা,
কিসের হৃদয় জ্বালা
দেখিব আজিকে হৃদয় আঁধার
ঘোচাতে পারি কি বালা।

পদ্মপত্র এবং পদ্ম কয়েকটি তোলা হইলে গানটি গাহিতে গাহিতে নীরজা সরসী হইতে উঠিয়া সেই কামিনীতলায় আসিয়া কতকগুলি ফুল কুড়াইয়া অঞ্চলে লইল চাঁপাবৃক্ষের নিকট গিয়া নিম্নমুখী শাখা হইতে কতকগুলি চাঁপা পাড়িল, বকুলতলা হইতে কতকগুলি বকুল কুড়াইল, লতাবৃক্ষের নিকট আসিয়া কতকগুলি লতা ছিঁড়িল, শেষে কতকগুলি বেল মল্লিকা গোলাপ তুলিয়া গোলাপের কাঁটা ছিড়িতে ছিড়িতে গানে কাকাতুয়ার সহিত কথা কহিতে কহিতে আবার সেই বৃক্ষসমাকুল নিভৃত প্রান্তে গমন করিল।

আসিতে আসিতে গান রাখিয়া কাকাতুয়াকে কথা কহিয়া বলিল "তুই আমার সখী কেমন? তুই আমার দুঃখ বুঝিস্? তোকে নিয়ে আজ আমার মনের জ্বালা জুড়াব" বলিয়া আবার গাহিতে গাহিতে সেই নিভৃত প্রান্তে গিয়া পদ্মপত্রে একটি শয্যা রচনা করিয়া সেই শয্যার চতুষ্পার্শে ফুল সাজাইয়া কাকাতুয়াটিকে তথায় শোয়াইতে গেল। নীরজার হস্ত ছাড়িয়া কাকাতুয়া তখন কুসুমশয্যায় যাইতে চাহিবে কেন? সে অনিচ্ছাপ্রকাশক স্বরে চীৎকার করত আবার তাহার হস্তে উঠিল। নীরজা তখন আবার তাহাকে সেই শয্যাতে শোয়াইতে চেষ্টা করিয়া বলিল "বেশ বিছানা হয়েছে তুই শুয়ে থাক, আমি ততক্ষণ আমার নুরীটিকে এই খানে নিয়ে আসি" কাকাতুয়া তাহার কথা বুঝিল না, সেই খান

হইতে আবার তাহার হস্তে উঠিতে গেল। অমনি নীরজা তাহাকে একটি পদ্মপত্র দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া, ছেলে ঘুম পাড়াইবার মত সেই খানে রাখিতে চেষ্টা করিল। কাকাতুয়া তাহাতে রাগিয়া নীরজার হস্তে চঞ্চু আঘাত করিল। নীরজাও তাহাতে ঈষৎ ক্রোধ দেখাইয়া কুসুম অঙ্গুলীতে ধীরে ধীরে তাহাকে মারিয়া বলিল "তুই বড় অবোধ এই খানে শুয়ে থাক" কাকাতুয়া তাহা শুনিল না, আবার তাহার হস্তে উঠিয়া আসিল। তখন নীরজা আর তাহাকে শোয়াইতে চেষ্টা না করিয়া বলিল "আহা এ বিছানা বুঝি তোর ভাল লাগলো না! কবে কাকাতুয়া আমি সেই অরণ্যে যাব বল দেখি! তাহলে তোকে কত ভাল ভাল পাতার বিছানা করে দেব, সে সব তো এখানে নাই" কাকাতুয়া তাহার আদর বুঝিয়া তাহার মুখ পানে চাহিয়া কাকাতুয়া কাকাতুয়া করিল, নীরজা বুঝিল কাকাতুয়া তাহার ব্যথায় ব্যথী। এই সময় যামিনী বাবু সমস্ত উদ্যানটি খুঁজিতে খুঁজিতে এই খানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া কাকাতুয়ার সহিত নীরজার গল্প শুনিতে লাগিলেন। নীরজা মুখ তুলিয়া একবার যামিনীনাথকে দেখিল একটু ছেলে মানুষের মত হাসিল কিন্তু তাঁহার সহিত কথা না কহিয়া আবার মুখ নত করিয়া কাকাতুয়ার সহিত কথা কহিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ যামিনী মৌন ভাবে থাকিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিলেন "নীরজা এত গল্প কাহার সঙ্গে?"

নীরজা মুখ নত করিয়াই বলিল "কেন? আমার সখীর সঙ্গে?"

"কাকাতুয়া নুরী এরাই কি নীরজ চিরকাল তোমার সখী থাকিবে? আমায় কি মনের কথা খুলিবে না" বলিয়া যামিনীনাথ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া আবার মৌন হইয়া রহিলেন। অনেক ক্ষণ গেল তথাপি নীরজা কথা কহিল না দেখিয়া আবার তখন আর একবার মৌন ভঙ্গ করিয়া যামিনী বলিলেন "নীরজা আমাকে আর কতদিন এরূপ যাতনা সহিতে হইবে"

নী। "কাকাতুয়াটা বুঝি ঘুমালো?—তোমার যন্ত্রণা? কেন? কি যন্ত্রণা?

যা। "কতকাল আমার মনোরথ আর অপূর্ণ থাকিবে?

নী। "এই যন্ত্রণা? আচ্ছা আমাদের অরণ্যে তো এমন বড় মল্লিকা ছিল না কিন্তু আমার বোধ হয় এর চেয়ে সে গুলি তবু ভাল।"

যা। "নীরজা আমার কষ্টে কি তোমার কিছুমাত্র কষ্ট হয় না? আমার এমন জিজ্ঞাসার উত্তর পর্য্যন্ত দিলে না!"

নী। "আঁ আঁ? আমি এই মল্লিকাটি দেখতে বড় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে ছিলেম। আমাদের কুটীরের চার ধারে এত মল্লিকা ফুটতো কি আর বলব? পিতা কি আমাদের শেষ চিঠিখানি পেয়েছেন মনে কর? সে চিঠি পেয়ে উত্তর দিলে কিম্বা তিনি এলে কত দিনে এখানে পৌছবেন বল দেখি! আহা কত দিনে সেই কুটীরে গিয়ে আগেকার মত বেড়াব"

যা। "তোমার ইচ্ছার মত কাজ করিতে আমার তো বিন্দু মাত্র ত্রুটি নাই। তোমার পিতাকে যে কত চিঠি লিখেছি তাতো জান?"

নী। "আমার কি সব কথাই তুমি শুনেছ! তাহলে এতদিন কেন সেই অরণ্যে আমাকে রেখে এলে না? কাকাতুয়া আমার সঙ্গে তুই যাবি? বল্‌না? যাবিতো?"কাকাতুয়া আবার তাহার মুখ পানে চাহিয়া কাকাতুয়া কাকাতুয়া করিল। নীরজা বুঝিল কাকাতুয়া যাইবে। যামিনী বলিলেন "ছি তুমি ঐ কথাটি লয়ে আমার মনে মিছে-মিছি কষ্ট দেবে? তুমি কি জাননা তোমার কথাটি রাখতে পারলুম না বলে কত কষ্ট হয়েছে! কিন্তু কি করব এমনি এখানে কাজে ব্যস্ত আছি যে কলকাতা ছেড়ে যাবার আমার একদিনের জন্যও যো নাই। কিন্তু আমি তোমাকে দস্যুদের হাত হতে রক্ষা করলুম—সুধুতা নয় তোমার জন্য কত কষ্ট স্বীকার করেছি, তুমি তার পরিবর্ত্তে আমার কথার উত্তর পর্য্যন্ত দেও না?"

নী। "কথার উত্তর আবার কখন দিইনে? আহা আমার সেই হরিণটা যে কেমন ছিল, বাবা নৈমিষারণ্য হতে এনে দিয়েছিলেন। সেটি থাকলে কেমন কাকাতুয়ার সঙ্গে খেলা করিত। কিন্তু না না ভুলে গেছি, তুমি কি বলছিলে বল?"

যা। "আমার এমনি অদৃষ্ট—তোমার মনের কথা এখনো বুঝিতে পারিলাম না—আমি অভাগা—আমি দুর্ভাগা, আমার মরণই ভাল।'

নী। ওকি কথা! মরবে কেন? বলনা তোমার কি মনোরথ?

যা। কত দিন আর বিবাহ করিতে দেরি করিবে?"

নী। "আচ্ছা তুমি এ কাকাতুয়াটি কোথা পেলে?" যামিনী বিষাদার্দ্র স্বরে বলিলেন "নীরজা এই কি আমার কথার উত্তর?" নীরজা কিছু অপ্রতিভ ভাবে বলিল "নানা আর আমি কাকাতুয়ার পানে চাইব না তা নইলে কেমন অন্যমনা হয়ে পড়ি এবার তুমি বল" যামিনী আবার বলিলেন নীরজা বিবাহে আর কত দেরি করিবে?"

নী। "কেন এক বৎসর?"

যা। "এক বৎসরই যে এক যুগ" নীরজা হাসিয়া বলিল "তা কি করে হবে আমি শাস্ত্রে পড়িয়াছি ১২ বৎসরে এক যুগ।"

যা। "নীরজ তুমি বড় নিষ্ঠুর, যদি বিবাহই করিবে তো এক বৎসর আবার বিলম্ব কেন"

নী। "এক বৎসরের মধ্যে নিশ্চয়ই পিতা আসিবেন তখন আমাকে লইয়া তাঁহার যাহা ইচ্ছা করিবেন, তা না আসেন তখন তোমার হইব। তুমি দস্যু হইতে উদ্ধার করিয়াছ পিতার পরেই আমি সুতরাং তোমার'

যা। "আমি তোমাকে দস্যুহস্ত হইতে মুক্ত করিলাম প্রত্যুপকারে তুমি আমার এই কথাটি রাখিবে না? সুন্দরি তুমি বড় কৃতঘ্ন।" নীরজার ভ্রুধনু ঈষৎ

কুঞ্চিত হইল, মুক্তাদন্তে অধর ঈষৎ চাপিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল "আমি কৃতঘ্ন! অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছি—আমি কৃতঘ্ন!

যা। "তোমার বিবাহে ইচ্ছা নাই, ইহাই যে কৃতঘ্নতা। এত ভালবাসিতেছি অথচ তাহার প্রতিদান নাই ইহাই তো কৃতঘ্নতা'।

নী। "কে বলিল আমি তোমাকে ভাল বাসিনা। আমার বোধ হয় পিতার নীচেই তোমাকে ভালবাসি। তুমি আমার সহোদর হইলেও তোমাকে ইহার অপেক্ষা ভাল বাসিতে পারিতাম কি না সন্দেহ।"

যা। "এ তো সব কথার কথা। তুমি যদি সত্য সত্য আমাকে ভাল বাসিতে তাহলে এক বৎসরও কি আর বিলম্ব করিতে চাহিতে? আমি তোমার ঐ বিশাল চক্ষুর মোহন দৃষ্টি যতই দেখিতেছি ততই মনে হইতেছে একবৎসর আমার পক্ষে একযুগ।'

নী। 'কই, আমার তো তা মনে হয় না"

যা। "আমার বেলা হয় না, কিন্তু প্রমোদ হোলে হইত।"

নীরজা যদিও প্রমোদের কথা যামিনীকে কিছুই বলে নাই, তথাপি যামিনী মনে মনে সন্দেহ করিতেন নীরজা প্রমোদকে ভালবাসে। কিন্তু সে কথা কখনো তাহাকে ফুটিয়া বলেন নাই। আজ এই সব কথায়, মনের বেগভরে এই কথাটি আপনা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। নীরজাও তাহাতে বিশেষ কিছুই লক্ষ্য না করিয়া আপনার মনে বলিল

"প্রমোদ—প্রমোদ আবার কবে এখানে আসিবেন?"

যা। "প্রমোদ এখানে আসুন না আসুন তোমার তাতে কি?"

নী। "কেন? তাঁহাকে এক-একবার-দেখিতে ইচ্ছা—"

যা। "আমার সমুখে ওসব কথা বলিতে তোমার লজ্জা বোধ হোল না?"

নী। "লজ্জা! এতে লজ্জা! কেন, একি কোন দোষের কথা?"

যা। "লজ্জাহীনা! কৃতঘ্ন! আমি বুঝিতে পারিয়াছি—

নী। "আবার তুমি বলিবে আমি কৃতঘ্ন। যে আমি আজ কেবল মাত্র কৃতজ্ঞতার উপরোধেই তোমার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে যাইতেছি—সেই আমি কৃতঘ্ন?" বলিতে বলিতে নীরজার চক্ষুদ্বয় স্থির বিদ্যুতের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। যামিনী ঈষৎহাস্য করিয়া বলিলেন "আমি দেখিতেছিলাম তোমার অঙ্গীকার হৃদয়ের না অধরের—"

যামিনীর কথা শেষ না হইতে হইতে এক জন ভৃত্য আসিয়া বলিল "এক জন সন্ন্যাসী আপনার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছে।" সন্ন্যাসীর নাম শুনিয়া যামিনী চমকিয়া উঠিলেন, বুঝিলেন সন্ন্যাসী নীরজার পিতা। যামিনী তখন সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ—সংশয়।

যামিনীনাথ দেখিলেন সন্ন্যাসী নীরজার সন্ধান জানিয়াছেন, এরূপ স্থলে তাঁহার

নিকট মিথ্যা কথা কহিয়া নীরজাকে গোপন করিতে কিম্বা বলপূর্ব্বক আটকাইয়া রখিতে চেষ্টা করা আর যুক্তিসিদ্ধ নহে। বুঝিলেন সে উপায়ে অভিপ্রায় সিদ্ধি বড় দুরূহ। তিনি তখন অন্য উপায় অবলম্বন করিতে স্থির করিয়া, দ্বারদেশ হইতে সন্ন্যাসীকে উপরে আনিতে আদেশ করিলেন। সন্ন্যাসী উপরে আসিলে তাঁহাকে সম্মান পূর্ব্বক বসিতে বলিয়া অতি বিনীত ভাবে বলিলেন "মহাশয়, এখানে কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছেন?" সন্ন্যাসী বলিলেন "বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া তোমাকে অগ্রেই বলা ভাল—আমি নীরজাকে লইতে আসিয়াছি।"

যা। "হাঁ নীরজা বলিয়া একটি কন্যাকে আমি দস্যুহস্ত হইতে মুক্ত করিয়া এখানে আশ্রয় দিয়াছি। কিন্তু আপনি অপরিচত, আপনার নিকট কি করিয়া তাহাকে সমর্পণ করিব।"

স। তবে আমার পরিচয় শুন, আমিই নীরজার পিতা"

যামিনী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন "আপনি—নীরজার পিতা?"

স। "হাঁ আমিই নীরজার পিতা। নীরজা আমারি ন্যায়ধন। আমা হইতে তাহাকে ছিন্ন করিয়া, পাষণ্ড, আমাকে কি কষ্টই না দিয়াছিস? দিন নাই, রাত্রি নাই, রৌদ্র নাই, বৃষ্টি নাই, নীরজার অনুসন্ধান করিয়া করিয়া কোথায় না ফিরিয়াছি। মনের ব্যাকুলতায় নির্দ্দোষীকে পর্য্যন্ত দোষী করিয়া অপরাধী হইয়াছি। পাষণ্ড ইহার সমুচিত ফল তোকে পাইতে হইবে।" যামিনী বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বলিলেন "মহাশয় কি বলিতেছেন? আমি নীরজাকে আপনা হইতে ছিন্ন করিয়াছি!"

স। "নহিলে এখানে নীরজাকে রাখিবে কেন? যদি যথার্থই দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা করিতে তাহা হইলে তাহাকে তাহার পিতার নিকট পঁহুছিয়া না দিয়া এখানে রাখিবে কেন? পাষণ্ড, নীরজা এখনইত দস্যুহস্তগত হইয়া রহিয়াছে—কিন্তু আমিই তাহাকে উদ্ধার করিব।"

যা। "কি আশ্চর্য্য! আমার এ উত্তম পুরস্কারই বটে। কোথায় নীরজার জীবন দান করিলাম বলিয়া আপনার প্রিয় পাত্র হইব, না আপনি আমাকেই মন্দ বলিয়া তিরস্কার করিতেছেন! নীরজাকে আপনার নিকট পাঠাইবার জন্য তাহাকে এখানে আনিয়া অবধি আপনাকে কানপুরে কত পত্র লিখিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই—দুর্ভাগ্য বশতঃ সেখানে না থাকায় আপনি তাহা পান নাই বোধ হইতেছে, কিন্তু তাহাতে আমি কি করিব।

স। "আমি বন্দবস্ত করিয়া আসিয়াছিলাম আমার নামে যে কোন পত্র আসুক আমি লিখিলেই যেখানে থাকি পাঠাইবে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তো কানপুর হইতে এক খানি পত্রও ফেরত আসে নাই'

যা। "তবে কি গোল হইয়াছে কি করিয়া বলিব—কিন্তু সেই জন্য কি আপনি আমাকে দোষী করিবেন? যদি কলিকাতায় আমাকে বিশেষ কাজে ধরিয়া না রাখিত তো আমি তাহাকে নিশ্চয়ই এত দিন

নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতাম। তাহা না পারায় কাজেই আপনার জন্য অপেক্ষা করিতে হইতেছিল। যাহা হউক আমার এ উত্তম পুরস্কার বটে"। যামিনীর কথা শুনিয়া তাহার দোষের প্রতি সন্ন্যাসী বিচলিতমনা হইলেন। যামিনী তাহা বুঝিয়া আবার ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "মহাশয়—আপনার কিসে সন্দেহ হইল আমি নীরজাকে হরণ করিয়াছি,তাহা বড় জানিতে ইচ্ছা করিতেছে। কেন না ভবিষ্যতে কাহারো উপকার করিতে গেলেও ভাবিয়া চিন্তিয়া অতি সাবধানে করিতে হইবে—কেন না উপকার করিলেও দেখিতেছি তাহার শাস্তি আছে, যথার্থই ভাল করিলে মন্দ হয়।" সন্ন্যাসী পূর্ব্ব হইতে একটু নরম হইয়া বলিলেন "যুবা পুরুষেরা সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অতি গর্হিত কার্য্যেও অগ্রসর হয়"

যা। "যদি তাহাই হইত তবে এত দিন কি আমি তাহাকে বিবাহ করিতাম না? একবার বিবাহ হইয়া গেলে তবে আপনি আর কি করিতেন? যদি ভাবেন নীরজা আমাকে বিবাহ করিতে অসম্মত বলিয়া তাহা হয় নাই—কিন্তু ভাবিয়া দেখুন—নীরজা এখন আমার সম্পূর্ণ অধীনে, তাহাকে বল পূর্ব্বক বিবাহ করিলে সে কি করিতে পারিত? নীরজা অনাথা, আমি তাহার উপর যত ইচ্ছা অত্যাচার করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন আমি তাহাকে কিরূপ যত্ন করিয়াছি" যামিনীর কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী অনেক নরম হইয়া আসিলেন। যামিনীর গৃহে নীরজাকে দেখিয়া তাহার প্রতি যে সন্দেহ হইয়াছিল অনেক কমিয়া আসিল। যামিনী আপন কথার ফল বুঝিতে পারিয়া আবার বলিলেন "মহাশয়, অন্যায় দোষে দোষী করিবেন না বরং নীরজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন তাহা হইলেই যথার্থ অবস্থা সকল বুঝিতে পারিবেন।" সন্ন্যাসী বলিলেন "যদি সত্যই তুমি নীরজাকে রক্ষা করিয়া থাক—তাহা হইলে তোমাকে দোষী করা আমার অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। তুমিও তো ব্রাহ্মণ—তাহা হইলে তোমার হস্তে নীরজাকে সমর্পণ করিয়া আমার এ দোষের প্রায়শ্চিত্ত করিব। তুমি নীরজার উদ্ধারকর্ত্তা, নীরজা তোমারি প্রাপ্য।" শুনিয়া যামিনীর মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং সবিনয়ে কহিলেন "মহাশয়, আমি বহু কষ্টে নীরজাকে উদ্ধার করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি নীরজার যোগ্য পাত্র নহি। নীরজা যেরূপ রূপবতী ও গুণবতী তাহার উপযুক্ত পাত্র আমার চক্ষে তো পড়ে না। আমার উপর আপনি অত কৃপা করিলে আমাকে——'

স। "আমার নিকট আর অত বিনয়ী হইবার আবশ্যক নাই। সে যাহা হউক, কিন্তু একটি বিষয় আমি এখনো মীমাংসা করিতে পারিতেছি না। তুমি এবং প্রমোদ বই অরণ্যে নীরজাকে কেহই দেখে নাই—তবে যদি তোমরা হরণ করিয়া না থাক তো কে করিল? তুমি না করিয়া থাক তবে প্রমোদ করিয়াছে।"

যামিনীনাথ এই কথায় থামিয়া থামিয়া

হাত রগড়াইতে রগড়াইতে বলিলেন "প্রমোদ! না না মহাশয় সে কি—সে কথনই না—কিন্তু প্রমোদ—প্রমোদ—না; আমার যে বিশ্বাস—উঃ তাওকি হ'তে পারে? কিন্তু——জগদীশ্বর! তুমিই জান ——মানুষের মন।" যামিনীনাথের কথার ভাবে বোধ হইল তিনি যেন ইহার কিছু জানেন—কিন্তু বলিতে অনিচ্ছুক। সন্ন্যাসী ইহাতে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া কন্যাকে দেখিতে চাহিলেন। যামিনী নীরজাকে অন্তঃপুর হইতে এইখানে লইয়া আসিলেন। এতদিন পরে পিতা কন্যায় সাক্ষাৎ হইল, তাঁহাদের মনের ভাব এখন কি হইল—তাঁহাদের কি কথা বার্ত্তা হইল তাহা অনুভবের বিষয়, বর্ণনার নহে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ—সাধু না চোর?

যামিনী এবং নীরজার সহিত কথা কহিবার পর সন্ন্যাসীর যামিনীকেও নির্দ্দোষী মনে হইল তিনি শুনিলেন যে দিন রাত্রে নীরজা অপহৃত হয় সে রাত্রে যামিনীনাথ কানপুরেই ছিলেন না।

কিন্তু যদি যামিনীনাথ নির্দ্দোষী তবে দোষী কে? প্রমোদ? যামিনীনাথের কথার ভাবে মনে হয় যেন প্রমোদ ইহার মধ্যে আছেন আবার কিন্তু নীরজার কথা মতে প্রমোদও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। কিন্তু তাহা তো হইতে পারে না দুজনের এক জনতো ইহার মধ্যে দোষী হইবেই। নীরজা বলে সে দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল কিন্তু দস্যুরা কি লোভে নীরজাকে হরণ করিবে? তাহার গাত্রেতো কিছুই অলঙ্কার ছিল না। ধনলোভ নহিলে কেবল সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া কি দস্যুরা নীরজাকে হরণ করিবে? ইহা কি সম্ভব? তাহা হইলে যামিনী ও প্রমোদের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বেই বা কেহ তাহাকে হরণ করিল না কেন! আগে করিলে বরং তাহাই মনে হইত, ইহার পর আর তাহা মনে করা যায় না। অবশ্য কোন ব্যক্তি ধন দ্বারা দস্যুক্রয় করিয়া তাহাদের দ্বারা আপন কার্য্যসিদ্ধি করিয়াছে। অন্য কোন ব্যক্তিই বা তাহা হইলে আর কে হইতে পারে? আর কেহই তো নীরজাকে অরণ্যে দেখে নাই। নীরজা ঐ অরণ্যে আছে আর কেহই তো তাহা জানিত না। এরূপ স্থলে যামিনী কিম্বা প্রমোদই দোষী। অথচ ইহাদের মধ্যে দুজনকেই আবার নির্দ্দোষী মনে হইতেছে।" সন্ন্যাসী ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না তিনি মহা সমস্যায় পড়িলেন। আপনি একাকী ইহার সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন না দেখিয়া সে দিনের জন্য নীরজাকে যামিনীর বাড়ীতেই রাখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ভবানীপুরে তাঁহার সেই আত্মীয়টির বাড়ী গমন করিলেন। আত্মীয়টি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত হিরণকুমার বই আর কেহই নহেন। সন্ন্যাসী এখানে আসিয়া হিরণকুমারকে আদ্যোপান্ত সবিশেষ বলিলেন। হিরণকুমার সকল শুনিয়া বলিলেন "আপনার কথায় আমার যামিনীকেই দোষী মনে হইতেছে" সন্ন্যাসী

বলিলেন "তাহা কি করিয়া হইবে! প্রথমতঃ যে রাত্রে নীরজা অপহৃত হয় তাহার পূর্ব্বরাত্রেই যামিনী কানপুর হইতে চলিয়া গিয়াছিল, দ্বিতীয়তঃ নৌকার মাঝির মুখে নীরজার দুর্দ্দশা শুনিবার পর, তবে যামিনী আসিয়া তাহাকে রক্ষা করে" হিরণকুমার বলিলেন "আমার মনে হয় এ সকল যামিনীর চাতুরী মাত্র। যামিনী যে কি ভয়ানক লোক আপনি জানেন না, আমি তাহাকে যথেষ্ট ঘৃণা করি। মনে হয় এমন কোন কার্য্য নাই যাহা তাহার পক্ষে অকার্য্য।"

স। সত্য নাকি? যামিনীর স্বভাব কি অত্যন্ত জঘন্য? কিন্তু তাহাকে দেখিয়া তো তাহা মনে হয় না এবং নীরজার মুখেও তো তাহার প্রশংসা শুনিলাম।

হি। অনেকেই যামিনীকে চেনে না। যামিনী অনেক ছেলের মাথা খেয়েছে। বাহির হইতে তাহাকে চেনা সহজ নহে।

স। কিন্তু তাহার স্বভাব মন্দ হইলেও একার্য্যে আমার তাহাকে দোষী মনে হয় না। তাহার দোষের বিপক্ষেই সমস্ত প্রমাণ। বরং যামিনীর কথার ভাবে মনে হয় প্রমোদ ইহার মধ্যে আছে।

হি। যামিনী ঐ যে অস্পষ্ট ভাবে প্রমোদের ঘাড়ে দোষ ফেলিতে চাহিতেছে উহাতে আমার তাহাকে আরো সন্দেহ হয়। যাহা হৌক যামিনীর সহিত একবার কথা না কহিয়া আমি আরো নিশ্চয়রূপে আমার মত বলিতে পারি না। হয় তো বাস্তবিক যামিনী নির্দ্দোষী তাহার প্রতি আমি অন্ধ বলিয়া তাহাকে ভুল বুঝিতেছি।

স। তবে সাক্ষাতই হইবে। কিন্তু যদি যামিনী বাস্তবিকই আপনি ঐরূপ ষড়যন্ত্রকারী প্রকাশ পায়, তো আমি রক্ষা রাখিব না" যামিনীকে সঙ্গে লইয়া পরদিন সন্ন্যাসী হিরণের বাড়ীতে আসিলেন। যামিনীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া হিরণের সন্দেহ আরো বৃদ্ধি হইল। হিরণকুমার যামিনীকে বলিলেন "আপনি বলিতেছেন কানপুরে সন্ন্যাসীর নামে অনেক পত্র লিখিয়াছেন কিন্তু একখানিও তবে সন্ন্যাসী পাইলেন না কেন? সমস্ত চিঠি মারা গিয়াছে ইহা অসম্ভব।

যামিনী বলিলেন "আমার কথায় অবিশ্বাস করিতে পারেন কিন্তু আমি মিথ্যা বলিতেছি না। আপনাকে বলিতে কি যে দিন মিথ্যাকথা কহিব এ জিভ কাটিয়া ফেলিব। স্বীকার করি আমি মানুষ নানা দোষে দোষী—কিন্তু আমার কোন শত্রুও আমাকে মিথ্যাকহার দোষে দোষী করিতে পারিবে না।

হি। আপনার কথায় কেবল বিশ্বাস করিতে বলা ছাড়া তবে এবিষয়ে আপনার আর বলিবার কিছুই নাই? আপনি সেই রাত্রেই হঠাৎ প্রমোদকে ছাড়িয়া কানপুর হইতে চলিয়া গেলেন কেন? দুজনে গিয়াছিলেন হঠাৎ একা চলিয়া আসিবার কারণ কি হইতে পারে?

যা। "কলিকাতায় বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ পত্র পাইয়া সেই রাত্রেই ছাড়িতে হইয়াছিল। সে রাত্রে তখনি না ছাড়িলে

একটি মকদ্দামায় আমার বিশেষ সর্ব্বনাশ হইত। ইহার পর আপনার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে ?'

হি। "কলিকাতায় যদি এতই প্রয়োজন ছিল তবে এলাহাবাদে কি করিতেছিলেন ? এলাহাবাদেই না আপনি নীরজাকে দুস্যুহস্ত হইতে উদ্ধার করেন ?"

যা। "আপনি দেখিতেছি আমাকে নিতান্তই আদালতের সাক্ষীর মত সওয়াল করিতেছেন ? কিন্তু যখন আমি এই উপকারে ব্রতী হইয়াছি যখন সন্ন্যাসীর কথায় আপনার নিকট পর্য্যন্ত আসিয়াছি তখন ইহাতেও আমি কিছু মনে করিব না। শুনুন কেন কলিকাতায় আসিবার আগে আমার দুই তিন দিন এলাহাবাদে গিয়া থাকিতে হইয়াছিল; কানপুর হইতে গাড়ী এলাহাবাদে ষ্টেশনে থামিলে আমি যখন একবার প্লেটফর্ম্মে নামিলাম তখন সেইখানে আমার এখানকার একজন নায়েবের সহিত দেখা হইল। সে আমাকে দেখিয়া বলিল আমাদের একজন প্রধান সাক্ষীর বাড়ী এই এলাহাবাদে, সে আমাদের পক্ষে না বলিলে আমাদের জিতিবার সম্ভাবনা নাই, সেইজন্য নায়েব স্বয়ং আসিয়াছে এবং আমাকে ও নিজে তাহাকে বলিতে অনুরোধ করিল। কি করি এলাহাবাদে তাহার বাটী আসিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সে সেখানে ছিল না, ইটোয়া গিয়াছিল, দুদিনের মধ্যে আসিবে শুনিলাম, দুদিন সুতরাং তাহার জন্য সেই খানে অপেক্ষা করিতে হইল।'

হি। "যদি এলাহাবাদে সাক্ষীর কাছে যাওয়ার আবশ্যক ছিল তবে কেন আগে নায়েব তাহা আপনাকে লেখে নাই, কিম্বা আগে হইতে তাহার জোগাড় করে নাই।'

যা। "সেই সাক্ষী নহিলে যে হইবে না একথা আগে নায়েব জানিত না, তাহা জানিবার আগে আমাকে চিঠি লিখিয়াছিল। তাহার পর তাহা জানিবার পরে নিজে সে এলাহাবাদে আসিল এবং কি জানি তাতেও যদি কাজ না হয় তাই আমার যাইতে হইল।"

হি। "আচ্ছা কলিকাতা হতে আপনি যে পত্র পেয়েছিলেন তাতে কদিন পরে ঐ মকদ্দামা হইবে বলিয়া লেখাছিল।

যা। "৫। ৬ দিন পরে ?"

হি। "তবে আপনি দুদিন এলাহাবাদে থেকে কলিকাতায় এসে, সব গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে মকদ্দামা বজায় রাখতে পেরেছিলেন ?"

যা। "তা আর পারব না ? মহাশয় আমাদের ঐ সবই কাজ, আমরা তো আর কোম্পানির চাকর নই। কিন্তু দেখুন আপনি নিতান্ত অসভ্যের মত আমাকে মিথ্যাবাদী দাঁড় করাতে চেষ্টা করিছেন কিন্তু আর নয়—"

হি। "মহাশয় আর একটি কথা। যে সময় নীরজা ঠিক এলাহাবাদের ঘাটে এসে পৌঁছিল ঠিক সেই সময় আপনি কি করিতে সেই ঘাটেই গেছলেন ? যামিনী সক্রোধে বলিলেন"আপনার শ্রাদ্ধ করিতে—মহাশয়—আপনার সঙ্গে আমি বাক্যালাপ

করিতে চাহিনা আপনি অতি অসভ্য"হিরণকুমার তখন যামিনী হইতে চক্ষু ফিরাইয়া সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "ইহার কথায় মহাশয়ের কি বোধ হইতেছে ? সমস্তই তো শুনিলেন ! ভাবিয়া দেখুন সেই বৃষ্টি বাদলে নীরজা সেই খানে আসিবে তাহা না জানিলে কেন যামিনী নদীতীরে বেড়াইতে যাইবেন। অবশ্য যামিনী সেই নৌকার অপেক্ষায় ছিলেন পরে মাঝির সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস যামিনী দোষী। এদিকে নীরজাকে হরণ করিয়া কোথায় লইয়া যাইতে হইবে দস্যুদের শিক্ষা দিয়া আপনি নির্দ্দোষী দেখাইবার জন্যই সে রাত্রে কানপুর ছাড়িয়াছিল। আপনি চোর হইয়াই আবার কৌশলে নীরজার রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে" সমস্ত শুনিয়া সন্ন্যাসীর বিশ্বাস হইল যামিনী দোষী। তিনি আরক্ত লোচনে বলিলেন "যামিনী তুমি আমার সহিত চাতুরী করিয়াছ, যথার্থই তুমি দোষী ! কি ভয়ানক আমি এমন পাষণ্ডের হস্তে কন্যা অর্পণ করিতে যাইতেছিলাম" হিরণকুমার বলিলেন "কি সর্ব্বনাশ যামিনীর সহিত কন্যার বিবাহ ! তাহা অপেক্ষা তো নীরজাকে জলে ডোবাইয়া মারাও ভাল। কেন মহাশয় আপনার কন্যার কি বর জোটে নাই নাকি ! প্রমোদের যদি সহস্র দোষ থাকে তো যামিনীর চেয়ে প্রমোদ সুপাত্র। বিশেষতঃ আপনি একে তাহাকে অন্যায় দোষী করিতেছিলেন তারপর আপনি জানেন, প্রমোদের সহিত বিবাহে নীরজা সন্তুষ্ট হইবে এবং প্রমোদও আপনার কন্যায় অনুরক্ত, এরূপ স্থলে তাহাকে কন্যা না দিয়া আপনি কি করিয়া এই যামিনীনাথের সহিত বিবাহ স্থির করিতেছিলেন !" হিরণের কথা শুনিয়া যামিনী মনে মনে গর্জ্জিতে লাগিলেন। সকল শুনিয়া তাহার চিত্ত দমন করিয়া রাখা কঠিন হইয়া উঠিল, সরোষে বলিয়া উঠিলেন কন্যা দান সম্বন্ধে তাহার পিতা যাহা কহিবেন সহ্য হইবে, মহাশয় কথা কহিবার কে ?" হিরণকুমার ঈষৎ ক্রদ্ধভাবে বলিলেন "আচ্ছা পিতাই কন্যার যথার্থ হিতাহিত বুঝুন" কথা বার্ত্তার পর সন্ন্যাসী রোষগম্ভীর মৌণভাবে এই খান হইতে বিদায় লইয়া নীরজাকে আনিতে যামিনীনাথের বাড়ী যাত্রা করিলেন। হিরণের নিকট হইতে সন্ন্যাসীকে উঠিতে দেখিয়া যামিনীর যেন প্রাণে প্রাণ আসিল, তিনিও সন্ন্যাসীর সহিত বাটী গমন করিলেন। রাস্তায় আসিতে আসিতে তিনি বলিলেন মহাশয় আপনি উহার ঐ সকল কথায় বিশ্বাস করিয়া আমাকে কি যথার্থই দোষী মনে করিতেছেন ?" সন্ন্যাসী মৌন ভঙ্গ করিয়া বজ্র গম্ভীর স্বরে অথচ ধীরে ধীরে বলিলেন "বাস্তবিকই তুমি দোষী তোমার কর্ম্মের দণ্ড তুমি পাইবে"

যা। "আপনি অবিশ্বাস করিলেই আমার যথেষ্ট দণ্ড হইবে—অন্য কোন দণ্ডই তাহাহইতে আমার নিকট গুরু দণ্ড নহে—আমি আর কোন দণ্ডকে ভয় করি না—যদি দোষী বিবেচনা করিয়া নীরজাকে আমায় না দেন তো তাহা হইলেই আমার দণ্ডের

পরাকাষ্ঠা হইবে—কিন্তু মহাশয় আমার কি এই শেষ পুরস্কার!—ধী.

স। "পুরস্কার! তুমি পুরস্কার প্রত্যাশা কর! তুমি নীরজাকে চাও। তুমি, তুমি দস্যু, তুমি নীরজাকে চাও! বামন হইয়া চাঁদে হাত!"

যা। "আচ্ছা মহাশয় আমি দস্যু,কন্যাকে তবে প্রমোদকেই দান করুন, নির্দ্দোষ গুণবান প্রমোদকেই দান করুন, কিন্তু একটি কথা—আপনার প্রমোদের মত সহস্র গুণবান হইলেও আমার মত তাহাকে কে ভাল বাসিবে? আপনার কন্যার জন্য এমন নিঃস্বার্থ বিশুদ্ধ ভাল বাসা কে দিতে পারিবে?"

স। "তোমার প্রেম বিশুদ্ধ! তোমার প্রেম নিঃস্বার্থ?" বিশুদ্ধ প্রেমে গর্হিত কার্য্য কখনই সম্ভবে না। তোমার প্রেম প্রেম নামেরি যোগ্য নহে। রূপ-লালসাকে তুমি ভাল বাসা নামে সম্বোধন করিলে ঐ নামেরও কলঙ্ক হইবে। তোমার মত নীরজাকে কে ভাল বাসিবে? যাহাকে দিব সেই তোমা হইতে নীরজাকে ভাল বাসিবে, তোমা হইতে সকলেই সুপাত্র"

যা। "তবে তাহাই হৌক। কিন্তু আমার এই মিনতি আপনি আমাকে দোষী স্থির করিবার আগে এক বার নীরজার সহিত কথা কহিয়া দেখিবেন।" কথা কহিতে কহিতে তাঁহারা যামিনীর বাটীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। বাড়ী আসিয়া যামিনী সন্ন্যাসীর আদেশানুসারে নীরজাকে তাঁহার নিকট আনিয়া দিলেন। তিনি আজ কন্যাকে পালকি করিয়া নিজ বাসস্থানে লইয়া যাইবার মানস করিয়াছিলেন। পালকি আসিতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ তিনি নীরজার সহিত বসিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী যামিনীনাথের প্রতি সন্দেহ করিতেছেন শুনিয়া নীরজা বলিল, "তাহা অসম্ভব তাহা কোন মতেই হইতে পারে না, সে শপথ করিয়া বলিতে পারে যামিনী নির্দ্দোষী। হিরণকুমার নিশ্চয়ই যামিনীনাথের প্রতি অন্ধ হইয়া দোষারোপ করিতেছেন। সে কথায় বিশ্বাস করিয়া উপকারক ব্যক্তিকে দোষী করিলে ঘোর পাপী হইতে হইবে। নীরজার তাহা হইলে আজীবন কষ্ট পাইতে হইবে!" নীরজা আরো বলিল প্রমোদ যামিনীনাথ কেহই তাহাকে হরণ করেন নাই, বাস্তবিক সে দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। কেন মিছামিছি তাহার পিতা নির্দ্দোষদিগের প্রতি সন্দেহ করিতেছেন" কন্যার এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া সন্ন্যাসী আপনিও আবার বিচলিত হইতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ পালকি বেহারা আসিয়া বসিয়া রহিল, সন্ধ্যা অতিবাহিত হইয়া গেল কিন্তু পিতা কন্যা কথোপকথনে মত্ত হইয়া রহিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ—দেবমন্দিরে রাক্ষস।

নীরজাকে সন্ন্যাসীর নিকট আনিয়া দিয়া যামিনী অন্য গৃহে গিয়া বসিলেন। হিরণের কথা বার্ত্তা শুনিয়া অবধি রাগে

তাহার শরীর কাঁপিতেছিল। প্রমোদের সহিত নীরজার বিবাহ! আপনি নীরজাকে না পাইলে বরং সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু নীরজা প্রমোদের হইবে ইহা তাঁহার অসহনীয়। যামিনী ইহার প্রতীকারের উপায় ভাবিতে ভাবিতে অন্য গৃহে আসিয়া বসিলেন। সকল রূপ বাধা অতিক্রম করিয়া তিনি নীরজাকে বিবাহ করেন নাই বলিয়া তাঁহার এখন অনুতাপ হইতে লাগিল। এইস্থলে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, নীরজাকে বিবাহ করিতে যামিনী যদি এতই উৎসুক তবে এত দিন তাহাদের বিবাহ না হইবার কারণ কি? কালবিলম্বে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে বিবেচনায়, নীরজাকে আপন অধীনে পাইয়াও যামিনী কেন বিবাহ করিলেন না? যামিনীর মত লোকের বল-পূর্ব্বক বিবাহে কি আপত্তি হইতে পারে?

ইহার উত্তর, যামিনীর এ বিবাহে বিলক্ষণ একটি বাধা পড়িয়াছিল। যামিনী যখন প্রথমে বিবাহের অভিপ্রায়ে নীরজাকে বাড়ী আনেন, তখন তিনি ভাবেন নাই তাঁহার ইচ্ছার উপর তাঁহার মাতা জ্যেঠাই মা কোন কথা কহিবেন। কিম্বা প্রথমে যদিই বা কিছু বলেন—যামিনী বুঝাইয়া বলিলে তাঁহাদের যে ইহাতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তাহার আভাস মাত্রও তাঁহার মনে হইলে তিনি নীরজাকে এখানে না আনিয়া অন্য এক পৃথক বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাকে প্রথমেই সেইখানে রাখিতেন। কিন্তু বাড়ী আনিয়া বিবাহের অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার পর তাঁহার মাতা, বিশেষতঃ জ্যেঠাই মা এ বিবাহে মহা আপত্তি তুলিলেন। নীরজা অজ্ঞাতকুলশীলা,ইহাই এই আপত্তির প্রধান কারণ। যামিনী বিশেষরূপ জেদ করাতে অবশেষে বৃদ্ধা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া বসিলেন—তাহার যে ৫ লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ আছে বিবাহ হইলে যামিনীকে কিছুই না দিয়া, যামিনীর ভগিনীকে দিয়া যাইবেন। এই কথায় যামিনী নরম হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মহা মুস্কিল লাগিল, একদিকে ধন লোভ, অন্যদিকে নীরজার লোভ, অবশেষে ধনলোভই জয়ী হইল। অতটা টাকার মায়া তিনি সহজে ছাড়িতে পারিলেন না। কিন্তু নীরজার আশা যে ইহাতে তিনি একেবারেই ছাড়িলেন—তাহা নহে—আপাততঃ বৃদ্ধা যতদিন বাঁচিয়া থাকেন ততদিন পর্য্যন্ত বিবাহ বন্ধ রাখিতে মাত্র স্থির করিলেন। বৃদ্ধা পীড়িতা, বড় জোর আর এক বৎসর বাঁচিতে পারেন—এই অল্প দিনের জন্য অগত্যা নীরজাকে পাইবার লোভ সম্বরণ করিয়া থাকিতে বাধ্য হইলেন।

অল্প দিনের জন্য তো তাঁহার বিবাহের অপেক্ষা করিতে হইল, তাহা যেন দায়ে পড়িয়া করিলেন—কিন্তু বিবাহ করুন না করুন—নীরজার সহিত মন খুলিয়া যে দুটা গল্প করিবেন তাহাও তাঁহার অদৃষ্টে বড় একটা ঘটিত না। নীরজাকে একাকী পাওয়া তাঁহার বড় দুষ্কর হইত। নীরজা অন্তঃপুর মধ্যে অন্য স্ত্রীগণের সহিত যদিও

বেশী থাকিত না,যদিও উদ্যানেই সে বেশীর ভাগ কাটাইত, কিন্তু উদ্যান ভ্রমণ কালে যামিনীর ভগিনী কিম্বা কোন না কোন দাসী প্রায়ই তাহার সঙ্গে থাকিত, সুতরাং সে সময় কিছু যামিনীর মন খুলিয়া কথা কওয়া হইত না, কাজেই কোন্ দিন নীরজা একাকী থাকে যামিনী সর্ব্বদাই ইহার সন্ধানে থাকিতেন। নীরজাকে কিছুক্ষণ একাকী পাইলেই নীরজার সহিত বিবাহের কথা পাড়িয়া তাহার মনের ভাব জানিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাহার সহিত কথা কহিয়া যামিনী দেখিলেন নীরজাও এখন বিবাহে সম্মত নহে। নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিলে সে আরো এক বৎসর সময় চাহে। যামিনী দেখিলেন জোর করিয়া বিবাহ করিতে গেলে যে কেবল মাত্র তাঁহার ধনক্ষতি হয় তাহাও নহে, নীরজার ভালবাসা নীরজার ভক্তি ও তাহা হইলে হারাইতে হয়। যামিনী ভিতরে যাহাই হউক না কেন, বাহিরে লোকের নিকট সততা-ব্যবহার করিয়া সৎ বলিয়া পরিচিত হইতে অত্যন্ত ইচ্ছা করিতেন। তিনি অত্যন্ত প্রশংসা প্রিয়, নিন্দা সহ্য করিতে পারিতেন না। এমন কি, প্রশংসার জন্য তিনি আপন লাভের অংশ কিছু পরিমাণে ত্যাগ করিতেও প্রস্তুত হইতেন। নীরজা তাঁহাকে অতি সৎলোক বলিয়া জানিত, সেই হেতু তাঁহার প্রতি নীরজার অতিশয় ভক্তি ছিল, এখন বল পূর্ব্বক বিবাহ করিলে যেমন ধনক্ষতি হইবে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নীরজার সে ভক্তি ও হারাইবেন। একেবারে অত ক্ষতি স্বীকার করিতে যামিনীনাথ প্রস্তুত হইলেন না। ভাবিলেন আর কিছু দিনে যদি সকল বিষয়ে সুবিধা হয়, যদি ধনলাভও হয় এবং বালিকা আপনা হইতেই বিবাহ করে তো এই অল্প দিন ধৈর্য্য ধরাই ভাল।

অল্পদিনের জন্য অতদূর ক্ষতি স্বীকার করিয়া নীরজাকে লাভ করিতে হয় দেখিয়া যামিনী এ বিবাহ এতদিন করেন নাই, কিন্তু এখন সেজন্য তাঁহার অনুতাপ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ দুই দিন পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত-পত্নীর মৃত্যু হইয়াছিল, নীরজাকে তিনি এখন বিবাহ করিবেন এই আশাতে সম্পূর্ণ আমোদে ছিলেন, হঠাৎ সে আশায় নিরাশ হইয়া আরো মনোক্ষুণ্ণতা জন্মিল। অতিশয় নিরাশচিত্তে ভাবিতে ভাবিতে তিনি এই গৃহে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে এক জন দ্বারবানকে ডাকিতে লাগিলেন, দ্বারবান আসিয়া যামিনীর আজ্ঞা শুনিয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার সেই দ্বারবান এক জন লোক সঙ্গে করিয়া এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। নবাগত ব্যক্তি গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিবার পর দ্বারবান চলিয়া গেল। তখন যামিনীনাথ অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন, কথা কহিতে কহিতে অনেকবার তাঁহার মুখে ক্রোধ লক্ষণ প্রকাশিত হইল, অবশেষে কথা সমাপ্তে সে ব্যক্তি উঠিয়া বলিল "আপনার অনেক কাজ করিয়াছি কিন্তু এ কার্য্য এ অধীন হইতে হইবে না।" যামিনীনাথের বঙ্কিম নাসাগ্রভাগ রক্তিম বর্ণ হইল, কুটীল ভ্রূ যুগ কুঞ্চিত করিয়া তিনি বলিলেন

"তোমার যেমন অভিরুচি। কিন্তু বুঝিয়া কাজ করিও।" ইহার উত্তর কিছুই না দিয়া সে ব্যক্তি চলিয়া গেল, তখন যামিনী তাহার একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কি কথা কহিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে সেও চলিয়া গেল। যামিনী তখন আপন মনে একাকী বসিয়া চিন্তা নিমগ্ন হইলেন। পূর্ব্ব দিকে দুটি একটি তারা ফুটিল, যামিনীর গৃহ হইতে আকাশের এক ভাগ দেখা যাইতেছিল, যামিনী সেই ভাগে সেই তারকার পানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন। এই সময় সন্ন্যাসী যামিনীর সহিত বিদায় লইতে এই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী আসিয়া বলিলেন "যামিনী, আমি নীরজাকে লইয়া চলিলাম, কিন্তু একটি কথা—নীরজার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমি কতকটা চমৎকৃত হইয়াছি, তোমার দোষের বিষয় এখন ঠিক কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না—কিন্তু—"

যা। "মহাশয়, আমার একটি মিনতি শুনুন, আমিতো নীরজার যোগ্য পাত্র নইই, আমি যে নীরজার উদ্ধার করিয়াছিলাম তাহা আপনি ভুলিয়া যান, তাহা নীরজাকেও ভুলিতে শেখান, কিন্তু—"

বলিতে বলিতে অধীর স্বরে সন্ন্যাসীর চরণ ধরিয়া বলিলেন "কিন্তু বিনা অপরাধে আমাকে অপরাধী মনে করিবেন না"

স। "কি কর, যামিনীনাথ, ওঠ ওঠ"

যা। "মহাশয়, কূট তর্কে যদি সকল সপ্রমাণ হইত, তাহলে দেখুন দেখি যার পর নাই ঈশ্বরের স্বরূপ পর্য্যন্ত লইয়া এত গোল হইবে কেন? পাষণ্ড চার্ব্বাকেরা কি না বলিয়াছে? আপনিওতো শাস্ত্রজ্ঞ বিজ্ঞ পুরুষ, আপনাকে আর অধিক কি বলিব?"

স। "না। আমি এখনো তোমাকে অপরাধী বলে স্থির বিশ্বাস করি নাই। আজ আমি নীরজাকে নিয়ে চলিলাম, যদি তুমি অপরাধী না হও তো কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তোমাকেই কন্যা দান করিব।"

এই সময় নীরজা অন্তঃপুর হইতে আসিয়া বলিল "আমি প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি, এবার চলুন।" তখন নীরজা এবং সন্ন্যাসী যামিনীর নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। যামিনী দ্বারবানকে ডাকিয়া বলিলেন "যে ভৃত্যকে ইতি পূর্ব্বে কাজে পাঠাইয়াছি, বল আর সে কার্য্যের আবশ্যক নাই! শীঘ্র ফিরাইয়া আন।" অনেকক্ষণ পরে দ্বারবান আসিয়া বলিল "তাহাকে খুজিয়া পাইলাম না!"

জীব-জগতের ক্রমাভিব্যক্তি বিষয়ক য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মত-বিচার।

ক্রমাভিব্যক্তি-মত আমাদের দেশে নূতন নহে। সাংখ্য ও বেদান্তদর্শন এই ক্রমাভিব্যক্তি-মতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা মাত্র। ঈশ্বর ৬ দিনে সমস্ত সৃষ্টি-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিলেন—এই রূপ যাঁহাদিগের বিশ্বাস—এই রূপ যাঁহাদিগের অপূর্ণ শ্রম-কাতর ঈশ্বরের কল্পনা—সেই খৃষ্টান-সম্প্রদায় এই মতটির প্রচারে যে তটস্থ হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি! যাঁহারা মনে করেন, এই ছয় দিনের সৃষ্টিই ঈশ্বরের পূর্ণ সৃষ্টি—কিম্বা ঈশ্বর মধ্যে মধ্যে যদৃচ্ছাক্রমে এক একটা স্বতন্ত্র সৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহারা যে ঈশ্বরের শক্তিকে বস্তুতঃ খর্ব্ব করিয়া কল্পনা করেন তাহা বলা বাহুল্য। ঈশ্বরের সৃষ্টি অপূর্ণ কিন্তু উত্তরোত্তর পূর্ণতার দিকেই অগ্রসর হইতেছে! "পূর্ণ হওয়া এবং একেবারেই না হওয়া সৃষ্ট বস্তুর পক্ষে উভয়ই সমান। পূর্ণ যিনি তিনি চিরকালই পূর্ণ আছেন এবং পূর্ণ থাকিবেন—সৃষ্ট বস্তু অপূর্ণ না হইলে হইতেই পারে না—সৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্বই অপূর্ণতা-নিবন্ধন—এবং তাহা অপূর্ণ বলিয়াই তাহার উন্নতির প্রয়োজন।—" (ভারতী ফাল্গুন) ঈশ্বরের সৃষ্টি স্বল্প-জ্ঞান মনুষ্য-কার্য্যের ন্যায় হইতে পারে না। আমাদিগের দৃষ্টি-পরিসর অতি পরিমিত। আমরা কোন অতীব দূর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য মনে করিলে সেই উদ্দেশ্য-সাধন-উপযোগী সমস্ত আয়োজন একেবারে পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিতে পারি না---যেমন যেমন কার্য্য উপস্থিত হয়—যেমন যেমন প্রয়োজন বুঝিতে পারি—তদনুসারে উপস্থিত মতে তাহার বিধান করিয়া থাকি—কিন্তু ঈশ্বরের কার্য্য-প্রণালী যদি আমাদিগের কার্য্য-প্রণালীর ন্যায় মনে করি, তাহা হইলে কি ঈশ্বরের পূর্ণতাকে খর্ব্ব করা হয় না? সৃষ্টির ক্রমোন্নতিই যদি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তিনি এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য যত কিছু আয়োজনের প্রয়োজন—তৎসমুদায় একেবারেই পূর্ব্ব হইতে সৃষ্টি-বীজ মধ্যে নিহিত করিয়া রাখিয়া—সেই বিশ্ব-বীজ—নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে উন্নতি হইতে উন্নতিতে ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত—ক্রমশঃ অভিব্যক্ত করিতেছেন—ইহাই কি সঙ্গত অনুমান নহে? এবং এই অনুমানটি শুদ্ধ অনুমান মাত্র নহে—ইহার প্রমাণও সৃষ্টি ব্যাপারে পদে পদে দৃষ্ট হয়।

এই অভিব্যক্তি-মত আমাদের দেশে পুরাকালে প্রচারিত হয়, কিন্তু বলিতে গেলে য়ুরোপে সে দিন মাত্র ইহার প্রথম সূত্রপাত হইয়াছে। Wolff (উল্‌ফ্) নামক পণ্ডিত ১৭৫৯ এই মতটি উপজনন-বাদ (Theory of Epigenesis) নামে প্রথম

প্রচার করেন। অধুনাতন য়ুরোপের অভিব্যক্তিবাদিগণের মধ্যে যদিও উল্‌ফ্‌কে এই মতের প্রথম প্রবর্ত্তক বলিয়া গণ্য করিতে হয়—কিন্তু Robinet, Bonnet, Geoffroy S. Hilaire, Weekel, "সৃষ্টি-চিহ্ন" নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার, Lamarck, এবং অধুনাতন জীবন্ত বিখ্যাত গ্রন্থকারদ্বয় Darwin ও Wallace প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই মতটিকে দৃঢ় বৈজ্ঞানিক পত্তনভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে যে বহুল সাহায্য করিয়াছেন তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয়।

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে F. B. Robinet কর্ত্তৃক Amsterdam নগরেDe La Nature নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানি সে সময় এত দূর লোক-প্রিয় হইয়াছিল যে অনতিকাল মধ্যে উহার তিন সংস্কার উঠিয়া যায়। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থের স্থূলমর্ম্ম এই;—জগতের সমস্তই একটি অখণ্ড জীব-শৃঙ্খল ভিন্ন আর কিছুই নহে—অর্থাৎ জগতের সকল পদার্থেরই জীবন আছে—পৃথিবী প্রস্তর গ্রহ তারা বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী সকলই এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—সকলই জীবন-বিশিষ্ট—সকলেরই বোধ-শক্তি আছে—সকলই বর্দ্ধিত হয়—সকলেরই প্রবৃত্তি-বাসনা আছে—সকলেই বংশ-বিস্তার করিতে সমর্থ। তিনি বলেন—অগ্নি অতীব বুভুক্ষু ও সর্ব্বভুক (আমাদের ভাষায় অগ্নির আর এক নাম সর্ব্বভুক) —বায়ুই ইহার খাদ্য—বায়ুর অভাবে অগ্নি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। আবার বায়ুর ভক্ষ্য জল—জলের ভক্ষ্য অন্যান্য পদার্থ; এই জন্য তিনি বলেন—ধাতু-উৎস-জলে—নবণ, লৌহ প্রভৃতি অনেক প্রকার ধাতু প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি বলেন,—"আমি প্রস্তর সকলের এবং প্রস্তর-আধার সকলের অঙ্কুর দৃষ্টি করিবার জন্য অনেক অন্বেষণ করিয়াছি—আমার অনুসন্ধানও তৎসম্বন্ধে বিফল হয় নাই—এমন কি—প্রস্তর ও ধাতু-সকল কি প্রকারে স্বীয় স্বীয় শরীর হইতে অঙ্কুর নিঃসৃত করে, তাহা পর্য্যন্ত আমি দেখিতে পাইয়াছি। আমি তাহাদিগের স্ত্রী-পুরুষভেদ নির্ণয় করিতে পারি নাই বটে কিন্তু তাহাতে কি?—অনেক জন্তু ও বৃক্ষেরও তো এপর্য্যন্ত স্ত্রীপুরুষভেদ নির্ণয় হয় নাই। অবশেষে আমরা ইহাও দেখিতে পাইয়াছি, প্রস্তর এবং ধাতু-গর্ভে আবরণ-বিশিষ্ট অসংখ্য প্রস্তর ও ধাতুর ভ্রূণ-সকল নিহিত থাকে—তাহারা জন্তুদিগের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত ও পরিপোষিত হয়।"

এইরূপ বিশ্বাস-অনুসারে Robinet বলেন যে, সকল পদার্থই শরীর-যন্ত্র বিশিষ্ট—তাঁহার মতে, প্রত্যেক স্ফটিক-খণ্ড, অসংখ্য আণবিক স্ফটিক শরীরের সমষ্টি মাত্র এবং সমস্ত স্ফটিক-খণ্ডের যে আকার ও গুণ-সকল দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায়ই সমান রূপে প্রত্যেক স্ফটিক-শরীরে আছে—এবং এই প্রকারে, জীব মাত্রেই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আণবিক জীবের সমষ্টিমাত্র। প্রত্যেক কুকুর আণবিক কুকুরের সমষ্টি, প্রত্যেক মনুষ্য আণবিক মনুষ্যের সমষ্টি!

আবার তিনি আরও বলেন,—যেমন

ব্যাঙাচি ক্রমশ ভেক-আকারে অভিব্যক্ত হয়—সেইরূপ ভেক পুনরায় অধোগমন করিয়া আবার মৎস্য-আকার ধারণ করে,কিন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞান এই প্রকার অভিব্যক্তি-মতের পোষকতা করেন না। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অভিব্যক্তি মতের অনেক পরিবর্ত্তন হইতেছে। এক কালে য়ুরোপে আর একটি মতের প্রাদুর্ভাব ছিল। তাহার নাম "বাক্স-বন্দি" কিম্বা 'কৌটা-বন্দি'-মত (Theory of Emboitement) এই মতের মর্ম্ম এই, কাশীর কৌটাতে একটা কৌটার মধ্যে যেমন অসংখ্য কৌটা পরম্পরা থাকে সেইরূপ জীব জন্তুগণের প্রত্যেক জাতির মূল বীজের মধ্যে সেই জাতির ভাবী বংশ-পরম্পরা প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত থাকে।

এক সময় এই মতাবলম্বী অনেক লোক ছিল। এমন কি, বিখ্যাত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-বেত্তা Cuvier এই মতের পক্ষপাতী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আবার সময়-ক্রমে এই মতটিও ধরাশায়ী হইয়া—ইহার স্থানে Wolff প্রবর্ত্তিত উপজনন-বাদ সমুত্থিত হয়। এই Wolff-প্রবর্ত্তিত অভিব্যক্তি বিষয়ক মতটির সহিত অধুনাতন মতের কতকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়—এই জন্যই Wolff য়ুরোপের বর্ত্তমান অভিব্যক্তি-মতের প্রথম পথ-প্রদর্শক বলিয়া ন্যায্যরূপে অভিহিত হইতে পারেন।

Wolff এই প্রকার মত প্রকাশ করিলেন যে,কোন শরীর-যন্ত্রের প্রথম উৎপত্তি-কালে—একটি শরীর হইতে সম্পূর্ণ আর একটি শরীর একেবারেই উৎপন্ন হয় না, পরন্তু ঐ শরীর-যন্ত্রের প্রত্যেক অঙ্গ একাদিক্রমে ক্রমশ নিঃসৃত হইয়া একটি সর্ব্বাঙ্গীন নূতন শরীরে পরিণত হয়। ফলিতার্থে এই মতটি এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, কোন জন্তু কিম্বা বৃক্ষের প্রত্যেক অংশই, পূর্ব্ববর্ত্তী অংশের ফল স্বরূপ—এবং সেই অংশটি আবার নিজে পরবর্ত্তী আর একটি নূতন অংশের কারণ স্বরূপ। অতএব ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমান হয়, যে অবশ্যম্ভাবী প্রক্রিয়া অনুসারে পরম্পরাক্রমে শরীরী জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অভিব্যক্ত হয়, তাহারই নাম উপজনন-প্রক্রিয়া (Epigenesis) এবং প্রত্যেক শরীর-যন্ত্র-বিশিষ্ট জীবের শরীরস্থ সমস্ত অঙ্গই সেই জীব-বিশেষের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক শক্তি হইতে নিঃসৃত হয়। এইত গেল উল্‌ফের মত। ইহার পরে Lamarck ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে আর একটি নূতন মত প্রকাশ করেন।

শরীর যন্ত্রের কোন অঙ্গ ব্যবহার করিলে পরিপুষ্ট হয়,এবং ব্যবহার না করিলে ক্ষীণ হইয়া যায়, এবং কি জীব জন্তু, কি বৃক্ষলতা, উহাদের বাহ্য অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুসারে উহাদের প্রত্যেকের শরীরে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়—এই যে সর্ব্বজন-পরীক্ষিত সত্যটি, ইহারই উপর Lamarck স্বকীয় মত স্থাপন করিয়াছিলেন।

কোন প্রাণী যদি স্বজাতির অস্তিত্ব স্থায়ী করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহার চতুষ্পার্শস্থ প্রত্যেক পরিবর্ত্তনে যে কোন নূতন অভাবের উৎপত্তি হয়, সেই অভাবের কোন প্রকার প্রতিবিধান না করিলে চলে না। এবং এই সকল নূতন অভাব সেই প্রাণীকে নূতন কার্য্য সাধনে এবং নূতন অভ্যাস অবলম্বনে উত্তেজিত করে। এইরূপে যে সকল অঙ্গ পূর্ব্ব-অবস্থায় বড় একটা ব্যবহারে আইসে নাই—সেই সকল অঙ্গের প্রয়োজন বর্দ্ধিত হওয়ায় অধিক চালনা হয়, এবং উহা হইতেই নূতন অঙ্গ-সকল পরিস্ফুটিত বা অভিব্যক্ত হয়। পক্ষান্তরে, যে সকল অঙ্গ অব্যবহৃত থাকে, তাহারা ক্ষীণ এবং খর্ব্ব কিম্বা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়।

কোন প্রাণীর বাহ্য অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাহার কতকগুলি অঙ্গ অন্তর্হিত এবং কতকগুলি নূতন অঙ্গ পরিস্ফুট বা অভিব্যক্ত হইতে পারে, এই কথাটি মানিয়া লইয়া ল্যামার্ক এই প্রকার মত প্রকাশ করিলেন যে, কোন জন্তুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন-বৈলক্ষণ্য অনুসারে তাহার অভ্যাস সকল নির্দ্দিষ্ট হয় না, পরন্তু তাহার অভ্যাস-অনুসারেই তাহার শারীরিক আকার গঠিত হয়। শত্রুগণের নিকট হইতে পলায়ন করিবার উদ্দেশে হরিণদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে চটুলতা প্রদত্ত হয় নাই, পরন্তু তাহারা হিংস্র জন্তুগণের সম্মুখে পড়িয়া, তাহাদিগের কবল হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত দ্রুতপদক্ষেপে পলাইতে বাধ্য হওয়াতেই তাহাদের শরীরও ক্রমশঃ তদুপযোগী হইয়াছে। এই অভ্যাস-প্রভাবে তাহাদিগের শরীরে শুদ্ধ যে অপরিসীম চটুলতা জন্মিয়াছে তাহা নহে, পরন্তু যে সকল লঘু অঙ্গের উপর তাহাদিগের গতি-চাপল্য নির্ভর করে, সেই সকল অঙ্গও এই অভ্যাস নিবন্ধন গঠিত হয়। এই মতানুসারে, জীব জন্তু বৃক্ষ লতাদি সামান্য হইতে জটিল, জটিল হইতে জটিলতর অবস্থায় ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহার মধ্যে সামুদ্রিক জীবও উদ্ভিদ, ভৌমিক জীবও উদ্ভিদগণের পূর্ব্ববর্ত্তী—এবং এই ভৌমিক জীবও উদ্ভিদের শারীরিক আকার, সামুদ্রিক জীবও উদ্ভিদের শারীরিক আকার অপেক্ষা উন্নত।

তাঁহার মতে, সকল পদার্থের মধ্যেই ক্রমোন্নতির নিয়ম অন্তর্নিহিত আছে—এই নিয়মানুসারে অচল জড় পদার্থ হইতে প্রাণের উৎপত্তি হইল, তৎপরে প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়-বোধ অভিব্যক্ত হইল। এবং অবশেষে এই প্রক্রিয়া অনুসারেই বুদ্ধিহীন জীব বুদ্ধি-সমন্বিত হইল।

কিন্তু যখন ল্যামার্ক দেখিলেন যে নানা শ্রেণীর অসংখ্য জীব এখনও একই অবস্থায় আছে, তাহাদিগের মধ্যে উন্নতি-প্রবণতা কিছু মাত্র লক্ষিত হয় না—তখন এই আপত্তিটি খণ্ডন করিবার জন্য তিনি আর একটি অনুমানের আশ্রয় লইলেন। সে অনুমানটি এই—প্রকৃতি একটি যন্ত্র বিশেষ, ঈশ্বর প্রকৃতির উপর যে সকল নিয়ম মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন,প্রকৃতি বাধ্য হইয়া সেই নিয়মানুসারেই কার্য্য করে এবং এইরূপে প্রকৃতি দেবী স্বতঃ-প্রজনন-প্রণালী অনুসারে (spontaneous generation) ক্রমাগত জীবও উদ্ভিদের অসংখ্য অসংখ্য

বীজাঙ্কুর ক্রমাগত অবিশ্রামে উৎপাদন করিতেছেন। তাঁহার মতে (monad) প্রাণী-বীজ সকল অহরহ স্বতঃ উৎপন্ন হইয়া উন্নত হইতে উন্নততর জীবে যুগযুগান্তরে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইতেছে।

ল্যামার্ক প্রচারিত মতের এই তো স্থূল মর্ম্ম। সর্ব্বশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, উরাং-উটাং জাতীয় বানর হইতে মনুষ্যজাতি অভিব্যক্ত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে মনুষ্যের উৎপত্তি বিষয়ক এই মতটি সর্ব্ব প্রথমে ল্যামার্কই প্রচার করেন। Infusoria কীট প্রভৃতি অতি নিম্ন শ্রেণীর জীবসকল কেন অদ্যাবধি পৃথিবীতে বর্ত্তমান, তাহারই একটা সঙ্গত কারণ দাঁড় করাইবার জন্য এবং তাঁহার প্রচারিত মতের সহিত এই ঘটনার সমন্বয় করিবার নিমিত্তই তিনি প্রকৃতির এই স্বতঃ-প্রজননী প্রক্রিয়ার কল্পনা করিয়াছিলেন। পুরাকালের Lucretius বলিতেন যে, প্রকৃতি দেবীর স্বাভাবিক কতকগুলি গর্ভ ভূতলের সহিত সূত্র দ্বারা আবদ্ধ আছে, সেই গর্ভে জীব জন্তুর অহরহ জন্ম হয়। এই অনুমানটি যেরূপ অপ্রামাণ্য, Lamarck কৃত অনুমানটিরও এ পর্য্যন্ত বিশিষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এই স্বতঃ-প্রজনন-বিষয়িনী প্রক্রিয়া লইয়া Tyndal প্রভৃতি অধুনাতন পণ্ডিতগণের মধ্যে এখনও বাদানুবাদ চলিতেছে।

পৃথিবীতে অদ্যাবধি যত প্রকার জীব জন্তুর উৎপত্তি হইয়াছে, বোধ হয় তাহাদের প্রত্যেকেরই অন্তর্ভূত অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর জীব এখনও পর্য্যন্ত পৃথিবীতে বিদ্যমান। অতএব পরিবর্ত্তন-নিয়মে যেরূপ নূতন নূতন জীব ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইতেছে, সেইরূপ স্থায়িত্ব-নিয়মে কতকগুলি জীব জন্তু. চিরকালই পৃথিবীতে রহিয়া যাইতেছে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এই নিয়মটির নাম (Persistence of Type) "মূল আদর্শের স্থায়িত্ব" রাখিয়াছেন। এই নিয়মানুসারে দেখা যায় জীব-ইতিবৃত্তের অতি-পূর্ব্বতন যুগ হইতে অদ্যাবধি কোন কোন জাতীয় জীবের বংশাবলী মধ্যে কিছু-মাত্র পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই।

অভিব্যক্তি বিষয়ক ল্যামার্কের এই মতটিও কালক্রমে লুপ্ত-প্রতিষ্ঠ হয় এবং ইহার স্থলে ৫০ বৎসর পরে Darwin প্রচারিত "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" নামক আর একটি নূতন মত সদর্পে মস্তক উত্তোলন করে। আজ কাল এই মতটির রাজত্ব চলিতেছে কিন্তু ইহারও সিংহাসন যে অটল নহে তাহার চিহ্ন এর মধ্যেই কিছু কিছু দেখা দিতেছে। এই মতটি কি —সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে। ইহা একটি সুসিদ্ধান্ত সত্য যে, সকল জীব জন্তু ও বৃক্ষলতা প্রায়ই এত অধিক সংখ্যায় সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করে যে, তাহারা সকলই সমানরূপে পরিপুষ্ট হইতে না পারিয়া বিনষ্ট হয়। তাহাদের মধ্যে যে যত নিম্নশ্রেণীস্থ, তাহাদের সন্তান সন্ততিও তত অধিক পরিমাণে জন্ম-গ্রহণ করে। সেই সন্তান-সন্ততি মধ্যে

যাহারা স্বভাবতঃ অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ কিম্বা অন্য কোন উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন তাহারাই আত্ম-জীবন রক্ষণে সমর্থ হয় এবং অবশিষ্ট মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। ইহাও একটি সর্ব্বজন-পরিজ্ঞাত বিষয় যে, পিতা মাতার সহিত সন্তান সন্ততির যেরূপ এক দিকে কতক অংশে সাদৃশ্য, সেইরূপ আবার কতক অংশে প্রভেদও থাকে।

অতএব সন্তানসন্ততির মধ্যে যাহারা "সর্ব্বাংশে উপযুক্ত" (best fitted) তাহারাই পৃথিবীতে থাকিয়া যায়। এই সন্তান সন্ততির মধ্যে যাহার যে কোন উপকারী গঠন-বৈলক্ষণ্য উৎপন্ন হয়, তাহাই কুল-পরম্পরায় প্রবাহিত হইয়া আরও বলবৎ হইয়া উঠে এবং তাহারই আনুসঙ্গিক (correlative) অন্যান্য গঠন-বৈলক্ষণ্য আপনা হইতেই অভিব্যক্ত হয়। যে সকল পরিবর্ত্তনে বাহ্য অবস্থার সহিত শরীর-যন্ত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা হইতে পারে, এই রূপ পরিবর্ত্তন সকল জীব-শরীরে সংঘটিত হয় এবং এইরূপে অল্পে অল্পে বংশ পরম্পরাক্রমে সেই সকল জীবের আকার এতদূর পরিবর্ত্তিত হয় যে অবশেষে তাহাদিগকে নূতন জাতীয় জীব বলিয়া আমরা নির্দেশ করি।

এই জাতির উৎপত্তি লইয়া য়ুরোপীয় প্রাকৃতিক ইতিবৃত্তবেত্তা পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেক দিন ধরিয়া বাদানুবাদ চলিতেছে। এক দলের মত এই যে, জীবজন্তু উদ্ভিদ্‌দিগের মধ্যে যে সকল বিশেষ বিশেষ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকই ঈশ্বরের স্বতন্ত্র সৃষ্টি। পূর্ব্বসৃষ্ট জীব ও উদ্ভিদগণের সহিত তাহাদের কোন যোগ নাই। আর এক দলের মত এই যে, একজাতি হইতেই আর এক জাতি অভিব্যক্তি-নিয়মে ক্রমশ উৎপন্ন হইয়াছে। কোন দুই জাতি সম্পূর্ণ রূপে পৃথক আপাতত প্রতীয়মান হইলেও তাহাদিগের উৎপত্তি-মূল একই। তাহারা উভয়ই একটি শৃঙ্খলের অংশ মাত্র। আজকাল ডারুইন এই শেষোক্ত মতটির অধিনেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই মতের প্রথম প্রবর্ত্তক না হউন কিন্তু তাঁহা কর্ত্তৃকই যে এই মতটি (origin of Species) "জাতির উৎপত্তি-মূল" নামক গ্রন্থে পরিস্ফুট রূপে ব্যক্ত এবং দৃঢ় পত্তন ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ফরাসিস্ দেশীয় Lamarck, Geoffroy, Saint Hilaire প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই মতের প্রথম সূত্রপাত করেন। ইহাঁরা সকলেই অভিব্যক্তিবাদী। তবে, এই অভিব্যক্তি যে নিয়মে, যে প্রণালীতে সম্পাদিত হয়, সেই নিয়ম সেই প্রণালী লইয়াই তাঁহাদিগের মধ্যে মত-ভেদ দৃষ্ট হয়। ডারুইন-ই "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" মতটির প্রথম প্রবর্ত্তক। এই মতটির আজকাল এতদূর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে, যাতে তাতে এই নিয়মটি খাটানো হয়। এমন কি ঔষধের মধ্যে যেরূপ হলোয়ের বটিকা, তত্ত্বালোচনার পক্ষেও "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের" মতটী তদ্রূপ দাঁড়াইয়াছে। বস্তুতঃ "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" এই নামটী বড় শুভক্ষণে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

প্রকৃতিদেবী নির্ব্বাচন করিতেছেন এইরূপ কবিতার ভাষায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ব্যক্ত হওয়ায় যেরূপ একদিকে লোকের চক্ষে ধূলি প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিতদিগের একটী উপায় হইয়াছে, সেইরূপ আর এক দিকে আসল কথাটী দৈব-যোগে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এই মতের আশ্রয় লইয়া ডারুইনের কোন কোন শিষ্য নাস্তিকতা সমর্থন করেন। কিন্তু বস্তুত ইহার সহিত নাস্তিকতার কোন যোগ নাই। "প্রত্যেক জীবের পক্ষে যে কোন পরিবর্ত্তন মঙ্গল-জনক তাহাই প্রকৃতিদেবী নির্ব্বাচন করেন এবং তাহাই বংশপরম্পরা ক্রমে প্রবাহিত হয় এবং যাহা অনিষ্টকর তাহা স্থায়ী হইতে পারে না" এই যে তাঁহাদিগের মূল মত, ইহার মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় আস্তিকতাই ত গূঢ়রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। নির্ব্বাচন-শক্তি অন্ধ জড়ের হইতে পারে না। অতএব যে শক্তি দ্বারা এইরূপ নির্ব্বাচন-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহা অবশ্য জ্ঞানস্বরূপ এবং যাহা উপকারী যাহা মঙ্গলজনক একমাত্র তাহাই নির্ব্বাচিত হওয়া কোন অমঙ্গল পুরুষের কার্য্য হইতে পারে না—অতএব যে শক্তি দ্বারা এইরূপ নির্ব্বাচিত হয় তিনি অবশ্য মঙ্গলস্বরূপ। সৃষ্টিকার্য্যের অপূর্ণতা দেখাইয়া যাঁহারা ঈশ্বরের অপূর্ণতা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন অথচ তাঁহারা যদি Darwin মতাবলম্বী হয়েন এবং ক্রমোন্নতি-নিয়মে বিশ্বাস করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের ও-কথা বলিবার আর অধিকার থাকে না। যেহেতু, যদি সমস্ত সৃষ্টি চিরকাল সমান ভাবেই থাকিত—যদি বর্ত্তমান অবস্থাই তাহার উন্নতির শেষ সীমা হইত—তাহা হইলেই বলা যাইতে পারিত ঈশ্বরের শক্তি সীমাবদ্ধ। কিন্তু যখন উন্নতি হইতে উন্নতিতে ক্রমাগতই সৃষ্টির গতি দেখা যাইতেছে, তখন তাহা কিরূপে বলা যাইতে পারে। তবে, সৃষ্টি একেবারেই পূর্ণ হইতে পারে না—যেহেতু দুইটি সম্পূর্ণরূপে পূর্ণবস্তু একত্রে থাকা অসম্ভব। আবার, যিনি মঙ্গলস্বরূপ ও পূর্ণস্বরূপ, তাঁহার সৃষ্টি কখন চিরকাল সমানরূপে অপূর্ণ থাকিতে পারে না। ঈশ্বর পূর্ণস্বরূপ এবং মঙ্গলস্বরূপ বলিয়াই সৃষ্টির অপূর্ণতা ক্রমশঃ হ্রাস হইবারই কথা, এবং যে সৃষ্টি ক্রমাগত উন্নতি হইতে উন্নতিতে, মঙ্গল হইতে মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহার কারণ কোন পূর্ণস্বরূপ এবং মঙ্গল-স্বরূপ পুরুষ হইবারই কথা। অতএব যে দিক দিয়াই দেখ, সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। যদি আমরা প্রথমে ঈশ্বরের স্বরূপ মানিয়া লইয়া সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই—তাহা হইলেও দেখিতে পাই সৃষ্টির ক্রমাভিব্যক্তি ভিন্ন সৃষ্টির পূর্ণতা কখনই হইতে পারে না—আবার যদি সৃষ্টির প্রকৃতি এবং নিয়মের আলোচনা করিয়া ঈশ্বর-স্বরূপের সিদ্ধান্ত করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলেও দেখিতে পাই—পূর্ণস্বরূপ ঈশ্বর মূল কারণ না হইলে সৃষ্টির ক্রমোন্নতি বা ক্রমাভিব্যক্তি সম্ভবে না। অতএব আরোহ ও অবরোহ উভয় প্রণালী অনুসারেই সৃষ্টি এবং ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে।

যাহা হউক এই 'প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন' নিয়মটি কি তাহা আজকাল সকলেরই ভাল করিয়া অবগত হওয়া আবশ্যক—অবসর ও স্থানাভাব না হইলে ভবিষ্যৎ সংখ্যায় এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

চীন।

চীন দেশের সকলই নূতন, সকলই অদ্ভুত। আর্য্য জাতীয়দিগের সহিত প্রায় তাহাদের কিছুই মিল নাই। ইউরোপে যাও, আমেরিকায় যাও, আমাদের সহিত তবু অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিতে পাইবে, কিন্তু চীন দেশে যাও, তাহাদের আচার ব্যবহার রীতি নীতি সকলই একেবারে নূতন ও অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইবে। স্প্রতি আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য মহাশয় চীন দেশে পর্য্যটন করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার প্রমুখাৎ তথাকার যে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করা গিয়াছে এবং অন্যান্য ইউরোপীয় পর্য্যটকদিগের গ্রন্থে যাহা পাঠ করা গিয়াছে তাহা এরূপ আমোদজনক যে, ভারতীর পাঠকদিগকে সেই আমোদের অংশ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

প্রথমতঃ 'চীন' এই শব্দের ব্যুৎপত্তি কি? এক জন অজ্ চীনবাসীর নিকট তাহাদের দেশকে চীন দেশ বলিলে কিম্বা তাহাকে চীনবাসী কিম্বা চিনেম্যান বলিয়া ডাকিলে তাহার একেবারে চক্ষুস্থির হয়! এই সম্বন্ধে রোম্যান ক্যাথলিক পাদ্রি অ্যাবে হুক্ (Abe Huc) একটি গল্প বলেন। তিনি একজন চীনের যুবা রাজকর্ম্মচারীর নিকট য়ুরোপের বৃত্তান্ত বলিতেছিলেন। চীনবাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের ভাষায় আমাদের দেশকে কি বলে?" পাদ্রি উত্তর করিলেন "আমরা তোমাদের দেশকে 'চাইনা' এবং তোমাদের দেশের লোককে 'চাইনীজ' বলি। ইহাতে চীনবাসী একেবারে অবাক্ হইলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা ঐ দুটি কথার বাস্তবিক অর্থ কি? "এত কথা থাকিতে আমাদের দেশকে এবং আমাদের দেশের লোককে 'চাইনা' ও 'চাইনীজ' এই দুই নাম দেওয়া হইল কেন? আমরা তোমাদের গৌরবান্বিত দেশের সুখী অধিবাসীদিগকে 'সি ইয়াংজিন' বলিয়া ডাকি। 'সি' এই শব্দটির অর্থ পশ্চিম 'ইয়াং' এই শব্দটির অর্থ সমুদ্র এবং 'জিন' এই শব্দের অর্থ মনুষ্য। অতএব এই কথাগুলি একত্র করিলে "পশ্চিম সমুদ্রের মনুষ্য" এইরূপ বুঝায়। আমরা ইউরোপীয়দিগের এই নাম দিয়াছি। এবং ইউরোপের বিভিন্ন জাতিদিগের স্ব স্ব দেশে যে নাম প্রচলিত আমরা তাহারই সাধ্যমত

অনুকরণ করিয়া আমাদের ভাষায় তাহাদের নাম রাখিয়াছি। তাহার দৃষ্টান্ত Homme Faran-cais (Francais অর্থাৎ ফরাসিস্) আমরা তাহাদিগকে বলি ফু-লাং-সিন্।" ইন্ কি-লি (অর্থাৎ ইংরাজ) তাহাদিগকে আমরা "হুং-মাস-জিন্" বলি অর্থাৎ "লোহিত কেশ-বিশিষ্ট মনুষ্য'। কারণ, শোনা যায় তাহাদিগের চুল লাল। এবং "ইয়্যা-মে-লি-কিয়েন্" (Americans) তাহাদিগের আমরা নাম রাখিয়াছি 'রঙ্গিন-পাতাকা-ওয়ালা মনুষ্য" কারণ তাহাদিগের জাহাজে বিচিত্র রঙ্গের পতাকা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব দেখ আমরা এই যে সব নাম রাখিয়াছি তাহার এক একটা অর্থ আছে। সেইরূপ তোমাদেরও 'চাইনা' এবং 'চাইনীজ" এই দুই শব্দের অবশ্য কোন না কোন অর্থ থাকিবে।"

চীনের পুরাতন নাম "তিবেন শা'; এখনও এই নামের ব্যবহার আছে। ইহার অর্থ—"কেবল স্বর্গ অপেক্ষা নিকৃষ্ট।" কিন্তু চীনেরা সচরাচর আপনাদের দেশকে "চং-কুয়ো" বলে। "চং-কুয়োর" অর্থ মধ্য রাজ্য। তবে "চীন" এই শব্দটি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল! চীনদিগের মধ্যে এই একটি রীতি প্রচলিত আছে যে, যখন যে রাজবংশ চীনে আধিপত্য লাভ করে সেই রাজবংশের নামানুযায়ী তাহারা দেশের নাম রাখিয়া থাকে। রাজা 'হন' এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের রাজত্বকালে চীনেরা আপনাদিগকে হন্-জিন্ অর্থাৎ হনের মনুষ্য বলিয়া অভিহিত করিত। এবং যখন থং রাজ-বংশের গৌরব-সূর্য্য হন্ রাজবংশের গৌরবকে মলিন করিয়া ফেলিল, তখন আবার চীনেরা আপনাদিগকে থং-জিন্ অর্থাৎ থঙ্গের মনুষ্য বলিত। যখন মঞ্চু রাজবংশের আধিপত্য হইল তখন চীনেরা আপনাদিগকে "ৎসিং-জিন" অর্থাৎ ৎসিং-মনুষ্য বলিত। এই ৎসিং হইতে বোধ হয় চিন শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে।

চীন রাজ্যটি অতি বৃহৎ রাজ্য, বিস্তারে প্রায় পাঁচ হাজার ক্রোশ হইবে। এত বৃহৎ হইলেও, কোন বিদেশীয় লোক, কি রুস্ কি আফ্‌গান, কি হিন্দু, কি ইংরাজ, চীন গবর্ণমেণ্টের অগোচরে কিম্বা বিনা অনুমতিতে চীন রাজ্যের সীমা এপর্য্যন্ত কেহই অতিক্রম করিতে পারে নাই। একবার ম্যানিং নামক একজন সম্পত্তিশালী ও সুশিক্ষিত ভদ্র ইংরাজ চীন রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, চীন জাতীয়দিগের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে মিশিবার অভিপ্রায়ে ক্যাণ্টনে যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছিয়া তিনি চীনেদিগের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিলেন, দাড়ি রাখিলেন, এবং শ্রম-সহকারে চীন ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলেন। যখন বাহ্য আকার প্রকার আচার ব্যবহার ভাষায় চীনেদিগের সহিত তাঁহার কিছুমাত্র প্রভেদ রহিল না, যখন তিনি বুঝিলেন যে, বিদেশীয় বলিয়া আর তাঁহাকে কেহই চিনিতে পারিবে না, তখন উপযুক্ত সময় হইয়াছে বিবেচনা করিয়া স্বকার্য্য সাধনে উদ্যত হইলেন। এমন সময় এক জন চীনের রাজ-কর্ম্মচারী আসিয়া তাঁহাকে বলিল যে, তাঁহার সঙ্কল্প প্রকাশ হইয়াছে—কেন বৃথা তিনি প্রবঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিতেছেন—ইংরাজি ফ্যাক্‌টরির সীমা অতিক্রম করিয়া যাহাতে তিনি চীনরাজ্যে পদার্পণ করিতে না পারেন পূর্ব্ব হইতেই তাহার উপায় বিধান করা হইয়াছে। ম্যানিংসাহেব বলিলেন তিনি নিরীহ লোক, তাঁহার কোন দুষ্ট অভিসন্ধি নাই, তিনি কেবল চিনের লোকদিগের সহিত মিশিতে চাহেন এইমাত্র. তিনি পাদ্রি নহেন, কি ধর্ম্ম কি বাণিজ্য কি রাজ্য সম্বন্ধে তাঁর কোন গূঢ় অভিসন্ধি নাই—এইরূপ অনেক করিয়া বলিলেন—কিন্তু সকলি বৃথা হইল। তৎপরে তিনি কোচিন চীনে গিয়া আর একবার এইরূপ চেষ্টা করিলেন কিন্তু সেখানেও তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। কোচিন চীনের গবর্ণমেণ্টও চীনের ন্যায় বিদেশীয়ের প্রবেশ সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক। কিন্তু সাহেব ইহাতেও হতাশ না হইয়া আবার কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে বাঙ্গালার উত্তর সীমায় গমন করিলেন এবং ভূটান অতিক্রম করিয়া তির্ব্বৎ প্রদেশের সাসা নামক স্থানে উপনীত হইলেন। এইবার তিনি তাতার রাজ্যের সীমা দিয়া চীনের রাজধানীতে পৌঁছিয়া তাহার বহুদিনকার মনোরথ পূর্ণ করিবেন মনে করিয়াছিলেন কিন্তু এবারও চীনের রাজ কর্ম্মচারীদিগের নিকট ধরা পড়িলেন। তাহারা চীন রাজ্য হইতে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিতে তাঁহাকে আদেশ করিল। চীনের রাজসরকার এমনি সতর্ক যে কোন রূপে তাহার দৃষ্টিকে এড়াইবার জো নাই।

চীনের রাজতন্ত্র পিতৃ-শাসন-প্রণালী ভিন্ন আর কিছুই নহে। রাজাই প্রজাদিগের পিতৃ-স্থানীয়। প্রজার উপর রাজার সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব। তাঁহার ইচ্ছাই নিয়ম—তাঁহার কার্য্যের ভাল মন্দ বিচার করিবার কাহারও অধিকার নাই। তিনি তাঁহার "প্রজাদিগের পিতা মাতা।" তাঁহার একটি উপাধি "স্বর্গ পুত্র।" লোকেরও বিশ্বাস যে স্বর্গ হইতেই তাঁহার বংশের উদ্ভব। তিনি স্বর্গীয়। তাঁহার আর একটি উপাধি "পবিত্র প্রভু।" তাঁহার সমক্ষে তো প্রজাগণ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবেই, আবার একটি প্রস্তর ফলকে "পবিত্র প্রভু" এই কথাগুলি খোদিত করিয়া তাহারা তৎসমক্ষে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করে। Lord Macartney যখন চীনদেশে দৌত্য কার্য্যে গমন করেন, তখন Sir John Barrow তাঁহার সমভিব্যবহারে ছিলেন। তিনি চীন সম্রাটের জন্ম-তিথি উৎসবের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই চীন দেশে রাজার সহিত প্রজার কি রূপ সম্বন্ধ স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইবে। "১৭ই সেপ্‌টেম্বরে সম্রাটের জন্ম-তিথি উৎসব দর্শন করিবার জন্য অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে রাত্রি ৩ টার সময় আমরা যাত্রা করিলাম। প্রাসাদ-উদ্যানের প্রবেশ দ্বারের সন্নিকট একটি প্রকাণ্ড শালা ছিল—সেখানে গিয়া আমরা দুই ঘণ্টা বিশ্রাম করিলাম। আমাদের জন্য ফল

চা, গরম দুধ এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী আনীত হইল। তাহার পর খবর হইল উৎসব এখনই আরম্ভ হইবে। আমরা তৎক্ষণাৎ উদ্যানে অবতরণ করিলাম। দেখিলাম সম্রাটের রাজ-শিবিরের সমক্ষে মাণ্ডারিন নামক প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী এবং অন্যান্য বড় বড় লোক সারি সারি দণ্ডায়মান। সম্রাট্ একটি যবনিকার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইতেছে না অথচ তিনি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অসংকোচে ও অবাধে সমস্ত তামাসা দেখিতেছেন। যেখানে সম্রাট সিংহাসনে আসীন সেই প্রচ্ছন্ন সিংহাসনের দিকে সকল লোকে আগ্রহের সহিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে এবং কখন্ উৎসব কার্য্য আরম্ভ হয় তজ্জন্য সকলে অধৈর্য্যের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছে। এমন সময় ধীরে ধীরে বাসাচ্ছাদিত ঢাক ও গভীর-কণ্ঠ ঘণ্টা সকলের গম্ভীর বাদ্য দূর হইতে শ্রুত হইল। আবার হঠাৎ সমস্ত বাদ্য বন্ধ হইয়া গেল—সমস্ত দিক নিঃস্তব্ধ হইল। আবার বাদ্য আরম্ভ হইল। আবার মধ্যে মধ্যে বন্ধ হইতে লাগিল—এই সময় শিবিরের সম্মুখে কতকগুলি লোক ব্যস্ত হইয়া যাতায়াত করিতে লাগিল—বোধ হয় তাহারা উৎসবের উদ্যোগ করিতেছিল। অবশেষে কণ্ঠ-সংগীত ও যন্ত্রবাদ্য ঘোর রোলে আরম্ভ হইল। অমনি সকলে সেই প্রচ্ছন্ন ভূদেবের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে ভূমিতলে প্রণত হইল। যে উৎসব-গান গীত হইতেছিল তাহার ধুয়া এই "হে পৃথিবীবাসী মনুষ্যগণ! তোমরা সকলে মহা প্রভুর নিকট মস্তক অবনত কর।" চীন-পৃথিবীর যত লোক বর্ত্তমান ছিল, আমরা ব্যতীত সকলেই সেই ধুয়ার পুনরাবৃত্তির সময়ে প্রতিবার ভূমিতলে প্রণত হইতে লাগিল।"

চিন সম্রাট ও তাঁহার প্রজাদিগের মধ্যে কার্য্যত অলঙ্ঘ্য ব্যবধান থাকিলেও—চলিত কথায় সম্রাট্ প্রজাদিগের পিতৃ-স্বরূপ। এই পিতৃ-শাসনের আবরণে চীন রাজ্যে ভয়ানক ভয়ানক অত্যাচার অবাধে অনুষ্ঠিত হয়। চীনদেশে পিতৃ-শাসন অত্যন্ত প্রবল—সন্তানের উপর পিতার সর্ব্বাঙ্গীন অসীম কর্তৃত্ব। পিতা তাঁহার পরিণতবয়স্ক পুত্রকেও যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে পারেন—নানা প্রকারে নির্যাতন করিতে পারেন, এমন কি তাঁহাকে দাসরূপে বিক্রয় পর্য্যন্ত করিতে পারেন, তথাপি পুত্রের তাহাতে কোন কথা কহিবার জো নাই। অধিকন্তু পিতার দোষের জন্য পুত্রকে দায়ী হইতে হয়। এই পারিবারিক শাসনের আদর্শে চীনদেশে রাজ-শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত। সম্রাট্ মন্ত্রীবর্গকে ও মাণ্ডারিন্‌দিগকে পিতৃভাবে শাসন করেন—এবং ম্যাণ্ডারিণগণ সাধারণ প্রজামণ্ডলীর পৃষ্ঠে এই পিতৃ-ভাবেই বংশ-দণ্ড অজস্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই বংশ-দণ্ডের ব্যবহার কিরূপ পরে তাহার ব্যাখ্যা করা যাইবে। পাঠক মনে রাখিবেন চীনের সম্রাট অপরাধীকে দণ্ড বিধান করেন না; কারণ, দণ্ড বিধানে হৃদয়ের কঠিনতা প্রকাশ হয়, এই কঠিনতা পিতৃ-স্নেহের বিরোধী! এই জন্য সম্রাট্ যখন সহস্র সহস্র প্রজার মস্তক খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করেন তখনও তাঁহাকে দণ্ড বলা যায় না, তাহা সন্তানের প্রতি পিতার কোমল শাসন ভিন্ন আর কিছুই নহে!

ক্রমশঃ

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদের পূর্ব্বাবস্থা। শ্রীপ্যারিচাঁদ মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত। বাঙ্মিকী যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ॥০

সাধারণতঃ আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা বিষয়ে এত অল্প জানা আছে, এমন কি, কৃতবিদ্য দলের মধ্যেও সে বিষয়ে এত কুসংস্কার আছে যে এ রূপ পুস্তক প্রকাশের আবশ্যকতা বিষয়ে কিছু বলাই বাহুল্য।

ঋগ্বেদে প্রকাশ হইতেছে যে, স্ত্রীলোকেরা সালঙ্কৃত হইয়া উৎসব ও বিদ্যানুরঞ্জন সভাতে গমন করিতেন। মহাবীর চরিতে লিখিত আছে যে, ঋষি কন্যা ও পত্নী সকল, পিতা স্বামীর সহিত ভোজে ও যজ্ঞে গমন করিতেন। নাটকাদি পাঠে স্পষ্ট বোধ হয় যে, স্ত্রীলোকেরা নাট্যশালায় ও উৎসবে গমন করিতেন। স্ত্রীলোকেরা প্রকাশ্য স্থানে মঞ্চোপরি বসিয়া মল্লযুদ্ধ ও বাণ শিক্ষা ইত্যাদি দেখিতেন। কি মৃগয়ায়, কি যুদ্ধস্থানে, কি শব-সৎকারে, কি যজ্ঞস্থানে, স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকিতেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালীন দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও উত্তরা পাণ্ডবদিগের শিবিরে ছিলেন। দ্রৌপদির বিবাহ বিষয় বিবেচনার্থে, দ্রুপদের সভায় কুন্তী উপস্থিত থাকিয়া, আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। রাজসূয়, অশ্বমেধ ও রাজা যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের সময়ে নারীরা উপস্থিত ছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে নারীদিগের জন্য স্বতন্ত্র স্থান ছিল ও যুবতীরা সভার মধ্যে ইতস্ততঃ বেড়াইতেন।

বিশেষ বিশেষ প্রমাণ দ্বারা ইহা প্রদর্শিত হইতে পারে যে, যবনরাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছিল। যে সকল প্রদেশে মুসলমানদের উপদ্রবের ততটা আশঙ্কা ছিল না, সে সকল প্রদেশে স্ত্রীস্বাধীনতার প্রাদুর্ভাব ছিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে স্ত্রীস্বাধীনতা এখনো জাজ্বল্যমান আছে। বঙ্গদেশে যবন-উৎপাত সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিল, সুতরাং বঙ্গদেশই স্ত্রীলোকদের পক্ষে একটি বিশাল কারাগার রূপে পরিণত হইয়া আসিয়াছে। ইহাতে এই প্রতীতি হইতেছে যে, স্ত্রীলোকদিগকে দারুণ ভাবে অবরুদ্ধ রাখা আর্য্যসমাজের প্রকৃত অবস্থা নহে, বিকৃত অবস্থামাত্র। স্বীকার করি যে এতদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগকে অবরুদ্ধ রাখিয়া তাহাদিগকে একেবারে পূর্ব্বকালের স্বাধীনতা প্রদান করিলে তাহাতে অশুভ ব্যতীত শুভ ফল

কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না, কারণ সদ্য আরোগী ব্যক্তিকে উচিত পথ্য না দিয়া একেবারে সুস্থাবস্থার স্বাভাবিক আহার দিলে তাহাতে মন্দই ঘটিবার সম্ভাবনা। স্বীকার করি যে এদেশের স্ত্রীলোকদিগকে ইউরোপীয় স্বাধীনতা প্রদান করিলে তাহাতেও অশুভ ব্যতীত শুভ ফল কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না, কারণ ইউরোপীয় বাহ্য আড়ম্বরময় সভ্যতার কোন উপকরণই আমাদের আধ্যাত্মিক সভ্যতার উপযুক্ত নহে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, অল্পে অল্পে আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগকে আমাদেরই পূর্ব্ব প্রণালী অনুসারে স্বাধীনতাতে দীক্ষিত করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। স্ত্রীলোকদিগের সমধিক কালে শ্বশুরালয়েই বাস, কিন্তু শ্বশুরালয়ে স্বামী ব্যতীত——অথবা কিশোর দেবর ব্যতীত অন্য কাহারো সঙ্গে তাহাদের কথা কওয়া দূরে থাকুক, মুখ দেখা-দেখি পর্য্যন্ত অন্যায়। অনেক স্থলে পুত্রবধূরা আপনার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সঙ্গে পর্য্যন্ত মুক্তকণ্ঠে কথা কহিতে সমর্থ নহে। কেবল সম-শিক্ষিতা সম-বয়স্কা সম-অধীনা সঙ্গিনীদের সহিত সমস্ত দিন সহবাসে প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবনা কোথায়? হৃদয় ও মনের সঙ্কোচ ভাবের এরূপ পোষকতা করা অপেক্ষা আর্য্য সমাজের শোভন স্বাধীনতার অল্পে অল্পে দ্বার উদ্ঘাটন করা নিতান্তই আবশ্যক। আমরা ভরসা করি এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেই ঐ বিষয়ে একটু চিন্তা করিবেন। প্যারীবাবু এই সময়োপযোগী গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়া আমাদিগের অশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

গোলাপের দৌত্য।

মাঝিনী আলেয়া——তাল আড়াঠেকা।

গোলাপ যাও গো সখি প্রিয়ার সদনে,
মরমের কথাগুলি বোলো গো গোপনে।
কত আমি সেধেছি
কত আমি কেঁদেছি
তবুও পাইনি স্থান সে নিঠুর মনে।
গোলাপ যাও গো তুমি, প্রিয়ার বদন চুমি,
আমা হয়ে বোলো কথা শিশিরাশ্রু-লোচনে।
কেঁদে কেঁদে আঁখি-রাঙ্গা
হৃদয়ের বৃন্ত-ভাঙ্গা
তোমারে নিশ্চয় হেরি উপজিবে দয়া মনে।

কুসুমের শিরোমণি
শোনো গো গোলাপ রাণি!
অবাক্ ভাষায়, আর নীরব নিশ্বাসে,
যে কাজ সাধিবে তুমি প্রিয়ার সকাশে,
শত-মুখে নারিব তা—কাতর ক্রন্দনে।
তোমার ও দশা হেরি
লইবেন হৃদে ধরি,
চুমিবেন কত আর আদরে যতনে।
সে সময়ে একবার, কথা তুলো অভাগার,
দেখিব সে নিঠুরার আছে কিনা স্মরণে।